বাংলাদেশের বাউল

সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত

ডক্টর আনোয়ারুল করীম

বাংলাদেশের বাউল
ডক্টর আনোয়ারুল করীম

বাংলাদেশের বাউল

সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত

ডক্টর আনোয়ারুল করীম

কথাপ্রকাশ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বাংলাদেশের বাউল' নতুন আঙ্গিকে আবার প্রকাশিত হলো। ২০০২ সালে 'বর্ণায়ন' থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এতদিনে গ্রন্থটি কয়েকবার পুনঃমুদ্রিত হয়েছে বলে শুনেছি। এর মধ্যে তাও নিঃশেষিত হয়েছে জেনেছি। ঢাকার জনৈক পুস্তক ব্যবসায়ী বইটি বাজারে নেই বলে আমাকে জানিয়েছিলেন। আমার আনন্দ হলো, পাঠকদের কাছে বইটির চাহিদা রয়েছে জেনে। এবারে যিনি বইটি পুনঃপ্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি প্রকাশনা জগতের একজন খ্যাতিমান এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব জনাব জসিম উদ্দিন। প্রকাশনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত যত্নবান। লেখকদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল। গ্রন্থটি ছাপাবার আগেই তার প্রমাণ পেয়েছি। তিনি অন্যদের অনুকরণযোগ্য। গ্রন্থটিতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করতে চেয়েছিলাম সময় অভাবের জন্য তা হলো না। বাউল শব্দটির দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আরবি ফারসি ভাষায় বা'আল, বাউল শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। এর একটি অর্থ হলো স্বামী, প্রেমাস্পদ, ফার্সিতে প্রেমিক বা আশেক। ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মে ব'আল নামে প্রজনন দেবতার নাম জানা যায়। তাঁর নামানুসারে বা'আল ধর্ম গোটা মেসোপটেমিয়াতে প্রসার লাভ করেছিল। ইসলামের আবির্ভাব কালেও বা'আল ধর্মীয় দেবতার কথা কোরআন মাজিদে উল্লেখ রয়েছে। (সূরা আস্‌সাফফাত)। বাইবেল এবং কোরআনে বা'আল মতবাদকে নিন্দা করা হয়েছে।

বিশ্ব সাহিত্যে 'দেহতত্ত্ব' মতবাদ সৃষ্টির প্রায় শুরু থেকেই কবিতা, গানে, এমনকি নাটক, উপন্যাসেও প্রকাশ পেয়েছে। পারস্যের সুফি ভাবনায় 'দেহতত্ত্ব' অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে মিশে পৃথিবীব্যাপী তার দীপ্তি ছড়াচ্ছে। চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ এবং বাউলগানে একই ভাবনার প্রতিফলন হতে দেখেছি। তবে লালনের গানে ভাব, ভাষা এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তা মহৎ সাহিত্যেরই পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথ লালনের গান শুনে এবং লালনকেই তিনি তাঁর কাব্যজীবনের প্রেরণার সজন বলে জেনেছিলেন এবং সে কারণেই বাউলদের প্রতি ছিল তার অপরিসীম ভালোবাসা। নিজেকে তাই রবীন্দ্রবাউল বলতেও তার কোনো সংকোচবোধ হয়নি।

১৯৫৫ সালে কলেজে পড়ার সময় বাউলদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ তাদের সঙ্গে আমার মেলামেশা। ১৯৬৩ সালে বাউল কবি লালন নামে আমার গ্রন্থ প্রকাশের পর কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি। তখনকার জেলা প্রশাসক কাজী গোলাম আহাদ আমাকে

সহযোগিতা করেন। ১৯৭৬ সালে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্রকে লালন একাডেমিতে রূপান্তরিত করি। ১৯৮৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে সেখানে যোগদান করি। সুফিসাহিত্যের বিশ্বনন্দিত প্রফেসর এ্যানমেরী শিমেল-এর তত্ত্বাবধানে সুফিবাদ ও লোকধর্মের ওপর উচ্চতর গবেষণা করি। হার্ভার্ডসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউল বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছি। এসবের ফসল 'বাংলাদেশের বাউল' গ্রন্থ। বাংলাদেশে এখন বাউল এবং লালন গবেষক অসংখ্য। বাউল-জীবনের সঙ্গে মোটেও না মিশে এবং না জেনে তারা অনেক গ্রন্থ লিখে চলেছেন। এদের অনেকের লেখায় কোনো নিজস্বতা নেই বললেও চলে। গানের অর্থ আদৌ না জেনে এরা গানের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে। এরা পণ্ডিতম্মন্য। এদের বই আজ জয়জয়কার চারদিকে। বাউল ও লালনের গানের সুরেও চরম স্বেচ্ছাচারিতা। প্রকৃত বাউল সাধক ও বাউল গায়কদের স্থান নিয়েছেন নগর বাউল এবং তাদের সহযোগীবৃন্দ। বাউল এবং লালনকে নিয়ে আজ তাদের ব্যবসা বেশ জমজমাট।

বাউল সাধক এবং লালন ফকির প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস করেননি। লালন ফকির এবং বাউলদেরকে তাই হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা সঠিক নয়। হিন্দু বা মুসলমান যে ঘরেই তারা জন্ম নিয়ে থাকুন না কেন, তাদের যা কর্মকাণ্ড তাই তাদের পরিচয় বহন করে। এরা প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং ধর্মের নামে যারা অসত্যকে আশ্রয় করে সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করতে চেয়েছে তাদেরকে তারা প্রতিহত করতে চেয়েছেন তাদের গানে। চর্যাপদ ও বাউল গানে এই প্রতিবাদী ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। অসাম্প্রদায়িকতা তাদের শক্তি। জীবনের পরিশীলিত বিষয় নিয়ে তারা লোকধর্মকে লোকশিক্ষার ফোকলোর বাহন মনে করেছেন। এদের অধ্যাত্মবাদ জীবন ও জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বলা যেতে পারে, জীবনই তাদের এই অধ্যাত্মবাদের উপজীব্য বিষয়। 'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। স্রষ্টাকে তারা চোখে দেখেননি, তাই তার প্রতি আকর্ষণও অনেকটাই কম। নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। 'যারে দেখিনা নয়নে তারে ভজিব কেমনে'। এটাই বাউল সাধনার প্রধান তত্ত্ব। 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'। এ সাধনা তাই একান্ত করেই লৌকিক। এখানে ইসলামকে অনুসন্ধান করা একেবারেই বাতুলতা। লালন ফকিরের গানে আল্লাহ এবং রসুলের কথা বলা হয়েছে, এতে মনে হয় তিনি ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এটাও সঠিক নয়। সবকিছুকেই রূপ-স্বরূপের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় ভাবনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাউলদের অবস্থান তাই সর্বধর্মে। কোনো একটিতেই তারা সীমাবদ্ধ নন। 'বিন্দু' সাধনার মাধ্যমে দেহকে রক্ষা করে তারা একটি আনন্দঘন দীর্ঘ সুখী জীবনের প্রত্যাশী। এই প্রত্যাশা যিনি পূরণ করতে পারেন তিনি তাদের মনের মানুষ। এই মনের মানুষকে পাওয়ার সাধনাই বাউলের একমাত্র সাধনা। আমার এই গ্রন্থে এই অনুসন্ধানের কথাই ব্যাপৃত রয়েছে সর্বত্র।

প্রফেসর ড. আনোয়ারুল করীম

প্র-ভিসি, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

সূচি

প্রাক-কথন ॥ ১১

প্রস্তাবনা ও পটভূমি

- প্রস্তাবনা ও পটভূমি ॥ ৩৩
- লোকধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি ॥ ৫৫
- লোকধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥ ৬২
- মারফতি-মুর্শিদ্যা গান ॥ ৮০
- বাউল সম্প্রদায় ॥ ৯২
- বাউলদের সাধনপীঠ ॥ ১০৫
- বাউল গবেষণার ইতিহাস ॥ ১১৭

প্রথম অধ্যায়

- বাউল লোকধর্মের উদ্ভবকালের ইতিহাস ॥ ১৪৫
- উৎসের সন্ধান এবং মূলধর্মের বিরোধিতা ॥ ১৫৬
- বাউল শব্দের অর্থবৈচিত্র্য ॥ ২২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

- বাউল : একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা ॥ ২৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

- বাউলসাধনার বৈশিষ্ট্য ॥ ৩১৩
- বাউলসাধনায় তন্ত্র ও যোগের প্রভাব ॥ ৩২৪
- বাউলতত্ত্ব ॥ ৩৩২
- বাউলসাধনায় রতিনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ॥ ৩৬৩
- ক্ষেত্রগবেষণার বিবরণ ॥ ৩৯১

- বাউলদের চিকিৎসাপদ্ধতি ॥ ৪০১
- বাউলগানে সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার ॥ ৪১১
- বাউলগানে বিম্বিত সমাজ ও সমাজতত্ত্ব ॥ ৪৩১

চতুর্থ অধ্যায়

- বাংলাদেশের লোকসংগীত ও বাউলগান ॥ ৪৫৩
- লালন শাহ ॥ ৪৭৫
- লালন ফকিরের শিষ্য ॥ ৫০১
- পাগলা কানাই ॥ ৫১৫
- পাঞ্জু শাহ ॥ ৫২৫
- দুদ্দু শাহ ॥ ৫৩৩
- গগন হরকরা ॥ ৫৩৯
- গোঁসাই রামগোপাল ॥ ৫৪২

পঞ্চম অধ্যায়

- বাউলগানের সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব ॥ ৫৪৯
- রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার বাউল ॥ ৫৭৪
- রবীন্দ্রসংগীতে বাউলপ্রভাব ॥ ৫৯৩
- নজরুল সাহিত্য ও সংগীতে বাউলপ্রভাব ॥ ৬০৪
- সমকালীন সাহিত্যে বাউলগানের প্রভাব ॥ ৬২৯
- আধুনিক কবিতায় বাউল চেতনা ॥ ৬৪৩

পরিশিষ্ট ॥ ৬৭৩

গ্রন্থপঞ্জি ॥ ৭০৯

প্রাক-কথন

১.১

১৯৫৫ সালে লালনের গান প্রথম শুনি কুষ্টিয়ায়। আমি তখন কুষ্টিয়া কলেজে পড়ি। আমার পিতার বদলি চাকরির সুবাদে ঢাকা থেকে আমাদের কুষ্টিয়ায় আসতে হয়। শহর থেকে একটু দূরে গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার একটি সরকারি খামারবাড়িতে আমরা থাকতাম। একপাশে ছিল জেলা বোর্ডের তৈরি সদরে যাওয়া-আসার জন্য রাস্তা, যার অধিকাংশ ছিল কাঁচা অর্থাৎ মাটির তৈরি। অপরপাশে ছিল বিস্তীর্ণ মাঠ এবং জলাশয়—নাম ছিল ছাইবেড়ের বিল। গভীর রাত অবধি পথচলতি মানুষের যাতায়াতের সময় মাঝে মাঝে ভেসে আসত একধরনের উদাসী গান। সুর এবং বাণীতে ছিল ভিন্ন স্বাদ। গ্রামের মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়, গ্রামাঞ্চলে এসব গানকে ভাব-সংগীত বলা হয়। লালন ফকির, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, পাগলা কানাই এমন অনেকের গান এই পর্যায়ভুক্ত। এইসব গানকে 'শব্দগান' নামেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো লেখক লালন এবং তাঁর অনুসারীদের গানকে 'বাউল', 'ধুয়া' এবং 'ভাটিয়ালি' বলেও অভিহিত করেছেন।

সেই তরুণ বয়সে লালনের গান আমার মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। কুষ্টিয়া কলেজে আমার একজন সতীর্থের সাথে আলাপ করে জানতে পারি লালন ফকিরের কবর এবং আখড়া আছে মোহিনী মিলের সন্নিকটে ছেঁউড়িয়া গ্রামে। আমি যেতে চাইলে সে আমাকে নিরুৎসাহিত করেছিল। তার কথায় যা জেনেছিলাম তা হলো : লালন ফকিরের একটি আখড়া আছে ছেঁউড়িয়া গ্রামে। এখানে মেয়ে-পুরুষ সবাই একসাথে থাকে। সারা রাত ধরে তারা গান করে। গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদি খায়। নানা ধরনের 'অপকর্ম' করে নারী-পুরুষে মিলে। আশেপাশের লোকজন তাদের ভালো জানে না। কোনো 'ভদ্র'লোক তাদের সাথে মেশে না।

আমার বন্ধুর নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে একদিন একা একা লালন ফকিরের আখড়ায় গেলাম। কুষ্টিয়া শহরের পূর্বপাশে যেখানে মোহিনী মিল, তার উত্তরপাশ দিয়ে প্রবাহিত গড়াই নদী এবং এই মিলের শ্রমিকদের ব্যারাকের পাশ দিয়ে বয়ে

যাওয়া (বর্তমানে মৃত) কালীগঙ্গা নদীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ছেঁউড়িয়া গ্রাম এবং নদীর পাড়েই ঘন বাঁশঝাড়, আম ও কাঁঠাল বাগানের ছায়াঢাকা পরিবেশে লালনের আখড়া। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, কুষ্টিয়া শহরে দুটি রেলওয়ে স্টেশন। একটি শহরের পশ্চিম অঞ্চলে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন। এখানে ব্রিটিশ আমল থেকে আদালত এবং জজকোর্ট থাকায় জনসাধারণের সুবিধার্থে রেল কর্তৃপক্ষ কোর্ট স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ অঞ্চলেই মূল শহর গড়ে উঠেছে। এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ছেঁউড়িয়া গ্রাম এবং লালন ফকিরের আখড়া। মোহিনী মিল সংলগ্ন রেলস্টেশনটির নাম 'কুষ্টিয়া'। এখান থেকে লালনের আখড়ার দূরত্ব কোয়ার্টার মাইল।

কুষ্টিয়া স্টেশন ও মোহিনী মিল সংলগ্ন ছিল কবি রবীন্দ্রনাথের সাময়িক বসতবাটি 'টেগোর লজ'। এই বসতবাটিটি রবীন্দ্রনাথ সাময়িক অবস্থান ও ব্যবসার সুবিধার জন্য তৈরি করেছিলেন। মোহিনী মিলের সম্মুখ দিয়ে যে রাস্তাটি রয়েছে তা পেরিয়ে একটি রেলওয়ে ক্রসিং, যার একধারে মোহিনী মিল অফিসার্স কোয়ার্টার্স, অপর ধারে শ্রমিকদের জন্য নির্মিত ব্যারাক। এখান থেকে পায়ে হেঁটে গেলে ৩ মিনিটের পথ ছেঁউড়িয়া গ্রাম এবং লালনের আখড়া। মিল ব্যারাক ছাড়লেই একটি মেঠোরাস্তা এবং তার উপরে জেলা বোর্ডের তৈরি একটি ব্রিজ কালীগঙ্গা নদীর উপর। এই ব্রিজ থেকে উত্তরদিকে তাকালে গড়াই নদী দেখা যায়। গড়াই নদীর উত্তরপাড়ের এককোণে কয়া গ্রাম। এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের কুঠিবাড়ির দূরত্ব প্রায় চার মাইল। রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়াতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য নদীর ঘাট পর্যন্ত একটি মাটির সড়ক নির্মাণ করে দিয়েছিলেন যা আজও 'রবীন্দ্র সড়ক' নামে পরিচিত। কুষ্টিয়া শহরের বড়বাজার সংলগ্ন নদীর উত্তরপাড়ে ঘোড়াই ঘাট। এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ কুঠির দূরত্ব ছয় মাইল। পাকিস্তান আমলে জেলা বোর্ডের একটি সড়ক নির্মিত হয় শিলাইদহ গ্রাম অবধি। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিলাইদহের এই রাস্তা পাকা করা হয়।

কালীগঙ্গা নদীর উপর মিল-ব্যারাক সংলগ্ন ব্রিজ থেকেই লালনের আখড়া এবং ছেঁউড়িয়া গ্রাম দেখা যায়। ছেঁউড়িয়া গ্রামের অধিকাংশ জনগণই তন্তুবায় বা কারিকর শ্রেণীভুক্ত। অন্যরা কৃষিজীবী এবং শ্রমিক। কথিত আছে, এই কালীগঙ্গা নদীর পূর্বপাড়ের তীরে কারিকরপাড়া থেকে নদীর পানি নিতে এসেছিলেন মলম ফকিরের স্ত্রী মতিজান বিবি। ঘাটে এসেই অচৈতন্য অবস্থায় একটি যুবককে দেখতে পান। বাড়িতে নিয়ে এসে দেখেন যুবকটির বসন্ত হয়েছে। সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে ভালো করে তোলেন মতিজান। এই যুবকটিই ছিলেন লালন। লোকশ্রুতি আছে যে, মলম কারিকরের বাড়িতে থাকার সময় একদিন মলম কারিকরের পবিত্র কোরান পাঠকে তিনি সংশোধন করে দিলে সকলে আশ্চর্য হন। তাঁর বাড়িঘর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিরুত্তর থাকতেন।

মলম কারিকর ফকিরি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন সিরাজ সাঁই। এতদঞ্চলে মলম ব্যতিরেকে ভাড়ারা গ্রামের আরমান শাহ সিরাজ শাহের শিষ্য ছিলেন। ছেঁউড়িয়া এবং ভাড়ারা ছিল কুমারখালী থানার অন্তর্গত চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। জনশ্রুতি আছে, মলম কারিকরের বাড়িতে থাকাকালীন সিরাজ সাঁইয়ের কাছে 'ফকিরি' মতবাদে দীক্ষিত হন লালন। তিনি ছেঁউড়িয়া গ্রাম থেকে চলে যেতে অনীহা প্রকাশ করলে মলম কারিকর তাঁর সম্পত্তির এক বিরাট অংশ লালনের নামে দান করেন। মলম কারিকরের বাড়ির দক্ষিণপাশের জমিতে লালন তাঁর আখড়া নির্মাণ করেন এবং এখানেই তিনি আমৃত্যু বসবাস করেন। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার বেশ কিছুদিন পর একদিন লালন ফকির কোনো এক স্থান থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং তাকে তাঁর শিষ্যদের কাছে 'গুরুমা' বলে পরিচয় দান করেন। এই মহিলার নাম বিশখা। ছেঁউড়িয়ায় লালনের সমাধি প্রাঙ্গণে তাঁর কবর আছে। লালন শাহের শিষ্যদের মধ্যে তাঁর আখড়ায় যারা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন তাদের মধ্যে শিতল শাহ, ভোলাই শাহ, পাঁচু শাহ, মানিক পণ্ডিত, মনিরউদ্দিন শাহ, মতিজান ফকিরানী, ভাঙ্গুড়ী ফকিরানী প্রমুখ অন্যতম।

সেদিন আমার তরুণ বয়সে লালনের আখড়া দেখতে এলে তার পরিবেশ আমাকে চমৎকৃত করেছিল। উত্তর এবং পূর্বে দু'চালা দুটো মাটির ঘর ছিল। লালন এবং মতিজান বিবির কবরের পাশে মধ্যখানে ছিল আটচালা বড় চৌরি ঘর। লালন এবং মতিজান বিবির কবর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। ইট ও সুরকি দিয়ে বাঁধাই করা ছিল লালনের কবর। কুষ্টিয়া কলেজে পড়বার সময় লালনের ছেঁউড়িয়া আখড়া বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। বাউলদের মধ্যে আখড়া বাড়ির সেবায়েত হিসেবে যার সাথে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল তার নাম ছিল কোকিল শাহ। তিনি বোধকরি, এমন বলেছিলেন যে, লালন ফকিরের কবরটি, মোহিনী মিলের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী বাবু দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী ওরফে কানু বাবু বাঁধাই করে দেন। লালন অনুসারী ভক্তদের মধ্যে ছেঁউড়িয়া গ্রামের নিজাম ফকির, আব্দুল গনি, আব্দুল জব্বার, স্বরুপ শাহ প্রমুখ ফকিরদের সাথে আলাপকালে এমন কথা শুনেছিলাম। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বর্তমান ফরিদপুর গ্রামের বিশিষ্ট লালন সংগীত শিল্পী বেহাল শাহ জানিয়েছিলেন লালনের কবরটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঁধাই করে দেন। এই উপজেলার জাঁহাপুর গ্রামের প্রখ্যাত শিল্পী এমন কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে ঠাকুর এস্টেটের জমিদার ছিলেন। মোহিনী মিল সংলগ্ন। তিনি প্রায়ই এসে থাকতেন। তিনি এমন টগোর লজ-এ সাধারণভাবে লালন ফকিরের সমাধি বাঁধাই করে দেবেন তা আমার মন মানতে চায় না। দেখেছি, অনেকেরই এমন ধারণা হয়েছিল তখন। বলতে কি, ৫০-এর

দশকে সামান্য কয়েকজন লালনভক্ত ব্যতিরেকে এই আখড়াতেও তেমন লোক সমাগম হতো না। চাপড়া ইউনিয়নের এক সময়ের চেয়ারম্যান ছেঁউড়িয়া নিবাসী মোজাম্মেল হক কেরু মিঞা পরবর্তীকালে আলোচনাকালে কানু বাবুর নামই উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৬০-৬২ সালের দিকে লালন ফকিরের অপর একজন অনুসারী ভক্ত এবং ছেঁউড়িয়া নিবাসী ইসমাইল ফকির এবং কুষ্টিয়া কলেজের তৎকালীন ডিগ্রী বিল্ডিং নির্মাণ কাজের সুপারভাইজার লালন মাজারের সদস্য মোসলেম ফকিরও কানু বাবুর নামটিই বলেছিলেন।

সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন ফকিরের কবরটি বাঁধাই করে দিয়েছিলেন, এমন তথ্য সঠিক নয়। তবে তিনি মাজারে প্রায়শ এসেছেন এবং মাজারের জন্য অর্থ অনুদানও করে থাকতে পারেন। তবে সে টাকা দিয়ে কবরটি বাঁধাই করা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না।

ছেঁউড়িয়া ফকিরদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে তেমন ভালো ধারণা ছিল না। তাঁরা দাবি করতেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন ফকিরের কয়েকটা গানের খাতা সে সময় মাজারে বসবাসকারী ফকিরদের কাছ থেকে নিয়ে যান। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী মিউজিয়ামে এসব খাতা আমি পরবর্তী সময়ে দেখেছি। আমার এক বন্ধু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনৎ কুমার মিত্র লালন ফকিরকে নিয়ে তাঁর একটি গ্রন্থে লালনের এসব খাতা থেকে নেওয়া লালনের বেশকিছু গান প্রকাশ করেন।

এখানে প্রচুর আমবাগান, বাঁশঝাড় এবং তেঁতুল ও কাঁঠালের গাছ ছিল। আখড়াতে তখন তেমন বেশি সাধু-ফকিরের আনাগোনা ছিল না। কয়েকজন নারী-পুরুষ প্রায়শই আখড়াতে থাকতেন। সাদা লুঙ্গি ও সাদা ফতুয়া ধরনের জামা গায়ে একজন লম্বা আকৃতির ফকির এবং একজন মহিলা ফকিরানীর সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। চালচলন বোষ্টম-বোষ্টমীদের মতো মনে হয়েছিল আমার। তাঁরা উত্তরদিকের ঘরে বসবাস করতেন। আটচালা ঘরে কয়েকজনকে সংগীতসাধনা ও আলাপরত অবস্থায় দেখেছিলাম। তাদেরকে গাঁজা সেবন করতেও দেখেছি। গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁরা রাতে যেতে বলেছিলেন। সে রাতে অবশ্য আর যাইনি, পরে গিয়েছি।

আখড়ার আশপাশে অল্প কয়েকটি বাড়িঘর ছিল। এরা বাউল বা ফকিরি মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বলেছিলেন যে, আখড়ায় যারা থাকেন তারা নাড়ার ফকির। ছেলেমেয়ে নেই। শরিয়তপন্থীদের সাথে তাদের বিরোধ আছে। এদের কাছ থেকে পরে জেনেছিলাম কুষ্টিয়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাওলানা আফসারউদ্দিন আখড়ার ফকিরদের চুল কেটে দেন এবং তাদের সাথে গ্রামবাসীদের মেলামেশা বন্ধ করে দিতে বলেন। গ্রামবাসীরা এদের সাথে

মেলামেশা না করলেও ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমার সময় ফকিরদের যে সাধুসেবা হতো, সে সময় ফকিরদের অনুষ্ঠানাদিতে গ্রামের অনেকেই অংশ নিত। তিনদিন ধরে হতো গান এবং তার বিশ্লেষণ। গ্রামবাসীরা এদের সাথে মেলামেশা না করলেও অসুখ-বিসুখে তাদের কাছে আসতে দেখেছি। লালনের মাজারে মানত এবং শিন্নি করতেও দেখেছি। ফকির মাত্রই লালনের কবরে গড় হয়ে সেজদা দেওয়া ছিল রীতি। সাধুসেবার শুরুতেই খাবার রেখে দেওয়া হতো কবরের পাশে। উদ্দেশ্য : গুরুভোগ। ফকিরেরা বিশ্বাস করত যে তাদের গুরু দেহ রেখেছেন সত্য, কিন্তু তিনি জীবিত। সুতরাং তাঁকে না খাইয়ে অন্যকে খেতে দেওয়া যায় না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাতি দেওয়া হতো কবরে।

গ্রামে গ্রামে এসব ফকিরদের সাথে বেড়িয়েছি। কখনও রাত কেটেছে তাদের সাথে। লক্ষ করেছি, তাদের সাথে নিম্নশ্রেণী বলে কথিত মানুষদের সংযোগ ছিল বেশি। অন্যেরা এদের সাথে মেলামেশা তেমন পছন্দ করত না। এমনকি একই গাঁয়ের অধিবাসী হলেও তাদেরকে ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবে কখনও আমন্ত্রণ জানানো হতো না। গাঁয়ের মধ্যে এরা সকলের সাথে একই পাড়ায় থাকতে পারেনি। বেশ দূরে স্বতন্ত্রভাবে এই 'ফকির' সম্প্রদায়কে থাকতে দেখেছি। গোঁড়া মুসলমানেরা এদেরকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করতেন না। গোঁড়া হিন্দুরাও তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না এবং সামাজিকভাবে তাদেরকে 'অস্পৃশ্য' জ্ঞান করতেন। কোনো কোনো অঞ্চলে এই 'ফকিরদের'কে নানা ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হতো। 'লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র', যা পরবর্তীতে 'লালন একাডেমি' নামে পরিচিত হয়, আমি তার দায়িত্বে থাকাকালীন এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। তাদের নিরাপত্তার জন্য জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নিতে হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৬২ সালের পূর্বে ছেঁউড়িয়া লালন আখড়াতে তেমন কোনো বড় উৎসব হয়নি। সীমিতভাবে ফকিরেরা তাদের ধর্মানুষ্ঠান পালন করেছে। গানের অনুষ্ঠানে জনসমাগম হতে দেখেছি। ছেঁউড়িয়া গ্রামে গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। এরা এই ফকিরদেরকে ঘৃণার চোখে দেখত। ছেঁউড়িয়ার আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেককে আসতে দেখেছি। তবে তখন নারীদের উপস্থিতি নিতান্ত কম ছিল। কেবল ফকিরি ধর্মমতের অনুসারী নারী-পুরুষ এসব অনুষ্ঠানে থাকত।

১.২

১৯৫৭-৫৮ সালে 'বাউল ফকির লালন শাহ' এই নামে আমার বেশ ক'টি লেখা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে ছাপা হয়। এরপর নিয়মিতভাবে

দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদ, মাসিক সওগাত ইত্যাদিতে বাউল এবং লালন বিষয়ে আমার লেখা প্রকাশিত হয়। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় লেখকসংঘ পত্রিকায় লালন ফকির সম্পর্কে নিয়মিত লিখেছি। প্রথমদিকে সম্পাদক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা এবং পরবর্তীতে কবি গোলাম মোস্তফা ও কবি সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় আমার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। এরপর লেখকসংঘ পত্রিকার নাম পাল্টে হয় 'পরিক্রম'। লালন সম্পর্কে আমার লেখার যে ধারাবাহিকতা এতদিন ছিল এবারে তার প্রকাশ সম্ভব হলো না। 'পরিক্রম' পত্রিকার সম্পাদক জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাকে একটি সংখ্যাতেই লেখা শেষ করার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং সেভাবেই একটি লেখায় লালন ফকির সম্পর্কে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৬০-৬১-তে বাংলা একাডেমিতে আমার গ্রন্থটি প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে পাণ্ডুলিপি দাখিল করি। দীর্ঘবছর যাবৎ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। তখন কোনো কোনো বন্ধু আমাকে সতর্ক করে দেন যে পাণ্ডুলিপিটি বাংলা একাডেমি থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

১৯৬২ সালে আমি কুষ্টিয়া কলেজে ইংরেজি বিভাগে যোগদান করে পাণ্ডুলিপি একাডেমি থেকে ফেরত নিয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তার মুদ্রণের ব্যবস্থা নেই। ১৯৬৩ সালে 'বাউল কবি লালন শাহ' নামে আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে লালন ফকির সম্পর্কে আমার সেই গ্রন্থটিই তৎকালীন পাকিস্তানে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ইতোমধ্যে লালন ফকির সম্পর্কে আমার লেখা প্রকাশ পাবার পর নানাজনের কাছ থেকে উৎসাহ পাই। তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব কিউ জি আহাদ আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন এবং তিনি জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে এবং সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যে ছেঁউড়িয়া লালন আখড়ায় লালনের মাজারে একটি চমৎকার সমাধিসৌধ, মোগল আঙ্গিকে সুউচ্চ তোরণ, বাউলগান পরিবেশনের জন্য একটি স্থায়ী মঞ্চ এবং লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র ভবন নির্মাণ করেন। স্থায়ী মঞ্চের সম্মুখ ভাগের স্থান পাকা করে দেওয়া হয়। সরকারি উকিল এ জেড রেজওয়ানুল হককে সম্পাদক এবং ছেঁউড়িয়া নিবাসী চাপড়া গ্রামের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোজাম্মেল হক (কেরু মিয়া)-কে সহ-সম্পাদক এবং আমাকে ও কুষ্টিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আফসারউদ্দিন শেখসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। জনাব কিউ জি আহাদ লালন শাহকে একজন অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন দরবেশ মনে করে কুষ্টিয়া জেলা শহরের নাম 'লালননগর' রাখার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই পরিকল্পনা প্রতিকূল প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সে-সময়ে বিশিষ্ট আলেম জনাব মাওলানা মেসবাহুর রহমান এবং তার অনুসারী অন্য আলেমগণের তীব্র প্রতিবাদ জানাবার কারণে এ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

পাকিস্তান আমলে এ জেড রেজওয়ানুল হকের পরে প্রথমে জনাব আফসার উদ্দিন শেখ এবং পরে আমাকে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই রাজনৈতিক নেতা কুমারখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব গোলাম কিবরিয়াকে সভাপতি এবং মুক্তিযোদ্ধা নূর আলম জিকুকে সম্পাদকের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। আমাকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭২ সালে লালন উৎসবের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তখন জেলা প্রশাসক ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা জনাব শামুসল হক। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলা থেকে বিশিষ্ট গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ড. মযহারুল ইসলাম ও পশ্চিম বাংলার ড. দুলাল চৌধুরী এবং দিব্যজ্যোতি মজুমদার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭৩ সালে লালন উৎসবের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়। তখন জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব আব্দুন নূর। পশ্চিমবাংলা থেকে বিশিষ্ট গবেষক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাকে অনুরোধ জানানো হয়। সরকারিভাবে আমার দায়িত্বে দুটি মাইক্রোবাস দেওয়া হয় এবং মুক্তিযোদ্ধা জনাব নূর আলম জিকু এবং মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারী আমার সাথে পশ্চিম বাংলায় গমন করেন। সেদিন আমাদের সাথে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী, পূর্ণদাস বাউল, মঞ্জুদাস, লক্ষ্মণ দাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, গৌরী ভট্টাচার্য, বালকৃষ্ণ মেনন এবং রবীন্দ্রভারতীর সংগীত বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, বরেণ্য লোকবিজ্ঞানী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, একই বিভাগের প্রফেসর ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম বাংলা ফোকলোর একাডেমির ডিরেক্টর ড. দুলাল চৌধুরী, বাংলাদেশের ড. মযহারুল ইসলাম, প্রফেসর মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আমলে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, মোস্তফা জামান আব্বাসী, কণ্ঠশিল্পী আব্দুল হামিদ ও নীনা হামিদ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার উপ-পরিচালক জনাব আনোয়ার আলী লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন।

পাকিস্তান আমলে ১৯৬৬ সালে আমার 'বাউল কবি লালন শাহ' দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ও 'লালন গীতি' প্রকাশিত হয়। এই সময় জেলা প্রশাসক ছিলেন আজিজুল জলিল। সে সময়ে পাকিস্তানের ইংরেজি পত্রিকা 'ডন'-এর সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেন কুষ্টিয়ায় আসেন এবং লোকসাহিত্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁকে লালন বিষয়ে আমার গ্রন্থটি উপহার দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় আমার লেখা গ্রন্থ 'বাউল সাহিত্য ও বাউলগান'। এ গ্রন্থটি লেখার জন্য আশীর্বাদ জানান প্রফেসর মুহম্মদ

মনসুরউদ্দীন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর আশুতোষ ভট্টাচার্য এর ভূমিকা লিখে দেন। অভিনন্দন জানিয়ে পত্র দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন রীডার প্রফেসর ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ভূমিকাংশে লেখেন :

> অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম রচিত 'বাউল সাহিত্য ও বাউলগান' বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর লৌকিকধর্ম বিষয়ক একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থখানি কেবলমাত্র অধ্যয়নের কিংবা কোন অধ্যাত্মবিশ্বাসের ফল নহে; ইহাতে গ্রন্থকার সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষভাবে তাঁহার চারিদিকের সমাজে প্রচলিত একটি লৌকিক ধর্মবিশ্বাস, তাহার আচার আচরণ এবং সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ধর্মীয় সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা অনেক সময় নিরপেক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু বর্তমান লেখক নিজে সাহিত্যের অধ্যাপক সেইজন্য উচ্চতম শিল্পসাহিত্যের বিশ্লেষণী রীতিতে অভ্যস্ত। সুতরাং তিনি সকল প্রকার সংস্কার মুক্ত হইয়া বিষয়টি সম্পর্কে সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতে পারিয়াছেন।
>
> বাউলের ধর্ম আলোকচারী ধর্ম; ইংরেজীতে ইহাকে mystic বলা যায়। বিশেষতঃ এই ধর্ম একান্ত গুরুমুখী। সেইজন্য অনেক সময় বাহির হইতে ইহার অন্তর্মুখী রহস্যের কথা বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার নিজে বাংলার বাউলের লীলাভূমি কুষ্টিয়ার অধিবাসী। সেই সূত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ বাউল সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে বাস করিয়া তাহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলস্বরূপ তিনি তাহার এই গ্রন্থখানি বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠিতে লেখেন :

> আপনার 'বাউল সাহিত্য ও বাউলগান' পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।... আপনি হয়তো বয়সে নবীন, অন্তত আমার চেয়ে তো নবীন বটেই, কিন্তু আপনার এই গবেষণাগ্রন্থে যে পক্ব-প্রবীণতা ও সরস শিল্পবোধের সমন্বয় লক্ষ্য করেছি তার জন্যে আপনাকে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ জানাই। এই দুরূহ রহস্যমণ্ডিত গুরুমুখী সাধ্য-সাধন—যার অনুল্লেখ্যকৃত্য ভব্যজনের বিবমিষা উদ্রেক করে, আপনি নিঃসন্দেহে বস্তুতন্মাত্র চেতনার মতো তাকে তার যথোচিত পরিপ্রেক্ষিতে রেখে আলোচনা করেছেন—এ সহজ কাজ নয়।...
>
> আপনার গবেষণাগ্রন্থ একটি অনবদ্য শিল্পবস্তু হয়েছে—এ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। ওর তথ্য ও তত্ত্বের যে সমারোহ রয়েছে তার মূল্য ঐ পথের পথিকেরা নিশ্চয় বুঝবেন। কিন্তু সাধারণত বাংলা গবেষণা বলতে আমরা যে বিষয়ের নীরস তথ্য বিবৃতি বুঝি, আপনার গ্রন্থটি তার একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। আপনার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও কলমের সরসতা ভাল লেগেছে।

প্রকৃত অর্থে এসব মনীষীর প্রেরণার কারণেই আমি বাউল বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হই। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে

বাউল বিষয়ে বক্তৃতাদানের সুযোগ আমাকে আরও আগ্রহী করে তোলে। এসব দেশের মধ্যে আমেরিকা, লন্ডন, জাপান, ফিলিপাইন, ইরাক ও ভারত অন্যতম।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গবেষকদের উৎসাহ ও প্রেরণার কারণে আমি আরও গভীরভাবে এই বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করি। ১৯৭৫ সালে এ বিষয়ে পিএইচ-ডি করার একটি সুযোগ এলে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নীলিমা ইব্রাহীমের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করি। অবশ্য পিএইচ-ডি লাভের জন্য গবেষণাকর্মে সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেন বর্তমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য মহোদয়। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে 'বাউল : একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা' নামে অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমাকে পিএইচ-ডি ডিগ্রি দেওয়া হয়। অতঃপর এ বিষয়ে আমি আরও ব্যাপক গবেষণা করি। ১৯৮৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে উচ্চতর গবেষণাকর্মের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রফেসর অ্যান মেরি শিমেলের তত্ত্বাবধানে আমি সেখানে সুফিবাদ বিষয়ে গবেষণা করেছি। এই সময় আমি লন্ডন, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিপাইন ও মিনদানাও বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানে ওকাইমা ফোকলোর সোসাইটি এবং নটরডাম সেইসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউল ও সুফিবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দেই।

১৯৮০ সালে আমেরিকান মহিলা গবেষক ক্যারোল সলোমন লালন বিষয়ে গবেষণার জন্য কুষ্টিয়াতে আমার কাছে আসেন। আমার বাসায় অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরপর আর একবার তিনি আমার বাড়িতে অবস্থান করেন এবং লালন ফকিরের অনুসারীদের গুপ্ত সাধনা ও তাদের গানের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমার নিকট থেকে অবহিত হন। বাউলদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমার আবিষ্কারের বিষয়টিও তাঁকে অবহিত করি। ১৯৮০ সালে জাপানের ওকাইমা ফোকলোর সোসাইটির জার্নালে এ সম্পর্কে আমার একটি ইংরেজি লেখা *Folk Medicine, Baul Practice and Their System of Birth Control*-এর জাপানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ক্যারোল আমার ইংরেজি প্রবন্ধ ও জাপানি অনুবাদ পাঠ করে চমৎকৃত হন। বাউলদের জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আমি বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, ঢাকা আয়োজিত একটি সভায় বক্তব্য রাখি। এরপর সরকারের জনসংখ্যা গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় ইনস্টিটিউটে (নিপোর্ট)-এ বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হই। আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে গণস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান আমার গবেষণার যথার্থতা নিরূপণের জন্য কুষ্টিয়াতে একটি টিম পাঠান। তাঁরা আমার ক্ষেত্র গবেষণা রিপোর্ট তাদের 'গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায় প্রকাশ

করেন। আমি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও এ বিষয়ে আলোচনা করি। বর্তমানে ক্যারিটাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি বাউলদের জন্মনিরোধের কয়েকটি পদ্ধতির একটি। আমি এ বিষয়ে এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। চিকিৎসা সম্পর্কে বাউলদের নিজস্ব ধ্যানধারণা আছে। অসুখ-বিসুখে তাঁরা কোনো ডাক্তার কিংবা কবিরাজের কাছে যায় না। তাদের চিকিৎসা তাঁরা নিজেরাই করে থাকে। বাউল ব্যতিরেকে অন্যান্য সাধন-ভজন সম্প্রদায়ের মধ্যেও জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিজস্ব চিকিৎসাপদ্ধতি আছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত খানসাহেব আব্দুল ওয়ালী ফকিরদের চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন। আমি যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

১৯৫৫ সাল থেকে অদ্যাবধি আমি বিভিন্ন সাধন-ভজন সম্প্রদায়ের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করে আসছি। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান ও নদীয়া অঞ্চলের বাউলদের সাথেও আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। লালন একাডেমির পরিচালক থাকাকালে আমি বাউলদের জীবনাচরণ ও সাধনপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেছি। পরিচালক থাকায় বাউলেরা আমাকে তাদের নিজেদের লোক হিসেবে দেখেছে এবং আমার পক্ষে তাদের সাধনার গভীরে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাধারণ্যে এরা নাড়ার ফকির হিসেবে গণ্য হলেও বাউলেরা নিজেদেরকে ফকির এবং বাউল নামে চিহ্নিত করে। 'নাড়া' অর্থে এরা শাখাপত্রহীন এবং এদের কোনো সন্তানসন্ততি হয় না। তাদের অস্বাভাবিক জীবনাচরণের কারণে তারা সমাজ এবং গোত্রচ্যুত।

অতীতে বাউল ফকিরেরা নিজেদেরকে চিশতিয়া তরিকাপন্থী বলে পরিচয় দিত। পাঞ্জু শাহের অনুসারীরা এখনও নিজেদেরকে সুফি ফকির বলে। তবে লালন-পাঞ্জু অনুসারীদের সাধন-ভজন দেহকেন্দ্রিক এবং যৌনপ্রক্রিয়াজাত। লালন শাহের অনুসারীদের মধ্যে একটি শ্রেণী পাঞ্জুশাহী ফকিরদের মতো নিজেদেরকে সুফি ফকির বলে থাকে। কিন্তু এর একটি বিরাট অংশ নিজেদেরকে হিন্দু বা মুসলমান বলে পরিচয় দেয় না। তারা লালন শাহকে তাদের নবী বলে জানে এবং তাদের ধর্মকে 'মানবধর্ম' বলে আখ্যায়িত করে। বর্তমানে এই মতানুসারীদের প্রাবল্য রয়েছে। তবে এরা সুফিদের মতো 'লেবাছ' (পরিচ্ছদ) পরিধান করে এবং পিতৃপ্রদত্ত মুসলমান বা হিন্দু নাম ব্যবহার করে। এদের মধ্যে সংসারত্যাগী এবং গৃহী ফকির রয়েছে। যারা গৃহী তাদের সন্তানসন্ততি আছে।

অতীতকালে বাউলদের সংখ্যা কম ছিল। কারণ এ মতবাদে আসতে হলে তাকে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হতো এবং সে দীক্ষা ছিল খুব কঠিন। দোলপূর্ণিমা এবং লালনের মৃত্যুদিন পহেলা কার্তিকের অনুষ্ঠানে ফকিরেরা এসেছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। এদের জন্য কোনো প্রচারব্যবস্থা লাগেনি।

লালন শাহ ছিলেন বাউলদের গুরু। তিনি বাউলদের জীবন-মরণের সহায়। বাউলেরা নিরাকার স্রষ্টার কথা জানে। তাঁকে মেনেও থাকে, কিন্তু ভজনা? সে তো অন্য কথা।

যারে দেখি না নয়নে
তারে ভজিব কেমনে?

লালন শাহকে বাউলেরা পীর দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। তাই তাঁর 'ওরসে' 'সাধুসেবা'য় তাদের আগমন এবং ভক্তি অর্পণ বাউলদের ধর্মের অঙ্গ এবং গুরু যে-উৎসব অর্থাৎ দোলপূর্ণিমা অনুষ্ঠান পালন করেছেন সে-সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। বাউলদের সাথে আমার দীর্ঘ মেলামেশার কালে এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি।

বলেছি, বাউলেরা বস্তুনিষ্ঠ। গুরুকে তারা বস্তুরূপে পূজা করে। লালনের আখড়ায় যেভাবে বাউলেরা তাদের ভক্তি-অর্ঘ্য বা পূজা দিয়েছে তা নিম্নরূপ :

আখড়ার ভেতর ঢুকবার দ্বারে প্রথমে দাঁড়িয়ে এবং পরে খাদেম বা গুরুর সম্মুখে বসে দুই হাতের আঙ্গুলকে ত্রিকোণ আকৃতি, যা স্ত্রীজননাঙ্গসদৃশ এমন অবস্থায় খাদেম বা গুরুর চোখে চোখ রেখে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পন্থায় প্রণাম বা ভক্তি জানায়। তারপর জুতা-খড়ম থাকলে তা খুলে খালি পায়ে আখড়ায় প্রবেশ করে এবং কবরে সেজদায় উপনীত হয়। অতঃপর সঙ্গে আনা খাদ্যদ্রব্য, চাল ডাল টাকা পয়সা ইত্যাদি মাজারের খাদেমের হাতে দেয় অথবা সিন্দুক থাকলে তাতে অর্থ প্রদান করেন। এরপর খাদেম একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাকে ও তার সঙ্গিনীর বসার ব্যবস্থা করে। একে বাউলেরা 'আসন' বলে। এই 'আসন' তাঁরা কোনো অবস্থাতে পরিবর্তন করে না।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক বাউলকে মাজারে 'নজরানা' দিতে হয়। এটা তাদের ধর্মের অঙ্গ। প্রতি বাউল-গুরুই শিষ্য এবং অনুসারীদের কাছ থেকে 'নজরানা' পেয়ে থাকে। আমার জানামতে বেশ কয়েকজন বাউল-গুরু এবং তাদের স্ত্রীকে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হতে দেখেছি। এর ফলে বাউল-গুরুদের তেমন কোনো আর্থিক অসচ্ছলতা থাকে না।

বাউল সাধনায় গুরুর স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। এই গুরুর প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন—দীক্ষাগুরু। এই গুরু সুফিবাদের পীর, মুরশিদ, শায়েকের সমপর্যায়ে। গুরুশ্রেষ্ঠকে সাঁই হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যিনি দীক্ষা দেন, তিনি সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা দেন না। বলেছি, গুরুর শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। দীক্ষাগুরুর নিচে যে-গুরুর স্থান, তাঁকে শিক্ষাগুরু বলা হয়ে থাকে। সাধনসঙ্গিনীকেও 'গুরু' নামে অভিহিত করা হয়। মূলত সাধনসঙ্গিনীর সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। তাই তাকে 'চেতনগুরু' বলা হয়। বাউলেরা বিশ্বাস করেন, গুরুর কোনো মৃত্যু

নেই। তিনি কেবল দেহরক্ষা করতে পারেন। তিনি চিরঞ্জীব। তাই তারা যে 'ওরস' বা সাধুসেবা উদ্‌যাপন করে তার অর্থ এই যে, গুরু তাঁর মনের মানুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে যান। বাউলেরা গুরুসর্বস্ব। কিন্তু এই গুরুর প্রকারভেদ বাউলদের যেমন রয়েছে তেমন অন্য কারো মধ্যে দেখা যায় না।

দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, ইহার পরে আছে গুরু
সেই গুরু কল্পতরু, রাগেরি আশ্রয় ॥

(চণ্ডীদাস গোঁসাই)

তুলনীয় :

কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কারো ভাই ॥

(লালন)

বাউলেরা আল্লাহ এবং ভগবানকে মানে। তাকেই সকল গুরুর গুরু হিসেবে তারা কল্পনা করে থাকে। সন্তানসৃষ্টি বীজকে তারা গুরুবস্তু বলে।

বাউলেরা মন্দিরে কিংবা মসজিদে যায় না। জুমার নামাজ, ঈদ এবং রোজা তারা পালন করে না। তারা তাদের স্ত্রীকে জায়নামাজ নামে অভিহিত করে এবং দুটি বিশেষ সময়ে তাদের 'নামাজ' পড়ার রীতি আছে। প্রাতে স্নান সেরে চাল পানি করা তাদের ধর্মরীতি। বাউলেরা মৃতদেহকে পোড়ায় না। কাফন পরিয়ে সরাসরি কবর দিয়ে থাকে। এদের জানাজা হয় না। হিন্দু মুসলমান নামের সব বাউলদের মধ্যেও এই একই রীতি। ছেঁউড়িয়া আখড়াতে এমন হতে দেখেছি।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার লালন একাডেমি ও মাজারকে কেন্দ্র করে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে একাডেমিতে ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কালচারাল কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। এখানে একটি অডিটোরিয়াম তৈরি করা হয়েছে। লাইব্রেরি কক্ষ এবং নিচের তলায় ফকিরদের থাকারও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে বিদেশী গবেষক ও পর্যটক আসছেন। ফলে লালন একাডেমির ক্ষমতালাভের ক্ষেত্রে বাউল, স্থানীয় বাউল, জনগণ ও গ্রামের সমাজপতিদের মধ্যে সম্প্রতি কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছে। লালন অনুসারীদের একটি অংশ লালন একাডেমি এবং মাজার পরিচালনার কর্তৃত্বলাভের জন্য আন্দোলন শুরু করেছে। এরা লালন ফকিরকে 'নবী' হিসেবে দাবি করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুষ্টিয়া কোর্টে মামলা করেছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ পেশ করা লালনভক্তদের মুখপাত্র হয়ে জনৈক মন্টু শাহ যা বলেন, তা নিম্নরূপ :

> আমরা বাউল। আমাদের ধর্ম আলাদা। আমরা না-মুসলমান না-হিন্দু। আমাদের নবী সাঁইজি লালন শাহ। তাঁর গান আমাদের ধর্মীয় শ্লোক। সাইজির মাজার আমাদের তীর্থভূমি। আমরা যারা তাঁর ভক্ত আমরা সকলেই এক বিশেষ নিয়মে ভেক গ্রহণ করি। আমাদের সৃষ্টি নেই মানে বিবাহ নেই—সন্তান জন্ম নেই। আমাদের গুরুই রাসুল।...আমরা আলাদা একটি জাতি, আমাদের কলেমাও আলাদা—লা ইলাহাঁ ইল্লাল্লাহু লালন রাসুলাল্লাহ।
>
> *[দ্র. সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, ২য় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ৪-৯৫]*

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, লালন ফকির এমন দাবি কখনও করেছেন কিনা তা জানা যায় না। তবে তাঁর গানে আল্লাহ এবং নবীপ্রশস্তি আছে। তিনি ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (দ.)-কেই নিজের নবী বলে জানতেন। তাঁর মতাদর্শে সর্বধর্মের সমন্বয় রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেকে কখনও ধর্মপ্রবর্তক বলে উপস্থাপিত করেননি। মন্টু শাহের এই দাবি ক্ষমতানির্দেশক। কিছুসংখ্যক বাউলদেরকে সংগঠিত করে তিনি তাঁর অবস্থানকে সমাজে দৃঢ় করতে চেয়েছেন। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে মন্টু শাহের দাবি প্রেক্ষিতে বলেন :

> ফকির মন্টু শা'র বক্তব্য যদি সাম্প্রতিক লালনপন্থীদের বক্তব্য বলে মনে করি, তবে বুঝতে হবে লালন ফকিরের প্রয়াণের শতবর্ষের মধ্যে তাঁকে ছেঁউড়িয়ার ভক্তমণ্ডলী 'রাসুল' (অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ, ধর্মবিধির প্রবর্তক, রসুল, নবী) পদে উন্নীত করেছেন। লক্ষণীয় যে, লালনের জীবদ্দশায় তাঁর ভক্তমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এতবড় দাবি ওঠেনি এবং তিনি নিজেও এমন সম্ভ্রান্ত পদের দাবিদার ছিলেন না। তিনি বরং বলেছিলেন যিনি আল্লাহ তিনিই রাসুল, তিনিই নবী। এমন উচ্চারণও ইসলামী 'আকিদা' বা বিশ্বাসে ঘোরতরভাবে আপত্তিকর। তাঁদের বিশ্বাস আল্লাহ এক বা লা-শরিক। যারা আল্লাহকে স্বীকার করেন আবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর গুণে অন্যকে শরিক বা অংশী মনে করেন তাঁরা বহুত্ববাদী। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তাই লালনতত্ত্ব বস্তুত মুশরিক।
>
> *[দ্র. সুধীর চক্রবর্তী ব্রাত্য লোকায়ত লালন, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ. ৪-৯৫]*

সুধীর চক্রবর্তীর বক্তব্য যথার্থ। লালন ফকির এবং বাউলদের গানে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা কাফের, মুরতাদের সমগোত্রীয়। আমার এই গবেষণায় আমি বাউল এবং লালনের গানের নানা উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজেও লালন বা বাউলপন্থী নই। কোনো গবেষক সাধারণত তা হন না। তবে তার গবেষণার স্বার্থে অনেক সময় তাদের নানা কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে হয় কিন্তু তা কোনোভাবেই নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নয়।

বাউল সুফিবাদের উৎস বা'আল নামের একজন প্রজনন দেবতা (fertility god) যা পরবর্তীতে বাতেনী সুফিসাধনায় দেহবাদে রূপান্তরিত। ভারতীয় উপমহাদেশে দেহবাদী সাধনা অত্যন্ত প্রাচীন। তন্ত্র সাধনায় দেহবাদের উন্মেষ রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধারায় দেহতত্ত্বের রূপায়ণ। সহজিয়া বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ

সহজিয়া মতবাদে এর বিকাশ। চৈতন্য দেবের সময় পরকীয়া প্রেমও বিন্দু সাধনায় (বীর্য নিয়ন্ত্রণ) বৈষ্ণব ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশজ বাউল সাধনায় তার ব্যাপ্তি ঘটে। এখানে তাই অলক্ষ্যে এই ধর্মমতের প্রসার ঘটেছিল। এই মতের অনুসারীরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার প্রচারণা নিয়ন্ত্রিত রেখেছে কেবল দীক্ষিতজনদের কাছেই। গানগুলির দ্ব্যর্থবোধকতা তা প্রমাণ করে। এই গ্রন্থে বাউল ধর্মমতের উৎস বা উদ্ভবকালের ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়েছে। কতটুকু সফল হয়েছি তা আমি জানি না। তবে গবেষণার একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে এমন বলা যেতে পারে।

আমাদের দেশে যথার্থ ইসলামী শিক্ষা না-থাকায় সাধারণ মানুষ এইসব মতবাদ 'ইসলামী' মনে করে দীক্ষিত হয়ে পড়েছে। মুসলমান সমাজ কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ পালন না করে নিজেদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদের মতো বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। এ সবই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞানতার ফল।

সুফিবাদ আমাদের দেশেই কেবল নয়, পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্তমূলক ধারণা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে বাতেনী সুফিবাদ কুরআন ও হাদিসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুসলমান সমাজ অজ্ঞানতার কারণে বাতেনী পীর-মুরশিদদেরকে জীবন-মরণের নিয়ামকরূপে গণ্য করেছে। এই বাউল সুফিসাধকেরা নিরাকার আল্লাহকে সাকারত্ব প্রদান করে তাদের অনুসারীদেরকে পৌত্তলিকতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এরা সাধারণ মানুষের সারল্য, অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতার কারণে তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে। দেহবাদের আড়ালে সমাজে যৌনাচারমূলক কর্মকাণ্ডকে একশ্রেণীর মানুষ ধর্মীয় চেতনা হিসেবে লালন করে আসছে। এরা সমাজে বিবাহবন্ধনকেও অস্বীকার করে নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেশা, বসবাসকে (Living together) দর্শন হিসেবে অনুসরণ করে আসছে।

তবে বাউলদের গান নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসছে এবং এসব গানের ভাব, ভাষা ইত্যাদি সাহিত্য ও শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে লালনের গান অদ্যাবধি অপূর্ব শিল্পকর্ম এবং সাহিত্যরসে পুষ্ট হওয়ায় লালন ফকিরের মৃত্যুর একশো বারো বছর পরেও সমাজে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। সাহিত্য ও গবেষণার নিরিখে আমি তা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষ আনন্দের জন্য তা পাঠ করে। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো কবিদের প্রতি মমত্ব প্রদর্শন করেও সমাজের মঙ্গলচিন্তায় তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন। অ্যারিস্টোটল তাঁর বিরোধিতা করে কবিদের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করলেও তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি সফোক্লেস রচিত 'ইডিপাস'-এর নায়ক ইডিপাস ধর্মীয় কারণে বহিষ্কৃত হয়েছেন দেশের পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য। পৃথিবীর তাবৎ মহৎ সাহিত্যে জীবনের পাশাপাশি ধর্মকে অস্বীকার করা হয়নি।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, পারস্যে যে সুফিসাধনা শিয়া ধর্মাবলম্বী ইমাম জাফর আস্ সাদেক কর্তৃক প্রবর্তিত হয়, তার পাশাপাশি ইমাম জাফর আস্ সাদেকের জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী ইমাম ইসমাইল বাতেনী সুফি শাখা প্রবর্তন করেন। বাতেনী সুফি শাখায় অবতারবাদ প্রাধান্য লাভ করে। এই শাখার অনুসারীরা হজরত মুহাম্মদ (দ.)-কে শেষ নবীর পরিবর্তে অন্যতম নবী বলে গ্রহণ করে। এরা মিথুনাত্মক গুপ্তসাধনপন্থী ছিল। আমাদের আলোচ্য বাউল সুফিসাধনা বাতেনী সুফিসাধনার অনুসারী ছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পারস্যে 'বাহাই' নামে একটি নতুন ধর্মমতও সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের নিজস্ব নবী ছিল।

আমার এই গবেষণাকর্মের জন্য আমি আমার অভিসন্দর্ভের নির্দেশক প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিমকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানাই। তিনি এ বিষয়ে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। বর্তমান গবেষণাকর্মটি আমার পিএইচ-ডি অভিসন্দর্ভ থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত রূপ। বলা যেতে পারে আমার পিএইচ-ডি ডিগ্রির জন্য প্রণীত অভিসন্দর্ভের সঙ্গে এর তেমন মিল নেই। সম্পূর্ণ নতুন তথ্য এবং তত্ত্বে সমৃদ্ধ এই গবেষণাকর্মটি। ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভের পর এই ২০০০ সাল অবধি যেসব নতুন তথ্য লাভ করেছি তা সন্নিবেশিত করেছি আমার এই অভিসন্দর্ভে।

আমার দীর্ঘকালের গবেষণায় আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান, উপমহাদেশের ফোকলোর চর্চার প্রাণপুরুষ প্রফেসর আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং তৎকালীন রবীন্দ্রঅধ্যাপক প্রফেসর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সস্নেহ আশীর্বাদ ও নির্দেশনা লাভ করি। উভয়ের সাথেই আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলাম। প্রফেসর আশুতোষ ভট্টাচার্য আজ প্রয়াত, তিনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেছেন। আমার সৌভাগ্য, প্রফেসর আশুতোষ ভট্টাচার্য ও প্রফেসর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কুষ্টিয়াতে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। অতিসম্প্রতি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে বাউল ধর্মমতের উদ্ভবকালের নতুন ইতিহাস সম্পর্কে আমার বক্তব্য প্রদানের অনুষ্ঠানে তিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়েও এসেছিলেন। এটা ছিল আমার জন্য বড় পাওয়া। তাঁর আশীর্বাদ আমার আজীবনের সম্পদ। এই অনুষ্ঠানে ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় আমাকে এই নতুন তথ্য প্রদানের কারণে অভিনন্দন জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর এবং বাংলা একাডেমির সভাপতি প্রফেসর আনিসুজ্জামান আমার বক্তৃতাদানের সময় এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতাতে সে-সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বন্ধু পূর্ণদাস বাউল এবং অন্যান্য গুণীজন আমার আলোচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমি সেজন্য আল্লাহপাককে শুকরিয়া জানাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগও এই

বিষয়ে আমাকে বক্তৃতাদানের সুযোগ দেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের নিকট আমার এই নতুন তথ্য পৌঁছাতে পেরে আমি তৃপ্ত।

বাউলসাধনায় যে ধর্মের প্রতিচ্ছবি আমরা লাভ করেছি তা আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। ফ্রেজার তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ *The Golden Bough*-এ আদিম ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

আমি 'বাউল' শব্দটিকে হেব্রু 'বা'আল', আরবি-ফারসি 'বা'আল', শব্দের সমার্থক বলে জেনেছি। তবে পারস্যে 'বা'আল' নামে যে সুফি সাধনভজন সম্প্রদায় ছিল তা আমার জানা ছিল না। ১৯৭২-৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুর্তাজা শরাফ ও তাঁর সহধর্মিণী প্রফেসর মাহদেখ শরাফ এই নতুন তথ্য সরবরাহ করেন। ড. শরাফ তাঁর শ্বশুর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষার অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মঈন প্রণীত ফারসি ভাষার অভিধানে বর্ণিত 'বা'আল' সুফিসাধকের পরিচয় তুলে ধরেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

১.৩

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে কাজ করার সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আলী আসানী আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। বস্তুত, তিনি আমাকে এই গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমি এ প্রসঙ্গে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিভিনিটি স্কুলের প্রয়াত প্রফেসর ড. জ্যাকোব, জে. পেটুশোভেস্কিকে। তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং তিনি আমার গবেষণাকর্মে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তিনি আমার গ্রন্থে *The Myths of Bangladesh*-এর একটি ভূমিকা প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি প্রয়াত। তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের প্রফেসর ডেটার ক্রিস্টেনসন-এর আমন্ত্রণক্রমে আমি লালন সম্পর্কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করি। ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সংস্থা ও ইরাক সরকারের আমন্ত্রণক্রমে আমি বাগদাদে বাউল বিষয়ে একটি বক্তৃতাদান করি। সে সময়ে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান ও সংগীত বিভাগের প্রফেসর বিশ্বনন্দিত গবেষক অ্যালান পি মেরিয়ামের সান্নিধ্য লাভ করি। আমার বক্তৃতা শুনবার পর তিনি এবং ডেটার ক্রিস্টেনসেন আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। মেরিয়াম পরবর্তীকালে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর সাথে দীর্ঘকাল আমার পত্র-যোগাযোগ ছিল।

আমার এই গবেষণাকর্মে আমি পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. ক্ষেত্রগুপ্ত, ড. সনৎ কুমার মিত্র, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর পবিত্র সরকার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, একাডেমি অব ফোকলোর প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. দুলাল চৌধুরী, ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নিকট থেকে নানা উৎসাহ লাভ করেছি। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। আমি সেখানে দুবার দুটি বক্তৃতা প্রদান করেছি। তাদের উৎসাহ আমাকে এই দুঃসাধ্য সাধনে সাহায্য করেছে। ড. সনৎ কুমার মিত্র ও ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত লালন ফকিরের স্কেচ ও তথ্য সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও বিশ্বভারতী লাইব্রেরির কর্মকর্তাগণের কাছে লাইব্রেরি ব্যবহার এবং অন্যান্য কাজে সহায়তাদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী প্রয়াত প্রফেসর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেছেন। আমার 'ফকির লালন শাহ' গ্রন্থের একটি ভূমিকাও তিনি লিখে দেন। এছাড়া সুফিসাধনা সম্পর্কে তাঁর লেখা একটি দুষ্প্রাপ্য অফপ্রিন্ট আমাকে তিনি উপহার দেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিগত পাঠাগারটি তিনি আমার ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন।

আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই উপমহাদেশখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে। আমার গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারটি আমার ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।

কবি জসীমউদ্‌দীন আমার গবেষণায় অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি প্রায়ই তাঁর ঢাকার বাড়িতে গিয়েছি। মৃত্যুর পূর্বে পিজি হাসপাতালে দেখা হলে তিনি আমার গবেষণাকর্মের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং দোয়া করেছেন।

বলতে কি, দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ আমি অনেকের উৎসাহ এবং স্নেহধন্য হয়েছি—তাঁরা হলেন : কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, আমার শিক্ষক জনাব এম. ইউ, ভুঁইয়া, উপাধ্যক্ষ শ্রী অম্বিকাদাস চক্রবর্তী, কুষ্টিয়া কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান এবং পরে অধ্যক্ষ, জনাব চৌধুরী গোলাম জাকারিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান আমার শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর আবদুল হাই, ড. আহমদ শরীফ, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, প্রফেসর কবীর চৌধুরী, প্রফেসর আলাউদ্দিন আল আজাদ, প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রফেসর সিরাজুল

ইসলাম চৌধুরী; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান (পরে উপাচার্য) প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, প্রফেসর আশরাফ সিদ্দিকী; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এনামুল হক, অধ্যক্ষ আজহার হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি আবদুল কাদির, কবি মাহফুজউল্লাহ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক জনাব ওবায়েদউল হক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম ও প্রফেসর ইনামুল হক, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রফেসর আলী আনোয়ার, ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, প্রফেসর গোলাম সাকলায়েন, প্রফেসর আবদুল আওয়াল, বিশিষ্ট ছোটগল্প লেখক হাসান আজিজুল হক, নাজমুল আলম এবং নাট্যকার আব্দুল লতিফ প্রমুখ।

প্রসংগত, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও পটুয়া কামরুল হাসানের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। ১৯৭৪ সালে শিল্পাচার্য কুষ্টিয়াতে আমার বাসায় এসেছিলেন এবং আমার গবেষণাকর্ম দেখে আমাকে আশীর্বাদ করেন। সে সময় তিনি ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণক্রমে কুষ্টিয়ার শিল্পী সহিদ হোসেনের একটি প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য এসেছিলেন। কামরুল হাসানও আমার গবেষণাকর্মে উৎসাহ দিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের কচি-কাঁচা আসরের দাদাভাই রোকনুজ্জামান ছিলেন আমার পরম শুভার্থী। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার গবেষণা সম্বন্ধে তিনি জানতে চাইতেন। তিনি কচি-কাঁচার আসরে ছোটদের লালন ফকিরকে নিয়ে লিখবার জন্য আমাকে তাগিদ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াত আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই ও মাগফিরাত কামনা করি।

চিত্রালীর সম্পাদক মরহুম পারভেজ ভাই আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং আমার বহু লেখা তিনি চিত্রালীতে ছেপেছেন। আমার আহ্বানে তিনি ফোকলোর কনফারেন্সে এসেছিলেন।

বাংলাদেশের কবিদের পুরোধা শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, নূরুল হুদা, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, সানাউল হক খান, এখলাসউদ্দিন প্রমুখ নানাভাবে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রফেসর মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন ছিলেন আমার গবেষণার প্রেরণার উৎস। তিনিও আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেছেন। আমাদের কুষ্টিয়ার বাসভবনে তিনি প্রায়ই এসে থেকেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারটি তিনি আমাকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে আমি আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সংস্থার সদস্য হই এবং পরে আট বছর যাবৎ বাংলাদেশের লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করি।

বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিবদের মধ্যে জনাব শাহ আব্দুল হান্নান, জনাব ইরশাদুল হক, জনাব ম. ম. রেজা এবং আমার সহপাঠী প্রাক্তন সমাজকল্যাণ সচিব ড. ক্ষণদামোহন দাস প্রমুখ আমাকে উৎসাহ প্রেরণা দিয়েছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বন্ধুজনদের মধ্যে সিদ্দিকুর রহমান, জেড. এ. তোফায়েল, কাজী খায়রুল বাশার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. বি. এস-এর ডিরেক্টর এবং বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. আব্দুল খালেক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ নানাভাবে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন বিশিষ্ট গবেষক ড. আবুল আহসান চৌধুরী, অনুজপ্রতিম ম. মনিরুজ্জামান নানা আলাপ-আলোচনা ও লেখালেখির মাধ্যমে আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন। এছাড়া প্রফেসর আবু তালিব, প্রফেসর শরীফ হোসেন, জাতীয় সাংসদ প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জনাব শামসুজ্জামান খান, ড. এম.এম. লুৎফর রহমান, ড. খন্দকার রিয়াজুল হক, ড. মোমেন চৌধুরী প্রমুখ আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব আজাদ রহমান এই গবেষণাকর্মে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন।

বিদেশীদের মধ্যে জার্মানির কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জোসেফ কুকার্জ এবং *দ্য মিউজিক অব দ্য বাউলস্ অব বেঙ্গল*-এর লেখক ড. চার্লস ক্যাপওয়েল-এর সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে বাউল বিষয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। প্রফেসর কুকার্জ বাউলগান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সংস্থার 'ইয়ার বুক'-এর প্রবন্ধে লিখেছিলেন। এরা উভয়েই পশ্চিম বাংলার বাউলদের নিয়ে গবেষণা করেছেন।

আমার স্ত্রী কুষ্টিয়া কলেজের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, অধ্যাপিকা সৈয়দা আমেনা করীম, আমাকে সংসারের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে গবেষণাকর্মে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে দিয়ে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন। বস্তুত, নানা আলোচনায় তিনি এবং আমার কন্যা সুলতানা আফরোজ লুলু আমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। সুলতানা আফরোজ-এর 'বাংলাদেশে জাতিভেদ প্রথা ও বাউল সমাজ' গ্রন্থটি থেকেও আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

আমার প্রয়াত পিতা জনাব করীম বখ্শ এবং আমার মা বেগম রহিমা খাতুন ছিলেন আমার গবেষণাকর্মের প্রধান উৎসাহপ্রদানকারী। তাঁরাও সংসারের সকল দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। আমার শিক্ষা ও জ্ঞানের উৎস ছিলেন তাঁরা উভয়েই। আমার পুত্রবধূ সুলতানা করীম মাঝেমধ্যে প্রুফ দেখার কাজে বিভিন্ন সময়ে সহায়তা করেছেন। তাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার গবেষণাকাজে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ আমি ছাত্র থাকাকালে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন লালন ফকিরের অনুসারী ছেঁউড়িয়া নিবাসী ইসমাইল ফকির, কোকিল শাহ, মোসলেম ফকির, গোলাম ইয়ামিন শাহ, মেহেরপুরের নিহাজউদ্দিন, ঝড়ু শাহ্, মাগুরার মনোরঞ্জন বিশ্বাস, মহেন্দ্র গোঁসাই, যশোরের কানাই ক্ষ্যাপা, ফরিদপুরের মহিম শাহ, কুষ্টিয়ার আব্দুল করিম শাহ, আব্দুল গণি শাহ (বাদের), স্বরূপ শাহ, বিল্লাল শাহ এবং লালন মাজারের খাদেম নিজামউদ্দিন শাহ ও কোমেলা, ছেঁউড়িয়া মাজারের হান্নান, বাসেত, কবিরাজ প্রমুখ। জনৈক আমিনউদ্দিন শাহ আমার লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সমালোচনার মাধ্যমে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁকে আমি কোনোদিন জানতে পারিনি। তাঁর সুন্দর সমালোচনা এবং উৎসাহ এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করেছে।

পশ্চিম বাংলার আন্তর্জাতিক সংগীতশিল্পী পূর্ণদাস বাউল ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জুদাস, অমর পাল এবং গৌরী ভট্টাচার্য আমার গবেষণাকর্মে উৎসাহ দিয়েছেন—তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার এই গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ রয়েছে। বক্তব্যকে জোরালো এবং অধ্যায়ে বর্ণিল বিষয়কে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তা করতে হয়েছে। 'সা' পদবি বাউলেরা নিজেরা ব্যবহার করেছে। 'শাহ' এবং 'সাঁই' শব্দটিও তাদের ব্যবহৃত।

পরিশেষে দীর্ঘ ৪৫ বছর পর বাউল বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করার তওফিক দান করার জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জানাই।

আনোয়ারুল করীম
প্রফেসর (ইংরেজী) বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।



প্রস্তাবনা ও পটভূমি

প্রস্তাবনা ও পটভূমি

১.১

বাংলাদেশের বাউলসমাজ একটি সংগীতাশ্রয়ী সাধনভজন সম্প্রদায়। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো বাউলসাধনা নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এই সাধনাকে জীবন ও জগতে তাদের মুক্তির একমাত্র উপায়স্থল বলে ভেবেছে। প্রচলিত ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে পরিহার করে একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শের মাধ্যমে পরম সত্যকে খুঁজে পাওয়াই তাদের লক্ষ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের সাধকদের সাক্ষাৎ মেলে। এদের সাধনায় নানা ধর্ম ও চেতনার সম্মিলন ঘটেছে। এরা কোনো জাতিভেদ মানে না। মানুষ ভজনা তাদের উপাসনা বিধায় সকল জাতের বা বর্ণের মানুষকে তাঁরা তাদের সাধনধর্মে স্থান দিয়ে থাকে। এরা অসাম্প্রদায়িক এবং মানবতাবাদী। এদের সাধনা দেহভিত্তিক, তাই গুপ্ত। এরা পরিব্রাজক। গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে ভিক্ষা করাই একসময়ে এদের পেশা ছিল। কালের বিবর্তনে এদের সাধনায় যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি তাদের পেশায়ও। অবশ্য এদের মধ্যে যারা সংসার-ত্যাগী তারা আজও এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ভ্রমণ করে ফেরে। আখড়ায় আখড়ায় ঘোরা তাদের জীবন। এদের সাধনা যুগল-সাধনা বলে তাদের সঙ্গী নারী। অতীতে এদের মধ্যে বিবাহের কোনো প্রথা ছিল না। কণ্ঠি বা মালা বদল করলেই সব হতো। এখনও বিয়েশাদির তেমন প্রয়োজন হয় না বাউলসাধকদের। যার সঙ্গে প্রয়োজন, চলে গেলেই হলো। কেউ তেমন আপত্তিও করে না। অবশ্য এই পদ্ধতি কেবল যারা পরিব্রাজক অর্থাৎ যারা আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়ায় কিংবা এখানে-ওখানে গান গেয়ে ফেরে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা গ্রামাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তারা স্ত্রী-পুত্র নিয়েই বসবাস করে।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে বাংলাদেশ যেমন মিশ্রজাতির সংগমস্থল অর্থাৎ এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং অন্যান্য জাতির যেমন আবাসভূমি,

বাউলসাধনায় তেমনি বিভিন্ন ধর্মের এবং বর্ণের মানুষেরা স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা খুব প্রবল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরাণ-পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে-বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করচে, এই বাউলগানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।[১]

এই বাউলধর্ম এবং বাউলগান, বলতে কি, আমাদের সংস্কৃতির অংশই শুধু নয়, বরং বলা চলে আমাদের সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে নীরবে কাজ করে চলেছে।

বাউলগানের ভেতর বাঙালি সংস্কৃতির নানা উপাদান সন্নিবেশিত আছে। এ যথার্থ আলোচনা প্রয়োজন। আমার পূর্বে বাউলসাধনা সম্পর্কে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় মূল্যবান কাজ হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বাউলসাধনা সম্পর্কে তাদের মূল্যবান গবেষণা আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে। তবে তাদের সব তথ্যই গ্রহণ করা যায় না। তাঁরা নিজেরাও একে অন্যের তথ্যকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। আমার মতে তাদের মূল্যবান তথ্য বাউলসাধনা সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় বলা চলে বাউলদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর নিজের তাগিদও ছিল। অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীনকে এ দেশের বাউলসহ অন্যান্য লোকসংগীত সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেছেন। ক্ষিতিমোহন সেন এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীনের প্রদর্শিত পথে বিজ্ঞানধর্মী আলোচনা করেছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এসব পথিকৃৎদের আলোচনা পাঠে আমার মনের মধ্যে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তা নিয়েই আমার এ গবেষণা। বাউলসাধনার উদ্ভবকালের ইতিহাস নিয়ে আমাদের মধ্যে যেমন প্রশ্ন জেগেছে, তেমনি এই শব্দের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, কোন ধর্মসাধনার উপর ভিত্তি করে এই সাধনার অবস্থান, এমন অনেক প্রশ্নের যথাযথ সমাধান এখনও হয়নি।

বাউলসাধনাকে অধ্যাত্মসাধনা বলতে কারও আপত্তি হয়নি ঠিকই, কিন্তু একে কেবল বস্তুবাদী সাধনা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতাও আমরা লক্ষ করি।

সমস্যা যে শুধু পণ্ডিতেরাই সৃষ্টি করেছেন তা নয়, বাউলসাধনার অনুসারীরাও নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এরা শাস্ত্রাচারকে উপেক্ষা করেছে, জাতিভেদ মানেনি, কোনো আচার-অনুষ্ঠানকে স্বীকার করেনি ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষেত্রগবেষণায় লক্ষ করা যায় বাউলেরা নিজেরাই শাস্ত্র গড়েছে, শ্রেণীভেদ করেছে এবং নানা আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেছে। ফলে তাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট সাধন মার্গের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয়। আমার ক্ষেত্রগবেষণায় আমি লক্ষ করেছি, এরা গুরু'র নামে 'ঘর' বা 'ঘরানা'[২] সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সাধনায় নিজস্ব 'ঘরনা'কে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রত্যেক 'ঘর' বা 'ঘরানা'র অনুসারীরা তাদের মৃত সাধুগুরুর নামে 'ওরশ'[৩] বা সাধুসেবা করে থাকে।'

যাহোক, দীর্ঘকাল বাউলদের জীবনাচরণ ও সাধনপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করে আমার এমন ধারণা জন্মেছে যে বাউলসাধনা নিছক একটি দেহবাদী সাধনা নয়, এই সাধনা বস্তুত একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা। এই সাধনায় কোনো একটি নির্দিষ্ট সাধনমার্গের পরিচয় খুঁজতে যাওয়া বৃথা। বলা যেতে পারে এ সাধনা নানা লোকধর্মের প্রভাবপুষ্ট একটি সমন্বিত (Syncretistic) সাধনমার্গ–সমাজের পিছিয়ে পড়া নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত একটি মৈথুনভিত্তিক লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা। 'যারে দেখি না নয়নে, তারে ভজিব কেমনে' এই বস্তুবাদী ভাবনার সঙ্গে বস্তুর ঊর্ধ্বের ধ্যানধারণার একটি মিলন সাধিত হয়েছে। দেহ এবং আত্মা দুইই সাধনার বিষয়। বাউল বিশ্বাস করে যে একটিকে অস্বীকার করে অপরটি সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। এই সাধনা তাই বস্তুজীবনকে যেমন অস্বীকার করেনি তেমনি অস্বীকার করেনি অধ্যাত্মচেতনাকে। মানুষের দেহে যে আত্মার অবস্থিতি, তার স্বরূপকে জানার মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজের মাধ্যমে পরমার্থকে জানা এই অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য। 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রববাহু'[৪] অর্থাৎ নিজেকে জানতে পারলেই আত্মার পরিচয় জানা সম্ভব। এই আত্মা বা বাউলের 'অচিন পাখি' বা 'অধর মানুষ'কে জানার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বস্তুগত জীবন। অর্থাৎ দেহবাদ এই সাধনার মাধ্যম। কিন্তু দেহই এই সাধনার শেষ নয়। নর-নারীর জীবনে যৌনজীবন অপরিহার্য। যৌনভিত্তিক ইন্দ্রিয়নির্ভর সাধারণ অভিজ্ঞতা স্থূল পর্যায়ের। অপরদিকে মরমীয় অভিজ্ঞতা অধ্যাত্মচেতনা নির্দেশক এবং তা সূক্ষ্ম ও গভীর।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাধারণ অভিজ্ঞতা অনেকাংশে খণ্ডিত, কিন্তু মরমীয় অভিজ্ঞতা সামগ্রিক। মরমীয় অভিজ্ঞতায় তার সমগ্র রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। তখন সবকিছু একাকার হয়ে যায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা অপ্রত্যক্ষ নয় বা একে 'অবিমিশ্র

মানসিক কুহেলিকাময় মগ্ন অবস্থা' বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ মরমীয় উপলব্ধি মূলত এমন একটি অনুভূতির ব্যাপার যা কোনো অবস্থায় অন্যকে বোঝানো সম্ভব নয়। তবে এই অনুভূতি জ্ঞানাত্মক। এই সাধনার পথ সহজ নয়। সাধারণ মানুষ এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না যতক্ষণ না গুরু তাকে এই প্রক্রিয়ার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করে দেন। বাউলসাধনা সম্পূর্ণরূপেই গুরুবাদী সাধনা। গুরু সমগ্রজীবনের নিয়ন্ত্রক।

আমাদের আলোচ্য বাউলসাধনা আমাদেরকে এমন একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন সাধারণ তেমনি অসাধারণও বটে। একদিকে এই সাধনা ইন্দ্রিয় আচারভিত্তিক যৌননির্ভর, অন্যদিকে মরমী বা সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিক। কিন্তু এই অধ্যাত্মসাধনার স্বরূপ কী? ধর্মীয় জীবন তো মূলত আধ্যাত্মিক চেতনা নির্দেশক। তা হলে বাউল সাধনার সঙ্গে পার্থক্য রইল কোথায়? পার্থক্য আছে, বাউলসাধক বেহেস্তের প্রতি আগ্রহী অথবা দোজখের ভয়ে ভীত নন, সে সম্পর্কে তাঁরা চিন্তাও করেন না। তাঁরা প্রেমিক। সুফিদের সাথে তাদের সম্পর্ক আছে কিন্তু অনেক সুফির মতো তাঁরা জীবনবিমুখ নন। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সাথে তাদের সাদৃশ্য আছে কিন্তু তাঁরা শুধু ভোগবাদী নন। দেহই তাদের একমাত্র সারবস্তু নয় এবং দেহকে তাঁরা আত্মা বলে জ্ঞান করেন না। মৃত্যুকে তাঁরা অস্বীকার করেন না বরং মৃত্যুকে তাঁরা জয় করতে চান। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাথে তাদের মিল আছে, কিন্তু তাঁরা শুধু ভক্তিবাদী নন—তাঁরা জ্ঞানেও বিশ্বাসী। কামাচার তাদের সাধনার অঙ্গ হলেও তাঁরা শুধু কামুক বা কামাচারী নন, কামকে জয় করে কামাতীত জীবনে পৌঁছানোকে তাঁরা মোক্ষ মনে করেন। কিন্তু বাউল জীবনসর্বস্ব নয়। বাউল মতাদর্শের বড় কথা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতার সন্ধান। তবে এই স্বাধীন সত্তা যাকে বাউলেরা 'অচিন মানুষ', 'অধর মানুষ' 'মনের মানুষ' রূপে কল্পনা করেছে, যিনি তাদের পরমার্থ, তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সে ধারণা করতে চেয়েছে তাঁর আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত এক নতুন জগতের আবিষ্কারের মাধ্যমে। এই চেতনা বস্তুজগতের বিরোধী নয় বরং বলা যেতে পারে বস্তুজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর অনুপ্রবেশ। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতিষ্ঠাই বাউলদের কাম্য। তাই ভাববাদের সঙ্গে বস্তুজীবনের সংযোগ সাধন করেই সে গড়ে তোলে তার আধ্যাত্মিক চিন্তা।

বাউলেরা হৃদয়বৃত্তির গুরুত্ব অনুভব করেছে। বাউলের এই হৃদয় বা মন হচ্ছে একপ্রকার জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি। এই অন্তর্দৃষ্টি হৃদয়ানুভূতিজাত আধ্যাত্মিক সত্তার যেসব বৈশিষ্ট্য আমাদের ইন্দ্রয়ানুভূতিতে ধরা পড়ে না তার সংস্পর্শে আমাদেরকে নিয়ে আসে এবং এই অন্তর্দৃষ্টিই আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'The blessed

mood'।[৫] এই অন্তর্দৃষ্টি বা হৃদয়বৃত্তি আমাদের সামনে যে অভিজ্ঞতার রাজ্য উদ্ঘাটিত করে তা যে কোনো অভিজ্ঞতার মতো সত্য এবং বাস্তব। একে এক অর্থে আত্মিক বা মরমী বলেও উল্লেখ করা চলে।

বাউলসাধনা নিম্নশ্রেণীর পিছিয়ে পড়া অমার্জিত নিরক্ষর মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাই একে লৌকিক বলা চলে। কিন্তু এ সাধনা কেবল লৌকিক সাধনা নয়। বাউলেরা অনুমানে বিশ্বাস করে না। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষকে পাওয়াই তাদের সাধনা। লোককে কেন্দ্র করে লোকাতীত জীবনে পৌঁছানোই তাদের উদ্দেশ্য। বস্তুজীবন বা matetrialism এদের একমাত্র আদর্শ নয়। এদের অধ্যাত্মচিন্তা মরমীপন্থী এবং লোকায়ত নির্ভর। একে তাই বলা চলে লৌকিক অধ্যাত্মবাদ। ইংরেজিতে যাকে বলা চলে মেটাফিজিক্যাল।[৬]

সাধারণ মানুষের কাছে যৌনজীবনের আবেদন অন্যদের থেকে একটু বেশি। এর অনেক কারণের একটি হলো এই যৌনজীবনের চর্চা এবং চর্যার মধ্য দিয়ে সে নিজের জন্য আনন্দ এবং প্রেরণার পথ খুঁজে নেয়। তাই দেখা যায় তাঁর সাহিত্যে, গানে এই যৌনজীবনের নানা ভাবনার বিভিন্ন প্রয়োগ। এই প্রক্রিয়াও আদিকাল থেকে প্রবহমান এবং এর ফলে তাঁর চিন্তায়, তা বস্তুগত বা অধ্যাত্ম যাইই হোক না কেন, অনেকাংশে তা যৌনভিত্তিক স্থূল পর্যায়ের। আমাদের আলোচ্য বাউলসাধনা দেহকে তথা বস্তুগত জীবনকে কখনও অস্বীকার করেনি। দেহ এবং ইহকালের গুরুত্ব স্বীকার করেই আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণে এই সাধনা তৎপর থেকেছে। বিভিন্ন ধর্মের ধ্যানধারণার পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে সত্য জানার প্রয়াস এই সাধনার উদ্দেশ্য। বাউলসাধনা তাই সমন্বয়েরও সাধনা। এই সাধনা সে কারণে অসাম্প্রদায়িকও বটে।

প্রশ্ন হতে পারে, এই সমন্বয়ে কি উচ্চস্তরের মানুষ অংশ নিয়েছে? উত্তর হবে : না। তবে কাদের এই সমন্বয়? উত্তর : নিম্নশ্রেণীর মানুষের। কিন্তু কেন এই সমন্বয়? এরও উত্তর হবে : নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাদের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাই বাঁচার তাগিদে এই সমন্বয়। বলা হয়েছে, ধর্মের নামে একটি প্রবঞ্চনার ইতিহাস গড়ে উঠেছে। অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের আড়ালে মানুষ তাঁর নিজের অধিকারকেই হারিয়ে এসেছে এতকাল। আর্যদের এ দেশে আগমনের পরপরই যে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তা এই ধারণার ইঙ্গিত বহনকারী। বর্ণবৈষম্যের সূত্রপাতও সেখান থেকে।[৭] এ-কথা আমরা জানি যে, আর্য ব্যতিরেকে অন্যদেরকে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। যারা পালিয়ে বেঁচেছিল তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিল পাহাড়ের গুহায় বা অন্যত্র। আর্যসমাজ তাদেরকে চিহ্নিত করেছিল অনার্য বা অসভ্যরূপে। কিন্তু অনার্যরা যে অসভ্য নয়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। এবং ধর্মও শুধু যে আর্যদের হতেই শুরু হয়নি, অনার্যদের তথা তারও পূর্বেকার আদিবাসীদের জীবনেও ধর্মের প্রভাব ছিল–এ-কথা আজ স্বীকৃত।[৮]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণবৈষম্য এই প্রবঞ্চনার অন্যতম কারণ হলেও তা অর্থনৈতিকও বটে এবং এই অর্থনৈতিক কারণের জন্যই তার জন্মনিয়ন্ত্রণ, যা বাউল সাধনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধ্যাত্মচিন্তা তার স্বস্তির সোপান। অল্পে তুষ্টিলাভ অনেকটা দুর্বল মানুষের অভিব্যক্তি হলেও একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের ইঙ্গিত দানকারী, যা দানা বাঁধলে যে কোনো সময়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু কেন এই বিস্ফোরণ ঘটেনি বা বিরোধ প্রকট হয়ে বাধেনি? এর উত্তরে বলা চলে : ধর্মচিন্তায়। ধর্মের বন্ধনে উচ্চ-নীচকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও শেষ রক্ষা হয়নি। কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালিপ্সু মানুষ ধর্মকে ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে। এতদসত্ত্বেও প্রবঞ্চিত সমাজধর্মকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে সক্ষম হয়নি। এবার সে ধর্মকে ব্যবহার করেছে নিজের প্রয়োজনে। অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ভুলতে সে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। জন্মনিরোধ করে সে মুক্তি খুঁজেছে আধ্যাত্মিক চিন্তায়। পুরুষের বীর্যে 'সাঁই'-এর অবস্থিতি। এই বীর্যকে ক্ষয় করা যাবে না–তা পাপ।[৯]

এমনি করে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে সে দূর করে গড়ে তুলেছে ছোট পরিবার। সাথে সাথে শ্রমনিবৃত্ত হবার ফলে অল্পে তুষ্ট থাকবার প্রকৃষ্ট উপায় খুঁজে পেতে চেয়েছে অধ্যাত্মচিন্তায়। আজও এই চেতনাই নিম্নশ্রেণীর মানুষের মনকে আচ্ছন্ন রেখেছে আমাদের দেশে। ধর্মের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে প্রতিবাদী মতাদর্শ, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় minor religion বা ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠী। বাউলসাধনাকে এমনি ধরনের একটি প্রতিবাদী মতাদর্শ বলা যেতে পারে, যা সর্বতোভাবে অধ্যাত্মচেতনাবাদী। নিম্নশ্রেণীর মানুষ এই মতাদর্শ গড়ে নিয়েছে একটি প্রতিবাদী চেতনার আদর্শে। এই মতাদর্শ সমাজের প্রবঞ্চিত মানুষের একদিন প্রতিদিনের বেঁচে থাকবার প্রেরণার স্থল। এই সাধনার উৎস কোনো বিশেষ একটি ধর্ম অথবা সময়ে নিহিত নয়। এর ইতিহাসও তাই একটি বিশেষ সময়ে খোঁজা নিরর্থক।

বাউলেরা সকল সংস্কার, শ্রেণী বা বর্ণবাদ এবং জাতিত্বকে নস্যাৎ করে মানবধর্মী তথা গণমানুষের লৌকিক অধ্যাত্মসাধনাকে আশ্রয়স্থল ভেবে শান্তি পেতে চেয়েছে। মানুষ তার সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। সে আপাতভাবে সকল শাস্ত্রাচার, আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী। কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন না মানলেও সে গুরুবাদী। এই গুরুই তার পথনির্দেশক। এই গুরুবাদেরও রকমফের আছে। তবে মূলে মানুষভজনা এই সাধনার বড় কথা। আদিকাল থেকে এই চেতনার ইতিহাস প্রবাহিত। ইতিহাসের এই ক্ষীণধারাকে অনুসরণ করে এই সাধনার একটি রূপরেখা নির্ণয়ে তাই এই প্রচেষ্টা। দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল বাউল এবং অন্যান্য মতাদর্শের সাধকদের সাথে জীবন অতিবাহিত করে তাদের সাধনাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। এই সাধনা নিতান্তই গুহ্য সাধনা, যা প্রকাশ করাকে তারা পাপ বলে গণ্য করে।

দীর্ঘদিন এ জাতীয় লোকদের সাথে মেলামেশা করে বুঝতে পেরেছি যে এই সাধনা কিছুসংখ্যক মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত হয়েছে। সত্যিকার জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হয়ে এরা মাকাল ফল নিয়েই তৃপ্ত হয়েছে। এই বিকৃত সাধকদের কার্যকলাপ অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং সমাজে তাঁরা দুষ্টক্ষতের ন্যায় বেড়ে উঠেছে। তাঁরা তাদের মূল আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অনেক কুলটা নারী, বিধবা, পথভ্রষ্ট, অসচ্চরিত্র প্রকৃতির লোক রয়েছে, যারা এই সাধনায় সামাজিক আশ্রয় পেয়েছে। এদের কার্যকলাপ অনেকাংশে বীভৎসতার নামান্তর। বিভিন্নস্থানে তাদের আখড়া রয়েছে। অনেক সেবাদাসী নিয়ে তারা থাকে। এদের দ্বারা নির্বিবাদে যৌনস্বেচ্ছাচার চলে লাগামহীন। এরা সংগীতাশ্রয়ীও বটে এবং অনেক তরুণ যুবক এদের এই জীবনের প্রতি তীব্র আসক্তি অনুভব করে এদের দলভুক্ত হয়ে আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নামধারী উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। যুবসমাজের মধ্যে অধিকাংশই কর্মবিমুখ। যুবতী বা তরুণীদের অধিকাংশই তালাকপ্রাপ্তা, কুলত্যাগী এবং বিধবা। মালা বদলের মাধ্যমে এরা একেকজন যুবকের সেবাসঙ্গিনী হিসেবে দলে থাকে। বর্তমানে এদের সংখ্যা নেহাত নগণ্য নয়। এদেরকে বাউল নামে চিহ্নিত করে অনেক পণ্ডিত এই সাধনার ধারাকে যথোপযুক্ত বিচার করতে সক্ষম হননি।

বাউলসাধনা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা মতামত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ এই সাধনায় কেবল বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রভাব লক্ষ করেছেন, অর্থাৎ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরাই প্রথম বাউল সম্প্রদায় এবং চর্যাপদই প্রথম বাউলগান। এরা 'বাজুল' শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তিমূল খুঁজেছেন। কেউ বাউলদের উন্মাদ, পাগল ইত্যাদি বলে বাতুল থেকে বাউল শব্দের উদ্ভব ঘটেছে বলে মনে করেন; কেউ তান্ত্রিক, সাংখ্য ও বৈষ্ণব ধর্মের শাখা বিশেষ রূপে উল্লেখ করেছেন।[১০] আবার কেউ একে কেবল সুফিসাধনার শাখা বিশেষ বলেও চিহ্নিত করেন। আবার কেউ বলেন : বজ্রযানী, সহজযানী থেকে নাথ, শিব, যোগী, বৈষ্ণব ও বিভিন্ন গুরুবাদের বেনামে হিন্দু-মুসলিম বাউলসাধনার বিকাশ এবং বিস্তৃতি। অনেকে সহজিয়া সাধনার সঙ্গে বাউলসাধনার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক চিন্তা করেছেন। তাদের মতে বৌদ্ধ সহজিয়ারা নর-নারী অর্থাৎ উপায় এবং প্রজ্ঞার যুগল মিলনে যে 'মহাসুখ' লাভ হয় তাকে 'সহজ অবস্থা' বলে ধারণা করেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়ারাও এমনিভাবে প্রকৃতি পুরুষের মিলনে বৌদ্ধ সহজিয়া ধারাকেই এই অর্থে অনুসরণ করে আসছেন। তবে তাঁরা তাদের সাধন প্রক্রিয়ায় প্রেম ও ভক্তির অবতারণা করেছেন। তাদের ধারণায় অবিমিশ্র প্রেমের মাধ্যমে প্রকৃতি পুরুষের মিলনে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য লাভ সম্ভব। কিন্তু সহজিয়ারা দেহকে অতিক্রম করে দেহাতীতে পৌঁছাতে সক্ষম হননি। নরনারী মিলন ইংরেজিতে যাকে sexo-yogic practice বলা হয়ে থাকে, এখানেই তাদের সাধনা আবর্তিত।

অপরপক্ষে লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ এবং দুদ্দু শাহ প্রমুখ বাউল যুগলমিলন বা মিথুনভিত্তিক যোগনির্ভর সাধনা অতিক্রম করে দেহাতীতে পৌঁছুবার সাধনা করেছেন। এখানে তাঁরা সুফিবাদ কর্তৃক প্রভাবিত।

তবে একথা সত্য যে, অন্যান্য লোকধর্মের মতো বাউলরাও বলে যে 'যাহা আছে ভাণ্ডে তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' অর্থাৎ এই দেহে যা আছে তার সবকিছুই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে। এই দেহসাধনাকে বাউল 'বর্তমান' নামেও চিহ্নিত করেছে। কারণ তারা 'অনুমান' মানে না। এই দেহের উপর গুরুত্ব এ কারণে যে এই দেহে আত্মা বা পরমার্থের সাময়িক অবস্থান। তিনি বাউলের 'অচিন পাখি' 'মনের মানুষ'। তার মূল অবস্থান দেহাতীত জীবনে। কেবল প্রেমের কারণেই তিনি দেহে অবস্থান করেন। নারী-পুরুষের যুগল সাধনায় যে প্রেমের জন্ম হয় কেবল তার মাধ্যমেই 'অচিন পাখি' বা 'মনের মানুষের' স্বরূপ জানা সম্ভব—এমন কথা বাউল বিশ্বাস করে। এই ধারণা সুফিপ্রভাবিত। সুফি সাধনায় আশেক ও মাশুকের যে-সম্পর্ক তা মূলত প্রেমের। কিন্তু প্রেমে বিরহ আছে, না-পাওয়ার বেদনা আছে। বাউলের প্রেম এই বিরহজনিত না-পাওয়ার বেদনাতে আবর্তিত। এই অতৃপ্তি তার চিরন্তন। দেহের কান্না এখানেই। সমগ্র বাউলগানের মধ্যে এই বিরহবোধই প্রধান।

মিলন হবে কত দিনে
আমার মনের মানুষের সনে।

বাউলগানের যথার্থ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণে বাউল সাধনার স্বরূপ যেমন জানা যেতে পারে, তেমনি এই শব্দের অর্থবৈচিত্র্যও আমাদেরকে এর উৎপত্তিমূল নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। তবে এ-কথা সত্য যে, বাউলসাধনার একটি অবিচ্ছিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্যরূপ বর্তমানে পাওয়া দুষ্কর। সময়ে ক্রমবিবর্তনে এই সাধনায় নানা ধর্ম বা মতের প্রতিফলন ঘটা যেমন সম্ভব, তেমনি এই শব্দের উৎসমূলও নানা বৈচিত্র্যে ঢেকে যেতে পারে। ভৌগোলিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কারণে ভাষা বা শব্দের পরিবর্তন হয়ে থাকে। একটি দেশীয় শব্দে যেমন বিদেশীয় প্রভাব পড়তে পারে এবং তাতে কখনও কখনও শব্দের বিপর্যয় ঘটে যায়, তেমনি একটি বিদেশী শব্দের পরিবর্তন, সংকোচন এবং বিপর্যয়ও স্বাভাবিক।

আমার ধারণায় বাউল একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদ এবং সংগীতাশ্রয়ী সাধন-ভজন সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছরের অধিককাল মেলামেশা করে তাদের সাধনা সম্পর্কে আমি যা জানতে পেয়েছি তা থেকে এমন প্রতীতি জন্মে যে এই সাধনার উৎস অনেক প্রাচীনকালে অবস্থিত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন প্যালেস্টাইনে ক্যানানাইট ধর্মে 'বা'আল'[১১] নামে একটি লোকধর্মের অস্তিত্ব ছিল। এরা দেহবাদী, প্রজননভিত্তিক এবং যৌনাচারমণ্ডিত সাধক সম্প্রদায়। পরবর্তীতে এই লোকধর্ম ইসলামপূর্ব আরব, মেসোপটেমিয়া

এবং ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। বাইবেল এবং কুরআন শরিফে 'বা'আল' ধর্মের উল্লেখ আছে।[১২] পারস্যের একটি সুফিশাখার নামও 'বা'আল' ছিল।[১৩] অন্যান্য সুফিধর্মের সঙ্গে 'বা'আল' সুফিসাধনাও ভারতে অনুপ্রবেশ করে।

প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও বাউলসাধনার পরিচয় রয়েছে।[১৪] এ বিষয়ে ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' গ্রন্থে বাউল-শব্দের উৎপত্তিকাল প্রাকচৈতন্যকাল বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও 'বাউল' শব্দের নানা প্রয়োগ রয়েছে।[১৬] চতুর্দশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' গ্রন্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'[১৭] এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'[১৮] গ্রন্থেও 'বাউল' শব্দটি নিন্দিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সুফি মুসলমানদের দ্বারা এদেশের সাধারণ মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে ধর্মান্তরিত হওয়ায় চৈতন্যদেব এবং অন্যদের মধ্যে এই বিদ্বেষভাব লক্ষ করা গেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব নিজেই নিজেকে 'মহাবাউল'[১৮ক] আখ্যায় চিহ্নিত করেন এবং বাউল সাধনাকে তাঁর বৈষ্ণবীয় সাধনার সঙ্গে একীভূত করে ফেলেন। চৈতন্যদেবের হাতে বাউলধর্ম নতুন আঙ্গিক ও অবয়ব লাভ করে। সুফিসাধনার অনুসারীদেরকে অনেক ক্ষেত্রে আউলিয়া নামে চিহ্নিত করা হত। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বাউলকে 'বাউলিয়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লোকনিরুক্তি বা Folk etymology অনুসারে আউলিয়া থেকে আউল অথবা বাউলিয়া, আউলিয়া থেকে বাউল আউল শব্দের উদ্ভব হতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমাদের তাই এমন ধারণা হওয়া অসংগত নয় যে বিদেশী (আরবি-ফারসি) 'বা'আল' শব্দটি বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় 'বাউল' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এই সাধনা এককভাবেও দেশজ নয় এবং বলা যেতে পারে এই লোকধর্ম একটি মিশ্র মতাদর্শ। প্রাচীন দেহবাদী সাধনার সঙ্গে সুফি ভাবদর্শের সংমিশ্রণে এদেশে এর বিকাশ যেমন ঘটেছে, আবার বিকৃত সাধকদের কারণে তার বিপর্যয়ও আমরা লক্ষ করি।

১.২

আমার ক্ষেত্রগবেষণা মূলত বিস্তৃত ছিল কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ এবং যশোর (বর্তমানে প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিণত)। এই অঞ্চলগুলো পাশাপাশি এবং প্রতি অঞ্চলেই বাউল ফকিরদের বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এই জেলাগুলোতে বাউল ফকিরদের আধিক্য হওয়ার মূলে পার্শ্ববর্তী ভারতের নদীয়া জেলায় ভক্তিবাদের অন্যতম প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা জেলাসমূহ অবিভক্ত ভারতের নদীয়া

জেলায় মহকুমা ছিল এবং বাউলগুরু লালন ফকিরের আখড়াবাড়ি ছিল কুষ্টিয়া। পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই-এর বাসস্থান ছিল ঝিনাইদহ অঞ্চলে। অবিভক্ত ভারতে নদীয়ার সঙ্গে এতদঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন তখন সমগ্র নদীয়া ছিল মুসলমানদের অধীনে। এসময় বিভিন্ন সুফিসাধকগণ নদীয়া জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে খান্‌কা নির্মাণ করেন। চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ এসময় মুসলমান সুফি ফকিরদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তিবাদ পরিবর্তিত আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে বাধ্য হন। মুসলমান সুফি ফকিরদের প্রভাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষ অধিক সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং লক্ষ করা গেছে নদীয়া জেলার অধিকাংশ স্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল।[১৯] নদীয়া জেলার মুসলমান সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কারণ এ সময় মুসলমান সুলতানগণের উদার মানসিকতা এবং মুসলিম সুফিসাধকদের সমন্বিত ধর্মমত হিসাবে ইসলাম প্রচার। মুসলমানদের আবির্ভাবের পূর্বে সেন আমলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা বৌদ্ধমতাবলম্বীরা যেমন নির্যাতিত হয়েছিল তেমনি নিম্নবর্ণের শূদ্র বলে কথিত হিন্দুসম্প্রদায়ও (নমঃশূদ্র) তাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই পরবর্তীতে মুসলমান হয় এবং এদের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে উভয় ধর্মের সমন্বয় সাধিত হয়।

অবশ্য হিন্দু মুসলমানের এই ধর্মসমন্বয়ে মুসলমান সুলতান ও সুফি ফকিরদের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, মুসলমান সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনুগ্রহে বাংলা সাহিত্য তার আপন মহিমা লাভ করে। মোগল আমলে সম্রাট আকবর এবং পরবর্তীকালে দারাশিকো সুফি ও ভারতীয় উপনিষদের ভাবনা এক করে এদেশের সাধারণ মানুষের চেতনায় এক অভাবিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। বাংলা ভাষায় তার প্রতিফলন ঘটে। সেন আমলে হিন্দুব্রাহ্মণদের প্রভাবের ফলে সংস্কৃত ব্যতিরেকে বাংলা ভাষার চর্চা শুধু নিষিদ্ধই ছিল না বরং বাংলা ভাষার চর্চাকারীকে রৌরব নামক নরকবাস করতে হবে এমন কথা ধর্মীয়ভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।[২০] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা অন্যান্য সুলতানের আমলে হলেও এর উৎকর্ষ সাধিত হয় হোসেন শাহের আমলে (১৪৩৯-১৫১৯ খ্রি.)।[২১] চৈতন্যদেবের আবির্ভাবও ঘটে তাঁর আমলে। এর আগে থেকেই মুসলিম সুফি ফকিরদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-ধর্মীয় চেতনা অপেক্ষা ইসলামের মানবিক ভাবনা প্রাধান্য লাভ করে। চণ্ডীদাসের পদাবলী এই মানসিকতার ফসল। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মও ছিল হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত ধর্মচেতনা ও সংস্কৃতির সার্থক সৃষ্টি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এ সময় মুসলমান সুলতানগণের উদার ও পরধর্মসহিষ্ণু শাসন এবং মুসলিম সুফি সাধকদের উদার মানবতা বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব জাগরণ বা রেনেসাঁ সৃষ্টি করেছিল।[২২] এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম মূলত সুফিবাদের অনুকরণে নির্মিত হলেও তা সুফিবাদকে প্রদমিত করার উদ্দেশ্যেই যে হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমগ্র নদীয়া জেলায় বিশেষ করে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য তাকে চিন্তিত করে তোলে। চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চলের ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধস্তূপ ও মঠ লক্ষ করলে বোঝা যায় যে এতদঞ্চলে একসময় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল যার অনুসারীবৃন্দ সে আমলে ইসলামের আবির্ভাবে মুসলমান হয়ে পড়ে। এ সময় চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের আলমডাঙ্গায় হজরত খায়রুল বাশার ওমজ ঘোলদাড়িতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এখানে থেকেই তিনি ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট হন। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে চারুলিয়া গ্রামে চারজন আউলিয়ার কবর রয়েছে। এরা সকলেই ইসলাম প্রচারক ছিলেন। মেহেরপুরের বাগওয়ান অঞ্চলেও সুফি সাধকদের বসতি ছিল। প্রায় অঞ্চলেই সুফিদের খান্‌কা ছিল। বলা যায়, সমগ্র বাংলাদেশেই তখন মুসলিম সংখ্যাধিক্য ছিল।

সি.জি. ও ডোনেল ১৮৯১ সালের Census of India-তে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

> In 1872 Muhammadans were nearly half a million less numerous than the Hindus in Bengal proper. Now (1891 A. D.) they surpass them (Hindus) by a million and a half.

তিনি আরও বলেন :

> It is statistically proved that since 1872, out of every 10,000 persons, Islam had gained 100 persons in Northern Bengal, 262 persons in Eastern Bengal and 110 persons in Western Bengal, on average 157 persons in the whole of Bengal proper...
>
> The Mussalman increase was in real and large. If it were to continue, the faith of Muhammad would be universal in Bengal proper in six centuries and a half, while Eastern Bengal would reach the same condition in about six hundred years.[২৩]

বলেছি, বৃহত্তর নদীয়া জেলাতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং মূলে ছিল একাধারে মুসলমান সুলতান, নৃপতিগণের এদেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা

এবং সুফি ফকিরদের দ্বারা ইসলামের উদার মানবতাপুষ্ট সুফি মতাদর্শের প্রচার। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের আলমডাঙ্গায় ঘোলদাড়ি গ্রামে সুফি ফকির খায়রুল বাশার ওমজের সঙ্গে অপর একজন সুফি ফকির আলাউদ্দিন ঘোরী আলমডাঙ্গায় আসেন এবং তিনি পরবর্তীকালে ঘোলদাড়িতে একটি মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।

নিচের ছক থেকে বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের একটি খতিয়ান পাওয়া যেতে পারে।

ব্রিটিশভারতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের একটি তুলনামূলক ছক

সময়কাল : ১৮৭২-১৯৪১

আদম শুমারি	মোট জনসংখ্যা ভারতবর্ষ	মোট মুসলিম জনসংখ্যা (ভারত)	মোট জনসংখ্যা (বঙ্গদেশ)	মোট মুসলিম জনসংখ্যা বঙ্গদেশ	মোট হিন্দু জনসংখ্যা বঙ্গদেশ	মন্তব্য
১৮৭২	২৫৫ মিলিয়ন		৩৬,৭৬৯,৭৩৫	১৬,৩৭০,৯৬৭	১৮,১০২,৩৪৮ যথার্থ হিন্দু জনসংখ্যা ১৬.৮ মিলিয়ন	জনসংখ্যা গণনার সময় সর্বপ্রাণ বা এ্যানিমিস্টদের সংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। যথার্থ হিন্দু জনসংখ্যা ১৬.৮ মিলিয়ন
১৮৮১	-	৪৯.৯৫ মিলিয়ন ১৯.৯৭%	৩৫,৬০৭,৬২৮	১৭,৮৬৩,৪১১	১৭,২৫৪,১২০	-
১৮৯৯	২৮৭,২১৩,৪৩১	-	৩৮,২৭৭,৩৩৮	১৯,৫৮২,৪৮১	১৮,০৬৮,৬৫৫	-
১৯০১	-	-	-	২১,৯০৭,৯৮০	২০,১৫০,৫৪১	১০ বৎসরে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০% হিন্দু ৪.৮%
১৯১১	-	-	-	২৪,২৩৭,২২৮	২০,৯৪৫,৩৭৯	১০ বৎসরে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০.৪% হিন্দু ৩.৯%
১৯৪১	৩৮৮.৯ মিলিয়ন	৯৪.৪৫ মিলিয়ন ২৪.২৮%	প্রায় ৭০ মিলিয়ন	প্রায় ৩৭ মিলিয়ন	প্রায় ৩১ মিলিয়ন	রাজনৈতিক কারণে উভয় সম্প্রদায় তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে।

মেহেরপুর অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেন শাহ মেহেরউল্লাহ নামে জনৈক সুফিসাধক। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ মুহাম্মদ জহির উদ্দীন। তিনি এতদঞ্চলে শাহ ভালাই নামেও চিহ্নিত হন। তিনি ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির মাধ্যমে লোকের রোগ ভালো করতে পারতেন বলে তাঁকে এই নামে অভিহিত করা হতো। মেহেরপুরে তাঁর মাজার এবং মসজিদ আছে। তাঁর সঙ্গী অপরজনের নাম শেখ ফরিদ, মেহেরপুর জেলায় মুজিবনগর সংলগ্ন বাগোয়ান গ্রামে বসবাস করেছেন এবং এখানে তাঁর মাজার আছে। শেখ জহিরউদ্দীন ওরফে শেখ মেহেরউল্লাহ ও শাহ ভালাই-এর আরও দুজন সঙ্গী ছিলেন–শেখ মালেকুল গাউস এবং মেহমান শাহ। শেখ মালেকুল গাউস-এর কবর এবং মাজার চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের দামুড়হুদা থানার চারুলিয়া গ্রামে অবস্থিত। মেহমান শাহ ধর্মপ্রচার করেন গাংনী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। তবে তিনি কোথায় মৃত্যুবরণ করেন তা জানা যায় না। কুষ্টিয়া অঞ্চলে যারা ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কুমারখালী থানার খোরশেদ শাহ (শিলাইদহের পার্শ্ববর্তী গ্রাম খোরশেদপুরে তাঁর মাজার আছে), ভেড়ামারা থানার মহিউদ্দীন বদায়ুনী ওরফে ঘোড়াশাহ, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার রেজা শাহ চিশতি এবং মুন্সীগঞ্জ থানার গোবিন্দপুর গ্রামের একদিল শাহ অন্যতম। কুষ্টিয়া শহরের উত্তরপ্রান্তে পদ্মা নদীর ধারে পুরাতন কুষ্টিয়াতে একদিল শাহের দরগা আছে।

এখানে বলা প্রয়োজন, সুফি ফকিরেরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের প্রভাব রেখেছিলেন খানকা এবং মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে। তাদের মৃত্যুর পর এবং এইসব খানকা বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন ঝাউদিয়া, স্বস্তিপুর, হরিনারায়ণপুর, জুনিয়াদহ প্রভৃতি অঞ্চলের অতিপ্রাচীন মসজিদসমূহ দেখে অনুমিত হয় যে, বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্যের মূলে সুফিসাধক এবং মুসলিম রাজন্যবর্গের গৌরবময় ভূমিকা ছিল। এই সুফি ফকিরেরা ছিল মূলত অধ্যাত্মবাদী, তাত্ত্বিক। পারস্যে এই মতবাদের উদ্ভব। ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের প্রতি বিশ্বাসী হয়েও এরা তাদের মতবাদে নানা ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছেন। পারস্যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং তাদের অনুসারীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। পারস্যে ইসলামের আবির্ভাবে এদের অধিকাংশ তাদের পুরাতন ধর্মত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু জীবনাচরণে পুরাতন বিশ্বাস এবং রীতিনীতিকে তারা অপসারণ করতে সক্ষম হয়নি। এরা একশ্রেণীর খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের মতো সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা বেছে নেয়। এরা তাত্ত্বিক এবং অধ্যাত্মসাধনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে তখন মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি দল গড়ে ওঠে।[২৪] উল্লিখিত দল হজরত আলীকে তাদের আদর্শ বলে গ্রহণ করে। এই দলের নেতা ছিলেন ইমাম জাফর সাদেক। ইমাম জাফর সাদেকের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাইল পরবর্তীতে

বাতেনী সুফিধারা প্রবর্তন করেন এবং তাঁর নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়। এরা শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। এদের মাধ্যমে বাতেনী সুফি মতবাদ গড়ে ওঠে।[২৫] এরা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীদের মতো নির্জন এবং নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছিলেন এবং পরিধানে সন্ন্যাসীদের আলখেল্লার মতো পশমি কাপড় ব্যবহার করতেন।

যা হোক বাংলাদেশে এই সুফি মতবাদ প্রাধান্য লাভের মূলে যে বৌদ্ধসমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল তা সহজে অনুমেয় এ কারণে যে অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সুফি ফকিরদের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হয় এবং সুফিদের অনুকরণে তারা তাদের জীবনযাত্রায়ও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় বাংলাদেশে বিভিন্ন ধারার সুফি মতাদর্শ প্রবর্তিত হয়।[২৬] এইসব ধারা প্রত্যেক সুফিসাধকের নামে বিকাশ লাভ করে। যেমন খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর নামে চিশতীয়া ধারা, শেখ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর নামে সোহরাওয়ার্দীয়া ধারা, শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর নামে কাদেরিয়া ধারা এবং বু আলী কলন্দের নামে কলন্দরীয়া ধারা, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবান্দের নামে নক্‌শবন্দীয়া ধারা।

এদের মধ্যে চিশতীয়া ধারা অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তাদের সংগীতের মাধ্যমে।[২৭] এই সংগীত ছিল মূলত ধর্মীয় সংগীত যা আল্লাহ এবং নবীর গুণকীর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে তা ছিল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মতো সম্পর্কযুক্ত। ইসলামে সংগীত নিষিদ্ধ হলেও আল্লাহ ও নবীর প্রশস্তিমূলক সংগীতকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।[২৮] ফলে জনগণের মধ্যে চিশতীয়া ধারা অন্যান্য ধারা অপেক্ষা সহজেই গ্রহণীয় হয়ে পড়ে। এরা মানুষের রোগ দূরীকরণের জন্যও আল্লাহর নাম এবং পবিত্র কুরআন শরিফের আয়াতকে ঝাড়ফুঁক এবং তাবিজ হিসাবে ব্যবহার করত।

চিশতীয়া ব্যতিরেকে অন্যান্য সুফি ফকিরদের মধ্যেও তাবিজ এবং দোয়া ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে দীর্ঘকাল ধরে পারস্য, মেসোপটেমিয়া (ইরাক) এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে ওঠে। ফলে সুফিরা এদেশে আসার সাথে সাথে তাদের আচরণ এবং জীবনযাত্রায় এদেশের জনগণ অনেকক্ষেত্রে সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। এবং এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে সুফি ফকিরদের অনুকরণে দেশজ ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। পারস্যের 'বা'আল' সাধকদের মত ও পথ অবলম্বনে গড়ে-ওঠা বাউলসমাজ এমনি একটি দেশজ সুফি সম্প্রদায়। সাধারণ গ্রামবাসীরা এদেরকে অদ্যাবধি 'নাড়ার ফকির' নামে অভিহিত করে। এদের জীবনাচরণে এবং ধর্মবিশ্বাসে পারস্যের একশ্রেণীর সুফি ফকির ও দেশজ ধর্মীয় আচার, যেমন বৌদ্ধ সহজিয়া এবং হিন্দু বৈষ্ণব প্রভৃতির প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য, এই সমন্বয় কাজে মুসলিম সুলতানেরাই যে

অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা নয়, মোগল আমলে বিশেষ করে সম্রাট আকবরের সময় মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে উপমহাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি দৃঢ় এবং গভীর সমন্বয় সাধিত হয়।

এখানে বলা অসংগত নয় যে সম্রাট আকবরের সমন্বয় প্রচেষ্টা ছিল মূলত রাজনৈতিক। 'দীন এলাহি'[২৯] ধর্ম প্রবর্তন করে তিনি এদেশের অমুসলিম মানুষের মন জয় করেছিলেন। এদেশের মহিলাদের বিবাহ করে তিনি মোগল সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুফি মতাদর্শ এবং সুফি ফকিরদের সান্নিধ্য তাঁকে এ-কাজে প্রেরণা দিয়েছিল।

সম্রাট আকবরের পর সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকো[৩০], সুফি সাধনার সঙ্গে দেশজ চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি ৫টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথম গ্রন্থ : সফীনাত-উল-আউলিয়া। এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন সুফিধারা যেমন চিশতীয়া, কাদেরিয়া, নখ্‌শবন্দীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থ : সখীনাত-উল-আউলিয়া। এই গ্রন্থে দারাশিকো তাঁর গুরু মুল্লা শাহের গুরু মিয়া মীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দারাশিকো কাদেরিয়া মতাবলম্বী ছিলেন এবং যোগসাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কাদেরিয়া ধারার অনুসারীগণ যৌগিক পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলেন।

দারার তৃতীয় গ্রন্থ : রিসালা-ই হক নামা। এই গ্রন্থে সুফিসাধনার বিভিন্ন স্তর, যেমন নাছুত, মলকুত, জবরুত, লাহুত এবং হাউত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এর পর চতুর্থ গ্রন্থ : হাসনাত-আল-আরেফিন। এই গ্রন্থে কাদেরিয়া শাখাসহ বিভিন্ন শাখার সুফিসাধকদের উপদেশ ও বাণী সংকলিত হয়েছে।

দারাশিকোর পঞ্চম ও সর্বশেষ গ্রন্থ : মজমা-উল-বাহরাইন বা দুই মহাসমুদ্রের মিলন। এই গ্রন্থে দারা ভারত উপমহাদেশের সনাতনী হিন্দুধর্মের সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ঐক্যসাধন করতে চেয়েছিলেন। এই গ্রন্থে মোট ২২টি অধ্যায় আছে। দারা এই গ্রন্থে সুফি মতবাদের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ-শেষে উপনিষদের বা বেদান্তের বাণীকে একত্রে মিলিয়ে দেখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। দারা কুরআন এবং উপনিষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেননি। এখানে বলা যেতে পারে, সম্রাট আকবরের 'দীন-এলাহি'র প্রবর্তন একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে হলেও দারার উদ্দেশ্য ছিল মূলত সাংস্কৃতিক।

সুফি সাধনার উদ্ভবকালে শিয়াদের প্রাধান্য ছিল। এবং সুন্নী সম্প্রদায় এই মতাদর্শকে গ্রহণ করেনি। বাগদাদে দশম খ্রিস্টাব্দে মনসুর হল্লাজের মৃত্যু তা প্রমাণ করে। সুন্নী সম্প্রদায় তাসাউফ বা অধ্যাত্মসাধনা অপেক্ষা শরীয়তি জীবনধারার

প্রতি গুরুত্ব অর্পণ করে। মোগল সম্রাটদের অধিকাংশই ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা এদেশে সুফিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু উলেমা সম্প্রদায় সর্বকালে তাদের বিরোধিতা করেছেন।[৩১] এরা ইসলামের মৌল ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩২]

যাহোক একাধারে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অপরধারে সুফি ফকিরদের উদার-মানসিকতা ইত্যাদির কারণে সুফিবাদকে সাধারণ মানুষ ইসলাম বলে গ্রহণ করেছে এবং তাঁরা শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। ফলে 'মোহররম' দিবস শুধু শিয়াদের অনুষ্ঠান থাকেনি, সমগ্র বাংলাদেশের মুসলমানদের অনুষ্ঠান হয়েছে। অবশ্য ইসলামকে সুফিবাদের আওতামুক্ত করার জন্যে এদেশে ওহাবী আন্দোলন হয়েছে[৩৩] এবং জামাতে ইসলাম রাজনৈতিকভাবে ইসলামের মৌলভাবনাকে গুরুত্ব প্রদান করছে। কিন্তু এরই পাশে তবলীগ জামাত ইসলামের শরীয়ত এবং মারেফাতকে সমন্বয়সাধন করেছে এবং সাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব অধিকমাত্রায় লক্ষ করা যায়।

সুফি এবং আউলিয়া এদেশে সমার্থক বিবেচিত এবং এদের মাধ্যমে পীর শব্দটিও এ উপমহাদেশে গুরুর প্রতিশব্দ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। সুফি মতবাদ সমন্বিত ভাবনা হিসেবে বিস্তার লাভ করায় 'সত্যনারায়ণ' অতি সহজেই সত্যপীর হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছেন। এবং যেহেতু সুফি সাধকেরা ধর্মীয় প্রচারের সাথে সাথে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন এবং ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে রোগ নিরাময় করে থাকতেন, ফলে এদেশের হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সুফিসাধকদের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। এসবের কারণে মানিক পীর, ঘোড়া পীর, কুম্ভীর পীর, মাদারী পীর প্রভৃতির উদ্ভব হয়।[৩৪]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মুসলমান কর্তৃক বাংলা আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে এদেশে তান্ত্রিকধর্মের প্রচলন ছিল।[৩৫] সাধারণ মানুষ তান্ত্রিক সাধকগণকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভেবে তাদেরকে ভয় পেত এবং সমীহ করে চলত।[৩৬]

রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেন :

> মুসলমানেরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক সুফি দরবেশ ও পীরই এইসব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের বাসস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন, ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত পীরেরা ইচ্ছা করিলেই লোকের দুঃখ দুর্দশা মোচন করিতে পারেন, মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন। আবার জীবন্ত মানুষকেও জাদুবলে মারিতে পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন। ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিষ্যেরাও অনেকে স্থান-মাহাত্ম্যে এবং এইসব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পীরের দর্গায় আসিত এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত।[৩৭]

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে আমরা আরও অনুমান করতে পারি যে বৌদ্ধ সহজিয়াগণের মধ্যেও অনেকে সুফি প্রচারিত ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের সাধনা সুফিকরণ করে। মধ্যযুগে লিখিত 'ধর্মপূজা বিধান' নামক গ্রন্থে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে একটি কবিতায় তৎকালীন সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কারণে বৌদ্ধগণ কীভাবে ধর্মান্তরিত হন, তার বিবরণ আছে। এই সময় বৌদ্ধগণ মুসলমানদেরকে ত্রাণকর্তা বলে ভেবেছিল এবং তাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যেই দেবতারা মুসলমানের আকারে অবতীর্ণ হয়েছিল। রমেশচন্দ্র বলেন :

> এইরূপে গণেশ হইলেন গাজী, কার্তিক-কাজী, চণ্ডিকা দেবী–হায়্যা বিবি ও পদ্মাবতী—বিবি নূর হইলেন। এইভাবে দেবগণ মুসলমানের রূপ ধারণ করিয়া জাজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিল। এই কবিতাটি কোন সময়ের রচনা তাহা জানা নাই। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধগণ মুসলমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্য দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল অর্থাৎ ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, উক্ত কবিতায় তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।[৩৮]

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীভুক্ত হিন্দু বৌদ্ধদের ধর্মান্তরকরণে মুসলমান সুফি দরবেশদের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। এই নিম্নশ্রেণীর ধর্মান্তরিত হিন্দু বৌদ্ধেরা আরবি-ফারসি ভাষা না-জানার কারণে সুফিদেরকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করত। বিশেষ করে পারস্যের বাতেনী বাউল সাধক সম্প্রদায় এই সময়, এদেশের সাধারণ মুসলমান সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এ সময়ে একশ্রেণীর মুসলমান নারী-পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান ও নৃত্যগীতের যে প্রচলন ছিল পর্তুগিজ ভ্রমণকারী বারবোসা বাংলাদেশের এক অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করেন।[৩৯]

এ থেকে অনুমিত হয় যে, পারস্যের বাউল সুফিসাধকদের মধ্যে যে গীতবাদ্যের প্রচলন ছিল তা হয়তো তৎকালীন মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরব ও পারস্যে নৃত্যগীত ও মদপান ইত্যাদির রেওয়াজ ছিল।[৪০] ইসলাম পরবর্তীকালে সুফিদের মধ্যে কোনো কোনো শাখা, বিশেষ করে বাতেনী সুফি শাখায় নৃত্যগীত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইল নিজেও মদপান ও নৃত্যগীতের প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে তাঁর পিতা এবং সুফি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম জাফর আস সাদেক কর্তৃক শিয়া ইমামমণ্ডলীর মধ্য থেকে বহিষ্কৃত হন।[৪১]

ভারত ও বাংলাদেশে বাতেনী ধারায় সুফি এবং 'বা'আল' ধারা অনুসরণকারীদের মধ্যে এই রীতি সক্রিয় ছিল। চর্যাগীতি, নাথগীতি, বৈষ্ণব ও বাউলগানের মধ্যে এই নৃত্যগীতের প্রচলন রয়েছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে আর্যদের 'বেদ' ধর্মগ্রন্থেও নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে।[৪২] এই আর্যসমাজ ভারতে আগমনের পূর্বে মধ্যএশিয়া অর্থাৎ পারস্যেও তারা বসবাস করে এবং পারস্যের অধিবাসীদের একটি বিরাট অংশ আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাদেরও ধর্মগ্রন্থ ছিল 'বেদ'। আমরা লক্ষ করেছি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে 'বা'আল' দেবতার উল্লেখ রয়েছে এবং সে কারণে 'বেদ' ধর্মগ্রন্থেও তার প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পারস্যে বসবাসকারী আর্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা যায় না। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ভারতীয় 'বেদ' ধর্মগ্রন্থে যে বাউল মতবাদের পরিচয় পেয়েছেন তার উৎস কোথায়?

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অবিভক্ত বাংলাদেশে 'বা'আল' সুফিসাধকদের যে আগমন ঘটেছিল তার প্রমাণ চতুর্দশ শতকে শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা', পঞ্চদশ শতকে মালাধর বসু বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থে রয়েছে। এই 'বা'আল' (বাউল) সাধকদের মত ও পথ বৈষ্ণবদেরকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার আকুতি এবং প্রেমপীড়ন ইউসুফ প্রেমিকা জোলেখার সমগোত্রীয়। সুতরাং এ কথা বলা অস্বাভাবিক নয় যে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পারস্যের বাতেনী সুফিসাধকদের, বিশেষ করে বা'আল সুফিসাধকদের অত্যন্ত গভীর প্রভাব পড়েছিল। আমাদের লোকসংগীত ও লোকসাহিত্যেও এই প্রভাব আবহমানকাল থেকে প্রবহমান। এ সবই আমাদের ফোকলোর নির্দেশক। মুখে মুখে, কিংবা দেখে শিখে বা ঐতিহ্য (oraltradition) গড়ে উঠেছে তা একধারায় কখনও প্রবাহিত হয়নি। এদের মধ্যে প্রায়শ বিবর্তন ও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। সংযোজন হয়েছে নতুন চেতনার। তৈরি হয়েছে নতুন বাউল সম্প্রদায় এবং তাদের গান।

যা হোক, বর্তমানকালে যদিও বাউলসাধনা বৃহত্তর কুষ্টিয়া এবং যশোর জেলায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কিন্তু অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই এই মতবাদ একসময় বিস্তার লাভ করেছিল। শাহ মুহম্মদ সগীরের রচনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই 'বাউল' শব্দের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

সুতরাং বলা যেতে পারে, দীর্ঘকাল বাউল সাধকেরা সমাজজীবনে যে তীব্র প্রভাব ফেলেছেন তার কারণেই সাহিত্যে এই শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। 'চর্যাগীতিকায়' বাউল প্রভাব স্বীকার করে নিলে এই মতবাদের উদ্ভবকাল আরও পূর্ব কালের বলে ধারণা জন্মে। যা হোক, পরবর্তী অধ্যায়ে এ সবের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আমার আলোচনায় এই মৌলিক বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হারামণি ১ম খণ্ড, কলকাতা, 'আশীর্বাদ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. 'ঘর' বা 'ঘরানা'র অর্থ পরিবার। এদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের 'ঘর' বা 'ঘরানা' ছিল। চতুর্দশ শতকে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়ে 'কলাবন্ত' এবং 'কাউয়াল' ঘরানা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। লোকসংগীতের এমন কোনো 'ঘর' বা 'ঘরানা' ছিল না বলে অনুমিত হয়। তবে লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীদের মধ্যে 'ঘর' বা 'ঘরানা'র প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য বাউলগানের ঘরানা শাস্ত্রীয় সংগীতের নিয়ম বা রীতি অনুযায়ী হয়নি। এই 'ঘরানা' সাধন-ভজন সংক্রান্ত, পশ্চিমবাংলায় সতী মায়ের 'ঘর' বলে সাধন-ভজন সম্প্রদায় আছে। বর্তমানে বাউলগানের ঘরানা সংখ্যা পাঁচ—লালনশাহী, পাঞ্জুশাহী, উজ্জ্বল শাহ চৌধুরী, দেলবারশাহী এবং পাঁচু শাহী। পাঁচু শাহ মূলে সতী মায়ের 'ঘরানা'র অনুসারী ছিলেন।

৩. ওরশ বা 'উরুস' ফারসি শব্দ, অর্থ 'মিলন' বা 'বিবাহ'। সাধু গুরুদের ভাষায় সাধক তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর পরমারাধ্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বাংলাদেশে বিভিন্ন সুফিসাধকদের মধ্যে 'ওরশ' শব্দটি বহুল প্রচলিত। প্রতি বছর 'পীর' বা 'গুরুর' মৃত্যুদিনে তাঁর মাজারে তাঁর অনুসারী অথবা সাধু গুরুদের যে সম্মিলন ঘটে তাকে 'ওরশ' নামে অভিহিত করা হয়। বাউলেরা একে 'সাধুসেবা' নামে অভিহিত করে। লালন শাহের মাজারে প্রতিবছর ১লা কার্তিকে এই সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। লালন শাহ অবশ্য তাঁর সমকালে দোল পূর্ণিমায় 'সাধুসেবা' করতেন। একে সাধুদের ভাষায় 'মচ্ছব' বা মহোৎসব বলা হত।
ওরশে মাজার-কর্তৃপক্ষ সকল সাধু গুরুকে এই সময়ে আপ্যায়ন করে থাকে। সাধুগুরুরাও 'গুরুর' নজরানা হিসেবেও এই অনুষ্ঠানে টাকাপয়সা, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি দিয়ে থাকে। তাঁরা মনে করে গুরু কখনও মৃত নন। তিনি তাদের সকল কার্যকলাপ অবলোকন করে থাকেন।

৪. 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রব্বাহু'—এইটি কোরান মজিদ বা হাদিসের কোনো অংশ নয়।

৫. William Wordsworth, Lines Composed a few miles above Tintern Abbey.
'that blessed mood in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened : .....'

৬. জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অধিবিদ্যা বা জ্ঞানের গভীরতম উপলব্ধি বুঝাতে ইংরেজি সাহিত্যে Dryden সর্বপ্রথম metaphysical শব্দটি ব্যবহার করেন। অতঃপর John

Donal Cowley এবং তাদের অনুসারীদের ভাবনা ও ধ্যানধারণাকে Dr. Johnson মেটাফিজিক্যাল (metaphysical) নামে চিহ্নিত করেন। ইংরেজি ভাষায় কোনো কোনো পণ্ডিত কাব্যে metaphysical শব্দটির প্রয়োগকে বিরোধিতা করলেও Saintsbury এবং Dr. Johnson মনে করেন : "it was not imappropriately used for the habit common to this school of poets, of always seeking to express something after, something behind, the obvious first sense and suggestion of subject." Fowler H.H, *modern English Usage*, Second Edition, Oxford, London, 1965, p. 363.
আলোচ্য গ্রন্থে লালন শাহ ও অন্যান্য বাউলের গানকে সেই একই অর্থে metaphysical বলা হয়েছে।

৭. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ*, কলকাতা, ১৩৫২ সন, পৃ. ৫-৬

৮. R.C. Majumdar. *Ancient India*, Delhi, 1960 pp. 48-49, 87-89 R.C Majumdar. *Corporate life in Ancient India*, Calcutta 1969, pp. 310-25

৯. কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত *চৈতন্যচরিতামৃত*, সম্পাদক সুবোধচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা, ১৩৬১ সন।

১০. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য ভাগবত*, কলকাতা, ১৩৫৮ সন।

১১. শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন প্যালেস্টাইন রাসসামারায় আবিষ্কার, ক্যানানাইট সাহিত্য ও ধর্ম, কলকাতা।
একজন কৃষক সর্বপ্রথম ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিকভাবে রাসসামারায় (প্রাচীন উগারিট) প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করে। অতঃপর সি.এফ.এ. শেফার নামে একজন ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ ১৯২৯ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাসসামারায় মাটি খুঁড়ে রাজপ্রাসাদসহ একটি নগর আবিষ্কার করেন। এখানে তিনি এই নগরের অধিবাসীদের দেবতা 'বা'আল'-এর মূর্তিও খুঁজে পান।
এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য Archaeology শিরোনামে The New Dictionery of Bible (Ed. J.D. Douglas) এ উল্লেখ আছে।

১২. কুরআন মজিদ-আসসাফাত ৩৭ সূরা ১২ *আল কুরআনুল করীম*, পৃ. ৭৩৩
বাইবেল-নবীদের কিতাব *বাদশাহনামা (১)* ১৮ : ১৩-২৯।
'ইলিয়াস বলিলেন, আমি ইস্রাফিলের কলঙ্ক হই নাই। এবং আপনি (আহাব) ও আপনার পূর্বপুরুষ; কেননা আপনারা মাবুদের হুকুম অমান্য করিয়াছেন এবং আপনি বা'আল দেবের অনুসারী হইয়াছেন।
নবীদের কিতাব–*বাদশাহনামা (২)*
....মাবুদের ফেরশতা তিশবিয় ইলিয়াসকে বলিলেন : উঠ, শমরিয়া বাদশাহের দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ কর গিয়া, আর তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েলের মধ্যে কি আল্লাহ নাই যে, তোমার ইক্রোণের দেবতা বা'আল সবুরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছ? *কিতাবুল মোকাদ্দস*—বাংলা অনুবাদ পৃ. ৪৫২, ৪৬১-৪৬৩

১৩. Dr. Mohd. Moin : *A Persian Dictionary*, Vol. V. Proper names, Tehran, 1978, P. 137

১৪. শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল*, কলকাতা, ১৩৭৮ সন, পৃ. ৪-১৯

১৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭৮ সন, পৃ. ২৯০

১৬. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা* (ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত), ঢাকা, পৃ. ২২৫-২৩৮।

১৭. মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩

১৮. শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, কলকাতা।

১৮ ক. উপন্দ্রেনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান*, কলকাতা, ১৩৭৮।

১৯. Census of India 1901, Vol. 1, Pt. I, pp. 66-69 and 384

২০. অষ্টাদশ পুরাণানি রামসাশ্চরিতাণিচ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা
রৌরবং নরকং ব্রজেৎ
দ্র. ১) আনোয়ারুল করীম, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক*, কুষ্টিয়া, ১৯৬৯, পৃ.৭

২১. Muhammed Mohor Ali, *History of the Muslims of Bengal*. Vol. IB, Riyad 1985, pp. 853-875
Muhammed Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. I. Karachi.

২২. Ibid.

২৩. *Census of India 1891*, Vol. II, pp. 2
Census of India 1891, Vol. I, pt. I pp. 146

২৪. Syed Mahmudul Hasan, *Islam*, Dhaka, p. 246-247

২৫. Islamic Foundation. Ibid Dhaka.

২৬. Muhammad Abdur Rahim, op. cit. p. 76-150

২৭. R.A. Nicholson, *A literary History of the Arabs*, Cambridge, 1953, p. 236

২৮. বোখারী শরীফ প্রথম, ৩য় এবং পঞ্চম। Also see Dr. Anawarul Karim. *The Bauls of Bangladesh*, Kushtia, 1980, p. 156

২৯. সম্রাট আকবর কর্তৃক সর্বধর্ম সমন্বয়ে গঠিত নতুন ধর্মসাধনা। বস্তুত, দীন-ইলাহীকে ধর্মসাধনা না বলে একে একটি মতাদর্শ বলাই যুক্তিসংগত। Annemarie Schimmel বলেন : "... In the regulations of this eclectic movement the noblest ideas of various religious traditions were combined, for instance the probition of sensual lust, deceit, slander and oppression, ideas that suggest influences of Jain 'ahimsa' and

Catholic Ideal of celibacy. A Central fact of 'Din-i-Ilahi' is the veneration of light, whether the sun or a perpetual fire, which may have its roots in zoroastrian practices. এই ধর্মসাধনা প্রবর্তনের জন্য আকবর নিন্দিত এবং সমালোচিত হন। Schimmel A.M. *Islam in the Indian Sub continent*, Leiden, The Netherland 1980, p. 82

৩০. সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকো এদেশে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বাতেনী সুফিধারা অনুসারে তিনি তাঁর মতাদর্শকে এদেশের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।
2 Schimmel দারাশিকো এ সম্পর্কে বলেন, 'For the main objective of his numerous studies in Sufi history and thought was to find a common denominator for Islam and Hinduism. The title of his book, Majma-al-bahrain : 'The Mingling of the two Oceans (sura 18/60) points to this ideal. In this work the prince tried to compare Sufi expressions with technical terms of Hinduism, as it had been done during akbar's time by Mir Abdul Wahid Bilgrami (Schimmel A.M. op cit, p. 98)

৩১. Joarder, Safiuddin, *The Ulma in Bangladesh, In Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh*, New Delhi, 1990

৩২. Ahmed Rafiuddin, *The Bengal Muslims* 1871-1906 : a quest for identity, Delhi, 1981.
Islam is Bangladesh; Society culture and polities, Dhaka 1983 (ed)

৩৩. Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Traditions in Bengal*, New Jersy, 1983, p. 214-17

৩৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ*, দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পাদিত), ৩য় সংস্করণ, কলকাতা ১৩৮৫ পৃ. ২৩৪-২৩৫

৩৫. প্রাগুক্ত,

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৪০. M.N. Mustafa, *Our Music*, Chittagong, First edition 1977, p. 70-82

৪১. Syed Mahmudul Hasan, *Islam*, Islamic Foundation, Dhaka, 1962, p. 247

৪২. শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল*, প্রাগুক্ত
M.N Mustafa, *Our Music*, opt. cit., p. 26-34

লোকধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশে বিভিন্ন সাধন-ভজন সম্প্রদায় রয়েছে এবং তাদের একটি পরিচিতিও জনসমাজে বিদ্যমান। সমাজের নিম্নস্তরের পিছিয়ে-পড়া মানুষ বলে কথিত নিরক্ষর, অমার্জিত অথবা অশালীন, যারা 'লোক' নামে সভ্যসমাজে পরিচিত, তাদের মধ্যেই এসব সাধন-ভজন সম্প্রদায়ের উদ্ভব, বিস্তার এবং বিকাশ। বিভিন্ন মূলধর্মের অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলামের পাশাপাশি এসব ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী বা লোকধর্ম বা সাধন-ভজন সম্প্রদায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে বলে জানা যায়। এদের সম্পর্কে এইচএইচ উইলসন (১৮৬১)[১], অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৭০)[২], রিজলে, এইচ (১৮৯১)[৩], উইলিয়াম হান্টার (১৮৭৫)[৪], প্রমথনাথ বসু (১৮৯৪)[৫], যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৯৬)[৬] এবং আব্দুল ওয়ালী (১৯০০)[৭] তাদের বিভিন্ন গ্রন্থ ও নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেছেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে *Census of India*-তে এইসব সাধন-ভজন সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ক্ষিতিমোহন সেন,[৮] শশিভূষণ দাশগুপ্ত,[৯] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,[১০] মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন[১১] এবং আরও অনেকে এইসব লোকধর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করেছেন।

এইসব পণ্ডিতদের প্রদত্ত বিবরণ থেকে উভয় বাংলায় বিদ্যমান যেসব লোকধর্ম বা সাধন-ভজন সম্প্রদায়ের কথা জানা যায় তারা হলো : বাউল (আউল), সাঁই, দরবেশ-ফকির, ন্যাড়া-সহজি, কর্তাভজা, স্পষ্টদেখা, সখীভাবুক, খুশীবিশ্বাসী, হরিবোলা, সাহেবধনী, বলরামী, বোষ্টম,-বোষ্টমী, আপা-পন্থি, কিশোরী ভজনী, রায়বল্লভী, জগন্মোহিনী ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশে আরও যেসব সাধন-ভজন সম্প্রদায়ের কথা জানা যায় তার মধ্যে বাউল, দরবেশ ফকির, বলরামী, লালনশাহী, পাঞ্জুশাহী, শীতলাংশাহী, মাইজভাণ্ডারী অন্যতম। হাছন রাজা নামে একজন সুফি সাধকের বেশ কিছু অনুসারী সিলেট অঞ্চলে রয়েছে। 'পঞ্চরস' সাধক[১২] নামে সাম্প্রতিককালে ঢাকার সন্নিকটে সাটুরিয়া সংলগ্ন আইনমারা গ্রামে একটি সাধন-সম্প্রদায়ের নাম জানতে পারা যায়। খুলনা-যশোর অঞ্চলে 'ভগবানী' নামেও একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী দীর্ঘকাল গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছে।

উভয় বাংলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাধুসেবায় এসব লোকধর্মের অনুসারীদের অংশগ্রহণ অনেকটা নিয়মিত। লালন ফকির নিজেও বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন সাধুগুরুর আখড়ায় পরিভ্রমণ করেছেন বলে জানা যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে হাছন রাজা এবং মাইজভাণ্ডারীকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এসব গানগুলিকে 'মুর্শিদী' এবং 'মারফতি' নামে চিহ্নিত করা হয়। দেহতত্ত্বই এসব গানের মূল উপজীব্য বিষয়। তবে এতদঞ্চলের গানে দেহতত্ত্বের সঙ্গে পরকালচিন্তা, জীবনের অসারতা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। সিলেট অঞ্চলে মারফতি গানের সাধক এবং রচয়িতাদের মধ্যে হাছন রাজা, শীতলাংশ শাহ, আরকুম শাহ, কুরবীন শাহ অন্যতম। 'মুর্শিদীগান' বস্তুত, মারফতি গানেরই আর একটি ধারা। সিলেট অঞ্চলে 'মারফতি' লোকধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হাছন রাজা। উভয় প্রকার গানেই মুর্শিদতত্ত্ব গুরুত্ব পেয়েছে। বাউলগানেও মারফতি এবং মুর্শিদী তত্ত্বের পরিচয় রয়েছে। এসব গানে দেহতত্ত্বের উল্লেখ দেখা গেলেও বাউলগানের দেহতত্ত্বের যে একটি সাধনভিত্তিক পরিচয় আছে, মারফতি এবং মুর্শিদী গানে অনেকাংশে তা নেই।

মারফতি ও মুর্শিদী গান অতিমাত্রায় ধর্মনির্ভর, কিন্তু বাউলগানে ধর্মের চেয়ে জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এসব গানে সুফিসাধনার কথা যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি হিন্দু যোগসাধনার বিষয়ও অনুল্লেখিত থাকেনি। সুফি পরিভাষার সঙ্গে যোগসাধনার বিভিন্ন পরিভাষারও সার্থক ব্যবহার ঘটেছে এসব গানে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বাংলা লোকসংগীতের অধিকাংশ রচয়িতা মুসলমান। তারাই নানা গানের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় পিপাসা নিবৃত্ত করেছে। মুসলমান রচয়িতা এবং গায়ক নির্দ্বিধায় হিন্দু দেবদেবীর গুণকীর্তন যেমন করেছে, তেমনি পীর-দরবেশদের প্রতি তাদের আনুগত্য কোনো অংশে কম ছিল না। বস্তুত, এইসব লোকসংগীত প্রকৃতপক্ষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক সফল প্রকাশ।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে এদেশে মূল ধর্মের, বিশেষ করে হিন্দুধর্মের অর্থাৎ বৈদিক যুগের পূর্বে তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য ধর্মের অস্তিত্ব ছিল।[১৩] আর্য-পূর্বকালে অনার্য নামে কথিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এসব ধর্মের প্রভাব ছিল। এদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তাগণ ছিলেন আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত। আর্য সম্প্রদায় বহিরাগত হিসেবে অনার্য নামে চিহ্নিত তৎকালীন ভারতবর্ষের আদিবাসীদের পরাজিত করে বিজিত জনগোষ্ঠীর উপর বৈদিক ধর্ম চাপিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে তা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়।[১৪]

এদেশের বিজিত অনার্য জনগোষ্ঠীকে শূদ্র নামে চিহ্নিত করে তাদেরকে 'দাসে' পরিণত করা হয়। এই সময় প্রাথমিকভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ডের সুবিধার জন্য যে স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি করা হয়েছিল তা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।[১৫] ক্রমানুসারে এরা

ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সর্বশেষ শূদ্র। পরবর্তীকালে এই স্তরবিন্যাস কঠোরতর রূপ পরিগ্রহ করে বর্ণভেদ বা জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়। সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের হাতেই সমাজগঠনের দায়িত্ব এসে পড়ে।

কিন্তু পরবর্তীকালে আর্য প্রবর্তিত এই বৈদিক বা হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ এবং অন্যদের মধ্যে অনাচার প্রবিষ্ট হওয়ায় বুদ্ধদেব এই বৈদিক ধর্মকে সংস্কার এবং অধিকতর গণমুখী করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজস্ব মতবাদ বৌদ্ধধর্ম নামে সমাজে প্রচার করলেন।[১৬] কিন্তু ব্রাহ্মণদের যে আধিপত্য সমাজে অনাচারের পথকে সুগম করে তুলেছিল, বৌদ্ধধর্ম তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। কালক্রমে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মে অনাচার এবং দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করলে মূল ধর্মের পাশাপাশি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠী বা লোকধর্মের বিকাশ ঘটে।[১৭]

এসব লোকধর্মের অনুসারীগণ অনার্য হওয়ার ফলে তারা তন্ত্র এবং যোগসাধনাকে তাদের সাধন-ভজনে সম্পৃক্ত করে ফেলে।[১৮] ফলে তাদের সাধনায় দেহবাদ প্রাধান্য পায় এবং এসব সাধনাকে তারা গুপ্ত এবং কেবল দীক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে।

এসব লোকধর্ম বা ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো কোনো সাধন-ভজন সম্প্রদায় সংগীতকে সাধন-ভজনের উপজীব্য বিষয় বলে গণ্য করেছিল। এখানে বলা অসংগত হবে না যে এই লোকধর্মভিত্তিক সাধনসংগীতই বাংলাদেশের লোকসংগীতের আদিতম প্রকাশ।[১৯] 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় বা 'বৌদ্ধগান ও দোহা' বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এ যাবৎকাল আবিষ্কৃত তথ্যের আদিতম রূপের পরিচয় শুধু বহন করে না, বরং এদেশের মাটি ও মানুষের লোকধর্মনির্ভর গণমুখী লোকসংগীতের সার্থক প্রকাশ বলেও তা চিহ্নিত।

বলেছি, বৌদ্ধ আমলে সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতির কারণে নানা লোকধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন : কালচক্রযান, হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি। চর্যাগীতিকায় তৎকালীন সমাজজীবন এবং তার অবক্ষয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বলা যেতে পারে, চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যগণ তৎকালীন সময়ে প্রথম বিদ্রোহী। অবশ্য তাদের প্রবর্তিত লোকধর্মেও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়নি। এসব ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীতে দেহবাদী সাধনা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা সমাজজীবনকে কলুষিত করে তুলেছিল। পারস্যে শিয়া প্রবর্তিত সুফিসাধনার উদ্ভবও একটি প্রতিবাদী মনোভঙ্গি এবং তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে উমাইয়া-আব্বাসিয়া বিদ্রোহ হিসেবে গড়ে ওঠে। উমাইয়া-আব্বাসীয় শাসনামলে শিয়া সম্প্রদায় নানাভাবে অত্যাচারিত হয়।[২০]

শিয়া এবং সুফি সম্প্রদায়ের উদ্ভব প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।[২১] শিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টিমূলে কেউ কেউ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং প্রাক-ইসলাম পূর্ব ইরানীয় ভাবধারা ছিল বলে ধারণা করেন। এরা শিয়া ভাবধারায় খ্রিস্টানদের ট্রিনিটি বা একের ভিতর তিন বা ত্রিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করেন।[২২]

সুফি সাধনায়ও নানা অনৈসলামী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তা এই সাধনাকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়।[২৩] অষ্টম শতক কিংবা তার আগে থেকেই ভারতবর্ষে সুফিসাধনার নানা শাখার আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশেও এই সময় তারা আগমন করে। সুফিসাধনার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সামঞ্জস্য থাকায় জনগণ এই লোকধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এই সাধনা বাংলাদেশে এতদঞ্চলের বৌদ্ধ সহজিয়া বৈষ্ণব এবং নাথ ইত্যাদি মতাদর্শের সঙ্গে একটি সমন্বয় সাধন করে এবং এসবের মধ্যে সুফি সাধন-ভজনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।[২৪] পরবর্তীকালে কবীরপন্থী, রজ্জবপন্থী ইত্যাদি লোকধর্মের উদ্ভব হয়।[২৫]

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইসলামে জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্যের কোনো স্থান নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ মুসলিম-অধিকৃত হওয়ার পর এদেশে বিরাজমান জাতিভেদ প্রথার মতো মুসলিমসমাজও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সুফিরা এর বিরোধিতা করে। ফলে সুফি এবং এদেশের ধর্মপীড়িত সাধারণ মানুষের চিন্তাচেতনার সমন্বিত ভাবধারাপুষ্ট লোকধর্মে তার প্রতিফলন ঘটে। কবীর এবং রজ্জবের সাধনসংগীতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।[২৬]

কিন্তু সব লোকধর্মের উৎপত্তি যে প্রতিবাদী মনোভঙ্গি থেকে হয়েছে এমন নয়। অনেকেই মূলধর্ম প্রবর্তিত শাস্ত্রাচার, বিধিনিষেধ অনুসরণে অপারগতার কারণে হৃদয়ে অবস্থিত অতীত বিশ্বাসকে অবলম্বন করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছিল নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠী। এরা মূল ধর্মের প্রবক্তাদের নির্যাতন এড়াতে গিয়ে তাদের সাধনায় গোপনীয়তা অবলম্বন করেছে।[২৭] সুফি প্রচারিত ইসলামের ক্ষেত্রে সুফিসাধকরা এই নব্যদীক্ষিতদের প্রতি তেমন কোনো বিধিনিষেধের গণ্ডি টেনে দেননি। এখানে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত উদারপন্থী। এসব লোকধর্ম বা সাধন-ভজন সম্প্রদায়ে গুরুর স্থান সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে। এসব ধর্মের অনুসারীরা গুরুকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করত। এখানে বলা অসংগত নয় যে এসব লোকধর্মেও গুরুদের ক্ষমতা এবং আধিপত্যের প্রতি লোভ ইত্যাদির কারণে নতুন নতুন লোকধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল। সুফিধর্মের 'পীর' এবং লোকধর্মের গুরু পার্থিব এবং অপার্থিব জীবনে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এমন বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করাতে মৃত্যুর পরেও তাদের নামে 'থান' 'মাজার' বা 'দরগা' গড়ে ওঠে।[২৮] এসব ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুসারীরা আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান বলে মনে হলেও কার্যত তারা মূলধর্মের অনুসারী ছিল না। এদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে এসব গুরু এবং পীর-ফকিরদের জীবিত এবং মৃত উভয় সময়েই পরম আরাধ্য বলে কল্পনা করে থাকে। এদের 'থান' 'দরগা' বা 'মাজার' ইত্যাদি নানা রোগমুক্তি এবং বিপদমুক্তির মূল হিসেবে বিবেচিত হয়।[২৯] এসব স্থানে 'সিন্নি' বা মানৎ করে তারা নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে।

বলেছি, এসব লোকধর্মের উৎপত্তিমূলে নানা প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে। মুসলিমসমাজে জাতিভেদপ্রথার অনুরূপ আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ এবং আরজাল শ্রেণী প্রবর্তিত হয়েছিল।[৩০] আশরাফ শ্রেণীদের মধ্যে ছিল সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান। এদেশে যারা বহিরাগত ছিল তারা এমনি স্তরবিন্যাসে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এরা যখন বৈবাহিক সূত্রে স্থানীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে তখন তাদের সন্তান-সন্ততিরাও এমনিভাবে আশরাফ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আশরাফ ব্যতিরেকে অন্যরা নিম্নশ্রেণীভুক্ত ছিল। তবে এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও নানা স্তরবিন্যাস দেখা যায়, যেমন : আতরাফ—কৃষিজীবী। আজলাফ—জোলা (তন্তুবায়/কারিকর), দরজি, কামার, কুমার, সুতার, তেলী, হাজাম, ধোপা। আরজাল—চামার, ঝাড়ুদার ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হিন্দুদের মতো মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না। মুসলিম সুফি ফকিরেরা মুসলিম রাজন্যবর্গ প্রবর্তিত এই শ্রেণীভেদকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন এবং তাদের অনুসরণে গড়ে-ওঠা এদেশীয় মুসলিম ফকির সমাজ জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।[৩১]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের সমাজেও বিভিন্ন বৃত্তিধারী একে অপরের মধ্যে একটি বিরোধের জাল সৃষ্টি করেছে। যেমন, একজন কৃষি পরিবারের মেয়ের সঙ্গে জোলা (তন্তুবায়/কারিকর) সমাজের বিবাহ হয় না। তেমনি জোলা পরিবারের মেয়েরও কৃষি পরিবারে বিবাহ হয় না। ছেলেদের বেলায়ও ওই একই প্রতিবন্ধকতা। এটাকে অনেকে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ বলে মনে করলেও প্রকৃত অর্থে এই বৈষম্য জাতিগত বা শ্রেণীগত নয়। কৃষি পরিবার এবং জোলা পরিবার বৃত্তি হিসেবে একে অপর থেকে ভিন্ন। কৃষি পরিবারের মেয়ের পক্ষে কারিকর পরিবারের বৃত্তিমূলক কাজ সহজে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। তেমনি কারিকর পরিবারের মেয়ে যে ধরনের কাজে অভ্যস্ত, তার বাইরে অন্য ধরনের কাজ বা শ্রম দেওয়া তার পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ছেলেদের বেলায়ও একই ধরনের অসুবিধা। কিন্তু কালক্রমে এসব অসুবিধার কথা ধামাচাপা পড়ে এখন এই দুই সমাজে বিবাহ ইত্যাদিতে অনেক বিধিনিষেধ দেখা দিয়েছে।[৩২]

এখানে বলা অসংগত নয় যে, লোকধর্মে জাতিভেদপ্রথার বিরোধিতা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এসব লোকধর্মেও বিভিন্ন গুরুর নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা কোনো শাস্ত্রাচার না মানলেও নিজেদের মধ্যে সাধন-ভজন অনুযায়ী বেশকিছু আচার-আচরণ অনুসরণ করে থাকে। এদের সাধনায় কিছু কিছু ভিন্নতা আছে এবং এরা তাদের গুরুদের নামে 'ঘর' বা 'ঘরানা' নির্দিষ্ট করে। কেউ নিজেকে পরিচিত করেছে 'সতী মায়ের ঘর' বলে, কেউ বলেছে 'লালনশাহী' 'পাঞ্জুশাহী' ইত্যাদি। এদের পোশাক-পরিচ্ছদেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কারো পোশাক কালো, কারো শত

তালিযুক্ত পোশাক শাদা অথবা রঙিন। কারো মাথায় পাগড়ি, কারো মাথা মুণ্ডিত, কারো কেশ খোলা, এলায়িত, কারো মাথায় ঝুটি বাঁধা অথবা জটা যুক্ত; কারো কারো চুল ঝুলে পড়েছে স্কন্ধ ছাড়িয়ে। কারো মুখে কেবল গোঁফ শোভা পায়, কারো চুলদাড়িতে সব একাকার। কেউ হাতে পরেছে লোহার বালা, কানে পরেছে লোহার গোলক। কারো সমস্ত শরীরজুড়ে লোহার শৃঙ্খল। মেয়েদের শাড়ি কারো শাদা, কারো বা গেরুয়া রঙের। কাউকে কাউকে একরঙা শাড়িও পরতে দেখেছি। গলায় পুরুষের মতো ছবি বা মালা। কারো চুল ঝুটি বাঁধা। তবে অধিকাংশেরই খোলা কেশ। কখনও কখনও দেখা যায় দু-একজন মহিলা লোহার বালা পরিহিতা। এসব লোকধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যারা সংগীতাশ্রয়ী তাদের হাতে একতারা, খমক, ডুগী, দোতারা বা জুড়ি কিংবা প্রেম-জুড়ি। প্রত্যেকের সাথেই দু-চারজন নারী-সঙ্গিনী যারা 'সেবাদাসী' নামে পরিচিত। এরা বিবাহ করে না-কণ্ঠি বদল করে। এদের মধ্যে যেটুকু মিল তা হলো, এরা সকলে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সাধুসেবায় অংশগ্রহণ করে। অন্নভোজনে কোনো বাধা নেই। এদেরকে প্রায়শ গাঁজা খেতে দেখা যায়। এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এরা একই সাথে গান পরিবেশন করে। এদের সঙ্গিনী বদলেও কোনো বাধা নেই। এদের মাঝে যারা হিন্দু তারা বৈষ্ণবপন্থী হলেও সুফিসাধকদেরকে তারা গুরু বলে মান্য করে। যারা সুফি ফকির তারাও বৈষ্ণব সাধকদের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। এসব সম্প্রদায়ের গুরুদের 'মাজার' 'দরগা'য় 'সাধুসেবা' নামে গুরুর জন্ম-মৃত্যুদিন অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে সব শ্রেণীর এবং যে-কোনো ধর্ম-অনুসারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায়। এই সাধুসেবা 'ওরশ' নামেও অভিহিত।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল বা উত্তরাঞ্চলেও নানা লোকধর্মের উদ্ভবের কথা জানা যায়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে যেসব লোকধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের লোকধর্মের বৈশিষ্ট্যগত নানা পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে নদ-নদীর সমারোহ নেই, আছে দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর। এখানে তপ্ত রোদের প্রভাবে মাঠ-প্রান্তরে আপাত-কাঠিন্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকৃতির বুকে নেমে আসে এক রহস্যময়তা। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই যেন হয়ে ওঠে উদাসীন। এখানে আকাশে মেঘের প্রাবল্য নেই, তাই মেঘের প্রতি আকর্ষণ আছে প্রচুর। সামান্য বৃষ্টিপাতেই ভূমির উপরিভাগ সিক্ত হয়ে ওঠে না। এই প্রকৃতিকে লক্ষ করে হুমায়ুন কবির বলেন :

> পশ্চিম বাংলার প্রকৃতি তাই বাঙালীর কবি-সুনামকে যে রূপ দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। অনির্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর যেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।[৩৩]

এখানে তাই বৈষ্ণব পদাবলী এবং বাউলগানের সৃষ্টি হয়েছে এবং এদের উভয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুফি ধ্যানধারণা। এখানে জীবনকে জানবার তীব্র বাসনা রয়েছে

ঠিকই, কিন্তু তা অতৃপ্তিতে নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। এখানে দৈহিক সম্ভোগের মধ্যে সে তৃপ্ত হতে পারেনি। রাধার আকুলতা তাকে ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছে দয়িতের সন্ধানে। তার অন্তরে থেকেও সে ধরা দেয়নি। এখানে যে অধ্যাত্মবোধের জন্ম হয়েছে তা শাস্ত্রগত সংশয়ে আবদ্ধ নয়—এ অধ্যাত্মবোধ একান্তই লৌকিক। দয়িতকে পরিপূর্ণভাবে না পাওয়ায় তার অন্তরের অতৃপ্তি তাকে জীবনের প্রতি উদাসীন করে তুলেছে।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। সেখানে নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত তাকে জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ এনে দিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে যে রুক্ষতা, এখানে তা আর নেই। এখানে বন্যা আছে, আছে সামুদ্রিক ঝড়। ভেসে যাবার ভয়। কিন্তু এর মধ্যেই সে জীবনকে ভালোবেসেছে। এখানে একদিকে আছে ধ্বংস, অপরদিকে সৃষ্টি। হুমায়ন কবির এ সম্পর্কে তাই বলেন, 'চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত হৃদয়কে সেখানে স্পর্শ করে। কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি। প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?'[৩৪] তবে এই প্রকৃতি যে তাকে ভাবুক করে তোলেনি, তা নয়। কিন্তু তাকে উদাসীন করে তোলেনি। এখানে নিত্যদিন জীবনের চাঞ্চল্য জীবনকে নানা সাজে সাজিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে ভালোবাসার পাত্রকে নিয়ে যে বিরহবোধ নিয়ত জাগ্রত থাকে, পূর্বাঞ্চলে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার একটি স্বপ্ন গভীরভাবে অন্তরকে সর্বক্ষণ নাড়া দেয়। এ কারণেই এখানে লোকধর্মে বৈচিত্র্য আছে, যার প্রতিফলন ঘটে তার সাহিত্যে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এমনি ভাবনার সার্থক প্রকাশ। এখানে বাস্তব প্রেমের স্বরূপ, তার নিবিড়তা এবং তীব্রতা গভীরভাবে রেখাপাত করে ঠিকই কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের লোকমানসে দয়িতকে না-পাওয়ার বেদনা আরও তীব্রতর হয়ে ফুটে ওঠে।

পশ্চিমাঞ্চলে সৃষ্ট লোকধর্মআশ্রিত সংগীত ও সাহিত্যে আমরা তাই এক লোকাতীত জীবনের প্রতি মানবহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। এখানে সব লোকধর্মই একপ্রকার উদাসীনতার জন্ম দিয়েছে। কর্তাভজা, সাহেবধনী, বৈষ্ণব পদাবলী এবং বাউলদের গানের মধ্যে এই গভীর সংযোগকে সহজেই লক্ষ করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিজয় সরকার (নড়াইল), এবং চারণকবি মুকুন্দদাস (বরিশাল), কুমিল্লা অঞ্চলের রমেশ শীল সম্প্রতি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাদের গানে দেহতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা লৌকিক অধ্যাত্ম নির্দেশক। এখানেই বাউলদের সঙ্গে এসব গানের বেশ মিল লক্ষ করা যায়।

লোকধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিত

কর্তাভজা

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কর্তাভজা সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। আউলচাঁদ নামক একজন মুসলমান ফকির এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। লোকশ্রুতি আছে যে আউলচাঁদ ফকির ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১১০১ সাল) পশ্চিমবঙ্গের বারাকপুর মহকুমার ঘোষপাড়া গ্রামে আগমন করেন এবং সেখানে জনৈক সদগোপ রামশরণ পালের বাড়িতে বসবাস করেন। এখানেই তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু এবং ২২ জন ব্যক্তিকে শিষ্য করেন। অতঃপর তিনি রামশরণ পালকে প্রধান গুরু (কর্তাভজা) করে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এর কিছুদিনের মধ্যে তিনি এই গ্রাম ত্যাগ করে চলে যান এবং কেউই তাঁর কোনো খোঁজ পায় না।

Bengal District Gazetteers (Nadia)[৩৫]-তে এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিম্নরূপ বিবরণ আছে :

> The Karthabhaja sect was founded about the middle of the 18th century, and took its origin at the village of Ghoshpara in the Chakhdah thana. The name of the founder was Ram Saran Pal, who was by birth a Sadgop and by profession a Cultivator, With him was associated a religious mendicant who was known as Fakir Thakur. A local legend relates how, while Ram Saran was tending his flock. Fakir thakur suddenly appeared before him and asked for a cup of milk. While he was drinking it, a messenger came up and said that Ram Saran's wife had been taken seriously ill and was at the point of death. Fakir Thakur offered to go there and cure her, and taking some mud from the nearest tank, he anointed the body of

> the dying woman with it and restored her instantly to full health and strength. He then said that he must himself be born of the woman whose life he had saved and miraculously disappearing, was in due time born as Ram Saran's son and received the name of Ram Dulal...
>
> According to another account, Ram Saran was born near Chakhdah; he caused dissensions in his family owing to the fact that he gave himself up entirely to religious exercises and neglected temporal affairs; not caring to remain with his family under such circumstances. He left them and went to Ghoshpara, where he found favour with one of the leading residents, and was allowed to settle there and marry the daughter of one Govinda Ghosh. Not long after his marriage he was visited by a strange Fakir, who informed him that he had just been beaten by some soldiers of the Nawab of Bengal and had to make his escape by miraculous means; he had in his hand a small vessel and he said that he had gathered the water of the Ganges in it, in order that he might pass over dry shod. Ram Saran comforted him, and before he took his departure pursuaded him to leave behind the miraculous vessel which is still preserved as a valuable relic in the family of Babu Gopal Krishna Pal. The Fakir settled in his own village in hte Bongaon sub division. and established a band of Fakirs. who performed many miracles and propagated many tenets of the new faith over all the districts of the Presidency Division. 'Ram Saran Pal is believed to have died in the year 1783, and his place as head of the sect was taken by his son Ram Dulal or Dulal Chand... the Census of 1901 furnishes no reliable indication as to the number of the sect. A great majority imbued this religion as Hidnu or Mahomedan as the case might be, but in the returns it was not differentiated.

উইল্‌সন, এইচ তাঁর *Hindu Religions or An Account of the Various Religious sects of India*[৩৬] গ্রন্থে কর্তাভজা সম্পর্কে বলেন :

> Kartahbajas... are a sect of very modern origin, having been founded no longer than thirty years ago by Ram Sundar Pal, a Gawla, an inhabitant of Ghoshpara, a village near sukh-sagar in Bengal, The chief popularity of this sect is the doctrine of the absolute divinity of the guru, at least being the present Krishna or deity incarnate, and whom they, therefore, relinquishing every other form of worship, venerate as their Ista Devata or elected God... the innovation is nothing, in fact, but an artful encroachment upon the authority of the old hereditory teachers or Gossains, and an attempt to invest a new friends with spiritual power; the attempt has been so far successful that it gave affluence and celebrity to the founder to which, as well as his father's sanctity, the son, Ram Dulal Pal has succeded. It is said to have numerous disciples, the greater portion of whom are women. The distinction of caste is not acknowledged amongst the follwers of the sect.... they eat together.... once or twice a year. The initiating Mantra is supposed to be highly efficacous in removing disease and barrenness, and hence many infirm persons and childless woman are inducted to join this sect.

Pramatha Nath Bose[৩৭] এই সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন :

> This sect was founded about the beginning of this century by an ascetic named. Aule Chand. Tradition has it, that he was picked up in a field by one Mahadeva of the Barui caste in the village of Ula in the district of Nadiya. Aule Chand is said to have then been about eight years old. After living in Mahadev's house for about twelve years. he left it to travel and preach in various parts of Bengal. When he was about twenty seven years

> of age he had twenty two disciples, all belonging to low castes. Among these disciples was Ram Saran Pal of the Sadgopa caste, an inhabitant of Ghoshpara near Naihati.
>
> There is a tradition that, while tending his flock, a religious mendicant suddenly appeared before Ram Saran and asked for a drink of milk. Just as the holy man had finished his drink, a man came running to say that Ram Saran's wife had fallen seriously ill. The mendicant told Ram Saran to take a jar of water from a tank close by and sprinkle it over his wife. In his haste Ram Saran split the water and returned to the mendicant for his advice. The holy man took a handful of mud from the place where the water had fallen, anointed Ram Saran's wife. Satima, with it, and immediately cured her. The holy man is said to have vanished soon after, and been born again as Ram Saran's son named Ram Dulal.
>
> Satima on her death was buried under a pomegranate tree near Ram Saran's house. A handful of dust from the foot of this tree is believed by the Kartabhajas "to cure any disease and cleanse from any sin." Groups may be seen. prostrate and fasting for days. The tank called Himsagar, the water to which was recommended by Ram Saran's holy visitor for the cure of his wife, is still supposed to possess miraculous healing powers. 'The blind, the dumb, and the lame crowd the stairs of the holy tank, and joyfully submit to and blows in order to plunge within its water.
>
> The chief religious festivals of the Kartabhajas are the 'Dol' and 'Rasjatra' which are celebrated at Ghoshpara, the former in March or April, and the latter in October or November. Forty to fifty thousand people are said to assemble at each festival. At these festivals Mahomedans and Hindus of all castes eat together. The annual contributions of the treasary of the family at Ghoshpara are said to amount to five or six thousand rupees.

To return to Aule Chand, he died in about A.D. 1769 near the village of Chakdah in the district of Nadiya. He is regarded by his followers as an incarnation of Vishnu like Krishna and Chaitanya. Aule made no distinction of caste or creed amongst his followers. He had Hindu as well as Mahomedan followers. He is said to have performed many miracles among which walking over the Ganges was one of the most notable... The Karthabhajas disregard caste distinctions, at least in religious celebrations. The initiating Mantra 'Guru is true' is given after the following conversation between the guru and the neophyte :

Guru : Will you be able to follow this religion?

Neophyte : Yes.

Guru : You shall not lie, steal or commit adultery?

Neophyte : I will not.

Guru : Say "Thou art true, and thine word is true"

Neophyte : "Thou art true, thine word is true".

After the death of Aule Chand, his soul was supposed to have passed with the body of his disciple, Ram Saran Pal who lived towards the close of the last century. He was succeeded on the 'godi' by his wife. The present occupant of the 'godi' is Isvarachandra Pal. He is the Head guru and is called Thakur (god); and though he cames of a low caste even Brahmans and Kayasthas are said to fall down at his feet and eat the remnants of his food.

কর্তাভজাদের সম্পর্কে উপর্যুক্ত বিবরণ ছাড়াও এই সম্প্রদায়ের নানা পুঁথিপুস্তকে এই ধর্মমত সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যই আউল চাঁদ বা ফকির ঠাকুর নামে পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং এই মতবাদ প্রচার করেন।[৩৮] এই ধর্মমতে গুরুই স্রষ্টার অবতার এবং তিনি কর্তা। কর্তাকে সেবা করাই ধর্ম। এজন্য এই ধর্মের অনুসারীদের কর্তাভজা সম্প্রদায় বলা হয়। এরা দেহবাদী এবং গুপ্তসাধন

সম্প্রদায়। বাউলদের মতো কেবল দীক্ষিতরাই এই সাধনার গোপন রহস্য জানে। এদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ নেই। সকলেই নিম্নশ্রেণীভুক্ত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একে অপরের অন্নজল ভক্ষণ করে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোকেরা পুত্রকে পুত্র বা পিতাকে পিতা বলে সম্বোধন করে না। এদের ধারণায় সকলেই একজনের পুত্র এবং গুরুই সকলের পিতা। নিম্নে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একটি সাধন গীতের উদাহরণ দেওয়া হলো :

পর নারী হইবে চেতন
শক্তির মন্ত্রেতে কর শক্তির পূজন ॥

... ...

নারী হিজরে পুরুষ খোজা এইতো লক্ষণ
সাবধানে কর সবে সাধন ভজন ॥

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার কাচরাপাড়ার সন্নিকটে ঘোষপাড়া গ্রামে এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ প্রথম অবস্থায় ২২ জন শিষ্য করেন। বর্তমানে কয়েক সহস্র এই ধর্মের অনুসারী।

রামশরণ পাল প্রথম কর্তাবাবা। রামশরণ পালের মৃত্যুর পর পুত্র দুলাল চাঁদ পরবর্তীকালে কর্তাবাবা হন এবং তিনি 'ভাব গীত' নামে একটি সাধনসংগীতের বই প্রণয়ন করেন। রামশরণ পালের স্ত্রী সতীমা এই ধর্মের অন্যতম গুরু হিসেবে স্বীকৃত। এরা বৈষ্ণব সহজিয়া মতাবলম্বী তবে এদের ধর্মমতে সুফিবাদের প্রভাব আছে।

কর্তাভজাদের কোনো আখড়া বাংলাদেশে নেই। তবে বাউল ফকিরদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবাংলা থেকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনেককে আসতে দেখেছি। বাউলধর্মের অনুসারীদের অনেককেই সতীমায়ের অনুষ্ঠানে গমন করতে দেখেছি। বলা যেতে পারে, এইসব লোকধর্মে একটি সম্মিলিত ধর্মীয় আদর্শ সক্রিয়। উল্লেখ্য, লালন ফকির তাঁর জীবিতকালে কর্তাভজাদের অনুসরণে 'দোল পূর্ণিমা'য় বাৎসরিক অনুষ্ঠান করতেন এবং অদ্যাবধি তা প্রচলিত আছে।

বলরামী

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও পশ্চিম বাংলার নদীয়া এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আঠারো শতকের শেষের দিকে তিনি কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) জন্মগ্রহণ করেন। মেহেরপুর শহরে তার বাড়ি আছে। বলরামের নামানুসারে তাঁর ধর্মের নাম বলরামী, বলরাম ভজা, বা বলরাম হাড়ি সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয়। বলরাম তার ভক্তবৃন্দের নিকট

অবতাররূপে পূজিত। মেহেরপুর শহরতলীতে তাঁর নিজগৃহে একটি মন্দির ও আখড়া আছে। এই মতাবলম্বীরা এতদঞ্চলে বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মূর্তিপূজা করে না। তবে বলরামকে তারা ভগবানরূপে পূজা করে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ নেই।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সোম প্রকাশ'[৩৯] নামে একটি সাময়িকপত্রে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। নিম্নে প্রতিবেদনের উল্লিখিত সম্প্রদায়ের একটি বিবরণ দেওয়া হলো :

> মেহেরপুর ১৩ই ফাল্গুন ১২৬৯ সাল।
>
> মেহেরপুর প্রসিদ্ধ বলরাম হাড়ির জন্মভূমি। উক্ত ব্যক্তি এক নতুন ধর্ম প্রবর্তিত করে। তাহা বলরাম চন্দ্রের ধর্ম বলিয়া বিখ্যাত। এরূপ প্রবাদ আছে যে, উক্ত ব্যক্তি বীরভূম, বর্ধমান, কলকাতা, নদীয়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি অনেক জিলাতে অনেক শিষ্য করিয়া গিয়াছে। প্রায় ৫/৬ বৎসর হইল, বললাম হাড়ি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বলরাম প্রথমে অতি সামান্য লোক ছিল। এই গ্রামের চৌকিদারী করিয়া কদাঞ্চিত জীবিকা নির্বাহ করিত। অনন্তর কোন কারণবশতঃ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে প্রত্যাগমনপূর্বক ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করে। ইহার মৃত্যু বিষয়েও নানারূপ আশ্চর্য্য কথা প্রসিদ্ধ আছে। এই ব্যক্তি মরিবার তিনদিন আগে বলিয়াছিল যে, 'আমি অমুক, এতক্ষণের সময় দেহত্যাগ করিব'। তাহার মৃত শরীর অগ্নিসাৎ বা জলসাৎ বা মৃত্তিকাসাৎ কিছুই করিতে দেয় নাই। উত্তম পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে নদীতীরে স্থাপন করিয়াছিল। এইরূপে শব রক্ষা করিলে তাহার যেরূপ দশা উপস্থিত হয় তাহা সকলেই বিদিত আছে। সম্প্রতি বলরাম হাড়ির উপপত্নি ভিন্নজাতীয়া ব্রহ্মময়ী নাম্নী এক বর্ষিয়সী তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে।
>
> ভৈরব নদীর ধারে এই ধর্মের একটা আখড়া আছে শুনিয়া আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা উক্ত স্ত্রীলোককে ধর্মবিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার উত্তর দ্বারা বোধ হইল যে উহারা বলরামকেই ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে অর্চনা করে। তাহারা পরজন্ম স্বীকার করে এবং এককালে সমুদয় পৃথিবীতেই যে এই ধর্ম ব্যাপ্ত হইবে এমতও আশা করে। কিন্তু ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না। ইহাদিগের ধর্মে চৌর্য্য, লাম্পট্য, মিথ্যাকথন এবং অত্যন্ত বিষয়াসক্তি সাতিশয় পাপ বলিয়া পরিগণিত। এ ধর্ম ভিক্ষাকেই একমাত্র প্রশস্ত ব্যবসা বলিয়া থাকে। ফলতঃ ইহাকে গৌরাঙ্গ ধর্মের প্রকারভেদ বলিলেও বলা যায়। মৃত্যুর পর ইহার শবকে দাহ অথবা মৃত্তিকা সাৎ করে না এবং কোন প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারও অনুষ্ঠান করে না। আর পূর্বোক্ত স্ত্রীলোক আপনাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া ভান করিয়া থাকে।

অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'[৪০] গ্রন্থে (১৮৭০) বলরাম হাড়ি সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ প্রদান করেন :

> বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত করে, এই নিমিত্ত ইহার নাম বলরামী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি। ১২৫৭ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণে অনুমান ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়। বলরাম এই গ্রামের মল্লিকবাবুগিদের বাটীতে চৌকিদারি করিত। তাঁহাদের ভবনে আনন্দবিহারী নামে এক বিগ্রহ আছে, ঐ বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে বাবুরা বলরামকে কিছু শাসন করেন। তাহাতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধানপূর্বক উদাসীন হইয়া যায় এবং এই স্বনাম প্রসিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন।
>
> বলরামের শিষ্যরা তাহাকে শ্রী রামচন্দ্র বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু বলরাম স্বয়ং যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল এমনবোধ হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, সে স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা বলিয়া আভাসে আপনাকে পরিচয় দিত। তাহার শিষ্যেরা কহে বলরাম 'বাচক' ছিলেন এবং সত্য ব্যবহার করিতে বলিতেন, এই নিমিত্ত আমরা তাহাকে পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি। 'বাচক' শব্দের কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বলরাম বাকচতুর ছিলেন এবং সংসারের যাবতীয় ব্যাপার নিগূঢ়ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; এই নিমিত্ত তিনি 'বাচক' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এক দিবস তাহার কোনো কোনো শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল? তিনি উত্তর করিলেন, ক্ষয় হইতে আসিয়াছে। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসিল, 'ক্ষয়' হইতে কিরূপে হইয়াছে? তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'আদিকালে কিছুই ছিল না, আমি আপন শরীরের 'ক্ষয়' করিয়া অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে লইয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। এই নিমিত্ত ইহার নাম ক্ষিতি হইয়াছে। ক্ষয় ক্ষিতি ও ক্ষেত্র সকলই এক পদার্থ। লোকে আমাকে নীচ জাতি হাড়ি বলিয়া জানে; কিন্তু তোমরা যে হাড়ি সচরাচর দেখিতে পাও, আমি সে হাড়ি নই। আমি কৃতকার গড়নদীর হাড়ি অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে, তাহার নাম যেমন ঘরামী; সেইরূপ আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া আমার নাম হাড়ী।...
>
> এ সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত নাই। ইহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ; কেহ কেহ উদাসীন। উদাসীনেরা বিবাহ করে না অথচ ইন্দ্রিয়দোষেও লিপ্ত নহে। গৃহস্থেরা আপন আপন কুলাচার মতে উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই; বিগ্রহ সেবাও দেখিতে পাওয়া যায় না; গুরু নাই বলিলেও হয়। ব্রহ্মমালোনী নামে এক স্ত্রীলোক আছে, বলরাম তাহাকে ভালবাসিত বলিয়া সেই একপ্রকার এক্ষণে গুরুর কার্য্য করিয়া থাকে। বলরামী সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত। এক শাখার লোকেরা বলরামের

মৃত্যুস্থানের উপর একখানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়াছে তথায় সন্ধ্যাকালে প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। দ্বিতীয় শাখার লোকেরা বলরামের এরূপ আজ্ঞা নাই বলিয়া মৃত্যু-স্থানের কোনরূপ গৌরব করে না।

১৮৯৪ সালে প্রমথনাথ বাবু তাঁর গ্রন্থ Hindu Civilization During British rule. Vol.1-এ বলরামীদের সম্পর্কে বলেন :

> The founder of this sect was Balarama Hari (a very low caste) an inhabitant of the village of Meherpur in the district of Nadiya. He died about A.D. 1850, when he was about sixty five years of age. Balarama was a watchman in the employ of the Mullick family at Meherpur. The Mullicks had in their house an idol with gold ornaments which were stolen one night. They chastised Balarama for his negligence. Balarama took the punishment to heart and left home with a view to become an ascetic. He was evidently a man of great natural parts, and gradually succeeded in gathering round him a few disciples who looked upon him as an incarnation of Vishnu.
>
> During the 'Dol' (or Holi) festival, Balarama used to be worshipped by his disciplies. They (Balaramis) ridicule idolatry, and recognise no distinction of caste. On the death of Balaram, his widow, a woman of examplary character and great intelligence, succeeded to the leadership of this sect. She died about twelve years ago. Since her death, there has been a schism in the sect owing to a dispute about the leadership. The numerical strength of the sect is about one thousand consisting exclusively of ignorant people.[৪১]

যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য[৪২] (১৮৯৬) এই সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন :

> This sect was founded about half a century ago by man of the sweeper caste named Balaram Hari. His widow inherited not only his position, but all his powers. I met her in the year 1872... The followers of Bala Hari have no peculiar sect marks or uniform. Some members of the sect are in the habit of begging for food from door to door. They are known not only by the absence of sect marks on their person, but also by their refraining from mentioning the name of any god or goddess at the time of asking for alms.

যোগেন্দ্রনাথ তাঁর বিবরণের একস্থানে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আরও বলেন :

> The most important feature of his cult was the hatred that he taught his followers to entertain towards Brahmans. He was quite illiterate but he had a power of inventing puns by which he could astonish his audience whenever he talked or debated.

নিম্নে বলরামী সম্প্রদায়ের কয়েকটি গানের অংশবিশেষ দেওয়া হলো :

১

হাড়িরাম তত্ত্ব কি সবাই জানে।
রামের গুণের কথা শোনো গো কানে
মলয় পর্বত বিনে
চন্দন হয় কি অন্য বনে
প্রেমের প্রেমিক যারা
জানে তারা
তারাই আছে আরাধনে।

২

মন কেন তুই বেঁহুশ হলি।
কেন মিথ্যা কাজে মরতে গেলি
ধর্মতলায় গিয়ে তলিয়ে কেন না বুঝিলি
তোর বক্ষে বইছে চক্ষের ধারা
কার কাছে এ শিক্ষা নিলি
করতে গেলি সাধুসঙ্গ সে সঙ্গ তুই ভঙ্গ দিলি।
আপন মাতৃধনে লুব্ধ হয়ে পিতৃধন সব খুয়াইলি।

ভগবানী

ভগবানী সম্প্রদায়ও একটি সহজিয়া সম্প্রদায়। বাংলাদেশের যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া এবং পাবনা অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা বসবাস করে। এই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত 'ভগবানী' নামকরণের হেতু নিম্নরূপ।

আদিতে 'ভগ' নামে জনৈক দেবতা ছিলেন। ঐশ্বর্য বিতরণই ছিল সেই দেবতার বৈশিষ্ট্য। এই ঐশ্বর্য ষড়ৈশ্বর্য বাচক। কিন্তু পরবর্তীকালে সহজিয়া প্রভাবে স্ত্রী জননাঙ্গ এই ষড়ৈশ্বর্যের প্রতীকরূপে গণ্য হয়। ভগবানী সম্প্রদায় স্ত্রী জননাঙ্গকেই পার্থিব ঐশ্বর্যের উৎস বলে মনে করে। এই মনোভঙ্গি তান্ত্রিকভাবাপন্ন। 'স্ত্রী ভগংপূজানাধার' এই ধরনের বহুশব্দ তন্ত্রে পাওয়া যায়। এই সাধনাও মিথুনাত্মক দেহবাদী সাধনা। এরা বর্তমানে গৃহী। যশোর জেলার কেশবপুর থানায় এই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। এরা এই সাধনাকে যুগল সাধনা বলে থাকে। তবে তারা তাদের সাধনার কথা অন্যকে বলে না। এদের কোনো শাস্ত্র নেই, এরা কোনো জাতিভেদ প্রথা মানে না। এরা গুরুবাদী এবং রতিনিরোধ সাধনায় বিশ্বাসী। এরা অধিকাংশ ভিক্ষাজীবী। কিন্তু কারো কারো জমিজমা আছে। সামাজিক কারণে তারা গ্রামে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করে। এরা অসুখ-বিসুখে ডাক্তারের কাছে যায় না। নিজেদের ধর্মীয় মতে চিকিৎসা করে। এরা সতীমাকে তাদের গুরু বলে জানে। এই সম্প্রদায়ের অনুসারী পাবনার হেমায়েতপুরের অনুকূল ঠাকুরকে তাদের অন্যতম গুরু বলে মনে করে। তবে লালন ফকিরের গানও তাদের সাধনার অঙ্গ। ভগবানীরা হিন্দু মুসলমানের মতো নাম রাখে। তবে ধর্মাচরণ ভিন্ন। বিবাহ-আচার প্রকাশ্য নয়। মৃতদেহ কবর দিয়ে থাকে। এরা নিরামিষাশী, তবে মাঝেমধ্যে মাছ খেয়ে থাকে।

সাহেবধনী

সাহেবধনী সম্প্রদায় সহজিয়া মতাবলম্বী। নদীয়া জেলার শালগ্রাম দোগাছিয়াতে সাহেবধনী নামক জনৈক নিম্নশ্রেণীভুক্ত একজন সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সাহেবধনীর শিষ্য। দেশবিভাগের পূর্বে কুষ্টিয়া, যশোর এবং খুলনা অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা বসবাস করত বলে জানা যায়। বর্তমানে এতদঞ্চলে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কোনো অনুসারী দেখা যায় না।

সাহেবধনী সম্পর্কে অক্ষয়কুমার দত্ত[৪৩] (১৮৭০) তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন।

> এরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শালগ্রাম দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে একজন উদাসীন বাস করিত। ঈশ্বর আরাধনা ও পরোপকার সাধনে তাহার বিশেষরূপ অনুরাগ ছিল। বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়া নিবাসী দুঃখীরাম পাল এবং হিন্দু মতাবলম্বী অপর কয়েক ব্যক্তি ও একজন মুসলমান তাহার শিষ্য হয়। ঐ উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নামও সাহেবধনী হইয়াছে। বোধ হয়, ইহারা কর্তাভজা সম্প্রদায়েরই শাখা বিশেষ। যেমন ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূলগুরু

রামশরণ পাল, সেইরূপ ইহাদের মূলগুরু দুঃখী রামপাল। ঐ পালের পুত্র চরণপাল এই সম্প্রদায়ের মত বিশেষরূপে প্রচার করিয়া অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। এই পালেরা গোপ জাতীয়। ইহারা কোন বিগ্রহের উপাসনা করে না, বরং বিগ্রহ ও মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি বিশেষ বিদ্বেষই প্রকাশ করে। ইহাদের উপাসনা স্থানের নাম 'আসন'। ঐ আসন একখানা চৌকিমাত্র। ঐ চৌকিতে পুষ্প, চন্দন ও পুষ্পমালা দেওয়া থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবারে ঐ সম্প্রদায়ী অনেক লোক ঐ আসন স্থানে সমাগত হইয়া পরমার্থ সাধন করে। তথায় তাহারা আপনাদের প্রস্তুত করা পরমান্ন এবং যবনাদি নানাজাতি প্রদত্ত মানসিক ভোগের সামগ্রী 'আসনের' নিকট নিবেদন করিয়া দিয়া নিবেদিত দ্রব্য পরস্পরের মুখে অর্পণ করে। ইহাকেই পরমার্থ সাধন কহে। অধিক রাত্র হইলেই ঐ সকল দ্রব্য সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করে এবং আপনাদের মতানুযায়ী সংগীতাদি করিয়া উপাসনা করে।

ঐ সময়ে অনেক রোগী ঐ স্থানে আগমন করে এবং রোগ মুক্ত হইবার উদ্দেশ্য মানসিক করিয়া যায়। সম্প্রদায় গুরুর বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা যাহারা রোগ হইতে মুক্ত হয়, তাহারা ঐ পূর্বকৃত মানসিক আনিয়া উপস্থিত করে। ইহাতে সম্বৎসরে অনেক অর্থ সংগৃহীত হয় এবং সেই অর্থ দ্বারা চৈত্রমাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে। ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না; কি হিন্দু কি মোসলমান সকল জাতিকেই সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করে। হিন্দুদিগকে 'ক্লীং দীননাত দীন বন্ধু' এবং মোসলমানদিগকে 'দীন দয়াল দীন বন্ধু' এই মন্ত্র উপদেশ দিয়া থাকে।

সাহেবধনী কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তবে বাউল সাধনার সঙ্গে সাহেবধনী সাধকদের মিল রয়েছে। সাহেবধনী এবং বাউলের গান অনেকাংশে একই ধরনের সাধন ধারার ইঙ্গিত বহন করে। এই সম্প্রদায়ের একজন বড় সাধক কুবির গোঁসাই।[৪৪] তাঁর অনেক গান আছে। নিম্নে তাঁর রচিত কিছু পদের নমুনা দেওয়া হলো :

১

মানুষ নিষ্ঠা রতি কর, মন।
তবে রতি ফিরবে, জানতে পারবে
মানুষ কেমন বস্তু ধন ॥
পরমাত্মা পরম ঈশ্বর
তিনি সর্বঘটে স্থিতি বটে
বেদ বিধি অন্তর।
এবার পরমজ্ঞানে ভাব তাঁরে
হবে ভাবলে ভাবের উপার্জন ॥

এই মানুষকে করবে বিশ্বাস
এই মানুষ জানিও সত্য নির্যাস।
এই মানুষ বিনা হবে নাকো
সেই সহজ মানুষের করণ ॥
এই মানুষে আছে সেই মানুষ
তার ভাব অগম্য পরব্রহ্ম পরপুরুষ।
এই মানুষ ধরে যাবি ত'রে
গোঁসাই চরণ বলে কুবির শোন ॥

২

কার এমন সাধ্য আছে
সেই বেদ ছাড়া গুরু কল্পতরু
অসাধ্য করণ তার
গুরুর করণ এমন ধারা
জীয়ন্তে হইবে মরা
অনলে মিশিলে ঘৃত
গলে না এক বিন্দু তার ॥
অন্য ধর্ম না যজিবা
অন্য দেব না পূজিবা
গুরু পরমার্থ সেবা
উত্তম অধর্ম নাই বিচার ॥
গোঁসাই চরণ বলেন কুবির
হতে পার ভাবের ফকির
গুরু হবেন ভবনদীর
পারাপারের কর্ণধার ॥

৩

আছে বারি পয়দা করি শরিক নাইগো তার
কি সুবেদে মহম্মদের নুরে পয়দা এ সংসার
এ সব কিতাবে লিখেছেন সত্য যথার্থ
কই সারদ্বার খোদ নিরঞ্জন নিরাকার।
ভেসেছিলেন বিম্বুভারে
হয়েছেন কুদরতের জোরে
নীরেতে সাকার

আল্লা আলেকেতে আলোকলতা
আলেকে করেন বিহার
লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ
রামকালা কালা কালুল্লা
করবে মন সার।
আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার ॥
আছে যার প্রকাশ্য দিন দীন মহম্মদ দীনের অধীন
যারে মেহের আল্লা আলামিন দোস্ত সে খোদার
আল্লার নামের উপর নামের জারি
কীর্তি ভারি চমৎকার ॥
একহাতে বাজেনা তালি এক সুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে বলাবলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহলাদিনী
মর্ম বোঝা হলো ভার
হর্দ তারিক সেই কারিগর ঘরের মধ্যে বানিয়েছে ঘর
বিরাজ করে আপনি অধর
খোলা নয় দুয়ার
করেন হাওয়া রূপে আসা যাওয়া।
কুবির কয় চরণ ধরে তার ॥

খুশীবিশ্বাসী

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকট ভাগা গ্রাম নিবাসী খুশী বিশ্বাস নামক একজন মুসলমান এই সাধনসম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এরা সহজিয়া মতাবলম্বী, তবে সুফি সাধনাকেও তারা সাধনার বিশেষ অঙ্গ বলে গণ্য করে। হিন্দু মুসলমান উভয়েই এই সম্প্রদায়ের অনুসারী এবং এরা জাতিভেদ মানে না। এরা বামাচারী ও রাগপন্থী। বাংলাদেশের মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় এই সম্প্রদায়ের অনুসারীবৃন্দ একসময় বসবাস করত। সামাজিক চাপে এই সম্প্রদায় পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যায় অথবা তারা অন্য লোকধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে। এই সম্প্রদায়ের রচিত গীত বাউল সংগীতের অনুরূপ। এরা ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করে।

দরবেশ ফকির

বাংলাদেশে দরবেশ ফকির নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী দেখা যায়। এরা নিজেদেরকে সহজিয়া-সুফি ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। তবে শ্রীচৈতন্যকে তারা অবতাররূপে গণ্য করে তার ভজনা করে থাকে। সনাতন গোস্বামী এই ধর্মীয়

গোষ্ঠীর উদ্ভাবক বলে শোনা যায়। সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এই মতের অনুসারী। এরা জাতিভেদ মানে না। রিজলে এদের সম্বন্ধে বলেন :

> When a novice is admitted he receives a Kaupin or loin cloth. a 'Khirka' or gown reaching down to the the ankles, and a cocoanut shell (Kishti) in which he is to collect alms, like the Aghories and some of the Baul sects, he is required to taste various disgusting substances; in order to show his superiority to ordinary prejudices. Darwesh-Faqirs never cut their hair or shave, and instead of washing with water, smear themselves and their clothes with mustared oil. Celebacy is professed but not practised and every akhra or community of ascetics has several women attached to it; ostensively to keep the place in order and cook the food. Never the less they affect great austerity and pretend to be the strictest of the Vaishanva sects. Animal life is never taken and it is deemed sinful to break off the branches or even the leaves of a tree. Before the tombs of the founders, and on receiving a present, a very elaborate obeisance is made by kneeling, touching the ground with the forehead and smearing the chest and face with dust."[৪৫]

কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের আখড়ায় প্রায় প্রতিবছর বার্ষিক ওরশের সময় হিন্দু মুসলমান নামধারী এই দরবেশ ফকিরদের দেখা যায়। তবে এদের সঙ্গে সেবাদাসী নামে নার সংগী থাকে। এরা সন্তানহীন এবং সন্ন্যাস জীবনযাপন করে। এরা ভিক্ষাজীবী। এই দরবেশ ফকিরদের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। মুসলিম প্রভাবিত শাখাগুলির নাম নিম্নরূপ :

১. খলুলিয়া—এরা নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত এবং নরনারীর অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী। এরা নৃত্যকালে পরস্পরকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করাকে বৈধ বলে জ্ঞান করে।

২. হালিয়া—এরা হাতে তালি দেওয়া ও নৃত্য করাকে বৈধ জ্ঞান করে।

৩. আউলিয়াইয়া—এদের মতে বান্দা আউলিয়ার দরজায় উন্নীত হলে শরিয়ত সাধনার কষ্ট থেকে তারা মুক্ত হয়।

৪. শামরানিয়া—এদের মতে পীরের মুরিদ হলে পীরই তাদের মুক্তির উপায় করে দেবেন। এরা তানপুরা ইত্যাদিসহ আমোদপ্রমোদকে বৈধ মনে করে।

৫. হোব্বাবিয়া—এদের মতে বান্দা মোহাব্বতের দরজায় উন্নীত হলে তার শরিয়তের বিধান পালনের আর প্রয়োজন হয় না।

৬. হুরিয়া—এদের মত খলুলিয়া সম্প্রদায়ের অনুরূপ। পর-দার গমন এদের কাছে পাপের বিষয় নয়, এবং এই কাজকে তারা সাধনার অঙ্গ বলে মনে করে।

৭. এবাহিয়া—এরা শরিয়তের বিধান মানে না এবং তোয়াক্কা করে না। এরা পর-দার বা পরকীয়া প্রেমকে সাধনার অঙ্গ বিবেচনা করে। এরা চারিচন্দ্র (মল মূত্র রজঃ বীর্য) পরম পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষণ করে।

৮. মোতাফাসেনিয়া—এদের মতে আল্লাহ্‌র ফকিরদের কোনো কাজকর্ম করতে নেই। ভিক্ষাই এদের একমাত্র জীবিকা।

৯. মোতাজাহিলা—এরা শত তালিযুক্ত বিচিত্র পোশাক পরিধান করে এবং গানবাজনায় রত থাকে। এরা ভিক্ষাজীবী।

এসব বিকৃত সাধনা সম্বলিত লোকধর্মের প্রভাব আমাদের সমাজজীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া'র লেখক মাওলানা রেয়াজউদ্দীন[৪৬] তাঁর গ্রন্থে এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে জনৈক স্বামী দয়ানন্দের লেখা 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এ বর্ণিত হিন্দুমতাবলম্বী বিকৃত সাধকদেরও পরিচয় দিয়েছেন। দয়ানন্দ এই বিকৃত সাধকদের দামমার্গী, চুলিমার্গী, বীজমার্গী এবং অঘোরী নামে চিহ্নিত করেছেন।

দামমার্গী–

> এরা জমি কিংবা তখতির উপর ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ কিংবা গোলাকার প্রস্তুত করত তাহার উপর মদের ঘড়া রাখিয়া মন্ত্র পড়িয়া তাহার পূজা করে এবং একটি গুপ্ত স্থানে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে একটি লোককে উলঙ্গ করতঃ তাহার স্ত্রীলিঙ্গকে পূজে, তারপর যে-কোনো স্ত্রীলোক সেখানে প্রবেশ করিলে সে যদি আপন মা, ভগ্নী, বউ, কন্যাও হয় তাহাকে ধরিতে পারে।

চুলিমার্গী–

> একটি গুপ্ত স্থানে স্ত্রী পুরুষ এবং সকলে মিলিয়া মাংস ভোজন মদ্যপান করে এবং স্ত্রীলোককে উলঙ্গ করতঃ তাহার গুপ্তস্থানের পূজা করে এবং তাহার নাম দুর্গাদেবী বলিয়া রাখে। আবার সকল স্ত্রীলোক একটি পুরুষকে উলঙ্গ করিয়া তাহার লিঙ্গের পূজা করে।

বীজমার্গী–

> স্ত্রী সঙ্গমান্তে নির্গলিত বীর্য পানিতে মিশাইয়া ভক্ষণ করে। দয়ানন্দ উল্লেখ করেন যে, এই ধরনের বিকৃত সাধনাকে উল্লিখিত সম্প্রদায় ধর্ম জ্ঞান করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এইসব লোকধর্মে বাতেনী মুসলিম সুফিসাধনার প্রভাব যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি এইসব ধর্মের প্রবর্তকের নাম ও পরিচয় মুসলমান নামধারী বলে জানা যায়।

কর্তাভজা লোকধর্মে মুসলিম প্রভাব সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তী[৪৭] মন্তব্য করেন :

> কর্তাভজাদের ধর্মতত্ত্বে মুসলিম সংস্কৃতি ও সংসর্গের কয়েকটি স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। যেমন তাদের সাপ্তাহিক সমাবেশ ও মজলিশের দিন শুক্রবার। ঐদিন শিরনি ভোগ হয় এ খবরটুকুও তাৎপর্যপূর্ণ। শুক্রবার দীক্ষাদানের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত। তাঁদের বিশ্বাস শুক্রবার কলিকালের উদ্ভব। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য শুক্রবার ইসলামী মতে মিলন ও সমাবেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট। সতীশচন্দ্র দে তাঁর গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী বইতে বিশেষত, জানিয়েছেন, কর্তাভজাদিগের উৎসবের সময় প্রথমে মুসলমানকে না আহার করাইলে উৎসব অঙ্গহীন হয়। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে দেখেছি বাংলাদেশে ও নদীয়া মুর্শীদাবাদের গ্রামে বহুসংখ্যক কর্তাভজা 'মহাশয়' ও 'বয়াতি' জাতিতে মুসলমান। অথচ তাদের অনেকের নাম মুসলমানের মতই নয়। যেমন একটি নাম পেয়েছি শশিশেখর মণ্ডল। সে চারপুরুষ কর্তাভজাধর্মে আশ্রিত। তাদের পূর্বপুরুষ যে দিনটিতে কর্থাভজা ধর্মাশ্রয় পেয়েছিলেন সেই দিনটির স্মরণে মুর্শিদাবাদ জেলার কুমীরদহ গ্রামে মণ্ডলবাড়ি মহোৎসব হয় আজও। 'সাহেবধনী' লোকধর্মের মূল প্রবর্তক মুসলমান ফকির। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মুসলমান এবং অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য নামীয় নিম্নবর্ণের হিন্দু, সাহেবধনী সম্প্রদায়ে কোন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ যোগ দেয়নি। আগে কর্তাভজা সম্প্রদায়েও উচ্চবর্ণের কাউকে পাওয়া যেত না। এখন দু'একজন উচ্চবর্ণের মানুষকে পাওয়া যায়।

সুধীর চক্রবর্তী মুসলমান প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন :

> সাহেবধনীদের গানে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়বাদের কথা যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে তার একটা কারণ এ ধর্মের উৎপত্তিতে একজন মুসলমান ধর্মের মানুষের সংযোগ ছিল। আর একটা কারণ এ ধর্মের পোষকতা ও পরিবহন করেছে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান যৌথভাবে। সম্ভবত সেই কারণে এ ধর্মের মূল গুরুকে বলা হয় ফকির, তাঁর কাছে থাকে ফকিরি দণ্ড। অগ্রদ্বীপের উৎসবে সাহেবধনীদের মূল ফকির মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসেন। এটা সুফি ধর্মের বিশিষ্টতা।[৪৮]

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কর্তাভজা, সাহেবধনী এবং লালনশাহী মতের উদ্ভব আঠারো শতকের শেষার্ধে। পাঞ্জুশাহী মতও এর কাছাকাছি সময়ে এবং এইসব লোকধর্মের উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে নদীয়া (ভারত) এবং কুষ্টিয়া ও যশোর (বাংলাদেশ)। ব্রিটিশ আমলে কুষ্টিয়া ছিল নদীয়ার একটা মহকুমা। মেহেরপুরে

বলরামী সম্প্রদায়ের উদ্ভব এর অনেক পরে হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে তা গুরুত্বপূর্ণ। এতদঞ্চলে অনেক সুফি ফকিরের বসবাস ছিল। এরা অত্যন্ত উদারপন্থী ছিলেন। কর্তাভজা, সাহেবধমী, লালন, পাঞ্জু শাহের গানের বিষয়বস্তু বা সাধনার ধারা বিশ্লেষণ করলে এসব গান একই মত বা পথের নির্দেশক বলে মনে হয়। তবে কর্তাভজা অপেক্ষা সাহেবধনীর সঙ্গে লালন, পাঞ্জু শাহের গানের সাদৃশ্য অনেকটা আন্তরিক। এ কারণে এসব গান 'বাউল' নামে চিহ্নিত করা হলে অত্যুক্তি হয় না। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গান ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, হাছনরাজার গান, মাইজভাণ্ডারীর গান। ভাওয়াইয়া গানেও দেহতত্ত্বের কথা আছে। কোনো এক সময়ে আদিবাসী রাজবংশীদের মধ্যে এই গানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। রংপুর, দিনাজপুরের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সংগীতের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তবে এই গান কোনো বিশেষ লোকধর্মের সাধন-ভজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

মারফতি-মুর্শিদ্যা গান

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মারফতি ও মুর্শিদ্যা গানের প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ করে সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী অঞ্চলে এই গান গীত হয়। এতদঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সুফিদের আবির্ভাবের কারণে এবং তাঁদের মাজার ইত্যাদিতে 'ওরসের' সময় মারফতি ও মুর্শিদ্যা গান গীত হয়। 'মারিফত' শব্দের অর্থ বস্তুজগৎ বহির্ভূত বুদ্ধির উর্ধ্বস্তরে দিব্যজ্ঞান বা অধ্যাত্মজ্ঞান। এই শব্দটি সুফি-পরিভাষা। মারিফতের অনুসারী ফকিরদের মারফতি ফকির বলা হয়।

সুফিসাধনায় চারটি স্তর : শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফত। মারিফত এই সাধনার সর্বশেষ স্তর। এই পথ একান্তভাবে পীর বা মুর্শিদ নিয়ন্ত্রিত। মারিফতকে গুপ্ত, গূঢ় বা গুহ্য সাধনাও বলা হয়ে থাকে। সে কারণে মুর্শিদ ভিন্ন এই পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। 'মুর্শিদ' শব্দটি আরবি 'ইরশাদ' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ নির্দেশ। যিনি সাধনায় নির্দেশ দিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে 'মুর্শিদ' বলা হয়। সুফিসাধনায় আল্লাহ, রসুল এবং পীরকে মুর্শিদ বলা হয়। এই পীর বা মুর্শিদ আমাদের দেশীয় ভাষায় 'গুরু'। আমাদের দেশে লোকগীতির সর্বত্রে 'মুর্শিদ' এবং 'গুরু' পাশাপাশি বা একত্রেই উচ্চারিত হয়। বলেছি, 'মারিফত' বা 'মারফত' সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের জন্য পীর বা মুর্শিদ একান্ত প্রয়োজন। এসব পীর বা মুর্শিদদের মধ্যে কারো কারো খানকায় 'গজল' বা 'সামা' গাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। কোনো কোনো পীরের অনুসারীদের অনেকেই স্বভাব-কবি ছিলেন। হাছনরাজা, শীতলাং শাহ, আরকুম শাহ সুফি সাধনার অনুসারী ছিলেন এবং তাঁদের কবিপ্রতিভা ছিল। এরা নিজেরাও খান্‌কা নির্মাণ করেছিলেন এবং তাদের এসব খানকায় নিয়মিতভাবে 'মারফত', মুর্শিদ্যা গান গীত হতো। এদের নিজেদেরও অনেক শিষ্য ছিল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে বিভিন্ন লোকগীতিতে 'মুর্শিদ' শব্দ ব্যবহৃত হলেও সব লোকসংগীত 'মুর্শিদ্যা' গান নয়। সাহেবধনী, লালনশাহী, পাঞ্জুশাহীদের গান মারিফত প্রভাবিত হলেও তা মুর্শিদ্যা বা মারফতিগান নয়। 'মারফতি' বা 'মুর্শিদ্যা' গানে দেহতত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও তা বাউল-বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতো প্রত্যক্ষভাবে

যুগল সাধনভজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বাউলদের সাধনা যুগল অর্থাৎ নরনারীর মিথুনাত্মক যোগ সাধনা। 'মারফতি' বা 'মুর্শিদ্যা' গানে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর অনেক উপমা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[৪৯] এমনকি যোগসাধনার 'শতদল' 'সহস্রদল' 'ইড়া' 'পিঙ্গলা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও এসব গানে রয়েছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে এসব মারফতি এবং মুর্শিদ্যা গানের রচয়িতাগণ যোগ এবং তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। ইতিহাস পাঠে[৫০] জানা যায় তুর্কি সুলতানী আমলে মুসলিম সুলতানগণ এদেশীয় তন্ত্র এবং যোগসাধনার অনেক গ্রন্থ আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে 'অমৃতকুণ্ড', 'যোগ কলন্দর' অন্যতম। অনেক সুফিসাধক পাঠান ও মোগল আমলে এদেশের গুহ্য সাধনা সম্পর্কীয় নানা গ্রন্থও রচনা করেন। ফলে বহিরাগত সুফি ও দেশজ গুহ্য সাধনার একটি 'মেলবন্ধন' এ সময় সূচিত হয়। এর ফলে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো 'মাজমাউল বাহরাইন' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে সুফি সাধনা ও দেশজ সাধনার একটি সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হন।[৫১]

হাছন রাজা

সিলেট অঞ্চলে বর্তমানে হাছন রাজার গান সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর নাম হাছন রাজা চৌধুরী।[৫২] 'রজা চৌধুরী' ছিল তাঁর পদবি। তাঁর পূর্বপুরুষ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। হাছন সুনামগঞ্জের একজন জমিদার ছিলেন। তিনি তাঁর নামের পূর্বে দেওয়ান শব্দটি মাঝেমধ্যে ব্যবহার করতেন। তিনি সুফি সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং হাছন উদাস নামে একটি বড় পুঁথি রচনা করে তা প্রকাশ করেন। হাছন রাজা সিলেটের সুনামগঞ্জের অন্তর্গত লক্ষণশ্রী গ্রামে ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিজের গ্রাম সিলেট জেলার সদর মহকুমার রামপাশা গ্রামে। একটি গানে হাছন তাঁর জন্ম ও নিবাসের পরিচয় দিয়েছেন :

হাছন রাজা মরিয়া গেলে
মাটির তলে বাসা
কোথায় রই-বো লক্ষণ ছিরি
রঙ্গের রাম পাশা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাছন রাজা, শীতালং শাহ বা অন্যান্য মারফতিদের গানে একটি উদাসী এবং বৈরাগ্যের সুর লক্ষণীয়। তারা জীবনের অসারত্ব লক্ষ করে শঙ্কিত হয়েছেন। এ ধারণা সুফিভাবনাজাত। সুফিরা সংসারত্যাগী। প্রসংগত বলা যায়, ইসলামের অধ্যাত্মসাধনার দুটি ধারা। এক. সাময়িক নিভৃতচারিতা; যেমন হজরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর নৈকট্য এবং সত্যসাধনায় গিরিগুহায় সাময়িক সময়কালে নিভৃত জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং যেভাবে হজরত মুসা (আ.) ৪০ দিন সংসার থেকে দূরে স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন

থেকেছেন। এই নিভৃতচারিতা সারাজীবনের জন্য নয়। সংসার বা পৃথিবীকে সত্যাদর্শে গড়ে তোলার জন্য সাময়িক সংসার ত্যাগ ছিল এক অর্থে শক্তি বা প্রেরণার উৎস। ইসলামের এই অধ্যাত্মসাধনা সংসারবিমুখিতা বা বৈরাগ্যে স্থিতি লাভের জন্য নয়। দুই. ইসলামের এই অধ্যাত্মসাধনা ক্রিয়াবাদ বা কর্মবাদের উপর গড়ে উঠেছে। অপরদিকে পারস্যের সুফিবাদ বৈরাগ্য বা নিষ্ক্রিয়বাদের জন্ম দিয়েছে যা ইসলামের পরিপন্থী। আল্লাহ সর্বপ্রকার সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য এবং খান্‌কা নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছেন।

ইসলাম শরিয়ত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সামাজিক মূল্যবোধ নির্মাণে বাহ্যিক আচারবিধি প্রবর্তন করেছে। এর ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভ : এক. কলেমা (আল্লাহ রসুলের প্রতি ঈমান), দুই. সালাত (নামাজ), তিন. সিয়াম (রোজা) চার. জাকাত প্রদান, এবং পাঁচ. হজব্রত পালন (যারা সক্ষম)। এই ধারায় জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করা হয়নি বরং তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে জীবন ও জগৎকে আখেরাত বা মৃত্যু পরপারের জগতের জন্য পরীক্ষাস্থল করা হয়েছে।

অপরদিকে সুফিসাধনায় উপর্যুক্ত পাঁচটি বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার কথা বলা হলেও বৈরাগ্যসাধনাকে খোদাপ্রাপ্তিতে সহায়ক বলে উল্লেখ করা হয়। এই সুফিসাধনায় নানা ধর্মের সমন্বয় সাধন করে থাকে। ফলে এই সাধনা একটি মিশ্র সাধনা হিসেবে পরিগণিত হয়। এই সাধনায় পার্থিব জীবন অপেক্ষা অপার্থিব জীবনের প্রতি গুরুত্ব অর্পণ করে। এই সুফিসাধনার একটি শাখা বাতেনী বা ইসমাইলিয়া বলে পরিচিত। এই শাখা গুপ্তসাধনাভিত্তিক এবং কতিপয় দীক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশজ আচার, যেমন তন্ত্র, যোগ ও সাংখ্যের প্রভাব। হাছন রাজা, শীতালং শাহ, আরকুম শাহ বা মাইজভাণ্ডারীর মধ্যে সুফি বৈরাগ্যসাধনার প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি যোগসাধনাকেও তারা অস্বীকার করেননি। ফলে নারীও তাদের সাধনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে বাউলসাধনায় নারীর অবস্থান যত প্রত্যক্ষ, মারিফতি সাধনায় তা তত নয়। বাউলসাধনায় নারী নিত্যসঙ্গী সেবাদাসী। মারিফতে নারী গোপন প্রদেশের অধিবাসিনী।

নিম্নের কয়েকটি গানে উপর্যুক্ত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে :

১

তোমার মরণ কথা স্মরণ হইল না হাছন রজা
মরণ কথা স্মরণ হইল না।
আর মাটির বান্ধা দালান কুঠি প্রেমে বান্ধা হিয়া।
তুমি যে মরিয়া যায়বায় মোরে কারে দিয়া ॥
আর মাটির বান্ধা দালান কুঠি রইবে রে পড়িয়া।
এই দম ছুটিয়া গেলে মাটির তলে বাসা।

আর তিরি পুত্র ভাই বেরাদর রইবেরে দুনিয়া
এইদম ছুটিয়া গেলে সঙ্গে না যাইবা।

২

ওবা মাবুদ আল্লাজী
আমারে ভাসাইলায় আল্লায় ভব সিন্ধুর নীর ॥
ভব সিন্ধুর চাকে পড়ি ঘুরি ঘুরি ফিরি
উঠিবার সাধ্য নাই, কেমনেতে উঠি ॥
কান্দিয়া মিনতি করে হাছন রজা দাসা
পার করিয়া চরণতলে মোরে দাও বাসা ॥

৩

কাকুতি মিনতি করি ডাকিয়া যে তোমারে
দয়াল বন্ধু দয়া নি করিবায় মোরে ॥
দিনে রাইতে আছি তোমার দয়ার কাঙ্গাল অইয়া
এই দয়া করো মোরে, বাঁচাও দেখা দিয়া ॥
হাছন রজার মনের আশা থাকত চরণতলে
ছাড়ব না ছাড়ব না তোমায় কোলে তুলি লইলে ॥

৪

সোনার বউ গো
তোর লাগি হাছন দেওয়ানা ॥
বউ আমার রঙ্গী চঙ্গী
মজাইল সঙ্গীর সঙ্গী
বউর লাগি হাছন রাজায়
ফিরে কান্দি কান্দি,
হাছন রজা, কুমুদ ছাড়ো
এখন তোমায় হুশ করো
পরকে ছাড়ি আপন ধরো
নিজ গুণ গাও ॥

৫

ওবা' হাদি আল্লাজী
ওবা' মুরশিদ আল্লাজী
আমারে ভাসাইলায় আল্লা ভব সিন্ধুর নীর
ভব সিন্দুর চাকে পড়ি

ঘুরি ঘুরি ফিরি
উঠবার সাধ্য নাই কেমনেতে উঠি ॥
হাছন রজায় বলে
মুরশিদ করো তার উপায়
ভবসিন্ধু উদ্ধারিয়া রাখো রাঙ্গা পায় ॥

৬

মায়া নদী কার জোরে তরি
বা দয়াল নবীজী
মায়ে বাপে বাড়াইয়া দিলা
উস্তাদ প্রাণের ধন।
উস্তাদ বাড়াইয়া দিলা
মুরশিদ প্রাণের ধন ॥
মায়ের চারি বাপের চারি,
আল্লার দেওয়া দশ।
আঠারো মুকামের মাঝে
ফিরে মায়া রস ॥
হাছন হইলা মক্কার খাদিম
হুছনা বড় পীর
জহুদের লাগিয়া তাইন
আগে দিলা ছির।

৭

হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো
মাইয়ার দেশে গো।
হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো
আর পুষ্কাভিতে ধন লইয়া
মাইয়ার বেপার করে।
মিছিমিছি পুরুষ লোকে
বেগার খাটি মরে গো ॥
আর পুষ্কাভিতে নাইরে জল
কি করবো তার সোতে।
যে মাইয়ার পুরুষ নাই।
কি করবো তার রূপে গো ॥
আর আসমানেতে উঠে চান্দ

সঙ্গে লইয়া তেরা
এক চান্দ সুরুয বিহনে
দুনিয়া অন্ধেরা গো ॥
আর উড়িয়া যায়রে সুয়া পক্ষী
গাইয়া যায়রে গান
সেই গান রুচিয়া দিছইন
হাছন রজা বইয়া গো ॥

৮

আজব লীলা রঙ্গের খেলা
মিছা ভবের কারখানা
মনরে, ও তুমি রঙ্গে মজিয়ো না ॥
রঙ্গপুর বন্ধুয়ার বাড়ী
দিলালপুর তার কারখানা।
গেল দিন তো লওরে পন্থ
করো কি সার ভাবনা ॥
মনরে, রসে রঙ্গে তোদের সঙ্গে
রিপু ছয় জনা।
ভবের কূলে মায়া জালে
জঞ্জালে আর ঠেকিয়োনা ॥
মনরে, অধম হাছনে বলইন
মুরশিদ পন্থের পাই না ঠিকানা।
আনো ছুরি, কপাল চিরি
বিধাতায় কি লেখিলা ॥

৯

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন
কর্ণ হইতে পয়দা হইছে মুসলমানী দীন।
শরীলে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম
নাকেতে করিল পয়দা খুশবয় বদ রয়।
আমি হইতে সর্ব উৎপত্তি, হাছন রজা কয়
মরণ জীবন নাইরে আমার ভাবিয়া দেখরে ভাই
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি, এই দেখতে পাই।

জিহ্বা বানাইয়াছে মিঠা আর তিতা
জীবের মরণ নাইরে দেখ সর্বদাই জীতা ॥
আপন চিনিয়ে দেখ, খোদা চিনা যায়
হাছন রজা আপন চিনিয়ে এই গান গায়।

১০

খাকের পিঞ্জিরার মাঝে সুয়া বন্দী করছে
কান্দে হাছন রাজার মন ময়নায় রে ॥
হাছন রাজা জানত যদি বাঁচব কত দিন
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রঙ্গীন রে ॥
হাছন রাজা মরিয়া গেলে মাটির তলে বাসা
কোথায় রই-বো লক্ষণ ছিরি রঙ্গের রাম পাশা ॥

শীতালং শাহ

মারফতি গানের অপর একজন নামী রচয়িতা এবং সাধকের নাম শীতালং শাহ।[৫৩] তাঁর বাড়িও সিলেট জেলার করিমগঞ্জের চারঘাট পরগণার শ্রীগৌরী গ্রামে। বাংলা ১২৯৬ সালে ১৭ অগ্রহায়ণ শীতালং শাহ চারঘাট পরগণার বারঠাকুরী গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি লালন ফকিরের সমসাময়িক ছিলেন এবং লালনের মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আনুমানিক ৯০-৯৫ বছর হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। তাঁর আসল নাম ছিল মোহাম্মদ সলিম। শীতালং শাহ নাম তাঁর স্বপ্রদত্ত। তিনি সুফিসাধক ছিলেন এবং তাঁর লিখিত প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী অসংখ্য গান ও কবিতার একটি খাতা পাওয়া যায়। শীতালং শাহের গানের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

যন্তর দরখ্তে বাজে
বৃক্ষ তুবা হয়ে যন্তর দরখতে বাজে
ডালে ডালে তালে তালে সুরে সুরে পত্র এ
যন্তর দরখ্তে বাজে ॥
বৃক্ষ তুবা গানে গায়ে পবনের সঙ্গে
তালে তেতাল তেতালে তাল, তালে রংগা রংগে
যন্তর দরখ্তে বাজে ॥

আরকুম শাহ

আরকুম শাহ[৫৪] সিলেট জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ফকির। হাজার হাজার লোক তাঁর মুরিদ এবং শিষ্য। তাঁর গুরু ছিলেন আব্দুল লতিফ শাহ্। একটি গানে আরকুম উল্লেখ করেন :

হযরত শাহ আব্দুল লতিফ নিজের বেসাত দিয়া
পাগল আরকুমের নৌকা দিয়াছইন ভাসাইয়া।

আরকুম শাহ অনেক গান রচনা করেছেন। তাঁর একটি গ্রন্থের নাম 'হকিকতে সিতারা'। এই গ্রন্থে ৯৪টি গান রয়েছে। গ্রন্থটি বাংলা ১৩৪৭ সালে সিলেটের ইসলামিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত। তার অপর গ্রন্থের নাম : 'কবিনামা'। একই স্থান থেকে মুদ্রিত।

জগন্মোহনী

এই লোকধর্ম রামানন্দ প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের একটি শাখা বিশেষ। সিলেট জেলার মাছুলিয়া, জলসুখা, বিথঙ্গল ইত্যাদি অঞ্চলে এই লোকধর্মের উদ্ভব ও বিস্তার লাভ ঘটে। ঢাকার ফরিদাবাদ অঞ্চলেও এই লোকধর্মের একসময়ে আখড়া ছিল।

ষোড়শ শতকে সিলেট জেলায় জগন্মোহনী ধর্মের প্রবর্তক জগমোহনের জন্ম। তিনি বাল্যকাল থেকেই ভাবুক প্রকৃতি এবং সাংসারিক কাজকর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। অতঃপর রামানন্দের ধারা অনুসারীরা জনৈক মুরারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। জগমোহনের জন্মসংক্রান্ত বিষয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে চন্দ্রদ্বীপে জগমোহনের জন্ম। জগমোহন এই লোকধর্মের প্রবর্তক বিধায় এই ধর্মশাখাকে জগন্মোহিনী নামে অভিহিত করা হয়। এই ধর্মের অনুসারী মূর্তিপূজা করে না ও কোনো বিগ্রহ মানে না। তবে এরা গুরুবাদী এবং ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এই ধর্মের অনুসারীরা সংগীতাশ্রয়ী। এদের গান 'নির্বাণ সংগীত' নামে পরিচিত। জগমোহনের মৃত্যুর বেশকিছু পরে রামকৃষ্ণ নামে একজন সাধক এই ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন বলে জানা যায়।

১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মাছুলিয়ার শান্ত গোঁসাই-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে মাঘীপূর্ণিমাতে রামকৃষ্ণ পরলোকগমন করেন। রামকৃষ্ণ বিথঙ্গল নামক স্থানে তাঁর আখড়া নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর সাধনবলে প্রচুর অনুসারী সৃষ্টি করেন। জানা যায়, তিনি জলদস্যুদেরকেও সুপথে ফিরিয়ে আনেন। নিম্নশ্রেণীর জেলে সম্প্রদায় ও অন্যরা এই মতের অনুসারী ছিল। রামকৃষ্ণ অনেক বিপন্ন ও দুর্গত জেলেকে রক্ষা করেন ও তাদেরকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করেন। জগন্মোহিনী সম্প্রদায়ের কবীরদাস ও লাবণী দাস সাধক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই মতাবলম্বী ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরে ভোলা শাহ নামে একজন মুসলমান এই মতে খ্যাতি অর্জন করেন বলে জানা যায়। জগন্মোহিনী সাধনপথের সঙ্গে বাউলসাধনার মিল আছে বলে বিশিষ্ট পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন[৫৫] মন্তব্য করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সিলেটের রফিনগরের ভোলা শাহ এবং করনসীর মতির গ্রামে রমজান মণ্ডল সুরমা নদী তীরে কানাইঘাটে রাখাল শাহকে জগন্মোহিনী ও বাউল মতাবলম্বী বলে উল্লেখ করেছেন।

মাইজভাণ্ডারী

মাইজভাণ্ডারী একটি বিশেষ লোকধর্ম হিসেবে সম্প্রতিকালে বাউল সম্প্রদায়ের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই লোকধর্মের অনুসারীগণ নিজেদেরকে সুফিসাধক হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক গাওসুল আজম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদউল্লাহ মাইজভাণ্ডারী। মাইজভাণ্ডারী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বলে তাঁর প্রবর্তিত এই লোকধর্ম মাইজভাণ্ডারী নামে খ্যাত। আহমদউল্লাহর পিতার নাম সৈয়দ মতিউল্লাহ। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত আজিমনগর থেকে মাইজভাণ্ডার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই গ্রামে ১৮২৬ সালে, বাংলা ১২৩৩ সালের ১ মাঘ, সুফি আহমদউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইরানীয় সুফিসাধকদের সংস্পর্শে এসে অধ্যাত্মসাধনায় পারঙ্গম হন এবং চিশতী ফকিরদের 'সামা' অবলম্বনে গান রচনা করেন। অতঃপর তাঁর অনুসারীগণের অনেকে তাঁর চিন্তাভাবনাকেন্দ্রিক গান রচনা করেন যা তাঁর শিষ্যদের ধর্মীয় সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাধিক সুফি প্রভাবিত অঞ্চল। অষ্টম-নবম শতক থেকে ইরানীয় সুফিরা চট্টগ্রামে আসেন এবং তাঁরা ব্যাপকহারে 'সামা' সংগীতের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করেন। ফলে, পরবর্তীতে নানা মারফতি ও মুর্শিদী শাখার উদ্ভব হয়। মাইজভাণ্ডারী এমনি একটি মারফতি সুফি শাখা। মূলত, মাইজভাণ্ডারী গান দেহতত্ত্বমূলক গান। তবে বাউলগানে যেমন বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ, মাইজভাণ্ডারী গানে সুফিপ্রভাবই সমধিক। মাইজভাণ্ডারী গান কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এই লোকধর্ম একান্ত করেই গুরুবাদী। মাইজভাণ্ডারকেই তাঁর অনুসারীগণ পরম আরাধ্য জেনে তাঁকে ঘিরেই সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। এই সাধনায় বাউলদের মতো গুহ্যসাধনা আছে। একমাত্র গুরু ব্যতিরেকে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। হিন্দু মুসলমান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মাইজভাণ্ডারী শিষ্য। এবং বিপদাপদে তিনিই তাঁদের পরিত্রাণ দিতে পারেন বলে তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস। মাইজভাণ্ডারী সংসারত্যাগী ফকির।

মাইজভাণ্ডারী গান

রে দুনিয়া সব ধান্ধা—
না বুঝিয়া রইলাম আমি ভবের মায়ায় আন্ধা।
মনরে, টেকা-পয়সা, জমিদারী—
বানাইছ টিনের ছওয়ারী
আইজ মরিবে, কাইল মরিবে-কবরের বাসিন্দা ॥

মনরে, ভাই-বন্ধু তিরি-পুত্র—
কেওতো কেওরের সঙ্গে যায় না।
ও তোমার সঙ্গের তিরি সঙ্গে যায় না
—যার প্রেমেতে বান্ধা ॥
মনরে, মাইজভাণ্ডারে বলছে কথা–
ও তুই মরিয়া গেলে কবরেতে
লাগবে গলে ফান্দা ॥

লালনশাহী

এরা ফকির লালন শাহের অনুসারী। লালন শাহের ধর্ম ও জন্মসংক্রান্ত বিষয়ে পণ্ডিতেরা দ্বিধাবিভক্ত। তবে তাঁর গানে সর্বধর্মের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তাঁর কোনো একক বিশ্বাস ছিল না। তিনি বাউলদের প্রধান গুরু বলে স্বীকৃত। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না এবং সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নামধারীরা থাকলেও তাঁরা লালন ফকিরের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

লালন ফকির নিজেকে 'ফকির' বলে আখ্যায়িত করেছেন তাঁর গানে। তাঁর সাধনা গুপ্ত এবং দেহভিত্তিক হলেও মনের মানুষের অন্বেষণ ছিল তাঁর সাধনার ভিত্তি। তাঁর গানে আল্লাহ, নবী, বেহেস্ত, দোজখ গুরুত্ব পেলেও তিনি কোনো মূলধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তাঁর সাধনা গুরুবাদী এবং কেবল দীক্ষিতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি ১২৯৭ বাংলা সালে মৃত্যুবরণ করেন। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার ছেঁউড়িয়া গ্রামে তাঁর মাজার আছে।

প্রতি বছর দোল পূর্ণিমায় এবং লালন ফকিরের মৃত্যুদিবস পহেলা কার্তিকে 'ওরশ' হয়ে থাকে। বর্তমানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর সংগীত গুরুত্ব পাওয়ায় তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হতে পারে। তবে দীক্ষিত অনুসারীদের সংখ্যা সীমিত। লালন ফকির এবং তাঁর অনুসারীদের সন্তানধারণ নিষিদ্ধ বিধায় তাদেরকে 'নাড়ার ফকির' নামেও অভিহিত করা হয়।

লালন ফকিরের সাধনায় সুফি ও সহজিয়া মতাদর্শ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ সাধনা যুগলধর্মী হওয়ায় নারী-পুরুষ উভয়েই তাঁর সাধনায় দীক্ষিত ছিল। নারী সঙ্গিনীকে সেবাদাসী বলা হয়। ইতোপূর্বে তাদের কোনো বিবাহ-শাদি হতো না। ইদানীং সামাজিক প্রভাবের কারণে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে থাকে। লালনের অনুসারীদের মধ্যে ইদানীং অনেকেই গৃহী এবং সন্তানাদি নিয়ে সংসার যাপন করে। কিন্তু লালনের মূলনীতি অনুসারে সংসার ও সন্তানাদি পরিহারের উল্লেখ আছে। দীক্ষা নেবার পর সন্তান ধারণ করা যাবে না। তবে নারী-পুরুষ দৈহিক মিলন সাধন-ভজন অনুসারে অপরিহার্য। লালন অনুসারীবৃন্দ নারীকে মাতৃতুল্য জ্ঞান

করে। স্ত্রী জননাঙ্গকে তারা অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য করে। গুরু ও শিষ্য-শিষ্যা পরস্পর দেখা হলে দুই হাত ত্রিভুজাকৃতি করে শ্রদ্ধা এবং কুশল বিনিময় করে। গুরুবাদী এই সম্প্রদায় গুরুর মৃত্যুদিনে 'ওরশ' দিয়ে থাকে।

লালন শাহের অনুসারীদের নিজ বাসস্থানই আখড়ারূপে গণ্য হয়। এদের জীবনাচরণ বাউলধর্মানুগ এবং তারা নিজেদেরকে বাউল ফকির হিসেবে চিহ্নিত করে। এদের মধ্যে পীর মুরিদ রেওয়াজ আছে। তবে ভিক্ষাবৃত্তি এই সম্প্রদায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বর্তমানে লালন অনুসারীদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। এরা সংগীতাশ্রয়ী। লালনের গানকে এরা পবিত্র শ্লোক মনে করে। এরা মৃত্যুর পর কবর দিয়ে থাকে। কিন্তু কোনো জানাজা হয় না। হিন্দু নামধারীদেরও কবর দেওয়া হয়।

লালনের অনুসারীগণ মাংসাশী নয়। এরা নিরামিষ ভোজী, তবে ইলিশ মাছ ভক্ষণে আপত্তি নাই। সাধুসেবায় ইলিশ মাছ, দই ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। এরা সাদা আলখেল্লা পরিধান করে এবং গলায় তসবি জাতীয় মালা রাখে। স্কন্ধে আঁচলা-ঝোলা থাকে। সংগীতশিল্পীরা একতারা কিংবা দোতারা এবং ডুগী সঙ্গে রাখে। লালনশাহীরা শাস্ত্রাচার মানে না। গুরুর নির্দেশই সাধনকার্য বলে তারা মনে করে। এরা অধিকাংশই পরিব্রাজক। তবে গ্রামে একটি স্বতন্ত্র স্থানে এরা বসবাস করে।

পাঞ্জুশাহী

পাঞ্জু শাহ লালন ফকিরের সমসাময়িক কিন্তু বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। তিনি বাতেনী সুফি ফকির ছিলেন এবং শাস্ত্রাচার মানতেন। দেহবাদ তাঁর সাধনার মাধ্যম। কিন্তু তা ছিল নিতান্তই গুপ্ত। পাঞ্জু শাহ সংগীতকে 'সামা'র অনুরূপ জ্ঞান করতেন। তাঁর শিষ্যদের অধিকাংশই গৃহী এবং সন্তানাদিসহ সংসার যাপন করে থাকে। ইদানীং পাঞ্জুশাহীদের অনেকেই লালনশাহীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। পাঞ্জুশাহীরা মুসলমান নামধারী এবং মৃত্যুকালে কবর দেওয়া হয়ে থাকে। এরা সুফিদের অনুসারে গুরুকে পীর এবং শিষ্যকে মুরিদ হিসেবে গণ্য করে।

পাঞ্জুশাহ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার অন্তর্গত কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তাঁর সমাধি আছে। তবে তাঁর সমাধি উত্তর-দক্ষিণের পরিবর্তে পূর্ব-পশ্চিম নির্দেশক। তাঁর মৃত্যুদিনে প্রতিবছর তাঁর দর্গা শরিফে 'ওরশ' হয়ে থাকে। এই গ্রামেই লালনগুরু সিরাজ সাঁই এবং লালন ফকিরের জন্মস্থান বলে অনেকেই মনে করেন।

পাঞ্জু শাহ নিরক্ষর ছিলেন না। তিনি অসংখ্য সাধনসংগীত ও পুঁথি আকারে গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'ইস্কি সাদেকী গওহর' তাঁর এমন একটি সাধন-ভজন সম্বলিত পুঁথি জাতীয় গ্রন্থ।

যোগী, নাথযোগী, কাপালিক

টাঙ্গাইলে যোগী, নাথযোগী, কাপালিক ইত্যাদি নামে অতীতে সাধন-ভজন সম্প্রদায় ছিল। তারা যোগশাস্ত্র অনুসারে সাধন-ভজন করত। চর্যাগীতিকায় যোগী এবং নাথযোগীদের বিবরণ রয়েছে। এরা ভিক্ষুক সম্প্রদায় এবং এদের অনেকে গান গেয়ে ভিক্ষা করে থাকে। দেশবিভাগের পর এরা অধিকাংশ ভারতে চলে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে যোগীদের সংখ্যা নাই বললেই চলে।

বোষ্টম-বোষ্টমী

বোষ্টম-বোষ্টমী নামে একদল ভিক্ষাজীবী সাধন-ভজন সম্প্রদায় অতীতে বাংলাদেশে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এরা বৈষ্ণব ধর্মানুসারী সাধক-সাধিকা এবং সংগীতাশ্রয়ী ছিল। একসময় রাজশাহীতে খেতুরীর মেলাতে বোষ্টম-বোষ্টমীদের বিপুল সমাগম হতো। এদের মধ্যে বিবাহ-রীতি ছিল না। কণ্ঠি বদল করেই তারা একে অপরের সঙ্গী হয়ে যেত। খেতুরীর মেলায় পুরুষ চোখ বেঁধে অন্ধভাবে কোনো সাধিকার গাত্র স্পর্শ করলেই সে তার হয়ে যেত। সমাজের বিধবা, কুলটা বা পরিত্যক্ত মহিলারা বোষ্টমধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করত। একজন বোষ্টম কয়েকজন বোষ্টমী রাখতে পারত। বর্তমানে বাংলাদেশে এদের তেমন দেখা যায় না।

সাঁই

বাউল এবং নাড়ার ফকিরদেরকে সাঁই নামে চিহ্নিত করা হয়। এরা কোনো শাস্ত্রাচার মানে না, এরা ভিক্ষাজীবী এবং গুরুবাদী সম্প্রদায়। এরা নিজেদেরকে 'ফকির' হিসেবে অভিহিত করে। 'সাঁই' অর্থ স্বামী বা অভিভাবক। কারো কারো মতে গোস্বামী থেকে গোঁসাই এবং তা ভেঙ্গে 'সাঁই'-এর ব্যবহার হয়েছে। হিন্দু মুসলমান নামধারীদেরকে সাঁই উপাধি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এদের আচার-আচরণ বাউল ফকিরদের অনুরূপ। 'আউল' নামে কোনো আলাদা সম্প্রদায়ের খোঁজ পাওয়া যায় না। কারো কারো মতে কর্তাভজাদের একটি শাখার নাম 'আউল'। কর্তাভজাদের গুরু আউলচাঁদের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এদের আচার-আচরণ কর্তাভজা এবং সতীমায়ের অনুসারীদের অনুরূপ।

বাউল সম্প্রদায়

বাংলাদেশের লোকধর্মের মধ্যে বাউল সম্প্রদায় সবিশেষ পরিচিত। এই পরিচিতির মূলে তাদের গান। রবীন্দ্রনাথ নিজেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাদের গানে। অবশ্য বাউল ব্যতিরেকে অন্য লোকধর্মেও গানের প্রচলন রয়েছে। কিন্তু তাদের গান একদিকে যেমন অতিমাত্রায় আচারভিত্তিক অপরদিকে তেমনি স্থূল পর্যায়ের। বাউলগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অসাম্প্রদায়িকতা এবং সুগভীর জীবনবোধ। বাউলসাধনাকে এর অনুসারীরা মানবধর্ম বলে থাকে।

বাউলগানে মানুষই মুখ্য। মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অবস্থান। তিনি তার পরম পুরুষ। বাউল তাকে 'মনের মানুষ' নামে আখ্যায়িত করেছে। তার স্বরূপ সন্ধানই বাউলের সাধনা। তিনি কেবল হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যেই নেই, তিনি সকলের। জাতিভেদ বা বর্ণবাদ সমাজের একশ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি। বাউল এই জাতিভেদকে অস্বীকার করে মানবতার কথা বলেছে। মানুষ ভজনাই তার সাধনা। বাউলগানেও সাধন-ভজনের কথা বলা হয়েছে—দেহবাদ সেখানে মুখ্য কিন্তু তা সাধারণের রসাগ্রহী মনে বাধার সৃষ্টি করেনি বরং অপরূপ উপমার নানা রসমাধুর্যে তা হয়েছে সরস। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান নির্বিশেষে এই গান শুনে পরিতৃপ্ত হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে অদ্যাপি বাউলগানকে 'ভাবগান' বা 'ভাবসংগীত' নামে অভিহিত করা হয়। লালন ফকির, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, গোঁসাই গোপাল প্রভৃতি সাধকের গান 'ভাবগান' নামেই সমধিক পরিচিত। এসব গান কোনো কোনো অঞ্চলে 'ধুয়াগান' নামেও পরিচিত। তবে শব্দগানে ভাবসংগীতের মতো দেহতত্ত্বের অবতারণা করা হয় কিন্তু সেখানে তত্ত্বকথাই প্রধান। কিন্তু ভাবসংগীতে, যার আর এক নাম বাউল, সেখানে তত্ত্বের সঙ্গে ভাবের এক অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয়। সুফিসংগীত 'সামা' এবং 'গজল'-এর অনুরূপ এই বাউলগান। এ সংগীত মূলত সাধনসংগীত। একশ্রেণীর সাধক যারা 'ফকির' বলে পরিচিত এবং পেশায় ভিক্ষাজীবী, সাধনসঙ্গিনী নিয়ে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গান গেয়ে ফেরে, সমাজে যাদের পরিচয় অতি সাধারণ অর্থাৎ যারা অন্ত্যজ তাদেরকে বাউল বলা হয়ে

থাকে এবং তারাই এই গানকে অদ্যাপি ধারণ করে আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সেখানে সামাজিকভাবে তারা নিন্দিত। এরা নির্ধারিত কোনো শাস্ত্রাচার মানেনি—তা অস্বীকারই করেছে। এরা নর-নারী মিলনজনিত যোগসাধনা অনুসারী।

বাংলাদেশের বাউল বলতে উপর্যুক্ত মতের অনুসারী ছিলেন লালন-গুরু সিরাজ সাঁই, লালন ফকির, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, গগন হরকরা প্রমুখ সাধকবৃন্দ। এরা কামাচারিতার মাধ্যমে নিষ্কাম প্রেমসাধনে অন্বিষ্ট ছিলেন। কাম এই সাধনার মুখ্য হলেও কামেই সাধনার শেষ নয় বলে বাউলেরা মনে করে থাকে। প্রজনন প্রক্রিয়া এই সাধনার অন্যতম বিষয় হলেও এদের সাধনাকে মূলত রতিনিরোধ সাধনা বলে অভিহিত করা চলে। তবে এখানে এই সাধনার শেষ নয় বরং বলা যেতে পারে রতিনিরোধ সাধনার মাধ্যমে সে তার অধ্যাত্মচেতনার বিকাশ ঘটাতে চায়। বলেছি, এই সাধনা যোগসাধনার অনুরূপ হওয়ায় দেহ অভ্যন্তরে বায়ু বা হাওয়ার সঞ্চলনের মাধ্যমে সে তার শরীরকে নীরোগ করে দীর্ঘজীবনেরও প্রত্যাশী। অনেকে তাই এই সাধনাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণজনিত সাধনা নামেও আখ্যায়িত করে। বস্তুত, সব লোকধর্মই যোগসাধনার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কলাকৌশলের প্রয়োগ রয়েছে। অতীতে যোগী বা সাধকেরা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হয়েছেন বলে যে দাবি করে থাকেন, আধুনিককালে পাশ্চাত্য জগতের একজন ডাক্তার Michael Garber তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন :

> As a physician, I find knowledge of this life habits of enormous benefit in treating patients and myself as well. It fills the gaps in my western medical training which was not much concerned with these daily practicalities.[৫৬]

Michael Garber যোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কলাকৌশল সম্পর্কে মন্তব্য প্রসংগে আরও বলেন :

> The Science of yoga has applied the knowledge of the hemisphere of the brain for centuries and has determined the specific functions of each hemisphere. They also noted a relationship between hemisphere and nostril functioning. These Yogis, through their experimentation. discovered that only nostril functions at a time and that, without intervention, it changes about once an hour. To change one's nostril mechanically, one need only lie down on his side, place a pillow under the rip cage and

armpit and let the mucous in the nose move downwards for several minutes and open the upper nostril. They found that the open right nostril causes the left hemisphere to predominate and vice virsa. So by controlling the nostril which is open, the hemisphere of the brain can be regulated.

I find controlling the nostrils to be an invaluable asset to my life. The pleasure of eating (right nostril), defecation (right), showering (right), sex (male's right and females left), drinking (left) and urinating (left) is markedly enhanced by controlling the proper nostril. Proper co-ordination of nostrils (hemisphere) with life functions saves energy and allows one to harmonize with these daily activities...

One needs this information regarding nostril control of the brain to insure best sexual enjoyment, proper digestion and pleasurable elimination.[৫৭]

প্রকৃত অর্থে তন্ত্র এবং যোগসাধনায় বিভিন্ন নাড়ির মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের এই কলাকৌশল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণও তাঁদের সাধনায় প্রয়োগ করেছেন।

আলি-কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি-শশী কুইণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগ দ্বেষ মোহ লাই অ ছার।
পরম এমোখ লব এ মুত্তিহার ॥
[চর্যা ১১ কাহ্নপাদ]

আমাদের আলোচ্য বাউলগানে সেই একই ধারা, যেমন :

দমটান মন দমের খবর জেনে
দম থাকিতে দমবাজিতে ভুলে রইলি কেনে ॥
তিন দমের তিনটি ধারা
জানলে হয় জেন্দা মরা
আদমে অধর ধরা দেখ জেনেশুনে ॥

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র প্রভৃতিতে মানবশরীরের নাড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে যে যোগপ্রক্রিয়া সাধিত হয় তাই-ই বাউলসাধনার বিষয়বস্তু।

কিন্তু অন্যান্য লোকধর্মসাধনায় বিশেষ করে চর্যাগীতিকা এবং নাথসাহিত্যে এই সাধনা একমাত্র উপায়স্থল হলেও বাউলসাধনায় তা এক ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত। এখানে সুফিসাধনার অধ্যাত্মচিন্তা মুখ্য হয়েছে। বাউলসাধনার 'মনের মানুষ' তত্ত্ব এই সুফিসাধনার অনুষঙ্গী। বৌদ্ধধর্মসাধনায় দেহ এবং আত্মা অবিচ্ছিন্ন। বৌদ্ধদের কাছে দেহই আত্মা কিংবা আত্মাই দেহ। কিন্তু বাউল দেহ এবং আত্মাকে দুটি ভিন্ন উপাদানে তৈরি বলে মনে করে। দেহের মৃত্যুতে বা ধ্বংসে আত্মা লয়প্রাপ্ত হয় না। আত্মার যথাযথ ব্যবহার দেহকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে। এর অপপ্রয়োগে দেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আত্মার তাতে কিছু যায় আসে না। আত্মাকে বাউলগানে 'অচিন পাখি' এবং 'মনের মানুষ' 'অধর মানুষ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং বাংলাদেশের বাউলসাধনায় উপর্যুক্ত ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। লালনগুরু সিরাজ শাহ, লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, গগন হরকরা প্রমুখ উপর্যুক্ত ভাবনার অনুসারী ছিলেন।

কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ অঞ্চলে লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহ্ এবং দুদ্দু শাহের অনুসারী বাউলদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। ১৯৮০ সালে ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে একটি জরিপে এতদঞ্চলে দীক্ষিত সংসারত্যাগী বাউলের সংখ্যা ছিল ৯১৫ জন। কুষ্টিয়া ২৫৭, মেহেরপুর ১৮০, চুয়াডাঙ্গা ২২৭, ঝিনাইদহে ২৫১। গৃহী বাউল অথবা বাউল-অনুসারীদের সংখ্যা ১২০০০। বাউলেরা গ্রামের মধ্যে বিশেষ একটি অঞ্চলে সমবেতভাবে বসবাস করে। গ্রামের অন্যদের সঙ্গে তাদের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। তবে এরা ঝাড়ফুঁক জানে বিধায় কখনও কখনও অসুখ-বিসুখে এদের ডাক পড়ে। এরা বেশরা বিধায় শরিয়তপন্থী মুসলমানেরা এদেরকে মুসলিম সমাজ বহির্ভূত বলে মনে করে।

বাউলসাধনা দেহবাদী সাধনা হওয়ায় তা গুপ্ত এবং কেবল দীক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদের গানে মিথুনাত্মক দেহসাধনার কথাকে সাধারণের কাছে শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে রহস্য সৃষ্টি করে উপস্থাপন করা হয়। দীক্ষিত সাধক ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এর যথার্থ অর্থ এবং গূঢ় তত্ত্ব জানা সম্ভব হয় না। চর্যাপদ বা 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য় এবং অন্যান্য সাধন-ভজন গানেও এই একই কৌশল অনুসৃত হয়েছে। চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয়েছে সন্ধ্যাভাষা বা আলো-আঁধারী ভাষা। বাউলগানসহ এরকমের দেহবাদী গানে এই রহস্যময়তা আছে। মারফতি, মুর্শিদী, মাইজভাণ্ডারী গানেও এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, শব্দ বা ধুয়া গান সাধনভিত্তিক না হলেও অনেক ক্ষেত্রে রচয়িতারা মিথুনাত্মক দেহবাদী ভাবনাকে ব্যক্ত করতে এসব গানে রহস্যপূর্ণ প্রতীকী শব্দের ব্যবহার করেছেন। তবে আমাদের আলোচ্য : বাউলগান সাধনভিত্তিক হওয়ায় এসব গানের রচয়িতাগণ যারা মূলত গুরু কিংবা তার সমপর্যায়ের; শিষ্য কিংবা

অনুসারীদের পালনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে তারা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এসব গানের মাধ্যমে। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী বা শব্দগানে দেহভিত্তিক প্রতীকী শব্দ ব্যবহার, অনেকটা রহস্যময়তা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রামীণ এবং সাধারণ মানুষ যারা 'লোক' নামে পরিচিত তাদের জীবনে বিনোদন ঘটে নর-নারীর যৌনজীবনকে কেন্দ্র করে। তাদের আনন্দ-বেদনা, সুখ দুঃখ, সবকিছু এমনকি নিত্যদিনের কর্মের ভাষাও যৌনজীবন আশ্রিত। বাউলগান কিংবা অন্যান্য লোকসংগীত হাজার বছর আগে থেকে প্রবহমান দেহবাদী দর্শন হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। গ্রামাঞ্চলে বাউলগান জনপ্রিয় হওয়ার মূলে এসব গানে দেহতত্ত্বের সমারোহ। শহরের মানুষের কাছে এ গানের ভাষা দুর্বোধ্য হলেও গ্রামের মানুষ এই গানের মধ্য থেকে রস এবং জ্ঞান উভয়ই পেয়ে থাকে বিধায় এসব গানে গ্রামগঞ্জে ভিড় জমে এবং সারারাত তা গীত হয় ক্লান্তিহীনভাবে।

বলেছি, লালন ফকিরের মাজার এবং সাধনপীঠ ছেঁউড়িয়ায় থাকায় বৃহত্তর কুষ্টিয়া এবং যশোর অঞ্চলে বাউলসাধকদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তবে অন্যত্রে যেমন—যশোর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, ঢাকা, নরসিংদী, বিক্রমপুর, কুমিল্লা, সিলেট, নীলফামারী, রাজশাহী, পাবনা অঞ্চলেও বাউল নামে সংগীতাশ্রয়ী কিংবা সাধকদের দেখা যায়। তবে এরা সবাই যে বাউলপন্থী তা নয়। ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের সম্পর্কে বলেন :

> বাউলদের বেশের ও ভাষার মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই ভাবেরই মিল আছে। তাঁহারা সর্বকেশ রক্ষা করেন, কারণ কেশের বিশেষভাবে রক্ষা না-রক্ষার দ্বারা বিশেষ সম্প্রদায় সূচিত হয়। দেহকে ইহারা নগ্ন রাখেন না, সযত্নে নানা বস্ত্রখণ্ডে জোড়তালি দিয়ে দেহকে আচ্ছাদিত রাখেন। সেই বেশও কতকটা মুসলমানী ভাবের।[৫৮]

ক্ষিতিমোহন সেন প্রদত্ত বাউলদের এই বিবরণ অনেকাংশে সত্য। তবে বর্তমানে বাউলদের পোশাকাদি এবং শারীরিক অবয়ব এরূপ : পুরুষ নারী উভয়ই সাধারণত শাদা পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। পুরুষ শাদা লুঙ্গি, ফতুয়া জাতীয় শাদা কাপড় অথবা আলখেল্লা যা খিরকা নামেও পরিচিত। মহিলারা শাদা শাড়ি এবং শাদা ব্লাউজ। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরা গেরুয়া কিংবা কালো রঙের আলখেল্লা পরে থাকে। মেয়েরা রঙিন কাপড়ও পরিধান করে। পুরুষেরা গোঁফদাড়ি রাখে এবং মাথার চুল কখনও বাবরী, কখনও তা কাঁধ ছাপিয়ে পড়ে। মাথা ন্যাড়া বা মুণ্ডিত এমন কোনো বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। হিন্দু বাউলদের পোশাকও শাদা। তবে তাদের অনেকে ধুতিকে কেটে লুঙ্গি এবং শাদা ফতুয়া পরিধান করে থাকে। এদের মধ্যে অধিকাংশই গোঁফ রাখে, কিন্তু দাড়ি রাখে না। দু-একজনকে গোঁফদাড়ি রাখতে

দেখেছি। এরা কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি বা আঁচলা-ঝুলি রাখে। হাতে বাঁকানো লাঠি। কারো কারো হাতে লোহার বড় শর্ণা রাখতেও দেখেছি। এরা দরিয়া নারিকেলের তৈরি কিস্তি নামের পাত্র রাখে যা দিয়ে পানি এবং খাদ্যদ্রব্য উভয়ই ভক্ষণ করা যায়। হিন্দু বাউলেরা হাতে কমণ্ডলু রাখে। প্রত্যেকের গলায় নানা রঙের মালা বা ছবি। নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই সিদ্ধী খেয়ে থাকে। পুরুষ বাউল সাধারণত ধীরস্থির এবং গম্ভীর প্রকৃতির। মহিলারা চটুল প্রকৃতির এবং হাস্যরসিক। তাদের উভয় হাতে কোনো বালা নেই। বৈষ্ণবধর্মী বাউল, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে কপালে তিলক ইত্যাদি দিয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান পুরুষ-বাউল কপ্‌নি পরে থাকে। বাউলদের মধ্যে যারা সংগীতাশ্রয়ী পুরুষ এবং মহিলা তাদের হাতে বা কাঁধে একতারা, দোতারা, ডুগী, খমক ও জুড়ি বা প্রেমজুড়ি।

মুসলমান নামধারীরা 'ফকির' বা 'দরবেশ' এবং পদবি হিসেবে 'সা', 'শাহ' যেমন ফকির লালন সা, ফকির পাঞ্জু সা ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং হিন্দুরা নামের সাথে 'গোঁসাই' বা 'দাস' পদবি হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। যেমন–গোঁসাই গোপাল। হিন্দু ও মুসলমান বাউলেরা একই সাথে থাকা এবং খাওয়া-দাওয়া করে। কারো অন্নস্পর্শে বাধা নেই। সাধুসেবায় সকলে সম্মিলিতভাবে খাওয়াদাওয়া করে এবং খাওয়ার শুরুতে কখনও কখনও আল্লা আলেক বা 'সাঁই' শব্দ সমবেতভাবে উচ্চারণ করে। এদের যারা নারীসঙ্গী তারা সবসময় যে একজনের সাথে থাকে তা নয়, প্রয়োজনে অন্যের সাথেও থাকে, কেউ বাধা দেয় না। তবে ইদানীং সামাজিকতার কারণে এরা নিজেদেরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে পরিচয় দিয়ে থাকে। কারো কারো একাধিক নারীসঙ্গী থাকে। এদেরকে সেবাদাসী বলা হয়ে থাকে। বাউল পরিভাষায় নারীকে 'চেতন গুরু' 'জায়নামাজ' রূপেও উল্লেখ করা হয়। বাউলদের মধ্যে 'ঘর' বা 'ঘরানা' আছে। কেউ লালন শাহের ঘর অথবা পাঞ্জু শাহের। মুসলমান বাউলেরা নিজেদেরকে 'সুফি ফকির' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং হিন্দুরা 'বৈষ্ণব বাউল'।

বাউলদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তারা নিজেদেরকে 'জ্যান্ত মরা' ভাবে। প্রতি ভেকধারী বাউলই জ্যান্তে মরা। দীক্ষার মাধ্যমেই এমন অবস্থা হয়ে থাকে। মুসলমান বাউলেরা দীক্ষা নেওয়াকে 'খেলাফৎ গ্রহণ' বলে থাকে। বাউল সাধনা মূলত যুগল সাধনা বলে নারী পুরুষ উভয়কেই একই সঙ্গে দীক্ষা নিতে হয়। দীক্ষা নেবার দিন সকালে প্রথমে পুরুষকে 'ডোর কৌপিন' পরিয়ে স্নান সেরে সেবিকাসহ কাফনের কাপড় পরিধান করতে হয়। পুরুষের জন্য কাফনের কাপড় দুভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগ, কোমর থেকে পা অবধি অনেকটা লুঙ্গির আকারে। দ্বিতীয় ভাগ, আলখেল্লা বা লম্বা জামার আকৃতিতে স্কন্ধ থেকে পা পর্যন্ত। একে ফকিরদের ভাষায় 'খিরকা' বা 'খিলকা' বলা হয়। কাঁধে শোভা পায় আঁচলা-ঝুলি ভিক্ষার জন্য–এর অর্থ, তারা সামাজিকভাবে মৃত। তারা আর সমাজজীবনে বা

গৃহস্থালির কাজে ফিরে যেতে পারবে না। কেবল ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমেই জীবনধারণ করতে হবে এবং গ্রামগঞ্জে কিংবা আখড়ায় আখড়ায়, ঘুরেফিরে দিনাতিপাত করতে হবে কিন্তু কাউকে কিছু বলা যাবে না। কেউ কোনো গ্রামের বাসিন্দা হলে তাদের নিজেদের বাড়িঘর আখড়ায় পরিণত করতে হবে। দীক্ষার পূর্বে কোনো সন্তান থাকলে তাকে স্বতন্ত্র করে দিতে হবে।

দীক্ষার পরে মিথুনভিত্তিক যোগসাধনা করতে হবে এবং কোনো অবস্থায় সন্তানধারণ করা যাবে না। একটি নির্জন ঘরে গুরুর কাছ থেকে কল্‌মা বা বীজমন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। গুরু তাদের সাধনার পথ ও ধারা বলে দেন। দীক্ষার পরে উভয়ের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়, অতঃপর আখড়ায় দেহ রেখেছেন এমন প্রধান গুরুর 'মাজার' সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। দীক্ষিত পুরুষের মাথায় থাকে পাগড়ি। নারীসঙ্গিনীর শাড়ির আঁচলের সঙ্গে তার পাগড়ির একাংশ বেঁধে দেওয়া হয়। নারীসঙ্গিনীকেও শাড়ির মতো করে কাফনের কাপড় পরানো হয়। তার আঁচলা থাকবে খোলা, কোনো গিঁট বাঁধার দরকার নেই। অর্থাৎ তার কাছে সংসারের কোনো দাবি নেই। 'দিসনে আর আঁচলায় কড়ি, নাড়ার নাড়ি হও যেয়েরে।'

উল্লেখ্য, দীক্ষা নেবার পূর্বেই কাফন পরানো শেষ হলে উভয়কে একত্রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের মাথার উপর চার কোণে চার ফকির কাফনের কাপড় চাঁদোয়ার মতো ধরে তাদেরকে একটি গোপন কক্ষে গুরুর নিকটে নিয়ে যায়। দীক্ষাশেষে মাজারে সেজদা দিতে হয়। অতঃপর তাদের উভয়কে চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। চোখ বাঁধা অবস্থায় মাজার প্রদক্ষিণের সময় একজন ফকির সম্মুখে থাকে তাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য এবং অন্যরা দীক্ষিতদের সঙ্গে গানে 'পাছদুয়ারী' ধরে।

আজ আমায় কপনি দে মা ভারতী গোঁসাই
কাঙ্গাল হব মেঙ্গে খাব
আমার রাজ রাজ্যের কার্য নাই।

অথবা

কে তোমারে এ বেশে ভূষণে মজাইল বলো শুনি
জিন্দা দেহে মরার বসন খিরকা তাজ আর ডোর কোপনী
জিন্দা মরার পোশাক পরা
আপন ছুরাত আপনি মরা
ভবলোককে ধ্বংস করা
দেখি অসম্ভব করণি ॥
যে মরনের আগে মরে
শমনে ছোঁবে না তারে

শুনেছি সাধুর দ্বারে
তাই বুঝি করেছে ধনি ॥
সেজেছ সাজ ভালই তরো
মরে যদি বাঁচতে পারো
লালন বলে যদি ফেরো
দুকূল হবে অপমানি ॥

মাজার প্রদক্ষিণ শেষে শুরু হয় এবাড়ি সেবাড়িতে ভিখ্ মাঙা। এরপর আয়োজন হয় সাধুদের জন্য পূর্ণসেবা অর্থাৎ আপ্যায়ন। একদিন সকল সাধুকে ভোজন করাবার দায়িত্ব নিতে হয় দীক্ষা গ্রহণকারীকে। গুরুকে দিতে হয় নজরানা। দীক্ষাগ্রহণকারী সাধুসেবার ব্যবস্থা না করতে পারলে অন্যান্য সাধু-ফকিরেরা নিজেরা ভিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে এই পূর্ণসেবার ব্যবস্থা করে। তারপর শুরু হয় গানের আসর, বাউলদের ভাষায় 'অধিবেশন'। সারা দিনরাত গান হয়, সবই সাধন-ভজনের গান। সকালবেলায় যে আপ্যায়ন করা হয় তার নাম বাল্যসেবা। এই আপ্যায়ন নাস্তাজাতীয়। লালন একাডেমির পরিচালক থাকাকালে আমি এমন অনেক দীক্ষা অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছি। এসময় দীক্ষিত নারী-পুরুষকে অঝোর ধারায় ক্রন্দনরত দেখেছি। এই হলো 'জ্যান্তে মরা' বা ভেক খেলাফৎ নেওয়ার অনুষ্ঠান। এই 'জ্যান্ত মরা' হওয়ার কারণে দীক্ষিতদের সামাজিক পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমাজ-সংসারের প্রতি তার আর কোনো দায় থাকে না। নারী হয়ে পড়ে সেবাদাসী। এই সময় রতিনিরোধ সাধনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

১৯৭৬ সাল অবধি ভেকধারী ফকিরদের সংখ্যা বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অর্থাৎ মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া মিলে ২৫২ জন ছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৫ জনে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয়েছে। এদেরকে ত্যাগী বাউল বলা হয়। এরা নিজেরাও অন্যকে দীক্ষাদানে সমর্থ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বর্তমানে ভেকধারীর সংখ্যা বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও বৃহত্তর যশোর জেলায় পাঁচ হাজারের কম হবে না এবং অনুসারী অথবা সহযোগীদের সংখ্যাও ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাউল লোকধর্মে কেউ জন্মসূত্রে বাউল হয় না। কেবল দীক্ষার মাধ্যমেই বাউল হওয়া সম্ভব। ত্যাগী বাউল ব্যতিরেকে সাধারণের মধ্যে গৃহী বাউল হওয়ার পদ্ধতি রয়েছে এই ধর্মে। ত্যাগীদের মতো কাফন পরিধান করে এই দীক্ষা নিতে হয় না। গুরুর কাছে গোপন কক্ষে বীজমন্ত্র বা কল্‌মা পাঠ করেই বাউল হওয়া যায়। গৃহী বাউলদেরকেও রতিনিরোধ সাধনা করতে হয়। তবে এই মতাবলম্বীরা গ্রামে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বসবাস করে।

গ্রামের অন্যান্য বসতি মানুষদের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না। স্বাধীনতাপূর্বকালে গৃহী বাউলদের সংখ্যা তেমন ছিল না। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রচুর। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় লক্ষাধিক গৃহী বাউল রয়েছে। এরা নারীসঙ্গী রাখে। তবে সামাজিক চাপে তারা নিজেদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেয়। এদের অনেকে গৃহস্থালি কাজ করে, জমিজমা চাষ, ব্যবসাবাণিজ্য, শ্রমিক হিসাবে রিক্‌শা, গাড়ি ইত্যাদি চালানো বা মিল কলকারখানাতেও কাজ করে। এরা নিয়মিত সাধুসেবায় অংশগ্রহণ করে। কখনও কখনও নিজেদের বাড়িতেও সাধুসেবার আয়োজন করে। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় এমন অনেক বাউল গ্রাম আছে।

এদের অনেকে গানবাজনাও জানে এবং রেডিও, টেলিভিশনের শিল্পী হিসেবে কাজ করে। এরা গুরুর নির্দেশে সন্তান ধারণ করতে পারে। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক লালন ফকিরের মাজারে একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং নানা কর্মকাণ্ডে সরকারি অনুদান প্রাপ্তিতে বাউলদের সামাজিককরণ ত্বরান্বিত হয়েছে। পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই ইত্যাদি সাধক এবং গায়কদের নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় জনগণের মধ্যে পূর্বেকার বৈষম্য দূর হয়েছে। অতীতে বাউলদের বিরুদ্ধে যে সামাজিক নির্যাতন হতো বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। লোকের মধ্যেও এই লোকধর্ম অনুসরণে আগ্রহ বেড়েছে। তবে এমন অনুসারীদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত বা নিম্নশ্রেণীর। বেতার ও টেলিভিশনে যারা লালনগীতি পরিবেশন করে তারা সকলেই বাউল নয়, কেউ 'শখের বাউল' হয়েছে। এসবের ফলে বাউলগুরুদের প্রাধান্য বেড়েছে এবং এদের সাথে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অনেকাংশেই পীর-মুরিদের মতো।

বাউলেরা গুরুবাদী। গুরুকে এরা ঈশ্বর বা আল্লাহর অবতার বলে জানে। এরা বিশ্বাস করে যে গুরু অসন্তুষ্ট হলে তার ইহকাল পরকাল সবই নষ্ট হতে পারে। সে কারণে গুরুকে তুষ্ট করাই এদের সাধনার অঙ্গ। এরা অসুখবিসুখে গুরুর শরণাপন্ন হয়। ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদিতেও গুরুকৃপা এবং তাঁর নামই একমাত্র ভরসা বলে তারা মনে করে। তাদের উন্নতি অবনতি সবই গুরুর জন্যে। গুরুর মৃত্যু হলে তাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি বৃদ্ধি পায়। এরা গুরুর মৃত্যুর দিনকে কেন্দ্র করে 'ওরশ' উদযাপন করে। এই সময় শত শত বাউল ফকির এসব ওরশে সমবেত হয়।

লালন একাডেমিতে লালন ফকিরের মৃত্যুদিনকে কেন্দ্র করে পহেলা কার্তিক তিনদিনের অনুষ্ঠান হয়। এ ছাড়া প্রতিবছর দোল পূর্ণিমায় বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান লালনের সময়কাল থেকে হয়ে আসছে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে গানবাজনা হয়। ভক্তরা মানৎ হিসেবে টাকাপয়সা দান করে থাকে লালন মাজারে। শিন্নি দেওয়া হয়। কবরে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো হয়। ভক্তেরা এসে মাজারকে সেজদা করে। এমনিভাবে সেজদা গুরুদেরকেও করতে হয়। তবে গুরুকে সেজদা দেওয়ার পদ্ধতি সাধন-ভজনের অনুরূপ।

সাধুদের আপ্যায়নকে 'সেবা' নামে অভিহিত করা হয়। সকালের নাস্তা খাওয়াকে বলে বাল্যসেবা, এই সময় পায়েস বা ক্ষীর জাতীয় খাবার দেওয়া হয়। দুপুর এবং রাত্রে পূর্ণসেবা, এই সময় খিচুড়ি অথবা ভাতের সঙ্গে নিরামিষ বা মাছ এবং দই। সব আপ্যায়নে ফকিরেরা দলবদ্ধভাবে বসে এবং খাবার পরিবেশন শেষ হলে 'আল্লা আলেক' বা 'আলেক সাঁই' নাম বলে সকলে খাবার মুখে দেয়।

লালন ফকিরের বার্ষিক 'ওরশ' বা উৎসবে মাজারে প্রথম খাবার প্রদান করে— তবে ভক্তেরা অন্ন গ্রহণ করে। তারা বিশ্বাস করে লালন ফকির মৃত নন এবং তিনি তাদের খাবারে অংশগ্রহণ করেন। লালন আখড়ায় উৎসবের সময় ফকিরেরা যেখানে আসন গ্রহণ করে সেখান থেকে অন্যত্রে সাধারণত তারা আসন পরিবর্তন করে না ।

বলেছি, বাউলদের মধ্যে গুরু নজরানা বা গুরু প্রণাম দেওয়ার রীতি আছে। বাউলগুরু বছরে কয়েকবার গৃহী বাউলদের বাড়িতে যাতায়াত করে এবং প্রচুর পরিমাণে নজরানা হিসেবে উপঢৌকন ইত্যাদি নিয়ে আসে। এরা আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল। অনেক মাজারে বছরের আয় লক্ষাধিক।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাউলদেরকে 'নাড়ার ফকির' নামে অভিহিত করা হয়। 'নাড়া' অর্থ যাদের সন্তানাদি নেই অথবা হয় না। বাউলসাধনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, রতিনিরোধ সাধনা। একে জন্মনিয়ন্ত্রণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য বাউলদের একক নয়। চর্যাপদেও আমরা এমনি ধরনের রতিনিরোধ সাধনার পরিচয় পাই। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যেও এই একই রতিনিরোধের প্রতিফলন দেখা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রতিনিরোধ হয়ে থাকে। বাউলদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য, এদের চিকিৎসাপদ্ধতি। এরা 'বায়ু' বা 'দম'কে নিয়ন্ত্রিত করে শরীরকে নীরোগ রাখতে চায়। আমাদের শরীরে অসংখ্য নাড়ি এবং তাদের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। বাউল এইসব নাড়ির মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে দীর্ঘজীবন লাভ করতে প্রয়াসী। লালন ফকিরের একটি গানে আছে :

হাওয়া ধরো
অগ্নি স্থির করো
মরিলেও বাঁচিতে পারো ॥

তবে এই বৈশিষ্ট্যও বাউলদের একক নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে তন্ত্র এবং যোগসাধনার মাধ্যমে শরীরকে রোগমুক্ত করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। বাউলদের মধ্যে যে কায়া-সাধন তা এক অর্থে শরীরকে নীরোগ রাখাও বোঝায়। এরা শরীর থেকে নির্গত নানা ধরনের রসপান করে থাকে। অসুখবিসুখে এরা কোনো ডাক্তারের কাছে যায় না। এদের মধ্যে প্রস্রাব, মাসিকের রক্ত এবং মাতৃদুগ্ধ পানের

প্রথা রয়েছে। এরা মাসিক শেষে ডিম্ব স্ফুরণকালে তিনদিনের স্রাব পান করে। কুমারী মেয়েদের স্রাবকে তারা 'অখণ্ড' নামে অভিহিত করে এবং পান করে। যক্ষ্মা এবং অন্যান্য রোগে তার অনুসারীদের মধ্য থেকে মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ করে তা পান করে। প্রস্রাব পান অনেকটা নিয়মিত। শরীর রক্ষার কারণেই তারা তা করে থাকে। বাউল ফকিরদের এই ধরনের চিকিৎসার পদ্ধতির একটি বিবরণ দিয়েছেন আবদুল ওয়ালী তাঁর নিবন্ধে। বাউলদের প্রতি তাঁর আগ্রহের মূলে ছিল তাদের চিকিৎসাপদ্ধতি। তিনি তাঁর নিবন্ধে বলেছেন যে, বাউল ফকিরেরা তাদের বিচিত্র চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে অন্যদেরকে দলে টেনে আনে। তিনি বলেন :

> My attention to them, was attracted first in this way. I had in my employ a servant aged apparently 22, who had been suffering from intestine cholic which had reduced him to a mere skeleton. He tried several medicines while in my employ and after he had left it, with no effect. Those who are acquainted with the disease, can testify that it is very hard to cure, and baffles the skill of physicians. For a time, I did not see the young man. Inqury revealed that a Faqir commonly called 'Narar Fakir' had cured him of the malady. When I next saw him. I found him a new man—hale, hearty and robust.[৫৯]

গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে বাউলফকিরদের একটি অবস্থান আছে, গবেষণাকালে তা লক্ষ করেছি। বিভিন্ন অসুখেবিসুখে এই মহিলারা বাউলদের নিকট যায় এবং রোগ থেকে মুক্ত হয়। কখনও কখনও গ্রামে কোনো বড় ধরনের অসুখের, যেমন ওলাওঠা, বসন্ত ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব হয় তখন গ্রামবাসী কখনও সম্মিলিত কিংবা ব্যক্তিগতভাবে বাউল ফকিরদের আহ্বান জানায়। তারা কয়েকদিন ধরে সেই গ্রামে ফকিরী গান করে। গ্রামবাসীদের অনেকে বিশ্বাস করেন, ফকিরদের এই গানে রোগপ্রদানকারী অপদেবতারা তুষ্ট হয় এবং গ্রাম রোগমুক্ত হয়। কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গ্রামে রোগমুক্তির জন্য পীর ফকির এবং দেবদেবীর নামে 'মানৎ' বা 'মানসা' করে ফকিরীগান হয়ে থাকে এবং আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি। ফকিরী গান শুরুর আগে মানৎকারী বাড়িতে মাটির ঘট ইত্যাদি বানিয়ে পূজা দিয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ে এর প্রচলন রয়েছে। কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন বারাদী নামে যে-গ্রামে আমি বসবাস করি এখানেও এই ধরনের অনুষ্ঠান বহুবার হয়েছে এবং আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। বস্তুত, বাউলদের গান এবং তাদের চিকিৎসাপদ্ধতির কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের একটি স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

গ্রামের সাধারণ মানুষ অধিকাংশ নিরক্ষর কিংবা অল্পশিক্ষিত। এরা তাদের গানে দেহতত্ত্বের বিশ্লেষণে সৃষ্টি রহস্যকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরে। এতে এইসব সাধারণ মানুষ যাদেরকে সমাজে 'লোক' নামে চিহ্নিত করা হয়—তাদের ক্ষুধা মেটে। এখানে বলা প্রয়োজন, আমাদের দেশে যেসব সাধনভজন সম্প্রদায়ের নিজস্ব গান আছে তারাই একটি স্থায়ী আসন পেয়েছে। বাউলগান এমনিভাবে এদেশের মাটি ও মানুষের গান হয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের অন্তর জয় করেছে। এরা নিরস তত্ত্বকথা বোঝে না কিন্তু গানের মাধ্যমে যে তত্ত্বকথা শোনানো হয় তা তারা মনে রাখে আজীবন। এজন্যে লক্ষ করা যায়, লালন ফকিরের গান কিংবা পাঞ্জু শাহের গান শুনবার জন্য অনুষ্ঠানে প্রচুর ভিড় জমে। এই গানে হিন্দু মুসলমান নামধারী সাধারণশ্রেণীর মানুষ যাদের সাথে শাস্ত্রের যোগ নেই, তাদের ধর্মতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বাউল এবং দেশজ ফকির-দরবেশ সম্প্রদায়ের অনুসারীবৃন্দ নিজেদেরকে ইরান থেকে আগত নানা সুফিসম্প্রদায় যেমন চিশতীয়া, কাদেরীয়া, নক্‌শবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, মুজাদ্দাদীয়া প্রমুখের অনুসারী বলে দাবি করে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ এদেরকে ভক্তি করে থাকে এবং তাদের গানের মাধ্যমেই তারা ধর্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ফলে ধর্মের একটি লৌকিক চিত্র বাউল-ফকিরদের গানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে এইসব ফকিরদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কারও কিছু চুরি হলে বা হারানো গেলে এদেরকে আহ্বান করা হয়। এরা ঝাড়ফুঁক জানে বিধায় সকলের মধ্যে একটি ভীতি ও আতঙ্ক আছে এদের সম্বন্ধে। আমি নিজে লক্ষ করেছি, অনেক চোরাই মাল বা হারানো জিনিস এরা উদ্ধার করে দিয়েছে। এরা বাটি চালান, চটা চালান এবং অন্যান্য পদ্ধতি এসব কাজে ব্যবহার করে। এরা জিন-ভূতে ধরা নারী-পুরুষের চিকিৎসা করে থাকে। এদের প্রভাবে তাই শাস্ত্রাচারযুক্ত ইসলাম অপেক্ষা শাস্ত্রহীন ইসলাম অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

বলেছি, বাউলদের জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি তাদের গান। গ্রামগঞ্জে উৎসবাদি, এমনকি কোনো 'মানৎ' ইত্যাদিতেও এদের গান পরিবেশিত হয়।

গবেষণাকালে আমি এমন কিছু প্রতিভাবান বাউলশিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছি যাদের গান শুনবার জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমত। লালন একাডেমিতে প্রতিবছর দুবার অনুষ্ঠান হয় : ফাল্গুন পূর্ণিমায় (দোল পূর্ণিমা) বাৎসরিক অনুষ্ঠান (লালন ফকিরের সময়কাল থেকে প্রচলিত) এবং লালন ফকিরের মৃত্যুবার্ষিকী পহেলা কার্তিকে। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বাউলরাই শুধু নয়, পশ্চিম বাংলা থেকেও অগণিত লোকশিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পরে যাতায়াত সহজ হওয়ায় এসব বাউলমেলায় উভয় বাংলার সাধকদের সম্মিলনে বাউলের

সাধনধারায় যেমন পরিবর্তন আসছে তেমনি এসেছে তাদের গানে। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাই বাঙালি সংস্কৃতির মূল উপজীব্য যা আবহমানকাল ধরে হিন্দু-মুসলিম, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সকলকেই এক প্রীতি-মমতার নীড়ে বেঁধে রেখেছে। অন্যান্য লোকধর্ম অপেক্ষা বাউলসম্প্রদায়ের গুরুত্ব এখানেই। বাউলদের সম্পর্কে আমার আকর্ষণও মূলত এ কারণেই; বাউলদের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতির মূল কাঠামোর একটি পরিচয় অনুসন্ধানই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বাউলদের সংখ্যা ইদানীং অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই মত ও পথকে একটি ধর্মীয় কাঠামো দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। বাউলেরা এই ধর্মকে 'মানবধর্ম' নামে আখ্যায়িত করে এবং লালন ফকিরকে তাদের 'আদর্শ মানব' বলে গ্রহণ করে। এই মতের উদ্ভব পারস্যে। মরুভূমিতে এখানে-সেখানে বিচরণকারী, সংসারত্যাগী একশ্রেণীর সংগীতাশ্রয়ী সুফিসাধক 'বা'আল' নামে পরিচিত ছিল। এরা অধ্যাত্মবাদী এবং এদের সাধনপদ্ধতি ছিল গুপ্ত এবং যৌনাচারভিত্তিক এবং আমাদের আলোচ্য বাউলসম্প্রদায় পারস্যের এই 'বা'আল' সম্প্রদায়ের উত্তরসূরি। চতুর্দশ শতকে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জুলেখা' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই ধর্মীয় সাধকদের 'বাউল' এবং 'বাউর' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। লোক-নিরুক্তি (folk etymology) অনুসারে বা'আল শব্দটি পরবর্তীকালে 'বাউল' শব্দে পরিণতি লাভ করে।

বাউলদের সাধনপীঠ
মাজার, আখড়া বা আশ্রম

ছেঁউড়িয়া আখড়া, কুষ্টিয়া

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর) বাউলদের সাধনপীঠ গড়ে ওঠে ছেঁউড়িয়াকে কেন্দ্র করে। এই গ্রামে বাউলগুরু লালন ফকির ১৮৯০ সনের ১৭ অক্টোবর (১২৯৭ বাং ১ কার্তিক) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুপূর্বকাল থেকেই কালীগঙ্গা নদীর তীরবর্তী ছেঁউড়িয়া কারিকরপাড়াস্থ মলম সা ফকিরের বাড়ি সংলগ্ন বিস্তৃত স্থান বাউলদের সাধনপীঠ হিসেবে গড়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জনশ্রুতি অনুসারে ছেঁউড়িয়া গ্রামের মলম সা'র স্ত্রী মতিজান বিবি কালীগঙ্গা নদীতে পানি নিতে আসবার সময় লালনকে বসন্ত রোগাক্রান্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান এবং বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করে ভালো করেন। অসুখে লালনের একটি চোখ কানা হয়ে যায়।

লালন কীভাবে কুষ্টিয়া এসেছিলেন এবং কোথায় তাঁর বাড়িঘর এ সম্পর্কে কখনও কিছু জানাননি। মলম সা সিরাজ সাঁই-এর শিষ্য ছিলেন। সিরাজ সাঁই-এর বাড়ি ছিল হরিশপুর গ্রামে হরিণাকুণ্ড থানায়, জেলা ঝিনাইদহ। মলম সা'র বাড়িতে লালন বাউল মতে দীক্ষা নেন। অতঃপর মলম সা তার বাড়ি সংলগ্ন নিজস্ব জমিতে দানপত্রের মাধ্যমে লালন ফকিরের আখড়াবাড়ি নির্মাণ করে দেন।

মতিজান বিবিকে লালন মায়ের মতো ভক্তি করতেন। এখানে একটি আটচালা চৌরিঘরে লালন ফকির তার সেবাসঙ্গিনী বিশখাসহ বসবাস করতেন। এই সময় তাঁর পুরুষ শিষ্যদের মধ্যে মলম সা, শীতল সা, ভোলাই সা, মনিরুদ্দিন সা, পাচু সা, মানিক সা, দয়াল সা, দুদ্দু সা, আরমান সা, জাগো সা, বলাই সা, কুদু সা, মহরম সা, কানাই সা অন্যতম ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে ভাঙ্গুরী ফকিরাণী, গরমের মা (ছত্রগাছা), মতিজান বিবি, বিশখা, শান্তি, কামিনী প্রমুখ প্রধান ছিলেন। এদের সঙ্গে লালন ফকির তাঁর আটচালা চৌরিঘরে বসে আলাপ করতেন। রাত্রে এখানেই

গান করতেন। ভোলাই সা-এর স্ত্রী পেয়ারী নেছা লালন ফকিরের শিষ্য ছিলেন কিনা তা জানা যায় না।

১৯৫৬ সালে আমি যখন প্রথমবারের মতো লালন আখড়ায় যাই তখন উত্তরদিকে একটি দোচালা ঘর বারান্দাসহ, পূর্বদিকে দোচালা ঘর বারান্দাসহ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আটচালা ঘর দেখেছি। এই ঘর সংলগ্ন স্থানে লালন ফকিরের কবর ছিল ইট দিয়ে বাঁধানো এবং বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আমগাছ, তালগাছ, কাঁঠালগাছ ও বড় একটা তেতুঁলগাছ ছিল আখড়ার মধ্যে। বেশ কয়েকজন ফকির এবং তাদের সেবাদাসীরা এই আখড়াবাড়িতে থাকতেন। প্রতি রাতেই এখানে গান বাজনা হতো। তবে তেমন লোক সমাগম হতো না। আশপাশের মুসলমান শরিয়তপন্থীরা এখানে আসত না। দোল-পূর্ণিমার সময়ে দু-একশত লোক গ্রামাঞ্চল থেকে আসত। এইরকম অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করেছি।

ইসমাইল ফকিরের মুখে জানতে পারি যে, আখড়ায় দুই একর সাতাত্তর শতক জমি শেষ অবধি ছিল। লালন ফকিরের আখড়া রবীন্দ্রনাথের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসমাইল সা উল্লেখ করেন, মলম সা প্রায় ১৬ বিঘা জমি লালন ফকিরের নামে উইল করে দেন। এই উইল তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন বলে আমাকে জানান। মলম সা নিঃসন্তান ছিলেন। লালন ফকিরের মৃত্যুর পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তাঁর শিষ্য শীতল সা এবং ভোলাই সা আখড়াবাড়ি দেখাশোনা করতেন। পরবর্তীকালে তাদের মৃত্যুর পর ইসমাইল সা ফকির লালন আখড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় কারিকরপাড়ার কিছু ব্যক্তি লালনের অনুসারী ছিলেন। ইসমাইল সা নিজেও কারিকর ছিলেন। ইসমাইল সা-এর মৃত্যুর পর মোসলেম ফকির এবং ডা. গোলাম রহমান দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। গোলাম রহমান কুষ্টিয়া কালেকটরেটে কেরানির কাজ করতেন এবং একসময় বিশিষ্ট সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় কুষ্টিয়া মহকুমার এস.ডি.ও থাকাকালে তাঁর সহকারী ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪০ সালে শিলাইদহ 'নিখিল বঙ্গ পল্লীসাহিত্য' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট বাউল গবেষক অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিলাইদহবাসী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাউল সাধক অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ১. বেলাল সা, ২. হরিদাসী ৩. গহর সা, ৪. আব্বাস সা, ৫. খোদা বখ্শ সা, ৬. হীরু সা অন্যতম।

এই সময় মাওলানা আফসারউদ্দীন নামে কুষ্টিয়ার একজন বিশিষ্ট আলেম বাউলদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্থানে আলেমসমাজ বাউলদের ইসলাম পরিপন্থী ও অসামাজিক কাজের জন্য প্রতিবাদমুখর হন। বাউলেরা এজন্যে নিজেদের একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সম্মেলনে সে-বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা যায়।

যা হোক, পরবর্তী সময়ে লালনের আখড়াবাড়িতে স্থানীয় সাধকদের প্রচেষ্টায় দরগা কমিটি গঠিত হয় এবং তাদের তত্ত্বাবধানে আখড়াবাড়িতে অনুষ্ঠানাদি হতো। লালনের আখড়া রবীন্দ্রনাথের জমিদারি এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত থাকায় দরগা কমিটিকে প্রতি বছর ১৬৷. টাকা খাজনা দিতে হতো। পরবর্তীকালে এই খাজনা বাকি পড়ে যাওয়ায় আখড়ার জমি নিলামে ওঠে। এই জমির খতিয়ান নং ১৭৪, ছেঁউড়িয়া মৌজা, কুমারখালী থানা। রবীন্দ্রনাথের পর ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি ভাগ্যকুলের জমিদারের নিকট হস্তান্তরিত হয়। ভাগ্যকুল এস্টেটে লালন দরগা কমিটি দরখাস্ত প্রদান করে এবং তার ফলে ভাগ্যকুল এস্টেট ১ টাকা নিরিখে লাখেরাজ সম্পত্তি হিসেবে খাজনা ধার্য করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মতিজান বিবির স্বামী মলম সা কারিকরের আরও তিন ভাই ছিল—আলম, তিলম ও কলম। মলমের এক ভাই আলম সা-এর দুই পুত্র ছিল—ওমর সা এবং মিলন সা। লালন ফকিরের মৃত্যুর পর এরাও আখড়াবাড়ি দেখাশোনা করেছে। এদের সকলের বাড়ি ছিল আখড়াবাড়ি সংলগ্ন।

এই আখড়াবাড়িতে অন্য অঞ্চলের বাউল ফকির এবং সাধুপ্রকৃতির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে থেকেছে। রাতে নিয়মিত গান ও আলোচনাও হয়েছে। পাকিস্তান আমলে মোহিনী মিলের মালিক রমাকান্ত চক্রবর্তী ওরফে কানু চক্রবর্তী লালন ফকিরের কবরটি বাঁধাই করে দেন। প্রায় প্রতিবছর অনুষ্ঠানাদিতে তিনি এবং কুষ্টিয়ার লালনভক্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা আর্থিক সহযোগিতা দান করেছেন। ১৯৬৩ সালে কুষ্টিয়ার তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব কাজী গোলাম আহাদ, জেলা পরিষদ এবং সরকারি সাহায্যে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র, প্রধান ফটক এবং লালন সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জেলা প্রশাসকগণের সহযোগিতায় অন্যান্য নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়।

১৯৭৬ সালে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র 'লালন একাডেমি'তে রূপান্তরিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে একটি কমিটি রয়েছে। বস্তুত লালন ফকিরের গান ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও উৎসবাদি পরিচালনা করা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। তবে কিছুসংখ্যক ফকির মনে করে, লালন মাজার তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এর তত্ত্বাবধানের সব দায়দায়িত্ব ফকিরদের। এদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তারা বিভিন্ন উৎসবাদিতে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

লালন মাজার শরিফের পরিচালনা নিয়ে আদালতে কেস হয়েছে। লালন একাডেমির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। এখানে ধর্মের নামে নিয়মিত গাঁজা খাওয়া এবং কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারীর দ্বারা অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটছে। ইদানীং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে উৎসবাদিতে প্রচুর জনসমাগম হয়, ফলে বাউলদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দৌলতপুর

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার মরিচা ইউনিয়নে বৈরাগীরচর গ্রামে মৃত ভাদুশাহ ফকিরের মাজার ও আখড়াবাড়ি আছে। প্রতিবছর চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে এই আখড়াবাড়িতে নিয়মিত সাধুসেবা হয়ে থাকে। ভাদু শাহের প্রচুর শিষ্য আছে। কিংবদন্তি আছে যে, পদ্মা নদীর ভাঙনের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য গ্রামবাসী ফকিরকে অনুরোধ জানালে তিনি নদীতে ডুব দেন এবং একদিন পরে উঠে এসে বলেন যে, পদ্মা নদী এই গ্রাম থেকে সরে যাবে। অতঃপর পদ্মা নদী অন্যদিকে বাঁক নেয় এবং দীর্ঘদিন কোনো ভাঙন হয়নি বলে লোকশ্রুতি আছে।

দৌলতপুর থানার প্রাগপুরে নৈরশাহ নামে আরও একজন ফকিরের আখড়াবাড়ি আছে। এসব আখড়ায় তাদের গুরুর নামে নিয়মিত সাধুসেবা হয়ে থাকে। এ ব্যতিরেকে এ থানার মথুরাপুরে কেনু ফকির, ভেলু শাহ এবং প্রাগপুরে ফরিদ ফকির ও খাসমথুরাপুরে সামসুল ফকিরের আখড়াবাড়ি আছে। এসব আখড়াবাড়িতে নিয়মিত সাধুসেবা হয়ে থাকে।

কুষ্টিয়া : কুমারখালী

কুষ্টিয়া সদর থানার বেলঘড়িয়া গ্রামে কোকিল শাহ ও তার স্ত্রী যশোদা ফকিরাণীর আখড়াবাড়ি আছে। কোকিল শাহ বেশ কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। এতদঞ্চলে তিনি লালনভক্ত ফকির হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বাউল মতবাদের অপর একজন নামী ফকিরের নাম কালু শাহ। তিনি লালন শাহের অনুসারী ছিলেন। কুমারখালীর চড়াইকোল গ্রামে তার মাজার আছে। কুমারখালী থানার দমদমা গ্রামে তক্‌কেল শাহ একজন বিখ্যাত বাউল ফকির ও সংগীতশিল্পী ছিলেন।

এছাড়া কুষ্টিয়া সদর থানার বৃত্তিপাড়া গ্রামে সৈয়দ আলি ফকির, আলমপুরের মোজাহার ফকির, সৈয়দ ফারাজি, দহখুলা গ্রামের সাচ্চা ফকির, রাজাপুরের গেদো ফকির, সোনাই ডিঙ্গি গ্রামে পাঁচুশাহ এবং চড়াইকোলে আজিজ ফকিরের আখড়াবাড়িতে প্রায়ই সাধুসেবা এবং অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। এসব সাধু ফকিরের প্রচুর শিষ্য আছে। তারাই সাধুসেবার খরচ বহন করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য, লালন শাহের ছেঁউড়িয়া গ্রামে মৃত ইয়াসিন ফকির, স্বরূপ শাহ্, দুর্লভ শাহ, নিজাম শাহ এবং আবদুল গনি শাহের বাড়িতে সাধুসেবা হয়ে থাকে।

খোকসা

খোকসা থানার হেলালপুর গ্রামে বক্‌কার ফকিরও একজন ভেকধারী ফকির। তার অনেক শিষ্য আছে। প্রতিবছর তার আখড়াবাড়িতে সাধুসেবা হয়। এই থানায়

আরও অনেক বাউল ফকির এবং লালন ও পাঞ্জু শাহের অনুসারী আছে। প্রতিবছর তাদের গুরুর নামে তারা নিজবাটীতে সাধুসেবার আয়োজন করে থাকে।

মীরপুর

মীরপুর থানার খলিশাকুণ্ডি গ্রামের আবদুর রব লালনশাহী ঘরানার একজন বিশিষ্ট ফকির। তার বাড়িতে নিয়মিতভাবে সাধুসেবা হয়। বিশিষ্ট বাউল ফকির মহিন শাহ ফরিদপুর জেলার অধিবাসী হলেও তিনি ১৯৬২ সালের পরে কুষ্টিয়ায় চলে আসেন। তার গুরু ছিলেন মানিকগঞ্জ জেলার ঝিটকার আবদুর রশিদ। মহিন শাহ একজন তাত্ত্বিক সাধক ছিলেন। প্রথমজীবনে তিনি লালনশাহী ঘরানার অনুসারী ছিলেন না। পরবর্তীকালে কুষ্টিয়ায় ছেঁউড়িয়াতে এসে তিনি লালন অনুসারী হন। তিনি নিজেও প্রচুর গান লিখেছেন এবং সুর করেছেন। সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক লালন গানের শিক্ষাদান প্রকল্পে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বাউল ফকির খোদা বখশের স্থলাভিষিক্ত হন। মীরপুর থানার হালসা গ্রামে তাঁর আখড়াবাড়ি আছে।

ভেড়ামারা

ভেড়ামারা থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বাউল ফকিরদের নিজস্ব আখড়াবাড়ি আছে। এসব বাউল ফকিরদের মধ্যে ঘোড়া শাহ, আরমান শাহ, দুলাল শাহ, সোলেমান শাহ এবং ওমর ফকিরের আখড়াবাড়িতে নিয়মিত সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বাউল ফকিরেরা নিজেদের আখড়াবাড়িতে যে সাধুসেবা করে থাকে তা তাদের মৃত গুরুর মৃত্যুদিন বা স্মরণ উপলক্ষে হয়ে থাকে। গুরু যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেও সাধুসেবা হয়ে থাকে। তবে সব বাউল ফকির সাধুসেবা করে না। যারা ভেকধারী এবং গুরুস্থানীয় কিংবা অবস্থাপন্ন—এসব বাউল ফকির এই সাধুসেবার আয়োজন করে থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার সেবাদাসী এই সাধুসেবা দিয়ে থাকে। কোনো বাউল ফকির মৃতগুরুর সাধুসেবায় না যেতে পারলে পরে তার নিজের বাড়িতে ক্ষুদ্রাকারে সাধুসেবা দিয়ে থাকে।

মাতবাড়িয়াতে ঘোড়া শাহ ফকিরের আখড়াবাড়িতে নিয়মিত ওরশ হয়ে থাকে। এখানে বাউল সংগীতসাধকদের সমাগম বেশি হয়। তিন দিন তিন রাত সংগীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে। গোলাপনগরে সোলেমান শাহ দরগা কয়েক বিঘা জমির উপর। সোলেমান শাহ পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে স্বাধীনতাযুদ্ধকালে নিহত হন।

যাদবপুর আখড়া : মেহেরপুর

যাদবপুর আখড়া মেহেরপুর জেলার সদর থানায় অবস্থিত। মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ১৫/২০ মিনিটের পথ। মাথাভাঙ্গা নদীর গা ঘেঁষে বাউল ফকিরদের এই

আখড়া। বাউল ফকির কলিমুদ্দিন সা ওরফে কালি ফকিরের মাজারকে কেন্দ্র করে এই আখড়া গড়ে উঠেছে। এই আখড়ায় আসতে পথে একটি ব্রিজ পড়ে। মাথাভাঙ্গা নদীতে প্রায় সময় কোনো পানি থাকে না। যাদবপুর একেবারে পশ্চিমবাংলার (ভারত) সীমান্ত জেলা নদীয়ার সন্নিকটে। দূরত্ব ৫-৬ মাইল হবে। কলিমুদ্দিন ফকিরের মৃত্যুর পর তার সেবাদাসী বা স্ত্রী জোবেদা এই আখড়ার মালিক। ৫ বিঘা সম্পত্তির উপর আখড়াবাড়িটি স্থাপিত। আখড়াবাড়ির একপাশে কলিমুদ্দিন সা-এর মাজার। ৩০ শে ফাল্গুন এখানে সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। কলিমুদ্দিন সা লালন ফকিরের ভক্ত। এখানে যারা আসেন তারা সবাই লালন, পাঞ্জু সা এবং তাদের অনুসারীদের ভক্ত। বাংলা ১৩৪৫ সালে আখড়াবাড়ি গড়ে ওঠে। কলিমুদ্দিনের গুরু ছিলেন ফটিক মণ্ডল। স্ত্রী জোবেদার গুরু ভোলা খান। জোবেদা জানালেন, আখড়ায় অনুষ্ঠানের সময় খরচ হয় কয়েক লক্ষ টাকা। তাঁর ১০০০ ভক্ত রয়েছে। এরাই অনুষ্ঠানের খরচ বহন করে। মাঠে সম্পত্তি ৯ বিঘা।

এখানে ফকিরদের থাকা-খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আমি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। এখানে বেশ কয়েকজন স্থায়ী ফকির এবং তাদের সেবাদাসী আছে। আশপাশের অধিবাসীগণ যারা এদের মত ও পথ পছন্দ করে না, তারা নানা অসামাজিক কার্যাদির অভিযোগ তোলে। মেহেরপুর জেলায় এটি বড় আখড়া। এ ছাড়াও মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বাউলদের বাড়িতে আখড়া আছে। অনুষ্ঠানের সময় পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবাংলা থেকে বাউল বৈষ্ণবে ভরে যায়। বলা চলে এদের কোনো পাসপোর্ট লাগে না। সীমান্তে উভয়পক্ষের সীমান্ত প্রহরীরা এদের ঠেকায় না।

মেহেরপুর যাদবপুর কালি ফকিরের আখড়াবাড়ির একপাশে থাকেন বাউল সংগীতশিল্পীদের অন্যতম প্রবীণ ও নামী শিল্পী ঝড়ু শাহ। যৌবনকালেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। এখন বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দোতারায় বাউলগান গেয়ে থাকেন। অপূর্ব কণ্ঠ এবং অপূর্ব তার দোতারার বাজনা। মুলাজান বিবি তার সেবাদাসী—এখন স্ত্রী বলেই পরিচিত। তার বড় ধরনের আখড়াবাড়ি নেই। এখানেও সাধুসেবা হয়। তবে সীমিতভাবে। ঝড়ু শাহের আসল বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলোকদিয়া গ্রামে, এক হিন্দু-পরিবারে তাঁর জন্ম। গান গাইতে জানতেন এবং সেই সুবাদে বাড়িঘর ছেড়ে তাঁর গুরু জনাব আলী শাহের নিকট দীক্ষা নেন, সাধনসঙ্গিনী ছিলেন মুলাজান। উভয়ের এখন বয়স হয়েছে। ঝড়ু শাহ অসুস্থ, চোখে তেমন দেখেন না। ভক্তেরা প্রায় তাঁর আখড়াবাড়িতে আসেন।

এই গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে আর একটি গ্রাম, নাম রাজাপুর। এই গ্রামে বেশ কয়েকজন বাউল থাকেন। বাউল সাধনতত্ত্বে পণ্ডিত নেহাজউদ্দিন এই গ্রামে বাস করতেন। সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পিতা ও মাতা ফকির ছিলেন। এবং

তাদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে সাধুসেবা হয়েছে। মেহেরপুর অঞ্চলে ঝাঁঝা গ্রামের আজমত শাহ এবং ফতেহপুর গ্রামের দৌলত শাহ বিশিষ্ট বাউল সাধক ও ফকির। এদের বসতবাটিতে নিয়মিত সাধুসেবা ও অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। মাতু শাহ ওরফে মাহতাবউদ্দিন শাহ একজন বিশিষ্ট বাউল গায়ক ও সাধক। তাঁর বাড়ি গাংনী থানায়।

চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বাউলদের বসবাস আছে। কোথাও কোথাও এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা প্রভৃতি অঞ্চলে বাউল ফকিরদের বাড়িঘর আছে। কিন্তু এখানে লালন সা বা কলিমুদ্দীন সা-এর আখড়াবাড়ির মতো বড় কোনো আখড়া নেই। তবে এদের বাড়িগুলো অনেকটা আখড়া প্রকৃতির। কেউ গেলে তার থাকা-খাওয়ার তেমন অসুবিধা নেই। বিভিন্ন সময়ে এরা নিজেদের বাড়িতেই সাধুসেবা করে থাকে।

আলমডাঙ্গা থানার ফরিদপুর গ্রামে বেশ কয়েক ঘর বাউল বসবাস করে। এদের মধ্যে বেহাল শাহ্-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি অতি প্রবীণ বাউলসংগীত শিল্পী এবং সাধক। তাকে কেন্দ্র করে এই গ্রামে অবস্থিত বাউল ফকিরদের বসতবাটিকেই আখড়াবাড়ি মনে করা যায় এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের দীক্ষা গুরুর নামে 'ওরশ' ইত্যাদি হয়ে থাকে।

এমনিভাবে চুয়াডাঙ্গা শহরের সন্নিকটে বেলগাছি গ্রামে হেদায়েত আলী শাহের বাড়িতে বাউল ফকিরদের আখড়া আছে। হেদায়েত আলী ভালো বাউলসংগীত শিল্পী এবং মাঠেও জমিজমা আছে। অবস্থা বেশ ভালো। হেদায়েত আলী গৃহী বাউল, স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে সংসার। আমি তার বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছি এবং তার ও অন্যান্য শিল্পীর গান শুনেছি।

চুয়াডাঙ্গা থেকে ৮ মাইল দূরে শরৎগঞ্জের পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামে বাউলদের বসতবাড়ি আছে। চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য অঞ্চলেও বাউলদের আখড়া আছে। এসব গ্রামের নাম—কুশোডাঙ্গা, ছয়ঘড়িয়া, কালাপোল, জয়রামপুর, ভুলটিলা প্রভৃতি।

আলমডাঙ্গা থানার জাঁহাপুর গ্রামে বেহাল শাহের সংগীতশিষ্য খ্যাতনামা বাউল খোদাবখ্শের বসতবাটি। এই বাড়িটিও একটি আখড়া এবং তার পুত্র লতিফ আখড়াবাড়ির দায়িত্বে আছে। তবে এরা সকলেই গৃহী।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে লালন শাহের সমকালে অথবা পরে যারা বাউলসাধক হিসেবে গীত রচনায় এবং শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন তাদের মধ্যে কুবির গোঁসাই, অমূল্য শাহ, ননীগোপাল গোঁসাই, শুকচাঁদ, খোরশেদ শাহ অন্যতম। চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তর্ভুক্ত আলমডাঙ্গা থানার ফরিদপুর গ্রামে ৭শ ঘর

বাউল-ফকিরদের বসবাস। এরা অবশ্য অধিকাংশই গৃহী বাউল। এই গ্রামে রণগাজী বিশ্বাসের বাগানবাড়িতে বাউলদের আখড়া আছে। রণগাজী বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব আখড়ায় সাধুসেবার সময় গুরুদক্ষিণা হিসেবে প্রচুর আয় হয়ে থাকে। এই আয়ের কিছু অংশ ব্যয় হয় অনুষ্ঠানে ও সাধুসেবায়। লালন ফকিরের ছেঁউড়িয়া আখড়ায় পানের বরোজ ছিল বলে শোনা যায়। এসব থেকেও প্রচুর আয় হতো।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও যেমন—রাজবাড়ী, ফরিদপুর, যশোর, মাগুরা, পাবনা, রংপুর, রাজশাহীতেও বাউল-ফকিরদের আখড়া আছে। অতীতে বিক্রমপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা এবং সিলেট অঞ্চলেও বাউলদের বেশকিছু আখড়া ছিল বলে জানা যায়। উত্তরবঙ্গে নীলফামারীতেও বাউলদের আখড়া আছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Wilson, *Religious Sects of the Hindus*, London, 1861
২. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, কলকাতা, ১৮৭০
৩. W.W. Hunter, *Statistical account of Bengal*, Vol. II (Nadiya and Jessore), London, 1875
৪. H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal*, Vol, II, Calcutta
৫. Pramatha Nath Bose, *A History of Hindu Civilisation during British Rule* Vol, I, Calcutta, 1894
৬. Jogendranath Bhattacharjaya, *Hindu Castes and sects* 1896. Calcutta.
৭. Abdul Wali, *On Curious Tenets Practices of a Certain Class of Faqirs in Bengal*, Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. V, No. 4, 1900, Calcutta.
৮. ক্ষিতিমোহন সেন, *বাংলার বাউল*, ১৯৪৯ সনে প্রদত্ত লীলা বক্তৃতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪।
৯. Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1976 (reprinted)
১০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান*, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৩৭৮
১১. মুহম্মদ *মনসুরউদ্দীন, হারামনি* ১-৮ খণ্ড, ঢাকা।
১২. ক্ষেত্র গবেষণা, ড. আনোয়ারুল করীম।

১৩. Deviprasad Chattopadhyaya, *Lokayota*, New Delhi 1968, P. 58-65. Also see Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults,* Calcutta, 1976, P. 20
১৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* কলকাতা ১৪০০, পৃ. ২১৪-২১৯; আরও দেখুন, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ*, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ২
১৫. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৭
১৬. A. Barth, *The Religions of India*, London 1906, P. 109-10, Also see T.W., Rhys Davids, *Buddhism*, London, 1896, P-23.
১৭. A. Barth, Ibid P. 131-132
১৮. Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious cults*, Calcutta, 1976. PP. 14-34
১৯. এ যাবৎকালে আবিষ্কৃত সাহিত্য-নিদর্শন হিসেবে 'চর্যাগীতিকা' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিতম পরিচয় বহন করে। এই গীতিকাগুলি মূলত সাধনসংগীত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুফিসাধকদের মধ্যে কয়েকটি শাখায় সংগীতের প্রচলন ছিল। এসব সুফিরা পারস্য থেকে ভারতবর্ষেও এসেছিল। অতীতকাল থেকে পারস্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল এবং সুফিধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। এ থেকে অনুমিত হয় যে সংস্কৃতির এই ভাববিনিময়ে তৎকালীন সমাজে স্বাভাবিকভাবে সংগীতকে সাধনার অঙ্গ বিবেচনা করা হত। অবশ্য লোকসংগীতই সব সংগীতের আদিতম প্রকাশ। এ সম্বন্ধে অঙ্গার প্রসাদ বলেন : Indian Civilization has been conceived by some scholars, as a primary or indigenous civilization. It is ascertained that it has developed through orthogenetic process being the element of little tradition, or local culture of the village folk into the systematic abstract and reflective dimensions of the 'great tradition' of the literate. In such a case the great tradition becomes the case of the primary civilization and serves as a standard for indentity for those who share it as members of common civilization. The little traditions mutually interact with the great tradition through the process of universaltization..." (Onkar prasad, *Folk music and Folk Dances of Benaras, introduction*, Calcutta, 1987, P. 1-2)
২০. M.L. Roy Chaudhury, *The State and Religion in Mughal India,* Calcutta, 1951. P. 127
২১. Ibid.
২২. Syed Mahmudul Hasan, Islam, Dhaka, 1980, P. 240

২৩. ইসলামে অধ্যাত্মবাদের ধারা হযরত মোহাম্মদ (দ.) থেকে শুরু হয়েছে বলে কোনো কোনো মহলে এমন ধারণা প্রচলিত আছে। এই পর্যায়ে আল্লাহ, মৃত্যু এবং দোজখের ভয় এই অধ্যাত্মসাধনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পারস্যে এসে তা পরিবর্তিত হয়। হাসান বলেন : "While Arabian mysticism was the outcome of the true devotional religious spirit of Islam embodied in the Qur'an and the Hadith, the Persian mysticism was the off-shoot of unislamic influence which gave it speculative, theosophical and pantheistic character. Started simply as contemplative and ascetic movement. Sufism during and after the second century Hijri of Islam developed into a syncretic organisation, assimilating foreign elements, passing through the stages of mysticism, theosophy and pantheism"—Syed Mahmudul Hasan, op. cit. P 313, also see P. K. Hitti, *History of the Arabs* P. 39.

২৪. Kshitimohan Sen, Medieval *Mysticism of India*, London 1929 P. 68-69

২৫. Ibid, P. 87-109, 112-113, 115, 119

২৬. Suniti Kumar Chatterji, *Islamic Mysticism*, Iran and India, Indo-Iranica Vol. No. 2, October 1946.

২৭. সুধীর চক্রবর্তী, *সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান*, কলকাতা, ১৯৮৫ পৃ ৪৮-৪৯.

২৮. Annemarie Schimmel, *Islam in the Indian Sub Continent* (Muslim life and Customs) the Netherlands, 1980 P. 106-149

২৯. Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, New Jersay 1983 P. 51. আমি আমার ক্ষেত্র গবেষণায় এসব 'মাজার' 'থান' এবং 'দরগা'তে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে রোগমুক্তির জন্য উপস্থিত থেকে প্রার্থনা এবং শিন্নি বিতরণ করতে দেখেছি। কুষ্টিয়াতে ঝাউদিয়া মসজিদ এবং মাজার, স্বস্তিপুর মসজিদ এবং মাজার, লালন শাহ-এর মাজার ছাড়াও বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি দরগা এবং মাজার ইত্যাদিতে শত শত লোকের ভিড় জমে রোগমুক্তির আশায়। এসব লোক মনে করে যে, পীর কখনও মৃত্যুবরণ করেন না। তিনি সবসময় জীবিত। কবরে তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্যে আছেন। এমনিভাবে ভারতের বিভিন্ন মাজারে—যেমন হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতীর মাজার (আজমীর), হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মাজার (দিল্লি), এবং অন্যান্য স্থানে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে রোগমুক্তি এবং জীবনে উন্নতির জন্য মানৎ করে থাকেন এবং শিন্নি নিয়ে উপস্থিত হন। আটরশীতে (ফরিদপুর) এমন ভিড় প্রতিনিয়ত জমে। হযরত শাহ জালাল, হযরত খানজাহান আলী, হযরত শাহ মখদুম প্রভৃতি সুফি ফকিরদের মাজারে সারা বছর ভিড় জমে।

৩০. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
সুলতানা আফরোজ, *জাতিভেদ প্রথা এবং বাংলাদেশের বাউল সমাজ*, কুষ্টিয়া, ১৯৮৮

৩১. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৬, কলকাতা, পৃ. ২১০, ১৮৯

৩২. সুলতানা আফরোজ, প্রাগুক্ত, *ভূমিকা*। আমি নিজেও ক্ষেত্রগবেষণায় এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

৩৩. হুমায়ুন কবির, *বাংলার কাব্য*, কলকাতা ২য় সংস্করণ ১৩৬৫ পৃ. ৪১

৩৪. হুমায়ুন কবির, প্রাগুক্ত, পৃ ১২

৩৫. Bengal District Gazetters (Nadia.) Census of 1872-1911) P 47-49.

৩৬. Wilson, H. *Hindu Religion or An Account of the Various Religious sects of India*, London 1861. P. 171-179

৩৭. Pramatha Nath Bose. *A History of Hindu Civilization during British Rule*, Vol, I 1894 p. 107-110

৩৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২-৬৩। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক আউলচাঁদ নামে একজন মুসলমান ফকির। তিনি ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া অঞ্চলে রামশরণ পাল নামে এক সদগোপকে দীক্ষা দেন।

৩৯. শ্রী সুধীর চক্রবর্তী, *বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৪

৪০. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষ উপাসক সম্প্রদায় প্রথমখণ্ড*, কলকাতা, পৃ. ২১৯

৪১. Pramatha Nath Bose, Op. cit. P. 116

৪২. Jogendranath Bhattacharyaya, Hidhu Caste and Sects, 1896

৪৩. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষ উপাসক সম্প্রদায় প্রথমখণ্ড*, কলকাতা, দ্র. সুধীর চক্রবর্তী, *সাহেবধনী তাদের গান*, কলকাতা ১৯৮৫ পৃ. ১০-১১

৪৪. কুবির চাঁদ বা গোঁসাই—সাহেবধনী লোকধর্মের প্রধান গীতিকার। তিনি সাহেবধনীদের অন্যতম গুরু চরণপালের শিষ্য। তাঁর বাড়ি বৃত্তিহুদা নদীয়া। তাঁর গানের সংখ্যা সহস্রাধিক। তাঁর শিষ্য যাদুবিন্দু গোঁসাই, বাড়ি বর্ধমান জেলার পাবলখি গ্রাম। তাঁর অনেক গান আছে। দ্র. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৪৫. Risley, H. H. *Tribes and Castes of Bengal*, Vol, II. p. 347

৪৬. রেয়াজউদ্দিন আহমেদ, *বাউল বংশ, ফৎওয়া*, রংপুর।

৪৭. সুধীর চক্রবর্তী, *সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৪৮. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৪৯. গুরুসদয় দত্ত, *শ্রীহট্টের লোকসংগীত*, কলকাতা পৃ. ২৫-২৮

৫০. (১) আহমদ শরীফ, *বাংলার সুফী সাহিত্য*, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৯
(২) মুহম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা পুণর্মুদ্রণ, ১৯৪৮
(৩) মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, ১ম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৩৫

৫১. গুরু সদয়দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক (সম্পাদিত) *শ্রীহট্টের লোক সংগীত*, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৫০
৫২. (১) হাসন রাজা চৌধুরীর ছেলের নাতি ড. সমীরণ দেওয়ানের মতে রজা চৌধুরী সঠিক নয়। হাছন রাজা চৌধুরী নিজেই তাঁর নামের বানান হাছন রাজা চৌধুরী লিখেছেন তার পাণ্ডুলিপিতে।
(২) মুহম্মদ আবদুল বারী, *শীতালাং শাহ*, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৪২
৫৩. গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৫৪. ঐ
৫৫. শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪, পৃ. ৪৭
৫৬. Harish Johari, *Dhanwantari*, Introduction by Michael Gerber M.D. Calcutta, 1986, P. IV
৫৭. Harish Johari. Op. cit, p. VI-VII
৫৮. শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৫৯. Abdul Wali. *On Curious Tenets and Practices of a Certain class of Fakirs in Bengal*, in the journal of the Anthropological Society of Bombay. 1900, Vol. V. No. 4

বাউল গবেষণার ইতিহাস

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের সাহিত্যকর্ম শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে বাউলসমাজের সর্বপ্রথম উল্লেখ ও তাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় একটি ঐতিহাসিক দলিল। এ থেকে অনুমিত হয় যে, বাউল সাধক সম্প্রদায়ের ইতিহাস অতি প্রাচীন।

বলেছি, বাউল সাধকেরা ইরানীয় বাতেনী সুফিসাধকদের একটি শাখা বিশেষ। এরা দেহভিত্তিক গুপ্তসাধনপন্থী, প্রচলিত রীতিনীতি এবং জাতিবর্ণবিরোধী, মানবতাবাদী, সাধনসম্প্রদায়। এদের অনেকেই কবিতাপ্রেমী ও সংগীতাশ্রয়ী ছিল। সুফিসাধনার প্রারম্ভকালেই এরা তাদের অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য সমাজে ধিকৃত হয়েছে। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সবধর্মের সমন্বয় সাধন ও সংগীতাশ্রয়ী হওয়ায় সাধারণ সমাজে এরা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে এদের 'ভাবুক' এবং 'অসামাজিক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] মালাধর বসু কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থেও এদের জীবনাচরণের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা হয়েছে।[২] চর্যাগীতিকার বৌদ্ধসিদ্ধার্যগণের সঙ্গে এদের অনেকাংশ মিল লক্ষ করা যায়।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, সুফিসাধনায় গ্রিক, বৌদ্ধ, খ্রিস্টীয় এবং ইসলামের একটি সমন্বিত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বাতেনী ধারায় যুক্ত হয়েছে দেহবাদ। বৌদ্ধদর্শন ভারতের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাউল সাধনায় এই বৌদ্ধদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। গ্রিকদর্শনে আত্মাকে জানার বিষয়ে যে গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং তা থেকে যে আত্মজিজ্ঞাসা যা বিভিন্ন দর্শনের উপজীব্য, বৌদ্ধদর্শনে তার পরিচয় রয়েছে। বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্র ও যোগসাধনার অনুপ্রবেশ ঘটে। বাউল সাধনায়ও এসবের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। কিন্তু বাতেনী সুফিধর্ম হিসেবে বাউলের যে পরিচয় আমরা লাভ করি তার উৎসমূল 'বেদ'-এর পূর্বকালে। বাইবেল ও কুরআন মজিদে এই ধর্মের উল্লেখ রয়েছে।[৩] বাইবেল ও ইসলাম এই ধর্মমতকে অস্বীকারই শুধু নয়, তাকে ধিক্কৃতও করেছে। অত্র গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

বাউলদের সম্পর্কে নানা নিবন্ধ প্রকাশ পেলেও তাদের বিষয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রী ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী।[৪] রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি বাউলদের জীবনী ও গান সংগ্রহ করেন এবং তার ফলে তিনি 'বাংলার বাউল' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি কবীরের সাধনার সঙ্গে বাউলদের একটি মিল খুঁজে পান। তিনি লক্ষ করেন, বেদ ও উপনিষদেও বাউল মতাদর্শের উল্লেখ রয়েছে। তিনি বাউলদের পরকীয়া প্রেমে বিশ্বাসী সর্বধর্মানুসারী 'সহজিয়া' মতাবলম্বী বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও বাউল ও সুফিসাধকদের উল্লেখ করলেও 'বাংলার বাউল' গ্রন্থটি ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও তার আলোচনার কারণে এটি একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তুত, তাঁর আলোচনায় লালন ফকির ও কবীরের নানা পদের ব্যাখ্যা রয়েছে এবং উভয় সাধকের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের প্রয়াসও নেওয়া হয়েছে। আধুনিক গবেষণার দৃষ্টিতে তাঁর আলোচনা অনেকটা আবেগধর্মী, উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং অতিকথনের দোষে দুষ্ট হতে পারে, তবু তিনি বাউলদের বিষয়ে জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় পথিকৃৎ।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বাউলদের সঙ্গে বেদ ও উপনিষদে যে তত্ত্বের মিল তিনি খুঁজে পেয়েছেন তা অনেকটা কষ্টার্জিত। কারণ বাউলেরা বেদ-বিরোধী। সব ধর্মগ্রন্থে 'বা'আল বা 'বাওল' মতবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। আর্য-সম্প্রদায় ভারতীয় উপমহাদেশে যে 'বেদ' ধর্মগ্রন্থের প্রবর্তন করেছিল, তাতে পরবর্তীকালে নানা ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে বাউলদের মতাদর্শের সঙ্গে বেদের সামঞ্জস্যের ঘটনাটি এই 'অনুপ্রবেশ'-এর ফসল। বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের ফলে নানা সাধনমার্গ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং সুফিমতবাদকে ইসলাম বলে গ্রহণ করা হলে 'ইসলাম' সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিচায়ক হবে। ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদেরকে ইসলাম ও সুফিসাধনার অনুসারী বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, যা যথার্থ নয়। তবে তিনি বাউলদের নানা বৈশিষ্ট্যের যে আলোচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। বাউলদের 'পরকীয়া' প্রেমের উৎস পাওয়া যায় কবি হাজিফ, ওমর খৈয়াম প্রমুখ ফারসি কবির রচনায়। চৈতন্যদেবের মধ্যে যে 'পরকীয়াবাদ' তা অনেকটা এই সুফিপ্রভাবিত। কবীর, লালন এবং বাউলদের রচনায় এই পরকীয়া প্রেমই মুখ্য। ক্ষিতিমোহন সেনও বাউলদের পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের কথা এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন তিনি বাউলদের

সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের সম্পর্কে নানা আলোচনা ও বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর অল্পবয়সে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় 'বাউলের গান'[৫] সম্পর্কে তাঁর আলোচনা তৎকালীন সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাউল বিষয়ে কোনো গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেননি। তবে তাঁর গানে, কবিতায়, ছোটগল্পে, উপন্যাস ও নাটকে, বাউল এবং বাউলগান নানাভাবে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাউল সম্পর্কে আলোচনায় একজন সাহিত্যিকের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজেকে 'রবীন্দ্রবাউল' বলে অভিহিত করলেও তিনি কোনো বাউলের কাছে দীক্ষিত হননি এবং তাদের আচার-আচরণও অনুসরণ করেননি। তাঁর সাহিত্যকর্মে বাউল ধর্মসাধনা ও গান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাউল বিষয়ক গবেষণায় রবীন্দ্রনাথ নিজেও আজ আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ *Sadhana* এবং *The Religion of man*-এ বাউলদের অধ্যাত্মচেতনার বিষয়টি তাঁর নিজের দর্শনের সঙ্গে একীভূত করে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথই অন্যতম ব্যক্তি যিনি লালনের গান সংগ্রহ করে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর পরে যিনি বাউলগানের সংগ্রহ ও আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। 'হারামণি'[৬] নামে কয়েকখণ্ডে তিনি বাউল এবং অন্যান্য বিষয়ে পদকর্তাদের জীবনী ও তাদের অসংখ্য রচনা সংগ্রহ করেন এবং সে-সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বস্তুত, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন আমাদের লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত সম্পর্কে যে অবদান রেখে গেছেন তা সমগ্র জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। তাঁর সংগ্রহ ও আলোচনা হয়তো কারো কারো দৃষ্টিতে বিজ্ঞানভিত্তিক হয়নি, কিন্তু এ-কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে তাঁর ক্ষেত্রগবেষণায় তিনি যে দিকনির্দেশনা করেছেন তা আমাদের অনুসরণযোগ্য। এ-কথা সত্য যে তাঁর আলোচনায় যেসব তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, তা অনেকাংশে বিশ্লেষণধর্মী হয়নি। কিন্তু তিনি এ সবকিছু নিয়েই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। বাউলদের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, বাউলদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে আহরিত। অবশ্য বাউলদের এই ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যও যুক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান, তিনি বাউলদের জীবনাচরণের সঙ্গে কখনও কখনও একাত্ম হয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বাউল গবেষণায় এটি তাঁর বড় সাফল্য।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের পরে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল বিষয়ে গবেষণার এক নতুন ধারা সংযোজন করেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থ 'বাংলার বাউল ও

বাউলগান'[৭]-এ বাউলসাধনার একটি ঐতিহাসিক পটভূমির উল্লেখ করেন। তবে তাঁর বৃহৎ গ্রন্থের অধিকাংশ আলোচনা অনেকটাই ইতিহাসচর্চামূলক। বাউল সাধনার বিশ্লেষণে এসব তথ্যের অবতারণা তাঁর গ্রন্থের কলেবরই বৃদ্ধি করছে যা একজন গবেষকের অজানা নয়।

তথাপি এ-কথা সত্য যে, তাঁর ক্ষেত্রগবেষণা নিঃসন্দেহে তথ্যসমৃদ্ধ। তবে তিনি বাউলসাধনার বিশ্লেষণে সুফি বাউল এবং বৈষ্ণবকে একীভূত করায় বাউলসাধনার স্বতন্ত্রের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বাউলসাধনায় বৈষ্ণবসাধনার প্রভাব পড়েছে সত্য, কিন্তু বাউলসাধনা বৈষ্ণবসাধনা নয়। তিনি বাউলদের পরিচয়দানে সুফিপ্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে তারা যে পুরোপুরি সুফিসাধনার অনুসারী এমন কথা বলেননি। এক্ষেত্রে তিনি সুফিসাধনার বাতেনী শাখা সম্পর্কে তেমন কিছু আলোকপাত করেননি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নিজ ধারণা ও সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট নয়। তবে এ-কথা সত্য যে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের পরে তিনিই ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। অবশ্য তাঁর এই ক্ষেত্রগবেষণায় বাউল অপেক্ষা বৈষ্ণবদের সঙ্গেই তাঁর অংশগ্রহণ অধিক ছিল, ফলে বাউল তথ্য অপেক্ষা বৈষ্ণব তথ্যে তাঁর গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে উভয় বাংলায় বাউল নামে কথিত সাধকদের অধিকাংশ বৈষ্ণবধর্মানুগ। চৈতন্য এই নতুন ধারার প্রবর্তক।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পর বাউল এবং সংশ্লিষ্ট সাধনায় পুঁথিগত বিদ্যানির্ভর করে গবেষণায় সাফল্য লাভ করেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত।[৮] তাঁর গবেষণা *Obscure Religious Cults*-এর একটি বড় অংশ *The Bauls of Bengal*। তাঁর গ্রন্থটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা এবং বিশ্লেষণ সাহিত্যধর্মী। তিনি বাউলদের বিভিন্ন গান ও সে-বিষয়ে নানা লেখকের রচনা পর্যালোচনা করে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাউলসাধকেরা আমাদের সংস্কৃতির একটি বড় বাহক। এই সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িক। সুফিভাবনার উদার মানবতাবাদ, জাতিবর্ণহীন চেতনা এবং সর্বোপরি সমন্বিত আদর্শ বাউলদের ধর্মকে সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। কিন্তু এদের যথার্থ জীবনপদ্ধতি এবং জীবনচর্চা সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন কোনো কাজ হয়নি। আমি আমার আলোচনায় ক্ষুদ্র পরিসরে এসবের ইঙ্গিত দিয়েছি। এ বিষয়ে আরও ব্যাপক কাজ হওয়া সম্ভব।

আব্দুল ওয়ালী

বাউল বিষয়ে ইংরেজিতে শশিভূষণ দাশগুপ্তের পূর্বে আব্দুল ওয়ালী[৯] *On Curious Tenets and Practices of A Certain Class of Faqirs in Bengal* নামে একটি বড় প্রবন্ধ লেখেন *Journal of the Anthropogical Society of Bombay*, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বাউল এবং এদেশীয় ফকিরদের জীবনাচরণ এবং ধর্মবিশ্বাসের একটি ছবি তুলে ধরেন। আব্দুল ওয়ালী চাকরির সুবাদে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণকালে বাউল ফকির ও অন্যদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর পূর্বে ইংরেজিতে বাউল ও অন্যান্য ফকিরদের জীবনাচরণ সম্পর্কে এত তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা হয়নি। এই প্রবন্ধে আব্দুল ওয়ালী লালন ফকিরের গান ও জন্মসংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

তবে তিনি বাউলসাধনাকে ইসলামবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে এক 'শয়তানী বিশ্বাস' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন :

> So for as I am aware, these beliefs are formerly confined to a class of Hindu Tantiris and Bairagis of the Baule order, but since a period of 30 or 40 years men of other castes e. g. Musalman of the lower order, are believing in this satanic beliefs.

চার্লস ক্যাপওয়েল

ইংরেজিতে 'বাউলদের গান' বিষয়ে অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন চার্লস ক্যাপওয়েল। তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ-ডি লাভ করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম *The Music of the Bauls of Bengal*.[১০] এই গ্রন্থে তিনি পশ্চিমবাংলার বৈষ্ণব-বাউলদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গানের উপর আলোচনা করেছেন। ফলে বাংলাদেশের বাউলদের আচার-আচরণ এবং তাদের গান অনালোচিত রয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলার বাউলেরা বৈষ্ণব-প্রভাবিত এবং এদের অনেকেই বৈষ্ণব-বাউল হওয়ায় তাদের গানের বিষয়বস্তু ও সুর ইত্যাদি বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়েছে। তবে এই গ্রন্থে চার্লস ক্যাপওয়েল একজন সংগীতবিশেষজ্ঞ হিসেবে পশ্চিমবাংলার বাউলদের জীবন ও তাদের গান সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে তথ্যবহুল। তাঁর লেখা বিশ্লেষণধর্মী, কিন্তু বাউল এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য দেখেননি। তাঁর আলোচনায় কেবল পশ্চিমবাংলার বাউলদের আলোচনা রয়েছে। বাংলাদেশের বাউলদের সম্বন্ধে তিনি কোনো কিছু লেখেননি। ফলে তাঁর লেখা একপেশে এবং পূর্ণাঙ্গ নয়।

তাঁর পূর্বে **এডওয়ার্ড সি. ডিমক**[১১] *The Place of the Hidden Moon* নামে একটি গ্রন্থে বাউলদের জীবনাচরণ ও সাধনামার্গ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। চার্লস ক্যাপওয়েল পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু ডিমক বাউলদের সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেননি। তাঁর গবেষণা মূলত বাউল বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাদি নির্ভর।

ইংরেজিতে গবেষণা করেন **জুনি ম্যাকডানিয়েল**[১২] তিনি ভারতের পশ্চিমবাংলায় বাউলদের জীবনদর্শন সম্পর্কে ক্ষেত্রগবেষণা করেন এবং এ বিষয়ে পিএইচ-ডি লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম *The Madness of the Saints*। তিনি তাঁর গ্রন্থে পশ্চিমবাংলার বাউল এবং বৈষ্ণবদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর আলোচনায় তিনি বাউলদেরকে বৈষ্ণবদের শাখাবিশেষ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তাদের ওপর সুফিধর্মের প্রভাবের কথা তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি বাউল সাধনাকে বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে বিচার করেছেন। তাঁর গ্রন্থটি অত্যন্ত আবেগআশ্রিত এবং অনেকাংশে বাস্তবতা বর্জিত। ক্ষেত্রগবেষণায় তিনি সাধকদের তথ্যের ওপর নির্ভর করেছেন। তিনি বাংলাদেশের বাউলের বিষয়ে এদেশের গবেষকদের কথা উল্লেখ করেছেন সত্য কিন্তু তিনি এদেশীয় বাউলের সম্পর্কে কোনো গবেষণা করেননি।

বাংলাদেশে বাউল ও লালন শাহ সম্পর্কে পাকিস্তান আমল থেকে নানা মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। **কবি আব্দুল কাদির**[১৩] 'সুফি ও বাউল পদাবলী' সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধে বাউলকে সুফিধর্মানুসারী বলে চিহ্নিত করে এই সাধনাকে 'গুহ্য-তত্ত্ব ও গূঢ় রসের সাধনা' নামে উল্লেখ করেছেন। তিনি সিরাজ সাঁই, লালন শাহ, দুদ্দু শাহ প্রমুখ মরমীয়াপন্থীদেরকে দ্বৈতবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে তেমন কোনো বিস্তারিত আলোচনা করেননি।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ[১৪] 'লালন শাহের কাব্যে আত্মনিবেদনের সুর' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন : "বাংলাদেশেও নৈষ্টিক হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বাইরে একশ্রেণীর সাধক ছিলেন এবং এখনও আছেন, যাঁরা খোদাকে চেয়েছেন এবং চান। হিন্দুদের মধ্যে তাঁরা হলেন বাউল, সাঁই, কর্তাভজা প্রভৃতি। আর মুসলমানদের মধ্যে তাঁরা হলেন ফকীর দরবেশ। ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বড় একটা নেই। ...একদল ফকীর হয়তো নামাজ রোজা ইত্যাদি ইসলামের অবশ্যকরণীয় কোন কাজই করেন না। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ করেন যে তাঁরা আল্লাহ ও রছুলের ভক্ত। তাঁরা বলেন, সাধারণ মুসলমান আছে শরীয়ত বা ধর্মের আচার নিয়ে, আর আমরা আছি মারেফাত বা ধর্মের অন্তরঙ্গতা নিয়ে। মৌলবীরা এঁদের বে–শরা ফকীর বলে নাম দেন। তাঁরা এঁদের ইসলামের গণ্ডীর বাইরে ফাকির বলে ফৎওয়া দেন। সত্যই দলিল-প্রমাণে এই সমস্ত বে-শরা ফকীর ইসলামের গণ্ডীর বাইরে

পড়েন। তবু এ কথা সত্য যে, তারা নিজেরা ভাবে যে, যতই ভুল হোক তারা খোদার ভক্ত। মদন বাউল, লালন শাহ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।"

কবি জসীমউদ্‌দীন[১৫] 'তত্ত্ব সাহিত্যে কবি লালন' শীর্ষক প্রবন্ধে লালন শাহকে তত্ত্বগত সাধক বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সাধনায় সুফিসাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাবের বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তবে তিনি বাউল সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। তিনি বলেন : ফকিরী মতে আর এক তত্ত্ব 'আলেক সাঁই'। অনেক গবেষকের মতে আরবি 'আলোক' শব্দ থেকে 'আলেক' শব্দের উৎপত্তি। 'আলোক' মানে 'বীর্য'। সুতরাং লালনশাহী ফকির সম্প্রদায়ের 'আলোক সাঁই' আসলে তাঁদের 'বীর্য প্রভু'। এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ফকির সম্প্রদায়ের লোকেরা বুঝি 'বীর্য'কে প্রভুজ্ঞানে পূজা করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়।

"আলেক সাঁই শব্দের অর্থ 'অলক্ষ্য স্বামী'। খোদাতা'লার অনন্ত নাম, আর অসংখ্য সাধকের অনন্ত সাধনা এবং অনন্ত সম্বোধন। আমি লালন শাহের জীবনী ও সাধনা নিয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধানে কুষ্টিয়া-যশোরের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছি। অসংখ্য লালনপন্থী সাধকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। লালন শাহের সাক্ষাৎ-শিষ্য ভোলাই শাহের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।... তাছাড়া আমি হাজার ফকিরের সম্মেলন দেখেছি। তাঁরা সারিবদ্ধভাবে যখন খাদ্যবস্তু নিয়ে বসেন, তখন সমবেতভাবে 'আল্লাহ-আলেক' উচ্চারণ করেন। তারপর আহার শুরু হয়। তাই 'আলেক' বলতে আল্লাহকে বুঝায় এ কথা নতুন করে আর বলার দরকার নেই। আমার ক্ষেত্রানুসন্ধানের অভিজ্ঞতা থেকেই তা পরিষ্কার হয়েছে।"

কবি জসীমউদ্‌দীন বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের বাউলদের সঙ্গে মিশেছিলেন এবং তাদের জীবনাচরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু বাউলদের সাধনা ছিল গুপ্ত এবং দীক্ষিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যদের পক্ষে এই সাধনার স্বরূপ জানা সম্ভব ছিল না। আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ ছিল। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

আমাদের দেশে অনেকেই লালন এবং বাউল সাধনা সম্পর্কে লেখালেখি করেছেন। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এবং কবি জসীমউদ্‌দীনের মতো ক্ষেত্র গবেষণাভিত্তিক নয়। অবশ্য এ-কথা বলা অসংগত নয় যে তাদের এই ক্ষেত্রগবেষণা ছিল অনেকটাই আলাপচারিতার পর্যায়ে। গবেষণার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অংশগ্রহণভিত্তিক অভিজ্ঞতা, ইংরেজিতে বলা হয় Participatory observation। বাইরে থেকে কেবল আলাপ-আলোচনায় পরিপূর্ণ তথ্য জানা সম্ভব নয়। বাউলদের প্রতিটি গানই দেহভিত্তিক গুপ্তসাধনা নির্দেশক। এ গানের তথ্য দ্ব্যর্থবোধক। এজন্যে এই গানের ভাষাকে আলো-আঁধারি ভাষা বলা

হয়। চর্যাগীতিকাও এমনি দ্ব্যর্থবোধক। সুতরাং বাউল এবং লালন ফকির বা অন্যান্য বাউলদের সম্বন্ধে যে আলোচনাই হোক না কেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক না হলে তা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিংবা দার্শনিক হোক– তা যথার্থ হবে না।

যা হোক, আমাদের দেশে বাউলদের বিশেষ করে লালন ফকির সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা যারা করেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন **দেওয়ান আজরফ**।[১৬] তিনি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং দেশজ সুফি কবি ও সাধক হাছন রাজার বংশোদ্ভূত বলে তিনি দাবি করেন। তিনি দর্শনের ভাষায় লালন ফকির এবং হাছন রজার গানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ সব ব্যাখ্যায় 'চমক' আছে সত্য কিন্তু তা তাদের গান কিংবা সাধনার সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

প্রফেসর মুহম্মদ এনামুল হক সুফিসাধনা সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় বাউলদের বিষয়ে মূল্যবান আলোকপাত করেছেন। *A History of Sufism in Bengal*[১৭] তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। বাউলদের তিনি সুফিসাধকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সে অনুসারে তিনি তাদের গান ও সাধনা সুফিমানদণ্ডে বিচার করেছেন। তবে তাঁর আলোচনার অনেকটাই পুঁথিপুস্তকনির্ভর। তাঁর আলোচনায় তিনি বাউলদেরকে সুফিসাধনার একটি বিশেষ ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় সুফিদের যে প্রভাব পড়েছে এবং তা পরবর্তীকালে দেশজ বাউলদের জীবনাচরণেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিশ্লেষণ অসাধারণ।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের[১৮] নামও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি ইরানীয় সুফিসাধনার সঙ্গে উপমহাদেশীয় তথা বাংলার সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সাযুজ্য ঘটিয়েছেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের পর এদেশে লালন সম্পর্কে যিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি **অধ্যাপক আবু তালিব**।[১৯] বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর লালন শাহ ও লালন গীতিকা দুই খণ্ডে প্রকাশিত। তাঁর পূর্বেই আমার লেখা **'বাউল কবি লালন শাহ'**[২০] ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটিই লালন সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ। আবু তালিব তাঁর গ্রন্থাদিতে লালনের অনেক গানেরও সংকলন করেছিলেন। তাঁর গবেষণায় অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান আমরা লাভ করি। তবে তাঁর গবেষণায় যুক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিমত প্রাধান্য পাওয়ায় কেউ কেউ তাঁকে 'একদেশদর্শী' বলে সমালোচনা করেছেন। তথাপি তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে যে, তিনি তাঁর গবেষণায় অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি লালন ফকিরের একটি 'সিজরা নাম' এবং তাঁর স্বাক্ষরিত দলিল আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেন।

অধ্যাপক আবু তালিব মূলত, লালন ফকিরকে নিয়ে গবেষণা করেন এবং সুফি ও বাউলের মধ্যে একটি পার্থক্য সূচিত করেন। তাঁর মতে, লালন ফকির জন্মগতভাবে সুফিবাদী মুসলমান এবং তাঁর সাধনা ইসলামের অধ্যাত্মসাধনার

অন্তর্ভুক্ত। তিনি লালন জীবনী সম্পর্কে দুদ্দু শাহ বিরচিত পুঁথির আবিষ্কারক। তবে প্রায় সকলেই এই পুঁথির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে লালন শাহ যে একজন বাতেনী সুফি দরবেশ বা বাউল ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গানে ফারসি সুফি সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গে দেশজ ভাবনার অর্থাৎ তন্ত্রযোগ এবং সহজিয়া সাধনার সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু লালনের গানে যে সুফিধারা তা কতখানি ইসলাম অনুসারী—এটা বিচার্য।

ড. এস. এম. লুৎফর রহমান[২১] অধ্যাপক আবু তালিবকে প্রাথমিক পর্যায়ে অনুসরণ করলেও পরে তাদের মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং লুৎফর রহমান লালন জীবনী সম্পর্কে অধ্যাপক আবু তালিব ব্যবহৃত অনেক তথ্যের দাবিদার বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তবে অধ্যাপক আবুল তালিব ও ড. এস. এম লুৎফর রহমান ঝিনাইদহ অঞ্চলের একজন শিক্ষিত বাউল সাধক আব্দুল লতিফ সাফি আনহু প্রদত্ত তথ্যাদিকে নির্ভর করেছেন।

ড. লুৎফর রহমান চর্যাগীতিকাকে বাউলগান এবং বাজুল থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি ইত্যাদি মতামত ব্যক্ত করলেও বাউলগুরু লালন শাহকে দরবেশী ফকির বলে উল্লেখ করেছেন। ড. লুৎফর রহমান অত্যন্ত পরিশ্রম করে পুঁথিপুস্তক ঘেঁটে তাঁর মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সাথে আমি সর্বক্ষেত্রে একমত না হলেও তাঁর গবেষণায় যে অনেক নতুন তথ্য এসেছে সে সম্বন্ধে তিনি প্রশংসার দাবিদার। তবে এসব তথ্য সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক না-হওয়ায় গ্রহণে অনেকের আপত্তি উঠেছে।

ড. আহমদ শরীফ ড. লুৎফর রহমানের পিএইচ-ডি গবেষণার নির্দেশক ছিলেন। তিনি সরেজমিন বাউল এবং লালন বিষয়ে কোনো গবেষণা না করলেও লাইব্রেরি ও পুঁথিপুস্তক ঘেঁটে 'বাউল তত্ত্ব'[২২] নামক গ্রন্থে বলেন, বাউলেরা বোধি তথা বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য আচারবিরোধী এবং মৈথুনাত্মক পরকীয়া ও রাগানুগ সাধনার পক্ষপাতী। বাউল মতবাদও ভোগ মোক্ষবাদ। শিব-শক্তি, রাধা-কৃষ্ণ ও পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, সুফিমত ও নানা লৌকিক তত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বলে বাউল মতে অসংগতিও কম নেই। তবু বাউলদের উপর বৈষ্ণব মতের (চৈতন্যচরিতমৃতের মাধ্যমে) এবং সুফিমতের (কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে) প্রভাবই অত্যধিক।' বাউলদের মধ্যে এসবের প্রভাব রয়েছে কিন্তু তথাপি বাউলেরা বৈষ্ণব নয়। ড. আহমদ শরীফ নিজে এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান করেননি। বাউলদের সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-চেতনা নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনাপ্রসূত এবং অন্যের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভরশীল।

এ.এইচ.এম. ইমামউদ্দিন[২৩] তাঁর গ্রন্থ 'বাউল মতবাদ ও ইসলাম'-এ বলেন, "...বাউলধর্মকে বেদ বহির্ভূত ও কুরআন বিবর্জিত ধর্ম বলা উচিত।" ইমামউদ্দিন

কুষ্টিয়ার লালন অনুসারী বাউলদের আচার-আচরণ ইত্যাদি দেখে উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন। তাঁর মতানুসারী অপর লেখক জনাব **সিরাজউদ্দিন**[২৪] তাঁর 'লালনতত্ত্বে ভূমিকা' গ্রন্থে বাউলদেরকে ইসলামবিরোধী এবং বৈষ্ণব সহজিয়া মতাবলম্বী বলে উল্লেখ করেছেন।

ড. আবুল আহসান চৌধুরী[২৫] 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক' এবং লালন বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে লালন ফকির সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। বাউল এবং লালন বিষয়ে গবেষণায় এসব তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর গবেষণায় একটি বড় অংশ জুড়ে আছে লালন ফকিরের জীবনী। তিনি লালন ফকিরকে কুষ্টিয়ার অধিবাসী এবং হিন্দু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতামতের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে একমত না হওয়া গেলেও লালন বিষয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্ব বহন করে। ড. আবুল আহসান চৌধুরী লালন সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের সংকলক প্রণেতা। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেন ও কাঙ্গাল হরিনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

ম. মনিরউজ্জামান[২৬]ও লালন বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এসব গ্রন্থে লালনজীবনী প্রাধান্য পেয়েছে। ম. মনিরউজ্জামান সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতিকে তাঁর গবেষণাকর্মে ব্যবহার করেছেন।

ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী ফরাসি ভাষায় বাউলদের নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। লালন বিষয়ে ইংরেজিতে তাঁর প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি বাউলদেরকে 'বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও সুফি মতবাদ প্রভাবিত' সাধন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন।

ড. খন্দকার রিয়াজুল হক : ড. খন্দকার রিয়াজুল হক বাউলগুরু পাঞ্জু শাহের বংশধর। তিনি পাঞ্জু শাহের জীবনী ও কর্মের উপর পিএইচ-ডি লাভ করেছেন। পাঞ্জু শাহ এবং লালন শাহ সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি পাঞ্জু শাহ-এর সাধনাকে লালন ফকির এবং অন্যান্য বাউলসাধকদের থেকে স্বতন্ত্র 'ঘরানা' বিশিষ্ট বলে মনে করেন। তাঁর গবেষণা তথ্যসমৃদ্ধ এবং বর্ণনামূলক।

ড. সোলায়মান আলী সরকার[২৭] সম্প্রতি বাউলদর্শন বিষয়ে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'বাউল দর্শন'। তিনি বলেন, "বাউল গীতিকায় যেমন সুফি মুরশীদ তত্ত্বের প্রভাব তেমনি বৌদ্ধ সহজিয়া, হিন্দু তান্ত্রিক বৈষ্ণব সহজিয়া গুরুবাদের প্রভাব আছে। বাউল মতবাদ সুফি ও বৈষ্ণব মতবাদের মতো দেহভিত্তিক এক অধ্যাত্মসাধনা, সেখানে মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে বন্ধনহীন সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে গুরু বা মুরশীদ। মুসলমান বাউলেরা তত্ত্বজ্ঞ সাধক, মুরশীদের কাছ থেকেই তত্ত্বকথা শ্রবণ, তত্ত্বসার গ্রহণ ও তত্ত্ববিষয়ক চিন্তা করতে শিখে। এটাই বাউলদর্শনের মূল লক্ষ্য।"

ড. সোলায়মান আলি সরকার বাউলসাধনাকে সুফি মতবাদপুষ্ট দেশজ সাধনা বলে উল্লেখ করেন। তাঁর গবেষণা মূলত পূর্বসুরিদের গবেষণা এবং পুস্তক ও পত্রপত্রিকা নির্ভর। তিনি আলাপচারিতার মাধ্যমে বাউলদের নিকট থেকে তথ্য নিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাদের সাধনাকে প্রত্যক্ষ করেননি। ফলে তাঁর গবেষণা অনেকটা পূর্বসুরিদের ধ্যানধারণার বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর গ্রন্থে তেমন নতুন কোনো কথা বলতে সক্ষম হননি। তবে বাউলতত্ত্বকে তিনি একজন দার্শনিকের চেতনায় উপলব্ধি করেছেন।

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল[২৮] তাঁর *Origin of the Bauls And Their Philosopy* প্রবন্ধে বাউলদেরকে ইরানীয় সুফি ফকিরদের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বাউলসাধনা সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা না-থাকায় বিভিন্ন বাউল শব্দের ব্যাখ্যাদানে তিনি বিভ্রান্ত করেছেন।

ড. মযহারুল ইসলাম[২৯] বাউলদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন "এ-কথা স্বীকার করি, বাউল মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ একটি বিশেষ ধর্মভিত্তিক ছিল এবং সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীর শেষদিক অবধি বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিকতার ভগ্নাবশেষকে অবলম্বন করে এদেশে একটি ধর্মসম্প্রদায় হিসেবেই তারা হয়তো পরিচিত ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উদ্ভূত বাউল সম্প্রদায়কে বিশেষ একটি ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কেননা এই সময়ের মধ্যে বাউলদের অধিকাংশই মুসলিমসমাজ থেকে এবং কিছু কিছু অংশ হিন্দুসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে একটি সংগীতসম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তুলেছিল। তাদের সম্মুখে মূল আকর্ষণ ছিল ধর্ম নয়, সংগীত। সংগীতের একটি অনাবিল আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে গানের দল গড়ে তোলে... তাদের মূল লক্ষ্য একটি বিশেষ ঢঙের সংগীতসাধনার মাধ্যমে একটি বিশেষ ভাব সাধনার প্রকাশ করা।"[৩০]

ড. মযহারুল ইসলামের এই মতামত আংশিক সত্য। কিন্তু অতীতকাল থেকেই বাউলেরা একটি সাধনসম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত। বর্তমানে এই সম্প্রদায় বাউলসাধনাকে একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিয়েছে।

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস[৩১] গ্রন্থের লেখক তৎকালীন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক **মোহাম্মদ আকরম খাঁ** বাউলদেরকে যৌনাচারে লিপ্ত একশ্রেণীর বৈষ্ণব বলে উল্লেখ করেছেন। এদেরকে তিনি ভিক্ষোপজীবী নেড়ার ফকির বলেও চিহ্নিত করেছেন। তিনি বাউলদেরকে ইসলামবিরোধী বলেও উল্লেখ করেছেন।

'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া'র[৩২] লেখক **মাওলানা রেয়াজউদ্দীন** এবং তাঁর পথ অনুসারী অন্য লেখকদের বক্তব্য অত্র গ্রন্থে যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ভারতবর্ষী উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের লেখক **অক্ষয়কুমার দত্ত**[৩৩] তাঁর গ্রন্থে

বাউলদের পরিচয় দিতে গিয়ে আউল ও বাউল শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এরা একশ্রেণীর বৈষ্ণব ও সুফিসাধক। তিনি এদের কদর্য আচরণ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ তথ্যসমৃদ্ধ তবে অনেকটাই বর্ণনামূলক এবং বিবরণধর্মী। অক্ষয়কুমার দত্তের অনেক আগে থেকে আমাদের লৌকিক সাহিত্যে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে বাউল, বাউর এবং আউল শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চদশ শতকে **মালাধর বসুর** 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যগ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপিতে প্রক্ষিপ্তভাবে বাউল শব্দের ব্যবহার রয়েছে।[৩৪]

সপ্তদশ শতকে রচিত সীতারাম দাসের **'ধর্মমঙ্গল'** কাব্যে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[৩৫]

অষ্টাদশ শতকে **কৃষ্ণদাসের 'রামমঙ্গল'**-এও 'বাউল' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাউলরা মন্ত্রসাধকও বটে।[৩৬] **ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'** কাব্যগ্রন্থেও বাউল একজন বস্তুবাদী বাউল সাধক।[৩৭] **ময়নামতি গোপিচন্দ্রের** গানেও 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "গুপ্তবেশে বাউল রূপে আছে এই ঠাঁই।"[৩৮]

ব্রিটিশ ভারতে **প্রমথনাথ বসু**[৩৯] তাঁর **A History of Hindu Civilization during British Rule** গ্রন্থে ১৮৯৪ সালে বাউলদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন :

> Like the Spasta-dayaka this is also a recent Vaishnava sect though its date of foundation is unknown. The Bauls do not shave or cut their hair. They are recruited chiefly from among the lower castes, and as class, are believed to be highly immoral, According to the last Census there were, in 1891, six hundred and sixty six male and seven hundred and seven female Bauls in Bengal.

প্রমথনাথ বসু 'নাড়া' এবং 'সহজী'দেরকেও বাউলের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে :

> The Nyras and Sahajis differ but little from the Bauls. Their sexual morality at least in practice is believed to be very low. All these sects are confined to Bengal.[৪০]

প্রমথনাথ বসু তাঁর গ্রন্থের অপর একস্থানে দরবেশ-ফকীরদেরকেও[৪১] বাউলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন :

> When a novice is admitted he receives a kaupin or loin cloth, a khirka or gown reaching down to the ankles, and a cocoanut shell (kishti) in which he is to collect alms; like the Aghoris and some of the Baul sects, he is required to taste various disgusting substances, in order to show his superiority to ordinary prejudices. Darvesh Faqris never cut their hair or shave, and instead of washing with water, smear themselves and their cloth with mustard oil. Celebacy is professed, but not practised and every akhra or community or ascetics has serveral woman atached to it... Animal life is never taken, and it is deemed sinful to break off the branches or even the leaves of a tree. Before the tombs of the founders, and on receiving a present, a very elaborate obeisance is made by kneeling, touching the ground with the forehead, and smearing the chest and face with dust.

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, বাউল সম্প্রদায়ের নানা শাখাগোষ্ঠীও এদেশে ছিল এবং তাদের আচার-আচরণের সঙ্গে বাউলদের মিল ছিল। কিন্তু প্রমথনাথ বসু বাউলদেরকে বৈষ্ণব বলে উল্লেখ করলেও কবে তাদের উদ্ভব এবং কে প্রতিষ্ঠাতা এ সম্বন্ধে কোনো তথ্যাদি দিতে সক্ষম হননি। তাঁর বর্ণিত দরবেশ ফকিরদের আচার-আচরণ বাউলদের যে সমগোত্রীয়—এমন লক্ষ করা যায়।

১৯৮৬ সালে **যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**[৪২] বলেন :

> Baul—A class or beggars pretend to be baul on account of religious fervour, and try to uphold their pretension by their fantastic dress, dirty habits and the queer philosophy of their songs. The Bauls are low class men and make it a point to appear as dirty as possible.

যোগেন্দ্রনাথ আরও বলেন :

> Bauls are spoken of Vaisnavas, but properly speaking they are a godless sect. They do not worship any idol, and on that account, their religion may be regarded as a very advanced one.

প্রথমনাথ বসু এবং **যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য** বাউলদের সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা থেকে সহজে অনুমিত হয় যে সমাজে এই ধরনের সাধকেরা এককালে ধিক্কৃত ছিল এবং এ কারণে তাদের সাহিত্য ও সংগীত অতীতকালে সংগৃহীত হয়নি। এঁরা উভয়েই বাউলদেরকে বৈষ্ণব বলে চিহ্নিত করেছেন। অনেকে 'কাপালিক' এবং 'অবধূত'দের আচার-আচরণও বাউলদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

বাউলেরা যে সমাজজীবনকে কলুষিত করেছে—এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সংরক্ষণশীল ব্যক্তিগণ প্রতিবাদে মুখর হয়েছে।[৪৪] তাদের চিন্তা-ভাবনা তৎকালীন সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। ইতোমধ্যে **মাওলানা রেয়াজউদ্দীনের** 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' সম্পর্কে বলা হয়েছে। **মুনসী মেহেরুল্লাহ** তাঁর 'মেহেরুল ইসলাম' গ্রন্থে নাড়ার ফকিরদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

নাড়ার ফকির যারা আছে গাঁয় গাঁয়
এই ঘোরে বহুজনে ফেলিল দাগায়
বহুতি আফছোছ হয় তাহাদের তরে
বানাইল পশু তারা বহুতর নরে ॥

... ...

মুনসী মেহেরুল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে বাউল ও নাড়াবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে **কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার** পরবর্তীকালে লালন ফকিরের গানে প্রভাবিত হয়ে 'ফিকিরচাঁদ' নামে বাউল দল গঠন করলেও প্রথম দিকে তিনিও লালন ফকির এবং তার বাউলসাধনা সম্পর্কে বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। তাঁর সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় 'জাতি' শীর্ষক নিবন্ধে তার প্রমাণ মেলে :

> ...লালন শাহ নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করে না সে কথা বলা বাহুল্য। এখন পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, একদিকে ব্রাহ্মধর্ম জাতির পশ্চাতে খোঁচা মারিতেছে, ওদিকে গৌরবাদিরা তাহাকে আঘাত করিতেছে, আবার সেদিকে সম্প্রদায়িরা, ইহার পরেও স্বেচ্ছাচারের তাড়না আছে। এখন জাতি তিষ্টিতে না পারিয়া বাঘিনীর ন্যায় পলায়ন করিবার পথ দেখিতেছে।

বাউল গবেষণায় এসব তথ্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। লালন শাহের সমকালীন জীবনে শুধু নয়, তার অনেক আগে থেকেই বাউলসম্প্রদায় এদেশের গোঁড়া হিন্দু

ও মুসলমান সমাজে নিন্দিত হয়ে আসছে। বাউল সংক্রান্ত গবেষণা, প্রবন্ধাদিতে যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে; আগামীদিনে এ বিষয়ে যারা গবেষণাকর্মে রত হবেন, তাদের সহায়তা দেবার উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধ রচিত। সকলের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া এখানে সম্ভব হচ্ছে না—কারণ সব তথ্যই আমার নিকট নেই। আধুনিককালে অনেকেই এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা না করলেও তাঁরা যেসব প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন তা থেকে অনেক তথ্য পাওয়া সম্ভব।

আশুতোষ ভট্টাচার্য[৪৫] একজন স্বনামধন্য গবেষক এবং পণ্ডিত। তিনি পশ্চিমবাংলায় (ভারত) ফোকলোর আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি নানা নিবন্ধে বাউলদের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এমনি একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> বাউলের ধর্ম আলোকচারী ধর্ম; ইংরেজীতে ইহাকে Mystic বলা যায়। বিশেষতঃ এই ধর্ম একান্ত গুরুমুখী। সেইজন্য অনেক সময় বাহির হইতে ইহার অন্তর্মুখী রহস্যের কথা বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। ...বাউল ধর্মের উদ্ভব যেভাবেই হোক না কেন কালক্রমে যে ভাবে নানা ধর্মের প্রভাববশতঃ ইহা একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আজ সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না।

ড. মতিলাল দাশ ও শ্রী পীযুষকান্তি মহাপাত্র[৪৬] কর্তৃক সম্পাদিত 'লালন গীতিকা' গ্রন্থে বাউল সাধনা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> বাউলদের সাধনা মূলতঃ দেহ-কেন্দ্রিক, কিন্তু ভোগাত্মক দেহবাদ নহে। মানবদেহকে তাহারা মন্দির রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই দেহমন্দিরের মধ্যেই দেবতা বাস করেন। সেই দেবতা মানুষের অন্তরতম সত্তা, অটল অধর আত্মা। দেহই অনন্ত আনন্দের আঁধার। পূর্ণানন্দরূপ চিৎ-সত্তা এই দেহে বিরাজমান। সেই আত্মাকে তাহারা মানবরূপী কল্পনা করিয়া তাহাকে 'মানুষ' 'মনের মানুষ' 'অধর মানুষ' 'রূপের মানুষ' 'ভাবের মানুষ' 'সোনার মানুষ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই অন্তরতম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি ও তাহার সহিত আত্মবিস্মৃত চেতনাবিহীন একাত্মতা উপলব্ধি–বাউল সাধনা।

লালন ও বাউলসাধনা সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থকারদ্বয় কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলসাধকদের নিকট থেকে নানা শব্দের অর্থও জেনেছিলেন। এ কারণে গ্রন্থটি বাউল গবেষণার দিকনির্দেশিকা বলা যেতে পারে। তবে সব অর্থ যে সঠিক, তা নয়। বহিরাঙ্গনে যে-অর্থ প্রযোজ্য তারা কেবল সে-অর্থই জেনেছিলেন। বাউলসাধনা গুপ্ত এবং দেহবাদী হওয়ায় দীক্ষিতজন ব্যতিরেকে সচরাচর অন্য কেউ জানেন না।

গুরুসদয় দত্ত লিখিত 'শ্রীহট্টের লোকসংগীত'[৪৭] সুফি ও বাউল সাধনা সম্পর্কে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। গুরুসদয় দত্ত শ্রীহট্টের লোকসংগীতে সুফি ও

বাউল প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বাউলসাধনাকে একটি মিশ্রসাধনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এই সাধনায় সুফি ও বৈষ্ণব চেতনার একটি সমন্বিত ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করেছিলেন। তবে তাঁর ধারণায় বাউলসাধনায় সুফিসাধনার প্রভাবই প্রবল।

ডক্টর পীযূষকান্তি মহাপাত্র তাঁর *The Folk Cults of Bengal*[৪৮]-এ বাউল সম্পর্কে আলোচনায় শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults*-এর বাউল বৈশিষ্ট্যগুলোকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর বক্তব্যে বাউল ধর্মীয় সাধনায় তন্ত্র এবং অন্যান্য সহজিয়া সাধনার প্রভাব সর্বাধিক। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সুফি দর্শন।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তাঁর বাউলগান ও দুদ্দুশাহ[৪৯] গ্রন্থে বাউলদের বৈষ্ণব সুফি প্রভাবিত একটি সাধন-সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দুদ্দু শাহ ছিলেন লালন ফকিরের প্রধান শিষ্য। তাঁর গানেই বাউলসাধনার মর্মকথা প্রকাশ পেয়েছে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের আলোচনা বিশ্লেষণধর্মী। তিনি সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বাউলগান ও সাধনাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে **সুলতানা আফরোজ** লিখিত 'জাতিভেদ প্রথা ও বাংলাদেশের বাউল সমাজ'[৫০] একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সুলতানা আফরোজ মূলত একজন সমাজবিজ্ঞানী। তিনি কুষ্টিয়ার বাউলসাধকদের মধ্যে জরিপ ও ক্ষেত্রগবেষণায় যা পেয়েছেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থটি আকারে ছোট হলেও অনেক নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ। তিনি বাউলদেরকে বৌদ্ধ সহজিয়া বৈষ্ণব এবং সুফিসাধনার একটি সমন্বিত সাধন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে "বাউলসম্প্রদায় মূলত একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী যার উৎপত্তি সাধিত হয়েছে এক প্রতিবাদী মনোভঙ্গির কারণে। জাতিভেদ প্রথা এই প্রতিক্রিয়ার মূলে। সমাজে লাঞ্ছিত হবার কারণে এরা নিজেরাই সমাজ গড়ে তুলেছে।" তিনি আরও বলেন, "বাউল সমাজ জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্যের একটি প্রত্যক্ষ ফসল।... ইসলাম ধর্মে যদিও জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত নেই তবে মুসলিম সমাজে শ্রেণীভেদ প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীভেদ যেমন আশরাফ (উচ্চবর্ণ)-আতরাফদের (নিম্নবর্ণ), তেমনি নিম্নবর্ণের মধ্যেও তা প্রচলিত।" তিনি তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, এর ফলে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সাথে তন্তুবায় বা তাঁতি সম্প্রদায়ের কারো বিবাহ হয় না। এর কারণস্বরূপ তিনি তাদের মধ্যে প্রচলিত কর্মপদ্ধতির ভিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মেয়ে তাঁতি সম্প্রদায়ের কাজ জানে না। তাই সেখানে বিয়ে হওয়া পরিবারের কর্মকাণ্ডে সহায়ক হয় না। কিন্তু এ সত্য ভুলে গিয়ে এখন তাঁতি বা জোলা সম্প্রদায় একে অপর থেকে নীচু বলে তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না—এমন ধারণা সমাজে একশ্রেণীর মানুষের কাছে প্রচলিত।

মুহম্মদ সিরাজউদ্দিন সম্প্রতি প্রকাশিত 'লালন তত্ত্বের ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থে লালন শাহ ও তাঁর অনুসারীদের অমুসলিম কার্যকলাপ ও যৌনাচার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।

সনৎকুমার মিত্র তাঁর 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য'[৫১] গ্রন্থে বাউলসাধনা অপেক্ষা লালনজীবনী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। **তুষার চট্টোপাধ্যায়ও**[৫২] সনৎকুমার মিত্রের মতো লালনজীবনী এবং লালন ফকিরের প্রতিকৃতি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। বাউলসাধনা সম্পর্কে তাদের ধারণা অন্যদের মতো।

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবাংলায় বাউল ও লালন ফকিরকে নিয়ে নানা নিবন্ধ এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে **অধ্যাপক আবদুল হাই, আবু রুশদ, কবীর চৌধুরী, প্রফেসর মনিরুজ্জামান, প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, ড. আব্দুল খালেক, ড. আব্দুল জলীল, জেড এ তোফায়েল** প্রমুখ অন্যতম। ড. মোমেন চৌধুরী লালন বিষয়ে গবেষণার ধারা ও গবেষকদের সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী ফরাসি ভাষায় বাউলদের উপর গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। লালন ও বাউল বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। তবে এদের রচনায় বাউল সাধনা সম্পর্কে কোনো মৌলিক তত্ত্ব পাওয়া যায় না। পূর্বসুরিদের বক্তব্যকেই তাঁরা নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। **প্রফেসর শরীফ হোসেন** তাঁর একটি নিবন্ধে 'লালনজীবনীর উৎস হিসেবে **আব্দুল ওয়ালীর** নিবন্ধ *On Curoius Tenets and Practices of a Certain class of Faqirs in Bengal*-এর প্রথম খোঁজ দিয়েছিলেন। বাউল ও লালন শীর্ষক রচনায় অন্যদের মধ্যে রয়েছেন **আবু জাফর, আমিনউদ্দিন শাহ, আফসারউদ্দিন সেখ, মুনসী আব্দুল মান্নান, ম. আ. সোবহান, ওয়ালিউল বারী চৌধুরী** প্রমুখ লেখকবৃন্দ। এর বাইরেও অনেকে লিখেছেন যাদের সকলের নাম এই মুহূর্তে আমার স্মরণে নেই। সিদ্দিকুর রহমান 'দাদ মানস সন্ধানে' গ্রন্থে কুষ্টিয়ার কবি দাদ আলীর সঙ্গে লালন ফকিরের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বাউল সাধক পাঞ্জু শাহ সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেছেন ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক।[৫৩]

ওপার বাংলায় বাউল বিষয়ে মূল্যবান কাজ করেছেন **শক্তিনাথ ঝাঁ**।[৫৪] তাঁর 'বস্তুবাদী বাউল' একটি উন্নতমানের গবেষণা গ্রন্থ। তিনি ক্ষেত্রগবেষণার ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদ জেলার আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় বাউলসাধনার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা নিয়েছেন। তিনি তাঁর গবেষণার শুরুতে আমার সঙ্গে বাউল বিষয়ে নানা আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর আলোচনার অনেক বিষয় সম্পর্কে আমার দ্বিমত রয়েছে। তিনি পশ্চিমবাংলার বাউলদের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসংগ বলা প্রয়োজন যে, তিনি আমার 'বাউল সাহিত্য ও বাউলগান' এবং *The Bauls of Bangladesh*[৫৫] গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্য গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সর্বত্র তার স্বীকৃতি দেননি। কিছু কিছু তথ্য আমার পূর্বে অন্য কেউ ব্যবহার

করেননি। প্রসংগত বা'আল সুফিদের কথা বলা যায়। ইরানীয় তথ্য এবং গ্রন্থের উল্লেখ আমার পূর্বে কেউ করেননি। তাঁর গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ এবং বিশ্লেষণধর্মী।

প্রসংগত উল্লেখ যে **দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**[৫৬] ইংরেজিতে *Lokayata* এবং বাংলায় লোকায়ত দর্শন-এ বস্তুবাদী অধ্যাত্মসাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমার পিএইচ-ডি অভিসন্দর্ভ '*বাউল : একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা*' আলোচনাকালে আমি দেবীপ্রসাদ চৌধুরীর মতামত সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করিনি। তিনি বাউল বিষয়ে কোনো আলোচনা করেননি। বর্তমান গ্রন্থটি আমার অভিসন্দর্ভের পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত সংস্করণ।

শক্তিনাথ ঝা ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনকেই বাউল সাধনায় প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলাদেশের বাউলদের গান ও তাদের জীবনাচরণ প্রত্যক্ষ করলে তাঁর আলোচনা আরও সমৃদ্ধ হতে পারত। সুফিবাদ সম্পর্কেও তাঁর ধারণা সঠিক নয়। সুফিদের সাধনা সমন্বিত সাধনা হলেও একশ্রেণীর সুফিসাধক শরিয়তকে অস্বীকার করেননি। তাঁরা মারেফতকে গুরুত্ব দিলেও শরিয়তের সকল কর্মকাণ্ডকে অনুসরণ করেছেন। 'বাতেনী' সুফিসাধকেরাই শরিয়তকে অস্বীকার করেছে এবং দেহবাদকে প্রাধান্য দিয়ে এই সাধনাকে গুপ্ত এবং কেবল দীক্ষিত জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এরা প্রচলিত কুরআন মজিদ ও নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ইত্যাদি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছে। ভারত উপমহাদেশে এই দুই শ্রেণীর সাধকের আগমন ঘটেছিল। শক্তিনাথ ঝা তাঁর গ্রন্থে বিভিন্নজনের চিন্তাচেতনার বিশ্লেষণ করেছেন ঠিকই কিন্তু স্পষ্টভাবে তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেননি। তবে তিনি প্রচলিত মতামতকে বিশ্লেষণ করে বাউল সাধনায় সুফি সহজিয়া এবং বৈষ্ণব প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। অতঃপর বাউলদেরকে বস্তুবাদী সাধক হিসেবে গণ্য করেছেন। এ-কথা নতুন নয়। কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা অনুকরণযোগ্য। তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাই।

এই প্রেক্ষিতে **সুধীর চক্রবর্তীর** লেখা 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন'[৫৭] গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। তাঁর গ্রন্থে তথ্য আছে কিন্তু তিনি একজন সাংবাদিকের মতো সেসব তথ্যের বিবরণ দিয়েছেন। তবে সাংবাদিকের মতো সর্বক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ হতে পারেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি 'একদেশদর্শী' হয়ে পড়েছেন। গবেষণার আলোচনা-সমালোচনা বিশেষভাবে কাম্য। কারো গবেষণাকে পরবর্তীজন যে মানবেন—এমন খুব কমই হয়। কিন্তু পূর্বসুরিদের গবেষণা তা তাঁর দৃষ্টিতে যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, তার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে আমাদের গবেষকদের মধ্যে এমন মানসিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈর্ষাকাতরতা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গবিশেষ। লালন ফকিরের জীবনী সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তীর বড় অবদান তিনি আমাদের লোকায়ত সাহিত্যের বিবরণ দানে একটি নতুন ধারা

সংযোজন করেছেন। এই ধারা সরস গল্পের ধারা। বিষয়ের গভীরে না ঢুকেও অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি অনেক কিছুই জানতে সচেষ্ট হয়েছেন। সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে লালনভক্তদের কথিত মুখপাত্র হিসেবে জনৈক ফকির মন্টু শাহ ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের দপ্তরে কুষ্টিয়ার একজন মুসলমান অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন :

> আমরা বাউল। আমাদের ধর্ম আলাদা। আমরা না মুসলমান না হিন্দু। আমাদের নবী সাঁইজী লালন শাহ। তাঁর গান আমাদের ধর্মীয় শ্লোক। সাঁইজীর মাযার আমাদের তীর্থভূমি। আমরা যারা তাঁর ভক্ত আমরা সকলেই এক বিশেষ নিয়মে ভেক গ্রহণ করি। আমাদের সৃষ্টি নেই, মানে বিবাহ নেই—সন্তান জন্ম নেই। আমাদের গুরুই রসুল।
>
> *যেহিতো মুরশিদ সেহিতো রসুল*
> *এই দুইয়ে নেই কোন ভুল*
> *মুরশিদ খোদা ভাবলে জুদা*
> *তুই পড়বি প্যাচে।*
>
> স্যার...ডক্টর সাহেব [অর্থাৎ উক্ত মুসলমান অধ্যাপক]... আমাদের এই তীর্থভূমিতে ঢুকে আমাদের ধর্মের কাজে বাধা দেন। কোরআন তেলওয়াত করেন, ইসলামের কথা বলেন, মিলাদ মাহফিল করে থাকেন—এ সবই আমাদের তীর্থভূমিতে আপত্তিকর। আমরা আলাদা একটা জাতি, আমাদের কলমাও আলাদা–"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ লালন রসুলুল্লাহ"।

সুধীর চক্রবর্তী উপর্যুক্ত বক্তব্যের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন :

> ফকির মন্টু শাহ-র বক্তব্য যদি সাম্প্রতিক লালনপন্থীদের বক্তব্য বলে মনে করি, তবে বুঝতে হবে লালন ফকিরের প্রয়াণের শতবর্ষের মধ্যে তাঁকে ছেঁউড়িয়ার ভক্তমণ্ডলী 'রসুল' [অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, ধর্মবিধির প্রবর্তক, রসুলই নবী] পদে উন্নীত করেছেন। লক্ষণীয় যে লালনের জীবদ্দশায় তাঁর ভক্তমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এতবড় দাবী ওঠেনি এবং তিনি নিজেও এমন সম্ভ্রান্ত পদের দাবীদার ছিলেন না।

সুধীর চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বাউল এবং ইসলামের সঙ্গে বিরোধিতার কারণও উদঘাটিত করেছেন। তিনি বলেন :

> ফকিরেরা সজ্ঞানে এবং সচেতনভাবে ইসলামী মতে যা হারাম, নাপাক, তার ব্যবহার করেন বলে বিরোধিতার আরেকটা কারণ ঘটে। মূলত এইসব বিরোধিতার সূত্র থেকে বাউল ফকির নাড়াদের এককালে দমন ও পীড়ন করা হয়েছে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে। (পৃষ্ঠা ৯৫)

আর একটি বিষয়ে সুধীর চক্রবর্তীর গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো লালন ফকিরের লড়াকু চিন্তায় তিনি উল্লেখ করেছেন :

> হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন : কাঙ্গাল হরিনাথের অপ্রকাশিত 'দিনপঞ্জি'তে দেখি সত্যি সত্যি লালন চরিত্র ভোলা বাউল, আবার প্রয়োজন হলে হতে পারেন জাঁদরেল লাঠিয়াল। হাতের একতারাটি রেখে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাঠিও ধরতে পারেন। কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁর পত্রিকা 'গ্রামবার্তায়' জমিদারের প্রজাপীড়নের খবর ছাপানোর ফলে সেই জমিদার যখন কাঙ্গাল হরিনাথকে শায়েস্তা করার জন্য লাঠিয়াল দল পাঠান, তখন লালন (?) তাঁর দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে ঢিট করে সুহৃদ কৃষক-বন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন।
>
> [হেমাঙ্গ বিশ্বাস, লোক সংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম, ১৩৮৫]

কিন্তু কাঙ্গালকে কেন্দ্র করে লালন ফকিরের লাঠিয়াল হওয়ার এমন ঘটনার কথা এযাবৎকাল কেউ কোথাও উল্লেখ করেননি। লালন ফকিরের কোনো শিষ্য এবং সে সময়ে প্রকাশিত কোনো পত্র-পত্রিকা, এমনকি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় এমনতর সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। লালন ফকিরের সমকালে বাউল ও নাড়ার ফকিরদের বিরুদ্ধে নানা অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য কোথাও তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, এমন শোনা যায়নি।

সুধীর চক্রবর্তী অবশ্য লিখেছেন যে তাঁর নিজেরও এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কারণ হরিনাথের 'দিনপঞ্জি' আজও অপ্রকাশিত।

(দ্র. ব্রাত্য লোকায়ত লালন, পৃ. ২১)

বসন্তকুমার পালের[৫৮] আলোচনা নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য। তাঁর মতামত গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও লালন জীবনী সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি পথিকৃৎ। এক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম।

প্রসংগত উল্লেখ যে, ভারতের পশ্চিমবাংলায় বাউল এবং লালন গবেষকদের মধ্যে অনেকের নাম ও তাদের রচনাবলি আমার জানা নেই। *পলাশ মিত্র* লালন ফকিরের উপর গবেষণা করে পিএইচ-ডি লাভ করেছেন—জেনেছি। কিন্তু তাঁর গ্রন্থ না-থাকায় আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

আদিত্য মুখোপাধ্যায়[৫৯] রচিত 'ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল' গ্রন্থটি বাউলসাধনা সম্পর্কে পুরাতন ধারার একটি নবতর মূল্যায়ন। লেখক তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত মতামতের বিশ্লেষণ করেছেন। **সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়**[৬০] বিরচিত

'বাংলার বাউল কাব্য ও দর্শন' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লেখক তাঁর গ্রন্থে বাউলদেরকে বৈষ্ণবধর্মের একটি শাখাবিশেষ বলে উল্লেখ করলেও অন্যান্য ধর্মসাধনার প্রভাব সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন।

এ ব্যতিরেকে অন্নদাশঙ্কর রায়, ড. দুলাল চৌধুরী, ড. রতনকুমার নন্দী, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, ড. বিমলকুমার মজুমদার, সত্যশিবপাল দেব মহান্ত, ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম প্রমুখ বাউল, কর্তাভজা ও বৈষ্ণব সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন।

ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম[৬১] লালন ফকির সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর 'লালন পরিক্রমা' (১৯৯৪) 'মরমী ব্যক্তিত্ব লালন ফকির' (১৯৯৪) লালন বিষয়ে নানা প্রবন্ধের সংকলন। এসব গ্রন্থে অন্যের রচনাদিও তিনি সংকলন করেছেন। বাউলগানের বেশকিছু ইংরেজি অনুবাদ আমাদের চোখে পড়েছে। বাংলাদেশে *Songs of Lalon Shah* নামে আবু রুশদ বাংলা একাডেমি থেকে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৬৪ সালে। ব্রাদার জেমস প্রকাশ করেন *Songs of Lalon* ঢাকা থেকে ১৯৮৭-এ। জাতীয় পুনর্গঠন কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় *Lalon Shah : Folkpoet of East Pakistan*, ঢাকা থেকে ১৯৬৩ সালে।

১৯৮০ সালে ড. আনোয়ারুল করীম লিখিত *The Bauls of Bangladesh* প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়া থেকে। জেড এ তোফায়েল প্রকাশ করেন *Lalon Shah And the Lyrics of the Padma* রাজশাহী থেকে ১৯৬৮ সালে। এম মিজানুর রহমানের *Myriad Miracle-Lalon's Song* প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। মাহমুদ শাহ কোরেশী বাউলগান ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন *Poems Mystiques Bengalis : Chants Bauls*, UNESCO Paris, 1977। ভারত এবং অন্যান্য দেশ থেকে প্রকাশিত বাউল ও লালন সম্পর্কীয় অনুবাদের মধ্যে Kukertz Josef এর লেখা *Origin and Construction of the Melodies in Baul Songs of Bengal* প্রকাশিত হয় Yearbook of the International Folkmusic Council, Canada থেকে ১৯৭৫। **দেবেন ভট্টাচার্য** প্রকাশ করেন, *The Mirror of the Sky*, ১৯৬৯ সালে লন্ডন থেকে। পরে বাউলগানের এই সংকলন নতুনভাবে প্রকাশিত হয় *Songs of the Bards of Bengal* ১৯৭৮ সালে আমেরিকা থেকে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং মেরী এ্যান দাশগুপ্ত প্রকাশ করেন তাঁদের বাউলগানের সংলকন *Roots in the Void* ১৯৭৯ সালে কলকাতায়। দীপক মজুমদার এবং গ্যাস্টন রোবার্জ লেখেন *The Bauls : Comunicators and Artists* ১৯৭৯ সালে বোম্বাই থেকে।

পৃথ্বিনাথ মুখার্জীর বই *Chants Bauls* প্রকাশ পায় প্যারিস থেকে ১৯৮৫ সালে। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয় **প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের** লেখা *Bauls of Bengal* কলকাতা থেকে।

বিক্ষিপ্তভাবে পত্রপত্রিকায় এবং সংকলনে অনেকের লেখা প্রকাশ পেয়েছে। সবার লেখা বা নাম আমার জানা নেই। এর মধ্যে মাহমুদ শাহ কোরেশী লিখেছেন *Lalon Shah Order of Bangladesh : Perspective in Folk Religion* তাঁর সংকলন *Culture and Development* ১৯৮২ সালে ঢাকা থেকে।

অন্যদের মধ্যে রয়েছেন :

Sunil Kumar Banerjee, *Lalon—A Great Sanit Poet and Composer,* Calcutta Quarterly, January 1987.

R.M. Sarkar, *Lalon's Philosophy*, Calcutta Quarterly, June 1987.

Bose, Sanat Kumar, "*Bauls of Bengal.*" In Folkmusic and Folklore : An Anthology, Vol. I. edited by Hemango Biswas, Calcutta 1967.

Roy, Leela : Translation of Kshitimohon Sen's work, *The Bauls of Bengal, Visva Bharati*, n.d.

Sen, Kshitimohan, "*The Baul Singers of Bengal*" Appendix to the *Religion* of Man by Rabindranath Tagore, London, 1931.

Dimock, Edward C. Jr. *Rabindranath Tagore—the Greatest of the Bauls of Bengal*, The Journal of the Asian Studies, Michigan 1957.

Capwell, C.H. *The Erotic Beliefs of the Bauls of Bengal*, The Journal of the Asian Studies, Vol. XXXIII, No. 2. 1974

Salmon : Carol "*A Contemporary Sahayiya Interpretaion of the Bilvamangal, Cintamoni legend as sung by Sonatan Das Baul" In patterns of Changes in Modern Bengal*, edited by Richard L. Park, Michigan state University, Asian Languages Centre, 1979.

ক্যারল সলোমন বাংলাদেশে প্রথমে কুষ্টিয়াতে আসেন আমার কাছে ১৯৮২ সালে। কুষ্টিয়াতে ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে তিনি উপর্যুক্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পরে তাঁর এই লেখা

ইনস্টিটিউটের জার্নাল ফোকলোর-এ প্রকাশিত হয়। তিনি পরপর তিন বছর আমার এখানে আসেন এবং বাউল ও লালন ফকিরের বিভিন্ন গানের ব্যাখ্যা, শব্দার্থ আমার কাছ থেকে শেখেন ও রেকর্ড করেন। এদেশের বাউলসাধনা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। তাঁর লেখা উপর্যুক্ত প্রবন্ধ বাংলাদেশের বাউলসাধনার সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এ যাবৎকালে প্রকাশিত বিদেশী লেখকদের বাউল ও লালন সম্পর্কীয় রচনায় বাউল এবং লালন সাধনার গূঢ়রহস্য ব্যক্ত হয়নি। সাহিত্য হিসাবে এসব রচনার মূল্য আছে, কিন্তু তাঁদের অনুবাদ বাউলসাধনার যথার্থ পরিচয় বহন করে না।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ এনামুল হক, (সম্পাদিত) *শাহ মুহম্মদ সগীর : ইউসুফ জোলেখা*, ঢাকা, ১৯৯৮

২. মালাধর বসু, *শ্রীকৃষ্ণ বিজয় পুঁথি*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫২৯, দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য *বাংলার বাউল ও বাউলগান*, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩

৩. The Holy Quran (Sura As-Safath XXXVII) The New Bible Dictionary. J. Doglas Michigan, 1962, p. 115

৪. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০০ (১৯৯৩) ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাউল বিষয়ে গবেষণা ও বাউলদের গান সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেন।

৫. *ভারতী*, ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা। ১২৮৮-১২৯০

৬. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামণি*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৩৭

৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭৮

৮. Shashibhusan Das Gupta, *Obscure Religious Cults*. Calcutta 1976

৯. Abdul Wali, *On Curious Tenets and Practices of a Certain Class of Faqirs in Bengal*. The Journal of the Anthropological Society of Bombay 1900, Vol. V. No 4 pp 217

১০. Charles Capwell, *The Music of the Bauls of Bengal*. The Kent State University Press, Kent, Ohio, 1986

১১. Edward C. Dimock jr. *The Place of the Hidden Moon*. The University of Chicago Press, Chicago, U.S.A 1967

১২. June Mc Daniel. *The Madness of the Saints*, the Chicago Press, Chicago, U.S.A 1987

১৩. আব্দুল কাদির, *সুফী ও বাউল পদাবলী, দ্র. লালন সাহিত্য দর্শন*, খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ২৫৪-২৬৩
১৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *লালন শাহের কাব্যে আত্মনিবেদনের সুর*।
দ্র. লালন মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক (সম্পাদিত), লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা, পৃ. ৩৭২-৩৭৬
১৫. জসীমউদ্‌দীন, *তত্ত্ব-সাহিত্যিক কবি লালন*
দ্র. লালন সাহিত্য ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২৩৪
১৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *লালন দর্শন সমীক্ষা*
দ্র. লালন মৃত্যু-শতবার্ষিকী খোন্দকার রিয়াজুল হক (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৫২
১৭. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufism in Bengal*, Asiatic Soceity of Bangladesh, Dhaka 1975.
১৮. Sunitikumar Chatterji, *Islamic Mysticism, Iran and India*, Indo-Iranica, Vol. I. No. 1946
১৯. আবু তালিব, *লালন শাহ ও লালনগীতিকা* ১ম ও ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৮
২০. আনোয়ারুল করীম, *বাউল কবি লালন শাহ* ১ম সংস্করণ, কুষ্টিয়া, ১৯৬৩
২১. ড. এস. এম লুৎফর রহমান, *লালন শাহ : জীবনী ও গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৩
২২. আহমদ শরীফ, *বাউল তত্ত্ব*, বাংলা একাডেমি, ১৩৭৯ (ফেব্রুয়ারি ১৯৭০)।
২৩. এইচ. এম. ইমামউদ্দীন, *বাউল মতবাদ ও ইসলাম*, কুষ্টিয়া, ১৯৬৯
২৪. সিরাজউদ্দিন, *লালন তত্ত্বের ভূমিকা*, কুষ্টিয়া, ১৯৯৭
২৫. ড. আবুল আহসান চৌধুরী, কুষ্টিয়ার বাউল সাধক, কুষ্টিয়া ১৩৮০; লালন শাহ, ঢাকা, ১৯৯০
২৬. ম. মনিরউজ্জামান, *লালন জীবনী ও সমস্যা*, কুষ্টিয়া, ১৯৭৮
২৭. ড. সোলায়মান আলি সরকার, বাংলার বাউল দর্শন, ঢাকা, ১৯৯২
২৮. Harendra Chandra Paul, Baul *Poets on Chari-Chandra*, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh. Vol XVIII No. 1. April 1993, pp. 13.
২৯. ডক্টর মযহারুল ইসলাম, *বাউল, বেতার কথিকা*, ঢাকা বেতার কেন্দ্র, তারিখ ৫-৬, ১৯৬৭
৩০. ডক্টর মযহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৩১. আনোয়ারুল করীম, *বাউল সাহিত্য ও বাউলগান*, লোকসাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র কুষ্টিয়া, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, পৃ. ১১৬-১১৭
৩২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৬৫, পৃ. ৮১
৩৩. মাওলানা রেয়াজউদ্দীন, প্রাগুক্ত।
৩৪. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ ১৮৭০ ঐ, ২য় ভাগ, ১৮৮৩
৩৫. মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান*, কলকাতা, পৃ. ৩
৩৬. দ্র. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৪
৩৭. ঐ, পৃ ৫৫২, ৫৫৩-৭৮১
৩৮. ঐ, পৃ. ৭৬২, ৭৭৫, ৭৮১
৩৯. Pramatha Nath. Bose, *Hindu civilization Vol.* 1 Calcatta, 1894, India.
৪০. Op. cit.
৪১. P. bose, op cit. Vol II. P. 341
৪২. Jogendranath Bhattacharyya, *Hindu Castes and Sects*, Calcutta, 1896, pp. 482
৪৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৮২, ৪৪, ৪৮, ৫৩, বিশ্বকোষ-অবধূত, পৃ ৫৯৬।
৪৪. কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (সম্পাদিত), সাপ্তাহিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ১০ম ভাগ ১৭তম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৭৯, আগস্ট ১৮, ৭২, পৃ. ৩
৪৫. দ্র. অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম, *বাউল সাহিত্য ও বাউলগান*, প্রফেসর ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'কথা মুখ' ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
৪৬. ডক্টর মতিলাল দাশ ও শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র, *লালন গীতিকা*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃ. ৩২১
৪৭. গুরুসদয় দত্ত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, *শ্রীহট্টের লোকসংগীত*, কলকাতা।
৪৮. Dr. Piyuskanti Mahapatra, *The Folk Cults of Bengal*, Calcutta, Indian Publication, 1972
৪৯. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর কৃষিজীবী সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে বাউলদের একটি সমন্বয় করার প্রচেষ্টায় বলেন : কৃষিজীবী জনসাধারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে মর্মাহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছে, বৌদ্ধ কিংবা কিংবা ব্রাহ্মণ্য যুগে তাদের সামাজিক স্থান যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে... যে কৃষি অতীতে তাদের স্রোতের উৎস সেখানে তাদের অবস্থান নয়, আর যেখানে তাদের অবস্থান সেখানে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব নেই...।
৫০. সুলতানা আফরোজ, *জাতিভেদ প্রথা ও বাংলাদেশের বাউল সমাজ*, ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কুষ্টিয়া, ১৯৮৮, পৃ. ১-৫
৫১. সনৎকুমার মিত্র, *লালন ফকির : কবি ও কাব্য*, কলকাতা, ১৩৮৬
৫২. তুষার চট্টোপাধ্যায়, লালন স্মরণিকা, চাকদহ কলেজ, চাকদহ, নদীয়া, ১৯৭৬
৫৩. দ্র. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জুশাহ : জীবন ও কাব্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৫৪. শক্তিনাথ ঝা, *বস্তুবাদী বাউল*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জানুয়ারি ১৯৯৯
৫৫. আনোয়ারুর করীম, *বাউল সাহিত্য ও বাউলগান*, কুষ্টিয়া, ১৯৭১। Anwarul Karim, *The Bauls of Bangladesh*, Kushtia, 1980
৫৬. Debi prasad Chattopadhyaya. The Lokayata, New Delhi.
৫৭. সুধীর চক্রবর্তী, *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*, পুস্তক বিপণী কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৮
৫৮. বসন্ত কুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ শান্তিপুর-নদীয়া, ১৩৬২
৫৯. আদিত্য মুখোপাধ্যায়, *ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল*, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
৬০. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার বাউল, কাব্য ও দর্শন*, কলকাতা, ১৯৬৪
৬১. ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম, *লালন পরিক্রমা*, কলকাতা ১৯৯৪; *ঐ মরমী ব্যক্তিত্ব লালন ফকির*, কলকাতা, ১৯৯৪



প্রথম অধ্যায়

বাউল লোকধর্মের উদ্ভবকালের ইতিহাস

বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকধর্মের মতো বাউল নিঃসন্দেহে একটি লোকধর্ম। অন্যান্য লোকধর্মের উদ্ভবকালের ইতিহাস সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানা গেলেও বাউল লোকধর্মের উদ্ভবকাল সম্পর্কে এ যাবৎকালে সঠিক তেমন কিছু জানা যায়নি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বাউল শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে। তা থেকে অনুমান করা হয় যে মধ্যযুগে এই ধর্ম বা সাধনার বিস্তার ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়' বা 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য় বাউল সাধনার অনেক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কারো কারো মতে 'বেদসংহিতা' এবং 'উপনিষদে' বাউল ভাবধারার পরিচয় রয়েছে। এ থেকে এমন ধারণা জন্মে যে আমাদের লোকসংগীত যেমন অতীতকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে গানের ধারায় প্রচারিত হয়ে আসছে, বাউলগান ও বাউল ধর্ম তেমনিভাবেই আমাদের অতীত ঐতিহ্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে বাউলগান বা লোকসংগীত আর তৈরি হচ্ছে না। ঘটনাটি এমন নয়।

অতীতে পিছিয়ে পড়া সমাজে যে লোকসংগীত বা বাউলগানের উদ্ভব ঘটেছিল আজও আধুনিক যুগে নগরসভ্যতায়ও সেই পিছিয়ে পড়া মানুষের দেখা পাওয়া যায়। তাদের হাতেই আজও তৈরি হচ্ছে নানা লোকসংগীত এবং লোকধর্ম। শহরে, নগরে, বন্দরে, কিংবা পল্লীতে অনুসন্ধানী ব্যক্তিমাত্রেই তাদের দেখা পেতে পারেন। এসব নিয়েই আমাদের ফোকলোর। অতীত ঐতিহ্যের সেই নদী আজও বহমান। হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন হয়নি, পাল্টেছে কেবল পারিপার্শ্বিকতা, মুখের ভাষা এবং বাচনভঙ্গি। সুরও পাল্টেছে, পাল্টেছে লোকবাদ্য যন্ত্র। একতারা, ডুগী, খমক বা প্রেমজুড়ির সঙ্গে যোগ হয়েছে হারমোনিয়াম, পিয়ানোকোর্ডিয়ামসহ আধুনিক বাদ্যযন্ত্র। পপ মিউজিকের ঢঙে গাওয়া হচ্ছে বাউলগান, লোকসংগীত, এমনকি রবীন্দ্রসংগীতও। কিন্তু এত করেও সবকিছু ছিনিয়ে নিতে পারেনি আধুনিক সভ্যতা। আজও পিছিয়ে পড়া সমাজের লোকসংগীত, বাউলগান তার অতীত ঐতিহ্য নিয়েই টিকে আছে। পিছিয়ে পড়া

মানুষ আজও আশ্রয় করে নিয়েছে নানা লোকধর্ম। ব্রিটিশ যুগেও নানা লোকধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু বাউলধর্মের উদ্ভবকালের ইতিহাস আজও যেন মেঘে ঢাকা তারা। বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীত গুরুত্বপূর্ণ। তা নইলে ভবিষ্যৎ নির্মাণ থেমে যেতে পারে। বাউলগান আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বর্তমানকালে ঘটলেও বাঙালি জাতি এবং সংস্কৃতির ইতিহাস তো অনেক প্রাচীন কালের। বাঙালি সংস্কৃতির এই শেকড় বা পরিচয়-চিহ্ন জানবার জন্য বাউল ধর্ম ও বাউলগানের প্রাচীন ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। আমার অনুসন্ধানের বিষয়ও তাই।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বাউলদের নিজস্ব কোনো পুঁথিপুস্তক পাওয়া যায় না। তাঁরা অতীতে কোনো পুঁথিপুস্তক রচনা করেছিলেন কিনা তাও জানা যায় না। যা পাওয়া যায় তা তাদের গান, যা এখনও সাধারণ মানুষের মুখে মুখে গীত হয়ে আসছে এতকাল ধরে। আর রয়েছে নানা লোকধর্মের সাধনভজনের পুঁথি যা দেহতত্ত্ব রসে পূর্ণ। বাউল ধর্ম ও গানে তার প্রভাব রয়েছে, কিন্তু বাউল সেখানে থেমে থাকেনি। বাউলের 'মনের মানুষ তত্ত্ব' দেহতত্ত্বকে ছাপিয়ে দেহাতীতে মিশেছে। প্রেম শুধু ভক্তিতে বাঁধা পড়েনি, অনুরাগে তা পূর্ণ হয়েছে। এখানেই এই গান ও ধর্মের বৈশিষ্ট্য।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, বাউলধর্ম ও সাধনা প্রাচীনত্বের দাবিদার হলেও এ যাবৎকালে আবিষ্কৃত বাউলগানের ইতিহাস তেমন প্রাচীন নয়। সিরাজ সাঁই, লালন সাঁই প্রমুখ বাউলগানের রচয়িতাদের উদ্ভব অষ্টাদশ শতকের দিকে। কিছু কিছু বাউলগানে রচয়িতাদের নাম নেই, কিন্তু সেসব গানের ভাষা তেমন প্রাচীন নয়। বাউলগানের পাশাপাশি বিভিন্ন পদাবলী সাহিত্যে বাউলগানের অনেক ভাবনা বা ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাউলগানের 'মনের মানুষ তত্ত্ব' সেখানে নেই। সেখানে প্রেমে বিরহ আছে, অতৃপ্তি আছে কিন্তু তা দেহেতেই সীমাবদ্ধ। 'রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব' বাউলগানেরও ঐতিহ্য, কিন্তু রাধা এবং কৃষ্ণ বাউলগানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবয়বে উপস্থিত। বলেছি, চর্যাগীতিকায় বাউলগানের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বাউলগানের মর্মপীড়া বা মর্মজ্বালার প্রকাশ সেখানে নেই। তবে এই সময়ে কিংবা তার কিছুকাল পূর্ব থেকে এদেশে সুফিদের আগমন ঘটেছে। সুফিসংগীত[১] 'রুবাই' 'গজল' 'কাসিদা' এবং 'সামা'তে যে জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে, বাউলগানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সুফি ভাবনার এই দিকটিও আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

বলেছি, বাউলের ধর্ম লোকধর্ম। এই ধর্মে দেহবাদ প্রধান ভিত্তি। ফলে নানা অসামাজিক ক্রিয়াকর্মে এই ধর্ম দুষ্ট। সামাজিক বিরোধিতা তাই কোনো নতুন বিষয় নয়, বাউলধর্মের মতো তা প্রাচীন। কিছু কিছু পণ্ডিত[২] বাউলদের নানা আচরণ, ক্রিয়াকর্ম লক্ষ করে তাদেরকে 'বাতুল' বা 'পাগল' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তাদের মতে বাউল ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে বাতুলশ্রেণীর কিছু সাধকের দ্বারা, এবং তারা মনে করেন এই 'বাতুল' শব্দ থেকেই 'বাউল' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। এরা বাউলদের মধ্যে একধরনের 'খ্যাপামি' দেখে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু যে অর্থে 'বাতুল' শব্দটি পাগল নির্দেশক, বাউলেরা সে অর্থে পাগল নয়। সুফিসাধকদের মধ্যে 'দিওয়ানা' শব্দের প্রচলন রয়েছে। 'দিওয়ানা'র অর্থ ভাবোন্মাদ। বাউলগানে সুফি 'দিওয়ানা'র প্রভাব রয়েছে। আবার কেউ কেউ চর্যাগীতিকার 'বাজুল' শব্দটি বাউলের সমার্থবোধক বলে অনুমান করেছেন। তাদের মতে 'বাজুল' শব্দটি বাউল শব্দের পূর্বরূপ। দীর্ঘকাল এসব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু যথার্থ ইতিহাস উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। 'বাউল' শব্দের উৎপত্তিমূল নির্ণয় এবং কবে কখন থেকে বাউল মতবাদের উদ্ভব হয়েছে এ সম্পর্কে তাই একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন।

আমি দীর্ঘ ৪০ বছরের অধিককাল এই মতবাদের অনুসারীদের সাথে মিশে বেড়িয়েছি, কিন্তু তারাও তেমন কিছু হদিস জানাতে সক্ষম হননি। এই প্রসঙ্গে আমি বেশ কয়েকজন বাউল ফকিরের সাথে কথা বলি। এদের মধ্যে ইসমাইল ফকির, কোকিল শাহ, গোলাম ইয়াসিন শাহ, বেল্লালশাহ, স্বরূপ শাহ, মোসলেম ফকির, বেহাল শাহ, খোদা বখশ, ঝড়ু শাহ, মহিম শাহ, বাদের শাহ এবং কানাই ক্ষেপা অন্যতম। এদের সকলের ধারণা বাউলধর্ম চিশতীয়া সুফিধর্মের একটি শাখা এবং তারা সবাই চিশতীয়া ফকির। এই ধর্ম বাতেনী ধর্ম এবং তাদের সাধনা গুহ্য সাধনা। এরা কোরান শরিফে বিশ্বাস করে, তবে সে কোরান লিখিত নয়। তারা বলেন, কোরান রয়েছে তাদের ছিনায় ছিনায়। একে তারা 'দেল কোরান' নামে অভিহিত করেছে। এদের নামাজ সন্ধ্যায়। এরা সেবাদাসীকে 'জায়নামাজ' নামে অভিহিত করে। এদের সাধনা দেহবাদী। বাউল শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরা বলে 'বায়ু+উল'। দেহের অভ্যন্তরে যে প্রাণবায়ু, যার কারণে সজীবতা এবং জীবন, তার বিনাশে মরণ। এর 'উল' বা সন্ধানই তাদের লক্ষ্য। এরা লালন ফকির এবং অন্য বাউল পদকর্তাদের বিভিন্ন পদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে :

হাওয়া ধরো
অগ্নি স্থির করো
মরিলেও বাঁচিতে পারো।
(লালন)

এখানে 'হাওয়া' অর্থ বায়ু। অপর গানে দুদ্দু বলেন :

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল ॥

বাউল সাধনায় দমের বা হাওয়ার ব্যবহার আছে এবং সেই দমের সাধনা তাকে মূল সত্যের কাছে নিয়ে আসে। যেমন :

দমের মানুষ দমে চলে।
আলেকে মানুষ আলের উপর
আর এক মানুষ গোপনে রয়
জেনেশুনে সাধন কর।
(গোঁসাই গোপাল)

অথবা

দমের আগে মানুষ জাগে চলে সে হাওয়ার উপর,
আটকুঠুরি বন্ধ করে উজন তোল তারে
অধর চাঁদকে ধরবি যদি দম ক'ষে দম সাধন কর।
(নারাণ ফকির)

এসবের উদ্ধৃতি দিয়ে বাউলসাধকেরা দেহের অভ্যন্তরে 'বায়ু'র প্রয়োগকে গুরুত্ব প্রদান করে এ ধর্ম ও সাধনার ব্যাখ্যা করে থাকে।

তবে এ কথা বলা যায় যে, অতীতকাল থেকেই দেহবাদী সাধনায় 'বায়ু'র ব্যবহার এবং প্রয়োগ রয়েছে। চর্যাগীতিকায় আমরা 'বায়ু'র প্রয়োগ দেখেছি। প্রতি চর্যায় এই দমের সাধনা রয়েছে। সুতরাং কেবল 'বায়ু'র এই প্রয়োগ থেকে 'বাউল' শব্দের অর্থবিচার তাই যথার্থ হবে না। তথাপি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন হিসেবে চর্যাগীতিকায় এই দেহবাদী সাধনার নানা মূল্যবান তথ্য এবং চর্যাগীতিকার বিভিন্ন 'যান' সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা বাউলসাধনার উদ্ভবকালের ইতিহাস এবং অর্থবিচারে সাহায্য হতে পারে বিধায় নিম্নে বিভিন্ন যানের একটি পরিচয় দেওয়া হলো।

বৌদ্ধ লোকধর্ম

বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের ফলে এই ধর্মের মধ্য থেকে নানা লোকধর্ম বা সাধক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নানা বিরোধ এবং বিতর্কের কারণে নানা মত বা যানের সৃষ্টি হয়। এই যানগুলির মধ্যে মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, কালচক্রযান এবং সহজযান প্রধান। এসব যানের অনুসারীদের মধ্যেও নানা দ্বিমত এবং বিরোধ ছিল। এদের বিরোধের মূল বিষয় ছিল বুদ্ধ প্রদর্শিত নির্বাণ লাভ। বুদ্ধদেব একে মোক্ষ বা মুক্তি বলে ভেবেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের নানা আদর্শকে অনুসরণ করলেও হিন্দুধর্মের পরমাত্মা এবং জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন

এবং এই কর্মবাদকে ভিত্তি করে তাঁর জন্মান্তরবাদ গড়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন : মানুষ যদি অবিদ্যা বা মোহের বশবর্তী না হয় এবং সে যদি জাগতিক মিথ্যা কামনা এবং লোভকে ত্যাগ করতে পারে তবে জীবনের দুঃখ থেকে সে পরিত্রাণ পেতে পারে এবং ওই দুঃখ নিরোধে তার নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ হতে পারে।[৩]

বুদ্ধদেবের এই মতাদর্শে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাসী হলেও নির্বাণলাভের পদ্ধতি নিয়ে উপর্যুক্ত 'যান'সমূহের মধ্যে বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে এবং এক এক যান এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বা পন্থা অনুসরণ করে। এসব যানে নানা আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয় এবং এসবের মাধ্যমে তারা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভে সচেষ্ট হয়। ইতোমধ্যে এসব যানের অনুসারীদের মধ্যে কোনো কোনো যানে তান্ত্রিক আচার-আচরণ এবং মন্ত্র ও গুহ্য সাধন পন্থা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করে। পরবর্তীকালে সকল যানে সাধনার বিষয়ে মতপার্থক্য চরমে ওঠে। এসব যানে গুরুবাদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অনুসৃত হতো এবং এই গুরুই পরবর্তীতে দেবতা বা দেব-দেবীতে পরিণত হতো।[৪]

হীনযান

এই মতের অনুসারীরা বুদ্ধদেব প্রদত্ত উপদেশসমূহ অনুসরণের জন্য নিজেরা সাধনাপদ্ধতি গড়ে তোলে। এরা শূন্যবাদী অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করতে হবে, অস্তিত্ব এবং স্বীয় বলে কিছুই থাকবে না। একে তারা নির্বাণ লাভ বলে মনে করেন। এই নির্বাণ লাভের জন্য তারা ধ্যান এবং বিভিন্ন নৈতিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে।

মহাযান

মহাযানদের সঙ্গে হীনযানীদের পার্থক্য–তারা নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে শূন্যতার মাধ্যমে যে নির্বাণ লাভ হয় তা পরিত্যাগ করে আপনার অন্তরে বুদ্ধত্ব লাভের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। এরা হীনযানীদের নৈষ্ঠিকতাপূর্ণ আচার-আচরণকে অস্বীকার করেছে। কারণ তারা মনে করে এর ফলে মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না, কেবল আচারপরায়ণতা সবিশেষ গুরুত্ব পাবে। মহাযানীরা বুদ্ধত্ব লাভকে বোধিচিত্তের অধিকার এবং তা অর্জনে এরা শূন্যতা এবং করুণার একটি সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছে। মোটকথা, এরা কঠোর শাস্ত্রাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছে। একে তারা বলেছে মুক্তি। এই মুক্তির সুযোগে অনেক অবৌদ্ধ মতবাদ মহাযানীদের মধ্যে পরবর্তীকালে অন্তর্ভুক্ত হয়। এসবের মধ্যে তান্ত্রিক মতাদর্শ প্রধান। ফলে মহাযানীদের মধ্যে দেহবাদ সম্বলিত নানা মন্ত্র এবং গুহ্য সাধনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

বজ্রযান

বজ্রযানীরা মহাযানীদের মতো বোধিচিত্ত অর্জনে বিশ্বাসী ছিল। তবে তাদের প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন। এরা হীনযানীদের শূন্যতত্ত্ব গ্রহণ করে এবং এই শূন্যতা সম্পর্কে পরমজ্ঞান লাভকে তারা নির্বাণ বলে বুঝেছে। শূন্যতার চরম স্তরকে তারা 'নিরাত্মা' নামে অভিহিত করেছে। বজ্রযানীদের মতে সাধকের বোধিচিত্ত যখন নিরস্তিত্ব শূন্যতা বা নিরাত্মায় বিলীন হয়ে যায় তখন তাকে তারা 'মহাসুখ' নামে চিহ্নিত করে। বজ্রযানীদের মধ্যে দেহবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল। তাদের মতে, নর-নারীর দৈনিক মিলনের ফলে যে পরামানন্দ লাভ হয় তাইই মহাসুখ এবং এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে যে একাত্মতা ঘটে তাকেই বজ্রযানীরা বোধিচিত্ত বলে উল্লেখ করেছে।

বজ্রযানে দেহমিলনের গুরুত্ব প্রদানের সঙ্গে ইন্দ্রিয় দমনের কথাও বলা হয়েছে। এখানে মৈথুনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই মুখ্য। এই মতে বলা হয় যে মৈথুনজাত আনন্দের মাধ্যমে বোধিচিত্ত জাগ্রত হবে এবং মন্ত্রশক্তি তাকে স্থিতি দেবে। বজ্রযানীরা মৈথুনের আনন্দ থেকে দেব-দেবীর জন্মের কথা বলেছে, যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে সাধককে ইন্দ্রিয় কামনাবাসনা বিবর্জিত একটি পরমজ্ঞান লাভে সহায়তা দান করে। বজ্রযান অত্যন্ত গুহ্য সাধনা এবং এই সাধনার ভাষাও খুব জটিল। গুরু ব্যতিরেকে এই সাধনার কথা অন্য কেউ বোঝাতে সক্ষম নয়। কেবল দীক্ষিতই এই সাধনার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। বজ্রযানীরা গুরুকে সকলের উপর স্থান দিয়েছে, কারণ গুরুকৃপা ব্যতীত কেউ এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।

সহজযানী

সহজযানী সম্প্রদায় শাস্ত্রাচারসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড অস্বীকার করেছিল। এই সাধনাও দেহবাদী এবং মৈথুনজাত যুগলসাধনা হলেও সহজযানীরা সব আচার-অনুষ্ঠান, দেব-দেবী, মন্ত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করে কেবল 'দেহহিবুদ্ধ' অর্থাৎ দেহের মধ্যেই বুদ্ধ বা পরম জ্ঞান–এই চেতনাকে 'সার' জেনেছিল। সহজযানীরা বস্তুবাদী ছিল এবং তাদের সাধনা দেহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। তাদের মতে সম্ভোগের মাধ্যমেই সত্যকে জানা সম্ভব। দেহমিলনের মাধ্যমে যে পরম প্রশান্তি আসে তাতেই 'আরাধ্য', যাকে তারা বুদ্ধ নামে অভিহিত করেছে, তিনি অবস্থান করেন। সহজযানীদের মতে দেহের স্বাভাবিক আবেদনকে অস্বীকার করা একধরনের বিকৃতি। তাদের মতে দেহের দাবি পূরণ হলেই আর কোনো বাধা থাকবে না। এটাই দেহের মুক্তি। তবে দেহের মাধ্যমে পরম আনন্দ লাভ করতে হলে রতিনিরোধ অপরিহার্য এবং গুরুর কৃপায় তা সম্ভব। সহজযানীর শূন্যতাকে প্রকৃতি এবং করুণাকে পুরুষ হিসেবে জেনে নর-নারীর মিলনে যে মহাসুখ লাভ হয়

তাকে ধ্রুবসত্য এবং বুদ্ধ বলে জেনেছে। এই অবস্থায় উপনীত হতে পারলে তার আর কোনোকিছুর প্রয়োজন হয় না। তাই তাঁরা এই অবস্থাকে 'সহজ' অবস্থা বলেছে। এই অবস্থায় উপনীত হতে কোনো মন্ত্রের বা দেব-দেবীর প্রয়োজন নেই। সব শাস্ত্রাচার বা আচার-অনুষ্ঠান তাই তার কাছে মূল্যহীন।

কালচক্রযান

এই যানের অনুসারীরা কালচক্রকে আদিবুদ্ধ এবং সবকিছুর নিয়ামক বলে ধারণা করেন। এই কালচক্র নিয়ত ঘূর্ণমান এবং তাকে নিরস্ত করা অথবা তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই কালচক্রযানীদের সাধনা। কালচক্রযানীরা বলেন যে, সমস্ত পৃথিবী নিয়ত চলমান। এই গতির বিবর্তনই কাল। এ একটি চক্র বিশেষ। মানুষের জীবনও এমনি একটি গতিশীল চক্রের মাধ্যমে আবর্তিত। কালচক্রযানীরা একে প্রাণক্রিয়া বলেছে। তারা যোগের মাধ্যমে এই প্রাণক্রিয়াকে নিশ্চল বা নিরস্ত করার সাধনা করে থাকে। এদের সাধনায় তাই তিথি, বার, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত চর্যাগীতিকায় সর্বযানের কথাই উল্লেখ আছে। তবে সব যানের মধ্যেই কমবেশি দেহবাদের কথা যেমন আছে, তেমনি মন্ত্রসাধনা এবং বজ্রযোগের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে চর্যাগীতিকার বিভিন্ন যানের একটি সম্যক পরিচয় আমরা লাভ করি। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অবক্ষয়ের কারণে এসব যানের উদ্ভব ঘটে। বলা যেতে পারে, বুদ্ধদেব নির্বাণ বা মুক্তিলাভের যে-কথা বলেছিলেন তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। গোল বেধেছিল এই নির্বাণের পদ্ধতি নিয়ে। এখানেই দেহবাদের স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব নিয়ে বিরোধ।

ক্রমে ক্রমে দেহবাদী সাধনার প্রাধান্য ঘটে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান, শাস্ত্রাচার, বর্ণবাদ সবকিছুই অস্বীকার করেছে ঠিকই, কিন্তু তান্ত্রিক দেহবাদের প্রতি তারা প্রচণ্ড গুরুত্ব এবং প্রকাশ্য আস্থা রেখেছে। ফলে নানা যোগাচারে নিবিষ্ট হয়েছে এসবের সাধক। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি নানা লোকধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। চর্যাগীতিকায় এসব লোকধর্ম এবং তাদের অনুসারীদের বৃত্তান্তও প্রকাশ পেয়েছে। চর্যাগীতিকায় সিদ্ধাচার্যদের কেউ দাবি করেছেন তিনি কাপালিক, কেউ অবধূত মার্গী বা নাথধর্মী। এরা সবাই দাবি করেছে যে, তারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। কিন্তু এদের সকলের সাধনার মধ্যেই গুহ্য সাধনতত্ত্ব ও সাধন নীতি পদ্ধতির প্রসার ঘটেছিল।

বৌদ্ধধর্মের এই অবক্ষয়ের যুগে তান্ত্রিক সাধনা বিজড়িত কাপালিক, অবধূতী এবং নাথধর্মীরা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এরা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে

দাবি করে। চর্যাগীতিকার অধিকাংশ সিদ্ধাচার্যগণ উপর্যুক্ত গুহ্যসাধনপন্থী। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

কাপালিক

বাংলাদেশের লোকধর্ম অনুসারীদের মধ্যে কাপালিকেরা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কাপালিকরা বৈদিকধর্ম বিরুদ্ধ এবং শৈবতন্ত্রে বিশ্বাসী। এরা কানে মহাশঙ্খের কুণ্ডল পরে, হাতে লাউ-এর পাত্র, কাঁধে ঝুলি, দেহে কাঁথা এবং অর্ধাঙ্গে চিতাভস্ম ধারণ করে নারীসঙ্গিনী ও শিষ্যসহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। ভিক্ষা এদের পেশা। এরা নরকপাল সঙ্গে রাখে এবং তাতে করে নারী সঙ্গিনীসহ সুরা ইত্যাদি পান করে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কাপালিকদের তেমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য 'দশকুমার চরিত্র' নামক গ্রন্থে কাপালিকদের বিবরণ পাওয়া যায়।[৫] সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়াব্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়ান-সাঙ যখন ভারতে অবস্থান করেন তখন তিনি কাপালিক দেখেছিলেন এবং তাদের তিনি নরকপালধারী বলে উল্লেখ করেন।[৬] অষ্টম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকে কাপালিকের একটি পূর্ণচিত্র পাওয়া যায়।[৭] এখানে উল্লেখ আছে যে : কাপালিকেরা নগ্নদেহ, শবভস্মাচ্ছাদিত, ত্রিশূল কমণ্ডলুধারী, মধ্যপান রত। এদের সঙ্গে থাকে কাপালিনী। নরবলি এদের সাধনার অঙ্গ। নবম শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য 'কর্পূরমঞ্জুরী' এবং কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃতি রূপক নাটকে কাপালিকের বর্ণনা আছে।[৮] সর্বত্রই এদের বীভৎস আচরণের চিত্র পাওয়া যায়। স্মৃতিপুরাণাদিতে এদের নিন্দা করা হয়েছে। বৈদিক ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে কাপালিকদেরকে 'লোকায়তিকা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা নাস্তিক এবং কোনো শাস্ত্রাচার মানে না।[৯] এদের সম্বন্ধে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী বলেন :

> The influence of the Lokayatikas and the Kapalikas is still strong in India. There is a sect and numerous one too, the followers of which consider that material human body, is all that should be cared for, and their religious practices are concerned with the union of men and women and their success (siddhi) varies according to the duration of the union. These call themselves Vaisnavas, but they do not believe in Vaisnavism of Krisna or his incarnation. They believe in '*deha*'. They have another

> name, Sahajiya, which is the name of sect of Buddhists which arose from Mahayana in the last for centuries of its existence in India.[১০]

চর্যাগীতিকায় এই কাপালিকদের সহজিয়া যোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১১] কাপালিক এবং সহজিয়ায় উভয় মতের অনুসারীগণ যৌনাচরণে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করায় তারা সমাজে নিন্দিত ছিল। বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ে এই কামাচারিতা নানা লোকধর্মের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। কাপালিকেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল এবং তাদের মধ্যেও এই যৌন স্বেচ্ছাচারিতা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করে। এ সম্বন্ধে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী আরও বলেন :

> Some of the sects of the degenerated Buddhists, in which laxity in sexual morals was one of the features, become gradually affiliated to the lokayata school. One of these sects was the Kapalika sect. The Kapalikas are a very ancient sect. They drink wine, offer human sacrifices and enjoy women. They strike to attain their religious goal with the help of human corpses, wine and woman.'[১২]

বৌদ্ধধর্মের অবসানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণে কাপালিক এবং লোকায়তিকেরা সহজিয়া ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সহজিয়া মতাদর্শে যৌনসাধনা এবং যৌন স্বেচ্ছাচার এই সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ কালক্রমে বিকৃত হয়ে পড়ে এবং কাপালিকদের একাংশ যারা যোগী বলে পরিচিত হয়, তারা এই পথভ্রষ্ট ব্রাহ্মণসমাজ বলে কেউ কেউ ধারণা করে।

> The Kapalika, who smear their bodies with ashes and who are yogins are some of them degenerate Brahmans.[১৩]

বস্তুত, এই কাপালিকেরা যে সহজিয়া এবং নাথযোগীদের অংশবিশেষ ছিল, চর্যাগীতিকায় তার নিদর্শন আছে।[১৪] সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ একজন কাপালিক যোগী ছিলেন। একটি পদে তিনি বলেন :

নাড়ি শক্তি দিট ধরি অ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজ এ বীরনাদে ॥
কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ না অরী বিহরএ এককারে ॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রশি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥

রাগ দ্বেষ মোহ লাই অ ছার।
পরম মোখ লব এ মুক্তিহার ॥
মারি অ শাসু নণন্দ ঘরে শালী
মা আমারি আ কাহ্ন ভই অ কবালী।

অর্থ : নাড়ি শক্তি দৃঢ় করে খাটে ধরা হলো। অনহা (অনাহত) ডমরু বীরনাদে বাজছে। কাপালিক কাহ্নপাদ যোগাচারে পর্যটনে লেগেছে। একাকারে দেহনগরীতে বিহার করছে। আলি কালি (যেন তার, অর্থাৎ কাহ্নপাদের) চারণ ঘণ্টা নূপুর, রবি-শশীকে (সে) কুণ্ডল আভরণ করেছে। পরশ মোক্ষের মুক্তাহার লাভ করেছে। শাশুড়ি ননদ শালীদের মারা হলো, মায়াকে মেরে কাহ্নপাদ কাপালিক হয়েছে।

উপর্যুক্ত পদ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের অনেকেই কাপালিক ছিলেন এবং তারা সহজিয়া সাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন। সহজিয়া সাধনা সম্পর্কে বলা যায় যে এই সাধনা একদিকে যেমন বৈদিক আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সাধনা হিসেবে গড়ে উঠেছিল, তেমনি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের তান্ত্রিক দেহবাদের প্রতি সমর্থন ছিল। অনেক ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের সহজিয়া মতের অনুসরণে তা প্রতীয়মান হয়।

তবে চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যগণ কখনও আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যবাদকে গ্রহণ করেনি। সহজিয়াদের সকলেই বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য এই ধর্ম অনুসরণে তাঁরা লোকায়ত ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ফলে দেহবাদ তাদের সাধনায় মুখ্য হয়েছিল। কাপালিকেরা সহজিয়া সাধনায় আশ্রয় নিলেও তন্ত্র তাদের সাধনার মূল ভিত্তি ছিল।

অবধূত

লোকধর্মে 'অবধূত' একশ্রেণীর সন্নাসী বা সংসারত্যাগী ভিক্ষু সম্প্রদায়। কাপালিকদের মতো এরাও বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণের মত ও পথ অনুসারী। এরা তন্ত্র এবং যোগশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। বৌদ্ধযোগশাস্ত্রে যে অবধূতী নাড়ির উল্লেখ আছে, তার কার্যকরণ সম্পর্কে এই সাধকশ্রেণীদের বিশেষ জ্ঞান আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[১৫] উল্লেখ করেন যে তান্ত্রিক বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য অদ্বয়বজ্রকে অবধূতীপাদ বলা হতো। 'গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে'[১৬] উল্লেখ আছে যে, অবধূতগণ উন্মাদ-প্রায় এবং সংসার সম্পর্কে আসক্তিহীন। এরা বর্ণাশ্রম, শাস্ত্র, তীর্থযাত্রা বিরোধী। ড. নীহাররঞ্জন রায়[১৬ক] অবধূতমার্গীদের সাধনপন্থা বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনা থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, দেহের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য নাড়ির মধ্যে প্রধান অবধূতীনাড়ি সম্বন্ধে এই সাধকশ্রেণী সম্যকভাবে অবহিত এবং এ বিষয়ে তাদের গভীর জ্ঞান থাকায় তাদের এই নামে চিহ্নিত করা হয়।

নগেন্দ্রনাথ বসু[১৭] অবধূত সম্পর্কে বলেন :

> অবধূত চারি প্রকার : ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, বীরাবধূত ও কুলাবধূত।... অবধূত সন্ন্যাসীদের কতকগুলি শৈব ও কতকগুলি বৈষ্ণব।... বিধিপূর্বক পূর্ণাভিষিক্ত হইলে সেই সন্ন্যাসীকে শৈবাবধূত বলে, ...বৈষ্ণবদের মধ্যেও একশ্রেণীকে অবধূত বলা হয়...অবধূত বৈষ্ণবেরা রামানন্দের শিষ্য। এখনও বাঙলার নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষে কোন কোন প্রদেশে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব অনেক দেখা যায়। ইহাদের আচার ব্যবহার অতিশয় কুৎসিত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিভেদ মানে না, এবং তাহাদের পান ভোজনেরও কোন বিচার নাই। তাহাদের মাথায় বড় বড় চুল, গলায় স্ফটিক প্রভৃতির মালা, কটীতে কৌপীন, গায়ে খিল্লা বা কাঁথা, হাতে নারিকেলের কিস্তী। ইহারা সর্বদা অত্যন্ত অপরিষ্কারভাবে থাকে। লোকে ইহাদিগকে বাউলও বলে। বাংলার নানা স্থানে ইহাদের আখড়া আছে। এক একটি আখড়ায় দুই তিনজন অবধূত এবং তাহাদের অনেকগুলি করিয়া সেবাদাসী থাকে। ইহারা ভেক দিয়া সকল জাতিকেই আপন সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে। ডুবকী, গুপীযন্ত্র, একতারা প্রভৃতি ইহাদের বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষা করিবার সময় ইহারা প্রথমে গৃহস্থদের দ্বারে গিয়া 'বীর অবধূত' এইরূপ নাম স্মরণ করে ও বাদ্য বাজাইয়া গান করিয়া থাকে।[১৮]

বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে নিত্যানন্দকে 'অবধূত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবধূতদের সঙ্গে বাউলদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কোনো কোনো পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন। কারো কারো মনে হয়েছে, অবধূত ও বাউল কথা দুইটি কি উভয় উভয়ের পরিপূরক বা সমার্থবোধক? তবে এ-কথা বলা যেতে পারে, অবধূতদের আচার আচরণ অনেকটা বাউলদের মতো। চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য অদ্বৈতাচার্য এবং অপর শিষ্য নিত্যানন্দ অবধূত ছিলেন বলে কারো কারো ধারণা আছে। এ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন :[১৯]

> তবে বাউলেরা ইহা বিশ্বাস করে যে, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ প্রকৃতি-পুরুষ মিলন ঘটিত ধর্ম সাধনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতেই সম্প্রদায় হিসাবে প্রকাশ্যভাবে এই প্রকৃতি-পুরুষ মিলন ঘটিত ধর্মসাধনার বা বাউল ভজন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গুরু পরম্পরার মধ্য দিয়া সারা বাংলায় ইহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপের ও বর্ধমান জেলার অনেক বাউল আমাকে বীরভদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের গুরু বংশের তালিকা দিয়া তেরো কি চৌদ্দ গুরু তাহাদের গুরু এইরূপ বলিয়াছে। বাউলদের মধ্যে মোহান্ত শ্রেণীর লোকদের অনেকের শাখা প্রশাখাযুক্ত গুরুবংশ তালিকা কণ্ঠস্থ আছে।

আমি নিজেও অনেক বাউলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে তাদের গুরুপরম্পরা তালিকা মুখস্থ শুনেছি। বাউলগুরু লালন ফকিরের একটি 'সিজরানামা'র কথাও জানা গেছে।

নাথধর্ম

বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের যুগে নাথধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২০] এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা চর্যাগীতিকার অন্যতম সিদ্ধাচার্য মৎস্যেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ।[২১] কেউ কেউ এই দুজনকে অভিন্ন বলেও মনে করেন।[২২] নাথধর্মীদের গুরু বা সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরীনাথ প্রভৃতি অন্যতম। মীননাথ ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের পিতা। তাঁর অপর নাম ছিল বজ্রনাথ ও অচিন্ত্য। মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে পাঁচখানি নেপালে পাওয়া গেছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন ময়নামতি রাজা গোপীচন্দ্রের সমসাময়িক। জালন্ধরীনাথকে বলা হয় আদিনাথ। তার অপর নাম হাড়িপাদ। হাড়িপাদ ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং রাজা গোপীচাঁদের গুরু। নাথপন্থীরা তান্ত্রিক ও হঠ যোগসাধনে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২৩] বর্তমানে নাথপন্থীদের যোগী বা যুগী নামে অবিহিত করা হয়। এদের বৃত্তি ছিল কাপড়বোনা। কুষ্টিয়ার বাউলদের মধ্যে একটি বৃহদাংশ যুগীদের মতো তাঁতী বা জোলা। যুগীরাও বর্তমানে বাউলদের মতো ভিক্ষাজীবী। এরা গুহ্যসাধন অনুসারী। চর্যাগীতিকায় এই নাথপন্থীদের সাধনার বিবরণ আছে।

এখন প্রশ্ন জাগে, কীভাবে এসব ধ্যানধারণা আর্যসমাজে বিকাশ লাভ করল। অনার্য-অধ্যুষিত এই উপমহাদেশে যে তন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত গভীর তা আজ ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তন্ত্র তো বামাচারী সাধনা।[২৪] অনার্য সভ্যতা মাতৃতান্ত্রিক কিন্তু আর্যসভ্যতা তো পুরুষপ্রধান।[২৫] বৌদ্ধসভ্যতার অবক্ষয়ে চর্যাগীতিকায় যে দেহবাদের প্রাধান্য তা তো পুরুষকেন্দ্রিক।[২৬] বজ্রযোগীদের বজ্রধরনাথ বা অদ্বয়বজ্র যাকে 'বাজিল' বা বাজুল নামেও অভিহিত করা হয়, তিনি তো পুরুষ। শুধু বজ্রযানেই নয়, সমগ্র চর্যাগীতিকায় পুরুষই প্রধান গুরু। তা হলে এর উৎস কোথায়?

উৎসের সন্ধান এবং মূলধর্মের বিরোধিতা

প্রত্নতান্ত্রিক খননকার্যের ফলে প্রাচীন প্যালেস্টাইনের রাসসামরায় 'বা'আল' নামের এক প্রজনন-দেবতা বা fertility god-এর সন্ধান পাওয়া গেছে।[২৭] অবশ্য এই দেবতার কথা তৌরাত, ইনজিল এবং কুরআন মজিদে উল্লেখ রয়েছে। সকল ধর্মগ্রন্থেই এই দেবতাকে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং তার উপাসনা থেকে সকলকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মজিদে 'বা'আল' নামের এই দেবতার উল্লেখ করে আল্লাহপাক এরশাদ করেন : 'ইলিয়াসও ছিল রাসুলদিগের একজন। স্মরণ করো তাহার সম্প্রদায়কে সে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? তোমরা কি বা'আলকে ডাকিবে এবং পরিত্যাগ করিবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আল্লাহকে।' (আসসাফাত, সূরা ৩৭ আয়াত ১২৩-১২৫)।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী[২৮] উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন :

> Eliza (Elias) lived in the reign of Ahab (B.C. 896-874) and Ahazian (B.C. 874-872), kings of the (northern) kinddom of Israil or Samaria. He was a prophet of the desert, like John the Baptist, unlike our holy Prophet, who took part in, controlled and guided all the affairs of his people. Both Ahab and Azariah were prone to lapse into the worship of Baal, the sun god worshipped in Syria. That worship also included the worship of nature powers and procreative powers, as in the Indian worship of the Lingam and led to many abuses. King Ahab had married a princess of Sidon. Jezebel, a wicked woman who led her husband to forsake god and adopt Baal worship. Eliza denounced all Ahab's sins as well as the sins of Azariah and had to flee for his life. Eventually, according to the Old Testament (2Kings, ii-II) he was taken up in a whirlwind to heaven in a chariot or fire after he had left his mantle with Eliza the prophet.

এলিজা বা ইলিয়াস ছিলেন হযরত জাকারিয়ার পুত্র। তাঁকে খ্রিস্টানধর্মে জন দ্য ব্যাপটিস্ট বলা হয়। তিনি বা'আল উপাসনার বিরোধী ছিলেন। এই উপাসনা ভারতীয় 'লিঙ্গম' উপাসনার অনুরূপ ছিল। এই 'বা'আল দেবতা অতি প্রাচীন। শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন প্যালেস্টাইন' নামক গ্রন্থে 'বা'আল দেবতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[২৯] তিনি (বা'আল) 'বাওল' শব্দকে 'প্রভু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনানুসারে জানা যায় যে প্রাচীন প্যালেস্টাইনে 'বা'আল' নামে একধরনের মরমিয়া সাধক বাস করতেন। তাঁরা প্রচলিত বিধি অনুসারে ধর্মকে অনুসরণ করেননি। এরা দেহবাদী ছিলেন। প্রাচীন প্যালেস্টাইন থেকে এই মতাদর্শ হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই মতবাদ প্রসার লাভ করেছিল বলে জানা যায়।[৩০]

বিভিন্ন বিশ্বকোষ ও অভিধানে 'বা'আল' দেবতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা নিম্নরূপ **The New Bible Dictionery (1962)** উল্লেখ আছে :

> The Hebrew word baal means 'master' 'possessor' or 'husband' When the Israilites entered Cannan they found

that every piece of land had its own deity, its 'owner' There were thus many 'Baals' : the Hebrew plural balim appears in English as Baalim. ... The gods of individual localities had appropriate surnames, e.g. Baal peor... But the word gradually became a proper name to indicate the great fertility god of the Cannanites. (Similarly Marduk, the chief Babylonian deity was called 'Bel' which became a proper name.) Some consider 'the Baal, to have the sun god, in view of the temple to him at Bethshemesh (house of the sun);...The Baal rites not only involved the usual lascivious practices of fertility cults, but even such abominations as child sacrifice.[৩১]

Encyclopedia of Islam-এ উল্লেখ আছে।

BAAL, or more fully, Baal Hadad was a Canaanite weather and fertility god whose cult was widespread throughout the entire leavant. By itself, baal means 'lord' and the term can refer to other gods but when used without qualification it almost invariably refers to Hadad. The name Hadad possibly means 'the thundering one.' Baal has long been known from the Old Testament... .

The excavation of Canaanite cuneiform tabletes from 1929 onward at Ugarit in Syria has provided scholars with a wealth of cultic and mythological material in which Baal is very prominent. In this literature the most common epithets for Baal are strong one; rider on the clouds...[৩২]

Encyclopedia Britannica-তে উল্লেখ আছে

Baal, the name of a god in many ancient near eastern communities, especially among the Canaanites, who apparently conferred him the most important god in the pantheon. His name common to the Semitic languages and means 'lord' or 'owner'....[৩৩]

'বা'আল' শব্দটি মূলে হেব্রু শব্দ হলেও আরবি ও ফারসি ভাষায় এই শব্দের ব্যবহার রয়েছে। সর্বত্রই 'বা'আল' অর্থ প্রভু, স্বামী, কর্তৃত্বের অধিকারী বা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, যুগল অর্থে স্বামী-স্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরিলিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'বা'আল' ধর্মমত প্রাচীনকালে প্রজনন-দেবতা বা fertility god হিসেবে প্রাচীন প্যালেস্টাইনসহ সমগ্র আরব, মেসোপটেমিয়ায় (পারস্যসহ) এবং ভারত উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। কোথাও কোথাও বা'আল-কে সূর্যদেবতা হিসেবেও উপাসনা করা হতো।

মূলত, 'বা'আল প্রজনন-দেবতা হওয়ায় মৈথুন বা যৌনাচার এই ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। ফলে পূজা-অর্চনায় এবং উৎসবাদিতে নানা যৌন ক্রিয়াকর্মের প্রাবল্য দেখা যেত। অনেক ক্ষেত্রে শিমু বলীদানের রীতিও এই ধর্মের মধ্যে ছিল।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও তন্ত্রসাধক এবং কাপালিকদের মধ্যে মানুষ বলী দেবার কথা জানা যায়।[৩৪] ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানেও শিশুবলী, মানুষবলী দেবার কথা শোনা যায়। এদেশে যৌনাচার যে ধর্মের অংশ ছিল, এ সম্পর্কে সব ইতিহাসবিদ এবং নৃবিজ্ঞানীরা একমত পোষণ করেছেন। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা যে মাতৃদেবতা শক্তি এবং পুরুষদেবতা শিবের উপাসক ছিল মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার খনন শেষে উদ্ধারকৃত যোনি এবং লিঙ্গমূর্তি থেকে তা প্রমাণিত হয়।[৩৫] বাংলাদেশেও এই একই ধরনের ধর্ম অনুসরণ করা হতো। ১৯৭৫ সালে ফারাক্কা বাঁধের কাছে গঙ্গানদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খনন করে মহেঞ্জোদারো হরপ্পার সমসাময়িক সভ্যতার উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩৬] এ সবই অনার্য সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এ থেকে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে অনার্যদের মধ্যেও পুরুষ-প্রাধান্য ছিল এবং শিব তাদের অন্যতম দেবতা ছিল।

এ প্রসঙ্গে জন মার্শাল বলেন :

In the religion of the Indus people there is much, of course, that might be paralleled in other countries. This is true of every pre-historic and of most historic religions as well. But taken as a whole their religion is so characteristically Indian as hardly to be distinguished from still living Hinduism or at least from that aspect of it which is bound up with animism and the cults of Siva and the Mother-goddess still the two most potent forces in popular worship.[৩৭]

মহেঞ্জোদারো এবং সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা যে শিবশক্তির উপাসক ছিল এ সম্পর্কে এই সভ্যতার অন্যতম আবিষ্কারক জন মার্শাল বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হন। তাঁর মতে এখানকার অধিবাসীরা লিঙ্গপূজা, যোনিপূজা এবং পশু ও বৃক্ষাদিও পূজা করত। জন মার্শালের এই অভিমত পরবর্তীকালে ফাদার হেরাস এবং জ্যাক ফিনিগান সমর্থন করেন। মহেঞ্জোদারো শিবশক্তি পূজা ও লিঙ্গপূজা আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাচীনকালে ধর্মের সঙ্গে প্রজননের একটি সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

Encyclopedia Britannica-তে উল্লেখ আছে :

> Fertility was envisaged in terms of seven years cycles. In the mythology of Canaans, Baal the god of life and fertility, locked in mortal combat with (MOT) the god of death and sterility. If Baal triumphed, a seven year cycle of fertility would ensue, but if he was vanquished by Mot, seven years of drought and femine would ensue.[৩৮]

'বা'আল' সর্বত্র প্রজননের দেবতা হিসেবেই পূজিত হয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে শিবশক্তি পূজার আবিষ্কার থেকে এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, সাধারণ নরনারীর মধ্যে যে মিলন-কল্পনা তা থেকেই আদি দেবদেবীর প্রজননযন্ত্র 'লিঙ্গ' এবং 'যোনি' পূজার প্রচলন হয়েছে। 'বা'আল' প্রজনন-দেবতা উপাসনার মধ্যে ধর্মের সঙ্গে দেবদেবীর যুগল মিলনের ঘটনা নিহিত। মহেঞ্জোদারের এই শিব যে অনেকাংশ 'বা'আল' দেবতা বা Fertility God-এর অনুরূপ ছিল এবং প্রাচীনকালে এমন ধারণা অন্যান্য দেশেও যে প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে **Westropp** বলেন :

> Among the Assyrians, the supreme God Bel was styled. the procreator and his wife the goddess Mylitta represented 'the productive' principle of nature and received the title of the queen of fertility... . It is thus evident that the doctrine of the reciprocal principles of nature or nature active and passive, male and female was recognized in nearly all the primitive religious systems of the old as well as the new world...
>
> Evidence that this worship extensively prevailed will be found in many countries both in ancient and modern times. It occurs in ancient Egypt, in India, in Syria, in Babylon, among the Assyrians, in Persia, Greece, Italy, Spain, Germany Scandinavia and among the Bauls.[৩৯]

লক্ষ করা যায়, পৃথিবীর প্রায় তাবৎ দেশে প্রজননের সঙ্গে সম্পৃক্ত যৌনাচার ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিল। আমরা জানি পৃথিবীকে 'বসুমাতা' হিসেবে কল্পনা করার রীতি অতি প্রাচীন।[৪০] আমাদের আলোচ্য বা'আলকে কখনও কখনও Lord of Earth নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একটি বড় নিদর্শন সৌরধর্ম বা সূর্যপূজার প্রসার। গুপ্তপূর্ব সময়কাল থেকে পারস্যের সূর্যপূজা বাংলাদেশে সুপ্রচারিত এবং সর্বত্র এই ধর্মের প্রচার বৃদ্ধি পায় বলে ঐতিহাসিকেরা অভিমত পোষন করেছেন।[৪১] পণ্ডিতদের মতে এই সূর্যপূজার সঙ্গে বৈদিক সূর্যদেবতার পূজার কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রাচীন পারস্যের এই সূর্যদেবতা পূজার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলা হয় যে এই দেবপূজার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি এবং রোগ নিরাময় হতো বলে সাধারণ বিশ্বাস ছিল।[৪২] এখানে উল্লেখ করা অসমীচীন নয় যে, প্রাচীনকালে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে 'বা'আল' দেবতাকেও সূর্যদেবতা হিসেবে উপাসনা করা হতো। তাহলে বাংলাদেশের এই সূর্যদেবতার সঙ্গে কি তার কোনো সাযুজ্য আছে? এ সময়ে বাংলাদেশে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তধর্মেরও বিশেষ প্রভাব ছিল। এসব ধর্মের কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে তা জানা যায় না। তবে এমন বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে এসব ধর্ম লোকায়ত-পরিমণ্ডলেই গড়ে উঠেছে। একেশ্বরবাদী বৈদিক ধর্মেও যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তার মূলেও বলা চলে, এই লোকধর্মের প্রভাব ছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে পারস্য, বলতে কি সমগ্র মেসোপটেমিয়া এবং আরবদেশের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[৪৩] বাণিজ্যিক লেনদেনের সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনার আদানপ্রদান হয়েছিল।[৪৪]

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নবম শতকের দিকে মুসলিম-বিশ্ব দুটি সাংস্কৃতিক বলয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৪৫] একটি আরবীয়, অপরটি পারস্যীয় বা ইরানীয় ধারা। এই সময় শিয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সুফি অধ্যাত্মদর্শনের উদ্ভব হয়।[৪৬]

এই সুফিবাদীদের একটি শাখা 'বাতেনীয়া' নামে পরিচিতি ছিল।[৪৭] এদের সাধনা গুপ্ত এবং কেবলমাত্র দীক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এরা উদারপন্থী এবং অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিল। বাতেনী সুফিবাদীদেরকে 'বেশরা' বলেও অভিহিত করা হতো। এই মতবাদের উদ্ভাবক ছিলেন ইমাম জাফর আস্ সাদেকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল এবং তাঁর অনুসারী আবদুল্লাহ ইবনে মায়মুন।[৪৮] প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, ইরানীয় সুফিসাধকদের মধ্যে মনসুর হল্লাজ ও বায়েজিদ বোস্তামী ইসলামের শরীয়তবিরোধী চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটালে তাঁরা গোঁড়া মুসলমান সমাজের রোষানলে পড়েন।[৪৯] মনসুর হাল্লাজ, 'আনাল হক' বা 'আমি খোদা' এমন দাবি করাতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এরা 'দিওয়ানা' নামে সমাজে পরিচিত ছিলেন।[৫০]

ডক্টর ইউসুফ হোসেনের মতে, পারস্যে এবং পরবর্তীকালে ভারতে মরমীবাদের প্রবর্তনে এই দুজন সাধকের ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তিনি বলেন : হাল্লাজ খুরাসান, পারস্য সংলগ্ন তুর্কিস্তানের নানা অঞ্চলে এবং ভারত উপমহাদেশ সফর করেন এবং 'কিতাবুল তাওয়াসীন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্যারির কলেজ দ্য ফ্রান্সের মঁসিয়ে এল মেসিনিন এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন এবং টীকা সন্নিবিষ্ট করেন। এই গ্রন্থে হাল্লাজ নিজেকে আল্লাহর প্রতিবিম্ব হিসেবে উল্লেখ করেন বলে বিবরণ রয়েছে।[৫১] ডক্টর ইউসুফ আরো উল্লেখ করেন যে পরবর্তীতে ইবনুল আরাবী ও আব্দুল করিম জিলির রচনাবলিতে হাল্লাজের এই ধারণার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। উত্তর ভারত এবং বাংলাদেশের আগত অনেক বেশরা সুফিসাধকেরা হাল্লাজের এই ধারণার অনুসারী ছিলেন।

পারস্যেও এই সময় বাতেনী বা বেশরা সাধকদের বেশ প্রাধান্য ছিল। এরা সবাই শিয়া-ভাবাপন্ন ছিলেন। সম্প্রতি একটি তথ্যানুসারে 'বা'আল' নামে একটি বেশরা সাধক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মঈন তাঁর প্রণীত একটি অভিধানে এই 'বা'আল' সাধকদের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

> Baal, meaning one who frees himself from an obligation by purgery : infatuated or in love with; He was a wanderer in the desert.[৫২]

এতদসঙ্গে ড. মঈন আরও একটি বেশরা সুফিসম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন। এদেরকে 'বহলুলিয়া' নামে অভিহিত করা হতো। বহলুল অর্থ 'খ্যাপা', 'পাগল'। আবু ওয়ালিদ ইবনে আমরে শিরাফিয়া খুফী এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নবম-দশম শতকে পারস্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথে মুক্তবুদ্ধির পৃষ্ঠপোষকতাও শুরু হয়েছিল। এরা গ্রিক, খ্রিস্টীয় এবং বৌদ্ধদর্শন সহ তৎকালীন সমাজজীবনের নানা চিন্তা-চেতনা ও ধ্যানধারণাকে তাদের বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে তুলে ধরেন। জালালউদ্দীন রুমী, দিওয়ানা হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রমুখ এই মুক্তবুদ্ধির ধারক ছিলেন। তাদের রচিত 'সামা' এবং 'রুবাইয়াত' প্রভৃতিতে দেহবাদ মুখ্য হয়ে ওঠে। ওমর খৈয়াম[৫৩] তাঁর রুবাইয়াতে বলেন :

১

মানবের সুধালিপ্সু ইন্দ্রিয় নিচয়
অবিরত কানে কানে কয়,
নাও নাও ভোগ করে নাও
সহস্র দুঃখের মাঝে যতটুকু সুখ হেথা পাও।

২

পড়িস কেউ মুষড়ে ভেঙে
দুর্ভাগ্যের দুর্বিপাকে,
দিস্‌নে রে আর আমল বুকে
বিচ্ছেদের ওই দুঃখটাকে;
ডুবিয়ে দে মন সুরার স্রোতে
সুন্দরীদের অধর পুটে;
তোমার দামী জীবনটা আজ
নেয়না যেন হাওয়ায় লুটে।

কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন, রুবাইয়াতে দেহবাদ একটি বিশেষ ধারায় মুখ্য হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই সুফিসাধকের চিন্তা কেবল দেহেতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেহকে অবলম্বন করে তারা দেহাতীতে পৌঁছাতে চেয়েছেন এবং এখানেই তাঁর সঙ্গে বাউলের মিল রয়েছে। ওমর খৈয়াম বলেন :

এই শক্তি, এই প্রাণ
এ সকলই তব দান
মোর সত্তা, আত্মা, মন,
এ তো প্রভু তব ধন।
আমার এ দেহখানি
তোমারি হে নাথ, জানি
একান্ত তোমারই আমি
তুমিও আমারই স্বামী
কেহ নাহি তুমি ছাড়া
তোমাতেই আমি হারা ॥

পারস্যের সুফিকবিদের মধ্যে এই দেহভিত্তিক প্রেম যা পরবর্তীতে লৌকিক অধ্যাত্মসাধনায় রূপান্তরিত হয়েছে, তার উৎসমূলে পারস্যের বাতেনী সুফিসাধনা সম্বলিত 'বা'আল' সুফিসাধক শ্রেণীদের কর্মকাণ্ড বা জীবনাচরণ সক্রিয় ছিল। শুধু কবিতায় বা গানে যে এই সাধকদের প্রভাব পড়েছে তা নয়, এ সময়ে নানা কাহিনীকাব্যেও তার গভীর প্রভাব ও প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে কবি আবুল কাসেম ফিরদৌসীর (৯৩৭-১০২০ খ্রি.) 'ইউসুফ জোলেখা' কাহিনীকাব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।[৫৪] এ গ্রন্থে কবি ফিরদৌসী পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাহিনী হুবহু ব্যবহার না করে তৎকালীন সমাজের সাধু-ফকিরদের ধ্যানধারণাকে প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই 'বা'আল' সুফিসাধকেরা ছিল তাদের পরমারাধ্যের (মাশুক) প্রতি প্রেমপীড়িত।

ভাবের ভাবুক, সংসারত্যাগী এবং মরুভূমি অঞ্চলে প্রেমাস্পদের মিলনাকাঙ্ক্ষায় খ্যাপা বা পাগলের মতো ঘুড়ে বেড়ানো পথিক। এদের কণ্ঠে থাকে গান। কারও হাতে বাদ্যযন্ত্র। নিজেকে নারীপ্রেমিকা (আশেক) হিসেবে উপস্থাপিত করে, আরাধ্যকে স্বামী হিসেবে গণ্য করে তাঁর প্রতিই ভালোবাসা নিবেদন করেছে সাধক। সুফি রাবেয়া আদাবিয়া ছিলেন এমন একজন সাধক। এই প্রসঙ্গে অ্যানমেরি শিমেল (১৯৮২:১৫) উল্লেখ করেন :

> This was the period when early Islamic asceticism, with is austere and world detesting outlook, began to turn into love mysticims, a development in which Jafar-us-Sadiq, the sixth Imam of Shia, and this younger contemmporary, the Iraqi woman Rabia al Adawiyya, seem to have taken the lead.[৫৫]

রাবেয়া আদাবিয়ার সমসাময়িক ছিলেন রাবেয়া আস্ সামিয়া। তিনিও একজন সুফি ছিলেন এবং অধ্যাত্ম কবিতা বা গান রচনা করেছেন।

এই বা'আল সাধকদের কবিতা বা গান ছিল রহস্যমণ্ডিত এবং দ্ব্যর্থবোধক। বলা যেতে পারে, অনেকটাই চর্যাগীতিকা এবং বাউলদের গানের মতো। এই ধরনের একজন ইরাকি সুফি কবির নাম জুনায়েদ। অ্যানমেরি শিমেল বলেন :

> Juniad the leader of the Baghdadian school around 900 was a master of cryptic verses and sayings, for he following his teacher Kharraz, was well aware of the necessity of hiding one's mystical thoughts and experiences in a time when the government became increasingly suspicious of the activities of the Sufis. However in this kind of poetry which sometimes seems so elusive, we cannot always be certain of the writers true intentions...[৫৬]

বস্তুত, এই 'বা'আল' সাধকের গানে এমনি ধরনের রহস্যময়তা লক্ষ করা যায়। এদের অনেকের গানই মুখে-মুখে রচিত এবং শিষ্যপরম্পরায় গীত হতো। এমনি একজন 'বা'আল' সাধক এবং কবির নাম মুহম্মদ ইবনে আব্দুল জাব্বার নিফ্ফারী (মৃ. ৯৬৫ খ্রি.)।[৫৭] তিনি মনসুর হাল্লাজের মত ও পথের অনুসারী ছিলেন।

নিফফারীর পূর্বে জুনায়েদ (মৃত্যু ৯১০ খ্রি.) ইয়াহিয়া ইবনে মু'আজ (নবম শতক) জু'ননুন আল মিছরি (মৃত্যু ৮৫৯ খ্রি.) প্রমুখ বাতেনী সুফিসাধনার অনুসারী ছিলেন।

দেহবাদ ও পরকীয়া প্রেম সাধনধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ফিরদৌসী 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে এই পরকীয়া প্রেমের অবতারণা করেছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.) ফিরদৌসী বিরচিত 'ইউসুফ জুলেখা' অনুসরণে তাঁর কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।[৫৮] এই কাব্যগ্রন্থ ফিরদৌসী রচিত কাব্যগ্রন্থের অনুরূপ এবং উভয় গ্রন্থেই দেহবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। সগীর জোলেখার প্রেমপীড়িত মন এবং আচার-আচরণকে তুলনা করার উদ্দেশ্যে 'বাউল' 'বাউর' এবং 'আউল' এসব শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। শাহ মুহম্মদ সগীরের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এই শব্দত্রয়ের কোনো প্রয়োগ এযাবৎকাল লক্ষ করা যায়নি। আরব পারস্যের 'বা'আল সাধকেরা লোক-নিরুক্তির প্রভাবে বাউল এবং আউল নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হয়ে ওঠে। এরা প্রেমোন্মাদ বা ভাবোন্মাদ এবং অস্থিরচিত্ত বলেও অভিহিত হতো।

শাহ মুহম্মদ সগীরের গ্রন্থেই সর্বপ্রথম 'বাউল' এবং 'বাউর' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'বাউল' বা 'বাউর' শব্দ দুটি সমার্থবোধক। যেমন :

১. *বাউর আকৃতি অস্থির প্রকৃতি*
ধিক চিত্ত বিচলিত

২. *চপল চঞ্চল ভেল বাউর মুরতি।*

৩. *সর্বক্ষণ উত্তরোল চিত্ত আসোয়াস্ত।*
নিশি ন পোহা এ তার দিন ন জা এ অস্ত।
জদি রাত্রি বিরাম উদয় ভেল ভানু
তার তাপে তাপিত কম্পিত সর্ব তনু ॥
হেন গতি মদি জদি নৃপতি দেখিল।
বাউর চরিত্র হেন ভূপতি জানিল ॥
লোকাচার জাতিকুল কিছু নাহি ভিত
সদায় উদাস বাস চিত্ত বিচলিত।

৪. *বিরহে তাপিত হৃদয় কম্পিত*
উরত লোরএ কেশ।
মলিন বয়ান কাতর নয়ান
আউল বাউল বেশ ॥

৫. *হেন জেহ্ন জন এক নগরুয়া নারী*
একদাসী সঙ্গে শেষ নাহি দুই চারি।
জারকেশ সৌরভ সমীর সমুদিত
আউল বাউল অতি কুভেস রচিত।

৬. *আউল হইল কেশ মুকুল কুন্তল।*

এই বাউলদের জীবনাচরণ থেকে শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে জোলেখার পরকীয়া প্রেমের আর্তিকে যথাযথ বর্ণনার উদ্দেশ্যে 'বাউর' 'বাউল' এবং 'আউল' শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এই উপমা তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর সময়ে অথবা তাঁর পূর্বকাল থেকে সমাজে বিচরণকারী একশ্রেণীর সাধু ফকির যারা 'বাউর' 'বাউল' বা 'আউল' নামে পরিচিত ছিল। এদের প্রকৃতি এবং আচার-আচারণ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে শাহ মুহম্মদ সগীর নায়িকা জোলেখার পরকীয়া প্রেমে পীড়িত হওয়ার ফলে তাঁর আচরণগত সাদৃশ্যহেতু 'বাউল' 'বাউর' এবং 'আউল' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে তিনি নিজেও নানা সংযোজন করেছেন এবং তা তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে বিধায় তাঁর এই গ্রন্থটি ফিরদৌসী বা অন্যদের বিরচিত গ্রন্থের অনুবাদই শুধু নয় এবং তা অনেকাংশেই মৌলিক। 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে 'বাউল' 'বাউর' 'আউল' শব্দগুলি প্রেমপীড়িত মনোভঙ্গি নির্দেশক বিধায় সমাজ লোকাচার সম্পর্কে তারা উদাসীন এমন অভিধায় চিহ্নিত এবং সে কারণে সমাজ যে তারা নিন্দিত ছিল তা জানা যায়।[৫৯]

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, হিন্দিসাহিত্যে বাউলদের অনুরূপ সাধুসন্তদের 'বাউর' বাওলা' 'বাউরা' নামে অভিহিত করা হতো। কবীর রজ্জব এই 'বাউর' শ্রেণীর সাধক ছিলেন। মনে হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই সগীর 'বাউর' শব্দের ব্যবহার করেছেন অথবা 'ইউসুফ জোলেখা' পুঁথিতে 'বাউল' শব্দের পরিবর্তে 'বাউর' শব্দের প্রয়োগ লিপিকারের কারণে ঘটতে পারে। যা হোক, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'বাউল', 'বাউর', 'আউল'—এই শব্দত্রয়ের উৎসমূল অনেক প্রাচীন।

আমাদের দেশে বাউলগানে 'গুরু' শব্দের যে প্রয়োগ তা প্রায়ই 'স্বামী' এবং 'সাঁই' নামে চিহ্নিত হয় এবং সেদিক থেকে বিচার করলে 'বা'আল' শব্দটির উৎস প্রাচীন প্যালেস্টাইনে ক্যানানাইট সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত—এমন অনুমিত হয়। প্রাচীন প্যালেস্টাইনের ক্যানানাইট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে 'বা'আল' নামে প্রজনন-দেবতার আবিষ্কার তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিব্রু বা আরবি ভাষায় 'বা'আল শব্দটি কখনও স্বামী, অভিভাবক বা যুগল (স্বামী-স্ত্রী) নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগের সাহিত্য চতুর্দশ শতকে শাহ মুহম্মদ সগীর এবং পঞ্চদশ শতকে মালাধর বসু তাদের গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

সুতরাং আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে 'বাউল' শব্দের উৎস অতি প্রাচীন। যুগে যুগে সময়ের প্রবহমান ধারায় তা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে ঠিকই, কিন্তু মূলধারার পরিবর্তন হয়নি। পারস্যের সুফিবাদের এই যে দেহবাদী ভাবনার উল্লেখ, তার উৎসও তো অনেক দূরকালের। মূলধর্মের সংস্পর্শে এসে মর্তের ভোগবাদ

অমর্তের নির্ভোগে পরিণতি লাভ করেছে। খ্রিস্টজন্মের পূর্বে যে 'বা'আল' শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল একদিন, পারস্যের 'বা'আল' সুফি শাখায় তার নবতর পরিবর্তন এসেছে। অতঃপর তন্ত্র এবং যোগ-সহযোগে প্রেমের এই ধারায় দেহবাদের সঙ্গে মিশে গেছে অমর্তভাবনা।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে আরবীয় এবং ইরানীয় (পারস্যীয়) ভাবধারার মধ্যে মেরুকরণ হওয়ায় তৎকালীন মুসলিম-বিশ্বে ক্ষমতাসীন আরবীয়-আব্বাসীদের সঙ্গে ইরানীয়দের একটি তুমুল বিরোধিতা শুরু হয়। আরবীয়রা ছিলেন সুন্নি মতবাদপন্থী এবং অপরদিকে ইরানীয়রা ছিলেন শিয়াপন্থী। এই সময় সুফিসাধনা, বিশেষ করে বাতেনীপন্থী সাধকদের আবির্ভাবে এই বিরোধ আরও তীব্রতর রূপ ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে M.L. Roy বলেন :

> During the last phase of Abbaside rule the forces of Islam were divided into two cultural groups; Arabian and Persian. The Arabian group represented by the Abbasides who by the 9th and 10th centuries of the Christain era had distinctly developed Semitic ideology, and the Persain group representing the ancient Aryan culture now supported the eastern Asiatic and Muslim states like Khurasan, Jurjans and Azarbaizan. The distinctive features of the Aryan culture were maintained by the Iranians by supporting the doctrine of incarnation through shiism supporting Ali as an inheritor of the role of Muhammad as held by Mukhtar. During the Samanid period the Persians shook off their cultural relations with Araba and supplanted the Arabic by Persian culture in the eastern and western countries.[৬০]

আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে শিয়া এবং সুফিদের অনেকে দেশত্যাগ করে ভারতে আগমন করে এবং স্থানীয় আদর্শের সঙ্গে একটি আত্মিক সংযোগ গড়ে তোলে। বাংলাদেশেও এই সাধকশ্রেণী নবম-দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদ কর্তৃক নিগৃহীত নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এদের উদার মনোভাবের কারণে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করে।[৬১] এই বৌদ্ধসমাজ সুফিসম্প্রদায়ের বাতেনী আদর্শের মধ্যে তাদের নিজেদের মরমীয়া ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পায়।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাগীতিকায় সুফিকবিদের ধ্যানধারণার একটি সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। সুফিকবিতার মতো চর্যাগীতিকায় মূল ধর্মের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী ভাবনার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় এবং এই গানের ভাষাও সুফিকবিদের ভাষার মতো দ্ব্যর্থবোধক এবং যা সাধারণের বোধগম্য নয়। সুফি মরমীয়াদের মতো চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্যগণের সাধনাও ছিল গুহ্যশ্রেণীভুক্ত। এই বেশরা সুফিসাধকেরা এদের এসে তন্ত্র এবং যোগসাধনার প্রতি আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং এ সম্পর্কে নানা গ্রন্থাদি তারা অনুবাদ করে।[৬২] ফলে এদেশে আগমনকারী এই বিশেষ শ্রেণীর সুফিসাধকদের মধ্যে একদিকে যেমন ভারতীয় তন্ত্র এবং যোগের প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনি এসব সুফিসাধকের প্রভাবে এদেশে নানা লোকধর্মের উন্মেষ ঘটে।

এ সময় ভারত উপমহাদেশে যেসব সুফিধর্মাবলম্বীরা এসেছিলেন তাদের মধ্যে চিশতীয়া, কাদেরীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, কলন্দরীয়া প্রভৃতি শাখা অন্যতম।[৬৩] এদের মধ্যে চিশতীয়া শাখা অধ্যাত্মসংগীত 'সামা' প্রবর্তন করেন।[৬৪] এ সময় পারস্য থেকে অনেক আত্মভোলা সংগীতসাধক-দরবেশদের আগমন ঘটেছিল। এ সুফিসাধকেরা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মতো প্রচণ্ড গুরুবাদী ছিলেন।[৬৫] পীরই ছিলেন তাদের গুরু, সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, জীবনের নিয়ামক। এসব থেকে এমন অনুমান করা অসংগত নয় যে, 'বা'আল' সুফি শাখাও অন্য সুফিদের মতো এদেশের সাধারণ মানুষকে অর্থাৎ যারা বৌদ্ধ কিংবা নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিল, তাদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পারস্যবাসীরা মূলত আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত।[৬৬] ভারতে আসবার পূর্বে আর্যসমাজ মধ্যএশিয়াতে বসতি স্থাপন করে। সুতরাং ভারত এবং পারস্যের আর্য সম্প্রদায় বলা যেতে পারে একই গোত্রীভূত।

এই আর্য সম্প্রদায়—পুরুষপ্রধান। প্রাচীন প্যালেস্টাইন অঞ্চলে যে 'বা'আল' ধর্মের প্রচলন দেখা গেছে—তা প্রভু, গুরু বা স্বামী নির্দেশক। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, 'বা'আল' সাধনায় পুরুষের প্রাধান্য ছিল। সুফিসাধনাও মূলত পুরুষপ্রধান। এই সাধনার যিনি আরাধ্য পুরুষ, তিনি সাধকের 'মাশুক' বা 'প্রেমাস্পদ'। সুফি অধ্যাত্মসাধনায় এই 'পুরুষ' প্রাধান্য সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন : "...here in we may see an influence of Mediterranean people.."[৬৭] তবে সুফিদের 'মাশুক' ভাবনাকে তিনি ইরানীয়দের নিজস্ব বলে অভিহিত করে বলেন : 'I feel inclined to think that this was in its origin a purely Iranian idea'.[৬৮]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইরানীয় সুফিসাধনায় 'আরাধ্য'কে পুরুষ কল্পনার সঙ্গে ভারতীয় ধ্যানধারণায় তার প্রভাব উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, সুফিদের তাসাউফ

সাধনা ভারতে বিশেষ অবদান রেখেছিল। ভারতের প্রেম ও ভক্তিবাদে 'পুরুষ' প্রধান হলেও সুফিদের হৃদয়ের আর্তি তাকে প্রেমের এক নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছিল। তিনি ইরানীয় সুফিদের মতো ভারতীয় সুফিদের মধ্যেও প্রেমাস্পদকে 'প্রভু' এবং 'স্বামী' হিসেবে কল্পনা করার প্রবণতা উল্লেখ করে বলেন :

> Yet in the long list of Panjabi and Sindhi Sufis, we find that it is God who is Shahib, the Master, the sai or Lord, the Pi (Priya) or the lover; and the soul is always conceived and described as a woman.[৬৯]

এই প্রসঙ্গে তিনি পাঞ্জাবের মুসলিম সুফিসাধক শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জশাকর (১১৭৩-১২৬৫) বুলেহ শাহ (১৬৮০-১৭৫৮) এবং সিন্ধের শাহ লতীফ (১৮ শতক) প্রমুখ সুফিসাধকের রচনায় আরাধ্যকে 'পুরুষ'রূপে চিত্রিত করার কথা উল্লেখ করেছেন।

চর্যাগীতিকায় সিদ্ধাচার্যদের আরাধ্যকে 'গুরু' 'সদগুরু' 'বাজুল' 'বাজিল' 'সহজা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এরা সকলেই পুরুষ। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধনায়ও পুরুষই-প্রধান উপাস্য। কৃষ্ণই আরাধ্যদেব। এ থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে পুরুষ প্রাধান্য যুগে যুগে প্রায় একরকমই ছিল। সাধক-সাধিকা চিরকালই সেবাদাসী-রাধা। কখনও যে সুফিসাধনার রাবেয়া অথবা বৈষ্ণবের মীরা বাঈ। অর্থাৎ বলা চলে সাধক-সাধিকা নিজেকে নারীরূপেই আরাধ্যের কাছে উপস্থাপিত করেছে। সুফি রাবেয়া সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> A Woman saint Rabiyah al Adawiyah first brought in love in Islamic mysticism and in this, she remains a woman.[৭০]

বলেছি, এই 'বা'আল' ছিল প্রজনন-দেবতা। কিন্তু প্রজনন তো একাদ্বারা সম্ভব নয়—তাই নারী সঙ্গী। 'বা'আল' সাধনায় যুগলসাধনা মুখ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বা'আল-কে কখনও সূর্যদেবতা, কখনও-বা Weather God বা আবহাওয়ার দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং এই পর্যায়ে Baal-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে Hadad শব্দ, যার অর্থ সম্ভবত Thundering One. চর্যাগীতিকায় যে বজ্রযানীদের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের গুরু হিসেবে বাজিল, বাজুল-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি শব্দ বজ্রযানীদের গুরু বজ্রধরনাথ বা অদ্বয় বজ্র। এখন প্রশ্ন জাগে : বজ্রযানীরা তাদের সাধনায় 'বজ্র' শব্দটি ব্যবহার করলেন কেন? তাহলে কি 'বা'আল হাদাদ' দেবতার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব তাদের উপর পড়েছিল?

বজ্রযানী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বজ্র' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বজ্রকে বোধিচিত্তও বলা হয়ে থাকে। কঠোর যোগসাধনার মাধ্যমে চিত্ত যখন বজ্রের মতো দৃঢ় এবং কঠিন হয় তখন বোধিচিত্ত লাভ হয় বলে এ মতাবলম্বীদের ধারণা। বজ্রযানীদের মধ্যে ইন্দ্রিয়দমনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়দমনের জন্য প্রয়োজন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণাঙ্গ জাগরণ। এই জাগরণ যৌনাচারভিত্তিক মৈথুন মাধ্যমে সম্ভব। মিথুনজাত আনন্দ যাকে বজ্রযানী মতানুসারে বোধিচিত্ত বলা হয়, তাকে স্থায়ী করার জন্য প্রয়োজন মন্ত্রের। এই মন্ত্রের উচ্চারণে নানা দেবদেবী কল্পনায় সাধকের নিকট স্বরূপে প্রতিভাত হন। ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ জাগরণের সঙ্গে চিত্তের মাধ্যমে যে পরমানন্দের সৃষ্টি হয় তাকে সাধক বজ্রকঠিন দৃঢ়তায় চিত্তে স্থিতি প্রদান করতে সক্ষম হলে তিনি বোধিচিত্ত লাভ করেন। বজ্রযানীদের 'বাজুল' 'বাজিল' এই বোধিচিত্ত নির্দেশক।

বলেছি, বজ্রযানী সাধনা একান্ত করেই দেহবাদী সাধনা। এই সাধনায় যৌনাচার ব্যাপক থাকায় সমস্ত সাধনভজন অত্যন্ত গুহ্য এবং গুরুনির্ভর ছিল। দীক্ষিত ব্যতিরেকে এই সাধনায় কোনো শব্দ বা ভাষা কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। গুরুই এখানে সকল প্রভুর প্রভু এবং সাধকের সমগ্র জীবনের নিয়ামক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা প্রাচীন প্যালেস্টাইনে রাসসামারায় আবিষ্কৃত ক্যানানাইট প্রজনন-দেবতার সঙ্গে বজ্রযানীদের একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ করি। বজ্রযানীদের এই মতাদর্শ সহজযানীদের হাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সহজযানীরা গুহ্য যোগসাধনার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু তারা মন্ত্র, পূজা আচার, শাস্ত্র এবং দেবদেবীদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। এরা বলেছে : "বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, স্বয়ং বুদ্ধদেবও জানতেন না। 'বুদ্ধোহপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ'।" ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই-বা কোথায়! সকলই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে।

সহজযানীরা বজ্রযানীদের অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়দমনকে গ্রহণ করেনি। তারা বলেছে, ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ জাগরণ এবং অতঃপর তার কঠোর দমন একটি অস্বাভাবিক কর্ম। এই অস্বাভাবিকতা মানুষের মনে একপ্রকার বিকৃতির জন্ম দেয়। সহজযানীরা দেহসাধনাকে স্বীকার করে দেহজ সকল কামনাকে স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগের পক্ষে ছিল। তারা বলেছে, দেহসাধনার অর্থ কেবল দেহসম্ভোগ বা ব্যভিচারে ভেসে যাওয়া নয়। দেহজসাধনার মাধ্যমে মানবচিত্তের পূর্ণতা ও মুক্তির পথপ্রাপ্তি তাদের অন্বেষণের বিষয় ছিল।

এখন প্রশ্ন জাগে, বৌদ্ধযানীদের সঙ্গে সহজযানীদের এই মতপার্থক্য কীভাবে সংঘটিত হলো? এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, হিন্দুব্রাহ্মণাবাদের

অত্যাচারের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে বহিরাগত মুসলমানদের নিকট বৌদ্ধসমাজ ধর্মান্তরিত হয়। সুফিসমাজের আগমনের ফলে এই ধর্মান্তর ত্বরান্বিত হয়। বলেছি, সুফিসাধনায় নানা ধর্মের সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ধর্মান্তরিত বৌদ্ধগণ একদিকে বর্ণবাদহীন উদার মানবতাবাদকে যেমন স্বীকার করে নিয়েছিল, তেমনি এই মতাদর্শে তাদের ধর্মের প্রতিফলন লক্ষ করে তারা মুসলমান হওয়ার প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

বলেছি, ক্যানানাইটের ধর্ম 'বা'আল' তখন ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল এবং অপরদিকে সুফিদের নানা শাখা যার একটি শাখার নাম 'বা'আল' ছিল বলে জানা যায়, এই 'বা'আল' ভারত এবং বাংলাদেশে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। এমন হওয়া তাই অস্বাভাবিক নয় যে উভয় মতবাদের প্রভাবের ফলে 'বা'আল' নামে একটি নতুন লোকধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল যার উপরিভাগে ছিল মুসলিম সুফিবাদের প্রাধান্য, অভ্যন্তরে তন্ত্র এবং যোগনির্ভর দেহজ সাধনা। কালক্রমে এই 'বা'আল' লোকধর্মই যে বাউল লোকধর্মে পরিণত হতে পারে এমন ধারণা অসমীচীন নয়। তা হলে লোকনিরুক্তি অনুসারে বাউল শব্দরূপ এভাবে হতে পারে : বা'আল>বাওল>বাউল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বজ্রযানীদের 'বাজিল', 'বাজুল' শব্দদ্বয় বোধিচিত্ত নির্দেশক হলেও বাআল>বাওল>বাউল শব্দের কোনো পরিবর্তিত বা বিকৃতরূপ নয়। হিব্রু 'হাদাদ' শব্দের অর্থ *Thundering one* মনে করে বাজুলকে বজ্রধর বলা হলেও এখানে বাউলের প্রেক্ষিত ভিন্ন।

আমাদের এই ধ্যানধারণা যে অমূলক নয়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী সে বিষয়ে অনেক পূর্বেই মতামত জ্ঞাপন করেছেন।[৭১] এ বিষয়ে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' আদিপর্বে বলেন :

> প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, বাঙলার বাউলেরা নাথধর্মী বা অবধূতমার্গী বা সহজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের ধ্যান, কল্পনা ও সাধনা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। বাংলাদেশে নাথধর্ম বিলুপ্ত, অবধূতবাদও তাই; আর বৈষ্ণব ধর্ম ও চিন্তার প্রভাবে সহজিয়াদের ধ্যানকল্পনা অনেক গিয়েছে বদলাইয়া; কিন্তু বাউলেরা কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই; শাক্ত প্রকৃতি পুরুষ কল্পনা বা বৈষ্ণব রাধা কল্পনা তাঁদের নিকট যেন অর্থই বহন করে না। অথচ বজ্রযানী, সহজযানীদের নাড়ি, শক্তি প্রভৃতি বাউলধর্মে অপরিহার্য; সহজযানীদের মতো সহজ সুখ বা মহাসুখ ইহাদের উদ্দেশ্য।[৭২]

প্রবোধচন্দ্র বাগচী যথার্থই বলেছেন যে বাউলদের মধ্যে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের ধ্যানধারণার পরিচয় আছে। বাউলদের গান বিশ্লেষণ করলে তাঁর কথার সত্যতা নিরূপণ করা যায়। তবে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের পরিপূর্ণ ভাবনাই যে বাউলদের মধ্যে প্রবল তা নয়, বাউলদের মধ্যে যে সুফিসাধনার আধিক্য আছে তা সব পণ্ডিতই

স্বীকার করেছেন। সুতরাং বলা চলে প্রাচীন প্যালেস্টাইনের ক্যানানাইট 'বা'আল' ধর্ম বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও বাউল সুফিসাধকদের মাধ্যমে বাংলায় বাউল লোকধর্মে পরিগণিত হয়ে পড়ে। এই ধর্মে একদিকে মিথুনভিত্তিক দেহসাধনা, যা একান্ত করে যোগনির্ভর বা সুফিসাধনা যা এই সাধনার প্রেমাস্পদ বা মাশুকের অনির্বচনীয় রূপমাধুর্য "মনের মানুষ"—এই দুয়ের অপূর্ব সমন্বয় সূচিত করে। বাউলসাধনা তাই বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের বজ্রযান, সহজিয়া এবং পারস্যের সুফি মতাদর্শের একটি সমন্বিত রূপ যাকে ইংরেজিতে *Religious syncretism* বলে অভিহিত করা চলে। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন বলেন :

> এই সন্ত ও বাউলিয়াদের মধ্যে আর একটা ঐতিহাসিক যোগও আছে। এই উভয় মতের উদ্ভব বৈদিক আর্যভূমির বাহিরে ভারতের পূর্বউত্তর সীমান্তে।[৭৩]

এই অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধ মতের জন্ম হয়। পরবর্তীতে মুসলিম সাধকদের আগমনও এই অঞ্চলে ঘটে। এখানে মধ্যযুগের কবীর প্রভৃতির মতবাদও বিকাশ লাভ করে। আমরা বাউলদের মধ্যে যে মানবধর্মের প্রচলন দেখি তা যে সুফিসাধকদের অবদান—এটা সর্বজনস্বীকৃত। ক্ষিতিমোহন সেন 'বা'আল' অথবা বাউল মতাদর্শ বেদ, সংহিতা এবং উপনিষদেও লক্ষ করেছেন।[৭৪] তিনি বলেন :

> ঠিক বাউলদের মত অথর্ববেদও বলিলেন, এই অপরাজেয় মানমন্দিরের মধ্যে অষ্টচক্র এবং নবদ্বার।
>
> *অষ্টা চক্রা নব দ্বারা দেবা নাং পূর যোধ্যা।*
> *তস্যাং হিরণ্যায়ঃ কোশঃ স্বর্গে জ্যোতিষাবৃতঃ ॥*

বাউলদের কথা, 'যা আছে ভাণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে'; অথর্ববেদের (অথর্ববেদ ১০:২.৩১)-ও সেই একই কথা। এই মানবদেহ দিনে দিনে কমলের মতো ফুটিয়া চলিয়াছে—

হৃদ কমল চলছে গো ফুটে কত যুগ ধরি।

অথর্ববেদেও নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে অমৃতের ফুলের কথা আছে।

অমৃতস্য পুষ্পম।
(অথর্ব : ৬.৯৫.২)

বাউলেরা বলেন, এই দেহ যেন সোনার নাও। তার বাঁধনও সোনার, সেখানে অমৃতের পুষ্প :

সোনার নায়ে সোনার বাঁধন
অমৃতের ফুল ফোটে।

যোগীদের গান সম্পর্কে অথর্ব বলেন—সোনার নাও, পবনের বৈঠা, আকাশে ভাসে।

হিরণ্যয়ী নৌরচরদ্বিরণ্যবন্ধনা দিবি
তত্রামৃতস্য পুষ্পম ॥
(অথর্ব ৫,৪)

অথর্বে একটি মণির বর্ণনা দেখি

বজ্র বিদ্যুতে রচিত মণি
বিদ্যুতাং পুষ্পম ॥
(অথর্ব ১৯,৪৪,৪)

বিদ্যুৎ ও বজ্র পুষ্পের কথা ক্রমে দেহতত্ত্বে আসিয়া নতুন রূপ হইল। যোগীরা বলেন,

দেখরে ফুইট্যা যায়
বজ্রকমল দেখবি যদি আয়।

নারায়ণ উপনিষদে আছে :

এই দেহপুরই পুণ্ডরীক
তদিদং পুরং পুণ্ডরীকং ॥
(নারা, উপ, ৫)

ছান্দোগ্যে আছে–

দহরং পুইণ্ডরীকং বেশ্ম। (ছা, উপ, ৮, ১১)

অথর্বও বলেন, বিশ্ব সলিলের সেই পথেরই কথা জিজ্ঞাসা করি যাহা অপূর্ব রহস্যে সেখানে ভাসিতেছে।

অপাংত্বাং পুষ্পং পুচ্ছামি যত্র তন মায়য়া হিতম।
(অথর্ব ১০.৮.৩৪)

কোন মায়ায় এই দেহ কমল ফুটিল, তাহার রহস্য কি বিনা সাধনায় বুঝা যাইবে? এ দেহই সেইপথ... এই পুণ্ডরীক দেহের নবদ্বার। তিনগুণে ইহা আবৃত। ইহাতে বিরাজমান আত্মময় দেবতাকে জানাই হইল আত্মবিদ হওয়া :

পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিবিণে ভিরাবৃতম।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্ম বিদো বিদুঃ ॥
(অথর্ব ১০.৮.৪৩)

ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর বক্তব্যে বেদের পর উপনিষদ, জৈন, বৌদ্ধ মত, শৈব, নাথযোগী ও বৌদ্ধ সহজমত ও তন্ত্রের কথাও বাউলসাধনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি তন্ত্রের ষটচক্রের এবং কায়া সাধনের কথাও আলোচনা করেছেন। ষটচক্রে মূলাধার, স্বাধিষ্টান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র প্রভৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব-যে বাউলদের মধ্যে রয়েছে, ক্ষিতিমোহন সেন সে-বিষয়েও আলোচনা

করেছেন। তবে তিনি বলেন বাউলদের সঙ্গে তন্ত্রের মিল ও অমিল দুই-ই আছে। তিনি বলেন : "তান্ত্রিকদের সঙ্গে বাউলদের কায়াবোধ এবং কায়াযোগের মিল দেখা যায়। অনুরাগতত্ত্ব কিন্তু বাউলদের বিশেষত্ব। তাহার কিছুই তন্ত্রে মেলে না। বেদাচার ও যোগাচারের বিরুদ্ধে বাউল ও তন্ত্র সমান বিদ্রোহী।"[৭৫]

ক্ষিতিমোহন সেন মৈত্রেয় উপনিষদে দেহ উপাসনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে বাউলও সেই একই কথা বলেছে তাদের গানে।[৭৬]

দেহা দেবালয়ঃ প্রোক্তাঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ ॥ অর্থাৎ এই দেহই দেবালয় এবং তাহাতে যে জীব তিনিই তো শিব। মৈত্রেয় উপনিষদে বর্ণবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায় :[৭৭]

বর্ণাদি ধর্মং হি পরিত্যজন্তঃ
স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি।
(মৈত্রেয় উপনিষৎ)

উপনিষদবাদীরা বর্ণাশ্রমকে পরিত্যাগ করে মানুষের অন্তরে যে মানুষ রয়েছে তার সাধনা করেই তৃপ্ত হতে পারে। এরা বলেন, 'বাহ্যবিগ্রহ পূজায় মুক্তি নাই, তাই মুক্তির জন্য স্বহৃদয়ার্চন করো, বাহ্যার্চনা ছাড়ো :

পাষাণলোহ মনি মৃন্ময় বিগ্রহেষু
পূজা পুনর্জন ভোগকারী মুমুক্ষোঃ
তস্মাদ্ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চনামের কুর্যাদ্
বাহ্যার্চনং পরিহরেদপুনর্ভবায়।'
(মৈত্রেয় উপনিষৎ)

এই উপনিষদবাদীরা বাহিরের ভেক বা আচার মানেন না। তাহারা বলেন,

অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারাঃ
(জাবালোপনিষৎ)

উপনিষদের মতো পুরাণেও বর্ণাশ্রমকে পরিত্যাগ করে সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণের কথা তাঁরা বলেছেন।[৭৮] তাঁরা জাতিভেদকে অস্বীকার করেছেন। তারা বলেন, একই পিতার চারি সন্তান কি চার জাতি হতে পারে?

চত্বার একস্য পিতৃঃ সুতাশ্চ
তেষাং সুতানাং খলু জাতিরেকা
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব
পিত্রৈকাভাবান্ ন চ জাতি ভেদঃ
(ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মপর্ব ৪১:৪২)

উপনিষদ এবং পুরাণে যে জাতিভেদের বিরোধিতা আমরা লক্ষ করেছি, তা ইসলামের সুফিসাধকদের প্রভাবের ফলে হতে পারে। কারণ এসব সুফি ফকির অষ্টম শতাব্দীতেই এ উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন।[৭৯] সুফিদের প্রভাবে হিন্দুধর্মের মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং এই ধর্ম নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে প্রমথনাথ বসু বলেন :

> The Puranic period extending from the eighth to the beginning of the present century in the period of what may be called sectarian Hinduism, that is Hinduism split up into a number of sects. It may be called the period of Mahamedan influence.[৮০]

মুসলমান সুফিদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্মের পূর্বেই নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন যান বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এ ধর্মের অধিকাংশ অনুসারী এই সুফি ফকিরদের নিকট ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়।

যারা পুরনো ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকল, তারাও সুফিদের প্রভাবে নতুন ধ্যানধারণাকে উপজীব্য করল। রামানুজ, রামানন্দ বৈষ্ণব সাধনায় নতুন ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই পথ ধরেই কবীর, দাদ্দু রজ্জব এবং নানকের আবির্ভাব হয়েছিল।[৮১]

ক্ষিতিমোহন সেন বলেন :

> এই কবীরেরও গুরু ছিলেন সাধক রামানন্দ। রামানন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আচারপন্থী রামানুজদের দলে ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্তরে প্রেমভক্তি পাইয়া আর আচার মানিতে পারিলেন না। তিনি আচারের বেড়া ভাঙিলেন। সম্প্রদায় তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্রাহ্মণও বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রধান শিষ্যই হইলেন জোলা কবীর, মুচি রামদাস, নাপিত সেনা, জাট ধন্না প্রভৃতি। নারীকেও তিনি দীক্ষা দিলেন। তাঁহার শিষ্য পীপা ছিলেন রাজপুত। রামানন্দের মধ্যেই বাউলিয়া তত্ত্বের সারমর্ম পাই। তিনি দেখাইলেন, বাহ্য আচারই হিন্দু মুসলমান সাধনার মিলনের বাধা। ভক্তিতে প্রেমে তো সবাই মিলিতে পারে। রামানন্দ দেখাইলেন, ধর্ম বাহিরে নয়, ধর্ম ভিতরে। সারতত্ত্ব এই মানবদেহের মধ্যে। কাজেই বাউলিয়া কায়াযোগই রামানন্দ ভালো করিয়া প্রচার করিলেন। গ্রন্থসাহেবে রামানন্দের যে বাণী আছে তাহাতে দেখি, বাহিরে যাও কোথায়? দেহমন্দিরে তোমার আপন ঘরেই চলিয়াছে। অপরূপ লীলা, দেখিয়া ধন্য হও–
>
> *কত জাইঐরে ঘর লাগু রংগু*
> (গ্রন্থ সাহেব : বসন্তরাগ)

রামানন্দ বলিলেন, ভগবানকে পূজিতে ব্যাকুলভাবে চুয়া চন্দন চলিলাম বাহিরের দেব মন্দিরে। গুরু বলিলেন, ব্রহ্ম যে তোমারই মনের মধ্যে। বাহিরে যেখানেই যাইবে, মিলিবে শুধু তীর্থের নামে জল আর মূর্তির নামে পাষাণ... ।...

রামানন্দ আরও বলিলেন, বেদে পুরাণে বৃথা তাঁহাকে খুঁজিয়া মরা। অন্তরের মধ্যে না পাইলে তবে নাহয় এই ব্যর্থভাবে বাহিরে তাঁহাকে খুঁজিয়া মরার কোন অর্থ থাকিত। কিন্তু অন্তরে সন্ধান না করিয়াই বাহিরে বৃথা ঘুরিয়া মর কেন?

বেদ পুরান সভ দেখে জোই
উহাঁ তউ জাইঐ জউ ঈহাঁ না হোই
(গ্রন্থ সাহেব, ঐ)

আর্যদের চেয়ে দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রেমভক্তি ছিল বেশি করিয়া। তাই বলা যায় এতদিন প্রেমভক্তি ছিল ভারতের দক্ষিণ দেশে। উত্তর ভারতে ছিল ব্রহ্মজ্ঞান, যুক্তিবিচার ও কর্ম। এতদিনে রামানন্দ সেই দক্ষিণের প্রেমভক্তি উত্তর দেশে আনিলেন।[৮২]

এখানে বলা প্রয়োজন সুফিসাধকগণ ও অন্য মুসলিম বণিকগণ প্রথমে দক্ষিণ-ভারতে আগমন করেন।[৮৩] সুতরাং এমন ধারণা অসংগত নয় যে, মুসলিম সুফিদের মাধ্যমেই এখানে সুফিদের প্রেমবাদের সঙ্গে ভারতীয় ভাবনার প্রথম পরিচয় ঘটে।

ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর গ্রন্থে জৈনধর্মেও বাউলপ্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন[৮৪] এবং তারপর চর্যাপদেও তিনি সেই ধারারই প্রকাশ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। তিনি বলেন :

চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্যগণ দেহকেই মুখ্য করেছেন। এই দেহের সাধনাই আসল। এই দেহের মধ্যেই গঙ্গা যমুনা ও সাগর-সঙ্গম। এখানেই প্রয়াগ-বারাণসী, এখানেই চন্দ্র, দিবাকর। দেহকে উপেক্ষা করা চলিবে না।।

এথু সে সূরসরি যমুনা এথু সে গঙ্গা সা অরু
এথু প্রয়াগ বানারসি এথু সে চংদ দিবা অরু ॥
(সেরহপাদ ১৫:৪৭)

চর্যাপদে আত্মাকে 'সহজ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আত্মা দেহের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। আত্মা ও দেহের সম্মিলনে সহজাবস্থা। কাহ্নপাদের মতে বেদ-পুরাণ সবই মিথ্যা। 'সহজ'ই পরমতত্ত্ব। বলেছি, চর্যাগীতিকায় এই নতুন চেতনার উল্লেখ ঘটেছিল সুফিদের প্রভাবে।

ক্ষিতিমোহন সেন যথার্থই বলেছেন :

দেহতত্ত্বেও লোকাচার-বেদাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, তন্ত্রে ও বাউলিয়া মতে মিল থাকিলেও তন্ত্রে বাউলদের আসল কথা অনুরাগতত্ত্বই নাই। অনুরাগের বলেই ইহারা সব বন্ধন অতিক্রম করেন।[৮৫]

এই অনুরাগতত্ত্ব ভারতীয় সাধনায় মুসলিম সুফি সাধকদের অবদান। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

I think that in the intensity of love and of a sense of beauty which is so characterestic of the completed or perfected sufism there is some thing which suffused Indian (Hindu) mysticism as the result of a direct contact with sufism after 1000AD.[৮৬]

বাউলসাধনায় এই ধারার সঙ্গে প্রথম দিকে চৈতন্যদেবের কোনো সংযোগ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিও সুফি সাধনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু সেন আমলে আর্যভাষা বা সংস্কৃত ছাড়া অন্যভাষা চর্চা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।[৮৭] চর্যাগীতিকা ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু এই ভাষায় বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ প্রকাশ্যে সাহিত্যচর্চা করতে পারেননি। এই নিষেধের একটি বড় কারণ এমন হতে পারে যে এই সময় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা মুসলিম সুফিদের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ সময় সুফিদের বাংলাদেশে বসতি স্থাপন এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত হওয়া তৎকালীন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজ অত্যন্ত ঘৃণা ও ঈর্ষার সঙ্গে দেখেছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে তার প্রমাণ রয়েছে।[৮৮] মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' পুঁথির একটি অংশে 'বাউল' শব্দটির ব্যবহার এবং প্রয়োগ অত্যন্ত নিন্দিতভাবে হয়েছে। এই প্রয়োগ নিঃসন্দেহে বিদ্বেষভাবাপন্ন। যেমন :

মুকুল (ত) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে
বিকটান কাড়ি রায় বলে মাংশ কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে ॥
(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃ. ৫২৯)

উল্লেখ্য যে, পনেরো শতকের শেষপাদে লিখিত মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' পুঁথির মূল পাঠে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার ছিল কিনা এ সম্বন্ধেও কারও কারও সন্দেহ আছে। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এর যে-কয়টি পুঁথি মিলিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার সম্পাদনা করেছিল তার একটি পুঁথির অতিরিক্ত অংশে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।[৮৯]

এই পুঁথিতে বিদ্বেষ বা নিন্দার যে চিত্র পাওয়া যায় তা সরাসরি বাউলদের প্রতি না হলেও এই আক্রমণের যারা মূল লক্ষ্য তাদের প্রতি ঘৃণা বা নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য

বাউলদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এরা বাউলদের মতো মুক্তকেশের অধিকারী এবং যুদ্ধবাজ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এদেশে মুসলমানদেরকে 'ম্লেচ্ছ' বা 'যবন' নামে অভিহিত করা হতো।

সুফিরা অষ্টম শতক থেকে এদেশে আগমন করেন এবং নানাস্থানে হিন্দু রাজন্যবর্গের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সেন আমলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা এদেশের বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের মানুষ নিগৃহীত হতে থাকলে তারা মুসলমানদের এদেশ আক্রমণের আহ্বান জানায়। মুসলমান ও বৌদ্ধসমাজ হিন্দুব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিকট ঘৃণা ও নিন্দার পাত্র ছিল। মনে হয় তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করতে গিয়েই বাউল শব্দের প্রয়োগ ঘটাতে হয়েছে। তবে যেভাবেই এই শব্দের ব্যবহার হোক না কেন, তা যে চরম নিন্দা ও বিদ্বেষজনিত তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এ ভাগবত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের গুণপনা বিবৃত এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরোধীপক্ষকে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। 'বাউল' শব্দটিকে এই নিন্দিত এবং বিকৃত অর্থেই 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এর অতিরিক্ত পাঠে সংযোজিত করা হয়েছে। 'নাং' শব্দটির অর্থ উপপতি। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধীপক্ষকে বাউলদের মতো এলায়িত চুলের অধিকারী এবং তুচ্ছার্থে 'নাং' বা উপপতি হিসেবে তুলনা করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বাউলেরা লম্বা এলোকেশের অধিকারী ছিল এবং তাদের কার্যকলাপ সমাজে একশ্রেণীর লোকের নিকট নিন্দনীয় ছিল।

এখানে বলা চলে, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এর শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাজা কংসের বিরোধ, যুদ্ধ এবং রাজা কংসের ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের বিজয় আলোচিত হয়েছে। এই পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধীপক্ষকে দৈত্য, অসুর বা রাক্ষস নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদেরকে নিন্দাচ্ছলে বাউলদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তা এ কারণে যে, পুঁথিটির লেখক কিংবা বিবরণদানকারী অর্থাৎ অতিরিক্ত পুঁথির সংযোজনকারী বাউল-বিদ্বেষী ছিলেন। মুসলমানেরা এদেশ জয় করার পর তাদের প্রতি হিন্দুসমাজ বিদ্বেষভাবাপান্ন ছিল এবং বৌদ্ধসমাজ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করায় বাউল নামে পরিচিত সুফিদের এই শাখাকে 'উপপতি' নামে অভিহিত করা হয়েছে বলে ধারণা জন্মে।

ধর্ম হৈল জবনরূপী মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
(নিরঞ্জনের রুষ্মা : রামাই পণ্ডিত)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মালাধর বসুর পূর্বেই চতুর্দশ শতকে শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে 'বাউল' 'বাউর' শব্দের প্রয়োগ করেছেন প্রেমপীড়িত হিসেবে এবং আচরণগত অর্থে সমাজ শব্দটি নিন্দনীয় বলে ভেবেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে (আনুমানিক খ্রি. ১৫৮০-৮১) শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেও এই শব্দটির বহুল ব্যবহার ও প্রয়োগে বাউলদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। চৈতন্যদেব নিজেই বাউলদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন বলে এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

১. *গোবিন্দের আজ্ঞা ছিল—ইহা আজি হোতে*
বাউল্যা বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে। (আদির ১২ পরিচ্ছেদ)

২. *প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাঁহে কর?*
কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কে বা পাতিয়ায় (মধ্যের ২য় পরিচ্ছেদ)

৩. *স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাউল।* (বাতুল)
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধুকুল ॥ (মধ্যের ২য় পরিচ্ছেদ)

৪. *আমি তো বাউল আন্ কহিতে আন কহি।*
কৃষ্ণের মাধুর্যস্রোতে আতি যাই বহি। (মধ্যের ২১ পরিচ্ছেদ)

৫. *নীবিবন্ধ পড়ে খসি বিনামূল্যে হয় দাসী*
বাউলী হঞা কৃষ্ণ পাশে ধায়। (অন্ত্যের ১৭ পরিচ্ছেদ)

৬. *তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস*
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম নাশ। (অন্ত্যের ১৯ পরিচ্ছেদ)

রূপগোস্বামী : শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র পর সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমাত্য রূপগোস্বামীর সংস্কৃত নাটক 'বিদগ্ধ মাধব' (১৫১৬ খ্রি.)[৯০] নাটকে বাউল শব্দের দুইবার প্রয়োগ দেখা যায়। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' নাটক মূল সংস্কৃত থেকে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বাংলায় অনুবাদ করেন। নাটকের আরেকটি বঙ্গানুবাদ মূল সংস্কৃত শ্লোকসহ সম্প্রতি খণ্ডিত অবস্থায় আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়। এই অনুবাদকের নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের শ্রীদাম ও মধুমঙ্গলের কথোপকথনে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

বাউল কিত্তি : "নিরগলং পলবসি?" অর্থ, "ওরে বাউল কেন অনর্গল প্রলাপ বকছিস?" এই নাটকের অপর একস্থানে নান্দীমুখ রাধার অবস্থা সম্পর্কে মুখরাকে প্রশ্ন করেছে : "কোরসঙ চেটঠই রাহি?" "রাধা কিরূপ চেষ্টা করছে?"

মুখরার উত্তর : "বাউলা কি অ কিম্প পলবই" "বাউলের ন্যায় প্রলাপ বকছে"।

উল্লিখিত দুটি কথোপকথন বিশ্লেষণ করলে 'বাউলের' প্রলাপ যে একটি বিশেষ অর্থবোধক তা সহজে অনুমেয়। এই প্রলাপ প্রেমোন্মত্ততা। সাধারণ পাগলের প্রলাপের সাথে উল্লিখিত উক্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই বলে মনে হয়। তৎকালীন

সমাজে বাউলের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা উল্লিখিত উক্তি থেকে ধারণা করতে কষ্ট হয় না। তবে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থে 'বাউল' শব্দটি ঘৃণাব্যঞ্জক। কিন্তু 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকে এই প্রয়োগ তুচ্ছার্থে হলেও ঘৃণাব্যঞ্জক নয়, বরং বাউলের প্রকৃতির সাথে একটি সাদৃশ্য বা সাযুজ্য কল্পনা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এমন ধারণা অসংগত নয় যে, এ সময় সমাজে 'বাউল' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ছিল, যার ফলে নাটকেও এই শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন জাগে : 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' 'চৈতন্যচরিতামৃত' 'বিদগ্ধ মাধব' প্রভৃতি সাহিত্যকর্মে বাউলদের প্রতি যে কখনও বিদ্বেষ-ঘৃণা, কখনও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হলো, এই বাউলদের পরিচয় কী? কী কারণেই তাদের প্রতি এই বিদ্বেষ, ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হলো?

এর উত্তরে বলা যায় যে, এই বাউলেরা বিজাতীয় এবং বিধর্মী। এরা মুসলমান নামধারী বাতেনী এবং বেশ'রা সুফি ফকির। এদের এবং অন্য বহিরাগত মুসলমানদের নিকট ব্রাহ্মণ্যদের হাতে নিগৃহীত এবং অত্যাচারিত বৌদ্ধ এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজ ধর্মান্তরিত হয় এবং তাদের আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে। পরবর্তীকালে এদেশেও নানা দেশজ সুফি ফকিরের সৃষ্টি হয়। চর্যাগীতিকায় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সিদ্ধাচার্যদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তা এই বহিরাগত সুফি ফকিরদের প্রেরণার ফসল। এই ফকিরদের মাধ্যমেই ইসলামের উদার মানবতা সকলের মধ্যে প্রসার লাভ করে।

এখানে বলা অসংগত নয় যে, এই সুফি ফকির এবং তাদের অনুসারীরা এদেশে লোকসমাজে বাউলিয়া, বাউল নামে পরিচিত ছিলেন। আবার এদেরকে সমাজে আউলিয়া দরবেশ এবং ফকির নামেও চিহ্নিত করা হতো।

এ-কথা আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, গোটা ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয় প্রধানত আউলিয়া, দরবেশদের দ্বারা। এসব আউলিয়া দরবেশদের অনেকেই দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।[৯১] এদেশের অনেক হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের অনেকেই ইসলাম ধর্মের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হন। এরা অধিকাংশ নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য মতবাদের বর্ণবৈষম্য এবং নিষ্পেষণ এই ধর্মান্তরে সহায়তা করেছিল। এই আউলিয়া দরবেশদের মধ্যে চিশতিয়া তরিকার অনুসারীরা ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৯২] কারও কারও মতে, বৈষ্ণববাদী রামানুজের জীবৎকাল দ্বাদশ শতকে আরব বণিক প্রচারকেরা পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় উপকূলের জনসাধারণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ইসলামের আন্তঃপ্লাবী ক্রিয়াকলাপ নিশ্চয়ই রামানুজকে এ সময়ে নতুন ভাবনা-চিন্তায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে।[৯৩] রামানুজের শিষ্য

রামানন্দ ইসলামী ভাবধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে একটি নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন। তিনি জনসাধারণের ভাষা হিন্দিতে তার সব বাণী প্রচার করেন। তখন পর্যন্ত হিন্দি ছিল অস্পৃশ্যদের ভাষা এবং উচ্চবর্ণ ও শিক্ষিত মহলের ভাষা ছিল সংস্কৃত। রামানন্দের একজন শিষ্য ছিলেন কবীর, তিনি তাঁতি বংশোদ্ভূত এবং জাতিতে মুসলমান ছিলেন।

এ সময় রামানন্দসহ অনেক হিন্দুযোগীই মুসলিম সুফিসাধকদের সংস্পর্শে আসেন। এসব সুফিসাধকের মধ্যে খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তী (১১৪২-১২৩৬), ফরিদউদ্দিন শাকরগঞ্জ (মৃ. ১২৬৯), নিজামউদ্দিন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫) অন্যতম। এই সুফিসাধকেরা উত্তর ভারতের হিন্দু সাধুসন্তদের মনের উপর তীব্র প্রভাব বিস্তার করেন।[৯৪]

সুতরাং এ কথা বলা অসংগত নয় যে, এসব মুসলিম সুফি-দরবেশের প্রভাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং আলোড়ন শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে সতেরো শতকের ঐতিহাসিক কাশ্মীরের অধিবাসী মুহসীন ফামী কবীর সম্পর্কে বলেন :

> কথিত আছে যে একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গার তীরে বসে সর্বপাপ হরণকারী উক্ত স্রোতধারার জলরাশীর প্রশংসা করেছিল। আলোচনা চলাকালে তাদের একজন তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ায় কবীর উঠে গিয়ে নিজের একটি কঠোর গামলায় জল তুলে ব্রাহ্মণকে পান করতে দিলেন। কিন্তু তিনি নিম্নবর্ণভুক্ত একজন তাঁতী হওয়ায় তাঁর দেওয়া জল গৃহীত হল না। এতে কবীর বললেন : তোমরা বলছো যে গঙ্গাজল যাবতীয় অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেহ ও আত্মাকে পবিত্র করে দেয়, কিন্তু এই জল যদি এই কাষ্ঠের গামলাটিকেও পবিত্র করতে না পারলো, তবে তো তা তোমাদের প্রশংসা লাভের যোগ্যই হতে পারে না।

একই লেখকের গ্রন্থে আমরা আরও পাই :

> আর একদিন কবীর মূর্তির সামনে নিবেদনের জন্য পুষ্প সংগ্রহে রত একটি মালিনীকে লক্ষ্য করেছিলেন। মালিনীকে তিনি বললেন : পুষ্পস্তবকের মধ্যে উদ্ভিদের প্রাণ রয়েছে, আর তোমরা যে মূর্তির সামনে এগুলো নিবেদন করবে, তার অনুভূতিও নেই, প্রাণও নেই। উদ্ভিদের অবস্থাই বরং ভালো। মূর্তির যদি প্রাণ থাকতো হবে ইহাকে নির্মাণের সময় যে ভাস্কর তার বুকের উপর পা রাখছিল, মূর্তিটি তাকে শাসন করতো। যাও–জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও পুণ্যের পূজা করো।[৯৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কবীর রামাবত সম্প্রদায়ের দীক্ষা গ্রহণ করলেও এলাহাবাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসী সমকালীন মুসলিম সুফিসাধক শেখ তকীর সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক সংযোগ ছিল। কবীর ইসলামের সুফিবাদ ও হিন্দু

ঐতিহ্যের সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী ছিলেন। তবে সুফিদের প্রতিই তিনি অনুরক্ত ছিলেন বেশি। তিনি গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন :

> বলুন ভ্রাতাঃ এক বিশ্বের দুই স্রষ্টা কোথা থেকে এলো? বলুন, আল্লাহ, রাম, কেশব, হরি ও হজরত—এ নামগুলি কার আবিষ্কার? সব স্বর্ণালংকারই আসলে প্রস্তুত হয় একটি অনন্য ধাতু থেকে। কেবল দুনিয়াকে দেখাবার জন্যই নামাজ ও পূজা—এ দুটি নিদর্শন প্রবর্তিত হয়েছে। মহাদেব ও মোহাম্মদ অভিন্ন। তেমনি এক ও অভিন্ন-ব্রহ্মা ও আদম। হিন্দু কি? তুর্ক কি? উভয়েই একই দুনিয়ার বাসিন্দা, কেউ বেদ পড়ে আর কেউ কুরআন ও খুৎবা। কেউ-বা মৌলানা, কেউ-বা পণ্ডিত, একই মাটির তৈরি পাত্রের নামই শুধু ভিন্ন ভিন্ন।[৯৬]

কবীর বর্ণবৈষম্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। ডক্টর ইউসুফ হোসেন মন্তব্য করেন :

> বর্ণ বৈষম্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু এবং হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। ইসলামী ভাবধারার প্রভাব ছায়ায় কবীর তার বিরোধিতা করে মধ্যভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করেন। কতিপয় শক্তিশালী উপাদানের কারণে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইসলাম ও হিন্দুসমাজ যে নতুন সামাজিক দ্যোতনা দেখা দেয়, কবীর তার যথাযথ অভিব্যক্তি দান করেন।[৯৭]

কবীর উল্লেখ করেছেন :

> তুমি যদি ব্রাহ্মণীয় গর্ভজাত ব্রাহ্মণীই থাকো, তবে তোমার জন্মগ্রহণের পদ্ধতিটি অন্যরূপ হলো না কেন? একটি কালো গরু ও একটি সাদা গরুর দুধ দোহনের পর উভয় দুধই মিলিয়ে দিলে একটি গরুর দুধ থেকে কি তুমি অন্য গরুটির দুধ পৃথক করতে পারো?[৯৮]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাজন্যবর্গ কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম তার সত্যিকার মতাদর্শ থেকে বেশ কিছু দূরে সরে পড়েছিল। আউলিয়া দরবেশগণ ইসলামের মরমী রূপটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এখানে উল্লেখ্য, আউলিয়া দরবেশগণ ইসলামের যে রূপটি জনসমক্ষে তুলে ধরতেন, অনেক সময় মুসলিম রাজন্যবর্গ তা সমর্থন করেননি। এবং এই অসমর্থনের কারণ পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক। রুকুনউদ্দিন বারবাক শাহের আমলে কয়েকজন মুসলমান দরবেশকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে দরবেশ সেনাপতি ইসমাইল গাজী, শেখ পিয়ারার শিষ্য শাহ জালাল দকীনী অন্যতম।[৯৯] এরা উভয়েই আউলিয়া হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই সকল আউলিয়াদের বিপুল সংখ্যক অনুসারী ছিলেন এবং এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে মুসলিম রাজন্যবর্গ উৎকণ্ঠিত হন এবং তাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ও এই আউলিয়া দরবেশদের শিষ্য ছিলেন।

ইসমাইল গাজীর মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। মধ্যযুগের 'মঙ্গলকাব্যে' হিন্দু দেব-দেবীর সাথে পীর

ইসমাইল গাজীরও বন্দনা আছে। মুসলমান কবি শেখ ফয়জুল্লা তাঁর 'সত্য পীর পাঁচালী'তে বলেন :

খোটদূরের পীর ইসমাইল গাজী
গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হইল রাজী ॥[১০০]

এখন স্বভাবত প্রশ্ন জাগে : মালাধর বসু, রুকনউদ্দিন বারবাক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে ভাগবতের যে অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদের 'খ' পুঁথির অতিরিক্ত পাঠে যে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তা কি 'বা'আল' শব্দের পরিবর্তিত রূপ বা বাউল নামের আউলিয়া দরবেশদের কোনো বিকৃত ছবি? এই আউলিয়া দরবেশরা নিজেরাও যোদ্ধা ছিলেন। মালাধর বসু রাজা কংসের অনুসারীদের দৈত্যরূপে চিত্রিত করতে গিয়ে তুলনার্থে রাজরোষে পতিত এই আউলিয়া দরবেশদের ছবিকে হয়তো বিকৃতভাবেই তুলে ধরেছেন। হয়তো এমনও হতে পারে যে উল্লিখিত 'খ' পুঁথিতে ব্যবহৃত কবিতা ছত্রটাই মূলপাঠ। পরবর্তীকালে লিপিকারেরা মুসলিম 'বাউল' শব্দটিকে পরিহার করতে চেয়েছেন এবং সে কারণে এই পাঠটিকে পরিবর্তন করে নতুন শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বাউল শব্দের বহুল প্রচলন দেখে মনে এমন ধারণা হওয়া অসংগত নয় যে মালাধর বসুর সময়ে এই শব্দের প্রচলন বেশ থাকতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেক মুসলমান আউলিয়ার সঙ্গে হিন্দুরাজাদের বিরোধ ছিল। রাজা গণেশ যে বিভিন্ন মুসলিম আউলিয়াকে কঠোর হস্তে দমন করেন, ইতিহাসে তার নজির রয়েছে। তথাপি মুসলিম সুফিসাধকদের প্রদমিত রাখা সম্ভব হয়নি। এই সুফিসাধকেরা ইতঃপূর্বে বর্ণিত মনসুর হাল্লাজ, ইবনুল আরাবী এবং আব্দুল করিম জিলির অনুসারী ছিলেন। এরা মরমিয়াপন্থী ও সমন্বয়বাদী ছিলেন। বাংলাদেশে আগত সুফিসাধকেরাও এমন ধারণা পোষণ করতেন। বিশেষ করে চিশ্‌তীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকা উপর্যুক্ত আদর্শে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী মরমীবাদ প্রচার করেন। ডক্টর ইউসুফ হোসেন উল্লেখ করেন যে, এদেশে চিশ্‌তীয়া তরীকার অসাধারণ সাফল্যের কারণ এই ছিল যে, তাঁরা এদেশের আচরণ বিধির সাথে নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পেরেছিল। তাঁর মতে এই চিশ্‌তীয়া তরিকার লোকেরাই এদেশে সাধনসংগীতের প্রবর্তন করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তীর খলীফা, কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শেখ আলী সিজিস্তানীর 'খানকাহতে' ইন্তেকাল করেন। তখন গায়কেরা সংগীতের এই রচনাটি গাইতেছিল :

কুশতাগাতে খানজারে তাসলিম রা
হর জামান আখ গায়ের জানে দিগর আস্ত।

আত্মসমর্পণের ছুরিকাঘাতে যাদের মৃত্যু ঘটে, অদৃশ্য জগৎ থেকে প্রতিনিয়তই তারা নব জীবন লাভ করেন।[১০১]

এই বিস্তারিত আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, এদেশে সুফিসাধকেরা মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতিবিম্বের প্রকাশ এবং মানুষের মহোত্তম উপলব্ধিতে মানুষ যে পূর্ণমানবে রূপ লাভ করে, এই ধারণা প্রচার করেন। চৈতন্যদেবের অনুসারীদের অনেকে সুফিসাধক কর্তৃক প্রভাবিত হন এবং তাদের ব্যর্থ অনুকরণ করেন। চৈতন্যদেব মুসলিম আউলিয়াদের সাথে 'বাহাস' বা তর্কে অবতীর্ণ হন এবং তাদের অনুসারীদের অনেককে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন বলে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন।[১০২] মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন :

> Chaitanya had a free exchange of views with the Muslim Theologians and Mystics, who must have exerted direct and indirect influence over him.[১০৩]

চৈতন্যদেব মুসলিমপ্রভাবিত হলেও ইসলাম ও আউলিয়াদেরকে তীব্র বিরোধিতাই করেছেন এবং অদ্বৈতাচার্যের সেবক কমলাকান্তকে আউলিয়াদের ব্যর্থ অনুকরণে অদ্বৈতকে ঈশ্বরারোপে করাতে তাকে 'বাউলিয়া' বলে তিরস্কৃত করেন এবং তার সেবক গোবিন্দকে আদেশ করেন :

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল আজি এথা হৈতে
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥[১০৪]

সুতরাং মুসলিম আউলিয়া এবং তাদের দেশজ অনুসারীদেরকে যে 'বাউলিয়া' বা 'বাউল' নামে তৎকালীন সমাজ অভিহিত করেছে এমন ধারণা হয়তো অসংগত নয়। তবে বহিরাগত মুসলিম আউলিয়াদের সম্পর্কে তুচ্ছার্থে 'বাউলিয়া' বা 'বাউল' শব্দ ব্যবহার করা হলেও পরবর্তীকালে এই শব্দ যে আউলিয়া দরবেশদের দেশজ অনুসারীদেরকেও বুঝিয়েছে, তৎকালীন বিভিন্ন গ্রন্থে তার প্রমাণ রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের দ্রুত প্রসারে সমাজে কী রূপান্তর ঘটেছিল তার একটি পরিচয় রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণের' অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক কবিতায় ফুটে উঠেছে।

ধর্ম হৈলা যবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপি আ উত্তম হএ ত্রিভুবনে লাগে ভ এ
খোদা এ বলিয়া একনাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলে এ দম্বদার।

জথেক দেবতাগণ সভে হৈয়া একমন
আনন্দেতে পরিলা ইজার ॥
ব্রহ্ম হৈল্যা মহাম্মদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম হইলা শুলপানি।
গণেশ হইলা গাজী কার্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা জথমুনি ॥

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন :

> ইহাতে যে ইসলামী পরিবেশ চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে মুসলিম রীতি নীতি এবং আচার ব্যবহারের আভাসও পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সহ্য করিত বলিয়া নিশ্চয় উত্যক্তও বোধ করিতেছিল। এমন সময় মুসলমান তুর্কীদের কাছ থেকে ইসলামী মানবতাবোধ এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের স্পর্শ লাভ করিয়া তাহারা যে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে তাহারা বঙ্গে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ্য শাসনের আশু নিপাতও কামনা করিয়াছে।[১০৫]

ইসলাম কীভাবে হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে এ সম্পর্কে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে উল্লেখ' আছে :

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে
মোজা পা এ নড়ি হাতে কামান ধরিবে।
মনসরি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর
ডাকা-চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর ॥

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন :

> ব্রাহ্মণগণ মুসলমানের ন্যায় দাড়ি রাখিতে শুরু করিয়াছেন, সংস্কৃত ছাড়িয়া ফারসী ভাষা পড়িতেছেন, তাঁহারা পায়ে 'মোজা' পরিধান করিয়া এক হাতে যষ্টি ও অন্যহাতে 'কামান' বা ধনুক ধারণ করিতেছেন, এবং মুখে মুখে পারস্যের সুফি কবি মৌলানা জালালুদ্দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩) 'মসনবী' গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেছেন, ইহাই তো তখনকার দিনে হিন্দুসমাজের অবস্থা। সুতরাং ফারসী সাহিত্যের নানা প্রভাবে হিন্দু মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যে পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এই প্রভাব প্রধানতঃ শব্দ, ভাব ও অনুবাদ–এই চারি প্রকারেই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।[১০৬]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জগাই মাধাই নামে দুজন হিন্দু ইসলামের সুফি মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরে চৈতন্যদেব তাদেরকে পুনরায় বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করেন। এদের সম্পর্কে জয়নান্দ 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলেন :

মসনবী (মনসরি)
আবৃত্তি করে থাকে নল বনে
মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে ॥[১০৭]

ধর্মীয় ও সামাজিক অভিশাপে জর্জরিত সাধারণ নরনারীদের উপর মুসলিম সুফি আউলিয়া-দরবেশদের বিশেষ করে বাউল সুফিদের প্রভাব অত্যধিক পরিমাণে পড়েছিল। তারা এসব আউলিয়ার ন্যায় জীবনযাপনে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করলেও তাদের আদর্শকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। এই জাতীয় লোকদেরকে হয়তো সমাজে 'বাউলিয়া' বা 'বাউল' নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকবে।

ডক্টর এনামুল হক বলেন :

> নামে রুচি, জীবে দয়া, ইহাই গৌড়ীর বৈষ্ণব মতের মূলমন্ত্র। তাঁহাদের 'নামের রুচি' কীর্তনের অর্থাৎ নাম-সংকীর্তনের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং 'জীবে দয়া' সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। বলাবাহুল্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই 'নামে রুচি', 'জীবে দয়া', 'মুসলিম সুফী' সাধকদের 'জিক্‌র ও খিদমৎ' নীতির নামান্তর। ইহাতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও সুস্পষ্ট। অধিকন্তু, সুফিদের 'সামা' ও বৈষ্ণবদের 'কীর্তনেও' কোন তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে 'দশা' হয় তাহাতে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া ওঠে, সুফিদের 'হালের' অবস্থাও তাহাই। 'কীর্তন' ও 'সামা' এবং 'দশা' ও 'হাল' শব্দার্থভাব, সম্পাদন ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'প্রেম' সুফীদের 'ইশ্‌ক', 'সুফীদের 'সাকী' ও 'বুৎ', কিংবা 'শমআ' ও 'পারওয়ানা', ঐশ্বর্য, সুফীদের 'কিয়ামৎ' ছাড়া কিছুই নহে।... সুফী সাহিত্যের 'শরাব', বৈষ্ণব পদাবলীতে 'প্রেম' ও 'পিরীতি' হইয়া দেখা দিয়াছে। সুফি সাহিত্যের 'আশিক' ও 'মাশুক' বৈষ্ণব পদাবলীতে 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ'। এই সাহিত্যের 'হিজরান' ও 'বিশাল' বৈষ্ণব পদাবলীর 'বিরহ' ও 'মিলন'।[১০৮]

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ওপর সুফিদের প্রভাব সম্পর্কে মুহম্মদ এনামুল হক আরও বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁর ইংরেজি নিবন্ধে–*'Impact of Islam on the Gaudian form of Vaishnavism'*[১০৯]

মুহম্মদ এনামুল হক আরও বলেন :

> গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের সহিত যেমন প্রাচীন বৈষ্ণব মতের মিলের চেয়ে গরমিল অধিক, ঠিক তেমনি প্রাচীন সংস্কৃত 'হর্ষচরিত' 'রঘুবংশ' প্রভৃতির সহিত বৈষ্ণব 'মহাজন চরিত্রের' গরমিল দেখা যায়। অথচ শেখ ফরীদ উদ্দিন আত্তার-এর 'তজকিরহ-ই ঔলিয়া' যেরূপ লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী সম্বলিত জীবনী; 'অদ্বৈত প্রকাশ' (রচনা ১৫৬৮), 'চৈতন্য ভাগবত' (রচনা ১৫৭৫) 'চৈতন্যচরিতামৃত' (রচনা ১৫৮৫) প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন চরিতগুলিও তেমনি লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী সম্বলিত জীবনীগ্রন্থ। যাঁহারা মসনবী শরীফ পড়িতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা 'তজকিরাহ-ই-ঔলিয়া' পড়েন নাই এবং বাঙলায় তাহার পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করেন নাই, এমন কথা রক্ষণশীল ও অনুদার ব্যক্তির অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি মাত্র।[১১০]

সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'বা'আল' শব্দের একটি পরিবর্তিত রূপ প্রকাশ পাবে তাতে আশ্চর্য কি? বরং বলা যেতে পারে, সুফিদের ব্যর্থ অনুকরণে এদেশে পরবর্তীকালে একটি নতুন মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল এবং এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন অন্ত্যজ বা নিম্নশ্রেণীর মানুষ, তাই সমাজে ছিলেন অবহেলিত। এরাই সমাজে বাউল সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে এরা 'বা'আল' সুফি দরবেশদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সমাজের লাঞ্ছিত, নিগৃহীত মানুষ এই বাউলিয়া বা বাউলশ্রেণীভুক্ত হতে থাকে এবং তাদের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করেই হয়তো পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব নিজেকে 'মহাবাউল' এবং বাউল হিসেবে চিহ্নিত করে বাউলদের সাধনার সাথে একটি যোগসূত্র নির্ণয় করেছেন। উদ্দেশ্য অনেকটা রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। অর্থাৎ বাউল আদর্শের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের ইসলামপ্রীতিকে রোধ করা এবং নিজেকে বাউল হিসেবে পরিচিত করে এই মতাদর্শকে আপনার আদর্শের সাথে একত্রীভূত করা, যেন নিম্নশ্রেণীর বাউলভক্তেরা চৈতন্যদেবকেও তাদের আদর্শ মনে করে এবং সেই অনুসারে চলতে শেখে। মনে হয় এরই ফলে বর্তমানে বাউলদের মধ্যে চৈতন্যদেবকেও তাদের আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। লালন ফকিরসহ প্রায় সকল বাউল ফকিরের গানে চৈতন্যদেবের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভাব লক্ষ করা যায় :

আর কি গৌর আসবে ফিরে।
মানুষ ভজে যে যা করো সেরে ॥
গউর চাঁদ গিয়েছে
একবার এসে এই নদীয়ায়
মানুষরূপে হয়ে উদয়
প্রেম বিলায়ে যথাতথা
গেলেন প্রভু নিজপুরে ॥
(লালন)

এই প্রসঙ্গে সুফি সাধনায় ব্যবহৃত 'বরজখ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বরজখ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আড়াল'। মওলানা শাহ আব্দুর রহমান তাঁর 'শরফুল ইনসান' বা 'খোদা' প্রাপ্তি সোপান' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> কাঁচের লণ্ঠরের ভিতর বাতি জ্বলিতে থাকে, উহার আলো কাঁচের স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া বাহিরের স্থান আলোকিত করে, কিন্তু বাতির শিখা ধরিতে হইলে কাঁচ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ না করিলে শিখা ধরা যাইতে পারে না। অতএব এ স্থলে লণ্ঠনের কাঁচের আবরণটি 'বরজখ'।[১১১]

শাহ আব্দুর রহমান 'বরজখ'কে ইংরেজি প্রিজমের সাথেও তুলনা করেছেন। তিনি বলেন :

> নিরঞ্জন ও নিরাকার আল্লাহতায়ালার জাত ও সেফাতের মজহর (আবির্ভাব) তাহার সৃষ্টি। অতএব তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাঁহার প্রিজম স্বরূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া করিতে হইবে। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান সৃষ্টি মানব। অতএব খোদাতা'লাকে চেনার মানুষই প্রধান প্রিজম বা বরজখ।[১১১ক]

শাহ্ আব্দুর রহমান বরজখের দুটি স্তর নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি, বরজখে কুবরা এবং দ্বিতীয়টি, বরজখে সোগরা। সুফি সাধকেরা হজরত মুহাম্মদ (দ.) কে বরজখে কুবরা জ্ঞান করেন এবং আউলিয়া পীর ও দরবেশকে 'বরজখে সোগরা' বলে ধারণা করেন। শিষ্যেরা আউলিয়া দরবেশকে ভক্তিভাবে ধ্যান করে, তাদের চেহারা অন্তরে নিগূঢ়ভাবে প্রবিষ্ট করিয়ে পীর বা আউলিয়াদের সাথে একাত্মতা হবার নামই 'বরজখে সোগরা'। একে সুফি কবিদের ভাষায় 'ফান-ফিশ-শেখ' বলা হয়ে থাকে। এই স্তর অতিক্রম করে রসুলের প্রতি একাত্মতা হওয়ার নাম 'ফান-ফির-রছুল' এবং এই দুই স্তর অতিক্রম করবার পর 'ফানাফিল্লাহ' বা আল্লাহ প্রাপ্তি। বরজখ সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করে শাহ আব্দুর রহমান বলেন :

> মোরাকাবা দ্বারা আল্লাহর মোকামে পৌঁছানো দুঃসাধ্য, কারণ খোদাতা'লা নিরাকার এবং সাধনার প্রথম অবস্থায় নিরাকারের ধ্যান বা চিন্তা করা অসাধ্য। নিরাকারের চিন্তা করতে গেলেই শয়তান অন্তরে অন্যান্য রূপের ওয়াসওয়াস ও খাতেরা প্রেরণা করিয়া মোরাকাবার সাধনা নষ্ট করিয়ে দেন। সেইজন্য আউলিয়াআল্লাহগণ স্থির করিয়াছেন যে মোরাকাবাতে একাগ্রতা বা *concentration of mind* হাসেল করিবার জন্য প্রথম আকারের চিন্তা করা দরকার।[১১২]

এ কারণে মনে হয় কমলাকান্ত সুফিসাধনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই 'গুরুকেই ঈশ্বরারোপ' করে ধ্যান করতে মনস্থ করে। চৈতন্যদেবও এ সম্বন্ধে সম্যকরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন। সুফিসাধনার এই প্রভাবকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে হয়তো তিনি কমলাকান্তকে তিরস্কার করেন এবং কার্যকলাপকে বাউলিয়া আখ্যায় চিহ্নিত করেন। 'বরজক' সম্বন্ধে লালন ফকির বলেন :

পড়গে নামাজ ভেদ বুঝেসুঝে,
'বরজক' নিরিক না হলে ঠিক নামাজ তার হয় মিছে।

এখানে লালন 'বরজক' বলতে একদিকে গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ ধ্যান, অপরদিকে কবরের চিন্তা বুঝেছেন। তিনি কবরের সঙ্গে সৃষ্টিকৌশলরূপে স্ত্রী-জননাঙ্গ বুঝেছেন। এই স্ত্রী-জননাঙ্গ মানুষ সৃষ্টির আঁধার।

বাতেনী সুফিসাধনায় অবতারবাদ স্বীকৃত। তাই বাংলাদেশে বাউলসাধকেরা গুরুকে ঈশ্বরারোপ করে ভজনা করে থাকে। সাধারণে স্বীকৃত যে, এসব পীর সুফি দরবেশ একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শক্তিমান ছিলেন, তেমনি জাগতিক জীবনেও তারা বলীয়ান ছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বাংলা সুলতানদের প্রায় সকলেই এসব পীর দরবেশদেরক পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কমলাকান্ত বিশ্বাসের তাই এমন ধারণা থাকা অস্বাভাবিক নয় এবং সে কারণেই সে হয়তো প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থসাহায্য কামনা করেছিল। এখানে লক্ষ করা যায়, চর্যাগীতিকায় গুরুকে অবতার হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। হাজার হাজার বছর আগে 'তৌরাত', 'যাবুর' এবং 'বাইবেল'-এর সময়কাল থেকেই ঈশ্বর বা আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মের পাশাপাশি মানুষ নিজেই আল্লাহর পরিবর্তে মানুষগুরুকে 'অবতার' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 'বা'আল' এমনিভাবেই 'প্রভু'তে পরিণত হয়েছে।

তাহলে কি বলা যেতে পারে—চর্যাপদের পর মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে এই যে বাউল, বাউলিয়া শব্দের ব্যবহার, তা কি অতীতকালের 'বা'আল' কিংবা বাতেনী সুফি মতাদর্শ 'বা'আল' প্রভাবিত? অথবা এমন বলা যেতে পারে, এদেশে আগত সুফিসাধকবৃন্দ যারা সাধারণের নিকট আউলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন তাদের নামের একটি বিকৃত রূপ হিসেবে আউলিয়া থেকে বাউলিয়া এবং তা থেকে বাউল; কিংবা আউলিয়া শব্দ থেকে 'আউল' শব্দের উদ্ভব হতে পারে। অবশ্য প্রাচীন ক্যানানাইট লোকধর্মে 'বা'আল' এবং সুফি 'বা'আল' সাধনার সংমিশ্রণে বাউল শব্দ উৎপত্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 'বা'আল'>বা'ওল>বাউল (লোকনিরুক্তি)। একইভাবে বাউল থেকে বাউলিয়া কিংবা বাউল। এখানে বলা প্রয়োজন, লৌকিক সাধকেরা অনুমান অপেক্ষা বর্তমানকে গুরুত্ব প্রদান করেন এবং সেহেতু গুরুই তাদের সবকিছুর সারবস্তু। এখানে বস্তুবাদ তাদের চেতনার মাধ্যম। চৈতন্য নিজেও সুফিসাধকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বৈষ্ণবধর্মকে গতিমুখী করার জন্য সুফিসাধন প্রক্রিয়াকে স্বীকরণ করে নিয়েছিলেন। ফলে সুফিপ্রভাবিত এই বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বাউলধর্মের তেমন কোনো প্রভেদ থাকেনি।

বস্তুত, চৈতন্যদেবের সময়কাল থেকে বাউলসাধনা একটি নতুন আঙ্গিকে গড়ে ওঠে। চৈতন্যদেবের শিষ্য অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ উভয়েই প্রকৃতি-পুরুষ মিলনঘটিত যৌনসাধনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিত্যানন্দ সহজিয়াপন্থী ছিলেন। অনেকের ধারণায়, নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র সহজিয়া বৈষ্ণব এবং সুফি বাউলসাধনার

মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে প্রকাশ্যভাবে প্রকৃতি-পুরুষ মিলনঘটিত ধর্মসাধনকে বাউলসাধনা নামে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে এবং গুরুপরম্পরায় তা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[১১৩]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, বৈষ্ণব গোস্বামীগণ পুরুষ-প্রকৃতি মিলনসাধনা করতেন। অবশ্য প্রকৃতি-পুরুষ মিলনঘটিত সাধনার সমর্থকেরা শুধু নয়, এমনকি চৈতন্যদেব নিজেও এই মতের প্রবক্তা ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর এই মতের সমর্থনে উল্লেখ করেন :

> পুরীর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কন্যা ষাঠীর সহিত চৈতন্যদেব সহজ সাধনা করিতেন, এইরূপ কোন কোন সহজিয়াপন্থীরা বলে, মহাপ্রভুর প্রতি জামাতার অসম্মানজনক ব্যবহার ভট্টাচার্যের স্ত্রী 'ষাঠী রাণ্ডী হউক', এইরূপ বলিয়াছিলেন।[১১৪]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যনন্দ উভয়কেই বাউল হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।[১১৫]

আমার ধারণায়, চৈতন্যদেব পরকীয়া প্রেম ও রতিনিরোধ সাধনাকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব ও বাউল সাধনাকে একীভূত করেন। তাঁর দুই শিষ্য অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দ তাঁর সহায়ক হিসেবে এই মতাদর্শকে তাদের অনুসারীদের মধ্যে প্রবর্তিত করেন। এই নতুন মতাদর্শ মূল বৈষ্ণবধর্ম থেকে বেরিয়ে সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল নামে চিহ্নিত হলো। এই মতবাদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় লালনের গানে :

১

আয় দেখে যা তোরা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা
গলে কাঁথা
কটিতে কৌপীন পরা ॥
গোরা হাসে কাঁদে, ভাবের অন্ত নাই
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই,
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
হয়েছি কি ধন হারা ॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে।
মরি হায় কি লীলা কলিকালে দেববিধি চমৎকার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়,
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়।
অধীন লালন বলে
ভাবুক হলে সে ভাব জানে তারা ॥

২

গৌর কি আইন আনিলে নদীয়ায়
এ তো জীবের সম্ভব নয় ॥
আনকা বিচার, আনকা আচার
দেখে শুনে লাগে ভয় ॥
ধর্মাধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাই তাতে
প্রেমের গুণ গায় ॥
জাতের বোল রাখলে না সে তো
করলে একাকারময় ॥
শুদ্ধ অশুদ্ধ নাইকো জ্ঞান,
সাতবার খেয়ে একবার চান করেন সদায়।
যবন ছিল দবীর খাস
তারে গোঁসাই পদ প্রকাশ
করলো গোরা রায়
আর লালন বলে মোমিন বংশে
জামালকে বৈরাগ্য দেয় ॥

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, সুফি ফকিরদের বাউলসাধনা চৈতন্যদেবের হাতে নতুন আঙ্গিক এবং চেতন লাভ করে। এই সাধনায় সমাজের সকল বর্ণের এবং জাতহীন মানুষকে যেমন স্থান দেওয়া হয়েছে, তেমনি সমাজে কুলটা, পতিত, বিধবা ইত্যাদিদেরও সমাজে স্থান দিয়ে বেঁচে থাকার পথ করে দিয়েছে।[১১৬] চৈতন্য প্রবর্তিত এই নতুন সাধনায় শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার একটি বিশেষ স্থান আছে।

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কবু নহে ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনায় পরকীয়াবাদ পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেব তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ পরকীয়া নারীদেরকে সাধনসঙ্গিনী বলে গ্রহণ করত। এই পরকীয়া নারী সাধনায় রাধাস্বরূপিণী হিসেবে চিহ্নিত হতো। চৈতন্য ভাগবতে 'কৃষ্ণ শক্তি ধাতুরূপ' বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।[১১৭] নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র সুফিসাধনায় সংগীতকে এই সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে বৈষ্ণব বাউল সাধনাকে সংগীতাশ্রয়ীরূপে গড়ে তোলেন। ফলে সাধারণের

মধ্যে বাউলসমাজ সংগীতের মাধ্যমে তাদের একটি স্থান গড়ে নেয়। মনে হয় এ কারণে চৈতন্যদেবকে বাউলসাধনার একটি বিশিষ্ট গুরু হিসেবে গ্রহণ করার ফলে এই সাধনাকে বৈষ্ণব সাধনার বিশেষ হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার কেউ কেউ চৈতন্যদেবকে বাউলমতের গুরু হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। তবে এ-কথা বলা যেতে পারে, চৈতন্যদেবের সময়কাল থেকে এই সাধনা নতুন অবয়ব লাভ করে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে স্বয়ং চৈতন্যদেবও সহজিয়া সুফিপন্থী ছিলেন এবং তার প্রবর্তিত বৈষ্ণব সাধনা দ্বিবিধ ধারায় অদ্যাবধি প্রবহমান রয়েছে।

আমরা লক্ষ করছি যে বাতেনী সুফিসাধনা যখন দেশজরূপ গ্রহণ করে, তখন বিভিন্ন সহজিয়া মতাদর্শের প্রভাবে প্রকৃতির সাধনাও এই সাধনায় অনুপ্রবেশ করে। দেশজ বিভিন্ন সুফিকবিদের রচনায় তার ইঙ্গিত মেলে।[১১৮]

সংসারে ফকির শূন্য জপে শূন্য নাম
শূন্য হস্ত ফকিরের সিদ্ধি সর্বকাম
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি।
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেতে পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান।
জে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী
সেই সব শুদ্ধ যোগী হও শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই সে যুগল
জে সবে এই তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল।
বৈরাগীর নাম যোগী ধরে কোরাণ
জে সব ফকির হএ যুগল ভজন।
যুগল ভজন হেতু যোগী ধরে নাম।
যুগল বিহীনে সিদ্ধি নাহি মনস্কাম।
যুগল না হইলে কেহ ত্রিলোক মাজার।
শক্তি নাহি কর্ম এক করিতে সুমার।
যুগল না হইলে কোন কার্য না চলএ
যুগল ভাবে ত্রিলোক সৃজিলে দয়াময়এ।
যুগল ভাবনা যদি প্রথমে না হৈত।
করতাএ ত্রিজগতে কিছু না সৃজিত।
যুগলভাবে ভক্ত প্রভু আগে হইলেন্ত।
প্রেম হেতু করতাএ জগ সৃজিলেন্ত
প্রেম রসে মগ্ন হইল আপনে গোঁসাই
যুগল ভিনে কোন কর্ম সিদ্ধি পন্থ নাই।

প্রথমে আছিল প্রভু এক নিরঞ্জন
প্রেম রসে ডুবি কৈল যুগল সৃজন।
একা একি প্রেম না হএ কদাচন
যুগল হইলে যোগ্য পিরীতি ভজন।
যুগলবিহীনে ভক্ত না হএ প্রকাশ
যুগল ভক্ত মহা প্রেমের বিলাস।
এ যুগল হৈতে নাম ধরে যোগীকুল
প্রেমপন্থ যোগীর প্রধান তত্ত্বমূল।

এই কারণেই আমাদের দেশে চৈতন্য পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলিমদের একটি অংশ 'ফকিরী' ধর্মের প্রচলন করে। বাউল মতে তাই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করে।

ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'বাংলায় সুফি সাহিত্য' গ্রন্থে ২০টি সুফিশাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এই সুফিশাস্ত্র যুগলসাধনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকেরা এই সুফিসাধনার কথা বাংলা ভাষায় যেমন প্রচার করেছিলেন, তেমনি তাদের হাতে এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধিও ঘটে। সৈয়দ সুলতান বলেন :

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন
যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছএ দুষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেত পড়ি
কিতাবের কথা দিল হিন্দুয়ানি করি ॥

কবি মুতালিব বলেন :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহুপাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিল।

আমীর হামজা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

মুসলমানি কথা কোথি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই
লোক উপকার হেতু ত্যাজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিলু হৃদয়।

আব্দুল হাকিম এ বিষয়ে আরও বেশি দৃঢ়তা নিয়ে বলেন :

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নর গণ
সেই কাব্য বুঝে প্রভু আদে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেগণ।
যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।[১১৯]

এখন মনে প্রশ্নজাগে : এই প্রকৃতিসাধনা যে-অর্থে সুফিসাধকেরা তাদের সাধনমার্গে ব্যবহার করেছিলেন, এর উৎস কোথায়? ইতঃপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি যে, প্রাচীন প্যালেস্টাইনের ক্যাননাইটদের মধ্যে যে 'বা'আল' ধর্ম প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করে। তাদের অনুসরণে ইরানি 'বা'আল' সুফিসাধকদের উদ্ভব ঘটে। এই সাধনা যুগলসাধনার অনুরূপ। মুসলিম সুফি সাহিত্য 'যোগ কলন্দরে' যুগলসাধনার উল্লেখ রয়েছে। বাউলসাধকেরা অনেকেই 'যোগ কলন্দরকে তাদের সাধনশাস্ত্র বলে গণ্য করে থাকে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বহিরাগত মুসলিম সুফিসাধকের অনেকেই পূর্ব থেকেই এদেশীয় যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আমাদের ধারণা তন্ত্র এবং যোগসাধনা সুফিবাদের নির্মাণকালেই সুফিসাধনাকে প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য সুফি-আদর্শও দেশজ বিভিন্ন মতাদর্শকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। বিশেষ করে প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে স্রষ্টাকে পাবার পথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সুফিসাধকেরাই এদেশে প্রচার করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, সুফি 'হাল' শব্দের সাথে বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনার 'দশা' শব্দের মিল আছে। তিনি বলেন :

> ...but one thing is clear—this special sense of the word 'Dasa' is very late in Sanskrit and appears to be confined only to Bengal.[১২০]

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জনৈক ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন :

> Mr. Mukherjee has found the following figures which he (in my opinion) rightly thinks have come from Sufi poetry into Bengali Vaishnav Mahajana padas or lyrics with their primary spiritual appeal.
>
> i) The lover (Beloved) is the collyrium (in Arabic Khol, in New Indo-Aryan Bengali etc. Kajal) in the eye of the other party.

> ii) the Beloved is the flame, the lover the moth.
> iii) the lover is caught in the net or the locks (Zulf) or tresses of the Beloved (or vice-versa)
> iv) The dead body of the lover will come back to life or consciousness through a glance or touch of the other party.
> v) The lover (or the Beloved) would go to the sea and drown himself (herself) far away form mortal ken, to escape the great shame or sorrow at being ignored or jilted by the beloved (or lover).[১২১]

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> Be it as it may, it must be said that if the Hindu mind did not respond to formal Quranic Islam it was most enthusiastic in its acceptance of Tasawwuf on mystic Islam. Tasawwuf made hundreds of muslims in India appreciate the deeper things of Hinduism and it affiliated to itself, formally or informally, hundreds of Hindus, who found that they could be Sufis and yet remain in the Hindu fold.[১২২]

সুতরাং আমাদের আলোচ্য 'বা'আল' শব্দ থেকে বাউল, বাউলিয়া কিংবা আউলিয়া, আউল, বাউল থেকে বাউলিয়া শব্দে পরিণত হওয়া এমন কোনো অস্বাভাবিক কার্যক্রম বলে মনে হয় না। বরং এই সাধনা 'মিশ্র ভাবনাজাত' বলে এই মতবাদের লোকেরা তখনকার সমাজে বাউল, বাউলিয়া ইত্যাদি নামে সম্বোধিত হয়ে থাকবে।

আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বাউল একটি মিশ্র লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা। এই সাধনায় মুসলিম সুফিসাধনা ও দেশজ বিভিন্ন সাধনার মিশ্রণ ঘটেছে। এই মিশ্রণের ফলে সাধক সুফি ভাবধারায় তার প্রেমাস্পদকে আপনার অন্তরে গভীর প্রেমানুভূতির সাথে উপলব্ধি করেছে এবং বুঝতে শিখেছে যে তিনিই সবকিছুর উৎস। তিনিই আলো এবং তার থেকেই সকল আলোকের সৃষ্টি। আল্লাহ নিজেই নূর এবং সবকিছুতেই এই নূরের প্রচ্ছায়া।[১২৩]

আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা
আলো নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় হরা ॥
(রবীন্দ্রনাথ)

এই উপলব্ধিই তাকে 'আনাল হক' বা 'আমি খোদা' বলিয়েছে। সে 'দিওয়ানা' হয়েছে। এবং সেই একই অর্থে বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিবৃত কৃষ্ণপ্রীতি তাকে 'বাউল' আখ্যা দিয়েছে। বাউল বলে :

শুদ্ধ প্রেম সুখ সিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউল কয়
কহিলা কেবা পাতিয়ায় ॥

(চৈঃ চঃ অধ্যায় ২য় অধ্যায়)

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত কবিতাংশের ভাব নিঃসন্দেহে সুফিপ্রভাবিত। এখানে বাউল অর্থ : ভাবোন্মত্ত কৃষ্ণপ্রেমিক। এখানে 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বুঝাতে চান—বাউল যে-অর্থে কৃষ্ণপ্রেমকে উপলব্ধি করেছে, অন্য কোনোভাবে সে তার এই ভাবনার প্রতি কোনো প্রত্যয় আনতে সক্ষম নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সুফিসাধনার সাথে চৈতন্যদেবের সম্যক পরিচয় ছিল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেও এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বিধায় 'মহাবাউল' শব্দটির ব্যবহার অসংগত হয়নি। সমগ্র চৈতন্যচরিতামৃতে 'বাউল' শব্দটি আরবি ফারসি 'বা'আল' শব্দের দেশজ সংস্করণ এবং তা ভাবোন্মত্ত বলে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুফিসাধনার প্রভাব বৈষ্ণব সাধনার উপর যে কত গভীর এবং ব্যাপক ছিল ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *Obscure Religious Cults*-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের একস্থানে তিনি বলেন :

> The Sufistic ideas that were thus introduced (by Muslim Sufi since the beginning of 11th century) were soon assimilated with the prevalent Sahajiya ideas and the result of this amalgum has been the Bauls of Bengal.[১২৪]

সুতরাং বাউলসাধনা একটি মিশ্র মতাদর্শ। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এমন ধারণা হওয়া অযৌক্তিক নয়, এই সময় কোনো কোনো মুসলিম রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সমন্বয় ত্বরান্বিত হয়েছিল। এদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নাম অন্যতম। চৈতন্যদেবের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লেখ আছে :[১২৫]

গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাত শুনিয়া
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
বিনা দানে যার কাছে এত লোক হয়
সেই গোসাঞি ইহা জানিও নিশ্চয় ॥

কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় চলন যাহা উহার মন ॥

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, তার ফলে সত্যপীরের পূজা প্রবর্তিত হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু তার বিশ্বকোষে বলেন :

> সত্যনারায়ণের কথায় যে আলা বাদশাহের উল্লেখ আছে, তাহাকে আমরা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বলে মনে করি। হোসেন শাহ হিন্দু মুসলমানকে সমানভাবে দেখিতেন, তাহার উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবত, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্য তাঁহারই যত্নে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্তিত হয়।[১২৬]

দীনেশচন্দ্র সেন রামায়ণ এবং নায়েক ময়াজ গাজীর লেখা দুইটি সত্যপীরের পাঁচালীর তুলনা করে ধারণা করেন যে হোসেন শাহই সত্যপীর পূজার প্রবর্তক।[১২৭] শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন :

> শঙ্কর আচার্য এবং কবি কর্ণ রচিত সত্যপীরের পাঁচালীতে জনৈক আলা বাদশাহ কর্তৃক সত্যপীরের পূজার একটি অলৌকিক রসাশ্রিত কাহিনী পাওয়া যায় এবং আরিফ রচিত লালমোনের কেচ্ছায় এই ক'টি চরণ মেলে :
>
> *সত্যপীর ছিল ছলে লালমোন সুন্দরী*
> *হোসেন শাহা বাদশা নিয়া হয় দেশান্তরী ॥*
>
> এ-কথা মনে করা যেতে পারে, শঙ্কর আচার্য ও কবি কর্ণের পাঁচালীতে উল্লিখিত আলা বাদশাহ এবং লালমোনের কেচ্ছায় বর্ণিত 'হোসেন শাহা বাদশাহ' অভিন্ন লোক এবং ইনি আসলে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)। হয়তো হোসেন শাহ কোনো সময় 'সত্যপীরের সির্ণী) দিয়েছিলেন, সেই কাহিনীই পরবর্তী সাহিত্যে পল্লবিত ও নানা অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত আকারে স্থান পেয়েছে।[১২৮] প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কবি কঙ্ক ও শেখ ফয়জুল্লাহ ষোড়শ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেন।[১২৯]

শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবি কঙ্কের সত্যপীর ভক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

> ...কবি কঙ্ক শুধু চণ্ডালের প্রতি উদার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নিজেও এক মুসলমান পীরকে ভক্তি করিতেন এবং তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই পীর বা সত্যপীরের প্রত্যাদেশের ফলেই তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।[১৩০]

ড. এনামুল হক বলেন :

> খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী সমগ্র উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগ। যে পরিবেশে এই সময়ে উত্তর ভারতে কবীর (১৩৯০-১৪৪৩ খ্রি.) নানক (১৪৬৯-১৫৩৩ খ্রি.) প্রভৃতি হিন্দু মুসলিম সাধকদের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল, ঠিক সেই পরিবেশেই বাংলাদেশে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। মোটের উপর, যুগধর্ম বলেই এই সময়ে ইসলাম ও হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি বিষয়ের পারস্পরিক সমঝোতা আবশ্যক হয়। এবং মুসলিম সুফি ও হিন্দু সাধকদের উদার মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি অভিব্যক্তি রূপে তাহাদের মতবাদ প্রচার ও প্রসারের মধ্যস্থতায় হিন্দু মুসলিম সমঝোতার পথ দ্রুত পরিষ্কৃত হইতে থাকে।[১৩১]

দীনেশচন্দ্র সেন বলেন :

> বহুদিন একত্রবাস নিবন্ধন হেতু হিন্দু মুসলমান পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিত্র দেবতার পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী আলখাল্লা গায়ে পরিয়াছেন ও উর্দ্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন :
>
> *বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায় বলে বাছা।*
> *দুনিয়মে এসাবি আদমি রহে সাঁচা ॥*
> *তালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে।*
> *রাত দিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে ॥*
> *জানাগেও বাত বাওয়া জানা গেল বাত।*
> *কাপড়াত লেও আও মেরা সাথ ॥*
> *জাআওত সত্যপীর মেরা জাওত সত্যপীর।*
> *তেরা দুঃখ দূর করতা হাম ফকির ॥*[১৩২]

সত্যপীর সম্পর্কে এই বিস্তারিত আলোচনা এইজন্য যে, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির একটি মিশ্ররূপ দেবার প্রয়াস তখন থেকে লক্ষ করা গেছে। তবে এই সমন্বিত ভাবনা প্রসারে যারা অগ্রগামী ছিল তারা অধিকাংশই অন্ত্যজ বা নিম্নশ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠী। উচ্চশ্রেণীর মানুষ তাদের এই চেতনার প্রসারতায় উদ্বেগ পোষণ করেছে। ফলে সাহিত্যে 'বাউল' শব্দ বিশেষক্ষেত্রে নিন্দিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত হবে না তদানীন্তন সমাজে বর্ণবৈষম্য বিশেষভাবে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেও এই বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে বিমান বিহারী মজুমদার উল্লেখ করেন যে কৃষ্ণদাস নিজেই ব্রাহ্মণদেরকে মারপিট করেছেন :

> রূপসনাতন বলিয়াছেন, তুমি শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মারিলে? কৃষ্ণদাস বলিলেন, আমি তো শূদ্র, তোমরাও তো কায়স্থ! সনাতন বলিলেন, এই কথা বাদশা শুনিলে কি জবাব দিবে? কৃষ্ণদাস বলিলেন, আমি তাহার জবাব দিব, কিন্তু তুমি যে কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণদের প্রণাম লও, তোমারও জবাব দেওয়া মুস্কিল হইবে। এই কথা শুনিয়া সনাতন চুপ করিয়া গেলেন।[১৩৩]

বাউল কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই প্রতিবাদী মনোভঙ্গি তাঁকে বাউলদের অতিনিকটের মানুষ করে তুলেছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বাউল শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ এ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের পরিচয় বহন করে। শ্রী সুকুমার সেন বলেন :

> 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বাউল প্রভৃতি মিস্টিক সাধক যাহাদের ঠিক বৈষ্ণব বলা চলে না এবং যাঁহারা সাধারণতঃ শাস্ত্রবিধি মানেন না তাহাদেরও আর্যগ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাসের অধ্যাত্মচিন্তায় মিস্টিক অংশ নেহাৎ কম ছিল না।[১৩৪]

এখন মনে প্রশ্ন জাগে, বাউল সম্প্রদায় যে মিশ্রসাধনাকে গ্রহণ করেছিল সেই সাধনার স্বরূপ কী? চৈতন্যদেবের সময়েই সহজিয়া সাধনার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। বাউলসাধনা সহজিয়া সাধনা কর্তৃক নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছে, তবে এই প্রভাব ব্যাপক নয়। বরং সহজিয়া মতাদর্শ, বিশেষভাবে বৈষ্ণব সহজিয়া মতাদর্শ ইসলামের সুফিবাদ দ্বারা অধিক প্রভাবিত। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় দৈহিক প্রেম মুখ্য। এই প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভই সাধকের উদ্দেশ্য। কিন্তু সহজিয়ারা এই প্রেমকে শুধু দেহকেন্দ্রিক পরমার্থরূপে কল্পনা করেছেন। তারা মানবদেহের রূপ, স্বরূপ ও আবেগের মধ্যে 'জীয়ান্ত মরা'[১৩৫] ভাব অবলম্বন করে কাম ও প্রেমকে একত্রে মিশিয়ে শিরস্থিত সহস্রারে উন্নীত করে অনন্ত আনন্দ লাভ করাকেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ বুঝেছেন। কিন্তু বাউলদের সাধনা এখানেই থেমে থাকেনি, দেহস্থ মনের মানুষের স্বরূপ উপলব্ধিই ছিল তাদের অন্বিষ্ট।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, বাউলসাধনার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সহজিয়া সাধনায়। অবশ্য তিনি মনে করেন যে, সুফি মতাদর্শ এই সাধনার ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং নতুন চেতনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, কারণ তিনি নিজেই তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> But the earlier shahajiya cult underwent a notabale transformation in the hands of the Bauls; for the Bauls, by derivation and innovation effected a great change both in the ideology and practice of the Sahajiya... The Buddhist Sahajiya conceived 'Sahaja' as Maha-Sukha which is the unity of the duality represents by man and

woman as 'upaya' and 'pranja'. The method for the realisation of this 'Sahaja' consisted therefore essentially in a sexo-yogic practice. To this however the Vaisnava supplied the element of love. But here in the Vaisnava school, also 'Sahaja' was conceived as supreme love which can be realised by the union of Krishna and Radha who reside in the corporal form of man and woman.

...But the Bauls conceived 'Sahaja' as the innermost external Beloved who is the Man of the Heart (Maner Manush). The Bauls also speak of love and union but this love means the love between the human personality and the Divine beloved within and in this love man realises his union with the Divine or in other words he merges his personal existence in the beloved that resides within this temple of the body. Great has been the influence of sufism on the Bauls in the evolution of this new conception of 'Sahja' and in the differerence in their religious approaches.[১৩৬]

আমরা শশিভূষণ দাসগুপ্তের বক্তব্য সম্পর্কে বলতে চাই যে, তিনি বাউলসাধনার সাথে সহজিয়া মতাদর্শের পার্থক্য এবং সুফিচেতনার ব্যাপকতার প্রভাব সম্পর্কে যে যুক্তি উপস্থাপনা করলেন তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাউলসাধনা একটি ভিন্নতর মতাদর্শ। আমরা স্বীকার করি বাউলসাধনায় সহজিয়া প্রভাব রয়েছে কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে সহজিয়া সাধনা বাউলসাধনার উৎসবিন্দু। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সহজিয়া সাধনার উৎসবিন্দুও সহজিয়া সাধনা নয়। এ সাধনার উৎস আরও প্রাচীন। সৃষ্টির প্রথম থেকেই এমনি ধরনের ভাবনা নিত্যপ্রবহমান। বাউলগানের 'সাপের ফণা' উৎস খোঁজ করলে ধর্মগ্রন্থের সহায়তা নিতে হয় বলতে হয়; মানুষের আদি ইতিহাস—সর্পরূপী শয়তানের প্ররোচনার কথা।[১৩৭]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রকৃতি বা নারীপ্রেম সহজিয়া সাধনার মৌল চেতনা এবং বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের পদে তা আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু এই প্রকৃতি প্রেম বহিরাগত মুসলিম সুফিসাধকদের নিকট কোনো নতুন তথ্য ছিল না। এ সম্পর্কে তাঁরা পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন। আরবে প্রাক-ইসলামী যুগে প্রকৃতি-প্রেম যাকে ইংরেজিতে erotic love বলে আখ্যায়িত করা যায়, 'কাসিদা' নামক এক বিশেষ ধরনের কবিতায় যা ইংরেজি ভাষায় ode নামে পরিচিত, এই

ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। এই প্রসঙ্গে আর.এ. নিকোলসন, ইবনে কুতাইবা নামক জনৈক আরবীয় পণ্ডিতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

I have heard, says Ibn Qutayba, from a man of learning that the composer of Odes began by mentioning the deserted dwelling places and the relics and traces of habitation. Then he wept and complained and addressed the desolate encampment and begged his companion to make a halt, in order that he might have occasion to speak of those who had once lived there and afterwords departed; for the dwellers in tents were different from town's man or villagers in respect of coming and going, because they moved from one water spring to another, seeking pasture and searching out the places where rain had fallen. Then to this, he linked the erotic prelude (nasib) and bewailed the violence of his love and the anguish of separation from his mistress and the extremity of his passion and desire.[১৩৮]

মুসলিম শাসন আমলে আব্বাসীয় রাজত্বকালে মুতানব্বী নামক জনৈক মুসলিম কবির রচনায় নারীর দৈহিক প্রকৃতি-প্রেমের (erotic love) উল্লেখ পাওয়া যায়। R.A. Nicholson মুতানব্বীর কবিতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে বলেন :

In the first place he calls attention to the poet's skill in handling the customary erotic prelude (nasib) and particularly to brilliant description of Bedouin women which were celebrated all over East.[১৩৯]

এখানে মুতানব্বীর একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কবিতাটি তাঁর প্রেমিককে উদ্দেশ্যে করে লেখা :

She loosed three sable tresses of her hair, And thus of night for nights at once she made. But when she lifted to the moon in heaven, her face, two moons together I surveyed.[১৪০]

লালন ফকির তাঁর একটি গানে বলেছেন :

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমি ভেবে করবো কি ॥

পারস্যের সুফি কবিরা নারী বা প্রকৃতিপ্রেমের ব্যাপকতার রূপ দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে। ওমার খৈয়াম, হাফিজ, জামী প্রভৃতি সুফিসাধকের রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রাক-ইসলামী যুগে আরবীয় কবিরা তান্ত্রিক বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। এ সম্পর্কে R. A. Nicholson বলেন :

> By the ancient Arabs the poet (sh-air, plural shuara) as his name implied, was held to be a person endowed with supernatural knowledge, a wizard in league with spirits (Jinn) or satans (shayatin) and dependent on them for the magical power which he displayed.[১৪১]

মুসলিম সুফিসাধকেরা এদেশীয় তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল না হলেও উল্টাসাধনা সম্পর্কে তাদের সম্যকজ্ঞান ছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মুসলিম সুফিসাধকদের এই উল্টাসাধনা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[১৪২] নিকলসনের বক্তব্যেও এই সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

> Unification (Towhid) is defined as the absoluteness of the Divine nature realised in the passing away of the human nature, so that the man's last state reverts to his first state and he becomes even as he was before existed.[১৪৩]

অতঃপর নিকলসন তাঁর অপর একটি গ্রন্থে বলেন :

> ... Hence the upward movement of the Absolute from the sphare of manifestation back to the unmanifested Essence takes places in the through the unitive experience of the soul.[১৪৪]

এ কথা অনস্বীকার্য যে বহিরাগত সুফিসাধকেরা দেশজ তান্ত্রিক ও যোগসাধনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সুফিসাধনাও দেশজ সাধনার উপর তীব্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। বীরভদ্রের কড়চায় তার হদিশ মেলে। নিত্যানন্দ তাঁর পুত্র বীরভদ্রকে বলেছেন :

শীঘ্র করি যাও তুমি মদিনা শহরে
তথা যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির সনে
তাহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে।
মাধব বিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই
তাহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই।[১৪৫]

এখানে মাধব বিবি কে তা আমরা জানি না। কিন্তু তিনি যে মুসলিম সাধিকা এবং তার কাছে দীক্ষা নিলে তবেই সিদ্ধি লাভ হবে, এ ধারণা বাতেনী সুফিসাধকদের প্রভাবের কথা ঘোষণা করে। মোদ্দাকথা, যার যত প্রভাব তার তত নাম। বৌদ্ধ সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রবেশ করে যেমন বৈষ্ণব হয়েছেন তেমনি তারা উভয়ে সুফিপ্রভাবে বাউল হয়েছেন। বলা যেতে পারে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও সুফিসাধনার মিশ্রিত রূপ বাউলসাধনার প্রবহমান ধারায় একীভূত হয়েছে। এ যাবৎ আমাদের আলোচনা থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে যে বাউলসাধনায় বহিরাগত সুফিসাধনার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এ সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে বহিরাগত সুফিসাধনা এমন ধারণা করা তাই অসংগত নয়।

বাতেনী সুফিসাধনা প্রভাবিত এই বাউলসাধনা তৎকালীন সমাজে যে ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল, 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্যের প্রহেলিকায় তা বিধৃত হয়েছে। অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের নিকট যে প্রহেলিকা প্রেরণ করেছিলেন, তা নিম্নরূপ :

বাউল কহিও লোক হইল বাউল
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥[১৪৬]

(চৈঃ চঃ অন্তলীলা)

কিন্তু এই তরজা প্রাপ্তির দিন থেকেই চৈতন্যদেব সুস্থির থাকতে পারেননি। মনে হয় অদ্বৈতাচার্য কর্তৃক প্রেরিত এই তরজা তাঁকে বিচলিত করেছিল। চৈতন্যদেবের এই বিচলিত হবার কারণ সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কিছু উল্লেখ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুধু চৈতন্যদেবের এই বিচলিত ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন :

প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগাম শাস্ত্রের বিধি বিধান কুশল ॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন ॥
পূজা নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তাহার না জানি অর্থ কিবা তার মন ॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥[১৪৭]

(চৈতুঃ চঃ অন্তলীলা)

কিন্তু এই তরজা প্রাপ্তির দিন থেকেই চৈতন্যদেব সুস্থির থাকতে পারেননি। মনে হয় অদ্বৈতাচার্য কর্তৃক প্রেরিত এই তরজা তাঁকে বিচলিত করেছে। চৈতন্যদেবের

এই বিচলিত হবার কারণ সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কিছু উল্লেখ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুধু চৈতন্যদেবের এই বিচলিত ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন :

শুনিয়া চিন্তিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোঁসাই কিছু হইলা বিমন ॥
সেইদিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।[১৪৮]

(চৈঃ চঃ অন্তলীলা)

উল্লিখিত কবিতাংশে অদ্বৈতের প্রতি চৈতন্যদেবের অসন্তুষ্টির ভাব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তখনকার জনগোষ্ঠী বৈষ্ণব মতবাদ অপেক্ষা বাউল মতবাদের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হওয়ার সংবাদে চৈতন্যদেব বিচলিত হয়েছেন। এই বিচলিত ভাবনায় চৈতন্যদেব যে শ্লোক পাঠে প্রলাপোক্তি করেন, চৈতন্যচরিতকার কৃত তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো :

(শ্রী রাধা কহিলেন) হে সখি।

নন্দকুল চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? ময়ুরপুচ্ছ ভূষণ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? যাহার মধুর মুরলী ধ্বনি সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? যাহার ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় নীলকান্ত তিনি কোথায়? রামরস নৃত্যকারী সেই কৃষ্ণ কোথায়? আমার প্রাণ রক্ষার উপায়কৃত অমূল্য রত্ন স্বরূপ এবং তোমার মহোত্তম কোথায়? হাঁ হাঁ এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত আমার যে বিয়োগ উৎপাদন করিল, সেই বিধিকে ধিক।[১৪৯]

(চৈঃ চঃ অন্তলীলা)

এই শ্লোকে চৈতন্যদেব মনে হয় বাউল মতাদর্শের প্রাদুর্ভাবকে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর নিজের বিয়োগব্যথার তুলনা করে আক্ষেপ করেছেন এবং বিধিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যদেবের ভাবনাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেন :

আরে বিধি তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যান্য দুর্ল্লভজন করাইয়া সম্মিলন
অকৃতার্থ কেনে করিস দূর ॥
আরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কৃষ্ণানন
নেত্রমন লোভাইলি মোর।
ক্ষণেক করিতে গান কাড়ি নিলি অন্যস্থান
পাপ বৈলে দত্ত অপহার ॥

অক্রুর করে তোর দোষ আমায় কেন কর রোষ
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুই অক্রুর রূপ ধরি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥
তোরে কিবা করি রোষ আপনার কর্মদোষ
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর ॥
যে আমার প্রাণনাথ একত্র রহি যার সাথ
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর ॥
সব ত্যাজি ভজি যারে সেই আপন হাতে মারে
নারী বধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি উলটি না চায় হরি
ক্ষণমাত্র ভাঙিল প্রণয় ॥
কৃষ্ণ কেন করি রোষ আপন দুর্দ্দৈব দোষ
পাকিল মোর এই পাপ ফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈল উদাসীন
এই মোর অভাগ্য প্রবল।[১৫০]

উল্লিখিত কবিতাপাঠ করে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কৃষ্ণকে অন্য সাধনমার্গের অনুসারীরাও সাধনার ধন বলে গণ্য করেছেন এবং চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম অপেক্ষা এই সাধনমার্গের অনুসারীরা কৃষ্ণের প্রতি অধিকতর প্রেমানুরাগ দেখাবার ফলে জনগোষ্ঠী সেইদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। বলাবাহুল্য, বাউলসাধনায় কৃষ্ণ করিম এক এবং অভিন্নরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা এ ধারণা করতে পারি যে, বাউল একটি নতুন লৌকিক মতাদর্শরূপে চৈতন্যদেবের সময়েও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বহিরাগত সুফিসাধনায় 'যোগ'সাধনার সকল দেশজ প্রক্রিয়ার সাথে বহিরাগত সুফিসাধকদের পরিচয় ছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে দেশজ আচারের সাথে যে তাদের পরিচয় হয়েছিল 'যোগ কলন্দর' 'অমৃতকুণ্ডু' প্রভৃতি গ্রন্থ আরবি ফারসি ভাষায় অনূদিত হওয়া থেকেই তা বোঝা যায়।

দেশজ মুসলিম সুফিসাধকেরা যুগলসাধনাকে অনুসরণ করেছেন এবং তার একটি আধ্যাত্মিক রূপও প্রকাশ পেয়েছে। যেসব বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক বাউলসাধনা দ্বারা প্রভাবিত হন, বীরভদ্র তাদের অন্যতম। এই বাউলপ্রভাবিত বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকেরা 'রসিক বৈষ্ণব' নামে পরিচিত। এরা ক্ষেত্রবিশেষে বাউল নামেও নিজেদের পরিচয় দান করে থাকে।

এখানে বলা যেতে পারে, বাউল সাধনমার্গে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকে তাদের ধর্মানুসারে 'কলমা' বা বীজমন্ত্র

গ্রহণ করতেন। এই সাধনসম্প্রদায় সুফি ও সহজিয়া মতাবলম্বী জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এরা সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের ধর্মকে 'মানবধর্ম' নামে অবহিত করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম সুফি ফকিরই উভয় দলের গুরু বলে গণ্য হতেন। পক্ষান্তরে, হিন্দুসমাজে যারা সহজিয়া সাধনাকে গুরুত্ব দিয়ে কেবল রাধা-কৃষ্ণকে উপাস্য জ্ঞান করেছেন, তারা সহজিয়া সাধক বলে পরিচিত হয়েছেন। এবং মুসলিম সুফিসাধকদের মধ্যে যাঁরা কেবল আল্লাহ ও মুহাম্মদ (দ.)-কে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা মারেফতি ফকির বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

বাউলদের কাছে আল্লাহ এবং কৃষ্ণ সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। এরা দেহাতীত প্রেম বা Divine love-কে ইপ্সিত বস্তু ধ্যান করেছে। প্রেমোন্মত্ততাই ছিল এই বাউলদের বৈশিষ্ট্য। স্রষ্টাপ্রেমপ্রীতির আশায় জিকির বা নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে তাঁরা বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকতেন। এদের কথাবার্তাও ছিল তাদের পরম প্রিয় বা মনের মানুষকে কেন্দ্র করে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এবং অন্যান্য পদে বাউলদের এই স্বভাবকে প্রেমোন্মত্ততা বা ভাবোন্মত্ততা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাউলেরা যে জিক্‌র বা নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে নিজেদেরকে ঘর্মাক্ত কলেবর এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের চেতনাও যে লুপ্ত হতো নিম্নের কবিতাংশে তার প্রমাণ মেলে :

হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মৈলুঁ
কহিতে কহিতে তনু জর জর
বাউল হইয়া গেলুঁ।[১৫১]

বাউল যে একটি সাধনভজন সম্প্রদায় এবং তাদের ধারা অন্য সাধনমার্গ থেকে যে ভিন্ন ছিল, সে সম্পর্কে লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ তাঁর একটি গানে উল্লেখ করেছেন :

নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
শাক্ত ভারতীর কাছে শক্তি মন্ত্র পায়
গিয়ে রামানন্দের কাছে
বাউল ধর্মের তত্ত্ব পোছে
তবে তো মানুষ ভজে পরম তত্ত্ব পায়।[১৫২]

এই রামানন্দ সম্পর্কে ডক্টর ইউসুফ হোসেন বলেন : মধ্যযুগের পাক ভারতীয় ধর্মীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো রামানুজের ছাত্র রামানন্দ কর্তৃক এক নয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ভক্তমালার তালিকা স্বীকার করে নিলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন রামানুজের উত্তরাধিকারীর মধ্যে পঞ্চম। প্রথম রামানুজ, দ্বিতীয় দেবাচার্য, তৃতীয় হারিয়ানন্দ, চতুর্থ রাঘবানন্দ এবং পঞ্চম রামানন্দ। খুব সম্ভব রামানন্দ উত্তর-ভারতে তোঘলক শাসনামলে ইসলামের বিপুল অগ্রগতি লক্ষ

করেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে সব ধর্মান্তরিতদের অধিকাংশই উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা লাভের তাগিদে স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষা নেয়, অন্যরা এরূপ করে রাজনৈতিক পরিবেশের চাপে। পর্যটক জীবনে রামানন্দ নিশ্চয়ই ইসলামী ভাবধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন এবং সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারেই সেগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।[১৫৩]

রামানন্দ গুরু রামানুজও যে ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রামানন্দের মতবাদ দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। প্রথমটি ভক্তিবাদ দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।

তুলসীদাস এই আদর্শে সাহিত্যিক রূপদান করেন। এই সম্প্রদায় হিন্দুসমাজকে কৃষ্ণের আদর্শে পুনর্গঠিত করার প্রচেষ্টা নেয়। নিম্বার্ক, বল্লভ এবং চৈতন্যদেব ছিলেন কৃষ্ণের আদর্শানুসারী আন্দোলনের গুরু। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাদের আদর্শ বিকৃত এবং গর্হিতভাবে প্রকাশ পায় এবং এই মতের অনুসারীরা সাধনার নামে যৌনাচারে লিপ্ত হয়। এমনিভাবেই হয়তো বৈষ্ণব সহজিয়াদের উদ্ভব ঘটে। রামানন্দের সম্প্রদায় উত্তর-ভারত এবং অন্যত্রে এই নৈতিকতাহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং জীবনে নৈতিক আদর্শের প্রতি গুরুত্ব দান করেন।

দ্বিতীয় মতবাদ রূপ-পরিগ্রহ করে কবীরের নেতৃত্বে। কবীর বর্ণভেদ প্রথার সামগ্রিক বিলুপ্তির শিক্ষা প্রচার করেন এবং বেদ ও অন্য গ্রন্থাবলির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন।

ডক্টর ইউসুফ বলেন :

> এ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা মূলতই ছিল বিদ্রোহী। ধর্মীয় আপ্ত বচনে অবিশ্বাসী থাকার দরুন তাদের মধ্যে বৈদেশিক প্রভাব বিস্তৃত হওয়া সহজ ছিল। কবীরের সম্প্রদায় ইসলামকে বুঝবার এবং ভারতীয় জনসাধারণের জীবনের উপযোগী একটি পাঁচমিশেলি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস পায়। তাদের মতবাদের পরিধি যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়ায় তারা ইসলামের কতকগুলি বুনিয়াদী মূলনীতিকে তাতে স্থান দিতে সক্ষম হয়। এভাবে, একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক জাগরণের সমসাময়িক কালেই ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটে এবং পরিণতিতে তা বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা প্রবর্তনের দ্বারা হিন্দুদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সামগ্রিক পরিবর্তন এনে দেয়।[১৫৪]

বৈষ্ণব সহজিয়ারাও যে বাউলসাধনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং বলা চলে, বাউলসাধনা তৎকালীন সমাজে একটি লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাউল ফকিরদের অনেক সময় 'নাড়ার ফকির' বলা হয়ে থাকে। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ 'নাড়া' শব্দটিকে 'মুণ্ডিত মস্তক' অর্থে

গ্রহণ করে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদের সাথে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' 'নাড়া' শব্দের প্রয়োগ নাই। তবে 'চৈতন্যচরিতামৃতের' পূর্বেকার রচনা বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' নাড়া শব্দটির প্রয়োগ বিদ্যমান। সচরাচর চলিত অর্থে 'নাড়া' শব্দটিকে 'মুণ্ডিত' অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন গাছটি 'নাড়া'—এখানে গাছটি শাখাহীন, পল্লবহীন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তেমনি কোনো মানুষকে 'নাড়া' শব্দের চলিত অর্থভেদে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, 'নাড়া' শব্দটির অর্থ নিঃসন্তান—সংসারের সকল দায়িত্ব এবং কর্তব্য থেকে মুক্ত ব্যক্তি; এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বর নিঃসন্তান। বৈষ্ণব উপাসনা ঈশ্বরোপাসনা। অদ্বৈত কৃষ্ণোপাসনা এবং যোগাচারে সিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর নাম অদ্বৈত হওয়াতে হয়তো চৈতন্যদেব তাঁকে 'নাড়া' নামে সম্বোধন করেছেন।

চতুর্দিকে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ
নাড়া নাড়া প্রভু বোলে অনুক্ষণ
সঘনে ঢুলায় শির নাড়া নাড়া বোলে
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে
সভেই বলিনু প্রভু নাড়া বল কারে
প্রভু বলেন আইলাম যাহার হুঙ্কারে ॥
অদ্বৈত আচার্য বলি কথা কহি যার
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার ॥[১৫৫]

২

অদ্বৈতের সংজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
আরে নাড়া আমার কীর্তনে নৃত্য কর।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্য গোঁসাঞি
নানাভক্তি যোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি ॥[১৫৬]

সুতরাং দেখা যায় যে 'চৈতন্যভাগবতে' 'নাড়া' বলতে কৃষ্ণসাধক অদ্বৈতকে বুঝানো হয়েছে। চৈতন্যদেব অদ্বৈতের নিকট থেকে এই সাধনার মর্মকথা উপলব্ধি করেন এবং এ কারণে অদ্বৈতকে যোগেশ্বর নামেও তিনি সম্বোধন করেছেন। অদ্বৈতের কৃষ্ণসাধনা সম্পর্কে 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতাচার্যের উপাসনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দর্শন দেন।

মোর আজিকার কথা শুন ভাইসব
নিশিতে দেখিলুঁ আজি কিছু অনুভব ॥
গীতা পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া
থাকিলাম দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া ॥

প্রত্যেক রাত্রেতে মোরে বলে একজন
উঠহ আচার্য ঝাট করহ ভোজন।
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে ॥[১৫৭]

বৃন্দাবন দাস বলেন :

ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল
অবতারিয়াছে প্রভু জানেন সকল।
তথাপি অদ্বৈত তত্ত্ব বুঝান না যায়
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনি লুকায় ॥[১৫৮]

চৈতন্যদেব অদ্বৈত সম্বন্ধে বলেন :

অদ্বৈতের প্রসাদে হয় প্রেমভক্তি
জানিহ অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি।[১৫৯]

'চৈতন্যভাগবতে' একটি বিশেষ অর্থে কৃষ্ণসাধনার উল্লেখ করা হয়েছে। মানবদেহে শ্রীকৃষ্ণ ধাতুস্বরূপ। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের এই মতাদর্শের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাও দান করেছেন তাঁর গ্রন্থে :

প্রভু বলেন কৃষ্ণ শক্তি ধাতুর প্রচার ॥
ধাতু সূত্র বাখানিয়ে শুন সর্বজন ॥
দেখি কার শক্তি আছে কর খণ্ডন ॥
যত দেখি রাজা প্রজা দিব্য কলেবর।
কনকে শোভিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর ॥
যম লক্ষ্মী যাহার বচনে লোকে কয়।
ধাতু গেলে শুন তার যে অবস্থা হয় ॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া ॥
কেহ করে ভস্ম কারো এড়েন গাড়িয়া ॥
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বসে কৃষ্ণ শক্তি।
তাহারে যে করি সেহ তাহারে সে ভক্তি ॥
... ...
... ...
এবে যারে নমস্করি করি মান্য জ্ঞান
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান ॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা সুখে
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥
ধাতুর সংজ্ঞা কৃষ্ণভক্তি বল্লভ সভার
দেখি কে দুষক আসি শক্তি আছে কার ॥

এমন পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি
হেন কৃষ্ণ ভাইসব কর দৃঢ় ভক্তি ॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম
অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণ চরণ কর ধ্যান ॥
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর ॥
যে চরণ মহিমা অনন্ত গুণ গায়
দন্তেতৃণ করি ভজ হেয় কৃষ্ণ পায় ॥
যাবত আছয়ে জীব দেহে আছে প্রাণ
তাবত করহ কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধ্যান ॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণধন
চরণ ধরিয়া বলি কৃষ্ণ দেহ মন ॥[১৬০]

'চৈতন্যভাগবতে' অদ্বৈতাচার্যকে তাই কৃষ্ণ-উপাসক বলে 'নাড়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কৃষ্ণকে একেশ্বর রূপ কল্পনা করার রীতিও এখানে প্রকাশিত। 'চৈতন্যভাগবতে' উপর্যুক্ত কৃষ্ণকে ধাতুশক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধাতুই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বিধায় তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাউলেরাও ধাতুশক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই সাধনাকে তাই বাউল 'মানুষ ভজনা' নামে অভিহিত করেছে। একটি গানে লালন বলেছেন :

একজন নাড়া
জগৎ জোড়া।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী এবং নিরাকার আল্লাহর উপাসক। চৈতন্যদেব সুফি ইসলামধর্মের প্রসারতা রোধে হিন্দুধর্মের পরিবর্তন সাধন করেন এবং বৈষ্ণবধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করেন। এই বৈষ্ণবধর্ম ইসলামধর্মের উদার মানবতাবোধ, সামাজিক সমতা ইত্যাদিকে স্বীকরণ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মনে ইসলামের মতোই বৈপ্লবিক ভাবনার জন্ম দেয়। শ্রীচৈতন্য ঘোষণা করেন :

মুচি যদি ভক্তি ভরে ডাকে কৃষ্ণ ধনে
কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে ॥[১৬১]

... ...

কিন্তু এতদসত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য সুফিসাধনার ধারাকে রুদ্ধ করে দিতে পারেননি। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' উল্লেখ আছে যে, জগাই মাধাই নামে দুইজন বৈষ্ণবদ্রোহী হিন্দু শ্রীচৈতন্য কর্তৃক দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের ফকিরি মতাদর্শে বিশেষ আকৃষ্ট হয়।

জয়ানন্দ বলেন :

মনসুরী (মসনবী) আবৃত্তি করে থাকে নল বনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে।[১৬২]

বলেছি, মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী, কিন্তু সুফিরা বিশেষ করে বাতেনীপন্থী সুফিসাধকেরা ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী। যদিও ভারতবর্ষে একত্ববাদ অনুপস্থিত ছিল না, কিন্তু বেদান্তে সর্বেশ্বরবাদ প্রবল ছিল। আউলিয়া দরবেশদের সংস্পর্শে এসে এদেশের জনগণ স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে এক নতুন ধারণা করতে সক্ষম হন। আমি পূর্বেই বলেছি যে মুসলিম সুফিসাধকেরাও এদেশের তান্ত্রিক ও যোগসাধনার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। ফলে মিলনের পথ দ্রুত প্রসার লাভ করে। 'নাড়া' শব্দটি সর্বেশ্বরবাদী সুফিমানসকে প্রভাবিত করে। সুফিরা আল্লাহকে 'নাড়া' বলতে তাঁকে এক এবং অদ্বিতীয় বুঝেছেন। আবার পৃথিবীসহ সব সৃষ্টি তাঁরই রূপের প্রতিফলন এমন ধারণাও করেছেন। তারা বিশ্বাস করেছেন যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজ করেছেন। সবকিছুর মধ্যে তাঁরই প্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে সুফিদের এই দর্শনের পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছে। মুসলিম সুফিসাধকেরা আল্লাহকে আপনার অন্তরে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন তার সাথে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতে। মানুষ যখন আল্লাহতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় তখন তার নিজস্ব কোনো সত্তা থাকে না। মনসুর হাল্লাজ এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। এই সুফিসাধনায় কীভাবে ধাতুসাধনা অনুপ্রবেশ করে এবং কীভাবে সাধক ধাতুতেই আল্লাহর লীলাচঞ্চল রূপ পরিলক্ষিত করেন সে সম্বন্ধে এমন ধারণা করা যায় যে, রতি বা ধাতু নিরোধ বৌদ্ধ প্রভাবজাত। ইরানে বহুপূর্ব থেকে বৌদ্ধসাধনা বিকাশ লাভ করেছিল। সুফিসাধনায় তার প্রভাব রয়েছে। বাতেনী সুফিসাধনা এবং 'বা'আল' সাধনা প্রজননভিত্তিক হওয়ায় 'বা'আল' সুফিসাধকদের সাধনায় ধাতুসাধনা অনুসৃত হয়েছে। দেশজ সুফিসাধনায় এর পরিচয় রয়েছে :

এক কায়া এক ছায়া নাবিক দোসর
একতন একমন আপে একেশ্বর।
ত্রিজগতে এক কায়া এক করতার
এক প্রভু সেবে জপে সব জীবধর।
... ...
তনুপতি মহামতি প্রভু করতার
লুকিত তনয় পতি জরিত আকার
তনে মনে ভিন্ন নাহি আপে নিরঞ্জন
সর্বঘটে জীব হই পুরিয়ে ভুবন।
... ...
যুগল সাধক লোক ঈশ্বর পা এ বিন
আপনার তন হন্তে না জানেন্ত ভিন ॥[১৬৩]

প্রেমের আসনে জুড়ি আছে ত্রিভুবন
প্রেম রসে বন্ধ আল্লাহর সিংহাসন

প্রেম সিংহাসন প্রভুর নিজ নাম ডুবুরি
ডুবি মূলে খেলে খেলা জথেক সংসারী
... ...
যথা রস তথা বশ সমস্ত ভুবন
সকল রসের মূল পিরীতি ভজন।
জপ জথ রস আছে ত্রিভব মাঝার
সমস্ত রসের মূল প্রেমের নাগার।[১৬৪]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধাতুর বা বীর্যসাধনার সাহিত্যিক প্রকাশ লক্ষ করা যায় চর্যাপদে। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন যানের কিছু কিছু কথা চর্যাপদে রয়েছে। অনেক চর্যাগীতিতে বজ্রযানের সাধনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আবার একই চর্যায় সহজযান এবং বজ্রযানের পাশাপাশি অবস্থিতিও লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো চর্যায় দেহসাধনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কোনো কোনো গীতিতে মন্ত্রসাধনা এবং বজ্রযোগের কথা বলা হয়েছে। এই কারণে কেউ কেউ অভিমত পোষণ করেন যে চর্যাপদকে একটি বিশেষ যানের পদ বলে চিহ্নিত করা সংগত নয়।[১৬৫]

সাম্প্রতিককালে চর্যাগীতিগুলিকে কেউ কেউ আদি বাউলগান নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এই মতবাদের প্রবক্তা জনাব এস. এম. লুৎফর রহমান বলেন : "বস্তুতঃ বজ্রযানী বৌদ্ধরাই বাউলদের আদি পুরুষ এবং বজ্রী শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। আর বজ্রগীতিকাই আদি বাউলগান।"[১৬৬]

অধ্যাপক এস. এম. লুৎফর রহমান কোনো কোনো চর্যায় বজ্রযানী ধর্মমত এবং বজ্রযানীদের উপাসকমণ্ডলীর অন্যতম বজ্রধরনাথের (বাজিল, বাজুল) উল্লেখ দেখতে পেয়ে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বাউল শব্দের যে ব্যুৎপত্তি উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ :

√বজ্ গমন করা + র = বজ্র সম্প্রদায় সুচক
সং বজ্রী>অপ বজ্জির>বাজির+বজ্জিল>+বাজিল = বাজুল>বাউল

তাঁর মতে প্রাকৃত ব্যাকরণের 'রলয়াভেদ' সূত্রানুসারে বজ্জির এবং বাজির>বাজিল নিষ্পন্ন হয়। তিনি আরও বলেন, একইভাবে অপর সূত্রানুসারে (ই=উ)। বাজিল>বাজুল হওয়া সম্ভব। তারপর জনাব রহমান 'প্রাকৃত প্রকাশের 'ক গ চ জ ত দ প য় বাং প্রায়োলোপ...সূত্রানুসারে বাজুল>বাউল শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ বলে উল্লেখ করেন।[১৬৭]

অধ্যাপক লুৎফর রহমানের এই বক্তব্যকে অনুসরণ করে তাহলে কি বলা যায় যে সংস্কৃত 'বাতুল' এবং 'ব্যাকুল' শব্দ থেকেও বাউল শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ? অধ্যাপক লুৎফর রহমানের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে 'বাতুল' এবং 'ব্যাকুল' শব্দ থেকেও

বাউল শব্দের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। কিন্তু 'বাজুল', 'বাতুল' এবং 'ব্যাকুল' এই তিনটি শব্দের একটি বিশেষ শব্দরূপ বাউলের উৎপত্তিমূল হতে পারে না। অধ্যাপক লুৎফর রহমানের এই বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না—তার কারণ, প্রথমত, চর্যাগীতির অনেকপূর্ব থেকে বাউল মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। পারস্যে 'বা'আল' সুফি মতাদর্শ তার প্রমাণ। চর্যাগীতিকার মধ্যে কোনো একটি যানের কথাই প্রধান নয়। সব যানের কিছু কিছু কথা চর্যাগীতিতে রয়েছে। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু বলেছেন : ৩, ৯, ১৯, ২৮, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৩, ইত্যাদি চর্যাগীতি সহজিয়া মতের বাহক।[১৬৮] অপরপক্ষে লুইপাদ, কুক্কুরী পাদ, কাহ্নপাদের চর্যায় বজ্রসাধনা, অবধূত এবং গুরুপ্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে এবং এরা বজ্রসাধনার দিকে জোর দিয়েছেন। সুতরাং চর্যাগীতিকাকে একটিমাত্র যানের অন্তর্ভুক্ত করা ন্যায়সংগত নয়। অথচ লুৎফর রহমান তাই করেছেন।

দ্বিতীয়ত, বজ্রযানী বৌদ্ধরা কেবল বজ্রসত্ত্বেরই উপাসক ছিলেন না। এই বজ্রযানীদের দেব-দেবীর সংখ্যা প্রচুর। এই দেব-দেবীদের মধ্যে হেবজ্র, বজ্রসত্ত্ব, হেরুক, মহামায়া, বজ্রযোগিনী, বজ্রধর, বজ্রভৈরব ইত্যাদি অন্যতম। অতীন্দ্র মজুমদার বলেন : 'বাঙ্গালী বৌদ্ধপণ্ডিত এবং সিদ্ধাচার্যরা এসব দেবদেবীর স্তুতিগান করে অসংখ্য গ্রন্থ খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের্ মধ্যে রচনা করেছিলেন। তবে তাদের অধিকাংশই হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিংবা আজও অপরিজ্ঞাত আছে। সামান্য কিছুমাত্র আমাদের হাতে এসেছে।'[১৬৯]

তৃতীয়ত, সমগ্র চর্যাপদে বাজিল বা বাজুল শব্দের কোনো ক্রমবিকাশ বা রূপান্তর আমরা লক্ষ করি না। এই শব্দগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একই অর্থবোধক। এর কোনো ক্রমপরিণতিও চর্যাপদে দেখা যায় না। লুৎফর রহমান উল্লেখ করেছেন : সরহের দোহাকোষে 'বাজির' শব্দের প্রয়োগ নেই। কিন্তু বজ্জিল শব্দের ব্যবহার বিদ্যমান। সরহ বলেছেন :

জোইপি গাঢ়া লিঙ্গ ণহি বজ্জিল লহু উপসন্ন

অর্থ : যোগিনীর গাঢ় আলিঙ্গনে বজ্রধর সহজে আবির্ভূত হয়। এখানে বজ্জিল শব্দটি যে 'বাজির' ও 'বাজুল' শব্দের সমর্থক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লুৎফর রহমান বলেছেন : চর্যাপদ ও অবহটঠ গীতিকবিতায় প্রাপ্ত বাজুল, বাজিল, বাজির, বজ্জিল মূলত একই শব্দের বিভিন্নরূপ।[১৭০] লুৎফর রহমানের এই বক্তব্য স্বীকার করে নিলে তিনি বাউল শব্দের যে ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন তা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তিনি বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তি দান প্রসঙ্গে 'বাজিল' শব্দের ক্রমপরিণতি হিসেবে বাউল এবং বাজুল শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

লুৎফর রহমান বাজুল, বাজিল, বাজির, বজ্জিল শব্দগুলিকে বজ্রযানী সাধক হিসেবে নির্দেশ করেছেন এবং বাউল শব্দের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বলে গণ্য করেছেন।

অর্থাৎ তিনি বলতে চান বাউলেরাও বজ্রযানী সাধক। কিন্তু তাঁর এই ধারণা যে সম্পূর্ণ অসংগত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বজ্রযানী সাধনায় 'বা'আল' সুফিসাধকের প্রভাব থাকতে পারে। শুধু বজ্রযানীই বা বলি কেন, বিভিন্ন সহজিয়া এবং সুফিসাধনার প্রভাবের কথা তো ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাউলসাধনার উৎস তাই কোনো বিশেষ ধর্মে বা মতাদর্শে খোঁজা নিরর্থক। এই সাধনায় সুফি, বজ্রযানী এবং সহজিয়া সাধনার সমন্বয় ঘটেছে। মূলত বাউলসাধনা বৌদ্ধসহজিয়া, বৈষ্ণবসহজিয়া ও সুফিসাধনার একটি সার্থক সমন্বিত রূপ এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাউল মতাদর্শকে একটি লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এই মতাদর্শের সাথে অন্যান্য সাধনার মতপার্থক্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাউলেরা বলেন :

নিগূঢ় সন্ধান জেনে শুন সাধন করতে হয়
শক্তিতত্ত্ব সাধন করে
পেত যদি সে চাঁদ
তবে বৈরাগীরা কেনে
আবাল গুদড়ি টেনে
কুলের বাহির হয় সেই চরণ বাঞ্ছায় ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী যারা
সদায় বলে তারা
শাক্ত বোষ্টমের নাই মূল পরিচয় ॥
শুনে ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য
দরবেশে করে তর্ক
বস্তুজ্ঞান যার নাই
নাম ব্রহ্মে কি পাই
লালন কয় দরবেশে একি কথা কয় ॥

লালন শিষ্য দুদ্দু এ-সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে বলেন : বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণব-এর যোগ নাই।

বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব
পঞ্চতত্ত্বে করে জপতব
তুলসী মালা অনুষ্ঠান সদাই ॥
বাউল মানুষ ভজে
যেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃত মজে
নারী সাক্ষী তাই ॥
নিত্যানন্দের দুই পুরুষ হয়
বীরভদ্র বীর চূড়ামণি কয়

দুইজনে দুইমতের গোঁসাই
শুনতে পাই ॥
দরবেশী বাউলের ক্রিয়া
বীরভদ্র জানে সেই ধারা
দরবেশ লালন সাঁইএর কথায়
দুদ্দু জানায় তাই ॥

দুদ্দু শাহ বীরভদ্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি চৈতন্যযুগে মুসলমান সংস্পর্শে হিন্দুসমাজের মধ্যে ভাঙন ধরেছিল। ধর্ম, কর্ম ও আচার-ব্যবহারে বেশকিছু হিন্দুরীতি প্রবেশ করেছিল। চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম মধ্যম এবং নিম্নশ্রেণীকে মুসলমান ধর্মান্তরীকরণ থেকে আপাতভাবে রক্ষা করলেও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। বীরভদ্র নিজেও মুসলিম মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মুসলিম সুফি-দরবেশদের সংস্পর্শে এসে অনেক অলৌকিক শক্তি, কেরামতিতে পারদর্শী হয়েছিলেন। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুসলমান নবাব তার বিভিন্ন কেরামতিতে মুগ্ধ হয়ে তার অনেক ইচ্ছা পূরণ করেন এবং বীরভদ্র নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত একটি মন্দিরশীর্ষে মুসলমানের অর্ধচন্দ্র সম্বলিত 'খুন্তি' স্থাপিত করে মুসলমান শাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর যে বীতরাগ ছিল না, 'খুন্তি'ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১৭১]

বীরভদ্র যে মুসলমান দরবেশীদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন, দুদ্দু শাহ সে সম্পর্কে তাঁর পদে উল্লেখ করেছেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বীরভদ্র মাধব বিবি নামে কথিত কোনো এক মুসলমান সাধিকার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীরভদ্র মুসলমান সুফিসাধনার ধারা সম্পর্কে পরিচিত থাকলেও তিনি বৈষ্ণব মতাদর্শকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁর উপদেশ যে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতেন এ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা অভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন।[১৭২]

নেড়া নেড়ী সম্প্রদায়ের সংরক্ষক হিসেবে বীরভদ্রের নাম বৈষ্ণব সহজিয়া মহলে বিশেষ পরিচিত। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন :

> নেড়া নেড়ী সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য রক্ষণশীল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহার ক্রিয়াকর্মের উপর ততটা প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশ শাখাতে সমাজশাস্ত্রীরা 'বীরভদ্র দোষ' নির্দেশ করিয়া তাহাদিগকে একটু পৃথক দৃষ্টিতে দেখিতেন।[১৭৩]

বীরভদ্র সম্পর্কে যে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত তার একজন প্রচারক ছিলেন নিত্যানন্দ বংশধর 'শ্রীমন্নিত্যাননন্দ বংশবল্লী'র লেখক ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী। তিনি উল্লেখ করেন :

বীরচন্দ্র পূর্ববঙ্গে গিয়া দেখিলেন বৌদ্ধগণের প্রবল অত্যাচারে হিন্দু একেবারে অবসন্ন প্রায়। বিশেষ চেষ্টাতেও হিন্দুগণ তাহাদের স্থান দেয় নাই। সেই সময় তাহাদের সংখ্যা আনুমানিক ১২০০ ছিল। তাহাদের থাকার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এইরূপ। কেশবিহীন মস্তকে শিখামাত্র অবশিষ্ট। শুকুবাস (গড়া) পরিধান উত্তরীয় তদ্রূপ। হস্তে দণ্ড এবং ভিক্ষাপাত্র (কিস্তি) বীরচন্দ্র দেখিলেন, ভিক্ষুকুল জাতিকুল হারাইয়া গৃহস্থের উপর যথাচিত্র (SIC) অত্যাচার করিতেছে। আপন-পর জ্ঞানশূন্য পরম দয়াল বীরচন্দ্র প্রভু তাহাদিগকে ডেকে উদ্ধার করিয়া আপন স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং ভিক্ষার সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিতে আদেশ করিলেন। ইহারাই নেড়া বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। কিছুদিন পরে নেড়ার দল অত্যন্ত বলবান হইয়া উত্তেজিত হইল। তখন প্রভু নেড়ি সৃষ্টি করিয়া বিবাহের আদেশ করিলেন। অদ্যাবধি তাহাদের সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে।

এই নেড়াশ্রেণীর সংখ্যা ১২০০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'নিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে' আছে :

বারশত নাড়া আর তেরশত নেড়ি
কেহো বহে গংগাজল কেহো শোধে বাড়ি ॥
বীর ২ করি নাড়া করে সিংহনাদে
কারে নাহি ভয় বীরচন্দ্রের প্রসাদে ॥
হেন লীলা বীরচন্দ্রের ইহাতে হৈল
নাড়ি সৃষ্টি করি নাড়ার তেজ ক্ষয় হইল ॥[১৭৪]

এই নেড়া-নেড়ি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন :

> এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সমাজ ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলীতেও এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান, নিত্যানন্দই, রক্ষণশীল বৈষ্ণব সমাজের দ্বার মোচন করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়কেও ইহার মধ্যে আহ্বান করেন। তিনি নিজেও বর্ণশ্রমের রীতি নিয়ম মানেন নাই, সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্তের পাক করা অন্নগ্রহণেও তাঁহার কোনা দ্বিধাসংকোচ ছিল না। পুত্র বীরচন্দ্র এই আদর্শে মানুষ হইয়াছিলেন।[১৭৫]
>
> সুতরাং একদা বৌদ্ধ উপমানের কেন্দ্র পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজ বহিষ্কৃত নেড়ানেড়ি নামে ঘৃণিত সহজিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়কে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে, বিশেষত নিত্যানন্দ পন্থায় দীক্ষা দিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহাদের উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবনকে তিনি বৈষ্ণবিক আনুগত্যের মধ্যে আনিয়া কতকটা পারিবারিক সংযম সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। পরে এই শ্রেণীই বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের দল বৃদ্ধি করিয়াছিল। অবশ্য বীরচন্দ্রের ভক্তের দল (সহজিয়া সম্প্রদায়) এই

নেড়ানেড়ি শব্দকে তান্ত্রিক সাধনার নাড়ির রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রী বীরচন্দ্র গোস্বামীর 'শিষ্য শিক্ষা যন্ত্রকারিকা' গ্রন্থ নামক একখানি সহজিয়া পুঁথিতে নেড়ানেড়ি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

বারশত নাড়া জগতে দেখ ভাল মতে
ইহার ব্যবস্থা তুমি করহ সাক্ষাতে ॥
তেরশত নাড়ি তোমার সঙ্গে প্রকাশ
তবে হবে নাড়া নাড়ি জগতে উল্লাস।

এখানে স্পষ্টত নেড়ানেড়ির ব্যাপারকে সহজিয়া নাড়ি তত্ত্বরূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[১৭৬]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' অদ্বৈতচার্যকে 'নাড়া' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। যা হোক, উপর্যুক্ত বিষয়দৃষ্টে আমাদের ধারণা হয় যে 'নাড়া' শব্দটি তান্ত্রিক। বাউল মতবাদেও এই তন্ত্রসাধনার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। এজন্য বাউলদেরকে ক্ষেত্রবিশেষ নাড়ার ফকির নামেও চিহ্নিত করা হয়। অদ্বৈতাচার্য এই তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ ছিলেন বলে তাকে চৈতন্যদেব 'নাড়া' নামে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এই 'নাড়া' শব্দটি সমাজে হীন বা তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত। লালন ফকির এবং তাঁর অনুসারীদেরকেও কখনও কখনও নাড়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত কুষ্টিয়ার মুন্সি এমদাদ আলী[১৭৭] (১৮৮১-১৯৪০) প্রণীত 'রদ্দে নাড়া' (অপ্রকাশিত) পুস্তকে নাড়াদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের তারিখ ২৪শে আষাঢ় ১৩২৪ সাল। পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত। ভূমিকা 'খ' পৃষ্ঠা থেকে পাণ্ডুলিপির বাকি অংশ উদ্ধার করা গেছে। ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে–

> 'নাড়া ইত্যাদিগের মধ্যে আমাদের দেশের এই নাড়ার হট্টোগোলই বেশী। আমাদের দেশে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর নাড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর নেড়া জেলা নদীয়া মহকুমা কুষ্টিয়ার অধীন ছেঁউড়িয়া নিবাসী লালন শাহ তাহার রচিত বহুবিধ গান লোকমুখে প্রচলিত আছে কিন্তু রচিত পুস্তকাদি নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেড়া জেলা যশোহরের অন্তর্গত ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন কুলবাড়িয়া হরিশপুর নিবাসী পাঞ্জুসা। তার রচিত অনেকানেক গান আছে। তাহার রচিত একখানা পুস্তক যাহার নাম 'ইস্কি ছাদেকী গাওহার'। এই মারাত্মক পুস্তক সম্পর্কে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ও ঐ নাড়ার ধর্ম সম্বন্ধেও আমি যতদূর নিজে অবগত হইয়াছি ইনশাল্লাহ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিব বাসনা করিয়াছি। ইহার দ্বারা মুসলেম সমাজে কোন উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। বাকী খোদার মর্জী।
>
> বানিয়াকান্দি — বিনীত
> ১৩২৪, আষাঢ়। — (স্বাক্ষর অস্পষ্ট)

এরপর 'নাড়া' ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য এবং পরে পদ্যছন্দে তিনি তাদের কার্যক্রম বর্ণিত করেন :

> নাড়া যে কি ধর্ম তাহা ব্যক্ত করা খুবই দুরূহ। এমন অসভ্য অশ্লীল ব্যবহার জগতে কোন মানুষের দ্বারা হইতে পারে এমন বিশ্বাস হয় না। তাহা নামেই পরিচয় পাইবেন, নাড়া শব্দটি ধাতু প্রত্যয় করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ন আড়া (বা) নাড়া অর্থাৎ যার কোন আকৃতি নাই বা যাহাদের ধর্মতত্ত্বে কোন আড়া বেড়া নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই ধর্ম। এই ধর্মে যত অশিক্ষিত-বর্বর-মূর্খ দীক্ষিত হইয়া থাকে এবং যত কামাভিলাসী নরপিচাশ ইহাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। আবার নিরীহ অশিক্ষিত ধর্মপিপাসু ব্যক্তিও ধর্ম আশায় ইহাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়। কারণ এ জগতে ধর্মের জন্য মানুষ যত বাধ্য হয় এমন আর কিছুতেই দেখা যায় না। ধর্মের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহে। আমার বিশ্বাস তাহাতেই এই জঘন্য পাপময় ঘৃণিত ব্যবহার মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়। পাঠক একটু স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। কতরকম ফকির মারফতি দাবী করে ও কিভাবে মুরিদ করে তাহার বিবরণ। (এখানে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো)

এক নেত্রে শুন ভাই যত বেরাদর।
বেহুদা ফকির কত খেলাফ সরার ॥
প্রেম তত্ত্ব হইয়া মত্ত ভাবতত্ত্ব গায়।
ঝোলার মধ্যে মালা টেপে দরবেশের ন্যায় ॥
কত আওরত মুরিদ করে ধোকার টাটী দিয়া।
অবশেষে জাতি মজায় হারামী করিয়া ॥
কত রকম ফকির আছে বাঙালা দেশেতে।
ইহার তফসীল তাই শোন এক চিত্তে ॥
গুরু শিষ্য করে ভক্তি ধুলা মেখে গায় ॥
গুরু ভজনা কোরে কেহ পায়ের ধুলা খায় ॥
ফিতনার ফকিরী করে মুঠী তুলে রাখে
মান্নত করে গোসাই ঠাকুর ভাল করো মোকে ॥
লক্ষো কালা গোরাচাঁদ চিশতিয়া সরদার।
তব্‌কাজ কাদেরী হাম্বলী উদাসী মাদার ॥
সন্নাসী যোগী মনি চেটন্তে পেটুন্তে।
মাথা মোড়া ঝোলা টেপা বাজায় শারিন্দে।
জমপোড়া মহাজন পোড়া মধু মংগল গিরী।
মাগী সাথে ফেরে পথে পেশাব খায় ধরি।
হায়েজের রক্ত খায় মনি নাহি ফেলে।
কত লোকের বৌ বার করে মারফতি বলে।
মরশেদ আল্লা সাঁই আল্লা আর ভক্তে বলা।

হাড়ি আল্লা মালাই হাতে পাগলা পাগলীর খেলা।
হাতে লোটা মাথায় জটা বোগলেতে বাল।
দরগাহ বেঁধে মাথা কোটে হইয়া বদহাল ॥
হাতে মড়া গলায় ধড়া লেঙ্গটি পিন্দে ফেরে।
ভাত পায় না কথা কয় না রাত্রে আহার করে ॥
কেহ বলে বার বছর ছেড়েছি ঘরবাড়ী।
মাছ গোস্ত খাইলে বাবা নাহি দেখি নারি ॥
বেটা বেটী নাতি পুতির মহব্বত ছাড়ী।
কালার নাম সার করেছি হয়ে দেশান্তরী ॥
রাগ গোস্বা নাই বাবা নাহি কেনা কশী।
মন মরশেদ ভজি বাবা হয়ে দাসের দাসী।
দাসের দাস হইয়াছি নাহি অন্যমন।
দশ হরফের ফকির বাবা হামেশা চেতন ॥
ঘুমিয়া থাকি চক্ষে দেখি দশ হরফের গুণে।
ফারাজিয়া নামাজ পড়ে পরের মুখে শুনে।
নয়নে দেখিয়া ভজি নাহি শুনি কানে।
দশ হরফের ভেদ বাবা সকলে কি জানে ॥
আমি যে পেরেছি বাবা নছিব আমার।
ধন দৌলত জরা শরম ছেড়ে একবার ॥
ধন দৌলত জরা শরম যে জন ছাড়িবে।
দশ হরফের ভেদ বাবা সে জন পাইবে ॥

রংপুর জেলার মওলানা রেয়াজউদ্দিন আহমদ তাঁর 'বাউল ধংশ ফৎওয়া' নামক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে নাড়ার ফকিরদের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি এই নাড়ার ফকিরদেরকে 'বাউল' নামে অভিহিত করেন। তিনি বলেন :

> মুসলমানদের মধ্য হইতে একদল লোক বাহির হইয়াছে তাহারা বাতেনি দরবেশ ফকির বলিয়া দাবী করে, প্রকাশ্যে নাম তাহাদের বাউল। তাহারা বলে কোরআন চল্লিশ পারা তন্মধ্যে হইতে দশ পারা আমরা ছিনায় ছিনায় পাইয়াছি। শরিয়তের আলেমগণ তার খবর রাখে না। মারফতি এই দশ পারায় ভরা রহিয়াছে। বাকী ত্রিশ পারায় কেবল জাহেরা এলেমদের বিষয় আছে। সুতরাং আমরা ত্রিশ পারা কোরানকে মানিতে পারি না। আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়া নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ছিনায় ছিনায় বাতেনি নামাজ রোজ করিয়া থাকি। সুতরাং না দেখা খোদার জাহেরা নামাজ রোজা আমরা মৌলবীগণের কথায় করিতে পারি না। খোদা মেয়ারাজ রাত্রে রসুলের সহিত যে কথা বলিয়াছেন, রসুল তন্মধ্যে হইতে কতক যাহেরা করিয়া বলিয়াছেন ও কতক গোপন রাখিয়াছেন। যেটাই গোপন করিয়াছেন সেইটাকেই আমরা ছিনাই ছিনাই পাইয়াছি। তাহারা

হায়েজ, মল, মূত্র, গর্ভপাত, শিশুর মাংস, গাঁজা ভাঙ্গ ইত্যাদি নাপাক জিনিস ভক্ষণে রিপু দমন করে। স্ত্রী, মুনি ও অগ্নিকেও সেজদা করে। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ একত্র উলঙ্গ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া কামরিপু দমন হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করে। তাহাতে যে বীর্যপাত হয় তাহা ময়দার সহিত মিশাইয়া রুটি বানাইয়া প্রেম ভাজা নামক উত্তম মারফতি খানা খায়। তাহারা পরস্পর স্ত্রীকে ব্যবহার করিয়া হিংসা রিপু দমন করে ও স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়া খনজরি জুরি খমক বাজাইয়া দেহতত্ত্ব ফকিরী গান করতঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহারা বলে, জবেহ করিয়া মাংস খাওয়া ও মাছ মাংস খাওয়া, ঈদের কোরবানী করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া শরিয়াতের আলেমগণের কথা শুনা, শরিয়াতের মতে চলা, ত্রিশ ছেপারা কোরআনকে মানা মুসলমানদের কোরআনে নাই। শরিয়তের আলেমগণ মিথ্যা মিথ্যি এই কথা বলিয়া বেড়ায়।[১৭৮]

এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণে তিনি বলেন :

এই বাউল বা ন্যাড়া মত মোসলমান হইতে দূরীভূত করার জন্য বঙ্গের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক গ্রাম, মহল্যা জুম্মা ও জমাতে একটি কমিটি স্থির করিয়া যতদিন পর্যন্ত বঙ্গে কোন স্থানেও একটি বাউল বা ন্যাড়া মোসলমান নামে পরিচয় দিয়া মোসলমানের দরবেশ ফকির বলিয়া দাবী করিতে থাকিবে ততদিন ঐ কমিটি অতিতেজ ও তীব্র ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে।[১৭৯]

এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে রেয়াজউদ্দিন আহমদ লালন ফকিরকে ন্যাড়া নামে চিহ্নিত করেন এবং বলেন :

যাহার মধ্যে এসলামের রীতি নীতি ও কার্য্যকলাপগুলি শরিয়তের কাটায় মিলিবে না, তিনি মুনি ঋষি, দরবেশ ফকির যে কোন নামেই পরিচিত হউন না কেন, মুসলমান তাহাকে কোনই শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করিয়া লইতে পারে না। অতএব লালন সাহার মধ্যে শরিয়তের চিহ্ন না থাকায় তিনি মোসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। সুতরাং বাউল বা ন্যাড়ার ফকিরগণ যে লালন সাহাকে মোসলমানের সেরা পীর, দরবেশ বলিয়া তাহার পদ অনুসরণ করতঃ মোসলমানের দরবেশ ফকিরের দাবী করিয়া দুনিয়াটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে, ইহা তাহাদের সর্ব্বৈব পথভ্রষ্টের পরিচয় মাত্র।[১৮০]

মওলানা আকরম খাঁ, তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে নাড়ার ফকিরদেরকে হিন্দু বৈষ্ণব অথবা চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ বলে উল্লেখ করেন। ১৮১ উপর্যুক্ত আলোচনায় বাউল ও নাড়াকে এক গোত্রীভূত করা হয়েছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, সমাজে বাউলেরা চিরকালই শরিয়তবাদীদের হাতে ধিক্কৃত হয়েছেন, বাউল শব্দের অর্থবৈচিত্র্য এবং ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনায় তা দেখা যায়। আমরা আরও দেখেছি যে, বৌদ্ধ সহজিয়াদেরকে যেমন উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজ নেড়ানেড়ি বলে ধিক্কৃত করেছেন তেমনি শরিয়তবাদী

মুসলিম সমাজও একশ্রেণীর মারফতি ফকিরদেরকে, বাউল এবং নাড়ার ফকির বলে ধিক্কৃত করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাউল সমাজে এমন কিছু অনুসারীদের লক্ষ করা যায়—তারা বস্তুত, এমন আচরণ করে থাকে যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঘৃণার যোগ্য। এরা সাধনার ধারা সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং তাদের আচার-আচরণ দানবতুল্য। এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে যৌনাচার এই সাধনায় একটি অন্যতম ভিত্তিভূমি। কিন্তু এই যৌনাচার কেবল উচ্ছৃঙ্খল কামাচারিতা নয়। প্রকৃত অর্থ মুসলিম 'বা'আল' দরবেশ ও আউলিয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান আউলিয়াদের অনুকরণে একটি ভিন্নসাধনার ধারা গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে এই সাধনায় নানা আচরণগত প্রভাব পড়ে এর সত্যিকার কাঠামো বদলে যায়। উচ্চকোটি এবং শরিয়তপন্থী মানবসমাজ তাদের সাধনাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানদের এদেশে আগমন তৎকালীন হিন্দুসমাজ কখনও ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। ইসলামধর্মের উদারতায় নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলামধর্ম গ্রহণ করাতে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং এদের মধ্যে যারা মুসলিম আউলিয়া দরবেশ এবং দেশজ বিভিন্ন সহজিয়া সাধনার অনুসরণে সাধনা শুরু করেন তাদেরকে তুচ্ছার্থে 'বাউলিয়া' নামে অভিহিত করার প্রবণতাও আমরা লক্ষ করেছি। চৈতন্যদেবের মধ্যেও এই ব্যঙ্গ করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এবং 'চৈতন্যভাগবতে' তার নিদর্শন রয়েছে। এ সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :

তিনি (চৈতন্যদেব) নিজের কথ্যভাষার গৌরব করিতেন। অন্য স্থানের কথ্য ভাষা তাঁহার নিকট হাসিঠাট্টার বস্তু ছিল।

সবার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে
কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে
বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া
বাঙ্গালের কদার্থেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া।

(চৈতন্যভাবগত)

এই নদেরচাঁদের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাবের জোয়ার আসিল। তাহার অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত লেখা হইল। অসংখ্য পদাবলী রচিত হইল। এই সমস্তই মধ্য-বঙ্গের ভাষায়। এখন নদিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের কেন্দ্র।[১৮২]

সুতরাং এই পটভূমিকায় 'বা'আল' সাধকদের ব্যর্থ অনুকরণে সে সাধনার বিকাশ লাভ করল তাকে তুচ্ছার্থে 'বাউলিয়া' বলে সম্বোধিত করা আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রকৃত অর্থে তাই ঘটেছিল এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে' 'বাউলিয়া' এবং 'বাউল' শব্দের

এমন বহুল প্রয়োগ অন্য কোথায়ও নেই। চৈতন্যদেব এই সাধকদেরকে 'বাউলিয়া' বা 'বাউল' নামে চিহ্নিত করাতে তার অনুসারীগণ এই শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাহিত্যেও প্রয়োগ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে 'বাউল' নামকরণটি এই সাধকদের স্ব প্রদত্ত নয়। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, প্রাচীন প্যালেস্টাইনের ক্যানানাইটে 'বা'আল' নামে একটি লোকধর্ম শাখার বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে আরব, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষসহ প্রাচ্যের নানাদেশে বিস্তারের ফলে শব্দবিকৃতি অনুসারে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে বাউল শব্দের উদ্ভব ঘটে। 'বা'আল' শব্দের প্রভাব থাকলেও তুচ্ছার্থে বা ব্যঙ্গার্থে শব্দটি বাংলা ভাষায় আউলিয়া শব্দের বিকৃত সংস্করণ হিসেবেও বাউলিয়া, বাউল রূপেও অনুপ্রবেশ করে থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অসমীয়া এবং হিন্দি সাহিত্যেও 'বাউল' শব্দের ঈষৎ পরিবর্তিত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :

> ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না।[১৮৩]
>
> ভাষা নদী প্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম যখন একটি ভাষা প্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা তাহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময়ের ভাষাভাষী দিগের নিকট একটি নতুন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নতুন নামকরণ হইতে থাকে।[১৮৪]

ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে উড়িষ্যা, হিন্দি ও অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যে অনেক বাংলা ভাষা প্রচলিত রয়েছে।[১৮৫]

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অতীতে একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আসামও বাংলাদেশের সাথে যুক্ত ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের লৌকিক ভেদ এই সকল রাজ্যে লক্ষ করা যায়। এত বৃহৎ দেশে ভাষার যে একটি লৌকিক পার্থক্য থাকবে এবং তার প্রয়োগও যে সাহিত্যে ঘটবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। বাউল শব্দের এই লৌকিক বা আঞ্চলিক ভেদের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

১. *গোরক্ষ নামঙ্ক দিব্যা বীর সিংহ আজ্ঞা*
মল্লিকা নাথঙ্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা ॥
(উড়িয়া)

২. *হৃদয়ক বাউলি কহি পর জনু*
তোহৌ কহৌ সয়ানী ॥
(বিদ্যাপতি পদাবলী)

৩. *সেই সূর্য্য বংশে তুমি নৃপতি প্রধান*
স্ত্রীতে ভৈলাহা বাউল চিন্তা নাহি আন ॥[১৮৬]
(অসমীয়া)

বাউল শব্দের অর্থবৈচিত্র্য

বাউলসাধনা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবার পর থেকেই ব্যবহারিক শব্দকোষে এবং অভিধানে এর বহু অর্থ এবং প্রকারভেদও সংযোজিত হয়েছে। রাজশেখর বসু বাউল শব্দের অর্থনির্দেশ করতে লিখেছেন : 'বাউল (বাতুল) পায়ক ভিক্ষু সম্প্রদায় বিঃ। সর্বসংস্কারমুক্ত এক শ্রেণীর ধর্মাচারী।

রাজশেখর বসু 'বাউরা' শব্দকে পাগল এবং 'বাউরী' শব্দকে পাগলিনী ও প্রকারভেদে পশ্চিমবঙ্গের 'জাতি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৮৭] হিন্দিভাষায় বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। তবে 'বাউর' শব্দের প্রচলন আছে। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত লিখেছেন : হিন্দি ভাষায় এই শব্দটি 'বায়ালো', 'বাওল' 'বাওলী' রূপে ব্যবহৃত হয়।[১৮৮] শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস বাউল শব্দকে উদাসীন ও গায়ক সম্প্রদায় এবং অন্য অর্থে খ্যাপা লোক ও পাগল হিসেবেও অর্থনির্দেশ করেছেন।[১৮৯] শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বাউলদেরকে 'পাগল', উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত এবং বায়ুগ্রস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯০] শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন : 'বাউল' অর্থ (১) উন্মাত্ত, পাগল; (২) বিহ্বল; (৩) চৈতন্যসম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ।... ইহারা তিলকমালা, ডোর-কৌপীন বহির্বাস ধারণ করে। ইহারা শ্মশ্রু, গুল্ফ রাখে, কেশ উন্নীত করিয়া চূড়া করে বাঁধে। পরস্পর সাক্ষাৎকারে 'দণ্ডবৎ' বলিয়া নমস্কার করে।[১৯১] বাউল সম্বন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন : "ঈশ্বরভক্ত সম্প্রদায় বিশেষ, ইহারা প্রচলিত হিন্দু মুসলমান আচার অনুসারে চলে না, সংগীত ইহাদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ।"[১৯২] 'ভারতকোষে' বাউলদের পরিচিতি নিম্নরূপ :

> বাংলার পল্লীগীতি বিশেষ একটি ধর্মসম্প্রদায়। বাউলগান এই সম্প্রদায়ের গান। তাহাদের যাবতীয় সাধনপদ্ধতি রূপকের ভাষায় বাউলগানে বর্ণিত। একতারা, খঞ্জনি, ডুগি, খমক ইত্যাদি যন্ত্রের সঙ্গে এই গান গাওয়া হয়।[১৯৩]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানাজন নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের

সহিত 'আছে' এই অর্থ দ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন এবং এই বায়ু শব্দের অর্থ যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করিবার সাধনা করেন তাঁহারা বাউল।

কেহ বলেন, 'বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থে জীবনধারণ এবং তাহা সংযোগ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাঁহারা তাঁহারা বাউল।' আবার কেহ বলেন, 'সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। যাহারা বাতাধিক তাহারা পাগল।'[১৯৪]

সাধক লালন ফকির 'বাউল' শব্দের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দান করেছেন তাঁর গানে :

আমার আপন খবর নাহিরে কেবল
বাউল নাম ধরি ॥
বেদ বেদান্তে নাই যার উল্
শুধুই কেবল নামে মশগুল
এ জগৎ ভরি,
খবরদার কারে বলা যায়
কিসে হয় খবরদারি ॥
আপনার আপনি যে জেনেছে
বাউলের উল সেই পেয়েছে
সেই হুশিয়ারী।
কত মুনি, যোগী তপস্বি
খবর পায় না তারি ॥
আউল বাউল আরেফ কামেল
আত্মতত্ত্বে হয়ে ফাজেল
যে দ্বারের দ্বারী
আমি লালন পশুর চলন
কেমনে তরি ॥

এখানে লালন ফকির আত্মতত্ত্বে পূর্ণ ওয়াকিফহাল সাধকদের 'বাউল' নামে চিহ্নিত করেছেন। লালন ফকির অবশ্য তার গানে 'উল' শব্দটিকে একটি পৃথক অর্থদ্যোতক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নিম্নের গান 'উল' শব্দের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণীয়।

মাস অন্তে ফোটে যে ফুল
কোথা গাছ কোথারে মূল
জানিনে তাহার উল
ঘোর যায় ছুটে ॥

এখানে লালন ফকির বাউল শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলে যে শব্দরূপ দেখা যায়, তা এরূপ : বা (ফারসি, উর্দু) = সহিত+উল (দেশীয়) =

খোঁজ, সন্ধান। এখানে বাউল অর্থে আত্মতত্ত্ব বা আত্মানুসন্ধান। বাউলেরা কখনও কখনও তাদের সাধনাকে 'দমের সাধনা' বলে, যা এক অর্থে প্রাণবায়ুর মাধ্যমে দেহের স্বরূপ সাধনা। বাউলসাধনায় আত্মসন্ধানের এটি একটি বিশিষ্ট দিক। বা=বায়ু+উল (সন্ধান); 'উল' মূল শব্দের একটি বিকৃত রূপও বলা যেতে পারে।

এমনিভাবে 'নাড়া' শব্দেরও বিশেষ ব্যবহার লালনের গানে লক্ষ করা যায়।

১

কুলের বউ ছিলাম বাড়ি
হলাম নাড়ি নাড়ার সাথে
কুলের আচার কুলের বিচার
আর কি ভুলি ঐ ভোলাতে
ভাবের নাড়ি ভাবের নাড়া
কুল নাশিলাম জগৎজোড়া
কারণ তার উল্টো দাঁড়া
বিধির ফাঁড়া কাটবে যাতে ॥
হয়েছিলাম নাড়ার নাড়ি
দিব না আঁচির কড়ি
বেড়াব চৈতন্য পথে ॥
আসতে নাড়া যেতে নাড়া
দু'দিন কেবল ঘোড়া জোড়া
লালন কয় আগা গোড়া
জানিয়ে মাথা হয় মুড়াতে ॥

২

তিল পরিমাণ জায়গাতে কী কুদরতিময়।
জগৎজোড়া একজন নাড়া
সেইখানেতে বারাম দেয় ॥
আমি বলব কী সেই নাড়ার গুণ বিচার
চার যুগে তার রূপ নব কৈশোর
অমাবস্যা নাই সে দেশে
দীপ্তাকারে সদাই রয় ॥
ভাবের নাড়া ভাব দিয়ে বেড়ায়,
যে যা ভাবে তাই হয়ে দাঁড়ায়
রসিক যারা বসে তারা
পেঁড়োর খবর পিঁড়েয় পায় ॥

শতদল কি সহস্রদলের দল
ওই নাড়া বেটা বসে ঘুরায় কল,
লালন বলে তিনটি তারে
অনন্তরূপ কল খাটায় ॥

এখানে 'নাড়া' অর্থে নিঃসন্তান, একক, অদ্বিতীয় সত্তা, বুঝানো হয়েছে। এই 'নাড়া' বাউলের সাধনার ধন। তিনিই সাঁই, তাঁর প্রভু, স্বামী, তাঁর মনের মানুষ। তিনি সুফি সাধকের মাশুক, বৈষ্ণবের কৃষ্ণ। বাউলের করিম, কালা। বাউল এই নাড়াকে পাবার সাধনা করে। এই সাধনা বিন্দু বা রজঃ + বীজের সাধনা। মানবদেহে এই বস্তুর অবস্থিতি। তাই বাউল মানুষভজনা করে। বাউলসাধনার সত্যিকার পরিচয় দুদ্দু শাহ তার পদে বিধৃত করেছেন :

১

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল ॥
পূর্ব-পুনঃজন্ম না মানে
চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে হয়রে কবুল ॥
বেদ তুলসী মালা টেপা
এ সব তারা বলে ধোঁকা
শয়তানে দিয়ে ধাপ্‌পা সব করে ভুল ॥
মানুষে সকল মেলে
দেখে শুনে বাউল চলে
দীন দুদ্দু কী বলে লালন সাঁইজির কুল ॥

২

বাউল জীবন জানতে হয়
কেমন জীবন বস্তু, কিসে জন্ম, কোথায় হয় ॥
যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন
জীবন পরম নিরূপণ বাউলেরা কয় ॥
জীবনই তীর্থ-ধর্ম, পথ
এই কথা বাউলের মত
বস্তুবাদী বাউল আদৎ কেহ কেহ কয় ॥
না করে অনুমান ভজন
করে না মুক্তির কারণ
জীবনই সত্য নিরূপণ দীন দুদ্দু জানায়।

বাউলসাধনায় কৃষ্ণের উল্লেখ আছে কিন্তু এই কৃষ্ণ, বৈষ্ণবধর্মের কৃষ্ণ নয়। দুদ্দু শাহ বলেন :

কোন্ কৃষ্ণ হয় জগৎপতি
মথুরার কৃষ্ণ নয় সে, সে কৃষ্ণ হয় সবার গতি ॥
জীবদেহে শুক্ররূপে
এ ব্রহ্মাণ্ডে আছে ব্যাপে
কৃষ্ণবস্তু নিগুম ঘরে
জীবদেহে বিরাজ করে
রসিকের করণ, সে কৃষ্ণধারণ, করণ গম্ভীর অতি ॥
আত্মতত্ত্ব জানে যে জন
কৃষ্ণ ধাতু চেনে সে জন
লালন সাঁইর বাণী রসিক ধনী, বলে দুদ্দুর প্রতি ॥

এই গানে দুদ্দু শাহ কৃষ্ণের স্বরূপ বিশ্লেষণে বা আত্মবস্তু হিসেবে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা শুক্র বা 'ধাতু'কেন্দ্রিক। 'চৈতন্যভাগবতে'ও কৃষ্ণকে 'ধাতু'স্বরূপ বলা হয়েছে। ক্ষেত্রগবেষণায় বিভিন্ন বাউল ফকির আমাকে জানান যে, এই সাধনা মূলত ফকিরি সাধনা এবং তা রতিনিরোধজাত। বাউল শব্দের অর্থ নির্ণয়ে তাঁরা বলেন, আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি যিনি করতে পারেন, তিনি বাউল। তাঁরা বলেন, এই সাধনা আউলিয়া দরবেশের সাধনা। এই প্রসঙ্গে তাঁরা নিম্নোক্ত গান করে থাকেন :

তলবেল মওলা যে জন হয়
কেরামন কাতেবিন তার খবর নাহি পায়
নাহি করে বেহেস্তের আশায়
দোজখ বলে না রাখে ভয়,
দিন দুনিয়া তরক তার হয়
খোদার তারে তার মিশায় ॥
শোগল রাবেতা দোন
বরজোখ নিরূপণ
মোরাকেবায় তার ধিয়ান
মোশাহাদায় মশগুল রয় ॥
খোদারূপে করিয়ে ফানা
বেখুদি আশেক দেওয়ানা
মাসুকরূপে তার মিলনা
খোদার রঙে রঙ ধরায় ॥
আশেক মাশুক হমবেস্ত
কেরাবান, কাতেবীন খবর নেস্ত

লালন কয় হাদিস ছাবেদ,
দুদ্দু সে ভয় নাহি পায় ॥

এই বাউল ফকিরেরা বাউল শব্দের অর্থ নির্ণয়ে আর একটি বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা বলেন, বাউল সাধনা 'জ্যান্তে মরার সাধনা'।

হাওয়া ধরো
অগ্নি স্থির করো
মরেও বাঁচিতে পার ॥

এই প্রসঙ্গে তাঁরা 'নফি এজবাতের' অর্থাৎ নাস্তি ও অস্তির রহস্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পর্কে আলোকপাত করেন :

নফি এজবাত যে জানে না
মিছে রে তার পড়াশুনা।

সুফি সাধনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জেকেরে এই নফি এজবাতের প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম 'দম' বা 'হাওয়া সাধনা'। একে উল্টা সাধনাও বলা হয়ে থাকে। লালন বলেন :

ওরে আলোকের মানুষ আলোকে রয়
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়।
রস রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মূল খণ্ড হয় ॥
লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলা করলেন প্রচার
জানলে আপনার জন্মের বিচার
সব জানা যায় ॥
... ...
আপনার জন্মলতা
জানগে তার মূলটি কোথা
লালন কয় শেষের কথায়
হবে সাঁই এর পরিচয় ॥

লালন ফকির এই গানে মানব সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এই মানবতত্ত্বের রহস্য সন্ধানে বাউল যৌনজীবনকে সাধনার অংশ বলে বিবেচনা

করেছেন। এখানেই প্রাচীন 'বা'আল'সাধনার সঙ্গে বাউলসাধনার সম্মিলন ঘটেছে। বাউল লালন বলেন :

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কতমুনি ঋষি চারযুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়
তেমনি সে থাকে সদায়
থাকে আলেকে বসে ॥
অচিন দলে বসতি ঘর
দ্বিদলপদ্মে বারাম তার
দল নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবে অনায়াসে ॥
আমার হলো কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন
সিরাজ সাঁই কয় ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥

এই মানব সৃষ্টিরহস্য সন্ধান এবং তার মাধ্যমে নিজের স্বরূপকে চেনাই বাউলসাধনার মূল উদ্দেশ্য।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেড়ী
দিতাম পাখির পায় ॥
(লালন)

নিম্নবর্ণিত কয়েকটি গানে তিনি আরও বলেন :

১

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
আমি জনম ভোরে একদিন দেখলাম নারে ॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে এই নয়নে
হাতের কাছে যার
ভবের হাট বাজার
আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে ॥

সবে কয় প্রাণ পাখি
শুনে চুপে চেপে থাকি
জল কি হুতাশন
মাটি কি পবন
কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে ॥

২

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে
সে কি সামান্য চোরা
ধরবি কোণা-কানছিতে ॥
পাতালে চোরের নহর
দেখায় আসমানের উপর
তিন তারে হচ্ছে খবর
শুভাশুভ যোগমতে ॥
কোথায় ঘর কী বাসনা
কে করে তার ঠিক ঠিকানা
হাওয়ায় তার লেনাদেনা
হাওয়া মূলাধার তাতে ॥
সে চোর ধরবি যদি
হৃদ-পারদ কর গা খাঁটি
লালন কয় খুঁটিনাটি
থাকতে দেবে নারে ছুঁতে ॥

সুতরাং এই সাধনাকে পাগল, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্তের সাধনা বলে তুচ্ছ করা যায় না এবং সে অর্থে বাতুল এবং বাউল শব্দদ্বয়কেও একগোত্রভুক্ত করা চলে না। এই সাধনাকে পরিপূর্ণভাবে আউলিয়া সাধনাও বলা চলে না কারণ সুফিসাধনায় আউলিয়া শব্দের দুটি স্তরভেদ আছে। মূলস্তরে শরিয়তকে অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু অপরস্তরে যা বাতেনী তা একদিকে যেমন শরিয়তকে অস্বীকার করেছে, আবার তা অন্তরঙ্গে নির্মাণ করেছে নতুন শরিয়ত ভিন্নভাবে। এই সাধনায় বিভিন্ন সাধনার মিশ্রণ ঘটেছে। এই মিশ্রণে বাউল সাধনা একটি স্বতন্ত্র ধরনের সাধনায় রূপ নিয়েছে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা তাই এই অভিমত পোষণ করতে পারি যে, বাউল একটি গুপ্ত ও মিথুনাত্মক দেহকেন্দ্রিক আত্মাবাদী অধ্যাত্মসাধনা। নিজেকে চেনা এই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষই তার সাধনার ক্ষেত্র। তাই স্থূল অর্থে, একে মানুষভজনার সাধনা বলা বলে। লালন বলেন :

এক অজান মানুষ ফিরেছে দেশে
তারে চিনতে হয়
তারে চিনতে হয় তারে মানতে হয় ॥
শরিয়তের বুনিয়াদে
পাবে না তা কোনো মতে
জানা যাবে মারফতে
যদি মনের বিকার যায় ॥
মূল ছাড়া এক আজগবি ফুল
ফুটেছে সে ভবনদীর কুল
চিরদিন এক রসিক বুলবুল
সেই ফুলেরই মধু খায় ॥
শুনেছি এক মানুষের খবর
আলেফের জের মিমের জবর
লালন বলে হ'সনে ফাঁফর
মুরশিদ ধরলে জানা যায় ॥

অন্য একটি গানে তিনি আবার বলেন :

এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
আমি পারলাম না চিনিতে ॥

সুতরাং মানুষভজনাই এই সাধনার মূল লক্ষ্য। তবে এই মানুষের প্রকারভেদ রয়েছে। মানুষের মধ্যে সুফিসাধনায় সর্বোত্তম মানুষকে 'আল-ইনসানুল কামেল' বলা হয়। মানুষের মধ্যে খোদার অবস্থান, বস্তুত ঈশ্বর—বাউলসাধনার একটি সারকথা। বাউল নিজের জীবনের মাধ্যমে তার বিচার করে। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষের উপলব্ধিতে তার সাধনার সিদ্ধি। ধর্মের প্রথাগত আচার, অনুষ্ঠান পরিহার করে লৌকিক ভাবনার আলোকে পরম প্রিয়কে আপনার মাঝে অনুভব করাই তার সাধনার সার্থকতা। বাউলসাধনার আধ্যাত্মিকতায় প্রচলিত ধর্মের কোনো মিল নেই। এই আধ্যাত্মিকতা একান্তভাবেই লৌকিক। তাই একে আমরা লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা নাম দেবার পক্ষপাতী। বাউল সাধনাকে শুধু মিস্টিক বা মরমী বলে চিহ্নিত করলে এই সাধনাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। বাউল মরমী, কিন্তু সে বুদ্ধিবৃত্তিকে অস্বীকার করেনি বরং বুদ্ধিবৃত্তিকে সে অন্যতম মাধ্যম বলে ধারণা করেছে। বাউলসাধককে তাই এক অর্থে মেটাফিজিক্যাল বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। তবে তার সাধনায় সক্রেটিস, প্লেটো, দান্তে অথবা জন ডান্-এর ধারণা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। যদি আমরা এই সাধনাকে 'Right intellectual attitude towards ultimiate reality'

পর্যায়ে নিয়ে যাই, তা হলেও ভুল করা হবে। বাউল সম্পূর্ণ ভিন্নতর অর্থে মেটাফিজিক্যাল। তার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ একান্তই বস্তুগত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা। বাউল সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিজ্ঞান বা অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মবিধি অনুসরণ করেনি। বুদ্ধিবৃত্তিকে গুরুত্ব দিলেও সে হৃদয়বৃত্তিকে পরিহার করেনি। বরং বলা যেতে পারে, তার হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিকে একটি পরিশীলিত রূপ দিয়েছে। তাই এই সাধনা যেমন শুধু মিস্টিক নয়, তেমনি কেবল মেটাফিজিক্যালও নয়। এখানেও একটি সমন্বয়ের ভাব লক্ষ করা যায়। সত্য কথা বলতে কী, বাউলসাধনা একটি সমন্বিত চেতনাদর্শন হওয়াতে বিভিন্ন সাধনমার্গের ভাবনা ও ধ্যানধারণার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় এই সাধকদের গানে। বাউল শব্দের মধ্যেও এই সমন্বয়ের ভাব পরিস্ফুট। এই কারণেই বাউলসাধনাকে একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী মতাদর্শরূপে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক নয়। বাউল শব্দের অর্থবিচারেও তাই কোনো বিশেষ সংজ্ঞা নির্ধারণ না করে বলা যেতে পারে যে, বাউল এমন একটি সাধন-ভজন সম্প্রদায় যারা তাদের আরাধ্যবস্তু, তাদের মনের মানুষের সাথে মিথুনভিত্তিক প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে মিলনপ্রত্যাশী। পরম প্রিয়ের সত্তার সাথে আপনার সত্তার পরিপূর্ণ একাত্মতা অর্জনই তাদের সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। এই মিলনপিয়াসী হৃদয়বৃত্তি কখনও কখনও তাদেরকে প্রেমোন্মাদ এবং ভাবোন্মাদ করে তোলে। তাই তারা বাউল।

এ যাবৎকাল আমাদের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাউলসাধনা একটি মিশ্র লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা। আমাদের দেশে আর্যপূর্বকাল থেকে দেহবাদী মিথুনভিত্তিক তান্ত্রিক যোগসাধনার ধারা প্রবহমান ছিল। এই ধারার একটি ছিল মাতৃতান্ত্রিক, অপরটি পুরুষপ্রধান। প্রাচীন প্যালেস্টাইনে রাঘসামরায় ক্যানানাইটদের মধ্যে যে 'বা'আল' ধর্মমতের জন্ম—যা আরব, পারস্য (মেসোপটেমিয়া) ও ভারত উপমহাদেশেও বিস্তার লাভ করে, আর্য-পরবর্তীকালেও তার ধারা থেমে থাকেনি। বৈদিক শাস্ত্রাচারকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখে উপনিষদে স্থান পেয়েছে মরমী চেতনা। অতঃপর উপনিষদের এই ধারার সঙ্গে মিলিত হলো পারস্যের সুফিসাধনা প্রবর্তিত দেহভিত্তিক অধিবিদ্যা যা দেহাতীত জীবন-নির্দেশক। এই সুফিবাদের একটি বিশেষ ধারায় ইসলামী শাস্ত্রাচার অস্বীকার করে বাতেনী বা গুহ্য সাধনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র ভারত উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দু সেন আমলে বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল এবং এখানেই সুফি ফকিরদের দ্বারা এদেশীয় মুসলমান হিসেবে দীক্ষিতের সংখ্যা অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশি ছিল। এরা শিয়া ভাবাপন্ন ছিল এবং অপরদিকে তারা তাদের পূর্ববর্তী বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও হিন্দু জীবনযাত্রাকে আঁকড়িয়ে ধরেছিল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশেই যে একমাত্র বাউল মতবাদের প্রসার হয়েছিল তা নয়; ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে কবীর, রজ্জব, দুদ্দু প্রমুখের

সাধনায় এই সাধনা 'বাওল', 'বাউর' নামে বিস্তার লাভ করে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত যে 'বা'আল' সুফিসাধকদের হাতেই এতদঞ্চলে বাউল মতবাদের উদ্ভব ঘটে এবং চৈতন্যদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশে বাউল একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা হিসেবে গড়ে ওঠে। কারণ এই সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে সাঁই বা স্বামী বা প্রভুর অবস্থান। গুরু বা মুরশিদই হচ্ছে সাধকের একমাত্র সাধনার ধন। সমগ্র বাউল-গীতিকা অথবা লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহের পদে এই গুরু বা সাঁই-এর প্রশস্তি। গুরু ব্যতিরেকে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ মোটেই সম্ভব নয়। গুরু অবতার। তাঁকে এই সাধনায় ঈশ্বরারোপ করা হয়েছে। এই গুরুর অবস্থান দেহে এবং দেহের বাইরে। নর-নারীর যুগলসাধনায় তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাউলের মনের মানুষ। কারণ তাঁকে হৃদয়বৃত্তি দিয়েই উপলব্ধি করতে হয়। প্রেম সেই উপলব্ধির সোপান।

অতএব, বাউল শব্দের উৎপত্তিমূল নিম্নোক্তভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে :

আরবি বা'আল>হিন্দি বাওল, বাউর>বাংলা বাউল

এখন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে 'বা'আল সুফিসাধকদের এ উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে আগমনকালকে এই মতের উদ্ভাবনকাল হিসেবে ধরে নিতে হয়। কিন্তু 'বা'আল' সুফিসাধকদের এ দেশে আগমনের কাল সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানা যায় না।

চর্যাপদে 'বাজুল' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় এবং কোনো কোনো পণ্ডিত এই শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তিমূলও নির্ণয় করতে চান। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই এ উপমহাদেশে ক্যানানাইট ধর্ম 'সাধনা 'বা'আল'-এর প্রভাব ছিল, আমাদের আলোচনা দৃষ্টে সে সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মে। পারস্যের সুফিসাধকদের একটি শাখার নাম যে 'বা'আল' ছিল এ সম্বন্ধে আমরা অবহিত হয়েছি। এক্ষেত্রে 'বা'আল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব এবং ক্রমপরিণতি অস্বাভাবিক নয়, কারণ আমরা মধ্যযুগেই এই সম্প্রদায়ের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চতভাবেই জানতে পারি। তবে সুফিদের নানা শাখা যে এ উপমহাদেশে এবং বাংলাদেশে আসে এবং অবস্থান করে এ-কথা আজ ঐতিহাসিক সত্য। এক্ষেত্রে লোকনিরুক্তি অনুসারে 'বা'আল' > বাওল, বাউল, আউল শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ।

এক্ষেত্রে বাউল শব্দের সাহিত্যিক প্রয়োগ শাহ মুহম্মদ সগীর লিখিত 'ইউসুফ-জোলেখা' পুঁথি পুস্তক অনুসারে মধ্যযুগে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকে হয়েছে এমন ধারণা অসংগত নয়। কারণ এর পূর্বে আবিষ্কৃত কোনো সাহিত্যকর্মে কিংবা অন্যকিছুতে বাউল শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ক্ষিতিমোহন সেন বেদ উপনিষদেও বাউল চিন্তাভাবনা এবং সাধনার পরিচয়চিহ্ন পেয়েছেন। আমার এই গ্রন্থে এসব তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। অতঃপর এসব

তথ্যের ভিত্তিতে আমার এমন ধারণা জন্মেছে যে, ক্যানানাইটদের 'বা'আল' ধর্ম যা প্রাচীন বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করে, তার সঙ্গে পারস্যের সুফি বা'আলসাধনার সমন্বয়ে বাংলাদেশে বাউলসাধনার উদ্ভব ঘটেছে। চর্যাগীতিকায় এই সাধনার প্রভাব তাই বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। হিন্দি ভাষায়ও 'বাওল' এবং 'বাউর'[১৯৬] শব্দের অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে যে সমাজে বাউলদের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে প্রাচীন ক্যানানাইটদের মধ্যে 'বা'আল' নামে যে প্রজননভিত্তিক লোকধর্মের উদ্ভব হয়েছিল তা আরব, পারস্যসহ মেসোপটেমিয়ায়, বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে তন্ত্র, যোগসাধনা এবং সুফিদের প্রভাবহেতু সাধারণের মধ্যে তা বিস্তার লাভ করে। তবে এই সাধনা প্রাথমিক পর্যায়ে গোঁড়া হিন্দুদের নিকট গৃহীত হয়নি বরং নিন্দিত হয়েছে। অপরদিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা একদিকে এই সাধনায় যেমন তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে, তেমনি হিন্দুদের অত্যাচারের কারণে মুসলিম প্রচারিত এই সুফিধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অতঃপর চৈতন্যদেব এবং তদীয় শিষ্য নিত্যানন্দ ও তাঁর পুত্র বীরভদ্র বাউলসাধনাকে নবতর আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সময় সুফিসাধনায় 'সামা' 'গজল' 'কাসিদা'র অনুরূপ কীর্তন নামে ধর্মীয়সংগীতের উন্মেষ ঘটে এবং এসবের প্রভাবে বাউলগান সাধনসংগীত হিসেবে বাউলধর্মে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শাহ মুহম্মদ সগীর মুসলিম সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) রাজত্বকালে 'ইউসুফ-জোলেখা' পুঁথিটি প্রণয়ন করেন এবং পুঁথিতে এ যাবৎকাল আবিষ্কৃত তথ্য হিসেবে সর্বপ্রথম 'বাউল' 'আউল' এবং 'বাউর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এ ধারণা স্বাভাবিক যে, এ সময়ের অনেককাল আগে থেকেই সমাজের এসব শব্দ প্রচলিত ছিল এবং তারই ফলে চতুর্দশ শতকে শাহ মুহম্মদ সগীর এই শব্দগুলি বিশেষ একটি ভাবময়তা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যস্বরূপ উল্লেখ করেন।

এসব তথ্য বিবেচনা করে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে বাউলধর্মের প্রাথমিক কাল বা উদ্ভবকাল হিসেবে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী এবং বাংলাদেশে এই ধর্মের বিকাশকাল হিসেবে সুলতানী আমল, বিশেষ করে চৈতন্যদেব ও চৈতন্য-পরবর্তীকাল হিসেবে নির্ধারণ করতে পারি।

উপসংহার

বাউল মতবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট সময় ও কাল এ যাবৎকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে বাউল শব্দের অর্থ-পরিচয় এবং ব্যুৎপত্তি নির্ধারণে আমরা অতীত ইতিহাস, বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রন্থাদি—যেমন তৌরাত, জাবুর, ইনজিল এবং কুরআন মজিদে প্রাচীন প্যালেস্টাইনে বা'আল নামে একটি

সাধনভজন সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। তা থেকে আমার এমন ধারণা জন্মেছে যে আরব এবং পারস্য, বিশেষ করে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে উল্লিখিত 'বা'আল সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তা পরবর্তীকালে সুফি বাতেনী ধারার সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে এবং ভারত উপমহাদেশে নানা সাধনমার্গের সঙ্গে অন্বয় সাধন করে বাউল নামে পরিচিত হয়। বাতেনী সুফিসাধকদের বাংলাদেশে আগমনের অব্যবহিত কাল থেকেই এই বাউল মতবাদের উদ্ভবকাল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পাল-রাজবংশের রাজত্বকালে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটে। নবম ও একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৌদ্ধধর্ম একটা তান্ত্রিক ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৯৫] এরপর একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল সময়ে সেন-রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করে। এই সময় বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এই সময়ের সৃষ্টি। পাল-যুগের বৌদ্ধধর্মের প্রজ্ঞা ও উপায়, সেন-যুগে বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাবে প্রকৃতি-পুরুষ রূপে সুচিহ্নিত হলো। এই প্রকৃতি-পুরুষ রাধা-কৃষ্ণের প্রতীকীরূপ। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে হিন্দুধর্মের সাথে বৌদ্ধ মতবাদের বিরোধ বাধে। হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধভিক্ষুরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই সেন-রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য-ভাবাদর্শে একটি সমাজ সংগঠনে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়ে এবং এই প্রচেষ্টা একটি একনায়কত্বের রূপ পরিগ্রহ করে। এই একনায়কত্ব একদিকে একটিমাত্র বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য বর্ণের; একদিকে একটি মাত্র ধর্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এবং অন্যদিকে একটি মাত্র সামাজিক আদর্শের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ব্যবহার।[১৯৬]

এই আমলে তাই মানবিক ঔদার্যের অভাব ভয়ঙ্করভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেন-রাজবংশ মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর খাড়া করেছে। কঠোর বিধিনিষেধের নিয়ন্ত্রণজালে প্রত্যেক বর্ণের ব্যবহারকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যেমন : ব্রাহ্মণ শূদ্রানীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে তাতে নৈতিক অপরাধ হয় না, সংসর্গ দোষ হয় মাত্র। সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করলে অপরাধ স্খলন হয়।

অরবিন্দ পোদ্দার মন্তব্য করেন যে, এই ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় সমতার আদর্শকে শুধু অস্বীকার করা হয়নি, অসামান্যকে বিধিবদ্ধ ও সংগঠিত করা হয়েছে।[১৯৭]

এই সময়কার জনজীবন নানা অনাচার, বিশেষ করে, যৌনশিথিলতা এবং কামাচারপুষ্ট হয়ে সমাজের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *বাংলার ইতিহাসে* তার প্রমাণ মেলে।

> Certain it is that the literature of the Sena period and the religious texts and practices of the later phases of both Hinduism and Buddhism ocassionally betray a

degradation in ideas of decency and sexual morality which could not but seriously affect the healthy development of moral and social life.

It is obviously a dangerous ground to tread upon but it is difficult to avoid the conclusion that religious influences were responsible to a large extent for the two great evils which were sapping the strength and vitality of society. The disintegrating and pernicious system of rigid caste division with its elaborate code of purity and untouchability, and the low standard of morality that governed the relations between men and women.[১৯৮]

অরবিন্দ পোদ্দার মন্তব্য করেন :

> এই বিচিত্র সমাজ, যেখানে একদিকে নিয়মনিষ্ঠা আচার এবং অন্যদিকে সমাজ অনুমোদিত অনাচার, ব্যভিচার; একদিকে সাহিত্যানুশীলন এবং অপরদিকে সাংস্কৃতিক অধঃপতন, একদিকে সামাজিক উচ্চবর্ণের বিলাস কলুষিত আড়ম্বর এবং অন্যদিকে দারিদ্র্যের মলিনতা, একদিকে ধর্মাচার এবং অন্যদিকে ধর্মগত উৎপীড়ন ও ভেদবিচার, এবং ঐ ভেদবিচার থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকুতি, সমতা, মৈত্রী ও করুণার জয়গান—এই সামগ্রিক চিত্রই চর্যাগীতির সামাজিক পটভূমি।[১৯৯]

এমনি ধর্মকলহ ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের মুহূর্তে ইসলাম এদেশে প্রচারিত হলো। নিগৃহীত লাঞ্ছিত মানুষ পেল মুক্ত মানুষের অধিকার। অরবিন্দ পোদ্দার উল্লেখ করেন যে, ইসলামই এদেশে আধ্যাত্মিকতার পথকে উন্মুক্ত এবং সুগম করেছে। 'ফানান্নাসো ওতা উম্মাতান ওয়াহেদাতান', অর্থাৎ 'সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি'—এই বাণী ইসলামের। তাঁর মতে ইসলাম বিজয়ের আর একটি অমূল্য অবদান, লৌকিক ভাষা ও সাহিত্যের আবির্ভাব। এই অবদানের আলোকেই ভারতের মধ্যযুগের ভাবাকাশ আশ্চার্যভাবে রূপান্তরিত হয় এবং নতুন ভাবরসে সমৃদ্ধ হয়।[২০০] তিনি বলেন :

> বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ইসলামের প্রভাব অনুভূত হয়েছে আরও একভাবে। মুসলিম অভিযানের পূর্বে বাংলায় সুসংহত বা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বাংলার নিজস্ব অধিবাসীদের অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে শতাব্দীব্যাপী লেনদেন সংমিশ্রণ ইত্যাদি হয়ে থাকলেও তাদের সমবায়ে নবতর জাতীয় জীবন গঠিত হয়েছে এ-কথা বলা চলে না।

অরবিন্দ পোদ্দারের মতে, ইসলামের প্রভাব বাঙালিকে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। চৈতন্যদেব এই নবাবির্ভূত বাঙালি জাতির প্রতীক।[২০১]

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ জয় করার অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ খ্রিস্টীয় অষ্টম এবং নবম শতক থেকে চট্টগ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরব মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও বণিকদের প্রভাবে স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং তার পরপরই ইরানীয় সুফিসাধক ইসলাম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে বাংলার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[২০২] এই সুফিসাধকদের প্রভাবে বাংলাদেশে যে নতুন ভাবসাধনার প্রবর্তন হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

চৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণব মতাদর্শ প্রচার করেন, তার অনেকপূর্বেই বাউলসাধনা জনজীবনে প্রবিষ্ট হয়েছে। চতুর্দশ শতকে শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', রূপ গোস্বামী বিরচিত 'বিদগ্ধ মাধব' নাটক, শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' 'বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং অন্যান্য সাহিত্যে বাউল শব্দের প্রয়োগ আমাদের মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, এই সাধনা এসব গ্রন্থ রচনার পূর্ব থেকেই সমাজে প্রচলিত ছিল, তা না হলে সাহিত্যে এই শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হতো না।

শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' রচিত হয় আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে, মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র রচনাকাল ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে। রূপ গোস্বামী কৃত, 'বিদগ্ধ মাধব' নাটক রচিত হয় ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাকাল ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং আমাদের ধারণা করতে অসুবিধা হয় না যে এসব গ্রন্থ রচনার অনেক পূর্বেই বাউলসাধনা আমাদের দেশে শিকড় গাড়তে সমর্থ হয়েছিল। এখন যদি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে' বাউল শব্দটি প্রক্ষিপ্তও মনে করি তাহলেও বলা যেতে পারে যে বাউলসাধনার উদ্ভবকাল অন্ততপক্ষে চতুর্দশ শতকের পরে নয়। ড. আহমদ শরীফ মনে করেন সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে বাউল মতের উন্মেষ।[২০৩] তবে তিনি এ সম্পর্কে কোনো প্রমাণাদি উপস্থাপিত করেননি। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন আনুমানিক ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় বাউল সাধনা পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়।[২০৪]

যা হোক, আমাদের ধারণায় আনুমানিক দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে হয়তো এই মতবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ঊনবিংশ শতকে লালন ফকিরের সাধনায় তার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। এই সময়কাল নির্ধারণে আমার অভিমত এই যে, প্রথমত, বিভিন্ন গ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ সমাজে বাউলসাধনার প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, ত্রয়োদশ শতকের অনেক পূর্ব থেকে ইরানীয় সুফিসাধনা ভারতীয় এবং দেশজ ধ্যানধারণার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে শুরু করে।

আহমদ শরীফ উল্লেখ করেন, 'তেরো শতকের গোড়া থেকেই ভারতীয় যোগ ও বেদান্ত দর্শনের প্রভাব ইরানী তথা মুসলিম-সুফিদের উপর গভীরভাবে পড়তে থাকে। কামরূপের ভোজন ব্রাহ্মণ (ভোজ বর্মণ) নামে এক ব্রাহ্মণ (বৌদ্ধতান্ত্রিক?) যোগীর প্রদত্ত 'অমৃতকুণ্ড' নামে যোগী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এক সংস্কৃত গ্রন্থ লখনৌতির শাসক আলি মরদান খলজির (খ্রি. ১২১০-১৩) আমলের লখনৌতির কাজী রুকুনুদ্দিন সমরখন্দ (১২১০-১৯) ফারসি ও আরবিতে অনুবাদ করেন। পরে কামরূপের অপর ব্রাহ্মণ অম্বরনাথের সাহায্যে আর এক অজ্ঞাত সুফিও গ্রন্থটি আরবিতে অনুবাদ করেন। Blockmann-এর মতে এই অনুবাদক দামেস্কের সুফি ইবনুল আরাবী।

ছাত্তারিয়া খানদানের সুফি গোয়ালিয়রের শেখ মুহাম্মদ গওসীর (মৃত্যু ১৫৬২) প্রবর্তনায় তাঁর শিষ্য মুহাম্মদ খতিরুদ্দিন বহর-আল-হায়াৎ নামে পুনরায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন ফারসিতে। কাজী রুকুনুদ্দিন সমরখন্দীর পুরো নাম ছিল কাজী রুকুনুদ্দীন আবু হানিফ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলী সরমখন্দী। ইনি ছিলেন বোখারাবাসী। বাংলায় ছিলেন ১২১০ থেকে ১২১৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি। ১২১৯ সনে বোখারায় তিনি দেহত্যাগ করেন। এই আরবি অনুবাদ চৌদ্দশতকে মিশরেও ছিল সুপরিচিত। চৌদ্দশতকে মিশরের সুফি মুহাম্মদ আল মিশরী অমৃতকুণ্ডের উল্লেখ করেছেন। মুসলিম জগতের সর্বত্র জনপ্রিয় হয় এ গ্রন্থ। তাই ভারত থেকে মিশর অবধি সব জায়গায় মিলেছে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি।[২০৫]

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে বিশিষ্ট সুফিসাধক মনসুর হাল্লাজ ভারতীয় যোগসাধনা কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন :

> Although Greek Neo-Platonism furnished largely the philosophic bases of Islamic mysticism, the points of agreement between Islamic sufism and Indian Vedanta are so numerous and so profound that it would not be unreasonable to assume a certain amount of influence from the earlier Vedanta upon the later Tasawwuf; and at a subsequent period contact between yoga practices and Tasawwuf as a path of spiritual discipline is plainly discernible (e.g. the Yogic Sat-Chakra of the six centres within the body, and the sufi Manzil or stages.)[২০৬]

মনসুর হাল্লাজ ৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯২২ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন :

> Tasawwuf, modifying Indian spiritual life, and in its turn modified by the latter in India, and equated with Indian mysticism and philosophy as in Yoga, in Bhakti and in Vedenta gave rise to a veritable Majma'ul-Bahrayn, a Union of the Two Oceans.
>
> The mutual interaction of Iranian Tasawwuf and Indian Yoga and Vedanta and Bhakti is a subjcet which is of primary importance in a study of the synthesis of Indian and Perso-Arabic culture that started with the advent of the Muslim Arabs and Turks and Iranis in India from the eighth century onwards, and particularly from the twelfth and thirteenth centuries.
>
> I think that in the intensity of love and of a sense of beauty which is so characteristic of the completed or perfected sufism, there is something which suffused Indian (Hindu) mysticism as the result of a direct contact with Sufism after 1000 A.D.
>
> But this Sufi abandon of love and Sufi idea of God as the Soul of Beauty and love was adapted by the Indian mystics in their own way.[২০৭]

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো মুসলিম সুফি এবং ভারতীয় যোগনির্ভরভিত্তিক একটি গ্রন্থ 'মজমা-উল-বাহরাইন' বা 'সমুদ্র সংগম' রচনা করে এদেশে লৌকিক অধ্যাত্মচেতনার একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বাংলায় 'যোগ কলন্দর' নামে সুফিমতাদর্শ ও যোগদর্শন সম্বলিত আরেকটি গ্রন্থের সন্ধানও পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের রচয়িতার নাম জানা যায় না। দারাশিকো ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন।

এখানে বলা যায় যে, জালাল উদ্দিন রুমীর 'মসনবী' যেমন বাঙালি মনকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে তেমনিভাবে ওমর খৈয়াম, হাফিজ, জামী এবং রুমী প্রভৃতি সুফিকবিদের প্রভাবও বাঙালি মনে গভীর রেখাপাত করেছে। এ ব্যতিরেকে আলি হুজায়রীর 'কাশফ্-উল-মাহজুব', ইমাম গাজ্জালীর 'এহিউল উলুম' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রারেয়া বসরী, শামসী তেব্রিজ, ফরিদুদ্দীন আত্তার, ইবনুল আরাবী, বায়েজিদ বোস্তামী, আব্দুল কাদের জিলানী, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি ও অসংখ্য সুফিসাধক এদেশে মানুষের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, মনসুর হাল্লাজ যে 'আনাল হক' শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, যার অর্থ 'আমি সত্য' এই ধারণার প্রতিধ্বনি ভারতীয় উপনিষদেও লক্ষ করা যায় : আমি ব্রহ্মা, অহম ব্রহ্মা অসমী। 'That art thou' (tat tvan asi) and I am Brahma (aham Brahma asmi)[২০৮]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে আরও বলেন :

> Here we have in India of the seventh century B.C. a figure which makes the Divinity the Sweetheart of man's soul, so to say; and this figure is the one which has been treated with such romantic beauty and elaboration in a great part of Sufi poetry. In the later Indian treatment of romantic love as the link between man and God, the figure of Krishna or God incarnate as the Soul of Love and Beauty. Krishna who is no other than the Supreme Deity in this form of Vishnu or Narayana and who is Purusottama or the Supreme Male attracts to Himself the Gopis who represent the souls or men. God becomes the Eternal lover of the Eternal Woman which is the human soul, so long as there is no merging of the identity of the latter into the Former : the Sufi idea of God as the Ma'suqah or the Beloved, the Sweetheart, somehow did not appeal the genuine Indian love-mystic, whether frankly Hindu or formally Muslim. A woman saint Rabiah-al-Ada-wiyyah first brought in love in Islamic mysticism; and in this she remains a woman. I do not know through what steps or stages the Divinity was conceived as the Masuqah or the Beloved, rather than the 'Asiq' or the Lover, of the human soul : the matter is well-worth investigating.
>
> I do not take up the question why the beloved is described as a male mas'uq, rather than 'Masuqah' : herein we may see an influence of Mediteranean peoples which I need not enter into the connexion. From absence of evidence from any other side, I feel inclined to think that this was in its origin a purely Iranian idea.[২০৯]

সুফিসাধনায় আরাধ্যকে প্রেমিক বা মাশুক হিসেবে চিহ্নিত করা যদি একান্তই ইরানীয় ভাবনাজাত বলে ধারণা করা হয়, তবে পরবর্তীতে এই ভাবনায় আরাধ্যকে প্রেমানন্দরূপে কল্পনা করার ধারণাও নেহাতই ভারতীয়। অবশ্য এই ধারণার মূলে ইরানীয় ভাবনা ভারতীয় মনকেও বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজগতে যে 'জীবনদেবতা'র কথা বলেছেন, তিনি স্বর্গের ঈশ্বর নন, তাঁকে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। এই 'জীবনদেবতা' পুরুষ। তিনি মাশুক। তাঁকে তিনি 'স্বামী', 'অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এখানেও ইরানীয় বা পারস্যের সুফি সম্প্রদায় 'বা'আল'দের প্রভাব লক্ষণীয় :

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি করিবারে চাহ পান?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব বহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ॥

বাউলের মনের মানুষও পুরুষ। তিনি লীলাকারী। বাউল তাঁকে যেমন হৃদয়ে উপলব্ধি করেছে, তেমনিভাবে তাঁকে ধরতে বা ছুঁতে সে পারেনি, রবীন্দ্রনাথেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। রূপের মধ্যে থেকেও তিনি অরূপ। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের মতোই বলেন :

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।

আরব, পারস্য, মেসোপটেমিয়া এবং প্রাচীন ভারতবর্ষে অধ্যাত্মসাধনার মর্মমূলে পুরুষের প্রাধান্য। বহিরাগত সাধকদের এই চেতনা ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'বা'আল' হিসেবে যার উৎস প্রাগৈতিহাসিক কালের লৌকিক পরিমণ্ডলে, 'বাউল' ভাবনায় তার রূপান্তর ঘটেছে সুফি ফকির, দরবেশ নামের লৌকিক সাধকদের এদেশে আগমনের সময়কাল থেকেই। সাধনার ধারা 'বাতেনী' বা গুপ্ত সাধনা হওয়ার ফলেই প্রকাশ্যে তাদের প্রচার তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। বিশেষ করে তাদের সাধনায় যৌনজীবন বা দেহসাধনা মুখ্য হওয়ায় এই সাধকেরা নিজেরাই প্রচারবিমুখ ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে চিশতীয়া সুফিসাধনার প্রভাবে সংগীত যখন সাধনার মাধ্যম হলো, ঠিক তারই পাশাপাশি বাউলসাধনার মতো চর্যাগীতিকায় দেহসাধনাকে প্রতীকের মাধ্যমে আড়াল করে গানেই তার প্রকাশ ঘটেছিল। এই সঙ্গমকালকে স্মরণে রাখলে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ কালের মধ্যেই এদেশে বাউল মতবাদের উদ্ভবকাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তা হলে নিম্নোক্তভাবে বাউল লোকধর্মের উদ্ভবকালের ইতিহাস চিহ্নিত করা যেতে পারে :

খিস্টপূর্বকালে 'তৌরাত' 'জাবুর' গ্রন্থে 'বা'আল' একজন প্রজনন-দেবতা হিসেবে চিহ্নিত। এখানেও তিনি যুগলবন্দি। প্রাচীন প্যালেস্টাইনে ক্যানানাইট সম্প্রদায়ের তিনি অন্যতম প্রধান দেবতা।

ইসা (আ.) বা যিশুখ্রিস্ট প্রবর্তিত খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ ইনজিল-এও 'বা'আল' প্রকৃতি-উপাসকদের একজন প্রজনন-দেবতা।

কুরআন মজিদে 'বা'আল' প্রকৃতি-উপাসকদের দেবতা। বাইবেলে সর্বক্ষেত্রেই 'বা'আল' অর্থ প্রভু, স্বামী; কুরআন মজিদে 'বা'আল' শব্দটির অর্থ প্রভু, স্বামী এবং 'বউল' (স্বামী-স্ত্রী) বা Consort হিসেবে চিহ্নিত। পারস্যে 'বা'আল' সম্প্রদায় একটি সুফি-বাতেনী সাধনভজন সম্প্রদায়। এই সাধনায় তন্ত্র, যোগ ও সুফিসাধনার প্রভাব বিচার-বিশ্লেষণ করে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উপমহাদেশে বাউলসাধনার আবির্ভাবকাল আনুমানিক একাদশ-ত্রয়োদশ শতক।

তথ্যনির্দেশ

১. সুফিসংগীত সুফিসাধনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পারস্যে বা ইরানে এই সংগীতের প্রচলন ঘটে সুফি মতবাদের উদ্ভবের পরপরই। বলা যেতে পারে রাবেয়া আদাবিয়া এই সংগীতের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুফিসাধনা মূলত প্রেমভিত্তিক সাধনা ছিল। সংগীত ছিল এই সাধনার মাধ্যম। নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুফিসংগীতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। 'সামা' 'কাসিদা' 'গজল' ও তদসহ সুফিনৃত্য এই সুফিসংগীতের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো।

২. বাউল শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে এদেশীয় পণ্ডিতদের বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে অত্র অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিদেশী গবেষকদের মধ্যে Edward C. Dimock, "The place of the Hidden Moon" (Chicago, 1966) p. 16. Charles Capwell, The Music of the Bauls of Bengal (Kennt. Ohio 1986). এবং June Mc Daniel, The Madness of the Saints : Esoteric Religion in Bengal (Chicago 1989) বাউল শব্দের উৎপত্তিমূল নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৩. শ্রী নলিনী নাথ দাশ গুপ্ত, *বাংলা বৌদ্ধধর্ম*, কলকাতা।

৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*। দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা। অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, ২য় বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭৯ (১৯৭২)।

৫. A.B. Keith—*Classical Sanskrit Literature*, p. 67 দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউলগান ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, পৃ-৩৭।

৬. ঐ

৭. ঐ

৮. A.B. Keith—*The Sanskrit Drama* P. 186-87, 251 দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান*, পৃ. ৩৮

৯. ঐ

১০. D.R. Shastri-*A Short History of Indian Materialism, Sensationalism and Hedonism*, Calcutta, Also see Deviprasad Chattopadhyaya-Lokayata, New Delhi, 1968

১১. Deviprasad Chattopadhya, Ibid, p. 17

১২. D.R. Shastri, op. cit. p. 37, Also see, Deviprasad, Ibid, p. 17

১৩. Deviprasad, *Lokayata* op. cit P. 51

১৪. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যা*-১১

১৫. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত) *অদ্বয়বজ্র* পৃ. ৭, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান*, পৃ. ৪২

১৬. মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ (সম্পাদিত) *গোরক্ষসিদ্ধান্ত* সংগ্রহ। ড. নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, কলকাতা-১৪০০, পৃ ৫৩২

১৭. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ .৪২

১৮. *বিশ্বকোষ*-অবধূত শব্দ, পৃ. ৫৯৬

১৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩

২০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮

২১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪

২২. নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৪০০ (১৯৯৩), পৃ. ৫৩১

২৩. চর্যাগীতিকায় লুইপাদের চর্যানাথ ধর্মাবলম্বী লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ এক এবং অভিন্ন। নীহাররঞ্জন রায়—*বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩১

২৪. Shashibhasan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1976, P. 20

২৫. Deviprasad Chattopadhyaya. op, cit, P. 65. "This was obviously a reference to the so called 'Vamacari' theory, 'Vama' meant the female and probably also the eros (Kama) : in the context of Tantrism it is meant both. For Tantrism is largely the practice of (acara) centered in the female and also in the sexual union. The meaning usaually attributed to 'vamacara' namely left hand practice, is really misleading."

২৬. Deviprasad Ibid, p. 534
The chief god Indra is invoked simply as 'man'—" I invoke Indra, the man (naram), who fulfils the disires of many from his ancient dwellings in the same manner as my ancestors did in the past." .....
"In the past, he was the chief among men (Pura cit sura nrinam)"

২৭. শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—*প্রাচীন প্যালেস্টাইন রাস সামারায় আবিষ্কার, ক্যানানাইট সাহিত্য ও ধর্ম*, কলকাতা, পৃ. ১৯

২৮. The Holy Quran (Sura As-Safath XXXVII) Tr. commentator Abdullah Yusuf Ali

২৯. শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৩০. ড. আনোয়ারুল করীম—*বাউল সাহিত্য ও বাউলগান*, কুষ্টিয়া, ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ৪৬

৩১. *The New Bible Dictionary*, Organising Editor : J. D. Douglas, Michigan, 1962, P. 115

৩২. *Encyclopedia of Islam,* p. 31-32
Also see, *stories from Ancient Canaan* edited and translated by Michael D. Coogan (Philadelphia, 1978)

৩৩. *Encyclopeodia Britannica*

৩৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৯

৩৫. *The Religion of Mohenjodaro people according to the inscriptions*—Hiras, Journal of the University of Bombay, V. part I, page 8. Also see the *Karnatak Historical Review*, July 1937.

৩৬. *Civilisation as Harappa found buried at Farakka.*—The Bangladesh observer, Dhaka, June 18, 1976

৩৭. John Marshall—*Mohenjo Daro and Indus Civilization*, preface, p. V-VII

৩৮. *Encyclopedia Britannica* Short Abridged edition Vol. 1, 1973-74

৩৯. H. M. Westropp—*The Influence of the Phallic idea in the Religions of Antiquity*—Ancient symbol worship, pp. 28-29

৪০. Debiprasad Chattopadhyaya. op, cit, p. 292-293
Also see Frazer, the *Golden Bough* Vol. 1, Abridged Edition, New York, paperbook edition, 1963, p. 385

৪১. নীহাররঞ্জন রায়-*বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

৪৩. V. A. Smith—*Ancient and Hindu India* (Introduction), p. 10
Smith—*Early History of India* Cha—IX, pp. 255-56
Smith-*Oxfrod History if India*, Book, I Ch, 8, p. 46

মুসলমানদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন :
Baladhuri, Kitab Futuh al buldan. ed S. Munajjid p. 530

৪৪. খলিফা হজরত ওসমানের সময় মুসলমানদের একটি সেনাবাহিনী ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। তারা প্রথমে 'মাকরান' নামক স্থানে আসেন। তৎকালীন মাকরানের অবস্থা সম্পর্কে হজরত ওসমানের সৈন্যরা তাঁর নিকট যে বিবরণ দান করেন Baladhuri নিম্নোক্তভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন :
Water scarce, fruit inferior, robbers impudent, the army if small, likely to be lost, if numerous, likely to perish from hunger and thirst.
অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান এমন ছিল না এবং হজরত ওসমানের পর ৭০ বছরের মধ্যে মুসলমানেরা বিভিন্ন সময়ে এদেশে আগমন করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হজরত ওসমানের সময়কালের পূর্বেও মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ঘটে। দেখুন, Y. Friedmann, *Qissat Shakarwati Farmad*, Israel Oriental Studies V. 1975, p. 245
F. Buchanan. *A Journey from Madras through the countries of Mysore*, Canare and Malabar, London 1807, II p. 421
M.Y. Kokan, *Arabic and Persian in Carnatic*, Madras 1974 p. 53
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষে তখন পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব ছিল এবং সে কারণে ইসলামের সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁর অনুসারীদের ভারতবর্ষে আক্রমণ ও ধর্মপ্রচারের নির্দেশ প্রদান করেন : "God saved two groups of my companions from hellfire; a group which will attack India and a group which will be (at the end of times) with Isa Ibn Mariam."
Nasa i, Sunan, IV 43 quot in Y. Friedmann, A Contribution to the early history of Islam in India. Studies in memory of Gaston Wiet. ed. M, Rosen Ayalon, Jerusalem, 1977

৪৫. M. L. Roy Choudhury : *The State and Religion in Mughol India*, Calcutta, 1951, p. 127

৪৬. M.L. Roy Choudhury : Ibid, p. 126. ইসলামে সুফিবাদের উদ্ভব হয় ইরানীয়দের দ্বারা। এ সম্পর্কে সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন : 'In the realm of thought, three tendencies are extant; viz, naql or revelation, employed by the Mutazilites and Kasf or Mysticism applied by the Sufis. The Sufis contend that God alone exists. He is the only Reality, all else is elusive, Thus they identify God with all existing things and He embraces all aspects of existence, unseen, perceived, imagined etc. ...the Sufis maintain that creatures and created are both the same, one—the real and the other-shadow or reflection of the same.

৪৭. Syed Mahmudul Hasan, *Islam*, Islamic Foundation, Bangladesh, Dhaka, 1980, p. 65

৪৮. Syed Mahmudul Hasan, *Islam*, Ibid, pp. 247-248. বাতেনীয় ধারার মূল প্রবর্তক ছিলেন শিয়া ইমাম জাফর আস্ সাদেকের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাইল। জাফর সাদেক তাঁকে ইমাম হিসেবে মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি মদ্যপ এবং লম্পট হওয়ায় জাফর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের পরিবর্তে জাফর সাদেকের দ্বিতীয় পুত্র মুসা আল কাজীম ইমাম নির্বাচিত হন। ফলে ইসমাইল ক্রোধান্বিত হয়ে নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠন করেন যা ইসমাইলীয়া বা বাতেনীয়া নামে পরিচিত হয়। বাতেনীবাদ সম্পর্কে হাসান বলেন : "the greatest organiser of religio-political system or Ismailia was Abdullah Ibn Maimun. A shitte propagandist—Abdullah was the follower of an esoteric system or 'batin'. Therefore, the followers of Abdullah was known as Batinites, They held that the Quran should be interpreted allegorically. He established a network of agencies and missionaries throughout the Islamic Empire to preach the Batinite view and to subvert the Abbasid Caliphate, Abdullah did not accept Muhammed (sm.) as the "Seal of the Prophets" but Ismail as the last prophet and Imam. He declared himself as an assistant to the prophet Ismail." Syed Mahmudul Hasan, Ibid, p. 247-248.

৪৯. ডক্টর ইউসুফ হোসেন : *মধ্যযুগের পাক ভারতীয় সংস্কৃতি*, অনুবাদক : ফারুক মাহমুদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৩৭-৩৮

৫০. ডক্টর ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭-৩৮, ৪০

৫১. ডক্টর ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৫২. Dr. Muhammad Moin, *A Persian Dictionary* Vol. V. Proper Names, Tehran, 1978 P. 137

৫৩. নরেন দেব, *রুবাইয়াত ওমর খৈয়াম*, কলকাতা

৫৪. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : (সম্পাদিত), শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত *'ইউসুফ জোলেখা'*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৭

৫৫. Annemarie Schimmel. *As through a Veil, Mystical poetry in Islam*, Columbia University Press, New York, 1982, P. 15

৫৬. Ibid, p. 22.

৫৭. Ibid, p. 34

৫৮. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত) শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত *'ইউসুফ-জোলেখা'*, ঢাকা, ১৯৯৮ পৃ. ৬৭

৫৯. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮, ১৩০, ১৩১, ২২৫, ২৩৮, ৩০৬

৬০. M.L. Roy Choudhury, op, cit p. 127

৬১. *চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, শূন্যপুরাণ*, রামাই পণ্ডিত, কলকাতা ১৩৩৬; এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা , ১৯৫৫, পৃ. ১৭।

৬২. Journal of the Pakistan Historical Society, 1953, Vol-1, Pt. 1, Karachi, p. 46. এই পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে লক্ষ্মণাবর্তীতে আলী মারদান খলজীর (১২১০-১৩ খ্রি.) সময়কালে কাজী রুকন আল দীন সমরকান্দী নামে তাঁর একজন কাজীর সঙ্গে ভোজরব্রাহ্মণ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যোগীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমান হন এবং কাজী রুকন আল দীনকে হিন্দু যোগসাধনা সম্বলিত একটি গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড' উপহার দেন। কাজী রুকন আলদীন উক্ত যোগীর সহায়তায় এই গ্রন্থটি আরবি এবং ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। কাজী রুকন আল দীনের পরে সাত্তারীয়া সুফিসাধক শেখ মুহম্মদ ঘাউটি (মৃ. ১৫৬২) (গোয়ালীয়লর অধিবাসী) 'অমৃতকুণ্ড' গ্রন্থ পুনরায় তাঁর জনৈক শিষ্য মুহম্মদ খয়ের আল দীনের দ্বারা ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। ফারসিতে এই গ্রন্থের নাম 'বাহার আল হায়াৎ'।

৬৩. Journal of the Pakistan Historical Society 1953 Ibid, pp. 51-52, Islamic Culture, 1947, Karachi, pp 190-91

সুলতান আলা আলাদীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৭)-এর আমলে তাঁর সভাসদের একজন যশোরাজ খান 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'; বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস 'মনসামঙ্গল' এবং 'মনসাবিজয়' মহাকাব্য রচনা করেন। হোসেন শাহ-এর সেনাপতি এবং চট্টগ্রামের গভর্নর পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সভাসদ কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস 'মহাভারত' অনুবাদ করেন। (সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খন্ড* পৃ ২২৫ কলকাতা ১৯৪০)। কারো কারো মতে নুসরাত শাহ (১৫১৯-৩২) জনৈক কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়ে 'মহাভারত' অনুবাদ করিয়েছিলেন। (দ্র. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৩৫৬ বাং ১৮৯৬ইং, পৃ. ৮২)

এই সময় মুসলিম রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে 'মহাভারত', রামায়ণ এবং 'ভাগবত'ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। (দ্র. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, ১৯৯৫)

এনামুল হক : *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম প্রচার*, ঢাকা ১৯৪৮; বঙ্গে সুফি প্রভাব, কলকাতা ১৯৩৫। মুহম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-১৫০

৬৩. Muhummad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal* Vol. 1, Pakistan Historical Society. Karachi, 1963 p. 78 Suniti Kumur Chatterjee, *Islamic Mysticism*, Iran and India, Reprinted from the Indo-Iranica, Volume, 1. No, II, October 1946
Khandeker Fazli Rubbe, *The Origin of the Muhammadan of Bengal*, Calcutta 1898, Eamul Haque. *A History of Sufism of Bengal*, Dhaka, 1975

৬৪. চিশতীয়া সুফিসাধকেরা ভারতবর্ষে 'সামা' নামে যে সাধনসংগীত প্রবর্তন করেন তার অনুসরণে এদেশীয় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ সংগীত রচনা করেন। এ বিষয়ে কবি ফয়েজুল্লাহ-কৃত 'রাগমালা' নামে সংগীত রচনাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্র. এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫। উল্লেখ্য, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সংকীর্তনও সুফি সাধনসংগীত কর্তৃক প্রভাবিত।

৬৫. Asim Roy : *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, New Jersy, 1983. p. 207-248

৬৬. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ পৃ. ২০ কলকাতা, ১৯৭৪। রাখাল দাস বলেন : "এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে আর্য্যাধিকার বিলুপ্ত হইলেও প্রাচীন ঐরানে (বর্তমানে পারস্য দেশে) আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐরানবাসী পারসিক নামধারী আর্য্যগণই পরবর্তীকালে প্রাচীন প্রাচ্য জগতে অসুর ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই আর্য্য জাতির এক শাখা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।"

৬৭. Suniti Kumar Chatterjee : *Islamic Mysticism Iran and India*. op cit, p. 25

৬৭. Ibid, p. 25

৬৯. Ibid, p. 27

৭০. Ibid, p. 25

৭১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : *বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৩৫৯

৭২. নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, কলকাতা, ১৪০০ (১৯৯৩), পৃ. ৫৩২

৭৩. ক্ষিতিমোহন সেন : *বাংলার বাউল*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪, পৃ. ১

৭৪. ক্ষিতিমোহন সেন : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৭৫. ক্ষিতিমোহন সেন : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭৬. ক্ষিতিমোহন সেন : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৭৭. ক্ষিতিমোহন সেন : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৭৮. ক্ষিতিমোহন সেন : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৭৯. K.N. Dikshit, *Memoirs of Archaeological Survey of India*. No. 55, Delhi, 1938, p. 87। এখানে উল্লেখ আছে যে খলিফা হারুন অর রশীদের সময়কালের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) একটি মুদ্রা পাহাড়পুরের বৌদ্ধমঠে পাওয়া যায়। এই মুদ্রার গায়ে যে তারিখ উল্লেখ আছে তা হলো ১৭২ হি. ৭৮৮ খ্রি.। কুমিল্লার ময়নামতি বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও এই সময়কালের মুদ্রা পাওয়া যায়। (দ্র. F.A. Khan, *Recent Archageological Discoveries in East Pakistan*, Karachi, P. 11)
এ থেকে এমন ধারণা করা অসংগত নয় যে এই সময়ে মুসলমানেরা এদেশে আগমন করেছিলেন। 'তাবাকাত-ই-নাসিরী'-এর লেখক মিনহাজউদ্দীনের মতে,

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজীর ভারত আক্রমণের পূর্বকার থেকে অর্থাৎ হিন্দু আমলেই মুসলমানদের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কে মিনহাজউদ্দীনের উদ্ধৃতি নিয়ে মু. আর. রহিম বলেন :
"A statement of Minhaj, author of Tabaqut-i-Nasiri Conveys the idea that the Muslims had trade with Bengal in the Hindu period, Minhaj says that when Mohammad bin Bakhtiar Khalji with 18 horsemen approached Nudia (his main army following behind) the people of the place thought that his party were traders and had brought horses for sale. So, they did not suspect that they had come to conquer their city." Mohammad Abdur Rahim op, cit p. 46

৮০. Pramatha Nath Bose, *A History of Hindu Civilzation druing British Rule*, Vol. 1, Calcutta, 1894, p. 3

৮১. Ibid p. 36-41

৮২. ক্ষিতিমোহন সেন : *বাংলার বাউল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬

৮৩. Annemaric Schimmel, *Islam in the Indian Subcontinent, Leiden*, The Netherlands, 1980, Ch. I, p. 3-4
Schimmel বলেন : "Indian local tradition speaks of much earlier contacts; the south Indian story of King Shakarwati tells that this ruler like Raja Bhoja of Ujjain had been converted to Islam when the miracle of the splitting of the moon (Sura 54/1) occured, Indeed, the first Arab Muslim settlers on the southern and western coasts of India considerably proceeded the Advent of the imperial armies in more northern areas. Some Arab families migrated to India during the time of al-Hajjaj, other some 150 years later, A tamil copper plate given to Arab settlers in 475 A. D. by the King of Madura, granted them asylum. Their discendants were destined to play an important role in South India." Also see M.Y. Koan, Arabic and Persian in Carnatic, Madras, 1974, p. 53

৮৪. ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৮৫. ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৮৬. Suniti Kumar Chattyerjee : op, cit, p. 24

৮৭. "*অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।*
ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্ব
রৌরবং নরকং বজেৎং
অষ্টাদশ পুরাণ ও রামচরিত মানব ভাষায় (দেশজ ভাষা বাংলা) শ্রবণ করলে রৌরব নরকে স্থান হবে।

ইতিহাসেও এ-কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় : 'at the courts of the Hindu Raja's priestly influence maintained Sanskrit as the Literary Language'. The Cambridge History of India.

৮৮. বিদ্যাপতির কীর্তিলতা'য় উল্লেখ আছে :

কতহুঁ তুরক বরকর
বাট জাইতে বেগার ধর।
ধরি আনএ বাঁঙন বড়ু অ,
মথাঁ চড়াব এ গাইক চুড়ুয়া।

(কত তুরস্ক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তাঁর মাথায় চড়িয়ে দেয় গরুর রাঙ)

এ সময়ের কবি জয়ানন্দ উল্লেখ করেন :

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
বিষম পিরল্যা গ্রামে নবদ্বীপের কাছে।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ আছে।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' এই বিরোধের আরও চিত্র পাওয়া যায় :

কত ভাগ্য দেখ তুমি হয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥

এখানে 'যবন' বলতে বৈষ্ণব হরিদাসকে বুঝানো হয়েছে। হরিদাস মুসলমান হয়ে হিন্দু আচার পালন করায় মুসলমানেরা মুল্লুকপতির নিকট ধরে নিয়ে যায় এবং তিনি হরিদাসকে হিন্দুর আচার ত্যাগ করার জন্য জানান। এই ঘটনা তৎকালীন কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, কলকাতা ১৯৫৮, পৃ. ৫৩-৬৫

৮৯. মালাধর বসু রচিত *শ্রীকৃষ্ণ বিজয় পুঁথি*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদিত, পৃ. ৫২৯। দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩

৯০. রূপ গোস্বামী : *'বিদগ্ধ মাধব'*, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত এবং সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, মুর্শিদাবাদ ৩৩১, পৃ. ৪৫, ৭৫।

৯১. Muhammad Abdur Rahim. op. cit p. 42-43, Muhammad Mohor Ali, *History of the Muslims of Bengal*. Vol 1A (Muslim Rule in Bengal) Early Muslim contact with Bengal. Riyadh, Ch. II p. 29-43

৯২. Asim Roy, op. cit p. 145-155, 190 191 "... It is to be noted that the dominant muslim mystical notion Wahdat Al Wazud, advocating a position of qualified dualism achieved through the meditating role of the soul between God and man, find a close Indian parallel in Ramanujas system of modified non-dualism. দেখুন, ড. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

৯৩. M. Enamul Haque, *Imapact of Islam on the Guadian from of Vaishnavism*, JASP Vol. XIII, No 2 Aug. 1968. Dhaka p. 128. Also see Suniti Kumar Chatterji, op. cit. p. 27

৯৪. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৯৫. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৯৬. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২, ২৫

৯৭. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৯৮. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৬ কলকাতা, পৃ. ২১০

৯৯. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১০০. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১০১. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১০২. শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত *'শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'*, মধ্যলীলা, কলকাতা, পৃ. ৩৩১। বিজুলী খান নামক জনৈক পাঠান এবং তাঁর চাকর রামদাস বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে বলে চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে।

১০৩. M. Enamul Huq, op. cit, JASP, p. 131

১০৪. *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদি লীলা ১২ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১০৫

১০৫. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৯-২০.

১০৬. মুহম্মদ এনামুল হক, ঐ, পৃ. ৪৪

১০৭. মুহম্মদ এনামুল হক, ঐ, পৃ. ৪৩

১০৮. মুহম্মদ এনামুল হক, ঐ, পৃ. ৫১

১০৯. M. Enamul Huq. op cit. pp. 125-136

১১০. মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১১১. শাহ আব্দুর রহমান : *শরফুল ইসলাম*, সংকলক, খান সাহেব মৌলবী হামিদুর রহমান বি. এ. ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৫২, পৃ. ২১১-২১২

১১২. শাহ আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

১১৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

১১৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১১৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১১৬. বাউলদের সম্পর্কে দীর্ঘ বছর ধরে গবেষণার সময় বাউলসাধকদের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই কুলত্যাগী, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা বলে জেনেছি। বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে বাউলদের নানা আখড়া আছে। এরা এইসব আখড়ায় আশ্রয় পায়। আবহমানকাল থেকে এইসব আখড়া বাউলসাধক, বোষ্টম-বোষ্টমী, সাধু-ফকিরদের আশ্রয়স্থল। তবে এরা কেউ একই আখড়ায় দীর্ঘদিন থাকে না। এসব আখড়া প্রতি গ্রামে একজন স্থায়ী বাউলসাধকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। গ্রামের বাইরে একটি নিভৃতস্থানে এসব আখড়াকে ঘিরে বাউলদের কিছু স্থায়ী আবাসস্থলও চোখে পড়েছে। অনেকে গৃহীবাউল হয়ে সংসারধর্ম পালন

করেছে। বর্তমানে বাউলসাধনার ধারা গেছে পাল্টে। এসব গৃহীবাউল কৃষিকাজ, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি করে। এদের মধ্যে পীর-মুরিদের মতোই বাউলগুরু এবং তাদের শিষ্যদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

১১৭. বৃন্দাবনদাস বিরচিত *চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের মধ্যখণ্ড*, পৃ. ১০

প্রভু বলেন কৃষ্ণ শক্তি ধাতুর প্রচার
ধাতু সূত্র বাখানিয়ে শুন সর্বজন
দেখি কার শক্তি আছে কর খণ্ড ন ॥

১১৮. আহমদ শরীফ, *বাংলা সুফী সাহিত্য*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৯

১১৯. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-৩২

১২০. Suniti Kumar Chatterji, *Islamic Mysticsm*, Iran & India, indo-Iranica, Vol. I. No. II, 1964 p. 32

১২১. Ibid.

১২২. Ibid.

১২৩. এখানে সুফিকবিরা পবিত্র কুরআন মজিদের একটি আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহর নূর বা আলো সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, ইহা প্রজ্বলিত করা হয় পূত পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যের নয়, অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ।" সুরা ২৪, নূর পারা ১৮ আয়াত ৩৫।

হাসন রাজা তার একটি গানে বলেছেন :

মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমিন।

লালন বলেন :

নূরের মানে হয় কোরানে
নূর বস্তু সে নিরাকার প্রমাণে
কেমন করে নূর চুয়ায়ে হয় সংসার।

(দ্র. আনোয়ারুল করীম, লালনের গানে বর্ণমালার সাংকেতিক অর্থ, 'সমকাল', (ঢাকা) অষ্টাদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৮৩। সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান পৃ. ৯৪-৬৮।

১২৪. Shashibhusan Dasgupta. op. cit, p. 169

১২৫. *চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা* পৃ. ১৪৬ (সম্পাদক, সুবোধচন্দ্র মজুমদার)

১২৬. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *বিশ্বকোষ*, অষ্টাদশ ভাগ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬০

১২৭. Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1911, p. 797.

১২৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, ২য় সংস্করণ ১৯৬৬ পৃ. ৩৫৩। দেখুন, বাংলার নাথ সাহিত্য, বিশ্ব ভারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩০

১২৯. মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

১৩০. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৯২

১৩১. মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

১৩২. দীনেশচন্দ্র সেন : *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলকাতা পৃ. ২৬৩

১৩৩. বিমানবিহারী মজুমদার : *চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান*। প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ৩১৯

১৩৪. শ্রী সুকুমার সেন : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পূবার্ধ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, পুনর্লিখিত, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৫৯, পৃ. ৩৪৭।

১৩৫. দেখবি যদি চিকণ কালা শ্বাসের মালা জপ না।
মনের ভোলা কাঠের মালা জপলে জ্বালা যাবে না।
জীয়ান্তে মরবি যদি, শ্বাসের সঙ্গ ধর না।
আসা যাওয়ার যে যন্ত্রণা, জেনে কি তা জান না ॥
... ...
... ...
ষটচক্র ভেদী যবে হবে পাবে তব ঠিকানা
দেখবে আলোর ভিতর কালো মানিক
ঘুচবে ভবের যন্ত্রণা।
গোবিন বলে, দেখলে পরে আসা যাওয়া আর রবে না।
একুশ হাজার ছয়শ বার জপ করে তা দেখ না।
(গোঁসাই গোবিন)

১৩৬. Shashibhusan Dasgupta. op cit p. 166

১৩৭. "The first serpent in Scripture is the subtle creature of Gn iii, used by Satan to alienate man from God (Rom, xvi, 20; 2 cor xi. 3) controlled by the devil like the demons in men and swine in New testament...

The Serpent thus remained a biblical symbol of deceit (Mt. xxiii 33) and the arch-deceiver himself is that of old serpent' (Rev xii 9, 14, 15 xx, 2) see J. D. Doughlas (organising Editor), The New Bible Dictionary Michigan, 1962, p. 1164-65.

১৩৮. Reyond A. Nicholson, *A literary History of the Arabs*, Cambridge, 1953. p. 77

১৩৯. Ibid, p. 182

১৪০. Ibid, p. 310
১৪১. Ibid, p. 72
১৪২. Shashibhusan Dasgupta. op cit p. 164
১৪৩. Nicholson R.A. *The Idea of Personality in Sufism*, Delhi, 1976, p. 17
১৪৪. Nicholson R.A. *Studies in Islamic Mysticism*, Cambridge 1921 p. 184
১৪৫. আহমদ শরীফ : *বাউলতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩০
১৪৬. *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্তলীলা, পৃ. ৫৮৫
১৪৭. *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্তলীলা, পৃ. ৫৮৬
১৪৮. *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্তলীলা, পৃ. ৫৮৬
১৪৯. *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্তলীলা, পৃ. ৫৮৬
১৫০. *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্তলীলা, পৃ. ৫৮৭
১৫১. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী সুনীতিকুমার বন্দ্যোপাদ্যায় সম্পাদিত *চণ্ডীদাস পদাবলী*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৪১, পৃ. ৪৬-৪৭
১৫২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *বাউলগান ও দুদ্দু শাহ* (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ১৩৭৯, পৃ. ৬৬।
১৫৩. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৫৪. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭
১৫৫. শ্রী বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, মধ্যখণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪
১৫৬. শ্রী বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, মধ্যখণ্ড, পৃষ্ঠা ১২
১৫৭. শ্রী বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, মধ্যখণ্ড, পৃষ্ঠা ১২
১৫৮. শ্রী বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, মধ্যখণ্ড, পৃষ্ঠা ১২
১৫৯. শ্রী বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, মধ্যখণ্ড, দশম অধ্যায়
১৬০. শ্রী বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, মধ্যখণ্ড, পৃষ্ঠা ১০
১৬১. শ্রী বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা
১৬২. মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১৬৩. আহমদ শরীফ, *বাংলা সুফী সাহিত্য* (সম্পাদিত), জ্ঞান সাগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫
১৬৪. আহমদ শরীফ, *বাংলা সুফী সাহিত্য* (সম্পাদিত), জ্ঞান সাগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬
১৬৫. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পুনর্মুদ্রণ ১১৭৯, পৃ ৭৭
১৬৬. এস এম লুৎফর রহমান, *সাহিত্য পত্রিকা*, শীত সংখ্যা, ১৩৭৬, সম্পাদক : আহমদ শরীফ, পৃ. ১৩৭
১৬৭. এস এম লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
১৬৮. মনীন্দ্রমোহন বসু : *চর্যাপদ*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মনীন্দ্রমোহন চর্যাপদ সংক্রান্ত বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন নির্দিষ্ট চর্যাগীতিকাগুলিতে সহজযানের পরিচয় আছে বলে উল্লেখ করেছেন, আবার অনেক চর্যাতে যে মহাযানী বৌদ্ধমতের প্রত্যক্ষ আলোচনা আছে, সে সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন।

১৬৯. অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, ৭৬-৭৭
১৭০. এস এম লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।
১৭১. অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬, পৃ. ৫৩৬।
১৭২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২
১৭৩. ঐ
১৭৪. *শ্রী মন্নিত্যানন্দ বংশাবলী*, পৃ. ১৬৯-৭১; *নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার*, পৃ. ২৩
১৭৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩-৫২৪
১৭৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫
১৭৭. মুনশী এমদাদ আলী প্রণীত 'রদ্দে নাড়া' অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। আমার জনৈক ছাত্র বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের গোপনীয় সহকারী হিসেবে কর্মরত মোঃ নজরুল ইসলাম, মুনসী এমদাদ আলীর আত্মীয়স্বজনের নিকট থেকে সংগ্রহ করে আমাকে প্রদান করে। পরবর্তীতে আমার ছাত্র বিশিষ্ট গবেষক ড. আবুল আহসান চৌধুরীকে আমি তা প্রদান করি।
১৭৮. রেয়াজউদ্দিন আহমদ : *বাউল ধ্বংস ফৎওয়া*, ১৩৩০ সাল, পৃ. ১-২
১৭৯. রেয়াজউদ্দিন আহমদ : *বাউল ধ্বংস ফৎওয়া*, ২য় খণ্ড, ১৩৩২ সাল, পৃ. ১০৪-১০৫
১৮০. ঐ. ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৩৩৩ সাল, পৃ. ২৫-২৬
১৮১. মাওলানা আকরম খাঁ : *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১১৭
১৮২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ১ম সংস্করণ ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৩
১৮৩. ঐ, পৃ. ১১
১৮৪. ঐ, পৃ. ৭৩
১৮৫. ঐ, পৃ. ৭৩
১৮৬. ঐ, পৃ. ৭৩
১৮৭. *চলন্তিকা, আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান*। রাজশেখর বসু সংকলিত, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ ১৩৬৯, কলকাতা, পৃ. ৪৬৮
১৮৮. শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত : *বাউল সম্প্রদায়, গৃহস্থ*, কার্তিক ১৩২০ পৃ. ২৩-২৫, দ্র. সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৭৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯৬-৯৭
১৮৯. *সংসদ বাংলা অভিধান*, শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংশোধিত ও পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ, শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৯৬০, পৃ, ৫৬৭
১৯০. শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : *বাংলা সাহিত্যের অভিধান*, এলাহাবাদ, পৃ. ১০৭৫
১৯১. শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, ব-স, কলকাতা, ১৩৪১, পৃ. ২০২০-২১
১৯২. কাজী আবদুল ওদুদ, *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, কলকাতা, পৃ. ৬৬৫
১৯৩. *ভারতকোষ*, কলকাতা।
১৯৪. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গবাণী*, কলকাতা।
১৯৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
১৯৬. অরবিন্দ পোদ্দার : *মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ*, ২য় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৫৮, পৃ. ১৮

১৯৭. অরবিন্দ পোদ্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১৯৮. Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, Dhaka University, Vol. I, Ch-XV, pp. 619-620
১৯৯. অরবিন্দ পোদ্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২০০. অরবিন্দ পোদ্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২০১. অরবিন্দ পোদ্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২০২. মুহম্মদ এনামুল হক : *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৪৮, পৃ, ১০
২০৩. আহমদ শরীফ, *বাংলার বাউল*, ঢাকা, পৃ. ৫৭
২০৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
২০৫. আহমদ শরীফ, *বাংলার সুফী সাহিত্য*, ঢাকা
২০৬. Suniti Kumar Chatterji, op, cit, p. 19
২০৭. Suniti Kumar Chatterji, op, cit, p. 23-24
২০৮. Ibid, p. 18
২০৯. Ibid, p. 25



দ্বিতীয় অধ্যায়

বাউল : একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা

'বাউল' শব্দের অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যেমন মতভেদ রয়েছে, তেমনি বাউলসাধনায় বিভিন্ন মতাদর্শের প্রভাব সম্পর্কে নানা চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। পণ্ডিত বা গবেষকদের মতামতের প্রেক্ষিতে এই ভাবনাগুলো নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এক. বাউলসাধনা একটি লোকায়ত বা বস্তুবাদী মতাদর্শ। এই সাধনায় তন্ত্র, যোগ এবং সহজিয়া ভাবনার প্রভাবই সমধিক।

দুই. বাউলসাধনা একটি অধ্যাত্মবাদী মতাদর্শ এই সাধনাকে সুফিসাধনা বলে গণ্য করা যেতে পারে।

আমার ধারণা, বাউলসাধনায় উল্লিখিত দুটি ধারাই সক্রিয়। একদিকে এই সাধনা লোকায়ত নির্ভর, বস্তুকেন্দ্রিক; অপরদিকে তা লোক বা বস্তুর ঊর্ধ্বেকার জীবন নির্দেশক, আধ্যাত্মিক; অর্থাৎ এই সাধনা একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা। লোকায়ত সাধনা হিসেবে এই সাধনায় অনার্য ভাবনা বিশেষভাবে বিদ্যমান। তন্ত্র, যোগ ইত্যাদি অনার্যভাবপ্রসূত। আধ্যাত্মিক অর্থে এই সাধনা বাতেনী সুফি ভাবনাজাত। বাউলসাধনার মূল লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা, তাই সুফিসাধনার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে এই অধ্যাত্মসাধনা কেবল সুফিসাধনা নয়; এখানে লোকায়ত ভাবনাও প্রবল বিধায় এই আধ্যাত্মিকতা লৌকিক।

এক

বস্তুত, বাউলসাধনা একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা। এখানে 'লোক' অর্থে সাধারণ মানুষ এবং লৌকিক অধ্যাত্মবাদী বলতে তাদের অধ্যাত্মচিন্তাকে বুঝায়। এই অধ্যাত্মভাবনা পরমাত্মাবিষয়ক, আত্মাসম্বন্ধীয়; ইংরেজিতে একে metaphysical হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[১] এই সাধনা 'মরম'কে গ্রহণ করলেও তা পুরোপুরি মরমী নয়। ইংরেজি মিস্টিসিজ্‌ম (mysticism) রহস্যমণ্ডিত অলৌকিকতা বা অতীন্দ্রিয়তা নির্দেশক। বাউলসাধনায় উভয় দৃষ্টিভঙ্গি

সক্রিয়। অনেকে সাধারণ মানুষের দর্শনকে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের মতে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি স্থূল, তেমন সূক্ষ্ম নয়। তারা এই মাটির পৃথিবীকে একমাত্র সত্যজ্ঞান করে থাকে।[২] পণ্ডিতেরা এই সাধারণের দর্শনকে 'লোকায়ত' নামে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা বলেন 'লোকায়ত' বলতে ইহলোক সংক্রান্ত জনসাধারণের দর্শন বুঝায়। অর্থাৎ যারা পরলোক মানে না, আত্মা মানে না; যারা মনে করে কেবল এই দেহই সত্য এবং পৃথিবীই সবকিছুর আদি এবং অন্ত, অর্থাৎ লোকায়ত হলো দেহাত্মবাদ, বস্তুবাদ ইংরেজি পরিভাষায় যাকে বলা হয় মেটিরিয়ালিজম। তাঁরা আরও বলতে চেয়েছেন, প্রত্যক্ষে যেটুকু ধরা পড়ে এই লোকায়তিকেরা অর্থাৎ যারা বস্তুবাদে বিশ্বাসী, তাঁরা শুধু সেইটুকুকেই সত্যি বলে স্বীকার করেন।[৩]

এই মতের ধারক পণ্ডিতদের বিবেচনায় পৃথিবীর তাবৎ সাধারণ মানুষ দুটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত : উচ্চ এবং নিম্ন। এই নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই সাধারণ, তাঁরাই লোক। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এরা যেহেতু পরকাল মানে না, ঈশ্বর মানে না; সুতরাং এরা অধ্যাত্মবাদী নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বৌদ্ধ সহজিয়ারা বস্তুবাদী ছিলেন। এরা বর্ণবাদের চক্রান্তে সমাজে শূদ্র এবং অস্পৃশ্য ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।[৪]

কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে, বুদ্ধদেব তো নিজেও বস্তুবাদী ছিলেন। তিনি বেদবিরোধী জীবনকে সার বলে জানতেন। এক্ষেত্রে আমরা কি তাকেও 'লোক' হিসেবে গণ্য করব? বৌদ্ধধর্ম তো শুধু নিম্নশ্রেণীকেই প্রভাবিত করেনি; রাজন্যবর্গ এবং উচ্চশ্রেণীর মানুষও এই ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, চার্বাক ও জৈনধর্মও বেদবিরোধী বিধায় নাস্তিকতাবাদী। এদেরকে লোকায়তিক বলতে দেবীপ্রসাদ আপত্তি করেননি। অবশ্য 'লোক' শব্দের একটি ব্যাপক অর্থ দিতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ বলেছেন, 'প্রত্যক্ষে যতটুকু ধরা পড়ে, লোকায়তিকেরা শুধু সেইটুকুকে সত্য বলে স্বীকার করেন। তারই নাম লোক। লোকই একমাত্র সত্য।'[৫]

'লোক' সম্বন্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করি না। জনসাধারণের একটি বিশেষ অংশ লোকায়তিক ছিলেন, এমন ধারণা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সমগ্র জনগোষ্ঠী বা জনসাধারণকে 'লোকায়তিক' হিসেবে চিহ্নিত করা কোনো অর্থেই সংগত নয় এবং তা যুক্তিযুক্তি হতে পারে না।

অধ্যাত্মদর্শন সম্বন্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য হলো, ভারতবর্ষে অধ্যাত্মদর্শনের বিকাশ ঘটেনি এমন নয়। কিন্তু এই অধ্যাত্মদর্শন একটি সংকীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ ছিল না। তাঁর মতে এই অধ্যাত্মদর্শন শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই বিকাশ লাভ করেছিল।[৬] তিনি বলেন, লোকায়িতকদের কাছে বার্তা বা চাষবাসের চেয়ে বড় বিদ্যা আর

কিছুই ছিল না। আর সেজন্যই তাদের চেতনায় এই মর্ত বা মাটির পৃথিবীই সবচেয়ে বড় সত্য ছিল। দেবীপ্রসাদ বলেন :

> সত্যই কী আশ্চর্য এই 'লোকায়ত' নামটি। এই নামের মধ্যেই খেটে খাওয়ার সংগতিটুকুও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা নামটার মূলে রয়েছে দুটি শব্দ: লোক + আয়াত। ...তাই লোকায়ত মানেও যা, বার্তাকেও একমাত্র বিদ্যা মনে করাও তাই। একই কথা, কৃষকদের কথা। ওরা কাজ করে। ওরা মাটির বুকে ফসল ফলায়। তাই ওদের চেতনার নাম হলো লোকায়ত।[৭]

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। তবে খণ্ডিত অর্থে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা থাকলেও সামগ্রিক অর্থে তাঁর মন্তব্য গ্রহণ করা যায় না। লোকায়ত অর্থে জনসাধারণের দর্শন বোঝা গেলেও তা কেবল বস্তুবাদী দর্শনকেই বুঝায় না। বস্তুবাদকে গ্রহণ করা হলে জনসাধারণের চেতনার ক্ষেত্রকে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সীমিত পরিসরে আবদ্ধ করে ফেলা হয়। জনসাধারণ যে কেবল বস্তুবাদী দর্শনেই বিশ্বাসী হবে এমন নয়; তাদের চেতনার ক্ষেত্র আধ্যাত্মিকও হতে পারে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ অধ্যাত্মচিন্তার একমাত্র যোগ্য অধিকারী নয়, সমাজে যারা অবহেলিত এবং নির্যাতিত, তারাও তার সমান অংশীদার।

বাউল, এই নিগৃহীত জনসাধারণের একটি অংশবিশেষ। এরা বস্তুবাদী হয়েও অধ্যাত্মবাদী, তাই এদের দর্শনকে আমরা লৌকিক অধ্যাত্মবাদী মতাদর্শ বলে আখ্যায়িত করেছি। এরা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষকে জানবার সাধনা করেছে। দেহকে কেন্দ্র করে দেহাতীত জীবন সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা করাই তার লক্ষ্য। মনের মানুষের সন্ধানে বাউল ব্যাপৃত। কিন্তু এই মনের মানুষের অবস্থান অপ্রত্যক্ষ। দেহের অভ্যন্তরে তার আনাগোনা সাময়িক সময়ের জন্য। কিন্তু তার এই সাময়িক অবস্থানে দেহ সুন্দর এবং মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তার নির্গমনে দেহ হয়ে পড়ে 'অসার', মূল্যহীন। বাউল এই মনের মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায় নিজের দেহের মধ্যে; অতঃপর তার সাথে একাত্ম হওয়ার বাসনাই তার সকল সাধনা।

বাউলেরা তাদের সাধনার প্রেক্ষিতে মানুষের জীবনকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে থাকে। একটি, বস্তুকেন্দ্রিক, জৈবিক; অপরটি আধ্যাত্মিক। এমনিভাবে মানবদেহকেও তারা দুটি অংশে বিভাজন করেন। প্রথমটি, ইন্দ্রিয় আচারসর্বস্ব বা কামকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়টি, ইন্দ্রিয়াতীত কামবর্জিত; আধ্যাত্মিক। প্রথম অংশের ক্ষেত্র দেহের নিম্নাঙ্গ এবং দ্বিতীয় অংশ, দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ। বাউলসাধনায় যিনি 'সাঁই', তাঁর অবস্থান মানবদেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে মস্তকে এবং একটি বিশেষ সময়ে তিনি মস্তক থেকে নেমে দেহের নিম্নাঙ্গে অর্থাৎ স্ত্রী-যোনিদ্বারে অবতীর্ণ হন। এই সাঁইকে বাউল কখনও তার পরিভাষায় 'সোনার মানুষ' নামে অভিহিত করে বলেছে : 'সোনার মানুষ ভাসছে

রসে'। কখনও তাঁকে 'মনের মানুষ' নামে আখ্যায়িত করেছে। এই মনের মানুষ ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে, তাঁকে সে বলেছে, 'অজানা মানুষ' 'অধর মানুষ' 'অচিন মানুষ'। কখনও-বা পাখি নামে আখ্যায়িত করে বলেছে 'অচিন পাখি'। আবার তাকে গানে 'চোর' নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাউলসাধক রহস্যমণ্ডিতভাবে গানেও উত্তর দিয়েছেন : 'ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে'। বাউল তার সাধনার বিষয় গুপ্ত রাখতে চায়। তাই সে বলে :

খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে।
কত মণিমুক্তা রেখেছে সে ধনী বোঝাই করে তার দোকানে ॥

বস্তুত, বাউলদের এই সাধনতত্ত্ব একমাত্র দীক্ষিত ব্যতীত অপরের নিকট ব্যক্ত করাকে তারা মহাপাপ বলে গণ্য করে। তারা বলেন, 'রসের কথা অরসিকে বোলো না।' তবু কিছু কথা বাউল তার গানে ইঙ্গিতে বলে যায়, যেমন :

১

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল ॥

(দুদ্দু)

২

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখনা রে মন ভেয়ে
দেশ দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে

(লালন)

৩

বাউল জীবন কারে কয়
কেমন জীবন, বস্তু কী সে
জন্ম কোথায় হয় ॥
যে বস্তু জীবনের কারণ তাই বাউল করে সাধন
জীবন পরম নিরূপণ, বাউলেরা কয় ॥

(দুদ্দু)

বাউল এখনে দেহকে গুরুত্ব দিয়েছে মানবজীবনের পূর্ণতার জন্য। দেহই জীবনের আধার। এই দেহের অভ্যন্তরে যে মূলবস্তু, যার মাধ্যমে জীবন গঠিত হয়; তার যথার্থ প্রয়োগ হলে জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে, তখনই জীবন সার্থক হয়। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে এই মূলবস্তুর স্বরূপ তো সহজে জানা যায় না। বলেছি, এই মূলবস্তুকে বাউল

'সাঁই' নামে চিহ্নিত করেছে। রহস্যচ্ছলে সে তাকে 'চোর' নামে অভিহিত করে তাকে ধরার কৌশল করেছেন নানাভাবে। এ সম্পর্কে একটি গানে বাউল বলে :

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে
সে কি সামান্য চোরা ধরবি কোণা কানছিতে ॥
পাতালে চোরের নহর
দেখায় আসমানের উপর
তিন তারে নিচ্ছে খবর
শুভাশুভ যোগমতে।
হাওয়ায় তার বারামখানা
হাওয়া মূলাধার তাতে।

(লালন)

বলেছি, এই সাধনা দেহবাদী যা এক অর্থে যৌনাচারভিত্তিক যুগলসাধনা। একে বাউল উল্টাসাধনা নামেও অভিহিত করেছে। একটি গানে বাউল বলে :

যদি ছেঁচের পানি মটকায় যায়
তবে সাঁই এর করণ কিছু হয় ॥
যাহাতে মরণ নিকটে
তাই যদি মটকায় ওঠে
তবে তো ঘোর সংকটে তারণ পায় ॥
... ...
... ...
ভাটির স্রোত যাবে উজন
হবে তার সাঁইজির করণ
দীন হীন দুদ্দুর বর্ণন
লালন সাঁইজির কৃপায়।

(দুদ্দু)

কিন্তু বাউলের সাধনা দেহের কেবল এই একটি দিকেই সীমাবদ্ধ নয় দেহের আরো ব্যবহার রয়েছে। সে দেহাতীতকে পেতে চেয়েছে তার দেহের মধ্যে :

১

ও যার আপন খবর আপনার হয় না
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না ॥

(লালন)

এখানে বাউলের দেহবাদ স্থূল যৌনসম্ভোগে নিঃশেষিত হয়নি এবং অধ্যাত্মচেতনায় তা পরিপূর্ণ হয়েছে। বাউলসাধনায় এই আধ্যাত্মিকতা সুফি সাধনাজাত। বাউলসাধনা তাই একটি মিশ্র সাধনা। এদেশে মুসলিম সুফিদের আগমনের ফলে দেহবাদী সাধনায় তন্ত্র এবং যোগের সাথে সুফি আধ্যাত্মিকতা গুরুত্ব পেয়েছে। জালালউদ্দিন রুমীর 'মসনবি' এদেশের সাধকদের জীবনাচরণে একটি নতুন দিকের নির্দেশনা দিয়েছে। মসনবীর আলোচনা প্রসঙ্গে এ. এম. এ. শাস্ত্রী বলেন :

> The Masnavi begins with the lamentation of the heart (soul) for its separation from the body, (origin). All see its manifestation through body. but none understands its real nature. Its activity is a longing for union. A man without such a longing or love is like a bird without wings. The union is attained when the mirror of the heart is purified from the rust of the passions.[৮]

শাস্ত্রী আরও বলেন :

> According to Jalal-uddin, the greatest virtue is love, by which spiritual sentiment is purified and the vision of the Supreme object of love attained. Religious rituals and prayers are good, but the dwelling of the beloved is not in the mosque, temple or church; it is in a pure heart. The essential object is self purification through faith and prayer. Evil is in creatures and not in the creator. Man's chief idol is his animal soul. He sees his own evil reflected in others and without looking at the evil in himself is ready to criticise the evil in others. He admits that man in a way is free-willed, though his will is subordinate to the Divine Will, ...Jalal-uddin is at his best while describing love or unity of the Divine Being and apperas as inspired by higher source.[৯]

শাস্ত্রী, জালালউদ্দিন মন্তব্য প্রসঙ্গে আরও বলেন :

> ...Jalal, like other sufis, belived in the importance of the heart, an immaterial luminous essence, lower than the real self and higher than the carnal soul, It is faced in its inner aspect towfirds the real self and towards the carnal soul in its outer aspect. It is illuminated by one and in turn illuminates the other.[১০]

বলেছি, বাউলসাধনার আধ্যাত্মিকতা সুফিপ্রভাবিত। মানবদেহের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মসনবীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাস্ত্রী জালালউদ্দিন রুমীর উক্তি অনুসরণ করে বলেন :

> A human being undergoes a number of intermediary stages or forms until he develops perfection necessary to appear in human form, and continues further development till he reaches his maximum development. This theory of human evolution is explained in several places in the Masnavis. Jalal says that man experiences the different states of the mineral, plant and animal lives passing from the lower to the higher grades till he reaches the highest summit or material development, in which he is distinguished from other creatures by his powers of judgement and foresight, he proceeds still further to higher and unknown states.[১১]

বাউলদের অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্রবিন্দু এই মানবদেহ। এই দেহ ব্যতিরেকে তার অধ্যাত্মসাধনা নাই। বাউল লালন বলেন :

এমন মানব জনম আর কী হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে ॥
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই,
দেব দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে ॥
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছে এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সু ধারায়
যেন ভরা না ডোবে ॥
এই মানুষে হবে মাধূর্য ভজন
তাইতো মানুষ রূপ গঠলে নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে ॥

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বাউলসাধনার যে-আধ্যাত্মিকতা এক অর্থে তা বস্তুবাদী মতাদর্শের প্রতিক্রিয়ার ফল। এ সম্পর্কে শাস্ত্রী বলেন :

> The extreme type of materialism is bound to end in a reaction towards spiritual and ethical life.[১২]

লোকায়তিক বা বস্তুবাদী মতাদর্শীরা কেবল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করেছে এবং ইন্দ্রিয়সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলে জ্ঞান করেছে। কাপালিক, বৈষ্ণব সহজিয়াদেরকে এই ধারণানুযায়ী লোকায়তিক আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন : লোকায়ত আর কাপালিক মতবাদ এদেশের বিভিন্ন স্থানে আজো টিকে রয়েছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় শুধু নামেই বৈষ্ণব। কেননা বিষ্ণু কিংবা কৃষ্ণ অবতারের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বৈষ্ণব ও সহজিয়াদের কাছে দেহসাধনাই মোদ্দাকথা এবং সাধনা বলতে সবটুকুই কাম সাধনা।[১৩] তাই এই জাতীয় সম্প্রদায়গুলিকে তিনি লোকায়তিক আখ্যা দিতে পক্ষপাতী। যদিও বাউলসাধনার সাথে সহজিয়া, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে, বিশেষ করে সাধনার একটি বিশেষ ধারা সহজিয়া কর্তৃক প্রভাবিত, তথাপি তাদের সাধনা শুধু সহজিয়া সাধনা নয়। সহজিয়া সাধনার 'মহাসুখ' তাদের কাম্য কিন্তু সেইটিই সারবস্তু নয়। সহজিয়াদের কাছে ইহলোক এবং দেহই সব এবং সুখভোগ ছাড়া আর কোনো পুরুষার্থ নেই। বাউলদের নিকট সুখভোগ মুখ্য নয়, মনের মানুষের অনুসন্ধান এবং আপনার জীবনে তার স্বরূপ উপলব্ধিই সার কথা। এই কারণেই বাউলসাধনাকে লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, লোকায়তিক বা সহজিয়া সাধকেরা কর্মফল মানে না কিন্তু বাউলেরা মানে।

একটি গানে লালন বলেন :

যেতে সাধ হয় রে কাশী
কর্মফাঁসী
বাঁধে গলায়
আমি আর কতদিন ঘুরব
এমন নাগর দোলায় ॥
হলো রে এ কী দশা, সর্বনাশা
মনের ভোলায়।
ডুবল ডিঙ্গি নিশ্চয় বুঝি
জন্ম নালায় ॥
বিধাতার সাজা এ কী,
কিবা মন পাজি, ফাঁকি দিয়ে
ফেরে ফেলায়

বাও না বুঝে বাই তরণী
ক্রমে তলায় ॥
কলুর বলদ যেমন ঢেকে নয়ন
পাকে চালায়
অধীন লালন প'ল তেমনি পাকে
হেলায় হেলায় ॥

অপর একটি গানে দুদ্দু শাহ বলেন :

মানুষ রতন চিনলে নারে ভাই
গেলে পুতুল পূজে জনম গো ভাই
যে ভাস্করে গড়ে পুতুল
তার চরণ করিয়া ভুল
পূজে সকল মাটির পুতুল দেখিয়ে তাই ॥
চিনলিনা রে বাংকি সোনা
কিনলি রে মন পেতল দানা
ভবিষ্যতে যাবে জানা, দেখতে পাই ॥
সময়ে করো বেচাকেনা
এমন জনম আর পাবে না
দীনো হীনো দুদ্দুর বর্ণনা, যাইরে গাই ॥

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে বাউলসাধকেরা একদিকে যেমন লৌকিক জীবনকে অস্বীকার করেনি তেমনি অধ্যাত্মসাধনাকেও তারা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। বস্তুত, লৌকিক এবং অধ্যাত্মসাধনা উভয়ই এই সাধনার মৌল বিষয়। তাই একে লৌকিক অধ্যাত্ম নামে অভিহিত করা সংগত।

দুই

বলেছি, বাউলসাধনা একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী মতাদর্শ। অর্থাৎ এই সাধনা একদিকে যেমন লৌকিক তেমনি অধ্যাত্মচেতনা নির্দেশকও বটে। বাউলসাধনায় যে লৌকিক প্রভাব তা তান্ত্রিক এবং যোগনির্ভর। তন্ত্র সম্বন্ধে অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত এই যে, তন্ত্র বাংলার আদিম ধর্ম। এই তান্ত্রিক ধর্ম সম্বন্ধে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

> Tantrism with its heterogeneous nature is neither exclusively Hindu, nor exclusively Buddhist in origin. It is an ancient religious cult of India manifesting itself somethimes as Hindu being associated with Hindu theology, thoughts and ideas and sometimes as Buddhist in association with later Buddhist thoroghly, thoughts and ideas :[১৪]

তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন :

> Tantrism seems to be religious under-current, originally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in the religious history of India.[১৫]

আমরা আমাদের আলোচনায় তন্ত্রের উৎস নিয়ে জল্পনাকল্পনা করতে চাই না। বরং কীভাবে এই তন্ত্র আমাদের সাহিত্যে ও জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে তার আলোচনার পক্ষপাতী। তন্ত্র সাধনার মূলকথা কায়াসাধনা বা দেহসাধনা। তন্ত্রের এই দেহসাধনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন :

> "যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।" "অর্থাৎ যে গুণাঃ সন্তিতে ভিষ্টন্তি কলেবরে।" ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই সকলে তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ...তন্ত্রের প্রায় সকল সাধনা ও আরাধনার দুইটি দিক আছে। একটি বাইরের বা বিশ্বতত্ত্বের দিক, আর একটা ভিতরের বা দেহতত্ত্বের দিক। সকল সিদ্ধিরই বিকাশের দুইটি দিক আছে। একটা জগতের বাহ্য প্রকৃতিক দিক, অপরটা ভিতরের বা দেহগত প্রকৃতির দিক। তুমি আত্মশক্তি বিকাশের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পার।...তন্ত্র বলিতেছেন যে, যখন ব্রহ্মাণ্ড দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদানের সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যে একই ভাবে নানা শক্তির খেলা হইতেছে; তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল, সহায়ক হইবে। এদেশের সিদ্ধগণ বলেন, যে মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই। এমন যন্ত্র আর কেহ গড়িতে পারে না, এমন যন্ত্র নির্মাণ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব এই যন্ত্রে সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে অন্য কোনো স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।...প্রকৃতির সকল গুপ্ত বা সম্মূঢ় শক্তির কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কীভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা। এই তন্ত্রসাধনার মূল হইল দেহতত্ত্ব। তাই দেহের কথা লইয়া তন্ত্র আগাগোড়া ব্যস্ত।'[১৬]

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> And this Tantrism, was in a very important sense, the extreme form of Deha-Vada Deha, that is the material human body, as conceived by Tantrism, was a microcosm of the Universe itself."[১৭]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

> যে পদ্ধতিক্রমে নর-নারীর সংযোগে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্ব-সংসারের উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষের প্রভাবে নূতন জীবে আমিত্বের বোধ ফুটিয়া ওঠে, দেহের মধ্যে যাহা কতকটা স্থিতিবাচক, তাহারই সৃষ্টি হয়, আর নারীর প্রভাবে দেহের নাম ও রূপ যাহা কিছু পরিবর্তনশীল তাহারই সৃষ্টি হয়। তাই তন্ত্র অনুমান করেন যে মেদ, মজ্জা, অস্থি, নখ প্রভৃতি পিতৃবীর্যে সৃষ্ট হয়; মাতৃ রজেঃ শোণিত, মাংস, চর্ম, কেশ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। তেমনি বিশ্ব-সংসারে পুরুষ-প্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ ও মূলপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্পন্দনের, কম্পনের ভাব অনুভূত হয়। এই স্পন্দনের জন্যই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিয়োগ ও মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি বা পতন, আর সেই বিন্দুর মধ্যে সৃষ্ট প্রকৃতির লীলা হইতে থাকে, সেই লীলার ফলেই বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ। ইহাই হইল বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে সমতাবিষয়ক গোটাকয়েক মোটাকথা।[১৮]

এই তন্ত্র সাধনার মূলে একটি অধ্যাত্মচেতনা সক্রিয় ছিল কিন্তু কালে তা পরিবর্তিত হয়ে লোকায়তরূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ দেহই একমাত্র সত্য এবং দেহোত্তর আত্মার কল্পনা অবাস্তব। এই দেহই একমাত্র সারবস্তু মনে করাতে তন্ত্রসাধনার বিপর্যয় ঘটল। এবং তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল বৌদ্ধ সহজিয়াদের উপর।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী বলেন :

> Some of the sects of degenerated Buddhists, in which laxity in sexual morals was one of the features, beame gradually affiliated to the lokayata school. One of these sects was the Kapalika sect. The Kapalikas are a very ancient sect. They drink wine, offer human sacrifices and enjoy woman. They strive to attain ther religious goal with the help of human corpses, wine and woman... As Kama or the enjoyment of sensual pleasure was the goal of this sect. It came gradually to be affiliated to the Nastika form of the Lokayata school according to which the summum bonum of the human life is... the enjoyment of gross sensual pleasure.[১৯]

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী অবশ্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অনুসরণ করেই এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে :

> এই সহজিয়া সম্প্রদায় বা সহজযান আসলে বৌদ্ধ অধঃপতনের ফলেই গড়ে ওঠে।... বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, সহজযানরা যে মত প্রচার করিলেন তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম নেড়া নেড়ীর দলে গিয়া দাঁড়াইল।[২০]

এই সহজিয়াদের সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুসরণে ড. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী আরও বলেন :

> They (Sahajias) believe that deha or the material human body is all that should be carved for their religious practices connected with the union of men and woman.[২১]

এই সহজিয়া সাধনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি সাধনা। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

> Another thing that deserves special attention in connection with the yogic practice of the Sahajiya Buddhist is the conception of the female force. In the 'Carya-songs' we find frequent reference to this female force variously called as the Chandi, Dombi, Savari, Yogini, Nairamani, Shajia-sundari etc. and we find frequent mention on the union of the yogin with this personified female diety.[২২]

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত অবশ্য এই স্ত্রীশক্তিটিকে তন্ত্রপ্রভাবজাত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

> This conception of Sakti of the Buddhist Sahajiyas is an adoption of general Tantric conception of the Sakti.[২৩]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রকৃতি সাধনাকে কামাচারী সাধনা বলে মনে করেন। তিনি বলেন :

> যোগাচার মতে যেমন কিছুই থাকে না বিজ্ঞান মাত্র থাকে, সহজমতে কিছুই থাকে না আনন্দ মাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনও-বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রী পুরুষ সংযোগজনিত সুখ।[২৪]

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত সহজিয়া সাধনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এই সম্প্রদায়ের আদি অকৃত্রিম রূপটির সঙ্গে বৌদ্ধ এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধ্যানধারণার মৌলিক বা আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে বহুপূর্ব থেকেই এদেশে একটি পুরনো সাধনাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল যার সঙ্গে পরে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং বৈষ্ণবধর্মের নানা ধ্যানধারণা মিশেছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

> Side by side with the community known theological speculations and religious practices there has been flowing in India an important religious under-current of esoteric yogic practices from a pretty old time, these esoteric practices when associated with the theological speculations of the Saivas and the Saktas have given rise to Saiva and Sakta Tantrism, when associated with Buddhistic speculations, have given rise to the composite religious system of Buddhist Tantricism and again when associated with the speculations of Bengal Vaisnavism, the same esoteric practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite cult, known as Vaisnava Sahajiya movement.[২৫]

এই সাধনপদ্ধতিকে ড. দাশগুপ্ত একপ্রকার গুহ্য যোগসাধনা নামে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন :

> এই গুহ্যসাধনার প্রধানতম অংশ হলো যৌনসুখকে যোগপদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে অতীন্দ্রিয় আনন্দে পরিণত করা। তার ফলে দেহ ও মন উভয়ের শক্তি বা বল বৃদ্ধি হয়। এই যোগসাধনা ও তার অন্যান্য ভাবনার সঙ্গে শিবশক্তিমূলক দর্শনের যোগাযোগ হয়ে হিন্দুতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। এবং তারপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে উপায়মূলক চিন্তার যোগাযোগ হয়ে বৌদ্ধতন্ত্র এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এবং এই ধারার সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রস-রতি কল্পিত রাধা-কৃষ্ণের ধারণা যুক্ত হয়ে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের জন্মে হয়েছে।[২৬]

অর্থাৎ ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, আমাদের দেশে আদিকাল থেকেই এই তান্ত্রিক যোগসাধনা সক্রিয় ছিল। তিনি এই তান্ত্রিক যোগপদ্ধতিটিকে *Sexo-yogic practice* নামে অভিহিত করেছেন। তন্ত্রের এই যোগসাধনার মূলকথা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন :

> The most important of the secret practices is the yogic control of the sex pleasure as to transform it into transcendendental bliss, which is at the same time conductive to the health both of the body and the mind.[২৭]

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই তান্ত্রিক যোগসাধনার মূল লক্ষ্য রতিনিরোধ বা Yogic control of the sex pleasure বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই মতে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেননি। তিনি বলেন :

> ...আমাদের পুঁথিপত্রের মধ্যে আজো যেখানে যোগসাধনার আদিরূপটির কথা স্মারক হিসাবে টিকে রয়েছে, সেখানে রতিনিরোধের বিপরীত উপদেশও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন যোগ সম্পর্কে উপনিষদে বলা হয়েছে, "রজসো রেতসো যোগাদ রাজযোগ ইতির্স্মত"[২৮]

দেবীপ্রসাদ আরও বলেন : তান্ত্রিক যোগসাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো : মৈথুন। তাঁর মতে, প্রয়োগ ও নিরোধ উভয়বিধ প্রক্রিয়াই তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গ।[২৯] বাউলগানে এই তান্ত্রিক যোগসাধনার পরিচয় রয়েছে :

১

কিভা শোভা দ্বিদলের পরে।
একরাশ মণিমানিক্যের রূপ ঝলক মারে ॥
আলোকসম্ভব যে নিত্য গোলক
তাহে বিরাজ করে পূর্ণ ব্রহ্মলোক
হলে দ্বিদল নির্ণয়
সব জানা যায়,
বাধা থাকে না সাধন দ্বারে ॥
শত কিংবা সহস্র দল
রসরতি করে চলাচল
তার দ্বিদলেতে স্থিতি, বিদ্যুৎ আকৃতি
ষড়দলে বারাম যুগান্তরে ॥
ষড়দলে সে তো ষড়তত্ত্ব হয়
দশম দলে মৃণাল গতি গঙ্গা বয়,
ও যে তিন ধারা তার, শ্রী গুণ বিচার
লালন বলে গুরু অনুসারে ॥

২

ষড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে
যার নাম অধরা ॥
শাক্ত শক্তি বুঝে সে রূপে যে মজে
বৈষ্ণবের বিষ্ণরূপ নিহারা ॥
বলে সপ্তপন্থীর মত সপ্তরূপ বেষ্টিত
রসিকের মন নয় তাতে বড়
রসিকের মন, রসেতে মগন
রূপ রস জানিয়ে খেলছে তারা ॥
করে পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞান পঞ্চরূপ বাখানি,
রসিক বলে সেও তো লীলারূপ গণি
বেদ বিধিতে যার লীলার নাই প্রচার
নিগুম শহরে সাঁইজি মরা ॥

যে জন ব্রহ্মজ্ঞানী হয় সেও তো কথায় কয়
না দেখে নাম ব্রহ্মসার করে হৃদয়
স্বরূপ দর্পণে রূপ দেখে নয়নে,
লালন বলে রসিক দীপ্ত যারা ॥

বাউলগানে এই তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ কেউ এই প্রভাবকে বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া প্রভাব বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের অনেক পূর্ব থেকেই তন্ত্র সমাজজীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের সময় তন্ত্র খুব স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন যানসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বলা যায় যে বৌদ্ধধর্মে বা যানে যে তান্ত্রিক মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় তা বৌদ্ধধর্মের কোনো নিজস্ব মতাদর্শ নয়। ক্ষিতিমোহন সেন উল্লেখ করেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের সময়ে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে এবং অঞ্চলভেদে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন নাম বা পরিচয় থাকলেও সাধারণভাবে এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীদেরকে 'সহজিয়া' নামে চিহ্নিত করা হয়।[২৯-ক] এসব সহজিয়া সাধনসম্প্রদায় সব শাস্ত্রাচারকে অস্বীকার করে নানা পদ ইত্যাদি রচনা করলেও বৌদ্ধধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠান তারা অনুসরণ করেছে। পরবর্তীকালে এসব সাধনগোষ্ঠীর অনুসারীবৃন্দ বৈষ্ণব সহজিয়া এবং বাউল মতাবলম্বী হলেও তারা অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগসাধনা অনুসরণ করে আসছে।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের যুগে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধকেরা জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রচলিত সব রীতিনীতিকে পরিত্যাগ করেছিল। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন :

> The Tantrikas proclaimed the essential equality of all men and of all women and along with it, the rejection of the traditional marriage morals. Anandagiri in his 'Samkara Vijaya', discribed the followers of 'Ucchista Ganapati' as belonging to the vamacari cult. According to him, they proclaimed : "However according to our cult there are two fundamental creeds (Dharma) to be followed. All the females belonging to the various castes shoule be (treated) as one caste. This is our creed. All the females belonging to the various castes should be (treated) as one caste. This is the other creed. There is no sin in their mutual union or separation. There is no rule

as 'such a man is the husband of such a woman'... All the castes being but one caste, the institution of marriage is a fiction." This is simply starling. Nevertheless, this does represent the standpoint of real Trantrism.[৩০]

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ উপর্যুক্ত মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। এ সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

The formal rules and regulations of religion were also severely criticised by the Sahanjiyas. The most penetrating and scathing criticism was made by Sarahapada in his 'Dohakosa'. His first revolt is against the orthodox system or the fourfold division of colours (coturvarna) placing the Brahmins at the top, Saraha says, that the Brahmins as a caste cannot reasonably be recognised to be the highest of men. for the saying that they dropped from the mouth of Brahma is a myth invented by a section of clever and cunning people; if on the other hand, a man becomes Brahmin by religions initiations (samskara) then even the lowest of men may be a Brahmin. If a man becomes a Brahmin by reciting the Vedas. Let the people of the lower classes also recite the Vedas and they will also become Brahmin and they also do read the Vedas for, they read grammar which contains many words to the Vedas."[৩১]

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সহজিয়াদের এই বিদ্রোহে নিঃসন্দেহে সমাজজীবনে আলোড়ন এসেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড ঘৃণা সমাজের লাঞ্ছিত, নিগৃহীত এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে একত্রিত হতে সাহায্য করেছে। তবে এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামের বর্ণহীন সমাজব্যবস্থার কারণে। সুফি-ফকিরদের সাহচর্যে এসে তাদের জীবনবোধেও পরিবর্তন এসেছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য আমলে সহজিয়া ভাবনাপুষ্ট যেমন ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল, তাতে অনেক মুসলমান খ্রিস্টান এবং ব্রাহ্মণ-অনুসারী ছিল।

...They gather recruits from all religions. There are Mahamedans. Christians and Brahmins amongst them... The Sahajiyas are free from all caste prejudices."[৩২]

জাতিভেদ এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড বিদ্রোহ যখন সমাজের সাধারণ এবং নিগৃহীত মানুষের একটি সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হলো তখন তারা নিজেরাই মূলধর্মের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠী সৃষ্টি করল এবং তন্ত্রের অনুসরণে তারা মানবদেহকে সাধনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করল। এ সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

...along with the uncompromising spirit of revolt against all formalities and orthodoxy in religion, great emphasis is laid in the Sahajiya literature of the human body. which is conceived as a microcosm of the universe. This feature, we have hinted, predominates in all the Tantras in general, wherever the yogic element prevails, but as the Sahajyas laid their whole stresses on the yogic element this theory of the body being the epitome of the whole universe was most emphasised.[৩৩]

তন্ত্রের মতে বিশ্ব এবং মানবসৃষ্টির মূলে কামাচারিতা মুখ্য ছিল। এই কামাচারিতা প্রকৃতি বা শক্তিকেন্দ্রিক। নারীই শক্তি। দেবীপ্রসাদ বলেন :

According to Tantra, the universe was created by sexual urge (Kama); it was born or the female (vamodbhava) and as the result of her union with the male.[৩৪]

অর্থাৎ তন্ত্রমতে নারী এবং পুরুষের যৌনকামনা থেকেই এই বিশ্বের সকল কিছুর উদ্ভব। পরবর্তীকালে এই ধ্যানধারণা শাক্ত, শিব, বৌদ্ধতান্ত্রিক, সহজিয়া, বৈষ্ণব এবং বাউলদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। তন্ত্রের এই ধারণার বিকাশে এদেশের বিভিন্ন ধর্মে কামাচার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

Among the Buddhist tantrikas there originated a sect called Kamavajrayana, based on the view that of the universe followed the same principles. ... the text or this school are full of obscure details as can hardly be published for the general readers. According to this sect, the universe is created by Kama exactly as human beings are...Their ritual practice aim at establishing a harmony between cosmic lust and human lust. They were, therefore, continually indulging in Kamasadhana. They exhibited this lust on the temples and monasteries... I am of the opinion that the temple of Jagannatha (Puri) was originally built under the influence of these Kamavajrayanas.[৩৫]

নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

১

আছে দীন দুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা।
কাজের সময় পরশমণি অন্য সময় কেউ চেনে না ॥
নবী অলি এই দুজনে
কলমাদাতা দল আরেফিনে
বে কলমায় সে অচিনজনে
পীরের পীর হয় জানো না ॥
যে দিন সাঁই নৈরাকারে
ভাসলেন একা একেশ্বরে।
সেই অচিন মানুষ তারে
দোসর তৎক্ষণা ॥
কেউ তারে জেনেছে দড়ো
খোদার ছোট নবীর বড়ো
লালন বলে নড়চড়
সে নইলে দর পাবা না ॥

এই গানটিতে বাউলসাধক 'সাঁই' এর স্বরূপ বর্ণনায় শক্তিরূপ অচিন মানুষের উল্লেখ করেছেন। এই অচিন মানুষ খোদার সমকক্ষ নয়, তবে তিনি নবীর বড় এবং তার সাহায্য বিনা সাধনায় সফল হওয়া যাবে না। এ ধারণা পরিপূর্ণভাবে তান্ত্রিক ভাবনাজাত। তান্ত্রিক যোগসাধনাভিত্তিক আর একটি গান :

যে সাধনে জোর কেটে যায় কর্ম ফাঁসী
যদি জানবি সে সাধনের কথা হও গুরুরদাসী।
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর
নপুংসুককে শাসিত করো
আছে যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের উপর
তারে প্রকাশি ॥

মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
রসিকের তেমনই করণি
ও সে আকর্ষণে আনে টানি
ক্ষীরোদ শশী ॥

করণ সমুদ্রের পারে
গেলে পায় অধর চাঁদেরে
অধীন লালন বলে নৈলে ঘুরে
মরবি চৌরাশী ॥

এই গানটিতে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব রয়েছে। 'চৌরাশ' অর্থ চারিকাল বুঝিয়েছে। বাউলসাধনায় শাক্ত এবং শৈব উভয়তন্ত্রের প্রভাব রয়েছে।

জগৎ শক্তিতে ভুলালে সাঁই
ভক্তি দাও হে যাতে চরণ পাই ॥
রাঙা চরণ দেখব বলে
বাঞ্ছা সদায় হৃদকমলে
তোমার নামের মিঠায় মন মজেছে
রূপ কেমন তাই দেখতে চাই ॥
ভক্তিপথ বঞ্চিত করে
শক্তি পথ দিছ তারে
যাতে জীবব্রহ্মাণ্ডে ঘোরে
কাণ্ড তোমার দেখি তাই ॥

তরণের যোগ্য মন নয়
তথাপি মন ঐ চরণ চায়
অধীন লালন বলে হে দয়াময়
দয়া করো আজ আমায় ॥

কিন্তু বাউলসাধক জানে, শাক্ততন্ত্রের সঙ্গে বাউলের পার্থক্য রয়েছে। নিম্নের গানে তার পরিচয় রয়েছে :

কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়
বিন্দুর সন্ধান দেখে শুনে সাধন করতে হয় ॥
শাক্ত তন্ত্র সাধন করে
পেত যদি চাঁদেরে
তবে বৈরাগীরা কেনে
আবাল গুদড়ি টেনে
কুলের বাহির হয় সেই চরণ বাঞ্ছায় ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী যারা
সদায় বলে তারা
শাক্ত বোষ্টমের নাই মূল পরিচয় ॥
শুনে ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য
দরবেশ করে তর্ক
ব্রহ্মজ্ঞান যার নাই
নাম ব্রহ্ম কি পায়
লালন কয় দরবেশে এ কী কথা কয় ॥

ইতঃপূর্বে আমরা কামবজ্রযানিদের সম্পর্কে আলোচনায় পুরীর জগন্নাথের মন্দির সম্পর্কে তাদের ধারণার কথা উল্লেখ করেছি। এই মন্দির সকল ধর্ম জাতির জন্য বড় আশ্রয়স্থল ছিল। বর্ণবাদ ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা প্রচণ্ড প্রতিবাদমুখর ছিল। তারা ঘোষণা দিয়েছিল যে পৃথিবীতে মাত্র দুটি জাতি–একটি পুরুষ, অপরটি নারী। নিম্নশ্রেণী এবং অস্পৃশ্য সকলেই এক জাতি। সুতরাং তাদের মধ্যে বিবাহের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ফলে যৌনাচার সমাজকে চরমভাবে কলুষিত করে ফেলেছিল। তবে এই কামাচারিতার মর্মমূলে যে বিশ্বাস সক্রিয় ছিল তা এ-কারণে যে, কামাচারিতার মাধ্যমেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সংগঠিত হয়েছে।[৩৬]

এই প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি প্রদান করেন :

> I am of opinion that the temple of Jagannath (Puri) was originally built under the influence of these Kamavajrayanis. The place of the goddess Vimala (the Puri temple) was sacred to them... It was in this Sri mandira (another name of the Pari temple) that the harmony was achieved between cosmic creation and the creation of the human body. In all these obscene sculptures, every male is a Buddhist monk of the Kamavajrayana school and every female is a devadasi or female votary. The whole temple was built on the princples of the Kamavajrayani Buddhism.[৩৭]

১৯৮০ সালে উড়িষ্যার কোনারকের মন্দির এবং পুরীর জগন্নাথের মন্দির দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটি আন্তর্জাতিক নৃবিজ্ঞান সম্মেলনে অংশগ্রহণের সময় এই দুটি মন্দির দেখেছিলাম। এই সম্মেলনে একজন আমেরিকান মহিলা দেবদাসীদের উপর গবেষণা করতে গিয়ে নিজেও 'দেবদাসী' হয়েছিলেন। বস্তুত, উড়িষ্যার মন্দিরের গাত্রে যে কামাচরিতার ছবি উৎকটভাবে উৎকীর্ণ তা বৌদ্ধতান্ত্রিকদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কারণেই ঘটেছিল।

ইতঃপূর্বে চৈতন্যদেব সম্পর্কে আলোচনায়ও আমরা এই পুরী-মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছি। বাউলসাধক লালন ফকির এই পুরীর মন্দির সম্বন্ধে তাঁর গানে বলেন :

একবার জগন্নাথে দেখরে যেয়ে জাত কেমন রাখ বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই লয় খেয়ে ॥
জোলা ছিল কবীর দাস
তাঁর তোড়ানি বারো মাস উঠছে উথলিয়ে।
সেই তোড়ানি খায় যে ধনী সেই আসে দরশন পেয়ে ॥

ধর্ম প্রভু জগন্নাথ
চায় নারে সে জাত অজাত
ভক্তের অধীন সে
যত জাত বিচারী দুরাচারী
যায় তারা সব দূর হয়ে ॥
জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়া।
লালন কয় জাত হাতে পেলে পুড়াতাম
আগুন দিয়া ॥

সুতরাং এ-কথা বলা অসংগত নয় যে বাউলগানেও হাজার বছর আগের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার ধারা অদ্যাবধি প্রবহমান। প্রায় সব বাউলগানেই অল্পবিস্তার তান্ত্রিক যোগসাধনার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তবে বাউলগান কেবল তান্ত্রিক সাধনার প্রতিফলন নয়। এই সাধনায় তান্ত্রিক সাধনার নানা দিকের অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায় ঠিকই, তবে তা সাধনার প্রধান অঙ্গ নয়। এই সাধনায় অনুরাগ এবং ভক্তির প্রাধান্য রয়েছে। স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের প্রতি গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। তবে তাকে শুদ্ধ প্রেম হিসেবে উপস্থাপনার একটি প্রচেষ্টাও আমরা লক্ষ করি। যেমন :

শুদ্ধ প্রেমরাগে সদায় থাকরে আমার মন।
সোঁতে গা ঢালান দিও না বেয়ে যাও উজন।
নিভাইতে মদন জ্বালা
অহিতুণ্ডে করগে খেলা
উভয় নেহার উর্ধ্বতালা প্রেমের এই লক্ষণ।
একটি সাপের দুটি ফণি
দো-মুখে কামড়ালেন তিনি
প্রেমবাণে বিক্রমে তার সনে দাও রণ ॥
মহারস মুদিত কমলে
প্রেমশৃঙ্গারে লও রে খুলে
আত্ম সামাল সেই রণকালে
কয় ফকির লালন ॥

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাউলসাধনায় সহজিয়া সাধনার প্রভাব লক্ষ করে বলেন :

> When we shall analyse the tenets of the Bauls as embodied in their songs that are available to us, we shall find that the doctrines of the earlier Sahajiya form the real background

of their religion. Although Sufism of Islam have introduced a new spirit in it... . In speaking of the earlier Sahajiya background of the Bauls we mean mainly the schools of Buddhist Shajiya and of Vaisnava Sahajiya... . But the earlier Sahajiya cult underwent a notable transformation in the hands of the Bauls; for the Bauls, by derivation and innovation, effected a great change both in the ideology and practice of the Sahajiyas.[৩৮]

এই প্রসেঙ্গ উল্লেখযোগ্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিশেষভাবে সুফিপ্রভাবজাত। বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'সহজানন্দ' বাউল সাধনায় ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরও বলেন :

But the Bauls conceived Sahajiya as the innermost eternal Beloved, who is the 'Men of the Heart' (maner manush). The Bauls also speak of love and union, but this love means the love between the human personality and the Divine Beloved within and in this love man realises his union with the Divine or in other words he merges his personal existence in the Beloved that resides within this temple of the body. Great has been the influence of Sufism of the Bauls in the evolution of this new conception of Sahajiya and in the difference in their religious approach.[৩৯]

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাউলসাধনাকে একটি মিশ্রসাধনা বলে মনে করার পক্ষপাতী। তান্ত্রিক যোগসাধনা যে বাউলসাধনায় একটি ভিন্নতর রূপ নিয়েছে এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর মতে বাউলসাধনা সহজিয়া মতবাদ এবং সুফি মতবাদের একটি সমন্বিত রূপ। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই চিন্তাধারার সাথে আমরা একমত। কিন্তু গোল বেধেছে যখন ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাউল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু বা সত্যিকার রূপটিকে সহজিয়া সাধনা বলে উল্লেখ করেন।[৪০]

এ সম্পর্কে এডওয়ার্ড সি. ডিমক একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন :

The doctrines and the poetic language of the unusual sect known as the Bauls are indeed in some respects similar to those of the Sahajiyas. But I do not think it can be said that the majority of those who are called Bauls are Sahajiyas.[৪১]

বাউলদের একটি পরিচিতি দান প্রসঙ্গে ডিমক উল্লেখ করেন :

A Baul is one who dressed in tattered caste off garments diliberately made up of remnants or clothing previously worn by both Hindus and Muslims, wander incessantly, living on whatever those who listen to his songs, which are his only form of worship, chose to give him, The rags on his shoulders are reminiscent of those of the 'durves', the saint of Sufi Islam, to whom the Baul is similar in other respects as well. He plays a primitive but haunting one stringed instrument called ek-tara, and the song he sings are beautiful in melody and thought, as gentle and as stiring as the wind which is his home. The baul is thought mad because he goes diliberately and powerfully against the current of custom.[৪২]

বাউলসাধনায় সুফিবাদের প্রভাব উল্লেখ করতে গিয়ে ডিমক আরও বলেন :

One thing seems certain, and that is that the Bauls drew upon the same spirit of iconoclastic Shakti which swept across northern India between the fourteenth and the seventeenth centuries, inspiring Ramananda, Tukuram, Kabir, Nanak, Dadu and Caitanya, the so-called Santa cults through which the effects of Sufi Islam show clearly.[৪৩]

এই গ্রন্থের অন্যত্র ডিমক লালন ফকিরের একটি গানের সাথে সুফি ফকিরদের রচনার তুলনা করেন।

The famous Baul Lalon Phakhir sings of a mirrored city :

I have never seen him,
Though he is my neighbour,
though he dwells in a mirrored city
near my house,
For around that city is moat,
bottomless and endless :
there is no way to reach the farther shore.
My heart yearns to see him,
but I can never reach his city.

This is the mirror of the heart, of which the Sufi poet Jalaluddin Rumi writes : "In the mirror or the heart is the reflection of your Friend; bow your head a moment, and see it there." The Nightingale singing in the Shirrazi Garden of the great Sufi poet Hafiz becomes the elusive bird or the heart of the Baul, trapped within the rib cage of this body, yet unknown. And it becomes again the bird of heart of Rabindranath Tagore :

Even though slow and sluggish
evening comes,
and stops as with a gesture
your song;
even though you are above
in the infinite sky
and in terror you utter
a silent mantra
to horizons hidden by the veil
Bird, O my bird,
though it is darkening
do not fold your wings,

And there is abundant use of Sufi technical terminology in the Baul songs. That there was considerable interaction between the sufis and the Bauls is undeniable.[৪৪]

এই প্রসঙ্গে সুফি এবং বাউল ভাবনার একটি পদের উল্লেখ করা যায় :

সাঁই দরবেশ যারা
আপনারে ফানা করে অধরে মেশে তারা
মন যদি হবি রে ফকির
নাও জেনে সেই ফানার ফিকির ধরো অধরা
ফানার ফিকির না জানিলে
ভস্ম মাখা হয় মস্করা ॥

কিন্তু ডিমক বাউলসাধনা প্রক্রিয়ায় সুফিপ্রভাব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তিনি বলেন :

The doctrinal and poetic similarities between Bauls and Sufis are plentiful. But whether it is fair to conclude that Sufi Islam influenced the Bauls in the areas of the religious usage of song and dance, the importance of the Guru (the Sufi Mursid), opposition to external religious practices, the conception of man as the microcosm and the connecting link between the divine and phenomenal creation, and the conception of God as the Beloved, is atleast doubtful, For we have seen that most of the characteristics are present also in the very old Sahajiya tradition.[৪৫]

ডিমকের এই সন্দেহ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিরসন করেছেন।[৪৬] এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই আমরা তা আলোচনা করেছি। বাউলসাধনায় সহজিয়া এবং তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের ভাবনা ও শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। বাউলগানে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার রয়েছে, যা একান্ত করেই তন্ত্র এবং সহজিয়া ভাবনা নির্দেশক। যেমন স্বরূপ, ত্রিবেণী, দ্বিদল, চতুর্দল, ষড়দল, শতদল, সহস্রদল, কারুণ্য, তারুণ্য, লাবণ্য, পৌর্নমাস, চারিচন্দ্র, মূলধার, রেচক-পূরক, কুম্ভক, যুগল, রোহিণী-সংযোগ, চক্রভেদ, রাধা-কৃষ্ণ এবং এ ধরনের আরও অনেক শব্দ। সহজিয়া সাধকদের মতো বাউলসাধকও দেহকে সার বলে ভেবেছেন। এই দেহে তার পরমার্থ লীলাচ্ছলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সহজিয়া সাধকদের মতোই বাউলেরা বেদ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এখানে বাউলসাধকের সাথে সুফিসাধনার মিল সহজিয়া সাধনা অপেক্ষা গভীর। ডিমক পরে তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন :

As to the Sahajiyas the Vedas and the Vedanta are to the Bauls not only unprofitable ways but delusive and downright dangerous... But and here they differ from the Sahajiya belief and are closer to the spirit of sufism. To the Bauls all external ritual, Vaisnava or Tantric, Hindu or Muslim is meaningless and foolish.[৪৭]

তান্ত্রিক এবং সহজিয়া সাধকেরা বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন সত্য, কিন্তু বাউলদের এই প্রতিবাদ অত্যন্ত জোরালো। তারা বর্ণবৈষম্যকে তীব্রভাবে ঘৃণা করেছেন।

বর্ণবৈষম্য এবং জাতিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বাউলেরা সুফিসাধকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ডিমক তা স্বীকার করেছেন।

Like the Sufi, who, from the heights of wisdom, sees all men as the same, to the Baul, there is no difference between Hindu and Muslim, A godly man is neigher.[৪৮]

এ সম্পর্কে বাউল লালন বলেন :

ভক্তির ডোরে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই ॥
ভক্ত কবীর জাতে জোলা
প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ালা
ধরেছে সেই ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তাই।
রামদাস মুচি এই ভবের পরে
পেল রতন ভক্তির জোরে
তার স্বর্গে সদাই ঘণ্টা পড়ে
সাধুর মুখে শুনতে পাই ॥
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হল
ফকির লালন কয় মিছে কল
কেন করিস সদায় ॥

ডিমকের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত :

> While not quite Sahajiyas, the Bauls are fitting hybrids; the Vaisnava, Sahajiya and Sufi strains yield beauty, sympaty and strength. From the Vaisnavas, and from the Sufi, comes the Baul vision of the warmth and humanness and love of God. From the Sahajiya comes their conviction of his compelling immediacy. In the songs of the Bauls is felt the power of divine love, here graced with human dignity.[৪৯]

অর্থাৎ ডিমকের সাধনায় বাউলসাধনায় সহজিয়া, বৈষ্ণব এবং সুফিধারার পরিচয় রয়েছে। তবে এই সাধনায় কতটুকু সহজিয়া এবং বৈষ্ণব এবং কতটুকু সুফিপ্রভাব রয়েছে তা কোনো নিক্তিতে তুলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সহজিয়া বৈষ্ণব এবং সুফিধারা বাউলসাধনার সাথে সম্পূর্ণ একত্রিত হয়ে একটি মিশ্রভাবনার জন্ম দিয়েছে এবং এই মিশ্রভাবনা এদেশে ইসলামের আবির্ভাবের পরেই সংঘটিত

হয়েছে। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তও তা স্বীকার করেছেন। ইসলাম যে এদেশের জনগণের উপর তীব্র প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে সব ঐতিহাসিকই একমত পোষণ করেন। এ সম্পর্কে A. M. A Shustery বলেন :

> The monotheistic doctrine of Islam gradually and unconsciously spread among all classes of Hindus and cast its influence, subtle in form but nonetheless effective, not only on religious beliefs but also on high philosophical conceptions. Several new religious movements started in India as the result of such influences..[৫০]

বাউলসাধনায় ইরানীয় সুফিধর্মের সমন্বয় ঘটেছে এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। তবে এই সাধনার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে এই সাধনার ইতিহাস আরও দূরবর্তী বলে মনে হয় এবং সেক্ষেত্রে 'বা'আল' সাধনার সঙ্গে বাউলসাধনার একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রত্যক্ষ করা যায়।

তিন

প্রশ্ন উঠেছে : বাউলসাধনায় যে লৌকিক সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে তন্ত্র ও যোগসাধনা, তা কি আর্যসমাজের অবদান না এর উৎস অনার্য সংস্কৃতি?

এর উত্তর এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়।

অবশ্য এমন ধারণা কেউ কেউ করেন যে শ্বেতাঙ্গ আর্যদের সাথে একদল কৃষ্ণাঙ্গ আর্যও এদেশে আসে। তাদের আদি নিবাস ইরান বা পারস্য। এই কৃষ্ণাঙ্গ আর্যরা কাবুলের পথ ধরে কাশ্মীরের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশে আগমন করে। এবং এরাই এদেশে তন্ত্র ধর্ম আনয়ন করে।[৫১]

এই মতবাদের পেছনে তেমন কোনো ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায় না। তবে তন্ত্র যে এদেশে আদিকাল থেকেই সক্রিয় ছিল, এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শুধু তন্ত্র নয়, যোগসাধনাও আদিতে অবৈদিক সাধনপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৫২] অনেকে মনে করেন আর্যরাই এদেশে ধর্মের প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ ধারণাও সঠিক নয়। ধর্ম কোনো না কোনো পর্যায়ে তা জাদুবিশ্বাস বা অন্যকিছু ভাবনাজাত যাইই হোক না কেন, তা এদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। বাউল এবং অন্যান্য সহজিয়া সাধনায় যে লৌকিক সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়, তা একান্তই অনার্য সংস্কৃতি প্রভাবজাত।

ভারত ও বাংলাদেশের ধর্মসাধনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। আর্যরাই এদেশে ধর্মের আদি প্রবর্তক নয়। আর্যদের এদেশে আগমনের অনেক আগে থেকেই অনার্যদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস অত্যন্ত গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল।[৫৩] ইতিহাস পাঠে

জানা যায় খ্রিস্ট শতকের দেড়শো বছর পূর্ব থেকে খ্রিস্টোত্তর দুশো বছর ধরে নানা ধর্ম, সংস্কৃতি, ভূমধ্যীয় যাবনিক, মধ্য এশীয় শক, কুষানধর্ম, নানাজাতি ও জনের সংঘাত ও সংস্কৃতির বিবর্তনে সবকিছু মিলে ভারতীয় জীবনপ্রবাহ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।[৫৪] এই প্রভাবের ফলে অনার্য ভাবনা, ধর্ম ও সংস্কৃতি, চিন্তা রূপান্তরিত হয়; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয় না। খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় শতক থেকে ভারতবর্ষে একটি সমন্বয় ও সংহতির ফসল ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণ।[৫৫]

ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এগুলোর সংকলন-কাল গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে।[৫৬] ভারতীয় ধর্মীয় ইতিহাসের এই বিবর্তনের সঙ্গে বাংলার ধর্মীয় ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাংলায় আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠার পূর্বে যারা এদেশে বাস করত তারা সকলেই অনার্য। তাদের ধর্মমত কী ছিল সে-সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তাদের মধ্যে যে লিঙ্গ বা যোনিপূজার প্রচলন ছিল ইতিহাস পাঠে তা জানা যায় না।[৫৭] 'লিঙ্গ' শব্দটি অনার্য ভাবনাপ্রসূত। এ ব্যতিরেকে বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফুল, স্থান, পশুপাখি ইত্যাদিকে অনার্যরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করত।[৫৮]

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে অনার্য সভ্যতার পরিচয় আমরা লাভ করি তা থেকে জানা যায় যে, লিঙ্গপূজা এবং মাতৃকাপূজা সিন্ধুতীরের প্রগৈতিহাসিক লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই লিঙ্গপূজাই পরবর্তীকালে শিবলিঙ্গ পূজা এবং শক্তি যোনীপূজায় রূপ লাভ করে।[৫৯] ড. নীহাররঞ্জন রায় আরও ধারণা করেন, দ্রাবিড় ভাষায় বিন বা আকাশ-দেবতা পরবর্তীকালে বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তেমনি শিব হলেন দ্রাবিড় ভাষীদের শিবন। ইনি রূপান্তরিত হয়ে আর্যদেবতা রুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যান। সর্পপূজা আদিম অধিবাসীরা প্রজননের প্রতীক বলে মনে করত। এর ফলে দুর্গাপূজা বর্তমানে মনসাপূজায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ সবই যৌনাচারের নিদর্শন।[৬০]

মৈথুন ক্রিয়া ভিত্তি করেই এদেশের লৌকিক সাধনা আবর্তিত হয়েছে এবং তার উৎসমূল অনার্য সংস্কৃতি। বাউলগানে আমরা যে মৈথুনক্রিয়ার উল্লেখ দেখি তা এই অনার্য ভাবনার ফসল। বাউলেরা অন্যান্য লোকধর্মের মতো এই মৈথুনকে পুনরায় উপাসনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই মৈথুনতত্ত্ব কৃষিসমাজকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং তার পরিচয় আমরা লাভ করি পৃথিবীর তাবৎ আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থায়। Frazer বলেন :

> For four days before they committed the seed to the earth, the Peoples of Central America kept apart from their wives in order that on the night before planting they might indulge their passions to the fullest extent; certain persons are even said to have been appointed to perform

> the sexual act at the very moment when the first seeds were deposited in the ground. ...In some parts of Java at the season when the bloom will be soon be on the rice, the husbandman and his wife visit their fields by night and there engage in sexual intercoures for purpose of promoting the growth of the crop.[৬১]

অনার্যরা যে কৃষিজীবী ছিল তা আজ ঐতিহাসিক সত্য[৬২] এবং এই কৃষি-কাজের পত্তন হয়েছিল নারীদের হাতেই। R. Briffault বলেন : "The art or cultivation has developed exclusively in the hands of women"[৬৩] আজো যারা অনার্য বলে চিহ্নিত তাদের জীবনযাত্রায় এই একই ধারা প্রবহমান। নারীরাই কৃষিকাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষিকাজে যথার্থই যে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এ সম্পর্কে জর্জ টমসনের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> In the prehunting stage there was no production, only simple appropriation of seeds, fruits and small animals and consequently there was no division of labour. With the invention of spear however hunting became the men's task, while the women continued the work of food-gathering. This sexual division of labour is Universal in hunting tribes, being due to the relative immobility of women during pregnancy and lactation.
>
> Hunting led to the domestication of animals. Instead of being killed the game was brought home alive and kept. Accordingly cattle raising is almost everywhere men's work. On the other hand, food gathering led to the cultivation of seeds in plots adjacent to the settlement and so garden village is women's work. Then after the introduction of the cattle drawn plough. agriculture was transferred to the man.[৬৪]

ভারতবর্ষে মেয়েরাই যে কৃষিবিদ্যা আবিষ্কার করে এ সম্পর্কে এরেন ফেল্‌স বলেন :

> Women here not only invented systematic tilling of the soil but also put this into practice. In consequence of the tilling of the soil,, the peoples of this matriarchal culture circle gave up roaming in the forest and become the first settlers..[৬৫]

মৈথুন এবং প্রজনন আদিম সমাজে কৃষিকাজের সাথেও জড়িত হয়ে পড়েছিল। আদিম মানুষদের এমন ধারণা ছিল যে নারী জমির উর্বরতাশক্তিকে বৃদ্ধি করে। এ সম্পর্কে ব্রিফল্ট বলেন :

> ...the assaimilation of the fruit bearing soil to the child bearing women is Universal.[৬৬]

এই গ্রন্থে অন্যত্রে তিনি আরও বলেন :

> The fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality.[৬৭]

নর-নারীর মৈথুন সম্পর্কে জেমস ফ্রেজার বলেন :

> ...ruder races in other parts of the world have consciously employed the inter-course of the sexes as means to ensure the fruitfulness of the earth.[৬৮]

আদিম জাতির জীবনে নারীর এই গুরুত্ব পরবর্তীকালে তাদের সাধনারও অঙ্গ হয়ে পড়ে। তান্ত্রিক ধ্যানধারণায় নারীর এই প্রাধান্য সম্পর্কে আর্থার অ্যাভেলন বলেন :

> ...we have in the Trantras the recognition of the five principle... its expression in ritual one...for all, whatever be their race or caste or sex. This marks a great advance on the parochial restrictions of the Vedas which are so often placed in opposition to the Tantra by English writers. The Sudra and women are under none of the Vedic bans. What, again, can be finer than the high veneration of women which the Tantra inclulcates. The Sufi author of the Dabistan, describing in the seventeenth century, the Shaktas, speaks of the Mother of the World in the following charmful passage. This Maya is the maker of the productions of this world and of its habitants, and the creator of the spirits and of the bodies: the universe and its contents are born from her, From respect of the said productions and of the mentioned effects she is entitled Jagadamba or Mother of the Universe... This sect hold women, in great esteem and call them Shaktis and to illtreat a Shakti that is a women, is held to be a crime, As H. H. Wilson also himself points out, women as manifestation or the great cause of all, are entitled to respect and even to veneration...we find that according to the Tantra alone of the great Shastras, a woman may be a spiritual teacher (Guru) and initiation by her achieves increased benefit.[৬৯]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বৈদিক ধর্মগ্রন্থে পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং নারীকে নিন্দিত করা হয়েছে; বলা হয়েছে নারীই পুরুষের অধঃপতনের কারণ এবং নরকের দ্বার।[৭০]

যা হোক, তন্ত্রের এই নারীপ্রাধান্য উত্তরকালে সহজিয়া এবং বাউলসাধনায়ও লক্ষ করা গেছে। বাউলসাধনায় নারীর গুরুত্ব সর্বাধিক। মানবদেহকে কৃষিজমি তথা যৌনজীবন এবং নারীর প্রাধান্য উল্লেখ করে অনেক বাউলসাধক পদ রচনা করেছেন। কিন্তু এই ধারণা বাউলদের নিজস্ব নয়। তন্ত্রই এ ধারণার মূল উৎস। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হই, কীভাবে বাউল সাধকেরা এই ধারণাকে তাদের গানে সন্নিবেশিত করলেন? বাউলগানে আমরা এমন অনেক তথ্য লাভ করি, যা আধুনিক নৃবিজ্ঞানকে পুনর্গঠিত করতে সাহায্য করতে পারে।

একটি পদে বাউল লালন বলেন :

জমির জরিপ একদিনেতে সারা
আগার পাগার আছে ডেগার
ঠিকেতে ঠিক করা ॥
দেহে আঠারো কালি
সে কথা এখন বলি।
পণ্ডিত পায় না খুঁজে
বুঝবে সাধু যারা ॥
একেতে তিন ভাগ করিয়ে
বারণ আকার দিয়ে
অতীত পতিত রয় ভিতরে
আছে বালুচরা ॥
চিকন ধারে নলটি ধরে
রাখে না জমিন জরিপ করে
বুঝবি কিরে শুনবি কিরে
দেখবি কিরে তোরা ॥
চর যোগে গাছ সৃষ্টি করে
রেখেছেন সাঁই ভবের পরে

শূন্যেতে ঘোরে ফেরে
যোগ যুগল করা ॥
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তুই
হোসগে জ্যান্ত মরা ॥

বাউল কালাচাঁদ তাঁর গানে বলেন :

মানবদেহ কল্পভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে
ভবে আমার আশা পূর্ণ হবে
শুভ যোগে চাষ করিলে ॥
কর্ম ধাতুর লাঙল ধরে
ছয় বলদে নে চাষ করে
সময় হলে রতন মিলে
জো থাকিতে বীজ বুনিলে ॥
এই জমি তোর চোদ্দ পোয়া
ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া
যন্ত্র বীজে নে সৃজে
গাছ হলে বীজ জন্মে মূলে ॥
কালাচাঁদ পাগল বলে
ফুল ফুটিবে জলে
এরূপ মিলে ভজন সত্য হলে
হৃদকমলে প্রেম উথলে ॥

অপর একটি গানে কালাচাঁদ বলেন :

এই দেহ জমিনে শুদ্ধ শুভ দিনে গেছে বিছন বুনে
গুরু রূপ ধরি ॥
শোন আমার মন, বিলম্ব আর কেন,
আন ত্বরা করি ॥
মন, তোমাকে বলি, শোন আমার কথা
এই পতিত জমিনে শুদ্ধ লতা পাতা,
বীজ রোপায়ে গেছেন মন্ত্রদাতা
যত্ন করে এবার সেচ নিত্য করি ॥
দীক্ষা গুরুমন্ত্র দিয়েছে শ্রবণে
সাধুসঙ্গ বিনে উপায় দেখিনে,
আবাদ না করলে জমিন ফসল পাবিনে,
আবাদের এবার কী উপায় করি ॥

তান্ত্রিক যোগসাধনায় দেহকে একটি অনুপমযন্ত্র বিশেষ বলা হয়েছে :

> ...There is no instrument (Yantra) more wonderful than the human body. None can construct an instrument as wonderful as this. The relationship between the forces lying dormant in nature and in the human body is indeed astonishing.[৭১]

নারী বিনে সাধনা যে সার্থক হতে পারে না, দুদ্দু শাহ তা উল্লেখ করেছেন তাঁর গানে। নারীকে সাধনার ভাষা অনুযায়ী 'প্রকৃতি' নামে সম্বোধন করা হয়। বাউল পরিভাষায় নারীর বিভিন্ন নাম। কোনো ক্ষেত্রে 'চেতন' নামেও নারীর উল্লেখ করা হয়েছে ।

গুরু বস্তু চেতনের ঘরে
চেতনের সঙ্গে ধরে চিনে নাও তারে ॥
চিৎশক্তি উৎপত্তি যথায়
চেতন মানুষ তারে কয়।
তারে ধরে চেতন প্রাপ্তি হয়
এই সংসারে।
যে দেশে চেতন ধনি
শিরে নাও তার চরণ খানি
গুরু বস্তু মিলবে এখনি
নহে তা দূরে ॥
আগমেতে গেল রে জানা
শক্তির দ্বারে গুরু জনা
দুদ্দু বলে পরশে সোনা
আপন ঘরে ॥

লালন বলেন :

কোথা আছ রে দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গে লয়ে খবর করো ভাই
চক্ষু আঁধার দেলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কী রঙ্গে সাঁই দেখছে সদায়
বসে নিগম হাঁই
এখানে না দেখলাম যারে
চিনব তারে কেমন করে
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই ॥

সুমঝে ভবে সাধন করো
নিকটে ধন পেতে পারো,
লালন কয় নিজ মোকাম ঢেঁড়ো
বহুদূরে নাই ॥

বাউল কৃষ্ণদাস সোজাভাবে ঘোষণা করলেন :

মেয়েকে না চিনতে পেরে
হল বিষম দায়
মেয়ে সর্বনাশী জগৎ ডুবায়
মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায় ॥
মেয়ে যাকে স্পর্শ করে
পাঁজরাকে ঝাঁঝরা করে
কাঁচা বাঁশে যেমন ঘুণ ধরে
মেয়ে কটাক্ষ বাণ হানে যারে
তার মাথায় মণি খসে যায় ॥
সেই ভয়েতে স্বয়ং শঙ্কর
রাখলেন মেয়ে বুকের উপর,
জয়দেব আদি নব রসিক, আর ছয় গোস্বামী
মাতল মেয়ের সাধনায় ॥
যে বিষেতে মানুষ মরে
সেই বিষেতে ব্যাধি সারে।
সুজন বৈদ্য দেয় শোধন করে
তারা জারণ বড়ি তৈরি করে
যত বিকারী রোগীকে খাওয়ায় ॥
গোবিন্দ গোঁসাইয়ের বচন
যাতে জনম, তাতেই মরণ
করতে পারলে তাতে হয় সাধন
হ'ল কানা বিড়াল কৃষ্ণদাস যেমন
শিকার দই দেখে কাপাস খেতে যায় ॥

বাউলসাধনায় এই নারীপ্রাধান্য একান্তই তান্ত্রিক ভাবনাজাত। এই সাধনায় শুধু নারীর গুরুত্বই যে আছে তা নয়, বাউলসাধক নিজেও নারীভাবে সাধনায় নিবিষ্ট হন। অর্থাৎ তন্ত্রের সেই পুরনো কথা 'বামাভাবে', বামা হয়ে, সাধনা করতে হয়। শাক্ততন্ত্রে ঈশ্বরকে নারী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে; সুতরাং নারীত্বই সকলের আদর্শ।[৭২] অনেকে মনে করেন তন্ত্রসাধনা আদিতে নারীদেরই সাধনপদ্ধতি ছিল এবং তার ফলে নারীভাবে সাধনার নীতি উত্তরকালেও প্রাধান্য লাভ করেছে।

বলেছি, তান্ত্রিক সাধনা একটি বামাচারী সাধনা এবং এই সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মৈথুন। এই মৈথুন আদিতে যেমন ফসল উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হয়েছে আবার উত্তরকালে রতিনিরোধ সাধনারও কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য হয়েছে।

এ সম্পর্কে জেমস ফ্রেজার বলেন :

> To the student who cares to track the dubious course of the human mind in its groping after truth, it is of some interest to observe that the same theoretical belief in the symphathetic influence of the sexes on vegetation, which has led some peoples to indulge, their passions as a means of fertilising the earth, has led others to seek the same end by directly opposite means. ... ... If we ask why it is that similar beliefs should logically lead, among different peoples, to such opposite modes of conduct as a strict chastity and more or less open debauchery, the reason, as it presents itself to the primitive mind, is perhaps not very far to seek. If rude man identifies himself, in a manner, with nature; if he fails to distinguish the impulses and processes in himself from the methods which nature adopts to ensure the reproduction of plants and animals, he may lead to one of two conclusions. Either he may infer that by yielding to his appetites he will thereby assist in hte multiplication of plants and animals; or he may imagine that the vigour that he refuses to expand in reproducing his own kind, will form as it were a store or energy whereby other creatures, whether vegetable or animal, will somehow benefit in propagating their species. Thus from the same crude philosophy, the same primitive notions of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either or profligacy or of asceticism.'[৭৩]

নিকরগুয়া নামে একদল রেড-ইন্ডিয়ানদের কৃষিভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ফ্রেজার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফসল বুনবার দিন থেকে ফসল কাটবার দিন পর্যন্ত এই রেড-ইন্ডিয়ানেরা কঠিন আত্মসংযম পালন করে।

চার

আদিম মানুষদের মধ্যে এই রতিনিরোধের কার্যক্রম এবং যৌক্তিকতা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই রতিনিরোধ তো কোনো একটি বিশেষ সময়ের। সর্বক্ষণের জন্য যে রতিনিরোধ সাধনা সহজিয়াদের মধ্যে প্রচলিত তার যৌক্তিকতা কী হতে পারে?

সহজিয়া মতবাদের উৎসমূলে একটি প্রতিবাদী চেতনা সক্রিয় ছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈষম্য এই সহজিয়া মতবাদের জন্ম দিয়েছে। সহজিয়া রচনাবলিতে তার প্রমাণ মেলে। আর্যদের এদেশে আগমনের পর প্রয়োজনের খাতিরে সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই কয়টি শ্রেণীতে গোটা সমাজ বিভক্ত হলো। তবে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল। সমাজের উচ্চস্তরে ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সমাজ। শূদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণী সমাজে অস্পৃশ্য বলে গণ্য হতেন। আহার বিহার বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে শূদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সাথে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিয়ে, মেলামেশা বিষবৎ পরিত্যাজ্য ছিল। নীহাররঞ্জন রায় বলেন :

> রজক, কর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, ম্লেচ্ছ, ভিল্ল, চণ্ডাল, গুফকশ, কাপালিক, নর্তক, সুবর্ণকার, শৌরিক এবং পতিত ও নির্বিদ্ধ বৃত্তিজীবীদের দ্বারা স্পৃষ্ট বা পক্ব খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধ অমান্য করিলে পূর্ণকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল, ...শূদ্রের পাত্রে রক্ষিত অথবা শূদ্রদত্ত জলপানও ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।[৭৪]

চণ্ডাল, ডোম্ব ও ডোম্বীরা ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য ছিল। চর্যাপদে তার প্রমাণ রয়েছে। তবে শূদ্র অপেক্ষাও অন্ত্যজশ্রেণীরা সমাজে অত্যন্ত নিগৃহীত জীবনযাপন করতেন। বিবাহ ব্যাপারেও নানাপ্রকার বিধিনিষেধ ছিল। তবে এই সমস্ত বিধিনিষেধ নিম্নবর্ণের বেলায় অধিকতর প্রযোজ্য ছিল। ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করলে বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করতেন না। জীমূতবাহনের একটি উক্তির উল্লেখ করে নীহাররঞ্জন রায় বলেন :

> ব্রাহ্মণ শূদ্রানীর গর্ভে সন্তানের জন্মদান করিলে তাহাতে নৈতিক অপরাধ হয় না, সংসর্গ দোষ তাহাকে স্পর্শ করে মাত্র, এবং নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে অপরাধ কাটিয়া যায়। শূদ্রানীর সঙ্গে বিবাহ যে সমাজে ক্রমে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল তাহা জীমূতবাহনের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যাইতেছে। বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীদের মর্যাদা সম্বন্ধে যে পার্থক্য করা হইতেছিল তাহাতেও পরিষ্কার। বর্ণাশ্রম বহির্ভূত যেসব জাত ছিল তাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধের কোনো প্রশ্ন বিবেচনার মধ্যেই আসে নাই, অর্থাৎ তাহা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; এমনকি শূদ্রদের পক্ষেও। উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, এইসব বিধিনিষেধ সাধারণত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই সবিশেষ প্রযোজ্য ছিল এবং তাহাও ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিম্নতর বর্ণের আহার বিহার বিবাহ ব্যাপারে যোগাযোগ সম্বন্ধে। কালক্রমে এইসব বিধিনিষেধই সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায় এবং বৃহত্তর সমাজে বিস্তৃত হইয়া অন্যান্য বর্ণ ও জাতের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করে।... সেন বর্মণদের আমলের বর্ণগত বিধিনিষেধের যে চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে স্পষ্টতই দেখা যায়, এই সময়ের ব্রাহ্মণেরা বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাত হইতে প্রায় পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। একপ্রান্তে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, অন্যপ্রান্তে স্পর্শচ্যুত অধিকার লেশহীন অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায় আর মধ্যস্থলে বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়। প্রত্যেকের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত ও স্বাঙ্গীক্রিয়মান দৃঢ়মান ও দূরাতিক্রম প্রাচীর।... অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায় তো একান্তই রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টির বাহিরে।'[৭৫]

নীহাররঞ্জন রায় আরও বলেন যে, ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়েস্থদের প্রভাবই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকরী ছিল। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা রাষ্ট্রে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন, কিন্তু পরে তাদের প্রভাব কমে যায়। অন্য কোনো বর্ণের প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল না।[৭৬]

বর্ণবৈষম্যের পরে শ্রেণীবৈষম্যের কথা। ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন রাজা অর্থাৎ সেবকশ্রেণী। এঁরা ছিলেন রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক। সহায়ক ব্রাহ্মণেরা বর্ণ হিসেবে যেমন, শ্রেণী হিসেবেও তেমনি পৃথক শ্রেণী। বৈশ্যরা ছিলেন তৃতীয় বর্ণের কৃষক ও বণিকশ্রেণী পর্যায়ভুক্ত। সমাজের ৪র্থ শ্রেণীতে ছিল ক্ষেত্রকর। দেশের ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় ছিলেন তাঁরা। কিন্তু বণ্টন ব্যাপারে এদের কোনো হাত ছিল না। এরা অধিকাংশই ছিলেন ভূমিহীন চাষি। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে বা শ্রেণীতে ছিলেন অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ বর্ণের আদিবাসী নামের নানাবৃত্তিধারী লোকেরা। রজক ও নাপিত শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেত্রকর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। পুলিন্দ, ডোম, ডোম্বী বা ডোমনী শর্বর শর্বরী কাপালিক ইত্যাদি সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই শ্রেণীবিন্যাস অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গঠিত হয়েছিল। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায়ভুক্ত সুবৃহৎ নিম্নতম শ্রমিক সমাজপতি এবং রাষ্ট্রপতিদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এদের অনেকেই বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, শৈব তান্ত্রিকধর্ম ও নাথধর্ম ইত্যাদির নানা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।'[৭৭]

অতীন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন :

> ...এর পরিণতি তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের মধ্যে একটি গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস। এই বিরোধ, অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং অপমানের ধুম কলঙ্কে মলিন পরিবেশ সেদিন বাংলার সমাজ-জীবনকে ঘোলাটে করে তুলেছিল।[৭৮]

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ধর্মের নামে যৌনাচার বাংলাদেশে অষ্টম শতক থেকেই প্রাধান্য লাভ করে আছে।[৭৯] বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ধর্ম-কর্ম আচার-অনুষ্ঠানে চর্যাপদের সমকালীন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের একচ্ছত্র

আধিপত্য ছিল। এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জন্য ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে নানা আনাচার ও নৈতিক অধঃপতনের সৃষ্টি হয়েছিল। বিত্তবানেরা নিজেদের উপভোগের জন্য সমাজের নিম্নশ্রেণী এবং নিম্নবর্ণ থেকে দাসী রাখতেন। ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের লোকেরাও এই যৌনাচারে গা ভাসিয়েছেন চর্যাপদে তার উল্লেখ আছে। "নগর বাহিরে ডোম্বি তোহারি কুড়িআ, ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়ি আ।" অর্থাৎ নগরের বাইরে ডোম্বি তোমার কুঁড়ে ঘর, ব্রাহ্মণ নেড়াকে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। (চর্যা ১০)

সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত রাজপুরুষ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ দারিদ্র্যপীড়িত লাঞ্ছিত নিম্নসমাজের রমণীদেরকে ভোগ করেছে। এই নিম্নসমাজের দরিদ্রতার একটি ছবি ফুটে উঠেছে চর্যাপদে :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেসী
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ
দুহিল দুধু কি বেন্টে যামা অ ॥

টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত। আমার ব্যাঙের সংসার (অযাচিত ক্রমবর্ধমান অসংখ্য সন্তান) বেড়েই চলেছে। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে (অর্থাৎ যে খাদ্য প্রস্তুত তাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে)।

সমগ্র চর্যাপদে এমন অনেক চিত্র রয়েছে যা একদিকে কামাচারিতার উদগ্র প্রকাশ অপরদিকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শোষণ, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর হাহাকারে সোচ্চার। একদিকে কামাচারিতা ধর্মের অঙ্গ—অপরদিকে সন্তানের জন্মদান দরিদ্রতা ও অসচ্ছলতার কারণ। এরই ফলে হয়তো কোনোদিন রতিনিরোধের কথা চিন্তা করেছে তৎকালীন সমাজ এবং ধর্মপতিরা। 'বীর্যস্খলনকে 'পাপ' বলে গণ্য করা হয়েছে। ধাতু সাধনা ধর্ম ও জীবনের সাথে একাত্ম হয়েছে। সহজিয়া সাধনায় এর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ফলে পরিবার হয়েছে ছোট। জন্মনিয়ন্ত্রণ সাধনার অঙ্গ হয়েছে। নিম্নসমাজ অর্থনৈতিক কারণেই জন্মনিয়ন্ত্রণকে মেনে নিয়েছে। ভাববাদের প্রলেপ মানসিক বৈকল্য থেকেও তাকে মুক্তি দিয়েছে। আজ এই চেতনাই নিম্নশ্রেণীর মানুষের মন ও ধর্মচিন্তাকে আচ্ছন্ন রেখেছে। এই রতিনিরোধ তার স্বস্তির সোপান এবং অল্পে তুষ্টিলাভের প্রকৃষ্ট পায়। সহজিয়ারা সমাজের নিষ্পেষণ, অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনো বিদ্রোহের জন্ম দেয়নি। এই প্রেক্ষিতে এঙ্গেল্‌স-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ... All merit for the swift advance of civilization was ascribed to the mind, to the development and activity of the brain. Men become accustomed to explain their actions from their thoughts, instead of from their needs (which in any case are reflected and come to consciousness in the

> mind) and so there arose in the course of time that idealistic outlook on the world which especially since the decline of the ancient world, has dominated men's minds.[৮০]

এঙ্গেল্‌স-এর এই বিশ্লেষণ একান্ত করেই বস্তুবাদী মতাদর্শকে কেন্দ্র করে রচিত এবং সহজিয়াদের চেতনার আড়ালে যে ভাববাদ তা অনেকটা এই সত্যের ইঙ্গিতবহ। এই সহজিয়ারা দেহটাকে একমাত্র সার বলে জেনেছে। দেহই আত্মা, ইহলোকই সব এবং নিরন্তর সুখভোগ ছাড়া আর কোনো পুরুষার্থ নেই। সহজিয়ারা ব্রাহ্মণদের ধর্মসাধনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সহজিয়াদের একটি গানের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন :

> এক ব্রাহ্মণ বুঝি নদীতে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে তর্পণ করছিল। তাই দেখে সহজিয়ারা গান গেয়ে বলেছে : ওগো বামুন, এত সহজেই যদি সুদূর পরলোক পর্যন্ত জল পাঠাতে পারো তা হলে কাছে পিঠে ওই যে চাষের ক্ষেত সেখানে জল পৌঁছে দেবার জন্যে আর হাঙ্গামা করা কেন?[৮১]

কিন্তু এই লোকায়তিক সহজিয়াদের সাধনা একান্ত করেই দেহকেন্দ্রিক হওয়াতে সারা দেশ কামাচারে ভরে যায়। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী উল্লেখ করেন :

> The Lokayatikas were a creed of joy, all sunny. Through their influence, at that period of Indian history, the temple and the court, poetry and art, delighted in sensuosness. Eroticism pervailed all over the county.[৮২]

এই প্রসঙ্গেই তিনি আরও বলেন যে বৈষ্ণবসাধনা এই যৌনাচারের প্রতিবাদী দর্শন :

> As a reaction against this practice of sexual romance, Vaisnavism made its appearance and the Madanotsava festival was replaced by Dolotsava.[৮৩]

কিন্তু আপাতভাবে তা মনে হলেও বৈষ্ণবধর্মেও যৌনাচার অনুপ্রবেশ করেছে, তবে তার প্রেক্ষিত ভিন্ন। এখানে ব্যক্তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু কালক্রমে এখানেও অবক্ষয় দেখা দেয়। ফলে মৈথুন এবং যুগলসাধনা ধর্মের সঙ্গে একীভূত হয় এবং হয়তো এর ফলে রতিনিরোধের আধ্যাত্মীকরণও ঘটে এই সময়।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, এই সহজিয়া এবং বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশেষ ধারা বাতেনী সুফিপ্রভাবে পরবর্তীকালে বাউলসাধনা নামে চিহ্নিত হয়েছিল। নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র এই ধারার প্রবর্তক বলে জানা যায়। দুদ্দু তাঁর একটি গানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন :

দরবেশী বাউলের ক্রিয়া
বীরভদ্র জানে সেই ধারা।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, বাউল সম্প্রদায় এবং লালন ফকির দোলোৎসবকে তাদের উৎসব হিসেবে গণ্য করতেন এবং অদ্যাপি তা অনুসৃত হচ্ছে।

সম্প্রতি 'বিবর্ত্ত বিলাস গ্রন্থ'[৮৪] নামে একটি পুঁথি আমার হস্তগত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট নিম্নরূপ :

বিবর্ত্ত বিলাস গ্রন্থ :
বৈষ্ণব ও ফকির সম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বাবলী।
শ্রী শ্রী কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত।
প্রকাশক-শ্রী অধর চন্দ্র চক্রবর্তী।

এই গ্রন্থে সহজিয়া এবং বাউলসাধনাকে পরকীয়া সাধনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পুঁথিতে উল্লেখ আছে :

অতএব কাম লইয়া মহা কামে রোগ
পরকীয়া রাধাভাব কয় ভাবে যোগ ॥
পরকীয়া ভাব যেই করিয়ে লক্ষণ।
বিষম সেবা কহে তারে ঠাকুর লোচন ॥
বাণেতে সাধন তার কহি পরকীয়া
পরকীয়া লইয়া গৌর আইল নদীয়া।
সেইভাবে তরঙ্গ সে ওঠে দিবা রাতি।
আঁখি ছলছল করে গৌরাঙ্গ মুরতি ॥
হেন রূপ মনে মনে ভাবে কত জন ॥
না পায় সাক্ষাৎ কহে সাধু মহাজন
তরঙ্গ লাবণ্য ঢেউ লাগে গৌর গায়।
যেথাকার কল্লোল বিন্দু সেথাতে মিশায় ॥
... ...
ব্রজপুর কারে কহি ওহে রূপ কেমন।
বিস্তারি কহিব তাহা করি আস্বাদন ॥
তথাহি পদম ॥
ব্রজপুরে রূপনগরে
রসের নদী বয়।
তীরে বসিয়া ঢেউ অসিয়া
লাগিল গোরা গায় ॥
গৌর অঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
উঠে দিবা রাতি।
জ্ঞান ধর্ম যোগকর্ম,
তপ ছাড়িল যদি ॥

মনে মনে কত জনে
দিচ্ছে রূপে দায়।
যে যে রূপ সুধাকূপ
ঠৌর নাহিক পায় ॥
রূপ ভাবনা গলায় সোনা
ঘুচিবে মনের ধাঁধা
রূপের ধারা বাউল পারা
বহিছে জগৎ আন্ধা
... ...
বিষম সেবা লইয়া যেবা
আপনাকে মারে যে
লোচন বলে অবহেলে
গৌর পাবে সে ॥

অতঃপর 'বিবর্ত্ত বিলাস' গ্রন্থের তৃতীয় বিলাসে পুঁথিকার বলেন :

প্রকট আছয়ে ভাই সেবার বিধান
মহাসুখ মহাদুঃখ বিবর্ত সন্ধান
রূপে ধারা পাইয়া ভাই বাউল যে জন
নয়নে চিনিয়া হেন রসিকের গণ ॥
জগতের জনতারে দেখিতে না পায়
দেখিতে পাইলে তবু চিনিতে না রয় ॥

নিত্যানন্দ সহজিয়া মতাবলম্বী ছিলেন এবং প্রকৃতি-পুরুষ মিলনঘটিত ধর্মানুষ্ঠান করতেন। চৈতন্যদেবও যে সহজিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, এ সম্পর্কে 'বিবর্ত্ত বিলাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

চৈতন্য আশ্রয় কর চৈতন্য সেবন
শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ পবে প্রেমধন।
চৈতন্য ভজিলে নিতাই পাবে অনায়াসে
নিত্যানন্দ ভজে যে চৈতন্য তার পাশে ॥
দুই প্রভু এক দেহ ভিন্ন ভেদ নয়
একেরে ভজিলে মন দোঁহাকারে হয় ॥
একের স্মরণে ধ্যান হয়ে দোঁহাকারে।
চৈতন্য ভজহ মন কহিনু তোমারে।

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দ যে ধর্মপ্রচার করলেন তা মূলত এক এবং এই সাধনা যে শুধু দেহবাদী তাই-ই নয়—এ সাধনা পরকীয়া সাধনাও বটে। 'বিবর্ত্ত বিলাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

পরকীয়া রতি পরতত্ত্ব সুখ সার
তাহার কারণ পঞ্চবাণের আচার ॥
আরোপ করহ সেই মর্ম পরকীয়া
গুহ্যে পরকীয়া তারা কামিনী লইয়া
নায়ক নায়িকা দোঁহাকার মর্ম সেই
নিত্য ধামে বিশুদ্ধ মানুষ যারে কই ॥[৮৫]

এই পরকীয়া সাধনায় কিশোরী সঙ্গী। কিশোরীর সঙ্গে যে রতিসাধন হয় বাউল তাকে 'অখণ্ড' সাধনা বলে থাকে। 'বিবর্ত্ত বিলাস' গ্রন্থে কিশোরী সাধনা সম্পর্কে উল্লেখ আছে :

কিশোরীর কৃপা বিনে কেবা তাহা যজে
তার কৃপা যারে সেই নব বিধি ভজে
কৃষ্ণ হইতে শত শত গুণেতে কিশোরী
অধিক বাড়ায়ে কি সে দেখহ নির্দ্ধারিত ॥[৮৬]

বৈষ্ণব ও ফকিরি সাধনায় পরকীয়া প্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কে 'বিবর্ত্ত বিলাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে : "বাহ্য পরকীয়া এবে শুন ওহে মন।"

ক্ষিতিমোহন সেন পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে বলেন :

> যে 'আমার নয়' তাহাকে 'আমার' বা আপন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই তো প্রেমের প্রেমত্ব। এই কারণেই সমাজ যাহাকে আমার নিজস্ব Possession করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে গ্রহণ করার মধ্যে প্রেমের গৌরব কি? যে জন আমার নয়, সমাজ বিধি অনুসারে যাহাকে দাবি করিতে পারি না, তাহাকে পাইতে পারিলেই প্রেম। সেইরূপ আমার অধিকারের বাহিরে অথচ আমার প্রার্থনীয়াই হইল পরকীয়া।[৮৭]

ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের মধ্যে এই পরকীয়া প্রেম লক্ষ করেছেন। এই পরকীয়া প্রেমের কারণে চৈতন্যদেবসহ সহজিয়া এবং বাউলদের মধ্যে এই রতিনিরোধ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পরকীয়া প্রেমের সন্তান জন্মলাভ করলে সে সন্তান সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করবে না বিধায় এই রতিনিরোধ সাধনা বৈষ্ণব সহজিয়া এবং বাউলসাধনার ক্ষেত্রে অনেকটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বৈষ্ণবসাধনায় একে বিন্দুসাধনা নামেও অভিহিত করা হয়। রতিনিরোধের কারণে বৈষ্ণব ও বাউলদের সন্তান না বলে এদেরকে 'নাড়া' নামে চিহ্নিত করা হয়। বাউলদের সাধনায় এই রতিনিরোধ সাধনাকে 'জ্যান্তে মরা' সাধনাও বলা হয়ে থাকে। এই সাধনায় যে রতিনিরোধে পরিপূর্ণ সক্ষম সেই-ই 'সাঁই'কে নিজ অন্তরে ধারণ করতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আদিবাসী সমাজ, সহজিয়া ও বৈষ্ণব সাধনায় যে রতিনিরোধ এবং পরকীয়া সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তা বাউলসাধনায় অনুসৃত হয়েছে। এই সাধনা সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকটা সীমাবদ্ধ এবং তাদের চেতনা ও ভাবনার ফসল বলেই এই ধারণাকে লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সাধনায় উচ্চকোটি মানুষের তেমন অংশগ্রহণ নেই। প্রধান প্রধান ধর্মগোষ্ঠীর অনুসারীগণ বাউলসাধনার অনুসারীদের প্রতি বিরূপ এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন। বর্তমানে এই সাধনা সাধারণ মানুষের ধর্ম হিসেবেই গণ্য। এই সাধনার অনুসারীদের নাম হিন্দু বা মুসলমানদের মতো হলেও এরা তাদের ধর্মসাধনায় একটি নির্দিষ্ট সাধনমার্গ অনুসরণ করে। মুসলিম নামধারী বাউলেরা নিজেদেরকে সুফি-ফকিরদের আদর্শের অনুসারী বলে উল্লেখ করে থাকে। তবে এরা নামাজ রোজাসহ মুসলমানদের শরিয়তের কোনোকিছুই অনুসরণ করে না। এরা প্রচলিত ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে পরিহার করে কেবল তাদের গুরু-প্রবর্তিত ধ্যানধারণা সম্বলিত জীবনকে অনুসরণ করে। এদের সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহন সেন বলেন :

> ভয়ে ভীত, লোভে লুব্ধ, অথবা নিজের সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে যাহাদের স্বার্থের আঘাত লাগিয়াছে এমন বহু বহু লোক প্রয়োজনের তাগিদে নতুন আদর্শ খুঁজিল, তাহারা সব সত্য পাইল কোথায়?...এদেশে যেসব নিষ্ঠাবান স্বধর্মনিরত পরমতসহিষ্ণু মুসলমান শাস্ত্রপন্থীরা আসিলেন তাহারা তেমন করিয়া সকলের হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই, যেমন করিয়া জয় করিলেন ভাবুক ও সুফিশ্রেণীর আধ্যাত্মিকভাবে ভরপুর মুসলমান সাধকেরা। অন্যসব প্রকারে সংখ্যাবৃদ্ধি বেশি পরিমাণে হইলেও যথার্থ অধ্যাত্মশক্তির মূলে এইসব ভাবুক সাধকেরাই।[৮৮]

ক্ষিতিমোহন সেন আরও বলেছেন যে, সুফিদের উদার মনোভক্তি সাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দিয়েছিল, ফলে সুফিসাধনার সাথে দেশজ ভাবনার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন :

> বাঙ্গালার বাউল ও জিকির বলিয়া যেসব সন্ন্যাসী আছে তাহাদিগকে না বলিতে পারা যায় কোন জাতি, না বলা যায় কোন সম্প্রদায়। তাহারা না মুসলমান না হিন্দু। এই বাউলেরা গৃহস্থ বাউল, তাহারা কতক পরিমাণে মুসলমানও বটেন।[৮৯]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমানে যারা গৃহস্থ বাউল তারা সংসারজীবন নির্বাহ করে, ব্যবসাবাণিজ্য কিংবা চাষাবাস ইত্যাদি করে থাকে। এরা পরিপূর্ণরূপে দীক্ষা গ্রহণ করে না। কেবল 'কলমা' বা বীজমন্ত্র পাঠ করে এরা বাউল হয়। আগে কণ্ঠী বদল করার রেওয়াজ ছিল। এখন সামাজিক চাপে এরা নারীপুরুষ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। তবে এদের 'পরকীয়া' সাধনায় বাধা নেই। এরা গুরুর আদেশ-ভিন্ন কোনো সন্তান গ্রহণ করেন না। গুরুকে এরা সমগ্র জীবনের 'নিয়ামক' হিসেবে জানে।

লালন ফকির এদের গুরুর গুরু। গৃহী বাউলেরা যৌবনশেষে প্রৌঢ়কালে 'জ্যান্তে মরা' দীক্ষা নেয়। 'জ্যান্তে মরা' দীক্ষা নেবার পর এরা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম পালন করে এবং আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়ায় ও ভিক্ষাজীবী হিসেবে জীবন নির্বাহ করে। অবশ্য কেউ কেউ নিজেও 'আখড়া' তৈরি করে তার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে থাকে। 'জ্যান্তে মরা' থাকাকালে সন্তান প্রজনন নিষিদ্ধ। এই সাধনায় অনেকে যৌবনকালেই 'জ্যান্তে মরা' দীক্ষা গ্রহণ করে। 'জ্যান্তে মরা' সম্পর্কে লালন তাঁর একটি গানে বলেন :

জ্যান্তে মরা প্রেম সাধন কি পারবি তোরা
যে প্রেমে কিশোর কিশোরী হয়েছে হারা ॥
শোষায় শোষে না ছাড়ে বাণ
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান
ও তার কাম নদীতে চর পড়েছে
প্রেম নদীতে জল পোরা ॥
হাঁটতে মানা আছে চরণ
মুখ আছে তার খাইতে বারণ
ফকির লালন বলে এ যে কঠিন মরণ
তা কি পারবি তোরা ॥

এই গানে 'জ্যান্তে মরা' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বাউলসাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যাকে বিন্দুসাধনা বা জন্মনিরোধ সাধনা বলা হয়, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লৌকিক জীবনে যৌনকর্মকাণ্ড অনেকটা অপরিহার্য। শ্রমজীবী মানুষের কাছে যৌনাচার চিত্তবিনোদনের একটি বড় মাধ্যম। নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডে, আচার-আচরণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যৌনজীবন সম্মলিত নানা শব্দ প্রয়োগ করে আনন্দ পায়। বলা যেতে পারে তাদের চিন্তা-চেতনায় যৌনভাবনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং তার অধ্যাত্মচেতনায়ও এই যৌনজীবন যে প্রাধান্য পাবে তা তো খুব স্বাভাবিক। এ কারণে অধ্যাত্মসাধনাকে লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে অধ্যাত্মচিন্তা নির্দেশক বিভিন্ন শব্দ, প্রতীক-উপমা সবই তার যৌনজীবন থেকে উৎসারিত। নিম্নের বাউলগানে এই লৌকিক অধ্যাত্মসাধনার পরিচয় রয়েছে। এখানে তন্ত্রে এবং সুফি সাধনতত্ত্বে সমন্বয় ঘটেছে :

এই মানুষ নবীর নূরে ঝলক দেয়।
দেহ খুঁজলে পাওয়া যায় ॥
ছিয়া ছফেদ লালন জরদে নূরের আসন ঘিরে রয়।
মোকাম নাছুত লাহুত মালকুত জবরুত চারি হয়,
চার মোকামে মঞ্জিল দ্বারে গুপ্ত বেশে কিরণ দেয়,
লা মোকামে নূরের আসন হাউতে নবোৎ বাজায় ॥

নূরের হস্তপদ নাসা কর্ণ কিছুই নাই;
অঙ্গহীন সে আপন জোরে বেগ ধরে ত্রিবেণী যায়
সেই না ঘাটে পদ্মফুলে ভ্রমর হয়ে মধু খায় ॥
বড় যত্ন করে ভ্রমরেরে ভজতে হয়,
কি সে হবে তার, এও ঠেকিলাম বিষম দায়।
অধীন পাঞ্জু বলে নূরের যত্ন কেবল জানেন ফাতেমায় ॥

উপর্যুক্ত গানে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়ান হয় যে বাউলসাধকেরা সুফিসাধনার অনুসারী কিন্তু এই সাধনা দেহবাদী সাধনা নির্দেশক। বলা যেতে পারে সুফি প্রতীকী শব্দের আড়ালে দেহসাধনাই মুখ্য হয়ে প্রতিফলিত। তন্ত্রের ষঠচক্র সুফিতত্ত্বের ছয় লতিফা এবং চার মোকামে পর্যবসিত।

বাউলসাধনায় অধ্যাত্মসাধনার ভাবনাগুলো লৌকিক পরিমণ্ডলেই বিকাশ লাভ করেছে। বলেছি, সাধারণ মানুষের ভাবনাচিন্তা স্থূল পর্যায়ে। যে জীবনকে সে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছে, অনুসরণ করেছে প্রতিনিয়ত তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে তার সাধনায়। দীর্ঘকাল হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এমনকি দেশজ খ্রিস্টানদের সাথে বসবাস করে তাদের জীবনাচরণ এবং ধর্মবিস্তারের একটি সমন্বিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে বাউলসাধনায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় যে, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস।[৯০] বৈষ্ণবের কীর্তন, সুফিদের সামা, গজল বাউলগানে একীভূত হয়ে সাধারণ মানুষের অধ্যাত্ম-ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করেছে এক অনুপম লৌকিক পরিমণ্ডলে।

উপর্যুক্ত আলোচনাদৃষ্টে আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে বাউলসাধনা একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা। এই সাধনায় সাধারণ মানুষ ধর্ম, বর্ণ বা শ্রেণীভেদাভেদ ভুলে অন্তরস্থিত পরমাত্মাকে যাকে সে 'মনের মানুষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে তাকেই সকল ভালোবাসা ও ভক্তিতে তার সকল মুক্তির উপায় বলে জেনেছে। এই মনের মানুষের কল্পনাও তার একান্ত নিজস্ব। শাস্ত্রগত আচার-অনুষ্ঠানকে পরিহার করেছে বলে সে লৌকিক। এবং এই অধ্যাত্মসাধনা তার একান্ত মনোগত। তার 'মনের মানুষ'কে নিজের অন্তরে অন্বেষণ করবার যে প্রক্রিয়া সে গ্রহণ করেছে তাও তার নিজস্ব ভাবনার ফসল। দেহবাদও একান্ত করেই লৌকিক বিধায় এই দেহকে কেন্দ্র করে দেহাতীত পৌঁছুবার জন্য তার এই সাধনা তাই একে লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা নামেই চিহ্নিত হতে পারে। এ সাধনার ধারা দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে সুদূর অতীত থেকে নিত্য প্রবহমান।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, বাঙালি সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিকের পরিচয় এই বাউলগান। বাউল সাধনার উৎস যেখানেই হোক না কেন, এই সংস্কৃতি বাংলার মাটি, বাংলার আবহাওয়া ও বাংলার জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে

তা নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। এই সাধনা একান্ত করেই অসাম্প্রদায়িক। যদি বাঙালি সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান খোঁজ করতে হয় তাহলে বাউল পদেই তা মিলবে। আর নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি বিরাট অংশই তো অনার্য ভাবনাজাত। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> It is now becoming more and more clear that the non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilization and a great deal of Indian religion and culture; Traditions, of ancient legend and history is just Non-Aryan translated in terms of the Aryan speech.[৯১]

তিনি যোগসাধনাকে অবৈদিক আখ্যা দান করেছেন এবং হিন্দুধর্মের উৎসবিন্দুতে অনার্য প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। ভারত এবং বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে আজ যারা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ইত্যাদি তারা তো অধিকাংশই এদেশের আদি বাসিন্দা। কালে তাদের উপর বৈদেশিক প্রভাব পড়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশীরাও এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ-কথা বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। অনেক সুফি দরবেশ, রাজা, বাদশাহ, সুলতান এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। এদেশের জনগণের উপর তাদের প্রভাব যে সমধিক ছিল ঐতিহাসিক মাত্রেই তা স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথা বলা যায়। ইতঃপূর্বে আমার আলোচনায় তা উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> We know that Persian literature had its appeal to some highly placed Hindus even before Chaitanya; and when, after following Todor Mall's advice, Akbar made Persian the language of the different state departments, to the exclusion of Hindi, there was a great impetus for the study of Persian among Hindus, as a knowledge of the language was the passport to official employment.
>
> Traditions of Persian scholarship continued among Hindus even after the establishment of British rule and the suppression of Persian from the law courts. Right down to the middle of the last century, a great many Hindus in Bengal remained faithful to Persian and in Western U. P. and the Panjab, the Persian traditon is still

a living one among a great many Hindus. Sufism thus found a very easy way to reach the Indian mind. ... In far away Bengal, we have had our Persian scholars and writers from among Hindus... Ram Mohon Ray began his literary carrer with a treatise on monotheism composed in Persain, the Tuhfatu-l-Muwayhidin. A forgotten writer in the history of Persian learning in Bengal in the eighteenth-nineteenth centuries is Ram Taran Mukherji, alias Taran Munshi of Santipur in Nadia District, who evidently was a good Brahman and a Sufi at the same time... We know also that Krishna Chandra Majumdar, the Bengali poet of the well known book of verses the "Sadbhava Sataka" was also a poet of Persian, There were doubtless scores of men like Ram Taran Mukherji, Krishna Chandra Majumdar and Ram mohon Ray, who formed bridges, so to say, between the minds of Sufi Iran and of Hindudom.[৯২]

এবং পরিশেষে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত :

> In Unity lies strength : and no Unity can be higher than the Unity of spirit. Islamic nysticism as it developed in later times (particularly in Iran) supplied in pre-British India a great platform for this Spirtual Unity among the two major communities of the country, without surrendering the bases of their spiritual life, bringing about a consequent loss of self-respect, on either side, It can still be so among those who believe in the things of the Spirit and have a faith in an Ultimate Reality. Narrow and exclusive preoccupation with ourselves only obscures our view, and revents us from forming a just and proper estimate of things, which alone can be the prelude for the drawning of higher understanding.[৯৩]

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে সুফিপ্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। বাউল এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফসল।

বাউলসাধনায় অতি প্রাচীন সংস্কৃতির যে পরিচয় আমরা লাভ করি, সুফিসাধনার প্রভাবে তা একটি নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। বাউলসাধনা তন্ত্র এবং যোগ সাধনার মতো এদেশের মাটিতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই শিকড় গেড়েছিল, এদেশের আদিবাসীদের জীবনচর্যায় তার প্রমাণ আছে। বাঙালির যদি কোনো নিজস্ব সাধনা থাকে তবে তা এই বাউলসাধনা। এই সাধনায় বাঙালি যেমন তার লৌকিক সাধনার পরিচয় খুঁজে পেয়েছে তেমনি সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের লৌকিক অধ্যাত্মবাদের ইতিহাসও এই বাউলগান :

নানান বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখি
একই মায়ের পুত ॥

তথ্যনির্দেশ

১. Hornby A. S তাঁর *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* : 1963; 515 পৃষ্ঠায় metaphysical শব্দটিকে based on abstract reasoning বলে উল্লেখ করেছেন।
The Concise Oxfrod Dictionary of English Literature 1951 344 পৃষ্ঠায় metaphysical poets-দের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে :
Metaphysical poets, a term invented by Dryden and adopted by Johnson as the designation of certain 17th cent. poets (chief of whom were Donne and Cowley) addicted to witty conceits and far fetched imagery. But modern opinion does not endorse Johnson's condemnation of these poets. The virtue of the highly intellectual conventions in which the worked and of the genuine poetic qualities of such poets as Donne, Herbert, Vaughn, Crawshaw & c, has been widely recognised. এরা বস্তুগত জীবনের বাইরের জগৎকে 'হৃদয় এবং মেধা' সহযোগে বিশ্লেষণ করতেন। আমাদের আলোচ্য বাউলগান এবং বাউলসাধনাকে এমনিভাবে 'মেটাফিজিক্যাল' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানেও হৃদয় এবং মেধার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।
২. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬০, নিউএজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা, পৃ. ৪৯,
৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৫০-৫১
৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৯

৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩
৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩
৮.৯. A. M. A Shustery, *Outlines of Islamic Culture*, Voll. II, Bangalore, 1938, PP. 520-521
১০-১১. Ibid, P. 548
১২. Ibid, P. 548
১৩. দ্র. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
১৪. Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*: Calcutta, 1975. P. 20
১৫. Ibid, p. 26
১৬. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *রচনাবলী* ২য় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ২৮৪-২৮৫। দ্র. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৪৮২
১৭. Debiprasad Chattopadhyaya, *Lokayata*, New Delhi, 1968, P. 49
১৮. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-৯৫। দ্র, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫
১৯. D. R. Sastri, *A Short History of Indian Materialism, Sensationalism and Hedonism*, Calcutta, pp. 35-36
২০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, কলকাতা, পৃ. ৭৮
২১. D. R. Sastri, op, cit P. 39. দ্র. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬
২২. Shashibhusan Dasgupta, op cit, p. 99
২৩. Ibid, P. 102
২৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২৫. Shashibhusan Dasgupta, op cit, p. 99
২৬. Ibid, P. 116
"and again, when associated with the speculations on Krishna and Radha conceived as Rasa and Rati in Bengali Vaisnavism, the same yogic practice and discipline has been responsible for the growth and development of the Vaisnava Sahayitya movement of Bengal
২৭. Ibid, P. 115
২৮. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬-৪৬৭
২৯. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২৯-ক
৩০. Deviprasad Chattopadhyaya, op. cit. p. 231-232.
৩১. Shashibhusan Dasgupta, op. cit. p. 55
৩২. Deviprasad, op cit, p. 331

৩৩. Shashibhusan Dasgupta, op. cit. p. 89
৩৪. Deviprasad Chattopadhyaya, op. cit. p. 336
৩৫. Ibid, P. 336
৩৬. *উত্তরা*, ১৩৪৪ সাল, কার্তিক, পৃ. ১২২। দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪.
৩৭. Deviprasad Chattopadhyaya, op. cit, p. 336
৩৮. Shashibhusan Dasgupta, op. cit, p. 165-166
৩৯. Ibid, P. 166
৪০. Ibid, P. 164-165
"The Baul poets are Sahajiyas in a general sense of the term... the earlier Sahajiyas from the real background of their religion..."
৪১. Edward C. Dimok, *The place of the Hidden Moon*, Chicago, 1966, p. 250-351
৪২. Ibid, P. 254
৪৩. Ibid, P. 254-255
৪৪. Ibid, P. 256
৪৫. Ibid, P. 258
৪৬. Suniti Kumar Chatterji, op. cit, p. 24. " I think that in the intensity of love and of a sense of beauty which is so characteristic of the completed of perfected Sufism, there is something which suffused Indian (Hindu mysticism) as the result of a direct contact with Sufism after 1000 A.D
৪৭. Edward C. Dimock, op. cit. p. 262-263
৪৮. Ibid, P. 254
৪৯. Ibid, P. 265
৫০. A. M. Shustery, op. cit, p. 758
৫১. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ২৫৯-২৬০ দ্র. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৪৫২
৫২. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ২১-২২
৫৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৭৩, কলকাতা, পৃ. ৩০১। 'ধর্ম' শব্দটি কোনো অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর। নীহাররঞ্জন রায় পৃ. ৪৮৬. SunitiKumar Chatterji, Indo-Asian and Hindi, Calcutta, P. 81-82
৫৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৪০০ (১৯৯৩), পৃ. ৪৯৬

৫৫. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭
৫৬. ঐ, পৃ. ৪৯৭
৫৭. Father Heras, *The Religion of Mohenjo Daro people according to inscriptions.* (Journal of the University of Bombay, V. Part I. p.8)
৫৮. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭
৫৯-৬০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৬১. James Gerge Frazer, *The Golden Bough*, I-Volume, Abridged edition, New York, 1963, p. 163
৬২. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪
৬৩. R. Briffault, *The Mothers*. vol, III. pp. 54-57, London, 1952
৬৪. George Thomson, *Studies in Ancient Greek Society*, London, 1919, pp. 41-42
৬৫. O.R. Ehrenfels, *Mother Right in India*, Hyderabad, 1941, p. 8
৬৬. R. Briffault, op. cit, p. 59
৬৭. Ibid, p. 55
৬৮. Frazer. J.G. op. cit, p.59
৬৯. A. Avelon, *Principle of Tantra*, London, 1914, Preface xvii.
৭০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২
৭১. Deviprasad, op. cit, p. 333-334
৭২. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫
৭৩. Frazer. J.G. op cit, p.159-60
৭৪. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-২৫৪
৭৫. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
৭৬. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
৭৭. অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২
৭৮. অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৭৯. অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৮০. F. Engles, *Dialectice of Nature*, London, 1941, pp. 288-89
৮১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৮২-৮৩. D. R. Sastri, op. cit. p-36; Also see Deviprased op. cit. p. 18
৮৪. *'বিবর্ত্ত বিলাস'* শ্রী শ্রী কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সংশোধিত), প্রকাশক শ্রী অধরচন্দ্র চক্রবর্তী, কলকাতা, পৃ. ৭২
৮৫. ঐ, পৃ. ৭৮
৮৬. ঐ, পৃ. ৮০
৮৭. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল*

৮৮. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৫
৮৯. ক্ষিতিমোহন সেন, *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা* কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ২৪
৯০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামণি ১ম খণ্ড*, কলকাতা, আশীর্বাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯১. Professor Suniti Kumar Chattarji, *Indo-Aryan and Hindi*, Calcutta, p. 81-82
৯২. Ibid, p. 35-36
৯৩. Ibid, p. 36-37



তৃতীয় অধ্যায়

বাউলসাধনার বৈশিষ্ট্য

বাউল ও বাউলসাধনার ইতিহাস হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু বাউল গবেষণা সাম্প্রতিক। বাউলেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু বাউলদের প্রধান গুরু লালন ফকিরের কর্মকাণ্ড ও মাজার কুষ্টিয়া থাকায় বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চলে এদের আধিক্য রয়েছে। আমি এতদঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করার কারণে তাদের সাথে আমার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাউলদের সঙ্গে দীর্ঘকাল মেলামেশা করে যা জেনেছি তা হলো এরা সমাজে প্রচলিত কোনো মূলধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী নয়। এদের কোনো ধর্মীয় শাস্ত্র নেই। এরা গুরুপরম্পরায় যা জেনেছে তাই-ই তারা সাধনার ধন হিসেবে আঁকড়ে ধরে আছে। এদের সাধনা দেহভিত্তিক এবং মিথুনাত্মক, সে কারণে গুপ্ত। এরা সংগীতাশ্রয়ী এবং এদের গানেই তাদের সাধনার বিষয়টি লিপিবদ্ধ। কিন্তু এসব গান সহজবোধ্য নয়। বাউলেরা চর্যাপদের ভাষার মতো তাদের গানের ভাষাও দ্ব্যর্থবোধক রেখেছে নিজেদের স্বার্থের কারণে। দীক্ষিত ব্যতিরেকে সে গানের অর্থ বোঝা যায় না। তাদের সাধনার সবকথা, বলা যেতে পারে—এসব গানে ব্যক্ত হয়েছে অনেক নিপুণতার সঙ্গে। এসব গানেই তাদের তত্ত্বকথা নিহিত। এদের ধর্মে হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়েছে এবং গানকেই অবলম্বন করেছে তাদের সাধনার পথ নির্ধারণে। এসব গানে সহজিয়া ও সুফিসাধনার কথা বলা হয়েছে। আমার ক্ষেত্রগবেষণায় আমি হিন্দু-মুসলমান নামধারী বাউলদের মধ্যে একই ধরনের সাধনা অনুসরণ করতে দেখেছি। তবে যারা মুসলমান নামধারী তারা নিজেকে 'ফকির' নামে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের সাধনায় সহজিয়া ধারা অক্ষুণ্ন থাকলেও সমগ্র সাধনায় বাতেনী[১] সুফি মতাদর্শ গুরুত্ব পেয়েছে। হিন্দু বাউলদের মধ্যে গোঁসাই এবং দাস, শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করেছি এবং তাদের সাধনায় সুফি অপেক্ষা সহজিয়া সাধনা অত্যধিক গুরুত্ব পেয়েছে। মাগুরার মহেন্দ্র গোঁসাই, মনোরঞ্জন কবিরাজ, কুষ্টিয়ার গোঁসাই গোপাল, গোঁসাই নিরঞ্জন, গোঁসাই নিমাই–বাউল হলেও নিজেদের নামের সঙ্গে গোঁসাই শব্দটি ব্যবহার করতেন।

অবশ্য কখনও কখনও মুসলমান সাধকেরা এদের নামের সঙ্গে 'শাহ' পদবিটি জুড়ে দিত। বিশেষ করে গানের আসরে যিনি উপস্থাপক তাঁকে হিন্দু বাউলদের নামের শেষে এ-ধরনের সংযোজন করতে দেখেছি। আমার ক্ষেত্রগবেষণায় হিন্দু মুসলমান বাউলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সহজিয়া এবং সুফিসাধনা সম্পর্কে এদের প্রগাঢ় জ্ঞান দেখে চমৎকৃত হয়েছি।

এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে এ উপমহাদেশে বাউলধর্ম ও সাধনা প্রাচীনত্বের দাবিদার হলেও অষ্টাদশ শতকের পূর্বে কোনো বাউলগান এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। লালন-গুরু সিরাজ সাঁই, পাঞ্জু-গুরু হীরু চাঁদ প্রভৃতি সাধকের পূর্বে বাংলা ভাষায় আমার জানা মতে বাউলগান পাওয়া যায়নি। রামানন্দ, কবীর, দাদ্দু, রজ্জব যেসব পদ রচনা করেছেন তা হিন্দি ভাষায়। এদের গানের কথা এবং সাধনতত্ত্ব অনেকক্ষেত্রে বাউলগানেও অনুসৃত হয়েছে। সহজিয়া মতাবলম্বী চণ্ডীদাস, নরোত্তম দাস, লোচন দাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের গান বাউলগানের ভিত্তি নির্মাণ করেছে ঠিকই, তবে তাদের পদে সহজিয়া বৈষ্ণব ধারার প্রকাশই দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলা চলে, মুসলিম সুফিসাধকেরা বিশেষ করে চিশতিয়া তরিকার সুফিসাধকেরা উপমহাদেশে 'সামা'[২] নামে সাধনসংগীতের প্রবর্তন করে। সুফিসাধকদের 'সামা' কেবল দীক্ষিতজনদের দ্বারাই গীত হতো এবং তার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত ছিল। 'সামা'র ভাব ও ভাষা চর্যাপদ ও বাউলগানের মতোই দ্ব্যর্থবোধক এবং সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ছিল।

বাংলাদেশে এ যাবৎকাল যেসব বাউলগান পাওয়া গেছে, তা বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এসব গান দেহভিত্তিক মিথুনাত্মক হলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেহাতীত জীবননির্দেশক। অর্থাৎ এদের সাধনা সহজিয়াদের মতো কেবল দেহতেই শেষ নয়। ইতোপূর্বে বাউলদের সম্পর্কে যেসব গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। তিনি তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থে বাউলসাধনার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা সহজিয়া ভাবনাজাত। তিনি বাউলসাধনায় সুফি মতবাদের প্রভাবের কথা স্বীকার করলেও এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ :

> বাউলদের সাধনা নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়া প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের মধ্যদিয়া নিজের আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধির সাধনা। সুতরাং সাদৃশ্য যতই থাকুক, মূল সাধনতত্ত্বে বাউল ও সুফিদের মধ্যে প্রভেদ বর্তমান।[৩]

অতঃপর তাঁর সিদ্ধান্ত :

> বৌদ্ধ সহজিয়া ও বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদের যে তত্ত্ব বা দর্শন, তাহাই বাউলধর্মের দার্শনিক ভিত্তিভূমি।... বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনাংশের একটা বিশিষ্ট রূপ বাউলধর্ম।[৪]

কিন্তু তিনি স্বীকার করেন :

> আমার বিশেষভাবে মনে হয়, সুফি-প্রভাবান্বিত এই মুসলমান নেড়া বা 'বেশরা' ফকিরেরাই বাংলায় বাউলধর্ম সাধনার আদি প্রবর্তক।[৫]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলতে চেয়েছেন যে সুফিদের প্রভাবে এবং অন্যান্য কারণে এদেশের অধিবাসীবৃন্দ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা কখনও তাদের পূর্বসাধনার ধারাটি ত্যাগ করেনি। এরা তাদের পূর্বাচরিত ধর্মসাধনাকে অতি সংগোপনে অনুসরণ করে চলে আসছে।[৬]

নিঃসন্দেহে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীদের সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা অনেকাংশে সঠিক কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যাদেরকে 'নেড়ার ফকির' অথবা বেশরা ফকির' বলে উল্লেখ করেছেন, তারা সহজিয়া ধারাটিকেই 'মুখ্য' বা 'একমাত্র উপায়' বলে গণ্য না করে সুফিসাধকদের আদর্শকেই তাদের সাধনার সর্বশেষ স্তর বলে ভেবেছে। সেইসাথে বাউলসাধনায় সহজিয়া এবং সুফিভাবনার একটি চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে বলে বিশ্বাস জন্মে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাউলসাধনায় বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এবং সুফিসাধনার প্রভাবের কথা স্বীকার করে বলেন যে, বাউলেরা সহজিয়া অনুসারী হলেও তারা সহজিয়া সাধনাকে অনেকটা ঢেলে সাজিয়ে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। তবে তিনি বলেন যে, বাউলদের মধ্যে যারা হিন্দু তারা অনেকাংশে বৈষ্ণব সহজিয়াভাবাপন্ন এবং মুসলমানেরা সুফিভাবাপন্ন।[৭] তিনি বাউলসাধনাকে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতো একটি দেহভিত্তিক মিথুনাত্মক সাধনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৮]

ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের দেহবাদী সাধনাকে বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার অনুরূপ বলে মনে করেন। তবে তিনি বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণসহ মধ্যযুগের ভারতীয় সন্তদের সাধনার সঙ্গে বাউলসাধনার একটি ঘনিষ্ঠ যোগের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বাউলদের সাধনাকে কায়াসাধনা হিসেবে অভিহিত করলেও এই সাধনা যে অনুরাগধর্মী ভক্তি ও প্রেমের সাধনা, সে-সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রেমের কথা বলতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেন বাউলসাধনায় পরকীয়া প্রেমের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেন।[৯]

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাউলসাধনাকে যোগভিত্তিক দেহবাদী সাধনা হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি এই সাধনায় তত্ত্ব, যোগ এবং সুফিসাধনার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন।[১০] আহমদ শরীফ বাউলসাধনা সম্পর্কে বলেন : বাউলেরা রাগপন্থী। কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগসাধনাই বাউলপদ্ধতি। ইন্দ্রিয়নিরোধ, বিষয়ত্যাগ কিংবা বৈরাগ্য এদের লক্ষ্য নয়।[১১] আবু তালিব বাউলসাধনাকে পরিপূর্ণ সুফিসাধনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১২]

বলেছি, বাউলদের নিজস্ব কোনো গ্রন্থাদি নেই। প্রয়োজনে তারা সহজিয়া সাধকদের পুঁথি কিংবা সুফিদের গ্রন্থাদি থেকে তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। বাউলদের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনায় তাদের সাধনার বিষয়টি বুঝাবার জন্য তারা বিভিন্ন পদকর্তার গান গেয়ে শুনাতেন। প্রকৃত অর্থে, তাদের সাধনা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে বাউলদের গানই একমাত্র উপজীব্য।

বাউল দুদ্দু বলেন :

বাউল জীবন কারে কয়।
কেমন জীবন, বস্তু কী সে,
জন্ম কোথায় হয় ॥
যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন
জীবন পরম নিরূপণ, বাউলেরা কয় ॥
জীবনই তীর্থ ধর্মপথ
এই কথা বাউলের মত
বস্তুবাদী বাউল আদ্য, কেহ কেহ হয় ॥
না করে অনুমান ভজন
করে না মুক্তির অন্বেষণ
জীবনই সত্য নিরূপণ, দীন দুদ্দু কয় ॥

আরেকটি গানে দুদ্দু বলেন :

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই ॥
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব,
পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ
তুলসী মালা অনুষ্ঠান সদাই ॥
বাউল মানুষ ভজে
যেখানে নিত্য বিরাজে,
বস্তুর অমৃতে মজে নারী সঙ্গী তাই ॥
নিত্যানন্দের দুই পুরুষ হয়,
বীরভদ্র বীর চূড়ামণি কয়,
দুইজন দুই মতের গোঁসাই
শুনতে পাই॥
দরবেশী বাউলের ক্রিয়া
বীরভদ্র জানে সেই ধারা,
দরবেশ লালন সাঁই এর কথায়
দুদ্দু জানায় তাই ॥

অপর একটি গানে বাউল দুদ্দু আরও বলেন :

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল ॥
পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে,
চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে, হয় রে কবুল ॥
বেদ তুলসী মালা টেপা
এসব তারা বলে ধোঁকা
শয়তানে দিয়ে ধাপ্পা, সব করে ভুল ॥
মানুষে সকল মেলে,
দেখে শুনে বাউল কি বলে
লালন সাঁইজির কুল?

এই তিনটি গানে বাউল দুদ্দু শাহ বাউলসাধনা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। বাউলসাধনা দেহবাদী সাধনা হলেও দেহকে একমাত্র 'সার' না জেনে দেহকে ভিত্তি করে যে মানবজীবন দেহাতীতে নির্দেশিত, বাউল তার সার্থকতাকেই তুলে ধরছে। এখানে বাউলসাধনা শুধু 'বস্তু'নির্ভর সাধনা নয়, বলা যেতে পারে বস্তুর মাধ্যমে যে মানবজীবন গড়ে ওঠে যা তাকে দেহ থেকে দেহাতীতেই শুধু নয়, বরং একটি লোকোত্তর মহিমা দান করতে পারে—তারই সাধনা। দুদ্দু শাহ-এর মতে বাউল বস্তুতে ঈশ্বর বা খোদাকে খোঁজে। এখানে সে কোনো আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী নয়। হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর বা খোদাকে সে উপলব্ধি করতে চায় তার আত্মার আত্মীয় হিসেবে। এখানে তার পরিচয় হিন্দু অথবা মুসলমান হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে। বাউলের এই সাধনাকে তাই লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা হিসেবে উল্লেখ করা চলে। দুদ্দু শাহ-এর গানে আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র বাউল মতাবলম্বী ছিলেন। নিত্যানন্দ ছিলেন যোগামার্গাবলম্বী একপ্রকার বৈষ্ণব।[১৩] বৃন্দাবন দাস লিখিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে তাঁকে 'অবধূত' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁর রীতিনীতি আচার ব্যবহারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[১৪] অবধূতদের সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন :

> ...বৈষ্ণবদের মধ্যেও একশ্রেণীকে অবধূত বলা হয়... অবধূত বৈষ্ণবেরা রামানন্দের শিষ্য। এখনও বাংলার নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের কোনো কোনো প্রদেশে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়। ইহাদের আচার-ব্যবহার অতিশয় কুৎসিত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিভেদ মানে না এবং তাহাদের পান ভোজনেরও কোনো বিচার নেই। তাহাদের মাথায় বড় বড় চুল, গলায় স্ফটিক প্রভৃতির মালা, কটিতে কৌপীন, গায়ে খিল্কা বা কাঁথা, হাতে নারিকেলের কিস্তি। ইহারা সর্বদা অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে। লোকে ইহাদিগকেও বাউল বলে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন :

> ...অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ প্রকৃতি-পুরুষ মিলন ঘটিত ধর্মসাধনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতেই সম্প্রদায় হিসেবে প্রকাশ্যভাবে এই প্রকৃতি-পুরুষমিলন ঘটিত ধর্মসাধনা বা বাউলভজনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গুরুপরম্পরার মধ্য দিয়ে সারা বাংলায় ইহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।[১৫]

লালন ফকিরের শিষ্য দুদ্দু শাহ উল্লিখিত একটি গানে বাউলসাধনার ধারা আলোচনা করতে গিয়ে বীরভদ্রের কথা উল্লেখ করেছেন। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বীরভদ্র বাউলমতাবলম্বী ছিলেন। দুদ্দু শাহ বাউলসাধনার ধারাকে 'দরবেশী ধারা' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, পারস্যে সুফিদের একাংশকে দরবেশ বলা হয়। এরা বিভিন্ন মাজারে দিনাতিপাত করেন এবং সামা, গজল, কাসিদা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন। তুরস্কেও এই ধরনের সুফিসাধকদের কথা জানা যায়, এরা *Whirling Darvesh* বলে পরিচিত।[১৬]

বলেছি, বাউলদের সাধনা সম্পর্কে বাউলগানেই পরিচয় রয়েছে। বাউলেরা তাদের সাধনাকে মানবজীবনভিত্তিক বলে উল্লেখ করেছে। লালন ফকির তাঁর গানে বলেন :

এমন মানব জনম আর কী হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে ॥
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই,
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে ॥
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মনরে পেয়েছ এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সু-ধারায়
যেন ভরা না ডোবে ॥
এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাইতো মানুষরূপ গঠলে নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে ॥

এই মানবজীবনের গৌরব মানুষের কারণে। এই মানুষ পশুশক্তিধর মানুষ নয়, সে দেহমহিমাপ্রাপ্ত। শুক্র বা বীজে তার আধার, কিন্তু আত্মার উদ্বোধনে তার সমৃদ্ধি অর্থাৎ মানবদেহে শুক্রের কারণে যে মানুষের সৃষ্টি, আত্মার দেবত্ব সান্নিধ্যে তার গৌরব। এজন্য বাউল শুক্র বা বীজকে গুরুবস্তু, গুরুধন বা 'আমানত' বলে

বুঝেছে। এই শুক্রের যথেচ্ছ ব্যবহার তার সাধনায় নিষিদ্ধ। সৃষ্টির কারণে মানবদেহে যে আত্মার অবস্থান, তার স্বরূপ বাউল জানে না। এই আত্মা স্বর্গীয় বস্তু। মানবদেহে প্রাণবায়ুর মাধ্যমে তার বিস্তার। আত্মাকে বাউল কখনও মানুষ বা মনের মানুষ; কখনও সহজ মানুষ, অধর মানুষ, অচিন পাখি, সাঁই ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে।

বাউল চিরকাল এই 'মনের মানুষ'কে জানতে চেয়েছে। কিন্তু তাকে সে কখনও জানতে পারেনি। বাউল বুঝেছে একমাত্র প্রেমের মাধ্যমে তাকে অনুভব করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে। বাউলের এই প্রেম নর-নারীর মিলনঘটিত প্রেম। মিথুনাত্মক যোগসাধনায় এই প্রেম ঘনীভূত হয়। একে বাউল মানুষভজনা বা মানুষ ধরার সাধনা বলে থাকে।

একটি গানে লালন বলেন :

মানুষ ধরো নেহারে রে।
ওরে মন নয়নে নয়নে যোগ করে ॥
নেহারায় চেহারা বন্দি
করো রে করো একান্তি
সাড়ে চব্বিশ জেলায় পাতো আটকের ফন্দি
পালাবে সে কোন্ শহরে ॥
ত্বরায় মন, দারোগা হয়ে করো বন্দি
স্বরূপ মন্দিরে ॥
স্বরূপে আসন যাহার
পবন হিল্লোলে নেহার
পক্ষান্তরে দেখ একবার
দিব্যচক্ষু প্রকাশ করে ॥
দ্বিপক্ষেতে খেলছে খেলা
নর নারী রূপ ধরে,
সিরাজ সাঁই বলেরে লালন
মানুষ সাধন প্রমাণ রে ॥

এই মানুষ ধারার সাধনা নর-নারীর মিলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রতিনিরোধ সাধনা। বাউল বিশ্বাস করে রতিনিরোধের মাধ্যমে যে মৈথুনক্রিয়া, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় বলে প্রেম গভীর হয় এবং তখন উভয়েই পরম প্রশান্তি লাভ করে। মানুষভজনার কথা আরও খোলাখুলিভাবে দুদ্দু বলেছেন তাঁর গানে :

মানুষ ভজনের কথা জানাই তোরে
যাহাতে অমর হবি যম-যাতনা যাবে দূরে ॥

নর-নারী নির্বিকার হয়ে
দোঁহাকে জানিয়ে দোঁহে
জীবনের অকৈতব গৃহে আত্মতত্ত্বের খবর করে।
যাহাতে সৃজন বর্ধন
যোগে তাহা করিবি গ্রহণ
দীর্ঘ পরমায়ুর কারণ
জনম তার মরণের দ্বারে ॥
এ দেহকে নিত্য ভেবে
আত্মবস্তু খুঁজে নেবে
লালন শাহ বলেছে তবে,
জানবি দুদ্দু মেয়েকে ধরে ॥

এই স্তরে যে-সাধনার কথা দুদ্দু উল্লেখ করেছেন তা মানুষভজন। বৈষ্ণব সহজিয়া একে রাগের ভজন বলে অভিহিত করে থাকে।[১৭] হাওয়া-দমের সাহায্যে রতিনিরোধ করে যুগলমিলনের মাধ্যমে অধর মানুষ, মনের মানুষ বা সহজ মানুষের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। এই রতি মূলত বিন্দু বা বীর্য, যাকে বাউল গুরুধন বা গুরুবস্তু বলেছে—এই বিন্দু বা বীর্য সংরক্ষণ করার নামই বাউলসাধনা।[১৮] বাউলদের রতিনিরোধ সাধনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য আমি বেশ কয়েকজন বাউলের সঙ্গে আলাপ করি। তাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয় তা নিম্নরূপ :

বাউলসাধনা বায়ু বা হাওয়া ধরার সাধনা। "হাওয়া ধরো অগ্নি স্থির করো, মরিলেও বাঁচিতে পারো—"(লালন)। এই সাধনা দেহভিত্তিক যোগক্রিয়ামূলক রতিনিরোধ সাধনা। রতি বা বীর্য (বিন্দু) দেহের অমূল্য সম্পদ। নর-নারীর মিলনে রতিকে নিরোধকল্পে সাধক 'দম' বা হাওয়ার সাধনা করে। অর্থাৎ রতিক্রিয়ার সময় বায়ু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিন্দু বা বীর্যের স্থৈর্য আনয়ন করা হয়। ফলে বীর্য স্খলন হয় না। বাউলের এই সাধনার কথা বলতে গিয়ে লালন বলেন :

জ্যান্তে মরা প্রেম সাধন কি পারবি তোরা।
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা ॥
শোষায় শোষে না ছাড়ে বাণ
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান,
ও তার কাম নদীতে চর পড়েছে
প্রেম নদীতে জলপোরা ॥
হাঁটতে মানা আছে বারণ
মুখ আছে তার খাইতে চরণ
ফকির লালন বলে এ যে কঠিন মরণ
তা কি পারবি তোরা ॥

এই গানে লালন সাধনা-সংক্রান্ত বক্তব্য রেখেছেন। বাউলসাধনার একটি অংশে দেহবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এই দেহবাদ যৌনাচারেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তাকে অতিক্রম করে নিখাদ অনুরাগমূলক প্রেমলাভে বাউল বিশ্বাসী। এই সাধনাকে লালন তাই 'জ্যান্তে মরা'[১৯] সাধনা নামে অভিহিত করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এদেশের বিভিন্ন লোকধর্মে দেহবাদই মুখ্য। দেহই সবকিছুর সার। তন্ত্র এবং যোগসাধনায় দেহই প্রধান। দেহকে বলা হয়েছে অনুবিশ্ব। 'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে' 'যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। এই দেহের মধ্যেই আত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি সকলের বাস :

নর দেহ নৈলে কোন তত্ত্ব নাহি জানে।
সাধনের মূল এই নরদেহগণে।
(বৃহৎ দেহ নির্ণয় পুঁথি)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে সহজিয়া বৈষ্ণব, নাথযোগী, রামপ্রসাদী, শাক্তগান, কর্তাভজা, লালনশাহী, পাঞ্জশাহী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেবধনী, বলরামী, হাছনরজা, শীতলাংশাহ, মাইজভাণ্ডারী, মারফতি এবং বাউলগানে এই দেহবাদের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। বলেছি, এই দেহবাদের উৎস তন্ত্র এবং যোগ। বাউলগানে তন্ত্র এবং যোগসাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এই তন্ত্র এবং যোগসাধনায় বায়ু বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কথা আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের ঘটনাটি অতি প্রাচীন। প্রাচীনকালের বিভিন্ন ধর্মে শ্বাস-প্রশ্বাস বা হাওয়া-দমের ব্যবহার রয়েছে। *Encyclopedia of Islam*-এ এ-বিষয়ে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায় :

> The concept of breath figures prominently in the development of thought in many religions. Egyptian *Ka*, Hebrew *nefesh* and *ruah*, Greek *Psuche* and *Pneuma*, Latin *anima* and *spiritus*, Sanskrit Prana, Chinese *Ch'i*, Polynesian *mana*, and Iroquoian orenda, all demonstrate that the theme of breath has had a major place in man's quest for religious understanding, Moreover, theological conception of breath have led many of the world's traditions to feature respikatory exercise in their religious disciplines, especially in Asia and among groups influenced directly or indirectly by practices from the Indian sub-continent.[২০]

দেহবাদী সাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবহারের কথা গ্রিক দর্শনে পাওয়া যায়। তবে প্লেটো, অ্যারিস্টোটল এমনকি সক্রেটিস এ বিষয়ে তেমন অবগত ছিলেন না।

সক্রেটিসের পূর্বেকার দর্শনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মা সম্পর্কে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। *Encyclopedia of Islam*-এ গ্রিক দার্শনিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

> Although the theme of breath is seldom mentioned by Plato and Aristotle, some of their predecessors, for whom the universe was a quasi living organism, saw air, wind, breath as central to the definition of the soul, Pre-Socrates philosophers identified two qualities of the soul movement and knowledge, Empedocles, for example, believed that because the soul knows all natural things, and because natural things can be analyzed into four constitutional parts—fire, air, water and earth, the soul must be made up of a combination of these four elements, together with the principles of love and strife.
>
> Diogenes, taking up the positions of the Jonians (one of whom, Anaximenes, described the soul as having an air like nature that guides and controls the living being.), credited air itself with sentience and intelligence. For Diogenes, air was the element most capable of orgniating movement, because it was the finest element in grain; in this characteristic, he thought, by the grounds of the soul's own powers of knowing and orgniating movement. Moreover he stated, the internal air in the body had an important role in the functioning of each of the sense organs. Similarly some of the Pythagoreans believed that the particles in the air, or the force that moved them, were soul and Heraclitus declared that the soul as first principle was a warm exhalation of which everything else was composed.[২১]

ভারতীয়দর্শনে বিশেষ করে তন্তসাধনায় যোগের মাধ্যমে এই শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ সাধনার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বজ্র এবং সহজযান, সুফিসাধনা এবং বাউলসাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ সাধনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একদিকে যেমন শরীরে দূষিত পদার্থ শোধন করে তা নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন লাভের উপকরণ হিসেবে গণ্য হয়, তেমনি রতিনিরোধ সাধনার জন্যেও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

পরিপূর্ণ রতিনিরোধ সাধনাকে তন্ত্রের ভাষায় মুক্তি বা Liberation নামে অভিহিত করা হয়। একে 'রসসিদ্ধ' নামেও তন্ত্রে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দেবীপ্রসাদ এ সম্পর্কে বলেন :

> The conception of liberation, here is peculiarly physical. To the Tantrikas, liberation meant perfection and development of the body...Thus, it is this conception of physical immortality that gave the Tantrikas the word for mercury (parada). According to them, mercurial preparations could make the body imperishable. To acquire such a state of the body was the highest ideal. Mercury, thus was the giver (da) of the *summum bonum* (para), i.e. it was parada, "The preservation of the body... is obtained by mercury and by (the suppression) of breath, Mercury when swooned, cures diseases and when killed, restores life to the dead.[২২]

তন্ত্রশাস্ত্রের পথ ধরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকে দীর্ঘজীবন লাভ এবং রতিনিরোধের কৌশল হিসেবে বাউলসাধকেরা গণ্য করেছেন। তাঁদের ভাষায় :

দমের মানুষ দমে চলে
আলেক মানুষ আলের উপর।
আর এক মানুষ গোপনে রয়
জেনে শুনে সাধন কর ॥
তিন মানুষর খেলারে মন,
কারে বা কর অন্বেষণ,
তিন মানুষের তিনরূপ করণ,
সদগুরু, মন, আগে ধর॥
জন্মদ্বার আর মৃত্যু দ্বারে
আর এক দ্বার আর কই বা কারে,
মৃত্যুর দ্বারে যে জন্মাইতে পারে
তার সাধন হবে অমর ॥
তিন রতিতে তিন জনে রয়,
আধ রতি মা গোপন রয়
গোঁসাই রামলাল যথার্থ কয়
গোপাল মরার আগে জীয়ন্তে মর ॥

বাউলসাধনায় তন্ত্র ও যোগের প্রভাব

ইতঃপূর্বে বাউলসাধনায় যোগতন্ত্রের প্রভাবের কথা বিস্তারিত বলা হয়েছে। বস্তুত, তন্ত্র ও যোগ বাউলসাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই তন্ত্রসাধনায় মানবদেহকে কয়েকটি চক্র বা পদ্মে কল্পনা করা হয়েছে। এই চক্রকে আবার বৌদ্ধতন্ত্রানুসারে 'কায়া' নামে অভিহিত করা হয়। এখানে তন্ত্র ও যোগের কার্যকরণ আলোচনা করা হলো।

মূলাধার চক্র : মানবদেহের গুহ্যদেশ এবং স্ত্রী-জননাঙ্গের মধ্যভাগে হিন্দুতন্ত্রের মূলাধার চক্র বিদ্যমান। একে মূলাধার পদ্মও বলা হয়। সুষুম্নানাড়ির মুখদেশে এই চক্রের অবস্থান।

স্বাধিষ্ঠান চক্র : স্ত্রীজননাঙ্গের মূলে সুষুম্নার মধ্যস্থ চিত্রিণী নাড়িতে স্বাধিষ্ঠান চক্র/পদ্মা বিদ্যমান। স্বাধিষ্ঠান চক্র/পদ্ম ষড়দল বিশিষ্ট এবং সিঁদুর বর্ণ।

মণিপুর চক্র/পদ্ম : স্বাধিষ্ঠান চক্রের ঊর্ধ্বদেশে নাভিমূলে দশদল বিশিষ্ট মণিপুর চক্রের অবস্থান। বৌদ্ধতন্ত্রে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্র একত্রে নির্মাণকায় গঠিত। এখানেই সৃষ্টির মূল বা নির্মাণ সংগঠিত হয় বিধায় বৌদ্ধতন্ত্রে একে নির্মাণকায় বলা হয়। এই চক্র বা পদ্ম মেঘবর্ণ বিশিষ্ট।

অনাহত চক্র/পদ্ম : মণিপুর চক্রের ঊর্ধ্বে হৃদয়প্রদেশে দ্বাদশদল বিশিষ্ট অনাহত চক্র/পদ্মের অবস্থান। বৌদ্ধতন্ত্রের অনাহত চক্র/পদ্মকে 'ধর্মকায়' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চক্র বা পদ্ম দেখতে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট।

বিশুদ্ধ চক্র/পদ্ম : মানবদেহের কণ্ঠদেশে ষোড়শদল বিশিষ্ট বিশুদ্ধ চক্র/পদ্ম অবস্থিত। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা এই চক্র বা পদ্মকে সম্ভোগকায় বলে অভিহিত করে। রঙ : ধূম্রবর্ণ।

আজ্ঞা চক্র/পদ্ম : চক্ষুর ভ্রুদ্বয়ের মধ্যস্থলে দ্বিদল শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট আজ্ঞা চক্র/পদ্ম বিরাজমান। বৌদ্ধতন্ত্রে এই চক্র স্বীকৃত নয়।

সহস্রার চক্র/পদ্ম : মস্তকের শীর্ষদেশে একটি শূন্যকার স্থানে সহস্রদল বিশিষ্ট পদ্ম বা সহস্রার চক্র অবস্থিত। বৌদ্ধতন্ত্রে এই চক্রকে মহাসুখ চক্র বা উষ্ণীষ কমল

এবং মহাসুখ কমল নামে চিহ্নিত করা হয়। একে 'সহজকায়' বলেও বৌদ্ধধর্মে অভিহিত করা হয়। হিন্দুতন্ত্রে সহস্রার বা সহস্রদল বিশিষ্ট এই পদ্ম নিম্নদিকে প্রস্ফুটিত এবং প্রভাতকালীন উদিত সূর্যের মতো দীপ্তিশীল।

নাড়ি : মানবশরীরে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নাড়ি বিদ্যমান। এদের মধ্যে মেরুদণ্ড যাকে সুষুম্নানাড়ি বলা হয়, তার বামভাগে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা বর্তমান। এই তিন নাড়িই প্রধান। ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাড়ি স্ত্রীজননাঙ্গে বা মূলাধার বা স্বাধিষ্ঠান চক্রে মিলিত হওয়ার কারণে এর সঙ্গমস্থলকে ত্রিবেণী বলা হয়। দেহের সমস্ত নাড়িই মূলাধার বা স্বাধিষ্ঠান চক্র থেকে উত্থিত। বৌদ্ধতন্ত্রে ইড়াকে ললনা, আলি, ধমন, চন্দ্র প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। পিঙ্গলা নাড়িকে বলা হয় রসনা। বৌদ্ধতন্ত্রে রসনাকে কালি, চমন, সূর্য প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়। সুষুম্নানাড়িকে অবধূতী নামেও আখ্যায়িত করা হয়। একে 'দেবী', 'প্রজ্ঞা', 'নৈরাত্ম' 'যোগিনী' ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। এ ছাড়াও বৌদ্ধতন্ত্রে প্রায়শ ললনাকে 'প্রজ্ঞা' ও রসনাকে 'উপায়' নামে চিহ্নিত করা হয়।

ললনা ইড়া বিন্দু বহনকারী, রসনা (পিঙ্গলা) রজঃ এবং অবধূতী (সুষুম্না) উভয়ের মিলিত বস্তু বোধিচিত্র বহনকারী–এ কারণে বৌদ্ধতন্ত্রে 'অবধূতী'কে 'সহজানন্দ রূপী' নামে অভিহিত করা হয়।

যোগসাধনায় মূল ভিত্তি 'বায়ু' বা 'হাওয়া' নাড়িই বায়ু চলাচলের মাধ্যম। এসব নাড়ির মাধ্যমে বায়ুকে শরীরমধ্যে সঞ্চালন ও পরিশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এই নাড়ি প্রাণবাহিনী বা প্রাণক্রিয়ার সহায়ক। এই বায়ুই শক্তিস্বরূপ। এই নাড়ির মাধ্যমে সাধকের দেহস্থ স্থূলবায়ু সূক্ষ্মবায়ুতে রূপান্তরিত হয়। শরীরমধ্যে বায়ুর নিবৃত্তাবস্থাকে বৌদ্ধধর্মের নির্বাণাবস্থার নামান্তর নামে অভিহিত করা হয়।

যোগশাস্ত্রে দেহকে পিণ্ড বা ভাণ্ড নামে উল্লেখ করা হয় এবং এ ভাণ্ডের বা দেহের অভ্যন্তরে নাড়ি জালের মতো ব্যাপ্ত। যোগসাধনায় বায়ুকে এসব নাড়ির মাধ্যমে ঊর্ধ্বগতিদানের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

বাউলগানে তন্ত্রসাধনা এবং যোগসাধনার নানা পরিভাষার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন :

১

কিবা শোভা দ্বিদলের পরে
একরাশ মণিমাণিক্যের রূপ ঝলক মারে ॥
আলোকসম্ভব যে নিত্য গোলকে
তাহে বিরাজ করে পূর্ণ ব্রহ্মলোকে।
হলে দ্বিদল নির্ণয়
সব জানা যায়
বাধা থাকে না সাধন দ্বারে ॥

শত কিংবা সহস্রদল
রসবতি করে চলাচল
ও তার দ্বিদলেতে স্থিতি বিদ্যুৎ আকৃতি
ষড়দলে বারাম যুগান্তরে ॥
ষড়দলে সে তো ষড়তত্ত্ব হয়
দশম দলে মৃণাল-গাতি গঙ্গা বয়,
ও যে তীর ধারা তার, শ্রীগুণ বিচার
লালন বলে গুরু অনুসারে ॥

(লালন)

উপর্যুক্ত বাউলগানে হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় রয়েছে। বাউলের মূল সাধনক্রিয়া যোগমিলন। হিন্দুতন্ত্র সাধনায় প্রকৃতি-মিলনের উল্লেখ আছে। শাক্ত-তান্ত্রিকগণ নানা উপাসনা বা আচার-পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধনা করে। নারীকে শক্তিতান্ত্রিকেরা শক্তির সাক্ষাৎ অংশস্বরূপ বলে মনে করে এবং নিজে শিবভাবে তার সাথে মিলিত হয়। কুমারী, যুবতী প্রভৃতি পূজা শাক্তদের সাধনার অঙ্গ। বাউলসাধনায় কুমারী কন্যার গুরুত্ব আছে। একে 'অখণ্ড' সাধনা নামে অভিহিত করা হয়। বাউলের দেহসাধনায় তন্ত্রের প্রকৃতি সাধন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তবে এই সাধনায় সুফিপ্রেম সাধনা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় একে যেমন 'রসের সাধনা' বলা হয় তেমনি এই সাধনপন্থাকে 'রাগের ভজন' বা 'রাগের করণ' নামেও চিহ্নিত করা হয়। নারী-পুরুষের যুগল মিলনই এই 'রাগের ভজন' বা 'রাগের করণ'। 'বীর্য' মানবদেহের সারবস্তু। একে বাউলের ভাষায় 'বিন্দু' বলা হয়। এই 'বিন্দু' রক্ষা করা বাউলসাধনায় একটি বিশেষ দিক। চর্যাগীতিকাতেও তার পরিচয় পাওয়া যায় :

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশি মণ্ডল।
চি অরাজ সহাবে মুকুল।
(না, নাদ, না বিন্দু না রবি, না শশি মণ্ডল
চিত্তরাজ স্বভাবে মুক্ত।)

এখানে উল্লেখ্য : বাউল এবং অন্যান্য লোকধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তারা কেবল দেহসাধনায় নিবিষ্ট থেকেছে, কিন্তু বাউল দেহকে অতিক্রম করে দেহাতীতে পৌঁছুনোর সাধনা করেছে। অর্থাৎ কামকে জয় করে তারা কামাতীত জীবনের সাধনা করছে। ইতঃপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি যে, বাউলসাধনায় তন্ত্র এবং যোগসাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, হিন্দুতন্ত্রে দেহের অভ্যন্তরে ষট্‌চক্রের অবস্থান সম্পর্কে বলা হলেও বৌদ্ধতন্ত্রে এই চক্র ৬টির পরিবর্তে ৪টি এবং তাদের নাম চক্রের পরিবর্তে 'কায়'। তবে সাধনার ধারা নির্মাণে বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দুধর্মের প্রাধান্য রয়েছে। যেমন : হিন্দুতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, মূলাধার

চক্রে সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তাকে প্রাণ ও অপ্রাণ ক্রিয়া দ্বারা শক্তিকে জাগ্রত করে সুষুম্না নামক নাড়ির মাধ্যমে ক্রমেই ঊর্ধ্বপানে উত্থিত করতে হবে। হিন্দুতন্ত্রের এই প্রাণ-অপ্রাণ বায়ুর ক্রিয়া বাউলের নিকট 'দমের সাধনা' নামে অভিহিত। বীর্য বা বিন্দুকে ধারণ করে তাকে ঊর্ধ্বগতি প্রদান বাউলসাধনার অন্যতম প্রক্রিয়া। বিন্দুকে এই ঊর্ধ্বগতি প্রদানের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয়। বাউলসাধনাকে এই অর্থে তাই ঊর্ধ্বায়নের বা 'উজানসাধনা' নামেও অভিহিত করা হয়। একে কেউ 'উল্টা' সাধনা নামেও আখ্যায়িত করে থাকে।

বাউলসাধনায় যে প্রকৃতিসাধনা হাওয়া বা দমের সাধনা, গুরুর প্রাধান্য এবং দেহের মধ্যে ইষ্টকে অন্বেষণ ইত্যাদি আমরা দেখি; তা চর্যাগীতিকা, বৈষ্ণবগীতিকা এবং অন্য লোকধর্মের গীতিকাতেও প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু বাউলের 'মনের মানুষ' সাধনা বাউলদের নিজস্ব সাধনা। এই সাধনার উৎস সুফিসাধনা।

বাউলসাধনায় অরূপতত্ত্ব এই সুফিসাধনা প্রভাবিত। বাউলসাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রেম ও প্রেমের আকুতি। কাম এই প্রেমের মাধ্যম কিন্তু কামাচারিতায় তা নিঃশেষিত নয়। বাউলসাধনায় 'চারিচন্দ্র ভেদ' সম্পর্কীয় সাধনপ্রক্রিয়া লক্ষ করা যায় কিন্তু তা দেহকে জানার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। বাউলসাধনা এখানেই শেষ বা আবর্তিত নয়। দেহ থেকে দেহাতীত জীবনে 'অচিন পাখি', 'মনের মানুষ' বা 'অধর মানুষ' সম্বন্ধে ধারণা লাভ বা তাঁর অন্বেষণই বাউলের কাম্য। এজন্য বাউলের গানে একটি বিরহবোধ সাধকের মনে সদাজাগ্রত থাকে। বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা নর-নারীর রাধাকৃষ্ণ নাম জপেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এখানেও দেহসম্ভোগই প্রেমের মুখ্য হয়েছে। বাউলসাধনায় এসবের একটি সমন্বয় লক্ষ করা যায়। বাউলগানে তন্ত্র ও যোগসাধনার পরিচয়স্বরূপ কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

১

আমার মন, সাজ প্রকৃতি।
প্রকৃতির স্বভাব ধর, সাধন কর, ঊর্ধ্ব হবে দেহের রতি ॥
যে আছে ষড়দলে, তারে লও উল্টা কলে,
যদি সে ধায় দ্বিদলে উঠবে জ্বলে জ্যোতি।
তখন অনর্থ নিবৃত্তি হবে, নিষ্ঠা হবে রতি
কামব্রহ্ম আকার হবে গুরুর মূর্তি ॥
যে আছে মূলাধারে, তারে লও সহস্র দলে
যাবি বিরজার পারে তাহার সংহতি।
যেই যুবতী রসবতী, রসময় সুরতি
এমন মধুর রতিজীবকে দিয়ে
প্রাপ্ত করায় কৃষ্ণপতি ॥

রূপচাঁদ বলছে স্বরূপ, আগে তুই ধরগে সে রূপ
স্বরূপ রূপে রূপ দেখতে পাবি কোটি সূর্যের জ্যোতি।
গুরু ভিন্ন হবে না রে মূঢ় মতি,
গুরুর দয়ায় সকল হবে কৃষ্ণ কৃপা প্রাপ্তি ॥

২

আর কেন মন ভ্রমিছ বাইরে
চল না আপন অন্তরে।
তুমি বাহিরে যারে তত্ত্ব কর,
অবিরত সে যে আজ্ঞা চক্রের উপরে ॥
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বয় মূলাধারে
প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে
শক্তি চেতন হলে পূর্ণানন্দ মিলে,
তোমার সদানন্দ স্বরূপ একবার দেখ না।
বামে ইড়ানাড়ি, দক্ষিণে পিঙ্গলা
রজঃ তমঃ গুণে করিতেছে খেলা
মধ্যে বিরাজ সুষুম্না,
তারে ধর না কেন সাদরে।
তখন আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে
উদয় হবে প্রাণে
তুমি যারে খোঁজ সদায় বাহিরে।
(নবীন)

৩

খেলছে মানুষ বাঁকা নলে।
পঞ্চভূত বড়ই মজবুত, ঘিরে আছে দশম দলে ॥
সে দেশের উল্টো কথা, ফুলে খায় ফলের মাথা
হুঙ্কারে ঝুলছে লতা আজব তরু বলে।
উঠছে তায় কিরণের ছবি, যেথা দিনে চন্দ্র রাত্রে রবি,
দেখলে তুই খাবি খাবি, জলের ভিতর মণি জ্বলে ॥
যোগশক্তি তাহার ভূষণ, মূলাধারেতে আসন,
যখন করে আকর্ষণ ঊর্ধ্বে সদা চলে।
আলো করে সপ্ত তালা, প্রভু গুপ্ত ঘরে হন উজালা
সে কমল বোঁটা খোলা
রসভরে আপনি দোলে ॥
(গোপাল)

গ্রিকদর্শনে আত্মাকে দেহের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস এই আত্মার সঙ্গে অঙ্গীভূত। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে, গ্রিকদর্শনে আত্মার যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, বাউল মতবাদেও আমরা তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

১

আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে
আমি জনম-ভরে একদিন দেখলাম নারে ॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
আমি দেখতে পাইনে এই নয়নে,
হাতের কাছে যার
ভবের হাট বাজার
আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে ॥
সবে কয় সে প্রাণপাখি
শুনে চুপে চেয়ে থাকি,
জল কি হুতাশন
মাটি কি পবন
কেউ বলে না একথা নির্ণয় করে।
আপন ঘরের খবর হয় না।
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা
লালন বলে পর বলতে পরমেশ্বর
সে কেমন রূপ আর আমি কী রূপ রে ॥

২

আপনি আপনার মনের না জানো ঠিকানা
পরের অন্তর সে যে সমুদ্দর, কী সে যাবে জানা ॥
পর অর্থে পরম ঈশ্বর
আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদলে হয় বারাম খানা,
শতদল সহস্রদল তার ঠিকানা
কেশের আড়লে যৈছে
পর্বত লুকিয়ে আছে দরশন হয় না ॥
এবারে হেঁট নয়ন যার
সে যে নিকটে তার
সিদ্ধি হয় তার সব কামনা ॥
সিরাজ সাঁই কয়, ওরে লালন
গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জেনে নে না ॥

বাউল তার অনেক গানে এই আত্মাকে মনের মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছে যার হদিস আজো সে পায়নি। গ্রিকদর্শনে জানা যায়, প্লেটো এই আত্মাকে স্বর্গীয় বস্তু হিসেবে বিবেচনা করেছেন :

> Of the words Plato used for 'soul' including *Nous*, *Soma*, *Psche* and *Genesis Psuche* was the closest to a concept that incorporated breath... In Plato, however, Psuche designates a comprehensive personal soul, the divine aspect of man that is the seat of rational inteligence and moral choice entirely separate from the body.[২৩]

গ্রিকদর্শনে আত্মাকে প্রাণবায়ু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। যা হোক, এই আত্মা সম্বন্ধে কোনো দর্শন সঠিক কিছু বলতে পারেনি। তন্ত্রের দেহবাদী সাধনায় এই আত্মাকে দেহের সঙ্গে বিবেচিত করা হয়েছে। কখনও কখনও সমগ্র দেহই আত্মা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই আত্মা সম্পর্কে বলা হয় :

> The self (Atman) which is free from evil, ageless, deathless, sorrowless, hungerless, thirstless, whose desire is the Real, whose conception is the Real—He should be searched out, Him one should desire to understand.[২৪]

অতঃপর শঙ্করাচার্য লোকায়ত দর্শনে আত্মার ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন :

> Unlearned People and the Lokayatikas are of opinion that the mere body endowed with the quality of intelligence is the self... Here now some materialists (Lokayatikas) who see the self in the body only, are of opinion that a self separate from the body does not exist.[২৫]

দেহ এবং আত্মা সম্পর্কে এই ধারণা সুপ্রাচীন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সবসময় এই ধারণা একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি। লোকায়ত দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে।[২৬] তন্ত্রে দেহই সর্বস্ব, কিন্তু যোগে দেহের বাইরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে। আলোচ্য বাউলসাধনায় আমরা তন্ত্র এবং যোগের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখি।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বাউলসাধনা একটি সমন্বয়মূলক ধর্মসাধনা। এই সাধনায় বিভিন্ন ধর্মসাধনার মিলন ঘটেছে। এই সাধনায় দেহবাদ প্রাধান্য পেয়েছে ঠিকই কিন্তু দেহবাদেই এই সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। এখানে বলা অসংগত নয় যে, বাংলাদেশে চর্যাপদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন লোকধর্মে বৈদিক আচারকে

অস্বীকারের কথা বলা হয়েছে। এই অস্বীকারের মূলে মূর্তিপূজা। প্রাথমিক পর্যায়ে বেদে কোনো মূর্তিপূজার উল্লেখ ছিল না, নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা ছিল। কালক্রমে মূর্তিপূজা অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দেবতাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠাও হয় বর্ণবাদের মাধ্যমে। কিন্তু উপনিষদে মূর্তিপূজার উল্লেখ নেই। যোগসাধনায় ঈশ্বরের পরিচয় আছে। কিন্তু দেহ তার বাহন। যোগ গুরুবাদী সাধনা। এই দেহের গুহ্য সাধনায় গুরু অবিসংবাদী নেতা।

দেহের তত্ত্ব জানবি তবে আগে গুরুর চরণ ধর
পাবিরে তুই নিত্য দেহে চারিচন্দ্র সাধন কর।

যোগের এই পথ ধরে বাউলসাধক বলেন :

১

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে
যাবে তার সব সংসার
অমূল্য ধন সেই হাতে পাবে।
(লালন)

২

গুরু যারে কৃপা করে, সেই যায় পারে
অনায়াসে ডঙ্কা মেরে।
থামে না মন্দ, মেটে দ্বন্দ্ব, নিত্যমানুষ দীপ্ত করে ॥

বাউলসাধনার এই ধারার সঙ্গে গুরুর প্রকারভেদ আছে। এই গুরু কখনও দীক্ষা গুরু, কখনও নারী সঙ্গিনী হয়ে চেতন-গুরু এবং সর্বোপরি আরাধ্য-গুরু।

বলেছি, বাউলসাধনায় দেহকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সে কারণে এই সাধনায় গুরুর প্রাধান্য। গুরু ব্যতিরেকে এই সাধনায় সফলতা আসবে না। তাই মুর্শিদ একজন শিষ্যের জীবনে অপরিহার্য। বাউলসাধনায় সৃষ্টিতত্ত্ব এককভাবে গুরুত্ব লাভ করেনি। দেহতত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই সাধনায় অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জন্মান্তরবাদ বা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো বাউল পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেননি কিন্তু তাদের অবচেতন মনে জন্মান্তর বা বিবর্তনবাদেরও উল্লেখ রয়েছে। ইরানে সুফিসাধনা অন্যান্য ধর্মীয়দর্শনের সঙ্গে গ্রিক ও বৌদ্ধদর্শনকে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিল। ফলে ভারত এবং বাংলাদেশে এই সাধনা বৌদ্ধধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে। এসবের ফলে বাউলগানে এই বিবর্তনবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বাউলতত্ত্ব

বাউলসাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণে আমাদের যে বিষয়টির আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা এই সাধনার তত্ত্বকথা।

এই তত্ত্বকথাটি আমরা কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

এক. দেহতত্ত্ব
দুই. আত্মতত্ত্ব
তিন, মনের মানুষ তত্ত্ব
চার. গুরুতত্ত্ব

দেহতত্ত্ব

বাউলসাধনার দেহতত্ত্ব আলোচনায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তন্ত্রের দেহতত্ত্বের কথা আসে। কারণ তন্ত্র এদেশের আদিতম সাধনমার্গ। অনেকে সাংখ্য, যোগ এবং তন্ত্রকে এক এবং অভিন্ন আখ্যায় চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।[২৭] সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি পুরুষের উল্লেখ দেখতে পেয়ে হয়তো কারো কারো মনে এমন ধারণা হয়েছে।

এই মতে বলা হয়েছে : সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র সুপ্রাচীন দেশীতন্ত্র ও শাস্ত্র। Pagan-যুগের যাদুবিশ্বাস এবং টোটেম স্তরের মৈথুনতত্ত্ব থেকে এর উদ্ভব। সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব বা দর্শন আর যোগ ও তন্ত্র এর দ্বিবিধ আচারশাস্ত্র। এসব তত্ত্ব ও আচারের জন্ম হয়েছে আদিম মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তাব্যবস্থার চিন্তায় ও কর্মে। অতএব, মূলত এক অভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্রই কালে দুই নামে দুইরূপে প্রকৃতপক্ষে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তন্ত্র, সাংখ্যদর্শনেরও বহুপূর্বের ধ্যানধারণা। আমি ইতঃপূর্বেই এ-কথা আলোচনা করেছি। সাংখ্যের প্রচলিত মতানুসারে পুরুষচেতন (Soul) এবং নারীপ্রকৃতি বা matter বুঝিয়েছে। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে কালক্রমে সাংখ্যের পুরুষ আত্মাবাচক বা soul-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু আদিতে সাংখ্যের পুরুষ বলতে আত্মা বুঝায়নি। তার বদলে সাংখ্যের পুরুষ রক্ত-মাংসের পুরুষমানুষ বলে গণ্য হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাউলসাধনায় বিভিন্ন সহজিয়া সাধনার যে একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা এই দেহসাধনা। তন্ত্রের মূলকথাই হচ্ছে—এই দেহসাধনা। এই দেহসাধনাই কালে শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এবং বাউল মতবাদে স্থান লাভ করেছে। এ সম্পর্কে Sir John Woodroffe বলেন :

> "The word 'Tantra' by itself simply means 'treatise, and not necessarily a religious scripture. When it has the latter significance, it may mean the scriptures which vary in doctrine and practice, Thus there are Tantras of Shaivas Vaishnavas and Shaktas and of various subdivisions of these.[২৮]

এখানে উল্লেখযোগ্য, বাউলসাধনায় যে দেহসাধনা তা নিরবচ্ছিন্ন তান্ত্রিক মতবাদপুষ্ট নয়; এই দেহসাধনা সুফিবাদ দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। বাউলসাধনায় নারীর প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু পুরুষের স্থান এখানে গৌণ নয়। সাংখ্যদর্শনের মতো পুরুষ এখানে উদাসীন নয়। বাউলসাধনায় পুরুষ সক্রিয়। এই সাধনায় পুরুষ এবং নারী উভয়েই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই সাধনা যুগলসাধনা। তবে সাধনার অনেক গুপ্ততত্ত্ব নারীর গোচরীভূত, তাই নারীর প্রাধান্য। কিন্তু এই সাধনা একটি বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত হবার পর পুরুষ তার স্বকীয়ত্ব হারিয়ে নারীত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন সাধনায় নারীর প্রয়োজন হয় না। পুরুষই এক অর্থে সেখানে নারী। কারণ পরিপূর্ণ নারীস্বভাব না হলে আত্মসমর্পণ সম্ভব নয়; ফলে সাধনাও সার্থক হতে পারে না। এই ধারণা নিঃসন্দেহে অনার্য ভাবনাজাত এবং সূত্রানুসারে তান্ত্রিক মনোভঙ্গিপুষ্ট।

সুফিসাধনার প্রাথমিক স্তরে ঈপ্সিতকে প্রেমিকা বা 'মাশুকা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়ে মাশুকে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই পরিবর্তন আসে সে সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু বলতে পারে না। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> I do not take up the question why the Beloved is described as a male (masuq rather than masuqah) : therein we may see an influence of Mediterranean people which I need not enter in this connection.
>
> From absence of evidence from any other side, I feel inclined to think that this was in its origin a purely Iranian idea.[২৯]

এ সম্পর্কে কোনো বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। কারণ সময়ের বিবর্তনে বহু সময় বহু ভাবনা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এ দেশে যেমন পরমার্থকে পুরুষরূপে কল্পনা

করা হয়েছে আবার তেমনি তাকে নারীরূপেও চিহ্নিত করা হয়েছে। কোনো সময় এই চিত্র মিশ্রিতও হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী উভয়েই মিশ্ররূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল কাব্য তার প্রমাণ বহন করে।

যা হোক, আমাদের মূল বক্তব্য মানবদেহ বা দেহতত্ত্ব। বাউল মতবাদের এই দেহতত্ত্বের মূল বক্তব্য এই : যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। অর্থাৎ নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব এবং সর্বমানব। এই ভাবনা উপনিষদেরও। সর্বকালের সর্বধর্মে এমনি ধরনের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনে হয় এই কারণেই মানবদেহ সর্বকালের, সর্বজাতির, সর্বমানুষের সাধনার ধন। বাউল তাই বলে, তাদের এ মতবাদ আদিকাল থেকেই নিত্যপ্রবহমান। লালন ফকির বলেন :

খ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।

বাউলসাধকের এই দেহবাদের মূল বক্তব্য এই যে, দেহের মধ্যে মানুষের মুক্তি এবং তাতেই তার পরম শান্তি। এই দেহের অভ্যন্তরে আত্মার অবস্থান। এই আত্মা স্বর্গীয় পদার্থ। তিনি পরমার্থ নন, কিন্তু তাকে ছাড়া পরমার্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ। পরমার্থ আত্মার দোসর। তিনি দেহের কোনো অংশ নন, কিন্তু তার অবর্তমানে দেহের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না।

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখনা রে মন ভেয়ে
দেশ দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ॥
করে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ মক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে।
ও তার চার দ্বারে চার নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে ॥
মানুষ মক্কা কুদরতি কাজ
উঠেছে রে আজগবি আওয়াজ
সাততালা ভেদিয়ে।
আছে সিং দরজায় দ্বারী একজন নিদ্রাত্যাগী হয়ে ॥
দশ দুয়ারী 'মানুষ' মক্কা
গুরু পদে ডুবে দেখ গা
ধাক্কা সামলিয়ে ॥

ফকির লালন বলেন সে যে গুপ্ত মক্কা
আদি ইমাম সেই মিঞে ॥

সুতরাং স্পষ্টত বোঝা যায় যে মানবজীবনই বাউলসাধকের সাধনার ধন। তার সাধনা অনুমাননির্ভর নয়, প্রত্যক্ষ বা বর্তমানকে কেন্দ্র করে গঠিত। এই মানবদেহের মধ্যে পরমার্থের বাস। এই পরমার্থকে উপলব্ধি করাই তার সাধনার লক্ষ।

এই দেহ সম্বন্ধে বাউল অত্যন্ত সতর্ক। তাই লালন বলেন :

কী বা রূপের ঝলক দিচ্ছে দিদ্বলে
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে।
ফণী মণি সৌদামিনী জিনি এরূপ উজলে ॥
অস্তি চর্ম স্বর্ণ রূপ
তাতে মহা রসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে।
ও তার এক বিন্দু অপার সিন্ধু
হয় রে এই ভূমণ্ডলে ॥
উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থ ব্রত যার জন্যে
এ দেহে তার সব মেলে ॥
রসিক যারা সচেতন
রসরতি টেনে সে জন
রূপে উদয় খেলে
লালন গোড়া লেংটি এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ ভুলে ॥

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, বাউলসাধনা দেহবাদতন্ত্রের দেহবাদ অপেক্ষা কিছু ভিন্নতর ভাবনাজাত। বাউলসাধনার দেহবাদ অধ্যাত্মপন্থী। কিন্তু তন্ত্রে দেহবাদে দেহই সার। তন্ত্র মনে করেন : 'মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই, এমন যন্ত্র আর কেহ গড়িতে পারে না, এমন যন্ত্র নির্মাণ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে অন্য কোনো স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার সকল কামনা পূর্ণ হইতে পারে।...প্রকৃতির সকল গুপ্তশক্তিসমূহের সহিত দেহের গুপ্তশক্তির কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কীভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বা কীভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারা যায়, ইহা সে সাধনার ফলে জানা যায় বা আয়ত্ত করিতে পারা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা। এই তন্ত্রসাধনার মূল হইল দেহতত্ত্ব। তাই দেহের কথা লইয়া তন্ত্র আগাগোড়া ব্যস্ত।[৩০]

তন্ত্রের দেহবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব একই সূত্রে বাঁধা। মানবদেহ যে পদ্ধতি অনুসারে গঠিত হয়ে থাকে সেই একই পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র পৃথিবী এবং বিশ্বও গঠিত। তন্ত্রের মতে মহাকাশে যে স্পন্দন অনুভূত হয় তাই মানব-মানবীর মধ্যে কামলীলা। এই কামলীলায় বিশ্বে সৃষ্টি যেমন সম্ভব, তেমনি নরনারীর মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটে থাকে।

বাউলসাধনায় এই একই নিয়মের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তবে বাউলসাধনায় তন্ত্রসাধনার মতো বিভিন্ন নাড়ির ব্যবহার যথাযথভাবে লক্ষ করা যায় না। এই সাধনায় অনেক নতুন কল্পনা, বিশেষ করে সুফি ধ্যানধারণামূলক বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ষটচক্র সুফি ধ্যানধারণার ছয় লতিফাতে রূপান্তরিত হয়েছে। তান্ত্রিক মতবাদের স্তরবিন্যাসও সুফিবাদের মাকামে পরিগণিত হয়েছে।

যাহোক, বাউলসাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে এই দেহসাধনা। এই দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে বিশ্বসৃষ্টি তথা দেহের অভ্যন্তরে সাঁই-এর স্বরূপ বোঝা সহজসাধ্য নয়। রাধেশ্যাম বলেন :

আগে দেহের খবর জানগে রে মন,
তত্ত্ব না জেনে কী হয় সাধন।
দেহে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল
চৌদ্দভুবন কর ভ্রমণ ॥
এই দেহে হয় চল্লিশ তত্ত্ব
গুরুবর্ত করে দেখলি নারে
হয়ে অহঙ্কারে মত্ত।
আছে চব্বিশ উপর তিন তত্ত্ব
যাতে মত্ত হয় রসিকগণ
আরো আঠারো বীজে দেহ গঠন হয়েছে
পিতার চার আর মাতার চার
দেখ রয়েছে।
আরো গুরু যে তার দশ দিয়েছে
সে কথা কি নাই স্মরণ।
বলি ওরে মন কানা, তোর ভ্রম তো গেল না,
দেহের মধ্যে কে আপন পর, তাওতো চিনলি না
এবার যত্ন করে গুরু দ্বারে চক্ষে দিলি না রে জ্ঞানাঞ্জন ॥
এই দেহেতে আছে বাইশ মোকাম
কে কোথার কার বা কোন স্থান,

দেখ না খুঁজে কোথায় বিরাজে
তোর পরম গুরু আত্মা রাম
খ্যাপা রাধেশ্যাম না জানিস তত্ত্ব প্রমাণ
গোঁসাই গুরু চাঁদের এই বচন ॥

বাউলসাধনা দেহকে গুরুত্ব দিয়েছে সত্য, কিন্তু এই দেহের নিজস্ব কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই। আত্মার শক্তিতেই দেহের শক্তি। বাউলসাধক মনে করে আত্মা সচেতন এবং দেহ অচেতন। কিন্তু এই দেহই আত্মচৈতন্যের মূল। এই দেহ ব্যতিরেকে আত্মার কোনো সার্থকতা নেই। দেহের জন্যই আত্মা এবং আত্মার জন্যই এই দেহ। দুই-ই একে অপরের পরিপূরক। তবে আত্মা অবিনশ্বর, দেহ নশ্বর। বাউল নবদ্বীপ দাস বলেন :

সচেতনের আপনি মূলধার
বল, ঘুম ভাঙায় ভবে কেবা কার ॥
সচেতনের আপনি মূলাধার
আমি কে, তা জানতে পারলে
পাবি রে নিস্তার ॥
এই ভাণ্ডের ভিতরে কত ব্রহ্মাণ্ডে
ঘুরছিস অনাহুত জীবনভর ॥
এই চৌদ্দ পোয়া দেহেরি ভিতর
স্থূল-সূক্ষ্ম জীব বহুতর,
ঘরের ভিতর ক'রে আছে ঘর,
তারা নীরের ভিতর খাচ্ছে রে ক্ষীর
সচেতনে হংস-হংসীর হয় বিহার ॥
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে
দেহের গঠন হয় ক্রমে
এই পঞ্চতত্ত্ব পঁচিশ তত্ত্ব
ভুলিস না ভ্রমে।
ওই যে আজ্ঞাচক্রে মায়াবিনী
করে কুহকেতে অন্ধকার ॥
ওই দেখ বীণাযন্ত্রে সুরটি বেঁধেছে,
মধুর ঝঙ্কার দিতেছে,
ঐ দেখ বাগবাদিনী
আহ্লাদিনী জেগে রয়েছে ॥
হংস-হংসী রূপে গুপ্ত
হয়ে আছে মূলাধার ॥

গোঁসাই বলাইচাঁদের এই বাণী
সেই তো জগৎ চিন্তামণি
সচৈতন্য আছেন যে তিনি,
দাস নবদ্বীপ তুই আধার মাত্র
গুরুকে দান করো দেহ আপনার ॥

চারিচন্দ্র

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু নামধারী বৈষ্ণব-বাউলেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মানুযায়ী তাদের সাধনপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকে। বাউল নবদ্বীপ সমগ্র মানবদেহের গঠন উপাদান হিসেবে যে পাঁচটি উপাদান অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, ত্যেজ, মরুৎ, ব্যোম-এর উল্লেখ করেছেন, মুসলিম বাউল সেখানে আব, আতশ, খাক, বাত—এই চারটি উপাদানের কথা বলে থাকেন, তবে আত্মাসহ এই উপাদানের সংখ্যা পাঁচ।

ইংরেজিতেও Earth, Water, Air, Fire এই চারটি উপাদানে দেহ গঠিত বলে উল্লেখ করা হয়। সহজিয়া এবং বাউলসাধনার পরিভাষা অনুসারে অবশ্য এই চারটি উপাদানকে চারিচন্দ্র নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই চারিচন্দ্র ফকিরি পরিভাষায় লাল, জরদ, ছিয়া, ছফেদ নামেও চিহ্নিত করা হয়।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই মানবদেহ বলতে শুধু নির্গুণ দেহ বুঝায় না। এই দেহেতে প্রাণ প্রবিষ্ট হওয়ায় দেহ সগুণত্ব লাভ করে। উল্লিখিত চারটি উপাদানই সগুণাত্মক। মানবদেহ বলতে আমরা নির্গুণ এব সগুণ দেহবিশেষ বুঝেছি।

Sir John Woodroffe এই চারটি উপাদান সম্পর্কে লোকায়তিক অর্থাৎ বস্তুবাদীদের ধারণা উল্লেখ করে বলেন :

> According to the Lokayata school of Indian materialism, mind was considered to be the result of the chemical combination of the four forms of material substance—earth, water, fire and air in organic forms.[৩১]

তান্ত্রিক মতানুসারে বলা হয়েছে যে মন চারটি উপাদানে তৈরি। উল্লিখিত উপাদানগুলিই মনের এই চারটি উপাদান। আমার ধারণায় এই চারটি উপাদানবিশিষ্ট শক্তিকে মন না বলে জীবন বা প্রাণশক্তি বা *life force* বলা যুক্তিসংগত এবং বাউলেরা সেই অর্থেই চারিচন্দ্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

লালন ফকির তাঁর গানে বলেন :

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
আমি জনম-ভরে একদিন দেখলাম নারে ॥

নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
আমি দেখতে পাইনে এই নয়নে,
হাতের কাছে যার
ভবের হাট বাজার
আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে ॥
সবে কয় সে প্রাণপাখি
শুনে চুপে চেপে থাকি,
জল কি হুতাশন
মাটি কি পবন
কেউ বলে না এ কথা নির্ণয় করে ॥
আপন ঘরের খবর হয় না
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা
লালন বলে পর বলতে পরমেশ্বর
সে কেমন রূপ আর আমি কী রূপ রে ॥

লালন ফকির এইগানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রাণশক্তির সংজ্ঞা জ্ঞাপন করেছেন। এই প্রাণশক্তি যে চারটি উপাদানে গঠিত সে সম্পর্কেও তিনি তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়, ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়'—এই প্রাণশক্তিকে তিনি বাউল পরিভাষায় 'অচিন পাখি' বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রাণশক্তি বা অচিন পাখিকে 'মনের মানুষ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে, লালন ফকির যাকে 'অচিন পাখি' বলেছেন, তিনি তার মনের মানুষও বটে; কিন্তু তিনি 'মন' নন, বরং মনকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং এই শক্তিকে মন আখ্যায় চিহ্নিত করা নিতান্তই অসংগত। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য চারিচন্দ্রকে মল, মূত্র, রজঃ এবং বীর্য বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩২]

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল চারিচন্দ্রকে সোজাসুজি 'মন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনের চারটি পর্যায়ক্রম নির্দেশ করে বলেন :

> In search of the self when the mind reaches its fourth developed state, and the realization of self is about to be attained, there occurs the chandara bhed (of splitting of the moons.)[৩৩]

মনীন্দ্রমোহন বসু চারিচন্দ্র ভেদকে *Piercing of the four moons* বলে চিহ্নিত করেছেন এবং এই চারিচন্দ্রভেদ বাউলদের একটি বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৪] উল্লিখিত পণ্ডিতবর্ণ বাউলসাধনার মূল ভাবনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত না-হওয়ায় সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

আমরা স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করলে দেখি, আমি একজন মানুষ। আমি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রাণবায়ু গ্রহণ করে সবলত্ব লাভ করি। এই সবলত্ব লাভে আমার দেহে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং তখন আমি আমার জ্ঞান বিবেক সবকিছুকে পরিচালিত করি। এখন প্রশ্ন জাগে : এই প্রাণবায়ু কী? নিঃসন্দেহে এই প্রাণবায়ু উল্লিখিত চারটি উপাদানের কোনো একটিমাত্র নয়। এ-কথা সত্য যে আব, আতস, খাক, বাত; বা আগুন, পানি, বাতাস এবং মাটি। এই চারটি উপাদানে শক্তির উৎপাদন হতে পারে। মানবজীবনে এই চারটি উপাদান জীবনীশক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম, কিন্তু জীবনদান করতে সক্ষম নয়। এই জীবনদান আল্লাহর হাতে। মানবদেহের এই চারটি উপাদান বিশ্লেষণ করে তবে আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভব। ইসলামে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান এবং সকল শক্তির উৎস বলা হয়ে থাকে। তিনি নিরাকার। মানবদেহে যে চারটি উপাদান আছে তাতে 'প্রাণ' নামক আরেকটি শক্তি সন্নিবিষ্ট হলে মানবদেহ সচল হয়ে ওঠে। এই 'প্রাণবায়ু' অপার্থিব এবং স্বর্গীয় পদার্থ। একে 'আত্মা' বলা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এই আত্মাকে আল্লাহ প্রদত্ত 'আদেশ' বা *Order* বলা হয়েছে। সৃষ্টির মূলে যে জীবন এবং মৃত্যু তা এই আদেশের বলেই। সৃষ্টির সবকিছুতে এই প্রাণ আছে। কিন্তু মানুষের নিকট 'প্রাণ'সহ আরেকটি শক্তি আছে তাকে 'আত্মা' বলা হয়। প্রাণ এই আত্মার দোসর। এই প্রাণ এবং আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধানই বাউলসাধনা। প্রাণ এবং আত্মা দুটি ভিন্ন, যদিও উভয়ের উৎস এক। অর্থাৎ দুটিই স্বর্গীয়। প্রাণের মাধ্যমে আত্মা সচল হয়। আত্মার কারণেই মানবজীবনের গৌরব এবং সমৃদ্ধি। এই জন্য লালন তার গানে বলেন :

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না ॥
খুঁজি তারে আসমান জমি
আমারে চিনি না আমি
এ কী বিষম ভুলে ভ্রমি
আমি কোন্ জন, সে কোন্ জনা ॥
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না ॥
হাতের কাছে হয় না খবর
কী দেখতে যাও দিল্লি লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম গেল না ॥

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, বাউলগানে চারিচন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে এবং বাউলের গানে এই চারিচন্দ্রের ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট। মুসলিম বাউলেরা অনেকক্ষেত্রে 'চার পেয়ালা'

নামে চারিচন্দ্রের উল্লেখ করেছে এবং বাউলের গান এই চারিচন্দ্রের ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট। তবে আরও এক পেয়ালার কথা জানা যায়—সর্বমোট পাঁচ পেয়ালা। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য চারিচন্দ্রকে রজঃ, শুক্র, বিষ্ঠা ও মূত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বাউলদের ভাষায় রজঃকে 'রূপ', শুক্রকে অনেক সময় 'রস', আবার কখনও মাটি এবং মূত্রকে 'রস' বলা হয়। রতি অর্থে-স্ত্রীবীর্য। তিনি 'চারিচন্দ্র ভেদ' বলতে দেহনিসৃত রজঃ, শুক্র, মল ও মূত্র ইত্যাদি পুনরায় দেহে গ্রহণ করাকে বুঝেছেন। তাঁর মতে বাউলেরা বিষ্ঠাকে ক্ষিতি, মূত্রকে অপ, তেজকে রজঃ এবং মরুৎকে শুক্রের প্রতীক বলে মনে করে। তাঁর ধারণায় দেহের এই চারটি উপাদান দেহের মধ্যে পুনরায় গ্রহণ করা হলে দেহের একটি পরিবর্তন সাধিত হয়। অধিকাংশ বাউলসাধকের মতে এই 'চারিচন্দ্র' দেহে পুনরায় গ্রহণ করা হলে দেহ পরিপক্ব হয় এবং সাধক-সাধিকার মনে একটা স্থির অচঞ্চল শক্তির সৃষ্টির হয়। একে সাধক সাধিকার অন্তরে ভাবের উপযোগী অবস্থা বলেও উল্লেখ করা হয়।[৩৫]

লালন বলে, সাধারণ মানুষ এই 'চারিচন্দ্র' গ্রহণের ভেদ বা মর্ম জানে না। তিনি একে সাধকের 'অটল অবস্থা' বলে উল্লেখ করেন। লালন তাঁর গানে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন :

১

সবাই কি তার মর্ম জানতে পায়
জানে ভজন সাধন করে
যে সাধন অটল হয় ॥

২

হুজরে হলে নিকাশ জানা যাবে পাওনা দেনা
লক্ষজনে আছে ঘিরে, বেরাদর তোর ফি-জনা ॥
ক্ষিতি, জল, বাই, হুতাশন
আকাশে হয় তাদের মিলন
তাই দিয়ে সব বস্তু গঠন
সবার গোড়ায় এই পাঁচজনা ॥

৩

চেয়ে দেখ নারে মন দিব্য নজরে।
চারিচাঁদ দিচ্ছে ঝলক
মণিকোঠার ঘরে।
হলে সে চাঁদের সাধন
অমর চাঁদ হয় দরশন,
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ঘিরে ॥

বাউলের গানে চারিচন্দ্রের ব্যবহার দেহসাধনাকে কেন্দ্র করে। এখানে চারিচন্দ্রের পরিবর্তে তারা কখনও চার পেয়ালার কথা বলেছে। চারিচন্দ্রের মিলন যেমন ঘটে আকাশে, চারি পেয়ালার মিলন তেমনি ঘটে আত্মার এবং দেহের সান্নিধ্যে। অবশ্য এই রূহ দেহের উপাদান দিয়ে তৈরি নয়, কিন্তু দেহ ব্যতিরেকে তার অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। দেহসাধনার ক্ষেত্রে বাউলের এই চারি পেয়ালা চারিচন্দ্রের অনুরূপ। এতদসঙ্গে আরেকটি পেয়ালার কথাও বাউলেরা বলে থাকে। এই পেয়ালা স্ত্রী-দুগ্ধ পান। অবশ্য কারো কারো মতে বাউলসাধনায় কুমারী মেয়ে যাকে বাউল 'অখণ্ড' নামে অভিহিত করে তার রতিকেও পূর্ণচন্দ্র হিসেবেও গণ্য করে থাকে। স্ত্রীরতিও একটি চন্দ্র বা পেয়ালা।

যা হোক, বাউলদের এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানে সহজিয়া ভাবনা নির্দেশক। বৈষ্ণব সহজিয়া শাস্ত্রে যে পঞ্চভূতের উল্লেখ পাওয়া যায় তা দেহের চারটি উপাদানকে ভিত্তি করে গঠিত। সুফিশাস্ত্রেও চারটি উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে।

চন্দ্র

চন্দ্র অর্থে বাউলসাধক প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃতি বুঝেছেন। এই প্রকৃতিই নারী। এই নারীদেহ কামক্রীড়ার লীলাক্ষেত্র। কামক্রীড়ার মাধ্যমে কামাতীতে পৌঁছুবার সাধনা বাউলসাধনা।

নারী প্রেমের আধার। নারীকে দেখে পুরুষের প্রেম জাগ্রত হয়। কারণ নারী সৌন্দর্যের প্রতীক। বাউলসাধনার ভাষায় পুরুষ এক অর্থে সূর্য। নারীর মাসিক শেষে অর্থাৎ সাধুদের ভাষায় অমাবস্যার শেষে চন্দ্রের উদয় হয় অর্থাৎ স্ত্রী সন্তানধারণের উপযোগী হয়। কিন্তু সাধক এই চন্দ্রের অভিলাষী নন। তিনি পূর্ণচন্দ্রকে কামনা করেন। এই পূর্ণচন্দ্র পূর্ণ মানব। আল ইনসানুল কামেল। তিনিই বাউলের পরমাত্মা। শুভযোগে তিনি আবির্ভূত হন বলে বাউলেরা বিশ্বাস করেন। বাউল এই শুভযোগের প্রতীক্ষায় থাকে এবং ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মাধ্যমে কারুণ্য, তারুণ্য, লাবণ্য রসধারায় স্বীয় বীর্যকে শোধন করে মহামানবকে ধরার আশায় প্রহর জেগে থাকে। বাউল এ সময়কালকে 'রতিতে মতি' ঝরাবার কাল বলে বুঝেছে। চেতনার উদ্রেক থাকে এখানে।

বাউল মনে করে তার মনের মানুষ অধরচাঁদ এই সময় নিজেকে ধরা দেন। সৃষ্টি হয় মহামানবের। বাউল এই ধারার বশবর্তী হয়ে হজরত মুহাম্মদ (দ.) শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে মহামানুষরূপে চিহ্নিত করেছে। বাউলদের ধারণায় যুগে যুগে পুরুষ প্রকৃতির মাধ্যমে অধরচাঁদ মহাপুরুষদের নামে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এঁরাই একদিকে জীবদেহে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। স্রষ্টা এই পরমাত্মার মাধ্যমেই নিজেকে বিকাশ করেন। এজন্য বাউলকবি স্রষ্টা ও পরমাত্মার

মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত করেন না। বাউলের গানে চন্দ্রের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। নারী এবং পুরুষ উভয়েই চন্দ্রস্বরূপ। আত্মা যাকে ধরা যায় না—তাকেও বাউল 'অধরচাঁদ' নামে অভিহিত করেছে।

১

মদিনায় রছুল নামে কে এল ভাই
কায়াধারী হয়ে কেন তাঁর ছায়া নাই ॥
ছায়াহীন যার কায়া ত্রিভুবন তাহারই ছায়া,
এ কথাটির মর্ম লওয়া অবশ্যই চাই।
কী দিব তুলনা তারে, খুঁজে পাইনে এ সংসারে
মেঘে যারে ছায়া ধরে ধূপের সময় ॥
কায়ার শরিক ছায়া দেখি ছায়াহীন সেই লা শারিকী
লালন বলে তার হাকিকী বলিতে ডরাই ।

২

তারে চিনবে কি এই মানুষে
মেরে সাঁই ফেরে কি রূপ সে ॥
গোলকে অটল হরি
ব্রজপুরে বংশীধারী
হলেন নদীয়াতে অবতারি
ভক্ত রূপে প্রকাশে ॥
মায়ের গুরু পুতের শিষ্য
দেখ জীবের জ্ঞান নৈরাশ্য
এবার কী তাহার মনের উদ্দেশ্য
ভেবে বোঝা যায় কি সে ॥
আমি বলি নয় নিরাকার
সে ফেরে স্বরূপ আকার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
কই হলো রে সে দিশে ॥

পূর্ণচন্দ্র

সুতরাং উল্লিখিত পদ থেকে আমাদের এমন ধারণা জন্মায় যে স্রষ্টা আত্মারূপে স্বয়ং মহাপুরুষদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। আমাদের মানবদেহেও এই মহাপুরুষদের গুণাবলি রয়েছে অর্থাৎ বাউলেরা এক অর্থে নিজেকে স্রষ্টার অংশভাগ হিসেবে কল্পনা করে। মানুষের মধ্যে যে পরমাত্মা বা রুহ বর্তমান তা এক অর্থে স্রষ্টার প্রতীকস্বরূপ। লীলার ছলে তিনি নারীর মধ্যে পূর্ণচন্দ্ররূপে বিকশিত হন এবং সাধক

নারী হিসেবে আপনার দেহটিকে তাকে উৎসর্গ করেন। এই পরমাত্মা পুরুষরূপী এবং সাধক নারীরূপী। এখানেই নারীরূপী জীবাত্মা পুরুষরূপী পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু এই পূর্ণচন্দ্রের স্থান নিরূপণহেতু সাধক এবং সাধিকা পুরুষ প্রকৃতি রূপে সাধনা করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে বাউলসাধনার দুটি স্তর : একটি প্রাথমিক, যা লৌকিক অর্থাৎ দেহের জরিপ সাধন; দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক বা পরমার্থ এবং দেহাতীত জীবন। প্রাথমিক পর্যায়ে যে সাধনা তা একান্ত লৌকিক অর্থাৎ তা দেহের সাধনা। এখানে চন্দ্রের অর্থ নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় : ১. শুক্র, ২. রজঃ, ৩. ডিম্বরূপী মনের মানুষ বা পূর্ণচন্দ্র ৪. প্রেম, আকারভিত্তিক। দ্বিতীয় পর্যায় : আধ্যাত্মিক। এই অর্থে পূর্ণচন্দ্র—পরমাত্মা। তিনি অধরচাঁদ, সাঁই, মুর্শিদ, নিরাকারভিত্তিক।

দেহের চারটি উপাদান : পানি, মাটি, আগুন এবং বাতাসকে চারিচন্দ্র বলা হয়। রুহ বা দিল বা আত্মাকেও চন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়। বাউলগানে স্ত্রীজননাঙ্গকেও অনেক সময় গুপ্তচন্দ্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দেহের মধ্যে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রেরও উল্লেখ রয়েছে। করনখ-১০, পদনখ-১০, দুই গণ্ডদেশ, অধর, জিহবা, ললাট (অর্ধচন্দ্র)-সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র (২৪॥)। এ ব্যতিরেকে মুখ, দুই স্তন, দুই হাত, দুই বক্ষ, নাভি উপরস্থকে অষ্ট ইন্দু বা চন্দ্র বলা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চন্দ্র অর্থে নাসিকার বামরন্ধ্র বুঝায়।

বস্তুত বাউলসাধক এক অর্থে তার পরমপ্রিয়কে চন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সুফিদের মাসুক বাউলদের চন্দ্র, অধরচাঁদ অভিন্ন। লালন একটি গানে বলেন :

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা।
ওরে কেমন করে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা,
তার মাঝে অধরচাঁদের আভা
দেখিস দেখিস, পাছে হবি রে জ্ঞানহারা ॥
রূপের গাছে চাঁদের ফল তায়
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
একবার দৃষ্টি করে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা ॥
আলেক নামে শহর কুদরতি
রেতে উদয় ভানু, দিবসে রাতি
যে জন আলের খবর জানে
তার দৃষ্টি হয় নয়নে,
লালন বলে সে চাঁদ দেখেছে তারা ॥

এখানে গানের অর্থ এই যে, অধরচাঁদ নারীরূপে চন্দ্রের দেহে অবস্থান করেন। সাধক একটি বিশেষ ক্ষণে এই অধরচাঁদের পরিচয় লাভ করতে সমর্থ হন। অপর একটি গানে লালন বলেন :

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে।
চাঁদ রয়েছে চাঁদের কোলে ঈশান কোণে ॥
প্রথম চাঁদ উদয় দক্ষিণে
শুক্লপক্ষে আসে নেমে বামে
আবার দেখ কৃষ্ণপক্ষে
কী রূপে যায় দক্ষিণে ॥
খুঁজলে আপন ঘরখানা
তুমি পাবে সকল ঠিকানা।
বারো মাসে চব্বিশ পক্ষ অধর ধরা তার সনে ॥
স্বর্গ চন্দ্র দেহ চন্দ্র হয়
তাতে ভিন্ন কিছু নয়।
এ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মেলে
ফকির লালন কয় নির্জনে ॥

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাউল বিভিন্ন সময় আত্মা বা পরমাত্মাকে চাঁদ বা অধরচাঁদ রূপে চিহ্নিত করেছে। এই আত্মা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে আছে। বাউল সাধনা যুগলসাধনা। অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ের মিলিত সাধনা। এই মিলিত সাধনার মাধ্যমেই অধরচাঁদকে পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ অধরচাঁদকে ধরতে উভয়ের প্রয়োজন।

এখন 'না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে' গানটি বিশ্লেষণ করলে সঠিক তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে। বলা হচ্ছে, নিজের ঘরের খবর না-জেনে আকাশে তাকাবার কোনো অর্থ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ স্বর্গে আছেন এটা নিশ্চিত। কিন্তু তিনি মানুষের মধ্যেও অবস্থান করেন একটি বিশেষরূপে। বাউলসাধনায় চন্দ্রকে সাধারণ অর্থে মণি, বীর্য বা শুক্র বলা হয়। এই বীর্য কামের প্রতীক। তার অবস্থান মস্তকে। কাম বাসনায় এই চন্দ্র ডিম্ব আকারে ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে আসে এবং স্ত্রীরজঃকালীন সময় শেষে এই চন্দ্র স্ত্রী জননাঙ্গে ডিম্বরূপে ভাসে।

এই চন্দ্র সম্বন্ধে কাজী শেখ মনসুর বলেন :

চন্দ্ররে বোল এ মণি আরবি বচন।
চন্দ্র কভু মণি মোতফ, শুক্র, বীর্য, পানি
একই মণিরে কহে এত ভাষখানি।
মণি হস্তে অঙ্গে রাগ জপ রঙ্গ আর বল
মণি হস্তে আয়ু দীর্ঘ জানিও সকল।[৩৬]

তিনি আরও বলেন :

বামার বামের শ্বাসে পুরুষের দক্ষিণ
চন্দ্রের উদিত হএ চিন ডিম্ব তিন।[৩৭]

লালন ফকিরের গানে আমরা শুনি :

প্রথমে সাঁই উদয় দক্ষিণে
শুক্লপক্ষে আসে নেমে বামে
আবার দেখ কৃষ্ণপক্ষে
কিরূপ যায় দক্ষিণে।

স্ত্রীলোকের 'মাসিক'-শেষে ডিম্বরূপে চন্দ্রের উদয়কালকে শুক্লপক্ষ বলে গণ্য করা হয়। এই শুক্লপক্ষে সাধক-সাধিকার সাধনের শুভ সময়। এই শুভযোগে প্রথমে পুরুষের দক্ষিণ নাসিকা এবং স্ত্রীর বাম নাসিকা দ্বারা শ্বাস বইতে শুরু করলে সাধক-সাধিকার মিলিত হবার উপযুক্ত সময় আসে। এমনিভাবে যোগ না আসলে সাধক-সাধিকা মিলিত হন না। কারণ এই সময় ব্যতিরেকে সাধনার অটলত্বপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে তা সম্ভব হয়। বীর্যকে ধারণ করবার ক্ষমতাই অটলত্বপ্রাপ্তি। সাধক বিশ্বাস করেন, 'টলে জীব অটলে ঈশ্বর'। অটলত্বপ্রাপ্তকে 'সাঁই' নামে অভিহিত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শুক্লপক্ষে স্ত্রী অধিকতর কামবতী থাকে এবং এ সময় সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। এ সময় সাধক-সাধিকা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন। কৃষ্ণপক্ষে এই সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। সাধারণত, কৃষ্ণপক্ষকে সাধনার উপযুক্ত সময় বলে গণ্য করা হয় না।

বাউলসাধনায় পুরুষকে দক্ষিণ অর্থাৎ ডানধারের মানুষ এবং স্ত্রীকে বামধারার মানুষ বলা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে পুরুষকে কৃষক এবং স্ত্রীকে জমি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।[৩৮]

এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই
কেন দেখলি না আপনার ভুঁই
তোর দেহ জমির পাকা ধানে
দেখ লেগেছে ছটা বাবুই
বহু কষ্টে করলি কৃষাণি
এই মানবদেহ চৌদ্দপোয়া লাল জমিখানি
তাতে ভক্তি ফসল জন্মেছিল
সব খেয়ে গেল হিংসা চড়ুই।
চেতন বেড়া উপড়ে পড়েছে

সব জায়গা আলগা পেয়ে
গরু ছাগল পাকা ফসল খেয়ে ফেলেছে
এখন গোঁফ ফুলিয়ে বসে আছে–
দেখ তোর মাচা ভরা বিঘ্ন পুঁই ॥
কেন ভুঁইয়ের আলে বাঁধলি নে কুঁড়ে
এখন চিন্তা জ্বরে মরবি পুড়ে
তোর পেটে হবে পিলুই ॥
তোর আশা ভাঙল ফসল গেল
তুই ঠেকবি যখন
দেখবি তখন
নিকিশের সময়।
কাঙ্গাল যাদুবিন্দু ভনে,
আমার এই টুকু ভরসা মনে
আমি কুবীর পদে মনকে থুই ॥

আবার পুরুষকে সূর্য এবং নারীকে চন্দ্র নামেও অভিহিত করার প্রবণতা বাউলগানে লক্ষ করা যায় :

রবী শশী রং বেমুখা
মাস অন্তে হয় একদিনে দেখা
সেই যোগের যোগে লেখাজোখা
সাধনে সিদ্ধি হয় অনায়াসে ॥
দিবাকর নিশাকর সদায়
উভয় অঙ্গে উভয় লুকায়
ইশারাতে সিরাজ সা কয়
লালন ভেড়োর হয় না দিশে ॥

'চন্দ্র' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে চন্দ্রের, বিভিন্ন প্রয়োগের একটি বিশেষ অর্থ শুক্র। এই শুক্রই জীব-আত্মা। এই জীবাত্মা বিশ্লেষণ করলে আমরা চারিচন্দ্রের হদিস পেতে পারি।

এখানে উল্লেখ্য যে, আত্মা দুই প্রকার : একটি জীবাত্মা, অপরটি পরমাত্মা। বলেছি, মানবজীবনেরও দুইটি স্তর—একটি লৌকিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। চন্দ্রেরও প্রকারভেদ রয়েছে। তার একটি পূর্ণচন্দ্র বা পরমাত্মার প্রতীক। পূর্ণচন্দ্র ব্যতিরেকে চারিচন্দ্র জীবাত্মার প্রতীক।

জীবাত্মা ইহলৌকিক কিন্তু পরামাত্মা ইহলোক-আশ্রিত অলৌকিক। এই জীবাত্মা যে বিশেষ চারটি উপাদানে তৈরি, সে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা

করেছি। শারীরবিদ্যায় এই চারটি উপাদানের নাম রক্ত, বায়ু, পিত্ত এবং কফ। অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু এক অর্থে রক্ত, বায়ু, পিত্ত, কফের মূল ধাতুসমষ্টি।

এই চার প্রকারের ধাতু অনেক অর্থের মূল। চিকিৎসাবিদ্যায় এই ধাতু-চতুষ্টয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় আনয়ন করা হয়। এই সমন্বয় একদিকে মানুষের শরীরকে রোগমুক্ত রাখে এবং অপরদিকে দৃষ্টিশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকার ফলে সে জ্ঞানলাভেও সক্ষম হয়।[৩৯] বাউল সাধক 'চারিচন্দ্র ভেদ'-এর মাধ্যমে জীবদেহে একটি সমন্বয় আনয়ন করতে সচেষ্ট হয়। চারিচন্দ্র ভেদ অর্থ সত্তার চারটি অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ। গোঁসাই গোপাল বলেন :

চার চন্দ্রের নিরূপণ
জান গা মন তার বিবরণ
জানলে পরে জীব দেহেতে ঘুচে যেত কুমতি ॥

যুগল মিলনেই চারিচন্দ্রের ভেদ সম্ভব। একে বাউলরা কায়াসাধন বলে থাকে।

চেয়ে দেখ নারে মন দিব্য নজরে
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে।
হ'লে সে চাঁদের সাধন
অধরচাঁদ হয় দরশন
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেছে ঘিরে ॥
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া
জমিনে ফলছে মেওয়া
চাঁদের সুধা ঝরে ॥
নয়নচাঁদ প্রসন্ন যার
সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার
লালন কয় বিপদ আবার
গুরু চাঁদ ভুলে রে ॥

আত্মতত্ত্ব

বাউলসাধনায় আত্মতত্ত্ব মূলত দেহকেন্দ্রিক। বাউলসাধক দেহের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। কারণ দেহ আত্মার বাহন। কিন্তু আত্মা দেহ অপেক্ষা শ্রেয়। দেহের ধ্বংস আছে কিন্তু আত্মার ধ্বংস নেই। এই আত্মা স্বচ্ছ আরশীর ন্যায় উজ্জ্বল। এই আত্মা সম্পর্কে লালন ফকির বলেন :

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
সেথা এক পড়শী বসত করে।

আত্মা দুই প্রকার : জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার মূল উৎস হৃৎপিণ্ড। এই হৃৎপিণ্ড বক্ষস্থলের বামপার্শ্বে অবস্থিত। এই জীবাত্মাই অনুভূমিশক্তি ও স্পন্দনশক্তির উৎস। জীবাত্মা নিম্নজগতের পদার্থ হলেও সাধনার বলে ধ্বংসের হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারে। দেহ তাঁর বিচরণক্ষেত্র এবং দেহের অভ্যন্তরে থেকেই সে দেহাতীতে পৌঁছুবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই জীবাত্মা কামরূপী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অপরদিকে পরমাত্মা কামবর্জিত এবং প্রেমসর্বস্ব। কাম ব্যতিরেকে প্রেম লাভ করা যায় না। কামই প্রেমের মাধ্যম। এই কামরূপী জীবাত্মা সাধনার দ্বারা স্বর্গীয় পরমাত্মাকে দেহের অভ্যন্তরে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। বাউল ভাষায় : 'গগনের চাঁদ পাতালে নামে।'

পরমাত্মাকে বাউল 'সোনার মানুষ', 'মনের মানুষ', 'অচিন মানুষ' ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছে। এই পরমাত্মার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই বাউলের উদ্দেশ্য। বাউল তাই শুধু দেহবাদী নয়, অধ্যাত্মবাদী। দেহকে অস্বীকার করে আত্মাকে জানা সম্ভব নয় বলে বাউল দেহের গুরুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতো বাউল দেহকেই একমাত্র সার বলে জানে না।

পরমাত্মা দেহের কোনো পদার্থ নয় বরং বলা যেতে পারে দেহের অতিথি, অচিন পাখি। হৃৎপিণ্ড এই পরামাত্মার বাহন। এই অচিন পাখি বা পরমাত্মা বা মনের মানুষের দেহে আসা-যাওয়ার কাল নির্ণয়ই বাউলসাধনা।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কমনে আসে যায়
ধরতে পালে মনোবেড়ি
দিতাম পাখির পায় ॥
আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপর আছে সদর কোঠা
আয়না মহল তায় ॥
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোন্ দিন খাঁচা পড়বে ধসে
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখি কোন্ খানে পালায় ॥

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাউলেরা দেহকে সাধনার উপজীব্য বিষয় বলে মনে করে। আত্মার স্থিতি এই দেহকে কেন্দ্র করে। কাজেই দেহের মাঝে অবস্থিত আত্মা সম্বন্ধে বাউল পরিপূর্ণ ধারণা করতে চায়। এই আত্মার মৃত্যু নেই। মানুষের

দেহের অবসান হবে কিন্তু আত্মার ধ্বংস হবে না। স্বর্গীয় বস্তু বিধায় তা যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করবে। আত্মা মানুষের দেহে অবস্থান করে মানুষকে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পরম সত্যকে জানতে সাহায্য করে। এজন্য সুফিসাধনায় আত্মার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, *মান আরফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রব্বাহ* অর্থাৎ নিজেকে জানলেই প্রভুকে জানা যাবে অর্থাৎ সে মনে করে আত্মার স্বরূপ জানতে পারলেই এই অমরত্ব লাভ সম্ভব হবে। বাউলদের আত্মা সম্বন্ধে ধারণা হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের মতো নয়। বৌদ্ধধর্মে দেহই আত্মা এবং আত্মাই দেহ। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ লাভ এই দেহকে জয় করেই সম্ভব। অর্থাৎ সাধক তার সাধনায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মবিলোপ ঘটাতে পারলে তিনি 'নির্বাণ' লাভ করতে পারবেন। বাউলেরা তা বিশ্বাস করে না। কারণ এই নির্বাণ লাভ এক অর্থে 'শূন্যতা'। অবশ্য এই শূন্যতা বা 'নির্বাণ'কে বৌদ্ধ সহজিয়ারা 'মহাসুখ' নামেও অভিহিত করেছে। বাউলেরা সুফিসাধনার 'ফানা'তে বিশ্বাসী। 'ফানা' অর্থে নিজের সত্তার সঙ্গে পরম আরাধ্যের পরিপূর্ণ মিলন ঘটানো। এর অপর অবস্থা 'বাকা'। এর অর্থ পরম আরাধ্যের সঙ্গে অনন্ত স্থিতি। 'ফানা' এবং 'বাকা' এই ধারণা খ্রিস্টানধর্ম প্রভাবিত।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'মারেফাত' সম্পর্কে সুফিধারণার উৎস গ্রিকদর্শন। পরবর্তীকালে খ্রিস্টানধর্মে এই ধারণা অনুসরিত হয়। নিকোলসন বলেন 'The modern idea of Divine personality is derived from the doctrine of Trinity, (*Nicholson R.A., 1971 : 10-11*)[৪০]

বাউলসাধনায় এই আত্মা নানারূপে প্রতিভাত হয়েছে। কখনও তাঁকে 'অচিন পাখি' 'অধরা', কখনও 'সোনার মানুষ' 'মনের মানুষ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। অনেক সময় 'নূর' শব্দটিও বাউলদের গানে ব্যবহৃত হয়েছে। বাউলের গানে দেহের রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, অন্যায় করলে তাঁকে পুনরায় এই সংসারে জন্ম নিতে হবে এবং কষ্ট করতে হবে। একজন বাউল বলেন :

দীক্ষা শিক্ষায় লয় না যাহার মন
ফিরে দুর্লভ জনম পাবে না কখন,
চৌরাশী লক্ষ ঘূর্ণি করে ভ্রমণ
শেষে তার পশুর কুলে যেতে হবে।
(ভুবন সদানন্দ)

এই ধারণা জন্মান্তরবাদ বা বিবর্তনবাদপুষ্ট। এখানে বৌদ্ধদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। এই দেহের পাপের কারণে আত্মার কষ্ট ঘটে। বাউল তাই সৎকর্মের মাধ্যমে মুক্তি পেতে চেয়েছে এবং সে মুক্তি তখনই পাবে যখন দেহস্থ আত্মা পরম আরাধ্যের সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত হতে পারবে। বিভিন্ন সাধনার মূলকথা এখানে।

মনের মানুষ : আত্মতত্ত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 'মনের মানুষ' তত্ত্ব। মানুষের মধ্যে যে আত্মার অবস্থিতি তার একটি জীবাত্মা যা লৌকিক; অপরটি পরমাত্মা যা অলৌকিক। মনের মানুষ এই অলৌকিকতানির্ভর। বাউল তাকে অচিন মানুষ, অধর মানুষ, অচিন পাখি ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছে। এই অচিন পাখি, সাঁই-এর স্বরূপ নির্ণয়েই বাউলের সকল সাধনা। এই অচিন পাখিরূপ পরমাত্মাকে বাউল তাঁর সাঁই বা মনের মানুষ বলে কল্পনা করেছে। এই মনের মানুষ বা সাঁই-এর প্রকারভেদ আছে কিন্তু বাউল মনে করে যে, মূলে এই মনের মানুষ, অচিন পাখি, স্রষ্টারই প্রতীকস্বরূপ :

১

সাঁই আমার কখন খেলে কোন্ খেলা
জীবের কি সাধ্য আছে তাই বলা ॥
কখনো ধরে আকার
কখনো হয় নিরাকার
কেউ বলে সাকার কেউ নিরাকার
অপার ভেবে হই ঘোলা ॥
অবতার অবতারী
সে তো স্বভাবে তারি
দেখো জগৎ ভরি
এক চাঁদে হয় জগৎ উজালা
ভাণ্ড বেভাণ্ড মাঝে
সাঁই বিনে কি খেল আছে
লালন কয় নাম ধরেছে
কৃষ্ণ করিম কালা ॥

২

সাঁইয়ের লীলা দেখে লাগে চমৎকার
ছুরাতে করিল সৃষ্টি আকার সে কি নিরাকার।
আদমেরে পয়দা করে খোদ ছুরাতে পরওয়ার
ছুরাত বিনে পয়দা কিসে হইল সে কি হঠাৎ কার ॥
নূরের মানে হয় কোরানে,
নূর বস্তু সে নিরাকার প্রমাণে,
কেমন করে নূর চুয়ায়ে হয় সংসার ॥
আহমদি রূপ ছাদি দুনিয়ায় দিয়েছে বার
লালন বলে মনে দেলে সেও তো বিষম ঘোর আমার ॥

৩

সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি
ধরবি যদি কর সাধনা।
তিনি আত্মারূপে থাকেন সহস্রারে
কেউ চেনে কেউ চেনে না ॥

(গোঁসাই গুরুচাঁদ)

সুতরাং এই আত্মারূপে স্রষ্টা কীভাবে মানুষের অন্তরে বিরাজমান, বাউল তারই অন্বেষণ করে।

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনিঋষি চারযুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে তারে কে পায়
তেমনি সে থাকে সদায় আলেকে বসে ॥
অচিন দলে বসতি ঘর
দ্বিদল পদ্মে বারাম তার
দল নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবে অনায়াসে ॥
আমার হল কী ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন
সিরাজ সাঁই কয় ঘুরলি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥

বাউল তার মনের মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়েছে। তাঁকে তার জানা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে সে লীন হতে পারেনি মনসুর হাল্লাজের মতো। তাই তার ক্রন্দন :

আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কত দিনে
চাতক প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছি কালো শশী
হব বলে চরণ দাসী
তা হয় না কপাল গুণে ॥

(লালন)

এমনি ধারার ক্রন্দন করেছেন গগন হরকরা :

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে

হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দিশ্যে
দেশ বিদেশে

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা এই ধারণা করতে পারি যে, বাউল মনের মানুষের সন্ধানী। এই মনের মানুষের স্বরূপ তার জানা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তিনি সাধনার বলে তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যেতে পারেন। এই অবস্থাকে সুফি পরিভাষায় 'ফানাফিল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে লালন বলেন :

সাঁই দরবেশ যারা
আপনারে ফানা করে
অধরে মেশে তারা ॥
মন যদি হতে চাও ফকির
নাও জেনে সেই ফানা'র ফিকির
ধরো অধরা ॥
ফানার ফিকির না জানিলে
ধর্ম শেখা মশকরা।
গঙ্গার জল কূপ জল হয়
মিশাইলে এক জল হয়
উভয়ে এক ধারা
তেমনি জেনে ফানার করণ
রূপে রূপে মিলন করা ॥
মুরশিদ রূপ আর আলেক নূরী
দুই রূপেতে এক রূপ হেরি
উভয়ে এক জোড়া।
লালন বলে রূপ সাধনে
হোস্‌নে যেন জ্ঞান হারা ॥

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাউলসাধনা চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গুরুকে বাউল দুইরূপে দেখেছে–মানবগুরু রূপ আর পরমতত্ত্ব বা সাঁইরূপ। এই সাঁই তার মনের মানুষ। বাউলগানে সাঁই শব্দের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। এই সাঁই কে? লালন ফকিরের একটি গানে আছে :

কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই।

এই সাঁইয়ের হদিস পাওয়া যেতে পারে চেতনগুরুর কাছে। এই চেতনগুরু কে? এই চেতনগুরু সাধকের সাধনসঙ্গিনী, তার সেবাদাসী। প্রথমেই বলা হয়েছে, বাউল সাধনা যুগলসাধনা। নারী ব্যতিরেকে এ সাধনা বিফল। নারীই মাধ্যম। সূর্যের সাত

রঙ বিশ্লেষণ করার জন্য প্রিজম (Prism) প্রয়োজন এবং তার সাহায্যে এই রং বিশ্লেষণ করেই ধারণা করা যেতে পারে সূর্যের স্বরূপ; তেমনি নারীর মাধ্যমে সাঁইয়ের হদিস পাওয়া সম্ভব। বাউলগানে 'বরজখ' শব্দের ব্যবহারও দেখেছি। বরজখের প্রকারভেদ রয়েছে। নারী সর্বনিম্নস্তরের বরজখ। 'বরজখে সোগরা' বলা হয় পীর মুরশিদকে এবং হজরত মুহাম্মদ (দ.)-কে বলা হয় 'বরজখে কুবরা'।

এই গুরু বা পীরের যে স্তরভেদ তার সর্বনিম্ন স্তরে নারী-চেতন গুরু এবং যার মধ্যে সাঁই-এর লীলাকেন্দ্র। লালন ফকির বলেন :

তিরপিনির তীর ধারে
মীনরূপে সাঁই বিহার করে।

মীন অর্থে মাছ। তিনিই সাঁই। এখানে বলা প্রয়োজন, দেহ বা বস্তুজগতে 'সাঁই' সাকার ধারণ করলেও মূলত তিনি নিরাকার। এখন এই সাঁইকে পাবার পথনির্দেশ করে লালন বলেন :

মাস অন্তে মহাযোগ হয়
নি-রস হতে রস ভেসে যায়
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীন রূপে খেল দেখলে না ॥
জগৎজোড়া মীন অবতার
তার মর্ম আছে সন্ধির উপর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সন্ধানীকে চিনলি না।

এই সাঁই কোনো ক্ষেত্রে মীন, কোনো ক্ষেত্রে অচিন পাখি। এই মীন বা সাঁইকে আবার নূররূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। বলেছি, মানুষ চারটি পদার্থের সৃষ্টি। কিন্তু এই চারটি পদার্থই সব নয়। যে পদার্থে মানবের আত্মা গঠিত, সে পদার্থ তার জীবনীশক্তি বা প্রাণ। তাই বাউলের সাঁই অচিন পাখি–তার Missing link মীন বা চন্দ্র। এই সাঁই বা মীনরূপী মাছকে ধরার কৌশল নির্দেশনাও রয়েছে বাউলের গানে।

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে
সে কি সামান্য চোরা ধরবি কোণা-কানছিতে ॥
পাতালে চোরের নহর
দেখায় আসমানের উপর
তিন তারে হচ্ছে খবর
শুভাশুভ যোগ মতে ॥
হাওয়ায় তার বারামখানা
হাওয়া মূলাধার তাতে ॥

সে চোর ধরবি যদি
হৃদপারদ করগে খাঁটি
লালন কয় খুঁটিনাটি থাকতে
দেবে না ছুঁতে ॥

এই সাঁই বা মনের মানুষকে বাউল চিহ্নিত করেছে। কোনো কোনো সাধক তাঁকে আল্লাহ বলে অভিহিত করলেও এই আল্লাহ ধর্মগ্রন্থের আল্লাহ নন। এই আল্লাহ তার পরম প্রিয়। তিনি প্রেমিক, তিনি প্রেমাস্পদ। তিনি লীলাকারী আবার তিনিই লীলা। তিনি রসুল, তিনি কৃষ্ণ, তিনি চৈতন্য, তিনি লালন, তিনি আদম সন্তান। বাউল বলেন :

আমি যে রূপিণী
দেখ না সে রূপ
দীন দয়াময়
(লালন)

এই অর্থে মনসুর হাল্লাজ ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি সত্য, আনাল হক।' আমি-ই 'সাঁই। এই 'আমি' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বাউল বলেন :

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়
আমি কথার অর্থ ভারী আমি সে তো আমার নয় ॥
অনন্ত শহর বাজারে আমি আমি শব্দ করে,
আমার আমি চিনতে নারি বেদ পড়ি পাগলের প্রায় ॥
মনসুর হাল্লাজ ফকির সে তো
বলেছিল আমি সত্য
সাঁই চলে সাঁই-এর আইন মতো
সবাই কি তার মর্ম পায় ॥
কম বে-এজ বে এজনে আল্লা
সাঁই-এর হুকুমে আমি হেল্লা
লালন তেমন কেটো মোল্লা
ভেদ না-জেনে গোল বাধায় ॥

সুতরাং মানুষভজনাই সারকথা। এই মানুষেই সাঁই-এর অবস্থিতি। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে যেমন বিচরণরত তেমনি অন্তরেও তিনি প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লক্ষ করে বলেন :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে তুমি বিচিত্ররূপিণী
অন্তরমাঝে তুমি একা একাকী তুমি অন্তরবাসিনী।

এই সাঁই সম্বন্ধেই লালন বলেন :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনো-বেড়ি দিতাম পাখির পায় ॥

অর্থাৎ, এই অচিন পাখির কারণেই এই মানবজীবন। এবং এই অচিন পাখির কারণেই তার মরণ। এই সাঁইয়ের হদিস জানবার জন্যই সে বাউল। মনসুর হাল্লাজ সাঁই এর স্বরূপ চিনেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শরীরের প্রতিটি রক্তকণা থেকে শব্দ ধ্বনিত হয়েছে 'আনাল হক'। বাউল অমৃতের সন্তান হতে চায়, সাঁই-এর একটু পরশেই তা সম্ভব।

পরশী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম যাতনা সকল যেত দূরে ॥

গুরুতত্ত্ব

বলেছি, বাউল গুরুবাদী। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাউলসাধনার গুরুতত্ত্ব এবং মনের মানুষের তত্ত্বে কোনো অমিল নেই। যেমন সাঁই বলতে বাউল স্রষ্টাকে যেমন বুঝেছে তেমনি আদম (আ.) মুহাম্মদ (দ.)সহ সকল মহাপুরুষ, কৃষ্ণ এবং চৈতন্যদেবকেও সে বুঝেছে। বাউলদের ধারণায় সবকিছুর মূলে মাত্র একজন। অন্য সবকিছু তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। সুতরাং মূল গুরু বলতে সাধক স্রষ্টাকেই বুঝেছে। স্রষ্টা থেকে শুরু করে দীক্ষাগুরু পর্যন্ত একই ধারা প্রবহমান। বাউলসাধনার গুরুবাদ একদিকে তন্ত্র অপরদিকে সুফিবাদ দ্বারা প্রভাবিত। তন্ত্রের গুরু ঈশ্বর বা স্রষ্টা নন তিনি মানুষ। সুফিবাদে এই গুরু তার পীর বা মুরশিদ যিনি খোদার অবতারস্বরূপ। এই অর্থে স্রষ্টাকেও সে মুরশিদ বলে জেনেছে এবং পীরকে আল্লাহর অবতার মনে করে তাকে মুরশিদ জেনে সে তার উপাসনা করেছে। বাউল বিশ্বাস করে, বীর্য মানবসৃষ্টির মূল কারণ এবং তা ঈশ্বরপ্রদত্ত। পৃথিবীতে মানবসৃষ্টি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই বীর্যের যথেচ্ছার ব্যবহার বাউলসাধনায় নিন্দিত। বাউল বিশ্বাস করে বীর্যের মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি। অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি বাউলের কাম্য নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণে তাই সে বিশ্বাসী। তাই তাকে সে গুরুবস্তু বলেছে :

গুরুবস্তু চিনলে না
অপারের কাণ্ডারী গুরু তা বিনে কেউ কূল পাবা না ॥
হেলায় হেলায় দিন ফুরালো
মহাকাল এখন ঘিরে এলো,
আর কতকাল বাঁচবি বলো,
রঙ মহলে লাগল হানা ॥
কী বলে এ ভবে আলি,

কী বা কর্ম করে গেলি,
মিছে মায়ায় ভুলে রইলি,
সে কথা তোর মনে হয় না।
ঘরে এখন বইছে পবন
হতে পারে কিছু সাধন
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
এবার গেলে আর হবে না ॥

পাঞ্জু শাহ বলেন :

গুরু রূপে নয়ন দে রে মন।
গুরু বিনে কেউ নাই তোর আপন ॥
গুরুরূপে অধর মানুষ দিবে তোরে দরশন।
পিতার ভাণ্ডে কী রূপ ছিলি
মায়ের গর্ভে কী রূপ হলি, মন,
পূর্ব পরে নিরন্তরে গুরুরূপে নিরঞ্জন ॥
রজঃ বীজে মিলন কে করিল
কোথায় আছে তার আসন।
ব্রহ্মাণ্ডের গড়ন গড়ে সে কোন্ জন ॥
কোথায় ছিলি, কার বা সাথে ভবে এলি,
ওরে মন।
অধীন পাঞ্জু বলে গুরু ধরে করো তার অন্বেষণ ॥

দুদ্দু গুরু সম্বন্ধে বলেন :

আপনারে চিনবি যদি মুর্শিদরে চেনো আগেতে
তবে সে চিনতে পারে কিরূপ খোদা এই দেহেতে ॥
মুর্শিদ হল রাহা কোনেন্দা
দেখান সে বন্দেগির কায়দা
মোরাকেবা খোদার দিদার হয় যাহাতে ॥
আপনি ডুবে আপন মাঝার
আছে সে রূপ নিরাকার
সে রূপ মন চেনে বেখুদী পেয়ালার সাথে ॥
সিঁড়ি ধরে উঠলে পরে
মোকাম মঞ্জিল মেলে তারে
লালন সাঁই কয় দুদ্দু ভেড়ে ঘুরিস কেন
ঘুরো পথে ॥

গুরু সম্বন্ধে লালন ফকির আরও বলেন :

আগম নিগমে কয়
গুরুরূপে দীন দয়াময়,
অসময়ে সকাশে হয়
যে তারে ভজিবে ॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার
অধঃপাতে গতি হয় তার
লালন বলে তাই আজ আমার
ঘটল বুঝি মনের কু-স্বভাবে ॥

বলেছি, বাউলসাধনায় নারীকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ভাবনা তন্ত্র এবং যোগ প্রভাবিত। লালন সাঁই, দেহের স্বরূপ নির্ণয়ে নারীর শরণাপন্ন হয়েছেন। কারণ তার হাতেই সব চাবিকাঠি। সন্তান জন্মাবার ক্ষেত্রে যে ডিম্বের গুরুত্ব, তাঁর অধিকারিণী নারী। তাই তার হদিস নারীই বলতে সক্ষম।

কোথা আছ দীন দরদী সাঁই
চেতনগুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই ॥

এখানে 'চেতন'গুরুই নারী। দেহসাধনায় নারী ভিন্ন পুরুষের কোনো গতি নেই। অনেক বাউলগানে 'গুরুবস্তু' 'গুরুধন' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই 'গুরুবস্তু' পুরুষের বীর্য। বাউল বিশ্বাস করে শুক্র বা বীর্যের মাধ্যমে পরম পুরুষ জীবের দেহে আগমন করেন। তাই এই বীর্যস্খলনকে বাউল পাপ মনে করে থাকে। বীর্যধারণ বা বিন্দু সাধনের ভাবনাও এই ধারণা থেকে উদ্ভূত। এ ভাবনা সহজিয়া প্রভাবিত।[৪২] সুফিসাধনাও একান্ত করেই গুরুবাদী। পীর, মুরশিদ, স্রষ্টা ও তার সৃষ্টি, মধ্যবর্তী আড়াল মাতৃগর্ভ, মৃত্যুতে কবর, বা বরজখ। সুফিসাধনায় হজরত মুহাম্মদ (দ.) পূর্ণ মানব।[৪৩] তাঁর মধ্যেই আল্লাহর শক্তির প্রকাশ ঘটেছে রুহের মাধ্যমে এবং একই ভাব অন্য মানুষের ভিতর। সুতরাং বাউল মনে করে আল্লাহ, নবী এবং সাধারণ মানুষের (আদম) মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল প্রকারভেদে। বাউলসাধক এই ভাবনা দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছে। লালন তার একটি গানে বলেন :

১

মুরশিদ বিনে কী ধন আছে রে জগতে।
মুরশিদের চরণ সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা,
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা

বোঝ অলিয়ম মোরশেদা
আয়েত লেখা কোরানেতে।
আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি,
অনন্তরূপ ধরে ধারণ,
কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুর্শিদরূপে ভজন পথে ॥
(লালন)

২

নবী চিনে কারো ধ্যান
আহমদে আহাদ মিলে আহাদ মানে সোব্বাহান।
আতিউল্লাহ আতিয়ার রসুল দলিলে আছে প্রমাণ ॥
আল্লাহর নূরে নবীর জন্ম নবীর নূরে ছারে জাহান।
নূরে জানে আদমতনে বসত করেন বর্তমান ॥
আওল আখের জাহের চারি রূপে বিরাজমান
বাতেনে গোপন থেকে জাহের দেন তরিকদান।
তরিক ধরো সাধন করো আখেরে পাবা আসান
বর্তমান নাহি জেনে পাঞ্জু হল হতজ্ঞান।
(পাঞ্জু)

৩

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনিঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে তারে কে পায়
তেমনি সে থাকে সদায় আলেকে বসে ॥
অচিন দলে বসতি ঘর
দ্বিদল পদ্মে বারাম তার
দল নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবে অনায়াসে ॥
আমার হল কী ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন।
সিরাজ সাঁই কয় ঘুরলি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে?
(লালন)

দল নিরূপণের জন্য প্রয়োজন নারী, তার যুগল সঙ্গিনী। কারণ সাঁই নিজেও যে লীলাকারী?

সে ভাব কি সবাই জানে।
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা
গোপীর মনে ॥
(লালন)

বাংলা সাহিত্যে গুরুবাদের প্রথম প্রচলন দেখা যায় চর্যাপদে। শাক্ত, শৈব, নাথ, বৈষ্ণব এবং সহজিয়া ধর্মে একই ধারা প্রবহমান। বাউলগানও চরম গুরুবাদী। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে এই গুরুবাদেরই মুসলিম সুফি সংস্করণ পীরবাদ।[৪৪]

এই গুরুবাদ বা পীরবাদ সম্পর্কে অনেক পণ্ডিতের এমন ধারণা রয়েছে এই গুরুবাদ একান্ত করেই দেশজ। কিন্তু কেউ কেউ এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। ড. আবদুল করিম বলেন :

> Reverence to the pir or the concept of super human power of the pir is not of Bengali origin. It was imported from Central Asia thorugh Northern India by the Muslim immigrants. But in Bengal it found a fertile soil and was established on a solid foundation.[৪৫]

ড. আবদুল করিমের মতে সুফিদের হাতেই পীরবাদের জন্ম এবং পরে ভারত এবং অন্যত্র তার প্রসার ঘটে।

সুফিবাদে পীর পথনির্দেশক। তিনি সর্বাবস্থায় তাঁর শিষ্যকে অধ্যাত্মপথে পরিচালিত করেন। ভারতীয় গুরুবাদের সঙ্গে পারস্যে সুফিবাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল দেখা যায়। ভারতীয় সুফিবাদে অনেকক্ষেত্রে ভারতীয় গুরুবাদের মতো পীরকে উপাস্য হিসেবে বিবেচনা করতে দেখা গেছে।

অসীম রায় বলেন :

> Bengali Muslims adoration of the mystic guide, as reflected in this literature, was unqualified and boundless, and provided a striking parallel with the local non-Muslim attitude to guru. In many instances, the term guru was used either exclusively or alongside the Perso-Arabic equivalents like Pir, Shaikh and Murshid.[৪৬]

অসীম রায় অন্যত্র বলেন :

> "The Bengali muslim folk developed almost a cult and a pantheon of pirs to whom they resorted in the trials and tribulations of their hard everyday life. Pirs in Bengal were as *ubiquitous* as their names were legion. Their shrines were found in every nook and corner of Bengal. In desolate country lanes, in the fields and groves, in forests and in the mountains...the veneration showed to them in life persisted with greater ardor after death, through visitation (Ziyarat) to their shrines (called either mazar of dargah).[৪৭]

মুসলিম বাংলা সাহিত্যে লোককবিরা পীরকে সৃষ্টিকর্তার গুণে ভূষিত করেছেন। সৈয়দ সুলতান তাঁর জ্ঞানপ্রদীপ গ্রন্থে পীরকে পরমেশ্বর হিসেবে অভিহিত করেছেন। হায়াৎ মামুদ গুরুভজনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।[৪৮]

বাউলগানে গুরুবাদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এই প্রকৃতির। এখানে গুরু পথনির্দেশক এবং ঈশ্বরগুণসম্পন্ন। বাউলদের গুরুভক্তি সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন :

> ... বাউলদের গুরুভক্তি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়, এই সম্প্রদায়ের মত গুরুবাদী সম্প্রদায় অন্য আর একটি আছে কিনা সন্দেহ। অন্তত বাংলায় যে নাই ইহা ঠিক।... সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোনো কোনো বিশিষ্ট গুরু প্রকৃতি-পুরুষ ঘটিত যোগসাধনার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কখন কীরূপে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া করিতে হইবে, কোন কোন মুদ্রা বা বন্ধ অবলম্বন করিতে হইবে, বিভিন্ন অনুভূতিতে কী করণীয়, প্রভৃতি অতি গুহ্য বিষয়ের উপদেশ দেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সাধক-সাধিকা বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না।[৪৯]

আমি নিজেও এমন ধরনের অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে গুরুই সব কাজের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে দীক্ষা গ্রহণের সময় গুপ্তকক্ষে গুরু সাধক এবং সাধিকাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, বাউল সাধনা বর্তমানে নানা অনাচারে পূর্ণ হয়ে পড়েছে। তথাকথিত বাউল গুরু-শিষ্যদের নির্দেশনার নামে অসামাজিক ক্রিয়াকর্মেও লিপ্ত হয়। সাধারণ মানুষ এই গুরুদেরকেই জীবন-মরণের অধীশ্বর জেনে তাদের হাতেই নিজেদেরকে সমর্পণ করে থাকে। সম্প্রতি June McDaniel তাঁর গবেষণাগ্রন্থ "The

Madness of Saints" গ্রন্থে সহজিয়া, বৈষ্ণব, সুফি এবং বাউল গুরুদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর গ্রন্থে তিনি পশ্চিমবাংলার সাধকদের সম্পর্কেই বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি কোনো কোনো গুরুকে 'পাগল' আখ্যায়িত করলেও এই পাগলামিকে তিনি সাধনার একটি পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন।[৫০] অতি সম্প্রতি বাংলদেশের সুফি পীরদের সম্পর্কে Samuel Peter Landell Mills তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ "An Anthropological Account of Islamic Holy Men in Bangladesh (Unpublished)"-এ মূল্যবান আলোচনা করেছেন। Mills বলেন :

> In broad terms, Pirs are specialists who earn money and, in the eyes of some but not all, earn or manifest religious merit by meditating Islam to Muslim Bengalis whilst also performing and array of other functions. In doing so, Pir often venture outside their social class, religious community and native locality and thereby, earn themselves an marginal, ambigous position.[৫১]

মিল্‌স পীরদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, সমাজে মানুষ তাদের প্রতি যেমন বিশ্বাস রাখে এবং জীবনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলে ভাবে, আবার অনেকেই এদের প্রতি একধরনের ঘৃণাও পোষণ করে।[৫২] অনেক পীর অসামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য সামাজিক প্রতিরোধেরও সম্মুখীন হয়ে থাকে। কাউকে কাউকে শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে।[৫৩] বাউলগুরুদের ভূমিকা এই পীরদের মতোই। এরা শিষ্যদের মাধ্যমে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ অশিক্ষা এবং ধর্ম সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না-রাখার কারণে এসব বাউলগুরু এবং পীরদের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে। এসব গুরু এবং পীর জীবিতকালীন যেমন প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে পড়ে, মৃত্যুর পরেও তাদের মাজার এবং দরগায় প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়। বাউলদের মধ্যে এই গুরুভক্তি তন্ত্র যোগ সহজিয়া এবং সুফি প্রভাবিত। এখানে কোনো বিশেষ একটা মতাদর্শের পরিচয় নেই।

বাউলসাধনায় রতিনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

বলেছি, বাউলসাধনা একটি দেহবাদী সাধনা। এর উৎসস্থল প্রজনন (Fertility) এই ধর্মের অঙ্গ বিবেচিত হলেও পরবর্তীকালে যৌনস্বেচ্ছাচার আর্থ-সামাজিক নিপীড়নের কারণ হলে রতিনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণকে ধর্মীয় আচারের অঙ্গীভূত করা হয়। বৌদ্ধ আমলের পূর্বে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের কালে ব্রাহ্মণদের হাতেই যৌনস্বেচ্ছাচার চরমে ওঠে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্যভিচার সংসর্গ-দোষ ছাড়া অন্য কোনো নৈতিক অপরাধ বলে গণ্য হতো না। এ সময়ে ধর্মের নামে যৌনাচার অষ্টম শতক থেকে বাংলাদেশে প্রাধান্য পেয়ে আসছে।[৫৪] শুধু ব্রাহ্মণদের হাতেই নয়, রাজসভাতেও যৌনাচার দারুণভাবেই উৎসাহ পেয়েছিল।[৫৫] ব্রাহ্মণদের মতে কোনো রাজপুরুষ যৌনাপরাধ করলে তেমন কোনো শাস্তি হয় না। এই যৌন-অনাচারের শিকার হয়ে পড়েছিল সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষেরা। অবিচ্ছিন্ন অভাব-দারিদ্র্য এবং শোষণ, অত্যাচার, অবিচারে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এমন সময়ে যৌন-অনাচার ধর্মের অঙ্গ হওয়ায় এসব নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের দ্বারা নিপীড়িত হতো। মন্দিরে যারা দেবদাসী ছিল তারা আসলে হয়ে পড়েছিল বারবনিতা। তারা উচ্চস্তরের লোকদের যৌন কামনা এবং বাসনা পূরণের সঙ্গিনী হয়ে পড়েছিল।[৫৬]

ধর্মের নামে যৌনাচার যে কীভাবে মানবজীবনকে কলুষিত করেছিল তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে।[৫৭] শারদীয় দুর্গাপূজার সময়ে দশমী তিথিতে 'শারদোৎসব' নামে এই উৎসব সমাজে প্রচলিত ছিল। এই উৎসবের সময় গ্রামে নগরে নরনারী সামান্য গাছের পাতার পোশাক পরিধান করে গায়ে কাদা পাঁক ইত্যাদি মেখে নানারকম যৌন-অনাচারে লিপ্ত হতো। এরকম না করা হলে দেবীদুর্গা তুষ্ট হবেন না এবং তার মুখ উৎফুল্ল হবে না এমন বিশ্বাস ছিল এবং এ সম্পর্কে ধর্মীয় গ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম পুরাণে নির্দেশ ছিল। বসন্তকালে হোলি উৎসবেও এ ধরনের যৌনাচার যে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, তার বিবরণ রয়েছে জীমূতবাহনের 'কাল বিবেক' গ্রন্থে।[৫৮] সমাজে প্রচলিত এই

কুৎসিত যৌনাচারের অনেক চিত্র ধর্মীয় গ্রন্থেও পাওয়া যায়। প্রমথনাথ বসু মহাভারতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

> The following extracts from the Harivamsa describing a sea side picnic given by Krishna hardly require any comment : 'Having thus issued his order to the sea, he (Krishna) commenced to play with Arjuna while Satyabhama, incited by a wink of Krishna, began to throw water on Narada. Then Balarama, tottering with drink with great glee fell into the water, and beckoning the charming daughter of Revata by his side, took her by the hand. The sons of Krishna and the leading Bhaimas, who belonged to the party of Rama, joyous and bent on pleasure, unmindful of their dresses and ornaments, and excited by drink, followed him to the sea. The Bhaimas belonging to the party of Krishna headed by Nishatha and Ulmuka, arrayed in many coloured garments, and rich jewels and bedecked with garlands of Parijata flowers, with bodies painted with sandal wood paste and unguents, excited by wine and carrying aquatic musical instruments in their hands, began to sing songs appropriate for the occasion. By order of Krishna, hundreds of courtesans, led by the heavenly Apsarases played various pleasing tunes on water and other instruments. Krishna and Narada with all those who were on their side, began to pelt water on Bala and his Party; and they in their turn did the same on the party of Krishna. The wives of Bala and Krishna, excited by libations of arrack (a strong spitituous liquor) followed their example, and squirted water in great glee with syringes in their hands. Some of the Bhaima ladies, over-weighted by the load both of love and wine, with crimson eyes and masculine garbes, entertained themselves before the other ladies, squirting water.[৫৯]

সমাজজীবনে এ যৌন-আনাচার বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের রচিত চর্যাগীতিকায়ও বর্ণনা দিয়েছেন :

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধ অ
চীঅণ বাকল অ বারুণী আন্ধ অ।

সহজে থির করি বারুণী বান্ধ।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখই আ।
আইল গরাহক আপণে বসিয়া ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিরাসা ॥
এ ঘড়ুরী সরুই নাল
ভণন্তি বিরু আ থিল করি চাল ॥

অর্থ : এক শুড়িনী দুই ঘরে ঢোকে। সে চিকন বাকল দিয়ে বারুণী মদ বাঁধে। সহজ পথে স্থির হয়ে বারুণীতে প্রবেশ কর। দৃঢ় স্কন্ধ লাভ করে অজর অমর হও। দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই সেই পথ বেয়ে শুঁড়ির দোকানে আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হয়েছে। গ্রাহক ঘরে ঢুকল, তার আর সাড়াশব্দ নেই অর্থাৎ মদের নেশায় সে এমনিই বিভোর। সরু নাল দিয়ে একটা ঘড়ায় মদ ঢালা হচ্ছে, বিরূপা সাবধান করে দিচ্ছেন, সরু নাল দিয়ে চিত্ত স্থির করে মদ ঢালো।[৬০]

পদটিতে যৌনক্রিয়া সম্বলিত দেহভিত্তিক রতিনিরোধমূলক আচরণের ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে 'দশমী দুয়ার' বলতে রতিনিরোধজনিত চিহ্ন, সরুনাল—পুরুষাঙ্গ; 'চৌষট্টি ঘড়া'—দেহের চৌষট্টি প্রকার নাড়ি, 'মদ' অর্থে রতিকর্ম বুঝানো হয়েছে। রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত না হয়ে ধীরে ধীরে চিত্ত শান্ত রেখে মৈথুনে লিপ্ত হবার জন্য বিরূপা তার শিষ্যকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করলে সে 'সহজ' লাভে অজর, অমর হতে পারে।

নাড়ি শক্তিদিট ধরিঅ খট্টে
অনহা ডমরু বাজ এ বীরনাদে ॥
কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ আচারে
দেহ-নঅরী বিহরএ আকারে ॥
আলি-কালি ঘণ্টা-নেউর চরণে
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগ দ্বেষ মোহ লাইঅ ছার
পরম মোখ লবএ মুত্তি হার।
মারিঅ শাসু ন ণন্দ ঘরে শালী।
মা অ মারিয়া কাহ্ন ভইহ্ন অ কাবালী ॥

অর্থাৎ নাড়ি শক্তি দৃঢ় করে খাটে ধরা হলো। অনহা (অনাহত) ডমরু বীরনাদে বাজছে। কাপালিক কাহ্নপাদ যোগাচারে পর্যটনে লেগেছে। একাকারে দেহনগরীতে বিহার করছে। আলি, কালি, যেন তার (অর্থাৎ কাহ্ন পাদের) চরণ ঘণ্টা নূপুর। রবি

শশিকে (সে) কুণ্ডল আভরণ করে পরম মোক্ষের মুক্তাহার লাভ করেছে। শাশুড়ি ননদ শালীদের মারা হলো। মায়াকে মেরে কাহ্নপাদ কাপালিক হয়েছে।[৬১]

এই পদটিতে একইভাবে যৌনক্রিয়া এবং রতিনিরোধের কথা বলা হয়েছে। বলতে কী প্রায় সমগ্র চর্যাগীতিকায় এই একই ধারা। সিদ্ধাচার্যগণ তাদের সংগীতে এ ধরনের রতিনিবৃত্তকারী সাধনার কথা উল্লেখ করেছিলেন কেন তার প্রধানত দুটি কারণ—সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্যগণ অনার্য হওয়ায় তাঁরা শূদ্র নামে পরিচিত ছিলেন এবং সমাজে তাঁদের ঠাঁই মেলেনি। কিন্তু উচ্চবর্ণের সকল কর্মকাণ্ডে দাস হিসেবে তাঁদের নিয়োজিত করা হতো। এঁরা সমাজচ্যুত হয়ে লোকালয়ের বাহিরে বসবাস করতেন।

একটি চর্যায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে :

নগর বাহিরে ডোম্নি তোহোরি কুড়ি আ
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়ি আ

অর্থাৎ নগর বাইরে ডোম্নি তোমার কুঁড়েঘর, ব্রাহ্মণ নাড়াকে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও।

এসব শূদ্র বা অস্পৃশ্য বলে কথিত অনার্য বা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা শহর বা নগরের বাইরে প্রান্তসীমানায় টিলায় ঘর বেঁধে বসবাস করত। ব্রাহ্মণ বা উচ্চশ্রেণীর অনেকেই তাদের সাথে গোপনে মেলামেশা করত। সমাজে তাদের এই মেলামেশা বা ব্যভিচার করে তারা কোনো সন্তানের জনক হলে তাকে কেবল সংসর্গ দোষ-বৈ কোনো নৈতিক অপরাধে চিহ্নিত করা হতো না এবং তাদের জারজ সন্তানের দায়ভারও বহন করতে হতো না। কেবল মনস্তাপের মাধ্যমেই সে দোষস্খলন হয়ে যেত।[৬২]

উচ্চবর্ণ সমাজ কর্তৃক এমনিভাবে লাঞ্ছিত এবং নিগৃহীত হওয়ার কারণে নিম্নবর্ণের মধ্যে রতিনিরোধ প্রবণতার সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচলিত ছিল। তবে সেসব ক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবহারসহ নানা দেশজ প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রতিনিরোধের ঘটনাও প্রাচীনত্বের দাবিদার।[৬৩] চর্যাগীতিকায় অন্ত্যজ বা নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই দেহভিত্তিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রতিনিরোধ সাধনা অনুসরণ করত। এ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ নিম্নের চর্যায় পাওয়া যায় :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেসী

বেঙ্গ সংসার বডহিল জা অ
দুহিল দুধু কি বেন্টে যামাঅ।

অর্থ : টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে।[৬৪]

বলেছি, তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে নানা কদাচার ও নৈতিক অধঃপতনের জন্ম হয়েছিল। কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখা হতো। অষ্টম শতকের পূর্ব থেকেই ব্রাহ্মণ্য আমলে যৌনাচার ধর্মে স্বীকৃতি পাবার পর থেকে রতিনিরোধ সাধনাও গুরুত্ব পেয়েছিল। সহজিয়া বৌদ্ধদের মতো তৎকালীন অন্যান্য বৌদ্ধসমাজেও রতিনিরোধ সাধনা অনুসরিত হচ্ছিল।

সহজিয়া ধর্মে যোগভিত্তিক সাধনা কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাধনা মূলত রতিনিরোধ সাধনা। শরীরের মধ্যে যে বত্রিশ নাড়ি আছে তার মধ্য দিয়ে শক্তি অর্থাৎ বীর্যকে মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ প্রদেশে প্রবাহিত করা এই সাধনার লক্ষ্য। এই স্থানটিকে সহস্রদল পদ্ম বা সহস্রার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ প্রদেশে পৌঁছুবার পথে দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন নাড়ির বিরাম ও সংযোগস্থল আছে। এগুলোকে পদ্ম ও চক্র নামে অভিহিত করা হয়। অতঃপর বীর্য বা শক্তি যখন মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ প্রদেশে অর্থাৎ মহাসূক্ষ্ম স্থানে পৌঁছে তখন সাধনার শেষ এবং সাধনার পরম ও চরম আনন্দ বা মহাসুখ লাভ হয়। এই রতিসাধনা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সংঘটিত হতো সে সম্পর্কে চর্যাগীতিকায় বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এ সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অতীন্দ্র মজুমদার বলেন :

> 'অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমাজের ব্রাহ্মাণের কোনো ধনোৎপাদনের ভূমিকা ছিল না। বণিক সমাজ বলে যাঁরা সমাজে স্থিত তাঁরা আবার শূদ্র; অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজ-শ্রমিকেরা সমস্ত রকম সামাজিক সম্মান থেকে বঞ্চিত, কৃষিনির্ভর, কুটিরশিল্পনির্ভর নবম-দশম শতকের বাংলাদেশে সমাজে ধনোৎপাদনের ভূমিকা নিয়েছিল যারা, তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল কায়িক শ্রম এবং কায়িক শ্রম ছিল ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিন্দিত।[৬৫]

চর্যাগীতিকার লেখক বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ সমাজের এই নিচের তলার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁদের রচিত চর্যাপদে সমাজের নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দারিদ্র্য প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে এবং তার ফলে তাঁদের গানে একটি নৈরাশ্য এবং হতাশাবোধ ছড়িয়ে আছে। রতিনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সাধনার অঙ্গ বিবেচিত হওয়ায় সিদ্ধাচার্যগণ নানাভাবে এই রতিনিরোধের কথা তাদের অনুসারীদের বলেছেন। পরিবারকে তারা ছোট করতে চেয়েছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে। ভাববাদের প্রলেপ মানসিক বৈকল্য থেকেও তাঁদের মুক্তি

দিয়েছে। রতিনিরোধ সাধনা তাঁর স্বস্তির সোপান এবং অল্পে তুষ্টি লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য ধর্মের মাধ্যমে এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এসব ধারণা প্রদান আরেকটি প্রবঞ্চনার ইঙ্গিতও বহন করে। যা হোক, এই সহজিয়া মতাদর্শে দেহই একমাত্র সার। দেহই আত্মা এবং ইহলোকই সারবস্তু। নিরন্তর সুখভোগ ছাড়া আর কোনো পরমার্থ নেই। এই সম্পর্কে সরহপাদ বলেন :

কা অ ণাবড়ি খাণ্ডি মণ কেডু আল।
সদ গুরু বঅণে ধর পতবাল ॥
চী অ থির করি ধরহুরে নাহী ॥
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টাণ্ডঅ গুণে
মেলি মেল সহজেঁ জাইউ ণ আণেঁ।
বাটত ভ অ খান্টা বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলি আ।
কূল লই খরসোন্তে উজাঅ
সরহ ভণই গঅণেঁ পমাঁএ ॥

অর্থ : কায়ারূপ নৌকা, মন বৈঠা : সদগুরুবচনেতে ধর পতবাল (হাল)। চিত্তস্থির করে তুমি নৌকা ধর (বা হালের চাকা বা নৌকাগর্ভ ধর), অন্য কোনো উপায়ে নদী পার হওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা গুনে টানে, সহজে মিলিত হও, অন্য পথে যেয়ো না। পথে ভয়, দস্যু বলবান; ভবসমুদ্রের উল্লোলে (উচ্ছ্বাসে) সবই বিনষ্ট। কূল অনুসরণ করে খরস্রোতে উজান বেয়ে গেলে, সরহ বলেছেন, গগনে (সেই নৌকা) প্রবেশ করে।

এখানে মিথুনাত্মক দেহসাধনার মাধ্যমে রতিনিরোধের কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যা বা আলো-আঁধারির ভাষা বলা হয়। কারণ এই ভাষার মাধ্যমে যে বাণী প্রচারিত হয় তা কেবল সহজিয়া মতাবলম্বী বা দীক্ষিতজনই বুঝতে সক্ষম, সাধারণ পাঠক বা শ্রোতা তার গূঢ় রহস্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা করতে পারে না। চর্যাগীতিকার সকল পদেই রতিনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণের উল্লেখ রয়েছে। তন্ত্র, সাংখ্য, যোগ এই রতিনিরোধ সাধনায় সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত হবে না যে, বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদে এমন অনেক চিত্র রয়েছে যা একদিকে কামাচারিতার উদগ্র প্রকাশ, অপরদিকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শোক, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর হাহাকারে সোচ্চার। একদিকে কামচারিতা ধর্মের অঙ্গ, অপরদিকে সন্তানের জন্মদান দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার কারণ। এরই ফলে হয়তো কোনোদিন রতিনিরোধের কথা চিন্তা করেছে তৎকালীন সমাজ এবং ধর্মপতিরা। বীর্যস্খলনকে 'পাপ' বলে গণ্য করা হয়েছে। ধাতুসাধনা ধর্ম ও জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এর প্রকাশ ঘটেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ

সাধনার অঙ্গ হয়েছে। নিম্নসমাজ অর্থনৈতিক কারণেই জন্মনিয়ন্ত্রণকে সাধনার স্বার্থে মেনে নিয়েছে। আমার ধারণায়, কামচারকে নিয়ন্ত্রণের জন্যই রতিনিরোধের একটি আধ্যাত্মিকরণ ঘটেছিল এ সময়ে।

বস্তুত, এই রতিনিরোধ সাধনা লৌকিক ধর্মের অঙ্গ হিসেবে অদ্যাবধি সমাজে প্রচলিত রয়েছে। লৌকিকধর্মে রতিনিরোধ সাধনা বিন্দুসাধনা নামেও চিহ্নিত। বৈষ্ণবগুরু চৈতন্যদেব বিন্দুসাধনাকে কৃষ্ণসাধনা নামে অভিহিত করে তাঁর অনুসারীদের এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মতে মানবদেহে শ্রীকৃষ্ণ ধাতুস্বরূপ। অতএব, এই ধাতুর অপচয় সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং পাপতুল্য। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত'[৬৬] গ্রন্থে চৈতন্যদেবের এই মতাদর্শের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাদান করেছেন :

প্রভু বলে কৃষ্ণশক্তি ধাতুর প্রচার ॥
ধাতু সূত্র বাখা নিয়ে শুন সর্বজন।
দেখি কার শক্তি আছে কর খণ্ডন ॥
... ...
সর্বদেহে ধাতুরূপ বসে কৃষ্ণশক্তি
তাহারে যে করি স্নেহ তাহারে ভক্তি ॥
... ...

বৈষ্ণব মতবাদের এই বিন্দুসাধনাকে কেন্দ্র করে 'নাড়া' মতাদর্শের জন্ম। 'নাড়া' অর্থে শাখা-প্রশাখাহীন একক সত্তা। সাধারণ কথায় যার কোনো সন্তানাদি হয়নি কিংবা নাই, সে নাড়া। এই মতাদর্শের উৎস মূল চর্যাগীতিকায় নিহিত। কাহ্নপাদ বলেন :

মণতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আশা বহল পাতহ বাহা ॥
বরগুরু বা অণে কুঠারেঁ ছিজ অ
কাহ্ন ভণই তরু পূর্ণ না উইজ অ ॥
বাটই সো তরু সুভাসুভ পানী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥
জো-তরু-ছের ভেউ ণ জাণই ॥
সড়ি পড়ি আঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥
সুন তরুবর গ অণ কুঠার।
ছেবই সো তরু মূল ন ডাল ॥

অর্থ : মনতরু, পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার ডাল, আশারূপ বহুল পত্রবাহী (বা আশারূপ বহুল পত্র ফলবাহী)। সদগুরু বচনরূপে কুঠারে তাকে ছেদ করঃ যাতে, কাহ্নপাদ বলেছেন, তরু আবার না জন্মাতে পারে। সেই তরু শুভ-অশুভ জলে বৃদ্ধিপায়, গুরু উপদেশে সেই তরু বিজ্ঞজন ছেদন করে। যে ব্যক্তি তরুচ্ছেদের

রহস্য জানে না, ওরে মূঢ় সরে পড়ে (ভিন্ন হয়ে) তারাই সংসারকে মেনে নেয়। শূন্য তরু বর, গগন কুঠার। কেটে ফেল সেই তরু যাতে তার মূল ডাল কিছুই না থাকে।[৬৭]

উপর্যুক্ত চর্যাগীতিকায় 'নাড়া' শব্দটির ধর্মীয় প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাবগত' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য অদ্বৈতাচার্যকে চৈতন্যদেব নিজেই 'নাড়া' নামে অভিহিত করেছেন।

চতুর্দিকে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ
নাড়া, নাড়া প্রভু বলে অনুক্ষণ।
যখন দুলায় শির নাড়া নাড়া বোলে
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে।
সভেই বলুন প্রভু নাড়া বল কারে
প্রভু বলেন আইলাম যাহার হুঙ্কারে ॥
অদ্বৈত আচার্য বলি কথা কহি যার
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার ॥[৬৮]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অদ্বৈত তান্ত্রিকমতে ধাতুসাধনায় সিদ্ধ ছিলেন বিধায় তাকে 'নাড়া' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। যা হোক, 'নাড়া' মতবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য রতিনিরোধ। নিম্নের চর্যাগীতিতে কামচারিতার সঙ্গে রতিনিরোধজনিত কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায় :

নিসি অন্ধারী মুষার চারা
আমি অ ভুখঅ মুষা করা অ আহারা ॥
মাররে জোই আ মুষা পবণা।
জেঁণ তুট অ অবণা-গবণা ॥
ভব বিন্দার অ মুষা খণঅ গাতী
চঞ্চল মুষা কলি আঁ নাশক থাতী ॥
কাল মুষা উহ ণ বাণ।
গ অণে উঠি কর অমণ ধাণ ॥
তব সে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদগুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল ॥
জবেঁ মুষা এর চার তুট অ
ভুসুক ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥

অর্থ : রাত্রি অন্ধকার, মূষিক বিচরণশীল; অমৃত ভক্ষ শূষিক আহার করে। পবনের মতো চঞ্চল মূষিককে, হে যোগি, তুমি মার, যেন তার আনাগোনা টুটে যায় (বন্ধ হয়ে যায়)। পৃথিবী-বিদ্ধকারী মূষিক গর্ত খনন করে, মূষিক চঞ্চল এটা জেনে (তাকে) নাশ করার জন্য স্থির হও (স্থির কর)। মূষিক কৃষ্ণবর্ণ, তার উদ্দেশ্য ও

গায়ের রঙ (দেখা যায় না), গগনে উঠে সে অমনস্ক ধ্যান করে। সেই মুষিকের ততক্ষণ চঞ্চলতা, যতক্ষণ না সে সদগুরুর উপদেশে নিশ্চল হয়। ভুসুকু বলেছেন, যখন মূষিকের বিচরণ টুটে যায় (বন্ধ হয়) তখন তার বন্ধন খোলে।[৬৯]

চর্যাগীতিকা এবং বৈষ্ণবসাধনায় রতিনিরোধের পরিচয় আমরা পেয়েছি। পরবর্তীকালে দেশজ সুফিসাধনায় দেহবাদ এবং রতিনিরোধমূলক সাধনার কথা জানা যায়। এখানেও তান্ত্রিক ও যোগসাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগীয় সুফিসাহিত্য আলি রাজার 'জ্ঞানসাগর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

যুগল না হইলে কেহ না পারে চলিতে
যুগ ভিনে প্রেমরস না পারে ভুগিতে ॥
একা একি প্রেম না হএ কদাচন
যুগল হইলে যোগ্য পিরীতি ভজন ॥[৭০]

অতঃপর এই দেহসাধনায় যোগের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আরও বলেন :

মিশাই পরমহংস পবনের মনে
পূরক রেচক সঙ্গে হৃদের কম্পনে ॥
পূরক রেচক সঙ্গে রাখি মহাহংস।
এক যুগ সাধনে যে শরীর নহে ধ্বংস ॥
... ...
তন্মধ্যে সরোবর ত্রিপিনীর ঘাটে ॥
... ...
পূরক রেচক হয়ে ত্রিবেণীর মাঝ ॥[৭১]

আলি রাজা দেহবাদী সাধনায় স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে :

স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস।
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস ॥[৭২]

এই দেহসাধনা যে অত্যন্ত গোপনীয় একটি বিষয় সে সম্পর্কে আলি রাজা নিজেও যেমন সচেতন তেমনি ফকিরি মতের অনুসারী অন্যদেরকেও এ বিষয়ে গোপনীয়তা অবলম্বনের জন্য বলেছেন :

প্রভুর গোপত তত্ত্ব ফকিরী রতন।
জে সবে গোপতে রাখে ফকির সুজন।
ফকিরী গোপত রত্ন যে করে প্রচার
সে সব ফকির নহে ত্রিলোক মাঝার।
আল্লার পরম রত্ন যে রাখে গোপতে।
তা সব মহিমা অতি বাড়ি ত্রি জগতে।[৭৩]

সুফি ফকিরদের এই দেহবাদী সাধনার ধারা বাউলের মধ্যেও প্রচলিত। বাউলসাধনা সুফিসাধনার বাতেনী ধারা। এ ধারা সহজিয়া সাধনার মতো একটি যুগল সাধনা। এই সাধনায় নারীর গুরুত্ব পুরুষ অপেক্ষা বেশি। কারণ নারী বা প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষের সাধনা সফল হতে পারে না। বাউল মানবদেহকে কৃষিভূমি এবং দেহসাধনাকে কৃষিকাজের সাথে তুলনা করেছে।

মানবদেহ কল্পভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে
শুভযোগে চাষ করিলে ॥
(কালাচাঁদ)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাউলসাধনা রতিনিরোধ সাধনা হলেও কখনও কখনও সন্তান জন্মদেবার কথাও বাউল বলেছে। ফলে বাউলসাধনা পরিপূর্ণ রতিনিরোধ সাধনা না হয়ে রতিনিয়ন্ত্রিত বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সাধনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাউলসাধনায় জন্মনিয়ন্ত্রণের আধ্যাত্মিক প্রলেপ দিয়ে একে ধর্মীয় আচারভুক্ত করা হয়েছে। বীর্য বা রতিনিরোধে যে অটল অবস্থা তাকে ঈশ্বরারোপ করে সাধক সিদ্ধিলাভের পথ খুঁজেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই রতিনিরোধ কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণের সাধনায় সহজিয়া সাধনার মতো বাউলেরা কখনও কোনো ওষুধ বা গাছগাছড়ার আশ্রয় নেয়নি। দেহের বিভিন্ন নাড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে তারা এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অর্জন করেছে। তাঁদের এই পদ্ধতিকে আমরা বাউলপদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করব। একে প্রাকৃতিক পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। কারণ প্রকৃতিগতভাবে বাউলসাধক এই জ্ঞানলাভ করেছে। সাধন-ভজনের সংজ্ঞায় প্রকৃতির অপর অর্থ নারী।

বলেছি, দেহসাধনায় নারীই প্রধান। এই নারীকে বাউল 'চেতন গুরু' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কারণ দেহসাধনায় এই নারীর হাতেই মূল চাবিকাঠি। নারীকে বাউলের সাধনসঙ্গিনী এবং সেবাদাসী হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রতিমাসে নারীর 'মাসিক' হয় এবং তার পরপরই অর্থাৎ মাসিক শেষ হবার পর ডিম্বস্ফোটনের কাল। লোকমুখে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, প্রতি গাছে ফুল ফোটে কিন্তু প্রতি ফুলে ফল হয় না। তেমনি নারীদের ডিম্বাণুরূপী ফুল যে সবসময়ে ফল বা সন্তানসম্ভাবনা হবে এমন নয়। পুরুষের বীর্যকে সূর্য বা রতি এবং নারীর ডিম্বাণুকে শশী বা চন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়। নারীর ঋতুমতী কাল বা মাসিক পরীক্ষা করে বাউলসাধক ডিম্বাণুর ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। নারীর ঋতুমতী কালকে বাউলসাধনায় অমাবস্যা, যোগ, মহাযোগ, শুভযোগ ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত

করা হয়ে থাকে। নারী নিজে তার সন্তানসম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে বলে বাউল তাকে 'চেতন গুরু' বলে অভিহিত করেছে।

কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরু সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই
(লালন)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নারীদেহে যোনিপথে মাসিক শেষে তিনদিন জরায়ু মুখ থেকে একপ্রকার জলীয় পদার্থ, কখনও পরিষ্কার কখনও-বা ঘোলাটে, পিচ্ছিল শ্লেষ্মাপাত হতে থাকে এবং সর্বশেষ দিনে ডিম্বস্ফোটন বা অভ্যুলেশন হয়ে থাকে। এই ডিম্বের জীবনীশক্তি মাত্র ২৪ ঘণ্টা। কিন্তু যোনিপথে যে শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ বের হয় তার উর্বরতা ডিমের জীবনীশক্তির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যোনিপথ শ্লেষ্মার কারণে ভিজা থাকলে সন্তানসম্ভাবনা অনেকটা নিশ্চিত। সাধারণত মাসিক শেষ হবার পর তিনদিন পর্যন্ত এই সম্ভাবনা থাকে। যোনিপথ শুষ্ক থাকলে এই সম্ভাবনা একেবারেই কম। অর্থাৎ এই সময় দৈহিক মিলন ঘটালে শুক্রকীট শীঘ্র মারা যায়। এই শুক্রকীটকে বাউলগানে মীন বা মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন :

সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না
জল শুকাবে মীন পালাবে
পস্তাবিরে ভাই মনা ॥
ত্রিবেণীর তীর ধারে
মীন রূপে সাঁই বিহার করে
তুমি উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না ॥
মাস অন্তে মহাযোগ হয়
নিরস হতে রস ভেসে যায়
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীন রূপের খেল দেখলে না ॥
জগৎজোড়া মীন অবতার
তার মর্ম আছে সন্ধির উপর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সন্ধানীকে চিনলি না ॥
(লালন)

এই ত্রিবেণীর (অর্থাৎ স্ত্রীজননাঙ্গ) ধারে মীনরূপী সাঁই-এর আনাগোনা হয়। মাসিক শেষ হবার পর তিনদিন ধরে যখন স্ত্রীযোনিপথে শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ নির্গত হয় তখন স্ত্রীডিম্বকোষ থেকে ডিম ফেটে বেরিয়ে যোনিপথে আসে। এই সময় যোনিপথে শেষ্মাজাতীয় পদার্থ থাকলে এবং তখন দৈহিক মিলন ঘটলে শুক্রকীট

ডিম্বের সাথে মিশে গেলে স্ত্রী সন্তানসম্ভাবা হয়ে থাকে। যোনিপথ শুষ্ক থাকলে সন্তানসম্ভাবনা থাকে না।

বাউলসাধনায় এই প্রক্রিয়াকে নানাভাবে গানে ব্যক্ত করা হয়েছে :

তিনদিনের তিন মর্ম জেনে
রসিক সাধনে ধরে তা একই দিনে ॥
(লালন)

বাউলসাধকের কাছে সাঁই-এর আবির্ভাব পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। এই পূর্ণচন্দ্রই তার সাধনার ধন। এই পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ই বাউলের সাধনা। এই চন্দ্র নির্ণয়ে সাধক কয়েকটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করে। প্রথমত, মাসিক শেষ হবার পর থেকে তিনদিন সাধক স্ত্রীর যোনিপথে নির্গত ধারা পরীক্ষা করে থাকে। একটি পরিষ্কার সাদা কাপড়ে এই রস পরীক্ষা করা হয়। তবে শ্লেষ্মাজনিত পদার্থ যা এ সময়ে স্ত্রীযোনিপথে নির্গত হয়ে থাকে তা কখনও ঘোলাটে, কখনও স্বচ্ছ এবং পিচ্ছিল হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, সাধক এই রসের স্বাদ নির্ণয় করে। এই স্বাদ তিন প্রকার : তিতো বা পানসে, ঈষৎ নোন্‌তা এবং মিষ্টি। যে রসের ধারা মিষ্টি তা মধুতুল্য। এই রসের ধারা স্বচ্ছ বা পরিষ্কার এবং পিচ্ছিল এবং যা দেখতে অখণ্ড রূপ এবং যার ঘ্রাণ পদ্ম বা চন্দনতুল্য তাতে সুসন্তান বা ত্রুটিমুক্ত সন্তানসম্ভাবনা থাকে। এই ধারাকে বাউল সাঁই-এর আগমনের ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

এই সময় স্ত্রী বিশেষভাবে কামনাপীড়িত হয় এবং মানসিকভাবে অস্থির থাকে। তার মধ্যে কখনও আবেগ এবং কখনও বিষাদ কাজ করে। শরীর থেকে সুগন্ধজাতীয় ঘ্রাণও বের হয়। এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে লালন বলেন :

১

যে পথে সাঁই চলে ফেরে খবর কে করে ॥
সে পথে আছে সদায়
বিষম কালনাগিনীর ভয়
যদি কেউ আজগবি যায়
অমনি ওঠে ছোঁ মেরে
পলকভরে বিষ ধেয়ে ওঠে ব্রহ্মরন্ধে ॥
যে জানে উলট মন্ত্র
খাটায়ে সেই তন্ত্র
গুরুরূপ করে নজর
বিষ ধরে ভজন করে।
দেখে তার করণরীতি
সাঁই দরদী দরশন দিবে তারে ॥

২

অমাবস্যা, প্রতিপদ,
দ্বিতীয়ায় প্রথমে-সে তো
অধীন লালন বলে
কর গমন সেই যোগের দিনে ॥

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, বাউলসাধনা এক অর্থে অখণ্ড সাধনা। অর্থাৎ যে নারী কুমারী এবং সন্তানবতী হয়নি তাকে নিয়ে বাউলদের মূল সাধনা। নারীর প্রথম ঋতুকালীন অবস্থা শেষ হবার পর যে রস নিঃসৃত হয় তাকে বাউলেরা 'শাস্তু রস' বলে গণ্য করে এবং তা পান করে থাকে। এই পানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তারা বলে যে, এই পানে তাদের বিন্দুর যেমন স্থৈর্য ঘটে, তেমনি তারা জরা ব্যাধি ইত্যাদির হাত থেকেও মুক্ত হয়। এর পরের সাধনা উল্টা সাধনা। অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের আগমনে সাধক যখন নারীর সাথে মিলিত হয় তখন যোগ প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসকে ঊর্ধ্বগতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় সাধক কারুণ্য, তারুণ্য এবং লাবণ্য রস আস্বাদন করে। কারুণ্যরস সাধনার প্রথমাবস্থায় রতিকে ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ইড়া নাড়ির মাধ্যমে মস্তিষ্কে চালনা শিক্ষা করতে হয়। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলে সাধক তারুণ্য বা প্রেমের তারুণ্যরূপ অমৃতধারা সিক্ত হয়। এই সাধনা এক অর্থে বিন্দুর অটল অবস্থার সাধনা।

দ্বিতীয় রস সাধনার নাম তারুণ্য। সাধক বিন্দুধারণে সমর্থ হলে প্রয়োজন মতে বিন্দুকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন এবং পিঙ্গলা নাড়ির সহায়তায় নিম্নে আনয়নের সাধনা করেন। স্নায়ুপথে নিম্নে আগমনের কালে, জোয়ারের জলের মতো প্রবাহ পায় বলে এই রসধারাকে তারুণ্যরস বলা হয়।

তৃতীয় রসসাধনার নাম লাবণ্য। এই সাধনায় সাধক ইচ্ছামতো ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্নাপথে বিন্দুকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়। এই অবস্থা সাধকের জন্য মহানন্দের অবস্থা। অনেক সময় প্রকৃতি সংগম না করেও সাধক এই অবস্থা লাভ করতে সক্ষম হন। এই রসসাধনায় শরীরমন পুলকিত থাকে বলে এই রসসাধনার নাম লাবণ্য নামে চিহ্নিত করা হয়। এই কারুণ্য, তারুণ্য এবং লাবণ্য রসসাধনার অপর নাম প্রবর্ত, সিদ্ধ, সাধক।

কোন্ রাগে সে মানুষ আছে মহারসের ধনী
পদ্মে মধু চন্দ্রে সুধা যোগায় রাত্রি দিনি
সাধক সিদ্ধ প্রবর্তগণ
রাগ ধরে আছে তিনজন,
এ তিন ছাড়া রাগ নিরূপণ কোথাও হয় না জানি ॥

মৃণালগতি রসের খেলা
নবঘাটে নব ঘেটেলা
দশম যোগে বারির গোলা
যজ্ঞেশ্বর আযোনি ॥
সিরাজ সাঁইএর আদেশে বলছে লালন
শোনরে মলম ঘুরতে হবে নাগর দোলন
না জেনে মূল বাণী ॥

বাউলসাধনার মোদ্দাকথা উল্টাসাধন। এই উল্টাসাধনাই প্রেমের সাধনা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিমাস অন্তে মহাযোগ বা স্ত্রীর মাসিকের শেষে যে চন্দ্রের উদয়, এই 'চন্দ্র' বাউলের কাম্য নয় কেন? কেন সে শুধু পূর্ণিমার অভিলাষী, লালন বলেন :

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখতে পায়।
অমাবস্যা নেই সে চাঁদে দ্বিদলে তার বারাম উদয় ॥
যেথারে সে চন্দ্রভুবন
দিবারাত্রি নাই আলাপন
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদায় ॥
বিন্দু নালে সিন্ধুবারি
মাঝখানে তার স্বর্ণপুরী
সেইতো তিনি প্রমাণ জানায় ॥
দরশনে দুঃখ হরে
পরশনে সোনা করে
এমন মহিমা সে চাঁদের
লালন ডুবে ডোবে না তায় ॥

উল্লিখিত বাউলপদ থেকে আমাদের প্রশ্নের একটি উত্তর পাওয়া যায়। প্রতিমাসে চন্দ্র উদয় হয় কিন্তু যে চাঁদ বাউলের ঈপ্সিত বস্তু তার দেখা সহজে মেলে না। তার আবির্ভাবে কোথাও অন্ধকার থাকে না, সবকিছু আলোকে উদ্ভাসিত এবং দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। এই পূর্ণচন্দ্র কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

অনেক বাউল এমন ধারণা পোষণ করে যে, বাউলসাধনা কেবল রতিনিরোধ সাধনা অর্থাৎ বাউলের কোনো সন্তান হতে নাই। আমি বেশ কয়েকজন তত্ত্বজ্ঞ বাউলের সাথে আলোচনা করেছি, তারা আমার কথা সমর্থন করে বলেছেন যে, সন্তান জন্মদান সর্বক্ষেত্রে পাপ নয়। বস্তুত, লালন ফকির এ সম্পর্কে নিজেও সচেতন ছিলেন। একটি গান ব্যাখ্যা করলেই আমরা এ সত্য উদ্ধার করতে সক্ষম হই। আমাদের আলোচ্য গানের একটি পদে রয়েছে :

রস রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মূল খণ্ড হয়।
লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলা করলেন প্রচার
জানলে আপনার জন্মের বিচার
সব জানা যায়।
(লালন)

এই গানের লালন সন্তান-জন্মদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এই সন্তান কেমন সন্তান হবে সে সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেছেন তার গানে। অর্থাৎ তিনি সুসন্তান কামনা করেছেন। যে রতিতে মতি ঝরে এবং সেই মতিতে যে মূলখণ্ড হয় সেই সন্তানই তাঁর কাম্য। এবং স্রষ্টা নিজেও যে তা কামনা করেছেন লালনের গানে তার ইঙ্গিত রয়েছে :

লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধলীলা করলেন প্রচার
জানলে আপনার জন্মের বিচার
সব জানা যায় ॥

আধলীলা বলতে লালন এই মানবজীবনকে বুঝেছেন। এই মানবের মাঝেই স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানবজন্ম তাই বাউলদের কাম্য। কিন্তু এই জন্মদান সুচিহ্নিত হতে হবে। অর্থাৎ সন্তান জন্মের ব্যাপারে একটি নির্বাচন বা Selection থাকতে হবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, লালন ফকিরের নিজেরও তো কোনো সন্তান ছিল না। এর উত্তর : লালন সারা জীবন ধরে এই সুসন্তানের যোগ খুঁজে পাননি। বাউল দুদ্দু বলেন :

আত্মরতি খণ্ড করে শরিক হয়
পুত্রকন্যা রূপে পুনর্জন্ম তারে কয় ॥
পুত্রকন্যার মধ্যে সেথা
থাকে বেঁচে পিতামাতা
এই রূপে সৃষ্টির প্রথা বলিয়া যায় ॥
শুক্রবিন্দু বস্তুর রস ধরে
বংশপরম্পরা চলে ফেরে
এই রূপে তারা জন্মে জন্মে থাকে সাধনায় ॥
ত্রিবিধ যাতনারে ভাই

সেই যাতনায় মরে সবাই
না মরিলে মুক্তি তো নাই, জানে না সবাই ॥
জন্মিয়ে যাতনা প্রাপ্তি
এ কারণে পরম মুক্তি
পাইবে সাধনে শক্তি
দীন দুদ্দু কয় ॥

সুতরাং এই সন্তান-জন্মদান কোনো পাপকার্য নয়। তবে সুসন্তান যেমন জীবনকে আনন্দঘন করে তোলে, কুসন্তান তেমনি এই জীবনকে নরকে পরিণত করে। অধিক সন্তান বাউলেরা কামনা করেনি। কারণ তারা মনে করে অধিক সন্তান হলে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্রষ্টার প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করা যায় না। দুদ্দু আরেকটি গানে বলেন :

শরিকের উল্টা কলে পড়ো নারে ভাই কখন ॥
দেখ না এই জগতে সবাই
শরিকের যাতনায় কষ্ট পাই
দীনো হীনো দুদ্দু বলে তাই
শরিকেই মৃত্যুর কারণ ॥

লালনের গানেও এমনি ভাবনার প্রতিফলন :

হীরা লালমতির দোকানে গেলে না
ভবে কিনলিরে তুই পিতল দানা ॥
চটকেতে ভুলেরে মন
হারালি তুই অমূল্য ধন
হেরে বাজি কাঁদলে এখন
আর সারবে না ॥
শেষের কথা আগে ভেবে
উচিত যাহা তাই করিবে
এবার গত কাজের বিধি ছাড়
মন রসনা ॥
বেপারে লাভ করলি ভাল
গুণপনা সব জানা গেল
অধীন লালন বলে এবার মিছে হল
আওনা যাওনা ॥

সুতরাং বলা যেতে পারে বাউলসাধনা শুধু রতিনিরোধ সাধনা নয়। বিশেষ করে ফকির লালন পরিপূর্ণ রতিনিরোধে বিশ্বাসী ছিলেন না। অপর একটি গানে লালন বলেন :

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেনে আসমানে
চাঁদ রয়েছে চাঁদের কোলে ঈশান কোণে ॥
প্রথম চাঁদ উদয় দক্ষিণে,
শুক্লপক্ষে আসে নেমে বামে
আবার দেখ কৃষ্ণপক্ষে
কিরূপে যায় দক্ষিণে ॥
খুঁজলে আপন ঘরখানা
তুমি পাবে সকল ঠিকানা।
বারো মাসে চব্বিশ পক্ষ
অধর ধরা তার সনে ॥
স্বর্গচন্দ্র দেহচন্দ্র হয়
তাতে ভিন্ন কিছু নয়।
এ চাঁদ ধরলে সে চাঁদ মেলে,
ফকির লালন কয় নির্জনে ॥

এই সুসন্তান কীভাবে হবে এ সম্পর্কেও বাউলসাধক ধারণা করতে সক্ষম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নারীর প্রতি 'মাসিকেই' সন্তান জন্ম হয় না, যেমন গাছের প্রতি ফুলেই ফল হয় না। তবে যে চন্দ্রের উদয়ে নারী সন্তানবতী হয়, বাউল সেই সময় সাবধানতা অবলম্বন করে। এই সাবধানতা মিলন বর্জন করে নয় বরং মিলনের মাধ্যমেই তাকে জয় করে নেবার জন্য লালন সাধককে নির্দেশ দিয়েছেন। লালন বলেন :

১

শুদ্ধ প্রেমরাগে সদায় থাক রে আমার মন
সোঁতে গা ঢালান দিও না বেয়ে যাও উজন।
নিবাইয়ে মদন জ্বালা অহিতুঙ্গে করগে খেলা
উভয় নেহার উর্ধ্ব তালা
প্রেমের এই লক্ষণ ॥
একটি সাপের দুটি ফণী
দোমুখে কামড়ালেন তিনি
প্রেম বাণে বিক্রমে
তার সনে দাও রণ ॥
মহারস মুদিত কমলে,
প্রেমশৃঙ্গারে লওরে খুলে,
আত্ম সামাল সেই রণকূলে
কয় ফকির লালন ॥

২

মানুষের করণ সে কি সাধারণ
জানে কেবল রসিক যারা।
টলে বিষয় ভোগী
অটলে ঈশ্বর রাগী।
টলে অটল মিশালে মানুষের করণ সারা ॥
যে ফুলের ছন্দ ঝরে পড়ে
আর কি তারে হাতে পায় রসিক ময়রা ॥
যে নীরে ক্ষীর মিশায়
পড়ে না সে দুর্দশায়,
না মিশালে তার সাধনা বিফল পারা ॥
যে জন অনুরাগী হয়
রাগের জোরে মানুষ সন্ধান পায়,
ত্যাজ্য করে বৈদিক রাগের ধারা
পঞ্চবাণের ছিলে
প্রেম অস্ত্রে কাটিলে
ফকির লালন বলে কাম যায় মারা ॥

লালন বলেন, সাধককে ঈশ্বরের গুণাবলি লাভ করতে হবে। প্রয়োজনে রতিনিরোধের শক্তি যেমন তাকে আয়ত্ত করতে হবে তেমনি রতিস্খলনে সুসন্তানের জন্মাদানও করতে হবে। বাউলের সাঁই এমনিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। লালন বলেন :

সাঁই আবার কখন খেলে কোন্ খেলা
জীবের কি সাধ্য আছে তাই বলা ॥
কখনো ধরে আকার।
কখনো হয় নিরাকার,
কেউ বলে সাকার, কেউ নিরাকার
অপার ভেবে হই ঘোলা ॥
অবতার অবতারী
সে তো স্বভাবে তারি
দেখো জগৎ ভরি
এক চাঁদে হয় উজলা ॥
ভাণ্ড বেভাণ্ড মাঝে
সাঁই বিনে কি খেল আছে
লালন কয় নাম ধরেছে
কৃষ্ণ করিম কালা ॥

এই সাঁইকে পাওয়াই তার সাধনা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুসন্তানের জন্মদানই বাউলের মোক্ষ নয়। মোক্ষ, সাঁইকে আপনার অন্তরে উপলব্ধি করা। নারী পুরুষের নিরবচ্ছিন্ন রতিক্রীড়ার মাধ্যমে এই প্রেম সার্থক হতে পারে। মাসিক অন্তে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে নারী যখন ভীষণভাবে কামপীড়িত হয়, তখন তার সঙ্গে রতিক্রীড়ায় সাধক অটলত্ব লাভ করে তাঁকে পরম পরিতৃপ্তি দান করে। আমরা জানি মানবজীবনের সব ভালোবাসা বিবাদ ইত্যাদির মূলে যৌন-আবেগ। বলেছি, বাউলসাধনার সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি সুনিবিড় সংযোগ আছে। বাউল সাধনা তাই এক অর্থে জন্মনিয়ন্ত্রণ সাধনা। এ সাধনা কেবল রতিনিরোধের সাধনা বলে চিহ্নিত করা সংগত নয়। সহজিয়া বৈষ্ণব এবং অন্য মতাবলম্বীরা রতিনিরোধে বিশ্বাসী। তারা পূর্ণভাবেই সন্তান-জন্মদানে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু বাউল পাঞ্জু শাহ বলেন :

মার উদরে বাবা গেল
তারা দুজনে এক সঙ্গে মল
সহমরণে দুজন গেল
মরে একটি বস্তু পায়।
মার কোলেতে বাবা বসে
দুগ্ধ খাচ্ছে হেসে হেসে
পাড়ার লোকে দেখতে এসে
পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয় ॥

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাউলদের মধ্যেও রতিনিরোধ সাধনা বিশেষ প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আজকের পৃথিবী যেখানে জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য নানা ধরনের ওষুধ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছে, তা যেমন একদিকে ব্যয়বহুল অপরদিকে সামাজিক দুর্নীতির সহায়ক। বাউল এবং সহজিয়া অনুসারীরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা সমাধান করেছে। আমি ইতঃপূর্বেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার বাউলদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। বাউলসাধনায় সাধিকার ঋতুকালীন সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই 'মাসিক'-এর গুরু থেকেই সাধনার শুরু। বলেছি, বাউল পূর্ণমানুষের অভিলাষী। বাউল এই পূর্ণচন্দ্র উদয়ের দিনটিকে অমাবস্যা, প্রতিপদ এবং দ্বিতীয়া নামে চিহ্নিত করেছে। অমাবস্যা, প্রতিপদ ও দ্বিতীয়া–এই তিনদিনের শেষে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। এখানে পূর্ণচন্দ্র বলতে নারীর জরায়ু থেকে যে ডিম্বের উদ্ভব হয় তা পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ। এ সম্পর্কে গোঁসাই নরহরি বলেন :

রূপ সায়রের লাল জলে
সময় বুঝে মানুষ খেলে
বুঝতে পারে রসিক হলে
রূপ সায়রে দেয় নজর ॥

রূপ সায়রে তিন ধারা
বুঝতে পারে রসিক যারা
সদায় রূপে দেয় পাহারা
নিরিখ দিয়ে সেই নহর ॥
প্রথমে গুণেরী মানুষ
ভক্তি করে রাখ ধরে হুঁশ
দ্বিতীয়াতে হোস না বেহুঁশ
নির্বিকারে তারে স্মর ॥
পূর্ণ ঈশ্বর উদয় তিনে
নিষ্কাম যাজন সেই দিনে
নিরিখ দিয়ে সেইখানে
জোয়ারের সন্ধান কর ॥
তারপরে সহজে আসে
থাকে রসিক সাধক তারি আশে
রূপ সায়রের রূপ রসে
মন মিশিয়ে কর খবর ॥

অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব সময়কাল সাবধানে অতিবাহিত করতে পারলে সাধকের সিদ্ধিলাভ সহজসাধ্য হয়। এই সময় সাধক রতিনিরোধে কতখানি সক্ষম তাঁর পরীক্ষা হয়। কারণ পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবকালে নারী অত্যন্ত কামনাপীড়িত থাকে এবং তখন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারাটাই সাধনা। এ সম্পর্কে বাউল চাঁদ বলেন :

রসিক সুজন লোকে
ডুব মেরে চুপ করে থাকে
কাহারেও ধরা দেয় না গো তারা ॥
যখন নদীর হুমো ডাকে
নঙ্গর করিয়ে রাখে
জাহাজ আর বজরা ॥

কোনো কোনো বাউলের এমন ধারণা আছে যে, মাসিক শেষে চন্দ্রের আবির্ভাবকালে যে শৃঙ্গাররস নিঃসৃত হয় তা পান করলে অটলত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এই রসকে সাধকদের ভাষায় অমৃতরস বলা হয়। এই রস পান করলে বীর্য সহজে স্খলিত হয় না বলে কোনো কোনো বাউল বিশ্বাস করেন। কিন্তু লালন এ ধরনের রীতিতে বিশ্বাসী নন। তিনি রতিনিরোধের জন্য দমের সাধনা করতে বলেছেন :

হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর
মরেও বাঁচিতে পার ॥
(লালন)

বাউল নারাণ বলেন :

দম লাগাও সেই দমের ঘরে।
মানুষ সরে যাবে তোমার দমেতে পাক খেলে পারে ॥
বেদমনা হলে পরে সহজ মানুষ মেলে না
যদি বল, বললে কী হয়,
ছাচনের জল কি মটকায় যায়,
সে কেবল কথার কথা, বলি শোন ওরে ॥
দম মাদারকে ডেকে এনে দমেতে মন কর ভর,
দমের আগে মানুষ জাগে, চলে সে হাওয়ার উপর,
আট কুঠুরি বন্ধ করে উজনে তোল তারে ॥
অধর চাঁদকে ধরবি যদি দম কষে দমে সাধন কর
নারাণে বলে, করব কী
দম লাগে দম দেব কী
এবার তুমি দম মারগে অটল চাঁদের চরণ ধরে ॥

শুধু পূর্ণচন্দ্র নয়, চন্দ্রের সাধনায়ও এই একই প্রক্রিয়া। চন্দ্রকে বাউলদের ভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুক্র বা রতিও বলা হয়। এই রতিস্খলনে সন্তান-জন্মলাভ ঘটে। স্ত্রীলোকের 'মাসিক' সন্তান জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয়। এই মাসিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২৪/২৫ দিন পরপর আসে। কারো ক্ষেত্রে ২৮ দিনে। এই প্রসঙ্গে বাউল তাই বলে :

দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখতে তোরা আয়
মানুষ পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে চাঁদোয়া ধরে বসে রয় ॥
... ...
বারো চাঁদ বারো মাসে
চব্বিশপুর তার ঘিরেছে চৌষট্টি রস মন্থন করে
পঞ্চ রসে ছাঁচ বানায় ॥
মানুষ দমের ঘরে আসন করে
নয়ন কোণে পলক দেয়।
(গোপাল চাঁদ)

বলেছি, যেদিন পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে সেদিন নারী অতিরিক্ত কামপীড়িতা হয়ে থাকে এবং সে সময় সাধনার ধারা সম্পর্কে বাউলের নির্দেশ :

গুণীন যখন সাপকে ধরে
হাত বাড়ায় ধীরে ধীরে
কোন সাপ দুনজর করে।

তখন হাঁফ লেগে সাপ লটকে পড়ে
সেই সময় ধরে ঠেসে।
তখন তার ভয় থাকে না সে তখন অতি সহজেই
ফণীর শিরের মণি খুঁজে
আপন শিরে নেয় সে তুলে
পাকা গুণীন নয় কাঁচা ছেলে ॥
ও সে সাপ খেলে হৃদয় তুলে
উন্মত্ত প্রেম রসে ॥
ফণী তাকে পোষে মেনেছে
নত হয়ে পড়ে আছে
বিষদাঁত তার ভেঙে দিয়েছে
ফণী ঘাড় তোলে না
মুখ মেলে না
রয়েছে বেদের বশে ॥

(যাদু বিন্দু)

রতিনিরোধ সম্পর্কে গোঁসাই চণ্ডীদাস তাঁর গানে উল্লেখ করেন,

চৌষট্টি রস রাগের কারণ
চব্বিশ ভেঙে নয়তে মিলন
সপ্তম ভেঙে পঞ্চম সাধন
তিন রস নিরূপণ ॥

চৌষট্টি রস বলতে শৃঙ্গার বুঝানো হয়েছে। চব্বিশ বলতে 'মাসিক'-এর ২৪ দিন অথবা 'দেহের চব্বিশ চন্দ্র' এবং পঞ্চম বলতে পাঁচ ধরনের পানির গুণ যাকে সুফি বাউল 'পাঁচ পেয়ালা' বা পঞ্চরসের সাধনার কথা বলেছে। 'নয়' বলতে দেহের নবদ্বার, এই নয় দ্বার রুদ্ধ করে হাওয়া দমের মাধ্যমে মিলন অথবা মাসিক শুরু থেকে নয় দিনে মিলন। তিন রস অর্থে তারুণ্য, কারুণ্য এবং লাবণ্য। বাউলদের সাধনায় শুক্লপক্ষ অর্থাৎ মাসিক শেষের প্রথম ১৩ দিন, এর পর কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষ মিলন সাধনার জন্য অপরিহার্য।

অনেক বাউলের ধারণায় মাসিক শেষ হবার দিন থেকে তিনদিন সন্তানসম্ভাবনাযোগ খুব বেশি। এরপর সম্ভাবনা খুব কম। বাউল আরও বিশ্বাস করে যে, প্রতি গাছের ফুলে যেমন ফল হয় না তেমনি প্রতি মাসিকেও সন্তানযোগ থাকে না। সন্তানযোগ বুঝবার রীতিও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বাউল স্ত্রীজননাঙ্গকে তাই গুরুত্ব দিয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রতিনিরোধ সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। যে তা পারে সেই-ই সিদ্ধ। এ সম্পর্কে গোঁসাইরাজ বলেন :

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাবো না
চুল ভিজাবোনা গো, নাগরী, বেণী ভিজাবো না।
জলে নামবো, জল ছাড়াবো, ডুব দেবো,
কারো বাধা মানবো না ॥
আমি এধার ওধার সাঁতার পাথার করে বেড়াবো,
কারো কথা শুনবো না ॥
ভুখ লাগাবো ভুখে মরব,
তবু জানতে দিবো না ॥
নাগরী গো রাঁধিব বাড়িব, ব্যঞ্জন বাঁটিব
তবু আমি হাঁড়ি ছোবো না।
গোঁসাই রসরাজ বলে শোনো গো নাগরী
ঐরূপের যাই বলিহারি
আমি হবো না সতী, না হবো অসতী
তবু আমি পতি ছাড়বো না ॥

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : অতীতে স্ত্রীজননাঙ্গ সন্তান উৎপাদনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু ধনোৎপাদনের কামনাও এই যৌনজীবনের সাথে জড়িত ছিল। তিনি বলেছেন, মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত যোনিমূর্তি মানববিশ্বাসের এমন এক স্তরের সাক্ষ্য বহন করেছে যে, সেখানে সন্তান উৎপাদনই শুধু নয়, প্রাকৃতিক উৎপাদনেও মানুষ নারী-জননাঙ্গের উপর নির্ভরশীল ছিল।[৭৪] শুধু তাই নয়, বাউলদের নিকট স্ত্রীজননাঙ্গ প্রেম ও ভক্তির প্রতীক।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়ত দর্শনে' স্ত্রীজননাঙ্গ-যে ধন উৎপাদনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রচুর উদাহরণ দিয়েছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিমতকে আমরা অস্বীকার করি না। এমন বিশ্বাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। ইতঃপূর্বে আমার আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। আমি আরও দেখেছি যে এই জননাঙ্গ উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির জন্য রতিনিরোধের জন্ম দিয়েছে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সন্তান বন্ধের নির্দেশ লাভ করা গেছে রতিনিরোধ সাধনায়। এই রতিনিরোধকে আধ্যাত্মিক প্রলেপ দিয়ে বলা হয়েছে সন্তানপ্রজনন সাধনার অন্তরায়। নিরবচ্ছিন্নভাবে স্রষ্টাকে ডাকবার অবসর পাওয়া যায় না সন্তানের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার কারণে। সন্তানের উন্নতি-অবনতিকে নিয়ে সর্বসময় চিন্তিত থাকতে হয় পিতামাতাকে। অধিকন্তু সংসারের দায়দায়িত্বও অধ্যাত্মসাধনার পরিপন্থী। স্বামী স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কেউ সংসারে না থাকলে এই সাধনায় কোনো বাধা আসে না। তাই রতিনিরোধে আধ্যাত্মিক ভাবনার জন্ম হয়।

এখন প্রশ্ন জাগে : এই অধ্যাত্মসাধনায় যৌনজীবন প্রাধান্য লাভ করল কেন? এর উত্তরে এটুকু মাত্র বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের যৌনকামনা বা আকাঙ্ক্ষা অন্যদের অপেক্ষা বেশি। এর কারণস্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণ বা নিম্নশ্রেণীর মানুষ সারা দিন পরিশ্রমের পর প্রশান্তি লাভ করে যৌনসম্ভোগে। শুধু তাই নয়, জীবনের প্রায় সর্বত্রই যৌনভাবনাকে সে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকসাহিত্য এবং গীতি পর্যালোচনা করলে এই পরিচয় লাভ করব। বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'ও অশ্লীলতায় পূর্ণ। বিভিন্ন পালা, পাঁচালী ইত্যাদি গানে অশ্লীলতা বা যৌনজীবনের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত গালিগালাজে যৌনাচারপূর্ণ শব্দের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। এসবে তারা তাদের যৌনকামনাকে বিভিন্নভাবে চরিতার্থ করে। বাঙালি মাত্রেরই এসবের সাথে অল্পবিস্তার পরিচয় রয়েছে। সুতরাং যৌনজীবন যে ধর্মজীবনের অন্তর্ভুক্ত হবে এতে আশ্চর্যের নেই। প্রাচীন অনার্য সভ্যতায়ও তার প্রমাণ মিলেছে। শুধু প্রাচীন অনার্য সভ্যতার কথাই বলি কেন, পৃথিবীর তাবৎ আদিম সমাজে যৌনাচারের পরিচয় পাওয়া যায়।[৭৫]

জর্জ রীলে স্কট বলেন :

> ...in its purely metaphysical aspects religion is indelibly and closely associated with sex. The connection between eroticism and mysticism which is so intimate a feature of the higher and more esoteric forms of religious feelings is specially pronounced.[৭৬]

H.M. Westtrops বলেন :

> Evidence that this worship extensively prevaialed was to be found in many countries, both in ancient and modern times. It occurs in ancient Egypt. in India, in Babylon among the Assyrians, in Persia, Greece, Italy, Spain, Germany, Scandinavia and among the Gauls.[৭৭]

আদিম জনজীবন এবং তাদের ধর্মসাধনায় যৌনাচার যে অনুল্লিখিত নয়, উল্লিখিত আলোচনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। বলেছি, যৌনাচারে আধ্যাত্মিকভাবে প্রলেপ দিয়ে তাকে মুক্তির সোপান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই মুক্তি একদিকে অর্থনৈতিক অন্যদিকে আধ্যাত্মিকও বটে। গুরু এই মুক্তির পথনির্দেশক। বাংলাদেশের সহজিয়া সাধনা, বৈষ্ণব, বাউল, কর্তাভজা ইত্যাদি সাধনায় এই মনোভঙ্গি সক্রিয়। এ সম্পর্কে Max Wever বলেন :

> The lower the social class, the more radical are the forms assumed by the need for a saviour, once this need has emerged. Hinduism provides as example of this in the Karthabhajas, a Vaishnavite sect that in common with many salvation sect, took most seriously the transcendence of the caste taboo. Members of this sect arranged for a limited commensality of their members on private as well as on cultic occasions, Essentially a sect of lower strata people, yet they earned the anthropolatric veneration of their hereditary Guru to such a point that the cult became extremely exclusive. Similar phenomena can be found elsewhere among religions which recruited followers from the lower social classes... The transfer of salvation doctrines to the masses practically always results in the emergence of the saviour, or atleast in an increase of emphasis upon the concept of a saviour.[৭৮]

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি অর্থনৈতিক কারণে জর্জরিত থাকার ফলে মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছে। Max Wever বলেন :

> Since every need for salvation in an expression of some distress, social or economic oppression is an effective source of salvation beliefs, through by no means, the exclusive source..[৭৯]

Max Wever আরও বলেন, উচ্চতর সমাজের মানুষেরা এই Salvation বা মুক্তিতে বিশ্বাস করে না এবং তাঁরা ধর্মকে নিজেদের সুবিধানুসারে ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন :

> Other things being equal, classes with high social and economic privilege will scracely be proved to evolve the idea of salvation, rather they assign to religion the primary function of legitimizing own life pattern and situation in the world.[৮০]

সুতরাং বলা যেতে পারে অর্থনৈতিক বৈষম্য এই নিম্নশ্রেণীর মানুষদেরকে মুক্তির পথ খুঁজতে বাধ্য করেছে এবং অধ্যাত্মসাধনায় গুরুর উপর নির্ভর করে সে এই মুক্তিলাভ করতে পেরেছে। অধ্যাত্মসাধনায় নিজের মন নিবিষ্ট করে সে তার

জৈবিক ক্ষুধা এবং প্রয়োজনকে ভুলতে শিখেছে। আমি অনেক বাউলকে দেখেছি যে সামান্যমাত্র জলপান বা কিঞ্চিৎ অন্নভক্ষণ করে পরম পরিতৃপ্তিতে দিন কাটিয়ে দিয়েছে। এই অধ্যাত্মসাধনা তাদেরকে অল্পেতুষ্টি লাভে উৎসাহিত করেছে। তাকে 'জ্যান্তে মরা' হতে শিখিয়েছে।

জ্যান্তে মরা প্রেম সাধনা কি পারবি তোরা।
যে প্রেমে কিশোর কিশোরী হয়েছে হারা ॥
শোষায় শোষে না ছাড়ে বাণ
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান,
ও তার কামনদীতে চর পড়েছে
প্রেম নদীতে জলপুরা ॥
হাঁটতে মানা আছে চরণ,
মুখ আছে তার, খাইতে বারণ
ফকির লালন কয় এ যে কঠিন মরণ,
তা কি পারবি তোরা ॥
(লালন)

এই জৈবিক ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে অধ্যাত্মক্ষুধাকে প্রজ্বলিত করাকে বাউলসাধক মুক্তির পথ বলে ভেবেছে। তাই বলে বাউল এই পৃথিবীকে অস্বীকার করেনি, এবং সে বলেছে :

এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা ধারণা করতে সক্ষম হই যে অনেকটা প্রয়োজন সাপেক্ষেই যৌনজীবন অধ্যাত্মসাধনার সাথে যুক্ত হয়েছে, এই কামাচার ও যৌনাচার এই সাধনার সারকথা নয়।

বাউলসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রেম। এই প্রেম নিঃসন্দেহে অধ্যাত্মপ্রেম। কিন্তু এই প্রেম যৌনাচার বিযুক্ত নয়। লালন বলেন :

কবি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন
প্রেম সাধিতে ফেঁপে ওঠে কামনদীর তুফান ॥
প্রেম রতন ধন পাওয়ার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কষে
কামনদীর এক ধাক্কা এসে
যায় ছাঁদন বাঁধন ॥
বলব কি সে প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথা তথা
নাইরে আগমন ॥

পরম গুরু প্রেম পিরিতি
কামগুরু হয় নিজ পতি
কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি
তাই ভাবে লালন ॥

পাঞ্জু শাহ বলেন :

এবার আগে কর রাগের অন্বেষণ।
রাগ ধরে প্রেমসাধনে পরে মিলবে প্রেমরতন ॥
অন্ধকারের আগে তাই হয় সে রাগের উদয়,
যে রাগেতে সহজ মানুষ করেছে আসন ॥
যে রাগ ব্রহ্মাণ্ড উপর
দীক্ষাশিক্ষা গুরু বিনা সত্য রাগ চিনা হয় তার ভার
নিত্যবস্তু চলে তার, জীবের অনিত্য আচার,
না জেনে জীব চৌরাশী করিছে ভ্রমণ ॥
সহজ মানুষ এসে তায়
সে রাগে বারাম দেয়,
তার এক বিন্দু পরশিলে এড়াবে শমন,
যে যোগ অমাবস্যা কয়
প্রতিপদে কার্য নাই, তার সাধন দ্বিতীয়ায়
পাত্র অন্তর লয়ে তাই
যে নীরে ক্ষীরে মিশায়,
অধীন পাঞ্জু কেঁদে বলে ভজি চরণ তার ।

বাউলের এই প্রেমসাধনা কাকে লক্ষ্য করে? কার জন্য তার এই সাধনা? এর উত্তরে গগন হরকরা বলেন :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ
দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে ॥
লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হতো সুখী
আমি দেখতাম নয়ন ভরে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে।
ও তার বিচ্ছেদ প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে।

দিব তার তুলনা কী
যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে ॥
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
ও সে না জানি কী কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে।
কুলমান সব গেল রে
তবু না পেলাম তারে
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে ॥
ও তার বসত কোথায়
না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে।
ও সে মানুষের উদ্দিশ
যদি জানিস
কৃপা করে
আমার সুহৃত হয়ে
ব্যথায় ব্যথিত হয়ে
আমায় বলে দে রে ॥

উল্লিখিত আলোচনাদৃষ্টে আমরা এ ধারণা সংগত কারণেই করতে পারি যে, বাউলসাধনা বস্তুত একটি অধ্যাত্মসাধনা। কিন্তু এর স্তরবিন্যাস বা সাধনপ্রক্রিয়ায় লৌকিক জীবনের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। বাউলসাধক এই লৌকিকজীবনকে সংগত কারণেই সাধনার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এই লৌকিকসাধনা যে রাগপন্থী এবং মিথুনাত্মক এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। বাউলসাধক বৈরাগ্যে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তিনি কেবল ভোগবাদী নন। বাউলসাধনাকে তাই কেবল যৌনাচারমূলক সাধনা বলা সংগত নয়। তবে যৌনাচার এই সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। বাউল তার সামগ্রিক সাধনায় যৌনাচারকে প্রেমাচারে পরিণত করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে চেয়েছে।

এখানে বলা অসংগত নয় যে, বাউলসাধনায় যৌনাচার অত্যধিক গুরুত্ব পাওয়ায় কখনও কখনও সমাজজীবনে এই সাধনার বিকৃতি ঘটেছে। কিছুসংখ্যক তথাকথিত অসৎ সাধু এই সাধনায় যৌনচারকে মুখ্য হিসেবে গ্রহণ করায় সমাজজীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে।

ক্ষেত্রগবেষণার বিবরণ

বাউলসাধনা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার জন্য আমাকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাউলেরা কখনওই তাদের সাধনার কথা দীক্ষিত ব্যতিরেকে কাউকে বলে না। অর্থের বিনিময়ে যদি কেউ কখনও কোনো তথ্য সম্বন্ধে জানেন বলে ভেবে থাকেন তা আদৌ সঠিক নয়। কিন্তু বাউলদের নিজস্ব কোনো পুঁথি না থাকলেও বৈষ্ণব সহজিয়াদের বেশ কিছু পুঁথি আছে, তাতে সহজিয়াদের যে সাধনপ্রণালী আছে তা বৈষ্ণব বাউলেরা অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করে থাকে। এসব সাধনপ্রণালী এবং কামশাস্ত্রের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য এটুকু যে বৈষ্ণব বাউলেরা কামশাস্ত্রের একটি ধর্মীয় প্রলেপ দেয়। বৌদ্ধ সহজিয়াদের হাতে এই কামশাস্ত্র একটি ধর্মীয় কাঠামো পেয়েছিল—চর্যাগীতিকায় তার নিদর্শন রয়েছে।

কামশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাসের পর্যালোচনা ইতোমধ্যেই এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্ত্র ও যোগসাধনা এই কামশাস্ত্রের উৎস।[৮১] আদিবাসীই শুধু নয়, সব পিছিয়ে পড়া সমাজে কামভাবনার প্রাধান্য রয়েছে। বাংলাদেশে বৈষ্ণব বাউল অপেক্ষা সুফিবাউলদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। পশ্চিমবাংলায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সমাজে কামসাধনা তাদের ধর্মের অঙ্গ। সুতরাং এসব কর্মকাণ্ডে সামাজিক কোনো প্রতিরোধ আসে না। সে অঞ্চলের মুসলমান নামধারী সাধকেরাও নির্বিঘ্নে নিজেদের মধ্যে সাধনপ্রণালী অনুসরণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামের নৈতিকতা এবং মুসলিম আধিক্য হওয়ায় এই সাধনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গুপ্তভাবে করা হয়। তথাপি বলা যায়, এ সাধনায় পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য আছে।

আমি বাউল ফকিরদের সঙ্গে দীর্ঘবছর মেলামেশার মাধ্যমে যা জেনেছি তা হলো, এই সাধনার অনুসারীদেরকে রতিনিরোধ কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে গুরু নিজেই তাদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেন। রতিনিরোধের একটি সাধনভাষা আছে, তা হলো 'জ্যান্তে মরা'। একে বলা হয় জীবন্মৃত। বাউলেরা যখন দীক্ষা নেয় তখন তাকে বলা হয়—"তুমি আজ থেকে নিজেকে মৃত জানবে। কিন্তু তোমার

কোনো সাধন প্রক্রিয়া থেমে থাকবে না। তোমার কোনো সংসার থাকবে না। তুমি কোনো সন্তানের পিতা-মাতা হতে পারবে না। তুমি সমাজেও ফিরে যাবে না। শুধু ভিক্ষাবৃত্তি করে যা পাবে তা দিয়ে তোমাকে আর তোমার সেবাদাসীকে জীবন নির্বাহ করতে হবে। কোনো অভিযোগ করতে পারবে না।" এর পরে তাকে কাফন পরানো হয়। তখন তাদের অনেককে ক্রন্দনরত দেখেছি। এই প্রক্রিয়াকে সন্ন্যাসধর্মের সাথে তুলনা করা চলে। এই পর্যায়ের সাধনা যৌনাচারভিত্তিক। এই পথের অনুসারীদেরকে 'ভেক-খিলাফত'ধারী বলা হয়। পরিধানে শ্বেতবস্ত্র এই পথের পথিকদের পরিচয় বহন করে।

এ ব্যতিরেকে অপর একটি শ্রেণী যারা গৃহী-বাউল বা সংসারী তাদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তা তেমন কড়াকড়ি নয়। তারা সমাজে থাকতে পারবে। বিভিন্ন কর্ম করতে পারবে। কিন্তু সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুর অনুমতি প্রয়োজন হবে। দীক্ষার সময় একটি গোপন প্রকোষ্ঠে গুরু তাদের স্বামী-স্ত্রীকে দীক্ষাদান করেন। এই গৃহী-বাউলেরা সংসারধর্ম পালন করতে পারবে। তবে ইচ্ছা করলে সংসার ত্যাগও করতে পারবে।

আমি কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার দুটি গ্রামে গৃহী-বাউলদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করি। ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে যা দেখেছি এবং জেনেছি এখানে সে সম্পর্কে আলোকপাত করছি। উল্লেখ্য, আমার এ তথ্যাদি বিবরণমূলক। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ অবধি এই সমীক্ষার সময়কাল।

আলমপুর

কুষ্টিয়া শহর থেকে ৭-৮ মাইল দক্ষিণে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ পাকা সড়কের পশ্চিমপাশে আলমপুর গ্রাম। থানা কুষ্টিয়া-সদর। এই গ্রামে আব্দুল জব্বার ওরফে খোকা ফারাজি একজন বাউলগুরু। তিনি পাঞ্জু শাহের শিষ্য। কিন্তু লালন ঘরানার বাউলদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তিনি বর্তমানে গৃহী-বাউল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তাঁর সংসার। পাঞ্জু শাহের ঘরানায় বিবাহ ও সংসারযাপন নিষিদ্ধ নয়। তাঁর বাড়িটি সাধারণ লোকালয়ের একটু দূরে। কয়েকঘর বাউল মিলে তাঁরা একটি বাউলপাড়া গড়ে তুলেছেন। খোকা ফারাজির বাড়িতেই নিয়মিত বাউলের আসর বসে সন্ধ্যায়। দিনমানে তারা কৃষিকাজে কিংবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। খোকা ফারাজির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের মেলামেশা। তাঁর কাছ থেকে সাধনপ্রণালীর কথা যা জেনেছিলাম, তার সাথে অন্যদের বিবরণের মিল রয়েছে। খোকা ফারাজির স্ত্রীর সংখ্যা তিন এবং পুত্র ছয়। তিনি জানান, তার পুত্রদের জন্ম বাউল মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে হয়েছিল। খোকা ফারাজির পরিবারে কোনো অশান্তি নেই। খোকা ফারাজি রতিনিরোধ সম্পর্কে আমাকে যা বললেন তা নিম্নরূপ :

শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ ও ৮ ইঞ্চি পদ্ধতি

বাউলসাধনা যুগলসাধনা। এ সাধনায় নারীই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কখন কোন সময় ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব নির্গত হয় এবং ডিম্ব নিঃসরণের সময় নারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন হয়—তা নারীর অজানা নয়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কোনো বিবাহিত মেয়ে এ বিষয়ে সচেতন না থাকার কারণে সাধারণত কোনো সতর্কতা অবলম্বন করে না। কারণ স্বামীর ইচ্ছা তার কাছে বড়। স্বামী আনন্দ চায়—তাকে আনন্দ দিতে হবে। তা না হলে তার কপাল মন্দ।

বাউলসাধনায় অংশগ্রহণকারী মহিলা বা সেবাদাসী এ বিষয়ে তার যা যা করণীয় সবকিছুই গুরু কর্তৃক নির্দেশিত হয়। মহিলাদের যে মাসিক বা ঋতুকাল হয় তা সকলের সমান নয়। কারো ২৬, ২৮ কিংবা ৩২ দিনেও ঋতুকাল শুরু হয়। এই ঋতুকাল ৭, ৫, ৩ দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। গুরুর নির্দেশ অনুসারে সাধক ও সাধিকা রতিনিরোধ কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়। ঋতুকাল শেষ হলে নারীর উর্বরকাল শুরু হয়। এই উর্বরকাল তিনদিন স্থায়ী থাকে। এই তিনদিনকে সাধক-সাধিকারা নারীযোনিপথে বা স্ত্রীযৌনাঙ্গে সাঁই-এর আবির্ভাবকাল বলে জানে। এখানে সাঁই ডিম্বরূপী। এই সময়কালকে ডিম্বস্ফোটন ও তা নিঃসরণের কাল বলা হয়। সাধিকা পূর্বাহ্নে শারীরিক কোনো পরিবর্তন এলে তা টের পেয়ে থাকে এবং সে মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইতঃপূর্বে রতিনিরোধ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং ফারাজির বক্তব্যের সঙ্গে মিল থাকায় এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হলো না।

বাউলেরা জানে : "যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।" মানবদেহের কার্যক্রমের সঙ্গে বহির্জগৎ বা প্রকৃতিরও কার্যক্রম একই নিয়মে সংঘটিত হয়। বর্ষাকালে প্রকৃতি রজঃশীলা হয়। চন্দ্রের উদয়-অস্তকালের মতো নারীর দেহেও চন্দ্রের উদয় ও অস্তকাল আছে। একে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়ে থাকে। ফারাজির মতে নর-নারীর মধ্যে কামভাব আছে এবং কাম না থাকলে প্রেম, ভালোবাসা এবং সৃষ্টি সম্ভব হতো না। তিনি এই কামভাবকে 'চন্দ্র' নামে অভিহিত করে তার উদয় ও অস্তকালকে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ নামে অভিহিত করেন। নারীদেহে কামভাব বাম অঙ্গ দিয়ে ওঠে এবং ডান অঙ্গ দিয়ে নামে। পুরুষ দেহে ডান অঙ্গ দিয়ে ওঠে এবং বাম অঙ্গ দিয়ে নামে। তিনি মানবদেহকে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ হিসেবে ভাগ করে জানালেন যে দেহের মস্তক এই সাধনার ঊর্ধ্বদেশ এবং পশ্চিমদেহের নিম্নদেশে; স্ত্রী এবং জননাঙ্গ এমনিভাবে দেহের বামে উত্তর এবং ডানে দক্ষিণ। বাউলসাধনায় ঈশান কোণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈশান কোণের অবস্থান উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান। প্রাণবায়ুর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড এবং দেহের অভ্যন্তরে হাজার হাজার নাড়ি সচল হয়। দেহের মূল

নাড়ি তিনটি : ইড়া, সুষুম্না ও পিঙ্গলা। মেরুদণ্ডকে সুষুম্না নাড়ি বলা হয়। দেহে বহির্জগতের মতো চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান রয়েছে। পুরুষ সূর্যের প্রতীক। পুরুষের বীর্য যা আরতিতুল্য তাকে সাধকদের ভাষায় কখনও 'চন্দ্র' কখনও 'সূর্য' বলা হয়ে থাকে। বাউলসাধনায় কখনও কখনও পুরুষ এবং নারী উভয়কেই 'চাঁদ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন : "চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে (লালন)।" বাউল সাধনায় 'মণি' এবং 'ডিম্ব' উভয়ের অবস্থান মস্তকের শীর্ষদেশে। লালনের গানে আছে—

বলব কি সেই পড়শীর কথা
তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা নাই রে ॥
সে ক্ষ্যাণেক থাকে শূন্যের উপর
ক্ষ্যাণেক থাকে নীরে ॥

রতিনিরোধে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ অবশ্যকর্তব্য। বাউলসাধক এ বিষয়ে অভ্যস্ত। এই নিয়ন্ত্রণ গুরুর নিকট থেকেই শিখতে হয়। যৌনমিলনের সময় কোন নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত হয় সে-সম্বন্ধে বাউল সচেতন থাকে। সাধারণত পুরুষের ডান নাসারন্ধ্রে শ্বাস সহজভাবে প্রবাহিত হলে তা মিলনের যথার্থ সময়। এই সময় মেয়েদের বাম নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত হতে হবে। যদি ডান নাক দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত না হয়, তবে বিশেষ কৌশলে ডান নাকে শ্বাস প্রবাহিত করতে হবে। বীর্যপাতের সম্ভাবনা থাকলে উভয়ে নিজেদের শরীর অচঞ্চল রাখবে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখবে। পুরুষ তার গুহ্যদ্বার সংকুচিত রাখবে। এর ফলে বীর্যপাত হবে না। এমনিভাবে দীর্ঘক্ষণ এই কৌশল ব্যবহার করা যাবে এবং বীর্যপাত হবে না। খোজা ফারাজি বলেন, অতঃপর 'আজল'-এর নিয়মে তারা স্ত্রীজননাঙ্গের উপরিভাগে অর্থাৎ ৮ ইঞ্চি জননাঙ্গের ৪ ইঞ্চি উপরে নিরাপদ স্থানে বীর্যপাত ঘটায়। সাধকদের অনেকেই এই বীর্য পান করে থাকে।

ডাক্তারি শাস্ত্রে বলা হয় : মানুষের শরীরে দুটি চেতন এন্টিজেন, যা শরীরের প্রতিরোধ পদ্ধতির (Immunological system) অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দুটি হলো অশ্রু এবং পুরুষের বীর্য। অশ্রু এবং বীর্য রক্তে মিশলে বিশেষ অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়। বীর্যপানরত পুরুষ নিজ বীর্যপানের মাধ্যমে এই অ্যন্টিবডি উৎপন্ন করতে পারে এবং এর ফলে শুক্রাণুর উৎপাদন হ্রাস পায়। বাউলসাধনায় নারীরা পুরুষের বীর্য পান করে না। তা নিজ অধরে ধরে এবং পুরুষ তা পান করে নেয়। লালনের একটি গানে আছে :

ধরবে অধর চাঁদেরে
অধরে অধর দিয়ে

অধরচাঁদ অর্থে বাউলের 'সাঁই'। তিনি রজঃ-বীর্যে অবস্থান করেন।

বলেছি, আলমপুরে বাউলসাধকেরা রতিনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণে একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। একে স্থানীয়ভাবে 'আট ইঞ্চি' বা আট আঙুল সাধনা

বলা হয়। বাউলদের মতে নারীযোনির গভীরতা গড়ে আট ইঞ্চি বা আট আঙুল। তাদের ধারণায় বীর্যপাত অত্যন্ত গভীরে না হলে আট ইঞ্চির উপরিভাগে চার ইঞ্চি পরিমিত স্থানে নিক্ষিপ্ত হলে সন্তানসম্ভাবনা কম থাকে। তবে বীর্যপাতের সঙ্গে সঙ্গে নারী উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে এবং কৃত্রিম উপায়ে জোরে হাঁচি দেয়। অতঃপর ঠাণ্ডাপানিতে সে স্থান ধৌত করে। ফলে বীর্য যোনি-অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। বাউলেরা রতিনিরোধে দৈহিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রীর কামচেতনাকে নিবৃত্ত করে, দীর্ঘক্ষণ শৃঙ্গার বা কামক্রীড়ার মাধ্যমে তারা মিলিত হয় এবং এতে সহজে বীর্যপাত হয় না। একে স্থানীয়ভাবে 'সাপখেলানো বলা হয়ে থাকে।

যা হোক, আলমপুর গ্রামে বাউলদের মধ্যে রতিনিরোধ তথা জন্মনিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সফলভাবে প্রচলিত। এই গ্রামের বেশ-কয়েকজন দম্পতির সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা হয়। মীর জাহাঙ্গির হোসেন একজন ২৭ বছরের যুবক। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি বিবাহিত এবং বিবাহের বয়স দুই বছর। বিবাহের আগে থেকে তিনি বাউলসাধনা সম্পর্কে কিঞ্চিত অবগত ছিলেন। বিবাহের পর খোকা ফারাজির নির্দেশমতো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে তার কোনো সন্তান হয়নি। তার স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। তারা উভয়ে সুখী। তারা কয়েক বছর পর সন্তান নিতে ইচ্ছুক, তবে গুরু অনুমতি দিলে।

জালালউদ্দীন (২৫) নামীয় জনৈক ব্যবসায়ী যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি কুড়ি বছর বয়সে বিবাহ করেন। স্ত্রীর বয়স ১৫। বিএ পর্যন্ত পড়েছেন, পাস করতে পারেননি। তিনি নিঃসন্তান। তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। স্বাস্থ্যবতী মহিলা। খোকা ফারাজির শিষ্য।

এই গ্রামের বাউলগায়ক আব্দুল খালেকের বয়স ৩৫। তার ১৪ বছর বিবাহিত জীবন। এখনও নিঃসন্তান। শারীরিক কোনো দোষ তাদের দুজনারই নেই। তিনি খোকা ফারাজির নির্দেশমতো রতিনিরোধ জন্মনিয়ন্ত্রণ সাধনা করেন। স্ত্রী সহযোগী এবং বাউলমতে দীক্ষিত।

বাউল নয়, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ মেনে সংসার নির্বাহ করছে এমন কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার মধ্যে ঝিনাইদহ সরকারি কলেজের ছাত্র আবুল কালাম মিঠু অন্যতম। তিনি বিএ পরীক্ষার্থী। বিয়ে করেছেন দু'বছর। এখনও নিঃসন্তান।

রফিউজ্জামান (২৭) এই পদ্ধতি মেনে চলছেন গত দেড় বছর। কোনো সন্তানাদি নেই।

রবেশ আলী (৪২) আলমপুরের অধিবাসী। কৃষিজীবী। তার একটি কন্যা। তিনি শ্বাস-নিরোধ পদ্ধতিতে অত্যন্ত সুখী জীবনযাপন করছেন।

আলমপুরের পাশের গ্রাম দহকুলা নিবাসী মোহাম্মদ তাজউদ্দিন (৪০) বাউলপদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে গত ১৫ বছর বিবাহিত জীবনে তিনি নিঃসন্তান। তিনি বাউল মতে দীক্ষিত।

আলমপুরের ত্রিশ ঘর বাউলদের মধ্যে দশঘর বাউলদম্পতির কোনো সন্তান নেই। এই ত্রিশ ঘর বাউলদের গড় বয়স ২০ থেকে ৪৫ বছর এবং বিশ ঘর বাউলদের সন্তানের গড় বয়স ৭ বছর। শতকরা ৩ জন সন্তান হওয়ার পর বাউলধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এ-গ্রামের কোনো মহিলা সরকারি, বেসরকারি কোনো পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি এবং এ পর্যন্ত তারা কোনো গর্ভপাতও করেনি। আলমপুরে কিছুসংখ্যক যুবক ও বয়স্কদের মধ্যে গাঁজা সেবনের প্রচলন রয়েছে। এরা চিকিৎসার জন্যও বাউলপদ্ধতি ব্যবহার করে, কোনো ডাক্তারের কাছে যায় না।

ছেঁউড়িয়া

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের পূর্বদিকে আধামাইল এগোলেই লালন শাহের মাজার এবং ছেঁউড়িয়া গ্রাম। এই গ্রামের পশ্চিমপাশ দিয়ে একসময়ের প্রবহমান কালীগঙ্গা নদী এখন মৃত। এই নদীতে লালন ফকিরকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। লালন শাহের মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লালন একাডেমি। প্রতিবছর দুবার এখানে ওরশ হয়ে থাকে। ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোল উৎসবের সময় এবং পহেলা কার্তিকে লালন শাহের মৃত্যুদিনে। ভেক-খেলাফতধারী বাউল, গৃহীবাউল এবং তাদের অনুসারী মিলে কয়েক হাজার লোকের আনাগোনা। এদের মধ্যে ৫০ জন বাউলফকির ও তাদের সেবাদাসীকে রতিনিরোধ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। এদের মধ্যে ১০ জন রতিনিরোধ সাধনা করেন এবং তাদের কোনো সন্তান নেই। এরা ভেকধারী। এই ১০ জন ভেকধারী পূর্বে ছিলেন গৃহী। তখন গড়ে ২ জন সন্তান ছিল। কিন্তু ভেক নেওয়ার পর আর সন্তান হয়নি। গুরুই পথনির্দেশক। ১০ জন গৃহী-বাউল। এরা কেউ কৃষিজীবী, কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অথবা শ্রমিক। এদের সন্তান আছে। এরা অবস্থাপন্ন। রতিনিরোধ সাধনায় এরা অভ্যস্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং অন্য পদ্ধতি সম্পর্কে তারা অবহিত। এরা স্বামী-স্ত্রী যুগলভাবে সাধনা করেন। সংসারে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এদের পরিচয় আছে। তবে তারা গোপনে এই সাধনা করেন। এদের মধ্যে ৮ জন চিশতিয়া তরিকাপন্থী। এরা কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রতিনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এরাও গৃহী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও ৩০ রোজা করেন। এদের গুরু পাঞ্জু শাহ। অন্য ২২ জন বাউলসাধনা সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ। এরা বউলগানের ভক্ত। বয়স ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে ১৫ জন বিবাহিত। তাদের গড়ে ২ জনের সন্তান আছে। এরা এখনও বাউলমতে দীক্ষা গ্রহণ করেনি, কিন্তু বাউলদের অনুসারী।

লালন একাডেমিতে পরিচালক থাকাকালে আমি বার্ষিক ওরশ শরিফে উপস্থিত বাউলদের মধ্যে ৫ বারে ৫০০ জন বাউলফকিরের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করি। এদের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগকে রতিনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত দেখি এবং তারা তা নিয়মিত অনুসরণ করে। ছেঁউড়িয়া গ্রামের উত্তরপাশে ২০ ঘর তাঁতি বাউল আছে। এরা প্রতিনিয়ত আখড়াবাড়িতে আসা-যাওয়া করে। এদের মধ্যে গোলাম ইয়াসিন, স্বরপ শাহ, আবদুল গণি, আবদুল জব্বার, দুর্লভ, নিজামউদ্দিন শাহ ভেকধারী গৃহী-বাউল। এরা সকলেই রতিনিরোধ সাধনায় অভ্যস্ত। এরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ ও আট আঙুল পদ্ধতিসহ মিলনের পর মহিলাদের হাঁচি দিয়ে রতিনিরোধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গোলাম ইয়াসিন শাহের বয়স ৫০ বছর। একটিমাত্র পুত্র। বিএ পাস। নিজামউদ্দিন শাহের বয়স ৫২। দুই পুত্র, একটির বয়স ৩২, অন্যজন ২৮। নিজামউদ্দিন শাহ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রতিনিরোধ করে থাকেন। তিনি লালন মাজারের খাদেম। আব্দুল গণি শাহ বয়স ৪৫। ভেকধারী গৃহী-বাউল। ১ কন্যা, ১ পুত্র। দীক্ষা নেওয়ার পূর্বেই সন্তান ছিল। পরে কোনো সন্তানাদি হয়নি। এই গ্রামে তরুণ-যুবকদের মধ্যে বাউল মতবাদ তেমন প্রসার লাভ করেনি। তবে বেশ কয়েকজন বাউলগানের প্রতি আগ্রহী। এরা একাডেমিতে নিয়মিত গান করে থাকে। যুবকদের মধ্যে গাঁজা খাওয়ার প্রবণতা অত্যধিক। এই গ্রামে নারীদের মধ্যে কোনো গর্ভপাতের সংবাদ পাওয়া যায়নি। মেয়েলি রোগে টোটকা চিকিৎসার বহুল ব্যবহার রয়েছে। বেল্লাহ শাহ আখড়ার স্থায়ী অধিবাসী। সে মাজার ও বাউলদের দেখাশোনা করে থাকে।

কুষ্টিয়া জেলার বাউলদের মধ্যে চারিচন্দ্রের ব্যবহার আছে। এরা প্রস্রাব, বীর্য, রজঃস্রাব ও স্তনদুগ্ধ পান করে থাকে। কুষ্টিয়ার আলমপুর ও ছেঁউড়িয়া গ্রামে বাউলদের রতিনিরোধ সাধনায় জননাঙ্গে দ্রুত ঠাণ্ডাপানির ব্যবহার, ঠাণ্ডাপানি পান, মূত্রত্যাগ ইত্যাদি প্রক্রিয়া প্রচলিত। এরা লিঙ্গমুখ চেপে ও শ্বাস বন্ধ করে রতিনিরোধ করে থাকে।

পশ্চিম বাংলার বাউল

পশ্চিম বাংলার বাউলদের মধ্যে আমি রতিনিরোধ সাধনার প্রচলন দেখেছি। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান-বীরভূম ও নদীয়া জেলার মুসলমান নামধারী বাউলেরা সরাসরি বৈষ্ণব-সহজিয়াপন্থী বাউল। এরা তাদের সাধনায় সহজিয়া প্রদর্শিত দেহমিলনে অভ্যস্ত। এরা বাৎস্যয়নের কামশাস্ত্র ও অন্য দেশজ রতিশাস্ত্র অনুসারে দেহসাধনা করে থাকে। সম্প্রতি প্রকাশিত শক্তিনাথ ঝা বিরচিত 'বস্তুবাদী বাউল' গ্রন্থে মুসলিম বাউলদের দেহসাধনা ভিত্তিক সাধনপ্রণালীর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা পরিপূর্ণ কাম-সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সাধনা অনেকাংশেই বিকৃত। এরা

সুফি সাধনার পরিবর্তে সহজিয়া সাধনাকেই গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন সহজিয়া পুঁথিতে দেহসাধনার যে কর্মকাণ্ড রয়েছে তাকেই তারা অনুসরণ করেছে। সম্প্রতি বিশ্বভারতীতে অবস্থানকালে জয়দেবের বাউল মেলা এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে সতীমায়ের ধামে সাধুদের সাথে আলাপ করেছি। ইতঃপূর্বে বহু বাউলের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে এবং তাদের সাধনপ্রণালী সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এরা সহজিয়াভিত্তিক সাধনপ্রণালীতে মুসলিম ধর্মীয়ভাব ভাষা ব্যবহার করেছে। শক্তিনাথ ঝা[৮৩] তাঁর গ্রন্থে পশ্চিম বাংলার মুসলিম বাউলসাধকদের সাধনপ্রণালী উল্লেখ করেছেন। যেমন : "দেহমিলনের আগে সাধক-সাধিকা পরস্পরের দেহকে পূজা করবে। সাধক নারীদের পাঁচটি স্থান স্পর্শ করে সেখানে 'সেজদা' দেবে। প্রথম পায়ে প্রণাম। সেজদার মন্ত্র—

গুরু সত্য, মা সত্য, মার নামে জয় হোক
আমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হোক।
মা তুমি গতি তুমি রতি তুমি জীবের নিস্তারণ,
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর খাদেম মোক্তারগণ
সেজদা দিলাম এখানে, সেজদা যায় মা বরকতের চরণে
এই সেজদা মূল,
এই সেজদা কবুল কর আল্লা মহম্মদ রসুল ॥

দ্বিতীয় সেজদা মক্কায় (জন্মস্থানে); মন্ত্র—

খাতনে মা জিন্নাত জহুর হুশিয়ার
দিনহীনকে দ্বীন দিয়ে কর মা উদ্ধার।
ও মা বরকত দাউনদার
এই কাবাতে মারিফাতে আল্লাহো আকবার ॥
আল্লাওলি মহম্মদ কলি মা বরকত দাউনদার
এই কাবাতে মারিফাতে নিষ্ঠা করে সেজদা করি
আল্লাহো আকরব ॥
... ...
আল্লা বীজ মহম্মদ ডাল
মাদার নাথ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর দীননাথ।

শক্তিনাথ ঝা তাঁর গ্রন্থে জনৈক গুরু আদম আলি বিশ্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "গুরু আদম আলি বিশ্বাস[৮৪], তাঁর গ্রন্থে বাউল তত্ত্বকে 'সৃষ্টি ব্রেক' শিক্ষা বলে, বস্তু রক্ষার প্রাথমিক সাধনা ব্যাখ্যা করেছেন। ১. মাতৃস্থান প্রণামপূর্বক দেহমিলন শুরু করবে ২. বাম নাকে বা উভয় নাকে নিশ্বাস বহন-কাল মিলনের পক্ষে প্রশস্ত ৩. মিলন শুরু করার আগে ঠাণ্ডাজল খাবে এবং অঙ্গসিক্ত করবে ৪. শৃঙ্গার করবে, মুখেও শৃঙ্গার করবে ৫. মিলনকালে নাভির নিচে যেন মন না যায় ৬. পরস্পরের

চোখের মণির দিকে অপলক দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকবে। নারী এবং পুরুষ পরস্পরের মধ্যে গুরুরূপকে আরোপ করে নিহার করতে থাকবে। এই গুরু বর্জোখ, কামনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। মন সেখানে আবিষ্ট থাকে। ৭. শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেহমিলন চালিত হবে। ৮. স্খলন আসন্ন হলে ঠাণ্ডাজলে অঙ্গসিক্ত করবে। (অনেকে এ জল পান করে)।

নারী জিহ্বার মাঝে কামড় দিয়ে রাখলে বস্তু স্খলিত হয় না। স্বস্থানে ফিরে যায়। দেহমিলনে ডান নাকে নিশ্বাস গেলে হয় নিশ্বাস বদলে নিতে হবে অথবা মিলন বন্ধ করতে হবে। গুরু প্রদত্ত মন্ত্র মনে মনে জপ করতে হয় মিলনকালে। স্খলনের সম্ভাবনায় মিলন বন্ধ রেখে, ডান নাক বন্ধ করে বাম নাসায় মূলাধার থেকে টেনে নিশ্বাস তুলতে হবে উপরে, মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে ধীরে রেচক করতে হবে। "দুই আঙ্গুল হটিয়া গুহ্যদ্বার জড়ত্ব করিয়া নিচ হইতে দোমবায়ু উঠাইবে ও নাভিমূলের দক্ষিণদিকে বাঁকাইয়া দোমবায়ু উঠানোর অভ্যাস করিতে হয়।" আদম আলি এই পদ্ধতিকে 'হপিং' করা বলেছেন। অতঃপর সর্বশেষে ব্যবহৃত মন্ত্রের একাংশ : 'আল্লাহ মহম্মদের দোহাই তোমাকে, টলিতে নাই থাক, থাক মন্ত্র নিজ ঠাঁই, আল্লা মহম্মদের দোহাই তোমাকে টলিতে নাই।'[৮৫]

শক্তিনাথ ঝা তাঁর গ্রন্থে হঠযোগ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বাউল সাধকদের মধ্যে নদীয়া জেলার কানাইনগরের ইমান আলী লিঙ্গমুখে দুধ বা জল পান করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইমানের গুরু জনাব পণ্ডিতের (হরিহরপাড়া, স্বরূপনগর, মুর্শিদাবাদ) গুপ্ত কচ্ছপসাধনার কথা উল্লেখ করেন। জনাব পণ্ডিতের মতে এই সাধনায় ক্রমাগত অভ্যাসে সাধক লিঙ্গকে শরীরের অভ্যন্তরে ঢোকাতে ও বের করতে সক্ষম হয়। এতে প্রয়োজনে কামোত্তেজনা দমন করা সম্ভব।[৮৬]

দীর্ঘকাল লালন একাডেমির পরিচালক থাকাকালে এ ধরনের অনেক বাউলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। এদের মধ্যে একজন বালতিভর্তি পানি লিঙ্গনালে সম্পূর্ণ শোধন করতে পারতেন। তবে এমন বাউল আর দেখা যায় না এদেশে। হিন্দুধর্মে যৌনাচার বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন মন্দিরের গাত্রে এসবের পরিচয় নানা চিত্রপটে উৎকীর্ণ। কোণার্ক, ইলোরা, অজন্তা সর্বত্রে এসবের ছড়াছড়ি। বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান হওয়ায় দেহবাদ ও যৌনাচারমূলক সাধনা একেবারেই হ্রাস পেয়েছে। বাউলদের মধ্যে এখনও যতটুকু আছে, তা একেবারে গুপ্ত। এরই মধ্যে সুফিসাধনায় এসবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় রচিত সুফিদের নানা পুঁথিতে দেহভিত্তিক সাধনার বিবরণ আছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার ফরিদপুর এবং চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রায় ৮-৯ মাইল দূরবর্তী শরৎগঞ্জ এলাকায় বেশ কয়েক ঘর বাউলের বসবাস। আমি এসব জায়গায় গিয়েছি এবং বাউলদের সঙ্গে মিশেছি। এসব বাউল লোকালয় থেকে

স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করেন বিধায় বাউলসাধনার নানা আচার-অনুষ্ঠান এখনও তারা ধরে রেখেছেন। তবে সংসারত্যাগী বাউলদের সংখ্যা এখন আর তেমন দেখা যায় না। অধিকাংশই গৃহী-বাউল। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মিরপুর, কুমারখালী, খোকসা ও সদর থানায় বাউলদের বিভিন্ন আখড়াবাড়িতে এসবের প্রচলন দেখেছি। মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় বাউলের আখড়াবাড়ি আছে। এখানে বাউলেরা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে তাদের সাধনকার্য করে থাকে।

যা হোক, পশ্চিম বাংলায় বৈষ্ণব বাউলদের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখেছি, তাদের সাধনপ্রণালী পুরোপুরি সহজিয়া নির্দেশিত। কামশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সহজিয়া পুঁথিপাঠে বাউলেরা তাদের সাধনপ্রণালী অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান হওয়ায় এসব পুঁথি এখানে দুষ্প্রাপ্য। বাউলসাধক গুরুর নির্দেশনাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের বাউলসাধক ষটচক্র, হঠযোগ ইত্যাদির পাশাপাশি সুফিদের ছয় লতিফা এবং তাদের নির্দেশনাকে অনুসরণ করে থাকে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য, দুই বাংলায় বাউলদের মধ্যে সাধনপ্রণালী অনেকাংশেই একই ধরনের।

বাউলদের চিকিৎসাপদ্ধতি

দীর্ঘকাল বাউলদের সঙ্গে মেলামেশায় লক্ষ করেছি, বাউলেরা নিজেদের মধ্যে একটি গণ্ডি টেনে দিয়েছে। এরা প্রয়োজনে অন্যদের চিকিৎসা দিয়ে থাকে, কিন্তু নিজেরা অন্যদের কাছ থেকে কোনো চিকিৎসা নেয় না। এ বিষয়ে খান সাহেব আব্দুল ওয়ালী[৮৭] তাঁর একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন :

> In the Districts of the 24 Parganas, Nadiya, Jessore and Khulna and probably in other parts of Bengal, a class of mendicants is to be seen who are called by different names and whose peculiar habits, unshaven hair and repulsive manners are as much a curiosity to a stranger, as the rigid secrecy they maintain with regard to their tenets and practices is inexplicable. What these men believed and practised are only known to the members of the mystic cult but never to others,—even to those intimately connected with them. My attention to them was attracted first in this way. I had in my employ a servant aged apparently 22 who had been suffering from intestine cholic which had reduced him to a mere skeleton. He tried several medicine while in my employ, and after he had left it, with no effect. Those who are acqainted with the disease, can testify that it is very hard to cure and baffles the skill of physicians. For a time I did not see the young man. Inquiry revealed that a Faqir—commonly called Narar Faqir—had cured him of the malady. When I next saw him, I found him a new man, hale, hearty and robust, I tried my best to have a talk with the

faqir, and to procure from all other sources information regarding the mode of the treatment and the medicines used. But beyond the fact that they can cure all diseases that flesh is here to. I could gather no useful information.

উপর্যুক্ত বক্তব্যে আব্দুল ওয়ালী বলেন যে, তাঁর চাকরিকালে তাঁর একজন কর্মচারী, বয়স সম্ভবত ২২, 'ইনটেসটিন কলিক' ব্যথায় ভুগছিল। অনেক ওষুধপত্র করা হয়েছিল কিন্তু কিছুই হয়নি। সে একেবারে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষিত মাত্রেই জানেন যে এসব ক্ষেত্রে কোনো ওষুধেই তাকে সারানো সম্ভব ছিল না। এরপর বহুবছর তার সাথে আর আমার দেখা নেই। খোঁজ নিয়ে জানলাম, একজন নাড়ার ফকির তাকে রোগমুক্ত করেছে। পরে একদিন যখন তার সাথে আমার দেখা হলো, দেখি সে একজন নতুন মানুষ, চমৎকার দেখতে এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও বেজায় খুশি। আমি সেই ফকিরকে খুঁজে তার সাথে আলাপ করতে চাইলাম। কীভাবে তিনি এই রোগ সারিয়েছেন এটা জানার আমার খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে কিছু না বলে তিনি শুধু এটুকু বললেন যে, তারা এসব রোগের চিকিৎসা জানেন। আব্দুল ওয়ালী এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু জানতে পারেননি।

দীর্ঘ সময় ধরে বাউলদের সঙ্গে মেলামেশায় দেখছি তারা যোগসাধনা করেন। এই যোগসাধনার মাধ্যমে তারা দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নাড়িকে সচল করে থাকেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শরীরকে নীরোগ করে তোলেন। মাইকেল গার্ভার[৮৮] নামে একজন পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞানী যোগসাধনাকে কোনো রহস্যজনক বা গুপ্ত বিষয় বলে ধারণা করেন না। তিনি বলেন :

In many areas of scientific research in neuroendocrinology and psychopharmacology, this ancient Sanskrit knowledge is proving to be compatible with the most recent, contemporary medical research findings. For example, the existence of the pineal gland and its functional relationship to light has been clearly established by research in the West for the past 10 years. The pineal gland has long been identified by, Yogis in India as the Sixth Chakra, called 'Ajna Chakra' or 'the Third Eye'. They found the pineal to be a powerful behaviour modifier, capable of slowing down the organism and balancing the activity of the hemispheres (two sides of the brain). Neuroendocrine (brain hormone) research has shown that the newly discovered hormone,

melatonin, formed only in the pineal gland, is stimulated by darkness and by particular neurochemicals and drugs. Melatonin acts through a comples chemical pathway which decreases the levels of Six (or seven) anterior pituitary hormones in the brain and literally slows down the body hormonally. Melatonin is involved with sex and sexual development growth hormone levels, thyroid hormone levels, adrenal hormone levels, and several of the body's diurnal (daily) cycles.

This knowledge, just being discovered in the West, has been used practically as a body control system by Yogis for thousands of years in India. The pineal body will undoubtedly play an important role in western psychiatry and medicine as techniqes of pineal manipulation and their neurochemical bases are disseminated and understood.

গার্ভার একজন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে যোগসাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। হাজার বছর আগে মানবদেহকে সকল জ্ঞানের উৎস জেনে যোগীরা যে সাধনায় নিবিষ্ট থেকে জরা-মৃত্যুকে জয় করতে চেয়েছিলেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। যোগসাধনার অনেক তথ্যই আজ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে। গার্ভার আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের *Lymph system*-এর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এক্ষেত্রে যোগীদের অভিজ্ঞতাকে অভিনব এবং অসাধারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : Amazingly, a chart of the ancient Hindu pressure points is nearly identical to chart of the lymph system as identified by modern lymphangiography. এমনিভাবে যোগসাধনা আজ আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণার বিষয়।

এদেশের সহজিয়া সাধক, বৈষ্ণব-বাউল তাদের দেহসাধনায় আজো এই প্রক্রিয়াকে ধারণ করে হাজার হাজার বছর ধরে এই জ্ঞান মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে, গানে গানে, আচার-আচরণে লোকসমাজে পরিব্যাপ্ত। এ জ্ঞানকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে পৃথিবী সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এ সম্পর্কে গার্ভার তাই বলেন :

As a physicain, I find knowledge of these life habits of enormous benefit in treating patients and myself as well. ...These yogis through their experimentation, discovered

that only one nostril functions at a time and that without intervention, it changes about once an hour. To change one's nostril mechanically one need only lie down on his side, place a pillow under the rib cage and armpit and let the mucous in the nose move downwards for several minutes and open the upper nostril. They found that the open right nostril causes the left hemishphere to predominate and vice-versa. So by controlling the nostril which is open, the hemishphere of the brain can be regulated. I find controlling the nostrils to be an invaluable asset to my life. The pleasure of eating (right nostril), defecation (right), showering (right), sex (males right and females' left), drinking (left), and urinating (left), is markedly enhanced by controlling the proper nostril. Proper coordination of nostrils (hemishpheres) with life function saves energy and allows one to harmonize with these daily activities.

হিন্দু যোগীরা বিশ্বাস করে পাকস্থলী দেহের সকল জ্ঞানের উৎস। তারা নিরামিষাশী এ কারণে যে, তাদের বিশ্বাস এতে পাকস্থলী স্বাভাবিক থাকে। মাংস খেলে এর ব্যত্যয় ঘটে। এই প্রসঙ্গে গার্ভার বলেন :

Recent scientific work by Fernstrom and Wortman at M.I.T. (Massachussets Institute of Technology, Boston) has demonstrated the subtle biochemical mechanism which causes a high protein diet to decrease levels of serotonin (low levels of serotonin are found in depressed humans) and conversely, high carbohydrate diet (vegetarian diet) increases serotonin, this work is the first to demonstrate a dietary link with mental health and adds to the evidence in favour of becoming vegetarian. (Scientific American, February, 1974).[৮৯]

বস্তুত, বৈষ্ণব ও বাউল সাধকেরা সকলেই নিরামিষাশী। অগ্নির উৎপত্তি পাকস্থলীতে। এই অগ্নি নিয়ন্ত্রিত থাকলে দেহ অজর হতে পারে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে জাপানি বিশেষজ্ঞদের একটি গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে গার্ভার আরও বলেন যে, কোষ্ঠকাঠিন্যও দুর্বল মানসিকতার কারণ :

Japanese investigators have recently found the hallucinogenic chemical, dimethyltryptamine (DMT) in the urine of schizophrenics. Their evidence suggests that this abnormal chemical collects in genetically susceptible individuals after large amounts of tryptamine (parent amino acid to DMT) is produced by bacteria in the colon where the individual is constipated and the bacteria cannot be eliminated.[৯০]

গার্ভার আরও উল্লেখ করেন যে, কোষ্ঠকাঠিন্য দীর্ঘদিন থাকলে মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। আবার ঘন ঘন মলত্যাগ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

বাউলদের সঙ্গে দীর্ঘ মেলামেশায় আমি দেখেছি, এরা খুব কমই অসুখে ভোগে। প্রত্যেকেই ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী। অশীতিপর বৃদ্ধ কানাই ক্ষ্যাপা হাজার হাজার শ্রোতার সামনে নেচে নেচে গান করেছেন। কোনো ক্লান্তি বোধ করেননি। মহেন্দ্র গোঁসাই, বেহাল শাহ, ফকির চাঁদ, জোমেলা, খোরশেদ শাহ, লাইলী বেগম, ঝড়ু শাহ, মহিম শাহ, প্রমুখ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাদের এই সুস্বাস্থ্যের মূলে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রতিনিরোধ এবং দেহনিঃসারিত রস এবং বর্জ্য পদার্থজাত সাধনা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

মানবদেহে বায়ুর গুরুত্ব অপরিসীম। দেহের অভ্যন্তরে বায়ু নাড়ি ইত্যাদির চালিকাশক্তি। বায়ু রক্তপ্রবাহ বা ধমনীশিরা প্রবাহিত রক্তের স্থানে শোধন ও বিকৃত করে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহের কার্য সাধন করে। যোগসাধনের মাধ্যমে বায়ুর যথাযথ প্রয়োগ শারীরিক-সুস্থতা আনতে সক্ষম এমন ধারণা তান্ত্রিক, যোগী বৈষ্ণব-বাউল সকলেরই আছে।

মহিম শাহ, মনোরঞ্জন, মহেন্দ্র গোঁসাই এবং নিহাজউদ্দিন বাউলমতের অনুসারী এবং বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাদের মতে একজন সাধক যোগমতে বায়ুকে বাম নাক দিয়ে গ্রহণ ও ডান নাক দিয়ে নিঃসরণ করবে। বায়ু আকর্ষণ ও নিঃসারণের সময় বেগে বহির্গত করা যাবে না। আস্তে আস্তে বায়ু বহির্গমন প্রয়োজন। এইভাবে বায়ু শোধন করলে শ্লেষ্মাঘটিত পীড়া থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আঙুল দিয়ে কখনও ডান নাক এবং কখনও বাম নাকের দ্বার বন্ধ করে এই শোধনকাজ করতে হয়। যোগ ও তন্ত্রে নাসিকার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মতে বাম নাসিকা চন্দ্র এবং দক্ষিণ নাসিকা সূর্য। দেহের নাড়ির মধ্যে ইড়াকে চন্দ্র এবং পিঙ্গলাকে সূর্য বলা হয়। চর্যাপদে ও বাউলগানে রবি-শশী নামে এর উল্লেখ রয়েছে। দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়ায় নাসিকার মাধ্যমে বায়ু গ্রহণ ও নিঃসারণ যোগ ও তন্ত্রমতে সাধন করতে সক্ষম হলে শরীরের সকল নাড়িই বিশুদ্ধ হবে।

বিভিন্ন বাউলগুরু ও সাধকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং মেলামেশার মাধ্যমে বায়ুর প্রয়োগ যেমন লক্ষ করেছি, তেমনি জলের কার্যকরণও প্রত্যক্ষ করেছি। এদের মতে শরীরে জলের ব্যবহারে নানা ব্যাধির বিনাশ ঘটে। সাধক নাকের মাধ্যমে জল গ্রহণ করে তা মুখ দিয়ে বের করে দেবে। বারবার এই প্রক্রিয়ায় দেহ শ্লেষ্মামুক্ত হবে। পুনরায় মুখ দিয়ে জল গ্রহণ করে নাক দিয়ে নিঃসারণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় দেহ লাবণ্য আসে, শরীরে স্থবিরতা দূর হয় এবং বার্ধক্য সহজে আসে না। শরীর সুস্থ থাকে এবং কফ দোষ নিবারিত হয়।

হরিশ জোহারী তাঁর *Dhanwantari* গ্রন্থে বলেন :

> Knowledge and practice of the principles of breath science enables one to control his state of consciousness and prevent disease states.[৯১]

বস্তুত, যোগ ও তন্ত্র সাধনায় যে দেহবাদের মাধ্যমে সাধক নিজদেহকে অজর, অমর করে তুলতে চেয়েছে, বাউল সাধনায় তারই প্রতিফলন দেখি আমরা। বাউলদের সাধনায় নানা রসপানের কথা আছে। এই রস বলতে মূত্র, রজঃ, বীর্য এবং স্তনদুগ্ধ। বাউলদের মধ্যে এই রসপান প্রচলিত। শারীরিক অসুখে বাউলেরা এই রস পান করে। পেটের ব্যথায় প্রস্রাব পান, মাথাব্যথায় প্রস্রাব দিয়ে মাটি সিক্ত করে তা কপালে মাখা ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে। মূত্রপানের ক্ষেত্রে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেশাই-এর উল্লেখ করা যায়। তিনি নিয়মিতভাবে নিজের মূত্র পান করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'প্রাকৃতিক চিকিৎসা (Nature Cure)'[৯২] এ মূত্রপান সম্পর্কে বলেন :

> প্রকৃতি-মানুষের শরীরের অভ্যন্তরেও রোগ প্রতিরোধের একটি বিধান রয়েছে। তা হলো মূত্র। ১৯৫৭ সালের আগপর্যন্ত আমি এ সম্পর্কে জানতাম না। রাওজী ভাই মনিভাই প্যাটেল নামধারী আমার এক সহকর্মী যিনি আমারও অনেক আগে গান্ধীজীর অনুসারী হয়েছিলেন, এ বিষয়ে আমাকে লেখেন এবং আর্মস্ট্রং (Armstrong) লিখিত 'জীবনের পানি' (Water of life) বইটি পড়তে দেন। এটা আমার কাছে অত্যন্ত উপকারী বলে মনে হয়। আরো খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, সন্ন্যাসী যোগীগণ হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই নিজ মূত্র পানের অভ্যাস করে আসছেন। অনুসন্ধান করে আরো জানতে পারি যে দু হাজার বৎসরের পুরনো এক গ্রিক বইতে এই অভ্যাসের ব্যাপারে সুপারিশ রয়েছে। হিন্দুরা গোমূত্রকে পবিত্র মনে করে এবং শাস্ত্রমতে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে উহা পানের নির্দেশ রয়েছে। এটা পাকস্থলীর অনেক জটিল অসুবিধা দূর করে। এই প্রতিবিধানটি আর্মস্ট্রং-এর চিন্তায় কিভাবে এসেছিল তা এক মজার গল্প। তার স্বাস্থ্য ছিল খুব খারাপ। অনেক ওষুধ সেবনের পর কোনো ফলোদয় না হওয়ায় জীবন সম্পর্কে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি বাইবেলে পড়েছিলেন "সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তোমার জলাধারা থেকে পান কর" (Drink from your own cistern)। এটা তার মনে এমনই দাগ কাটে যে, কারো শরীরের জলাধার বলতে মূত্রকেই বুঝায়। পশু ডাক্তারগণ কর্তৃক পশুদেরকে নিজ নিজ মূত্র পান করাতে এবং তাতে পশুদের উপকৃত হতে দেখেছেন তিনি। ফলে আর্মস্টং-এর প্রত্যয় হয় যে, ঈশ্বর মানুষকে দেহ যেমন দিয়েছেন, দেহের সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পন্থাও দান করেছেন। অতএব তিনি নিজের উপরই তা চেষ্টা করে দেখেন। পঁয়তাল্লিশ দিন তিনি শুধু নিজ মূত্র ও পানি পান করে কাটান এবং অন্য যে-কোনো খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। তার পরিত্যক্ত মূত্রের সবটা তিনি পান করতেন। মূত্র দিয়ে তিনি তার সমগ্র শরীরও মালিশ করতেন। এই চিকিৎসায় তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি ৪০,০০০ রোগীর ওপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখেন, যাদের বেশির ভাগই উপকৃত হয়েছে।

কিছু জন্তুকে নিজ মূত্র পান করতে আমি দেখেছি। আগে মায়েরা পেটের অসুখ সারাতে বাচ্চাদেরকে নিজ মূত্র পান করাতেন। যোগী-সন্ন্যাসীরাও এই প্রতিবিধানটি প্রয়োগ করতেন এবং এ বিষয়ে শিবাম্বুসংহিতা (Shivambusanhita) নামক সংস্কৃতিতে একটি পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। আমি নিজের উপর এই প্রতিবিধান প্রয়োগ করে দেখেছি এবং আমার পরামর্শে অন্যেরাও এই পদ্ধতি পরীক্ষা করেন। আমি বহুমূত্র, ক্যান্সার ও যক্ষ্মা রোগীদের ক্ষেত্রে এই প্রতিবিধান ধন্বন্তরী কাজ করতে দেখেছি। চক্ষু, কর্ণ, দন্ত এবং চর্ম রোগেও এটা একটা অত্যন্ত কার্যকর প্রতিবিধান।

এসব সত্য ঘটনা থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিবিধানটি জনপ্রিয় হয় না কেন? এর কারণ হলো মূত্রকে নোংরা বস্তু বলে গণ্য করার সাধারণ সংস্কার। কিন্তু যারা মানুষের মূত্রকে নোংরা মনে করে তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক হিন্দু আছেন যারা গোমূত্রকে পবিত্র মনে করেন এবং উহা পান করেন। ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধ যত খারাপ গন্ধযুক্ত হোক না কেন তা তারা পান করেন। কোনো কোনো ওষুধ প্রাণীর অন্ত্র, কোনোটি উহাদের ক্ষুর হতে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও তা তারা পান করেন। কিন্তু নিজ মূত্রের প্রতি লালিত সংস্কারই তাদেরকে তা পানে বিরত রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের কাছে আরোগ্যের প্রতিবিধান রয়েছে। তাতে কোনো খরচও নেই। এ সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়াত রাওজী ভাই মানুষের মূত্রের উপর একটি বই লিখেন। বইটি আহমেদাবাদের ভারত সেবক সমাজ কর্তৃক গুজরাটি, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করা হয়। মূত্র দ্বারা চিকিৎসায় আঘাতজনিত রোগ ভালো হয়। গুজরাটি ভাষায় একটা পুরনো প্রবাদ আছে যে, 'অমুকের হৃদয় এতই কঠিন যে, একটা ফাড়া আঙুলেও সে প্রস্রাব করে না।' এক টুকরো কাপড় মূত্রে ভিজিয়ে ক্ষত ঢেকে দিলে ক্ষত ভালো হয়ে যায়। একই চিকিৎসায় পোড়া ঘা-ও ভালো হয়। শরীরে কোনো স্থান সাধারণভাবে কেটে গেলে তা ভালোভাবে পানি দিয়ে সাফ করে পরিষ্কার পানিতে ভেজা কাপড় মুড়ে দিলে ক্ষত তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। আর

কোনোপ্রকার ড্রেসিং (কোনোকিছু দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা)-এর প্রয়োজন হয় না। আঙুল ভাঙা বা মচকানোর ক্ষেত্রে এক টুকরো ভিজে কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ করা খুবই কার্যকর প্রতিকার। কিন্তু এসব স্বল্প ব্যয়ের প্রতিকার এতই সহজলভ্য যে, কিছু লোক এসবের অভীষ্ট ফলপ্রসূতা সম্পর্কে বিশ্বাস করতে চায় না।

জ্বর ইত্যাদিতে স্বীয় মূত্র শরীরে লেপনের বিষয়ও বাউলসমাজে প্রচলিত। এতে নিরাময় হয়ে থাকে। নারীর রজঃ পান বাউলদের মধ্যে নিত্যনৈতিক ঘটনা। বাউলেরা বিশ্বাস করে যে রজঃ পানে দোষ মুক্ত হয় এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধক তৈরি হয়। অখণ্ড পান বলতে কিশোরী বা কুমারী মেয়ের রজঃ পানকে বোঝানো হয়েছে। রতিনিরোধে স্বীয় বীর্যপান বাউলদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। বাউলেরা বিশ্বাস করে এতে দেহের অভ্যন্তরে নানা রোগ দূরীভূত হয় এবং দেহ লাবণ্যময় হয়। এ ছাড়াও বীর্যপানে বীর্যস্খলন সহজে হয় না। বাউলদের মধ্যে স্তনদুগ্ধ পান করার রেওয়াজ আছে। আমি বেশ কয়েকজন বাউলকে জানি তারা তাদের শিষ্যদের থেকে স্তনদুগ্ধ সংগ্রহ করে তা নিয়মিত পান করেছে। ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়াবাড়িতে বাউলদের একজন যক্ষ্মারোগী সে নিয়মিত স্তনদুগ্ধ পান করে অনেকদিন বেঁচেছিল। বাউলদের মধ্যে সর্বরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চারিচন্দ্র অর্থাৎ মল, মূত্র, রজঃ, বীর্য মিশ্রণে একপ্রকার পদার্থ তৈরি করে তা 'প্রেম ভাজা' নামে ভক্ষণের রীতি বাউলসমাজে আছে। এই চারিচন্দ্র সমগ্র শরীরে, কপালে, বুকে, পিঠে, মাথায় মর্দন করাও হয়ে থাকে। স্বীয় প্রস্রাব মাটিতে মিশিয়ে তা কপালে বা গায়ে মাখালে মাথাব্যথা, গা ব্যথা এবং জ্বরাদির উপশম হয়। বাউলদের মধ্যে এমন ধারণা আছে শুক্রকে স্খলনের মুহূর্তে ঊর্ধ্বে ওঠাতে সক্ষম হলে অজর যৌবনলাভ সম্ভব হয়। চারিচন্দ্র অর্থাৎ মল, মূত্র, রজঃ, বীর্য একত্রে মিশিয়ে গায়ে মাখালে চর্মরোগ হয় না—এমন ধারণা আছে বাউলদের।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাউলদের যে চিকিৎসাপদ্ধতি এর উৎস অনেক প্রাচীন। তন্ত্র ও যোগসাধনায় এই ধরনের চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ[৯৩] বলেন :

> As a matter of fact, it is in this field of alchemy that the contribution of the Tantrikas to Indian science was most notable.

এই প্রসঙ্গে P. C. Ray[৯৪] তাঁর *History of Hindu Chemistry*-তে তন্ত্র সম্পর্কে বলেন :

> Indian Alchemy very largely derives its colour and flavour from it (Tantrism), There is a curious mixture of alchemical processes on the one hand, and grotesque and obscene and sometimes rites on the other.

প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র : 'রসরত্নাকর' (৮ম শতক), 'রসেন্দ্রচূড়ামণি', 'রসার্ণভ' প্রভৃতি গ্রন্থে মানবদেহে নিঃসারিত নানা রসজাতীয় বর্জ্যপদার্থকে ওষুধরূপে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্রসাধকেরা এসব বর্জ্যপদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে পারদের ব্যবহারও গুরুত্ব পেয়েছে। জরা-ব্যাধি ইত্যাদি থেকে নিজ শরীরকে মুক্ত করার বাসনা দীর্ঘকালের। দেহসাধনায় সাধকেরা এ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে দেহের মুক্তি অর্থে জরা থেকে মুক্ত যৌবনদীপ্ত জীবনকে নির্দেশ করা হয়েছে। তান্ত্রিকেরা বিশ্বাস করেন যে দেহের বর্জ্যপদার্থ ও পারদের সমন্বয়ে দেহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। এই জরামুক্ত জীবনের জন্য তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে নানা প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৫] যেমন :

১. শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণায়াম।
২. দৈহিক কসরৎ বা কলাকৌশল (আসন ইত্যাদি)
৩. মৈথুন প্রক্রিয়া।
৪. দেহ নিঃসারিত বর্জ্যপদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণ।

সহজিয়া সাধনায় চারিচন্দ্র বা কায়াসাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়—যা বৈষ্ণব-বাউলেরা অনুসরণ করে থাকে তা এই দেহকে বার্ধক্যমুক্ত রাখার প্রয়াস। পি. সি. রায় 'রসার্ণভ' তন্ত্রশাস্ত্র থেকে এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন :

> The Preservation of body is obtained by mercury and by the suppression of breath. Mercury when swooned cures disease and when killed, restores life.[৯৬]

বাউলসাধনায় গাঁজা খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। এই গাঁজা খাওয়ার মূলে বাউলদের মধ্যে একটি বিশ্বাস যে এতে শরীরের একপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, ফলে বীর্যস্খলন সহজে হয় না এবং সাধক-সাধিকা দীর্ঘক্ষণ রতি ক্রিয়ায় নিবিষ্ট থাকতে পারে। বাউলসমাজে কোনো প্রকার মাংস ভক্ষণের প্রচলন নেই। বাউল বিশ্বাস করে যে এতে পাকস্থলী গরম হয়ে শারীরিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। শরীরে স্বাভাবিকভাবে কিছু প্রোটিনযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন পুষ্টিসাধনের জন্য। এ কারণে বাউলেরা মাছ, দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাদ্য যেমন দই, পায়েশ ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

বাউলেরা রোগ নিরাময়ে কিংবা শরীরের পুষ্টিসাধনে উপর্যুক্ত দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে কোনো গাছগাছড়া, ফল, ফুল ইত্যাদি ভক্ষণ করে না।

বাউলেরা গলায় তসবি ব্যতিরেকে অন্য কোনো লোহা, তামা ইত্যাদি ধাতু ব্যবহার করে না। ইদানীং ফকির নামধারী কেউ কেউ এসব ধাতু জাতীয় পদার্থ পরিধান করে। এরা বাউল মতাবলম্বী নয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই তারা তা করে থাকে। অবশ্য বাতরোগ ইত্যাদিতে কিছু কিছু ধাতু ব্যবহারের প্রচলন আছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, বাউলদের মধ্যে কিছু আদিম জাদুবিশ্বাস প্রচলিত। এই বিশ্বাস যে কেবল বাউলদের মধ্যেই—তা নয়। সকল পিছিয়ে পড়া সমাজে এমন বিশ্বাস রয়েছে। জেমস্ ফ্রেজার[৯৭] এ বিষয়ে তাঁর *The Golden Bough*-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাউলদের সকল বিশ্বাস গুরুকে কেন্দ্র করে। গুরুই তাঁর সমগ্র জীবনের নিয়ন্তা। গুরুর প্রতি তাই ভক্তির চেয়ে ভয়ই কাজ করে। বাউলদের বাইরের জগতে বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে সাধারণ মানুষ বাউলদের একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। কোনো সময় গ্রামে কোনো মহামারী দেখা দিলে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কেউ অসুখে আক্রান্ত হলে দলীয় কিংবা এককভাবে গ্রামে গানের আসর বসে। তিনদিন তিনরাত এই গান হয়ে থাকে। গ্রামবাসী মনে করে যে, এতে রোগ-বালাই দূর হবে। আমি এমন অনেককে দেখেছি যে অসুখে-বিসুখে তারা বাউলগানের জন্য মানত করে থাকে। অনেক বাউলফকির তাবিজ এবং ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ গ্রামবাসীকে রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যেই বাউলদের নিকট থেকে চিকিৎসা নেওয়ার প্রবণতা বেশি। এসবের মাধ্যমে বাউলফকিরেরা আর্থিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। লালন শাহের মাজারেও অনেকে মানৎ করে থাকে। কেউ কেউ তাদের সন্তান-সন্ততির অসুখে লালন মাজারের মাটি গায়ে মাখিয়ে দেয়। হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষদের মধ্যে এমন বিশ্বাস রয়েছে। ভূতে ধরা বা জিনে-ধরা মহিলাদের চিকিৎসার জন্যও বাউলফকিরদের আহ্বান করা হয়। লালন মাজারের একজন খাদেম, তিনি কবিরাজ নামে পরিচিত, প্রায়শই এ ধরনের কাজ করে থাকেন।

যাহোক, বাউলদের এই চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পূর্ণ নয়। অনেক বিষয় এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব হলো না। বাউলসাধনায় বর্তমানে সুফিসাধনার পাশাপাশি সহজিয়া সাধনা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় সহজিয়া সাধনা মুখ্য। সেখানে মুসলিম বাউলেরা সহজিয়া সাধনাকে মূল হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে এই সহজিয়া সাধনা সুফিসাধনার মাধ্যমে ফল্গুধারার মতো বহমান। বাউলদের চিকিৎসা এই দুই ধারায় প্রকাশ দেখা যায়। তাঁদের এই চিকিৎসাপদ্ধতি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আজকে আধুনিক চিকিৎসায় নানা 'থেপারি' দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাউলদের চিকিৎসাপদ্ধতি শারীরিক ও মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে রোগনিরাময় বিদ্যা হিসেবে গৃহীত হতে পারে কি না আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা তা ভেবে দেখতে পারেন।

বাউলগানে সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার

বাউল গান একটি বিশেষ সাধনমার্গকে কেন্দ্র করে রচিত। গান এই সাধনমার্গের অনুসারীদের সাধনভাষা। যেহেতু তা গান, সুতরাং সাধারণ লোকের তো সেসবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ারই কথা। কিন্তু সাধারণ লোক যাতে এই গানের অন্তর্নিহিত ভাবনারাশি বুঝতে সক্ষম না হয় অথচ তাদের রসপিপাসা যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, তার জন্য সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার প্রচলিত। এই সাংকেতিক শব্দ কেবল সাধুজনের নিকটের পরিস্ফুট। যেহেতু এই সাধনার অনুসারীগণ মৈথুন প্রেমে (erotic love) বিশ্বাসী এবং তাদের আচার-আচরণ সাধারণ্যে গ্রহণীয় নয়, সে কারণেই এই সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার। তথাপি এসব গানের একটি বহিরঙ্গরূপ রয়েছে যা অন্তর্নিহিত ভাবনা বা ধ্যানধারণাকে পরিচ্ছন্ন না করলেও একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদানে বাধার সৃষ্টি করে না। বাউলগানের প্রতি সাধারণ মানুষের আকৃষ্ট হওয়ার এ একটি বিশেষ কারণ। বাউল, সহজিয়া, তান্ত্রিক প্রভৃতি সাধনমার্গে এই সাংকেতিক পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে স্যার জন উডরফ বলেন :

> Symbolism exists in all religions in varying degrees. The Tantra Shastra is extra-ordinarily full of it in all its kinds...form, colour, language, number, action. The subject is a highly interesting but very lengthy one. I can only make two remarks with regard to it here. There is a good deal of what is called erotic symbolism in some of the Tantras. This is apt to shock many English people who are by no means all so moral, in fact as some might think this sensitivity suggests. It does not necessarily carry this suggestion to me. Such fear of erotic symbols is rather indicative in the generality of cases of natural impurity and want of self control. The great Edward Carpenter speaks of the "impure

hush" in these matters. A person whose mind is naturally bent towards sexual thoughts but who desires to contest them, has no doubt a fear which one readily understands of anything which may provoke such thoughts. But such a man in this respect lower than him who looks upon natural things in a natural way without fear of injury to himself; and infinitely lower than he to whom all is a manifestation of the one consciousness and who realises this in these things which are the cause of fall to the imperfectly self-governed passion. Nothing is in itself impure. It is the mind which makes it so.[৯৮]

উডরফের এই বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে সর্বমানুষের বেলায় প্রযোজ্য। বাউলগানে যে মৈথুন প্রেমের (erotic love) প্রচলন দেখা যায় তা কোনো নতুন কিছু নয়। উডরফ আরও বলেন :

Erotic symbolism however (for to this I now limit myself) is not peculiar to the Tantras. It is as old as the hills and may be found in other scriptures. It is a matter of embarrassment to the class I have mentioned that the Bible is not free from it. If we would picture the cosmic processes we must take the materials therefore from our own life. It is not always necessary to go to the erotic life. But man has generally done so for reasons I need not discuss here, and his selections must sometimes be admitted to be very apt. It has however been said that throughout Shakta symbolism and pseudeo-philosophising there lies at the basis of the whole system the conception of sexual relationship as the ultimate explanation of the Universe. Reading these words as they stand, they are nonsense. What is true is that some Shakta Tantras convey philosophic and scientific truths by the media of erotic imagery; which is another matter. But so also does Upanishad.[৯৯]

তান্ত্রিক সাধনায় মৈথুনপ্রেম এবং তার সাংকেতিক ব্যবহার সম্পর্কে উডরফের এই মন্তব্য আমাদের আলোচ্য বাউলগান সম্পর্কেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাউলগানে

যে যৌনাচার বা মৈথুনপ্রেম লক্ষ করা যায় তা অনেক ক্ষেত্রে রতিনিরোধমূলক হলেও এই রতিনিরোধ কর্মকাণ্ড সাধকের জীবনে স্বাভাবিকভাবে প্রবিষ্ট। এখানেই সে জ্যান্তমৃত। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনে যৌনাচার বা রতিক্রিয়া একমাত্র আনন্দানুষ্ঠান। এই ভাবনার প্রতিফলন অতি স্বাভাবিকভাবেই তার সাহিত্য ও গানে রূপলাভ করে। অন্যদের বিরূপ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তারা এই সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার করে তাদের সাহিত্যে। কিন্তু আমি এমন লক্ষ করেছি যে অনেক বিকৃত সাধক বাউলগানের এই মৈথুনপ্রেমের সাংকেতিক পরিভাষা না বুঝতে সক্ষম হয়ে বীভৎস যৌনাচারে লিপ্ত হয়েছে। এরা এই সাধনাকে কদর্যতায় পর্যবসিত করেছে।

আমার মনে হয় চর্যাপদের ভাষার মতোই বাউলগানের ভাষাকেও দ্ব্যর্থবোধকতার কারণে সান্ধ্যভাষা বা আলো-আঁধারি ভাষা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। Arthur Symons বলেন :

Without symbolism there can be no literature indeed, not even language... Symbolism began with the first words, uttered by the first man, as he named every living thing, or before them in heaven, when God named the word into being and we see, in these beginnings, precisely what symbolism in litereture really is a form of expression...[১০০]

Joseph Jastrow বলেন :

The art of communication makes primitive man a sign maker; his urge to explain makes him a myth maker; and a belever in sings; in all, he is symbolic.[১০১]

কবি শেলী বলেন :

All high poetry is infinite—veil after veil may be undrawn and the inmost naked beauty of the meaning never expressed.[১০২]

সাংকেতিকতা সম্পর্কে অশোক সেন বলেন :

সাংকেতিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যে ভাবকে বা সত্যকে ইহা রূপ দিতে চায় তাহাকে প্রথমে অমূর্ত করিয়া রাখে অর্থাৎ লুকাইয়া রাখিয়া দেয়। কিন্তু এই অমূর্ত করিয়া রাখিবার মধ্যে একটি গভীর উদ্দেশ্য আছে। যে সকল সহজ সত্য বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাধারণভাবে বর্ণিত হইলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ বা মর্মস্পর্শ করে না তাহাদের যখন

খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় তখন ঐ অমূর্তরূপই তাহাদের অধিকতর স্পষ্ট করিয়া এবং অধিকতর মূর্ত করিয়া তোলে। যে আলোকে সকল জ্যোতির জ্যোতি তাহা তো অন্ধকারের স্তরেই গুপ্তভাবে অবস্থান করে।[১০৩]

খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে
আপন আপন ঘর বোঝে মন
আবার কেন হাতড়ে বেড়াও
কোলের ঘোরে ॥
সর্ব দেশে মেঘের উদয়,
নীরদ বিন্দু বরিষণ তায়,
তাতে ফলবে ফল
রঙ বেরঙ হাল
আজব কুদরতি কল
ভাবের ঘরে ॥
নদী নীর গভীরে ডোবা কঠিন হয়,
ডুবলে কত আজব চিজ দেখা যায়,
ও সে নীর ভাণ্ড পোরা ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড
বলতে আমার নয়ন ঝরে
ইন্দ্র ভাঙ্গা নাই সে রাজ্যে,
সহজ ধারা ফেলে সহজে
মিথ্যা নয়, লালন
একবার ডুব দিয়ে দেখ স্বরূপ দ্বারে ॥

এখন প্রশ্ন জাগে : সাংকেতিকতা কি কেবল কোনোকিছুকে অমূর্ত বা অস্পষ্ট রাখবার জন্য? না তা নয়, বরং বলা যেতে পারে অমূর্তকে সুন্দর ও সহজভাবে বুঝবার বা উপলব্ধি করবার এমন উপায় আর নেই। বাউলসাধকও তাই এই সাংকেতিকতা বা প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। এই প্রতীক সৌন্দর্যসৃষ্টিরও বাহন। বস্তুত, দৃশ্যজগৎ পরম সুন্দরের এক রূপময় অভিব্যক্তি যা সংকেতের মাধ্যমে আমাদের মনকে ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে টেনে নিতে চায়। মানুষ ভাবপ্রবণ, সে স্রষ্টা ও শিল্পী; বাউল ফকিরের সহজ মানুষ, মনের মানুষের নানা অরূপ-রূপের বিবিধ প্রতিচ্ছবি নানাভাবে নানারূপে প্রতিনিয়ত মানুষের শিল্পীমনের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। এই প্রতিচ্ছবিগুলিকে সে চায় মন থেকে মনে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে, প্রাণ থেকে প্রাণে চালনা করতে, ব্যাপ্ত করতে, উৎক্ষিপ্ত করতে। বাউল সমস্ত দৃশ্যজগৎকে একটি সংকেতময় প্রতীকের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে চেয়েছে।

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে।

ফণী মণী সৌদামিনী
জিনি এ রূপ উজলে ॥
অস্তি চর্ম স্বর্ণ রূপ
তাতে মহারসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে।

রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব

এই রূপ-স্বরূপ তত্ত্বই মূল বাউলতত্ত্ব। বাউলগানে রূপ-স্বরূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাউল লালন একটি গানে বলেন :

কি সাধনে আমি পাইগো তারে
ও সে ব্রহ্মাবিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে ॥
স্বর্ণশিখর যার নির্জন গোফা
স্বরূপে সেইতো চন্দ্রের আভা
ও সে আভা চাই
হাতে নাহি পাই
কেমনে সে রূপ যায় গো সরে ॥
তিন রসের সাধন করো
রূপ স্বরূপের তত্ত্ব ধরো,
লালন কয় তবে যদি পারো
প্রাণ জুড়াতে সে রূপ হেরে ॥

এই রূপ-স্বরূপ সম্পর্কে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন : 'রূপ বলিতে বাহিরের একটি আকার বুঝায়, আর এই রূপকে আশ্রয় করিয়া এই রূপের অভ্যন্তরে উহার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাহাকে স্বরূপ বলা যায়।'[১০৪] অধ্যাপক ভট্টাচার্য এই রূপ-স্বরূপ তত্ত্বের সাধনাকে ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন : "তন্ত্রমতে পরমানন্দময় অদ্বয় সত্যের দুটি অংশ, খণ্ড বা রূপ আছে। এই দুইটি অংশের মিলনে এক পরমানন্দময় অদ্বয় সত্তা। এই দুইটি অংশের একটি শিব ও অপরটি শক্তি। এই শিব-শক্তির মিলনজনিত কেবল আনন্দই সাধকের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য।"[১০৫] একেই বলা যায় বৈষ্ণব সহজিয়াদের মহাভাব বা সহজাবস্থা এবং বৌদ্ধ সহজিয়াদের মহাসুখ। অধ্যাপক ভট্টাচার্য আরও বলেন : 'এখন রূপ ও স্বরূপ এই দুইটি কথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। জগতের পুরুষ ও নারীর যে রূপ তাহা তাহাদের বাহিরের 'রূপ'। এই রূপ বা বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে উহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব, তাহাই স্বরূপ। এই দৃশ্যমান, স্থূল, প্রাকৃত 'রূপ'-এর অন্তরালে উহার স্বরূপ অবস্থিত। জগতের প্রত্যেক পুরুষ 'রূপ'-এ পুরুষ কিন্তু 'স্বরূপ'-এ কৃষ্ণ, আবার প্রত্যেক নারী

'রূপ-এ নারী, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ রাধা। নর-নারী যখন রূপের মধ্য দিয়ে তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নর-নারীর মিলন হইবে রাধা কৃষ্ণের নিত্য প্রেম-লীলা; মর্তের প্রাকৃত প্রেম-মিলন হইবে নিত্য বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সহজ-লীলা। ইহাই সংক্ষেপে রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব।[১০৬]

অধ্যাপক ভট্টাচার্য রূপ-স্বরূপের বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা দান করেছেন; কিন্তু বাউলদের ধারণা এ থেকে বেশকিছু স্বতন্ত্র।

বাউলেরা রূপ বলতে এক অর্থে প্রকৃতিরূপকে বুঝেছে। প্রতিটি মানুষ পুরুষ-নারী নির্বিশেষে প্রকৃতি। স্বরূপ অর্থে স্ত্রীজননাঙ্গ। এই স্ত্রীজননাঙ্গই বাউলসাধনার লৌকিক স্তরের মৌলবিন্দু। এই স্ত্রীজননাঙ্গের মাধ্যমে বাউল তার মানুষতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছে। মানুষ সৃষ্টির মূল এই স্ত্রীজননাঙ্গ। এখানে চন্দ্রের উদয়, এখানেই মীন বা মাছরূপে সাঁই বিহার করে। এই স্ত্রীজননাঙ্গই বাউলদের বরজখ। তাই বাউল ভক্তি নিবেদন করে এই যোনিপ্রদেশকে। এখানেই তার সিদ্ধি। এই স্তর অতিক্রম করতে পারলেই সে সাধক। এই স্ত্রীজননাঙ্গকে স্বরূপ বলার অর্থ কী? স্বরূপ অর্থ আত্মরূপ, নিজের রূপ, নিজের আকার। একজন মানুষ পৃথিবীতে যে রূপ পরিগ্রহ করে তার উৎস এই স্ত্রীজননাঙ্গেই। বাউল মনে করে এই স্ত্রীজননাঙ্গেই তার পরমার্থ নিজেকে প্রকাশ করেছে। এই স্ত্রীজননাঙ্গকে ভগবান নামে চিহ্নিত করবার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে বৈদিক সাহিত্যে। স্ত্রীজননাঙ্গ যে ষড়ৈশ্বর্যবাচক তার উৎপত্তিও এখানে। যশোর-খুলনা অঞ্চলের একটি লোকধর্মের নাম ভগবাণী। ভগ+বাণ = ভগবাণী। এখানেই এই স্ত্রীজননাঙ্গ সাধনার প্রধান অঙ্গ।

দেবীপ্রাসাদ বলেন : 'ভগ' বলতে আদিতে জনৈক দেবতাকে বোঝাত। ঐশ্বর্য বিহরণই ছিল সে দেবতার বৈশিষ্ট্য। তাই, এ শব্দের ষড়ৈশ্বর্য বাচকতত্ত্বের উৎপত্তি সেই দেবতার নাম থেকে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তন্ত্রমতে নারী জননাঙ্গের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। একে পূজার আচার বলেও কল্পনা করা হয়েছে। স্ত্রী ভগং পূজনাধার।[১০৭]

বাউলসাধনার স্বরূপতত্ত্বের এই চেতনা যে নেহাৎই তান্ত্রিক ভাবনাজাত এমন ধারণা অসংগত নয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নারীই এই সাধনার প্রধান অধিকরণ এবং স্ত্রীজননাঙ্গই এই সাধনার মূল উপকরণ। তাই এ সাধনা সাধুদের মধ্যে স্বরূপসাধনা নামে পরিচিত। এই স্বরূপতত্ত্বের সাধন ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না সমন্বয়ে তিন রসের সাধন। এই রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব সম্পর্কে লালন বলেন :

রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে
চেয়ে দেখ না তোরা।
ফণী মণি জিনি
রূপের বাখানি
দুই রূপে আছে সেইরূপ হল-করা ॥

যে জন অনুরাগী হয়।
রাগের দেশে যায়
রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখিতে পায়।
রাগেরি করণ
বিধি বিস্মরণ
নিত্য লীলার উপর রাগ নেহারা ॥
ও সে অটল রূপ সাঁই
ভেবে দেখ তাই,
সে রূপের কভু নিত্য লীলা নাই ॥
যে জন পঞ্চতত্ত্ব খোঁজে
লীলা রূপে মজে
সে কি জানে অটল রূপ কি ধারা ॥
আছে রূপের দরজায়
শ্রী রূপ মহাশয়,
রূপের তালা ছোড়ান তার হাতে সদায়।
সে জন শ্রী রূপগত হবে,
তালার ছোড়ান পাবে,
অধীন লালন বলে অধর ধরবে তারা ॥

অপর একটি গানে রূপচাঁদ বলেন :

আমার মন সাজ প্রকৃতি
প্রকৃতির স্বভাব ধর, সাধন কর, ঊর্ধ্ব হবে দেহের রতি ॥
যে আছে ষড়দলে, তারে লও উল্টা কলে,
যদি সে যায় দ্বিদলে
উঠলে জ্বলে জ্যোতি,
তখন অনর্থ নিবৃত্তি হবে, নিষ্ঠা হবে রতি,
কাম ব্রহ্ম সাকার হবে, উদয় হবে গুরুর মূর্তি ॥
যে আছে মূলাধারে তারে লও সহস্রদলে,
যাবি বিরজার পারে তাহার সংহতি।
সেই যুবতী রসবতী, রসময় মুরতি।
এমন মধুর রতি জীবকে দিয়ে
প্রাপ্ত করায় কৃষ্ণ পতি ॥
রূপচাঁদ বলছে স্বরূপ, আগে তুই ধরগে সে রূপ
স্বরূপ-রূপে রূপ দেখতে পাবে
কোটি সূর্যের জ্যোতি ॥
গুরু ভিন্ন হবে নারে মূঢ় মতি,
গুরুর দয়ায় সফল হবে কৃষ্ণ কৃপা প্রাপ্তি ॥

রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব সম্পর্কে অপর একজন বাউল বলেন :

বজ্রপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন
তবে করগে যা স্বরূপ সাধন
স্বরূপের রূপ রূপের স্বরূপ
স্বরূপ দেহে হয় মিলন ॥
রূপের দেহে স্বরূপের স্থিতি
স্বরূপেতে রসের মানুষ ধরবি যদি
রাগের পথে কর গমন ॥
সেথা রাগের আশ্রয়
রূপ-রতির নির্ণয়,
রতি গাঢ় হলে প্রেম নাম ধরায়
তখন অনায়াসে রাগের ঘরে
হবে রে মানুষ মিলন ॥

আচার বিচার নাইকো সে দেশে
স্বরূপ-রূপে নেহার দিয়ে আছে গো সে বসে,
সেই নেহারে রসের মানুষ
করতেছে সব দরশন ॥
রূপনগরে রসের নদী বয়
রেজো ক্ষ্যাপা সাঁতার ভুলে অমনি ডুবে যায়।
দয়াল প্রসন্ন সাঁই দয়া করে
হাত ধরে তোলে তখন ॥

বলেছি, স্বরূপ অর্থ আত্মরূপ। এই আত্মরূপের সন্ধানই বাউলসাধনা। 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ রব্বাহু' মূলত এই একই কথার প্রতিধ্বনি। মনসুর হাল্লাজ নিজেকে চিনেছিলেন বলেই 'আনাল হক' বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। বাউলের মনের মানুষ, অচিন পাখির সন্ধান এই আত্মসন্ধানেরই নামান্তর। লালন বলেন :

ও যার আপন খবর আপনার হয় না
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখনা ।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না ॥
আত্মরূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা ॥
দেব-দেবান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা ॥

আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ লওনা।
ফকির লালন বলে মনের ঘোরে
হলাম চোখ থাকতে কানা ॥

ত্রিবেণী

স্ত্রীজননাঙ্গকে সাধনভাষায় ত্রিবেণী বলা হয়। এই স্ত্রীজননাঙ্গে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্না নাড়ি মিলিত হয়েছে। তন্ত্রসাধনায় এই তিনটি নাড়িকে গঙ্গা, যমুনা বা সরস্বতী অথবা পদ্মা, যমুনা, ভাগীরথী নদী নামে অভিহিত করা হয় এবং তাদের মিলনকে ত্রিবেণীর সংগম—বাউলদের ভাষায় তিরপিনি বলা হয়। প্রতি মাস অন্তে নারী বা প্রকৃতির যে মাসিক বা ঋতুস্রাব হয় তাকে বাউলেরা ত্রিবেণীর ত্রিধারা রূপে কল্পনা করেছে। অর্থাৎ একধারা প্রস্রাব, দুই ঋতুস্রাব এবং তিন স্ত্রীরতি—যার মাধ্যমে এবং পুরুষবীর্য মিলনে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়। বাউলেরা এই তিন ধারাকে সাধারণী, সামঞ্জস্য ও সামর্থ্য রতি নামে উল্লেখ করেছে। এই ত্রিবেণী বা স্ত্রীজননাঙ্গকে বাউল 'আরশীনগর' হিসেবেও অভিহিত করেছে। 'আরশী' অর্থে আয়না। স্ত্রীজননাঙ্গে রতিক্রিয়া বলে যে রসের সৃষ্টি তা পানি-রূপ। পানিতে নিজের চেহারা যেমন দেখা যায় তেমনি রস-রতিরূপ পানিদ্বারা পিতামাতার চেহারার আদলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ত্রিবেণী সম্পর্কে বাউল বলে :

আছে সাত সমুদ্র তেরো নদী
ত্রিবেণীর তিন ধারা
কোন্ ধারার সুধারা রয়
করে সহজ মানুষ চলাফেরা ॥
কোন নদী বল শুনি
মিষ্ট টক নোনা পানি,
কোন্ নদীর পানি তিত জহরা
কোন্ নদী উজান চলে
কোন্ নদী বয় ভেটেলে
কোন্খানে দাঁড়ায়ে
রূপের মানুষকে যায় ধরা ॥
কামেল দরবেশগণে
সেই দরিয়ায় দেল-ঈমানে
বসে থাকে তারা।
বাহ্য কাজ ত্যজ্য করে
থাকে রূপ নেহার করে,

আহামরি বলব কারে
সহজে কি পূরা ॥
রসিক সুজন লোকে
ডুব মেরে চুপ করে থাকে
কাহারেও ধরা দেয় নাগো তারা
যখন নদীর হুসো ডাকে
তখন কিনারায় থাকে,
নঙ্গর করিয়ে রাখে
জাহাজ আর বজরা ॥
অধীন রূপের বাণী
হীরা কাঞ্চন মুক্তামণি
ছিল মোর এই ডিঙিখানি পুরা ॥
বাউল চাঁদের বাক্য
জন পাঁচ ছয় কুঠে মুটে
ভাগ করে নিল লুটে
আমার সঙ্গে ছিল যারা ॥

এই ত্রিবেণী সম্পর্কে অপর একজন বাউল বলেন :

বিষম সে ত্রিপানি নদী
ত্রিকোণ যন্ত্র পাতাল ভেদী
মধ্যে আছে মহাঔষধি।
ওঠে ঘুরনো জল, যদি না থাকে গুরু বল,
তবে খুলবে মণিকোঠা, বাধবে ল্যাঠা
সেখানে খুব খবরদার ॥
নদীর ভিতর তলায় গরল-সুধা
এক পাত্রেতে রহে সদা
সুধা খেলে যায় ভব ক্ষুধা
গরল পান করে প্রাণেতে মরে
ছুটে সেই উল্টো কল নেমেছে ঢল
শিখতে হবে আপ্ত সার ॥
ত্রিপানিতে তিনটি ধারা
নিধারাতে আছে ধরা
ঠিক রাখ নয়নের তারা।
পলকে প্রলয় হয়ে যাবি ক্ষয়
স্থূলে মূলে সকল ভুলে
করতে হবে হাহাকার ॥

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
যেতে হবে নিষ্কপটে
সাধু বাক্য ধরে এঁটে।
তিনদিন বারুনী
তাইতে স্নানশুনি
নইলে সে মহাযোগে অনুরাগে
কাম কুম্ভীর কি করবে তার ॥
রসিক ডুবুরী হলে
ডুব দিয়ে সেই গভীর জলে,
অনায়াসে রত্ন ধন তোলে।
গোঁসাই গোবিন কয়, কুবীর চাঁদের জয়,
ভেবে গোপাল মূর্খ, পায়রে দুঃখ
দিনে দেখে অন্ধকার ॥

ফুল

বাউল নারীর রজঃস্রাব শেষে প্রবহমান একটি বিশেষ ধারাকে ফুল বলে অভিহিত করেছে। এই ফুলেই সাঁই-এর অবস্থিতি। এই রজঃস্রাবকে বাউলেরা যেমন 'গরল' বলে চিহ্নিত করেছে, তেমনি এই ধারাতে সুধারও প্রকাশ ঘটে বলে মন্তব্য করেছে। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রজঃস্রাবকেই ফুল বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন কিন্তু তা সঠিক নয়। রজঃস্রাব বা মাসিক শেষে যে রস বা রতি নির্গত হয় তাকেই বাউল ফুল বলেছে। একে ডিম্বস্ফোটন প্রক্রিয়া বলে। এই সময় স্ত্রীরতি বা ডিম্বাণু ডিম্বনালী দিয়ে বেরিয়ে তা স্ত্রীজননাঙ্গে বীর্যের সঙ্গে মিলিত হলে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়। এই ডিম্বাণুকে 'ফুল' বলা হয়।

এই ফুল সম্পর্কে লালন বলেন :

এক অজান মানুষ ফিরেছে দেশে তারে চিনতে হয়
তারে চিনতে হয়, তারে মানতে হয় ॥
শরীয়তের বুনিয়াদে
পাবে না তা কোনোমতে,
জানা যাবে মারফতে
যদি মনের বিকায় যায় ॥
মূল ছাড়া এক আজগবি কুল
ফুটেছে সে ভবনদীর ফুল
চিরদিন এক রসিক বুলবুল
সে ফুলের মধু খায় ॥

শুনেছি এক মানুষের খবর
আলেফের জের মেমের জবর
লালন বলে হ'সনে ফাঁফর
মুরশিদ ধরলে জানা যায় ॥

নীর ও ক্ষীর

নীর সাধারণ অর্থে পানি। এই পানিই মূল বস্তু; বাউলসাধকের নিকট পানি অত্যন্ত পবিত্র। এই পানির মধ্যে সৃষ্টির বীজ নিহিত। এই পানিতে সাঁই-এর অবস্থিতি। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব শেষে যে ডিম্বাণু বা স্ত্রীরতি প্রকাশ পায় তা যেমন জলীয়পদার্থ, পুরুষের বীর্যও তেমনি জলীয় পদার্থ। একটি তরল, অপরটি ঘন। একটি নীর, অপরটি ক্ষীর। নীরের কারণেই ক্ষীর এবং এই নীর ও ক্ষীরের মিলনে জাগে প্রেম। নীর প্রকৃতি, ক্ষীর পুরুষ। প্রকৃতির পুরুষের উভয়ের মিলনে যে প্রেমের উৎপত্তি তাতেই সুধারস।

এই নীর ও ক্ষীর সম্পর্কে জনৈক বাউল বলেন :

ও যে স্বরূপ হরে, সে কি ছাড়িতে পারে।
ঐ যে প্রেমানন্দ সিন্ধু ডুবে থাকতে কিন্তু
সিঞ্চনে নাদ ইন্দুর বিন্দু ধরে ॥
যে বিন্দুতে হয় জগৎ উৎপত্তি,
প্রবর্ততে আত্মরসে সদা স্থিতি, কমলে বরিষণ,
সে যে যোগাযোগ আসে, মণি চন্দ্র খসে,
রূপের কমল ভাসে নীরে ক্ষীরে।
নীর হতে পায় ক্ষীর, ক্ষীর হতে পায় সুধা,
ক্ষীরে নীরে বিম্বু ঢাকা সদা
রয়েছে দেখ না।
আছে কমলে কমল অতিশয় বিরল,
নির্মল তার জল যত্নে নেয় হরে ॥
যাতে জন্ম ধর্ম কর্ম মাত্র হয়,
শক্তি সত্ত্ব বস্তু করয়ে উদয়,
বুঝে তাই দেখ তাই
হয়ে শক্তিতে আশক্তি সাধ রসরতি,
প্রকৃতি নিবৃত্তি পাবে একেবারে ॥
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে একতারে
অভিন্নতা চিত্তে রসে ডুবে রবে,
ভেদাভেদ তথায় নাই,
ধরে হৃদি কমলে কমল, স্বভাবে ভাব যুগল,

বিষয় বিষ্ন গরল
নাহি পান করে ॥
দুঃখে সুখ মানি সুখ আলাপনে, উভয়ে প্রেমে রত,
বিচ্ছেদ নাহি জানি
ভাবেতে মত্ত দুজনে,
তাদের নিত্য সুখ ধাম, কাম শূন্য কাম,
হাওরে যেতে স্বধাম বাঞ্ছা করে ॥

এখানে নীর ও ক্ষীর প্রতীকী অর্থে নারী-পুরুষের যৌনমিলনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নারীর রজঃ ও পুরুষের বীর্য উভয়ই পানি। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে প্রেমক্রীড়া বা নৈপুণ্যের মাধ্যম প্রেম গভীরতর হয়। এই নীর তখন ক্ষীরে রূপান্তরিত হয়। বাউলের কামনা তাই-ই।

রস

রস বলতে বাউল স্ত্রী ও পুরুষের রতি বা বীর্য এবং কখনও কখনও উভয়ের মূত্রকেও বুঝেছে। রস কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী রজঃ, পুরুষবীর্য এবং স্ত্রীবীর্য যা কামনা ও প্রেমের প্রতীকরূপেও বাউলগানে ব্যবহৃত হয়েছে। রস-রতির মাধ্যমে সৃষ্টি সংঘটিত হয়। এই রস-রতি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা থাকলে সৃষ্টিতে শান্তি আসে। দেহকে জানার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। বাউল এই জ্ঞানের অধিকারী হতে চায়। বাউল লালন বলেন :

ওরে আলোকের মানুষ আলোকে রয়
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়
রস রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মূল খণ্ড হয় ॥
লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলা করলেন প্রচার
জানলে আপনার জন্মের বিচার
সব জানা যায় ॥
আপনার জন্মলতা
জানগে তাহার মূলটি কোথা
লালন কয় শেষের কথা
হবে সাঁই এর পরিচয় ॥

অমাবস্যা

বাউলসাধনায় অমাবস্যা শব্দের একটি বিশেষ অর্থ এবং প্রয়োগ রয়েছে। এখানে অমাবস্যা অর্থ, স্ত্রী ঋতুবতী হওয়া বা মাসিককাল। বাউল 'মাসিক' বা স্ত্রী ঋতু পরীক্ষা করে তার সাধনার পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

১

অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে কোন শহরে।
প্রতিমাসে হলে উদয় দেখা যায় না তারে ॥
মাসে মাসে চন্দ্রের উদয়
অমাবস্যা মাস অন্তে হয়।
অমাবস্যা পূর্ণিমার নির্ণয়
জানতে হবে নেহার করে ॥
(লালন)

২

সে কথা কি কবার কথা, জানতে হয় ভাবাদেশে
অমাবস্যায় পূর্ণশশী পূর্ণিমাতে অমাবস্যে ॥
অমাবস্যায় পূর্ণিমার যোগ
আজব সম্ভব সম্ভোগ
জানলে খণ্ডে এ ভব রোগ
গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥
(লালন)

৩

ভেদ জেনে রস সাধলে পরে রসিক তারে বলে।
সাঁই গুপ্তবেশে গোপনে বসে
বিরাজ করে অমৃত রসে
অমাবশ্যার দ্বিতীয়াতে বর্ত কমলে হয় ॥

এই অমাবস্যাকে বাউলসাধক 'মহাযোগ' নামেও চিহ্নিত করেছে। স্ত্রীর ঋতুবতীকালই 'মহাযোগ'-এর সময়। একে বাউল কখনও 'অম্বুবাচি' বলেও অভিহিত করেছে। এই সময়কাল বাউলসাধনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ সময়েই 'মানুষ' বা সাঁই-এর আবির্ভাব ঘটে। অমাবস্যায় পূর্ণিমায় কোনো যোগ বলতে কিছু কিছু বাউল মাসিকের রক্তলালকে বুঝেছেন। তাদের মতে মাসিককালকে অমাবস্যা বলা হলেও তার আভা পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির মতো। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মাসিক শেষে ডিম্বস্ফোটন কালকে পূর্ণিমার যোগ বলা হয়ে থাকে।

মাস আন্তে মহাযোগ হয়
নিরস হতে রস ভেসে যায়।
(লালন)

দল

বাউলসাধনা তন্ত্র এবং যোগসাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, ফলে তাদের গানে এই সাধনার নানা সাংকেতিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মানবদেহকে যোগসাধনায় নানা দলে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন দ্বিদল, চতুর্দল, শতদল ইত্যাদি।

সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বিদলে
মেঘে যেমন বিদ্যুৎ খেলে।
দল নিরূপণ হয় যদি
জানা যায় সে রূপ-নিধি
মানুষের করণ হবে সিদ্ধি
সে রূপ দেখিলে ॥

মানুষের প্রেমের উৎপত্তিস্থল চোখ। চোখের দুই ভ্রুর মাঝখানে দ্বিদলের অবস্থান। চোখের ভাষায় একে অপরের মধ্যে প্রেম জাগে।

এছাড়া আরও যে সাংকেতিক শব্দ বাউলেরা ব্যবহার করেছে এসবই তাদের সাধনার ভাষা। একমাত্র দীক্ষিতজনই এই ভাষার অর্থ এবং প্রয়োগ জানে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হই যখন দেখি সাধনার ভাষা কী অপরূপভাবে সাহিত্যের ভাষা হয়ে আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। এখানেই বাউলগানের রচয়িতাদের সার্থকতা।

সংখ্যা প্রতীক

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাউলগানে যে রূপক বা উপমার প্রয়োগ দেখা যায় তা একদিকে লৌকিক বা দেহকেন্দ্রিক, অন্যদিকে তা অধ্যাত্মনির্দেশক। অনেক বাউলগানে সংখ্যার প্রাধান্য রয়েছে। এই সংখ্যাগুলি সাধনার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুই : বাউলগানে 'দুই'-এর ব্যবহার সাধনার একটি বিশেষ সময় নির্দেশক। দ্বিতীয়াতে চন্দ্র উদয়। এই দ্বিতীয়া সাঁই-এর আগমনকাল নির্দেশ করে :

প্রথমে গুণেরী মানুষ
ভক্তি করে রাখ ধরে হুঁশ,
দ্বিতীয়াতে হোসনে বেহুঁশ
নির্বিকারে তাঁকে স্মর ॥
পূর্ণ ঈশ্বর উদয় তিনে

নিষ্কাম যাজন সেইদিনে
নিরিখ দিয়ে সেইখানে
জোয়ারেতে সন্ধান কর ॥

এখানে 'পূর্ণ ঈশ্বর উদয় তিনে'-এর অর্থ ঋতুস্রাব বা মাসিকের শেষে চন্দ্রের উদয়। চন্দ্র বা পূর্ণ ঈশ্বর অর্থে সাঁইকে বুঝানো হয়েছে। ঋতুস্রাবের সময়কালকে বাউলদের ভাষায় অমাবস্যা বলা হয়। ঋতুস্রাব ভালো হওয়ার আগের দিনকে বলা হয় প্রতিপদ এবং ঋতুস্রাব যেদিন মোটেই থাকে না সেই দিনকে বলা হয় দ্বিতীয়া। এই দিনে স্ত্রীরতি বা ডিম্বাণুর প্রকাশ ঘটে।

লালন একটি গানে বলেন :

অকৈতব সে ভেদের কথা
কইতে মর্মে লাগে ব্যথা
আবার না কহিলে জীবের নাহিক কো নিস্তার
কই সেজন্যে ॥
অমাবস্যা প্রতিপদ
দ্বিতীয়ার প্রথমে সে তো
অধীন লালন বলে
করে আগমন সেই যোগের দিনে ॥

এই দ্বিতীয়াতে সাঁই-এর আগমন ঘটে। এই সাঁই পরমার্থ। তিনি স্বর্গ বা বেহেস্তের ভগবান বা আল্লাহ নন। তিনি বাউলদের মনের মানুষ, অধর মানুষ। 'দুই' বলতে যুগল সাধনাও বুঝায় অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির সাধনা।

তিন : তিন সংখ্যাটির বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায় বাউলগানে। এই তিন কখনও ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না; কখনও প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব এবং গুরুতত্ত্ব; কখনও আহাদ অর্থাৎ আলিফ, হে, দাল এই তিন বর্ণ, অথবা আলিফ, লাম, মিম; কখনও গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই তিনটি নদীরূপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনের সমাহার ত্রিবেণী আর এই ত্রিবেণী অর্থ স্ত্রীজননাঙ্গ। তিন অর্থে, আল্লাহ, আদম, মুহাম্মদও বুঝানো হয়েছে। আবার রস বলতে গরল, শম্ভু এবং অমৃত রসও বুঝায়। একে সাধারণী, সামঞ্জস্য এবং সামর্থ্যও বলা হয়। তিন বলতে অমাবস্যা, প্রতিপদ এবং দ্বিতীয়াও ধরা যেতে পারে। তিন অর্থে কারুণ্য, তারুণ্য এবং লাবণ্যরসও বুঝায় এবং তিন বলতে, বায়ু, ফক, পিত্ত এবং সর্বোপরি এই তিন স্ত্রীরতি বা ডিম্বাণু হিসেবে স্ত্রীজননাঙ্গে অবস্থানের তিনদিন। এই তিনদিনের পরে বা শেষে স্ত্রীরতি আর সন্তান জন্মদানের জন্য সক্রিয় থাকে না। বাউলেরা স্ত্রীরতি বা ডিম্বের অবস্থান নিরূপণ করেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে থাকে।

এই 'তিন' সম্পর্কে লালন বলেন :

তিনদিনের তিন মর্ম জেনে
রসিক সাধনে ধরে তা একই দিনে।
তিন শো ষাট রসের মাঝার
তিন রস গণ্য হয় সাধিকার
এবার সাধনে সে করণ
এড়াবে শমন
এই ভুবনে ॥

চার : 'চার' বলতে, বাউলগানে চারিচন্দ্রের অর্থাৎ মল, মূত্র, রজঃ, শুক্র উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো সময় 'চার' বলতে চার ইমাম বা খলিফা বুঝানো হয়েছে। আবার কখনও কখনও বাউলেরা চার অর্থে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফত এবং অন্যদিকে হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান এবং হজরত আলীকে বুঝেছে। আবার চার বলতে মানবদেহের চার উপাদানও বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আব, আতস, খাক, বাত; আগুন, পানি, হাওয়া মাটি। সাধনার ভাষায় লাল, জরদ, ছিয়া, ছফেদ। কখনও কখনও চার অর্থে চার বেদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আবার চার মোকাম অর্থে আলম-ই-লাহুত, আলম-ই-জবরুত, আলম-ই-মলকুত এবং আলম-ই-নাছুত বুঝানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আলম-ই-হাজতকে ধরা হয়নি এবং কখনও 'চার' অর্থে আহমদ বুঝানো হয়েছে। আহমদ, হজরত মুহাম্মদ (দ.)-এর অপর নাম।

পাঁচ : পঞ্চতত্ত্ব–শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য; পঞ্চবান–চুম্বন, মর্দন, শোষণ, স্তম্ভন ও সম্মোহন। পঞ্চভূত–ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পঞ্চরস–রজঃ, বীর্য, স্ত্রীরতি, প্রস্রাব এবং স্তন্যদুধ। বাউলেরা একে পাঁচ পেয়ালাও বলেছে।

ছয় : ছয় সংখ্যায় ষড়রিপু বুঝানো হয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। অনেক সময় ষটচক্রের কথাও বাউলগানে উল্লেখ দেখা যায়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ি, মধ্যবর্তী দ্বিদল এবং চতুর্দল; পদ্মাকার ছয়টি চক্র।

আট : আটকুঠুরি অর্থাৎ এই মানবদেহ আটকোঠা বিশিষ্ট। দ্র. 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' (লালন)

নয় : 'নয়' শব্দটি বাউলগানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেহের মধ্যে নয়টি দরজা, যথা নাক (২) মুখ, (১) পায়ু, (১) চোখ, (২) কান, (২) উপস্থ (১)

এই নয় আর একটি অর্থে জন্মনিয়ন্ত্রণ নির্দেশক। উপর্যুক্ত নয়টি দরজা বন্ধ করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মিলন সাধন। একে বাউলেরা বিন্দুসাধনা নামে অভিহিত করেছে।

নয় সাত পাঁচ অক্ষর শুধু তিন তার ভিতর
তিনে তিনে ভাবলে দেহ হয় রূপান্তর,
তখন রস চিনবি, রসিক হবি
করবি রসের আস্বাদন ॥
তিনে তিন গুণেতে নয়, তিন ছাড়তে হয়,
যে থাকে তাহাতে ডুবায় হয়ে রসাশ্রয়,
এ রস কে জানে রায় রামানন্দ বিনে
স্মরণ কর তাঁর চরণ ॥

চৌষট্টি রস রাগের কারণ
চব্বিশ ভেঙে নয়তে মিলন
সপ্তম ভেঙে পঞ্চম সাধন
তিন রস নিরূপণ ॥

দশ : দশ সংখ্যার চারটি—আব, আতস, খাক, বাত। অবশিষ্ট ছয় : নফস, কাল্‌ব, রূহ, শির, খাফী, আখফা। এ ছাড়াও বাউলগানে 'দশম দুয়ারী' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এই দশদুয়ারীকে কখনও স্ত্রীজননাঙ্গ বীর্যনালী বা জরায়ুমুখ বলা হয়।

ষোলো : ষোলো অর্থে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয়টি রিপু।

জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি–চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।

কর্মেন্দ্রিয় : বাক, পানি, গাদ, পায়ু, উপস্থ।

আঠারো : আঠারো অর্থে মানুষের শরীর আঠারোটি উপাদানে গঠিত। পুরুষ ও রমণী প্রত্যেকের চারটি করে আটটি।

পুরুষ চার : মণি, রগ, হাড় ও মগজ।
রমণী চার : রক্ত, চর্ম, মাংস, লোম।
অবশিষ্ট দশ : আল্লাহর। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।

এ ব্যতিরেকে বাউলগানে আরও কিছু সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন 'নুক্তা'। বাউল সাধনায় 'নুক্তা' শব্দের বিশেষ অর্থ আছে। নুক্তা অর্থে শুক্র বা বীর্য। একটি গানে আছে :

আলিফ হয় আল্লাহ হাদী
মিমে নূর মুহম্মদী
লামের মানে কেউ করলে না
নুক্তা বুঝি হল চুরি।

এখানে লাম অর্থে আল্লাহ ও মুহাম্মদ (দ.)-এর মধ্যে দৌত্যকার্যে রত জিব্রাইল (আ.)-কে বুঝালেও বাউলসাধনায় এই 'লাম' অর্থে সাধনসঙ্গিনী বা স্ত্রীকেও বুঝানো হয়েছে।

লালন নুক্তাকে নূররূপেও চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন :

নূরের মানে হয় কুরআনে
নূরবস্তু সে নিরাকার প্রমাণে
কেমন করে নূর চুঁয়ায়ে হয় সংসার ॥

নুক্তার সাধারণ অর্থ বিন্দু। এই বিন্দুর স্বরূপ সঠিকভাবে নিরূপণ করাই বাউল সাধনার লক্ষ্য। এই বিন্দুই পুরুষের বীর্য। এই বীর্যকে বাউল 'নূর' বলে উল্লেখ করেছে। এই নূর চুঁইয়েই জগৎসংসার অর্থাৎ সৃষ্টি।

বাউল বিশ্বাস করে শুক্র বা বীজরূপী সাঁই মানুষের মধ্যে অবস্থান করে। এই বীর্জকে সহজিয়া সাধনায় বিন্দু নামে চিহ্নিত করা হয়। শুক্রই সকল সৃষ্টির মূল। এর যথেচ্ছ ব্যবহার বাউলসাধনায় নিষিদ্ধ। শুক্র বা বীজের যথাযথ সংরক্ষণকে বাউল আমানতদারী বলে থাকে। বাউলেরা বিভিন্ন আরবি হরফে তাদের সাধনার বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান প্রতীকী ভাষায় ব্যক্ত করেছে, সাধারণের মধ্যে তাদের এই সাধনাকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে। বাউল তার সাধনা সম্পর্কে যা বলতে চায় তা কেবল একজন দীক্ষিতই অনুধাবন করতে পারে, অন্যেরা নয়। এটা রহস্যপ্রিয়তা হলেও এর মধ্যে একটি সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রবণতাও আমরা লক্ষ করি। বাউলেরা আরবি হরফ আলিফ, লাম এবং মিম তাদের সাধনার তিনটি সাংকেতিক ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছে। ইতঃপূর্বেই বলেছি, বাউলের সাধনা দেহবাদী সাধনা এবং তা সৃষ্টিকৌশলের সঙ্গে একীভূত। প্রত্যেক সৃষ্টির মূলে পুরুষ এবং প্রকৃতির অবদান রয়েছে। এই দুয়ের মিলনে জগৎ সৃষ্টিশীল হয়। আরবি হরফ 'লাম' যাকে বাউলের সাধন ভাষায় 'বাঁকা নাল বা বাঁকা নদী' বলা হয়, তা এই সৃষ্টির মূল। এই 'বাঁকা নদী' স্ত্রীজননাঙ্গের প্রতীক। এখানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ির অবস্থিতি।

খেলছে মানুষ বাঁকা নলে
পঞ্চভূত বড়ই মজবুত
ঘিরে আছে দশম দলে ॥
(গোঁসাই গোবিন)

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
যেতে হবে নিষ্কপটে
সাধু বাক্য ধরে এঁটে।
(গোঁসাই গোবিন)

এই বাঁকা নদীতে 'নুক্তা' বা বিন্দু চুরি হওয়ার ব্যাপারে বাউলসাধক সজাগ থাকার কথা বলেছে। এখানে বাউল রতিনিরোধ সাধনার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছে। এমনিভাবে বিভিন্ন গানে বাউল আরবি এবং বাংলা ভাষা থেকে সাংকেতিক শব্দ চয়ন করে তার গান হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে লালন ফকিরে একটি গানের উল্লেখ করা চলে :

বাড়ির কাছে আরশীনগর
সেথা এক পড়শী বসত করে ॥

এখানে 'আরশীনগর' স্ত্রীজননাঙ্গের প্রতীক। 'পড়শী' অর্থে বাউলের সাঁই, যার অবস্থান স্ত্রীজননাঙ্গে। এই যৌনাচারগুলি বাউল অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রতীকের মাধ্যমে ঢেকে রেখে তাকে শিল্পসুষমামণ্ডিত করে তুলেছে।

বাউলেরা সাধারণের মধ্যে তাদের এই সাধনাকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আরবি হরফকে তাদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহার করেছেন।

বাউলগানে বিম্বিত সমাজ ও সমাজতত্ত্ব

বাংলাদেশের বাউলসমাজ এদেশের একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয়গোষ্ঠী। গান তাদের সাধনার প্রধান মাধ্যম হওয়ায় দেহবাদের বিচারে এই গানে বাঙালি সমাজজীবনের নানা সুখ-দুঃখের পরিচয়ও প্রতীকী উপমায় প্রতিফলিত হয়েছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের সাহিত্যে[১০৮] এই ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া গেলেও সেসময়ে রচিত তাদের কোনো সাহিত্য বা গান এযাবৎকাল পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে বাউলগানের সঙ্গে চর্যাপদের[১০৯] ভাবনারাশির বেশকিছু মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও কবীরের[১১০] দোহাকোষের সঙ্গে বাউলগানের মিল দেখতে পাওয়া যায়। বাউলদের 'মনের মানুষ' সুফি কবীর 'মাশুক' বা *Lord of the Soul*-এর সমগোত্রীয়[১১১]। কিন্তু কবীরের গানে অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটতে দেখি, বাউলের গানেও তার সফল[১১২] অভিব্যক্তি দেখে আমরা উচ্চকিত হই।

বিভিন্ন বাউলগানে যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের চিত্র আমরা দেখতে পাই, তা এই বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদেরই প্রভাবের ফসল। বৈদিক এবং হিন্দু আমলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়রূপে রাজন এবং বাণিজ্যে বৈশ্যদের শোষণ এবং নির্যাতন সমাজের নিম্নস্তরে দাসরূপে চিহ্নিত শূদ্র বাঙালিদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল। সে সময়ের অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রয়োগ ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সঙ্গে শূদ্রদের একটি চিরকালের ব্যবধান গড়ে তোলা হয়েছে।

সুলতানী এবং মোগল আমলে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে হিন্দু বর্ণবৈষম্যের পাশাপাশি মুসলিম সামাজিক ভেদবিন্যাসে—আশরাফ-আতরাফ এবং আজলাফ সৃষ্টি কৌশলে[১১৩]। মুসলিম জাতিতত্ত্বের বিধানে যার পরিচয় নেই, এ দেশীয় উচ্চকোটির সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে তা সৃষ্টি করে নেওয়া হয়েছে দলন নীতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্য। ফলে শূদ্র নামে চিহ্নিত গোষ্ঠী এবং আতরাফ-আজলফ এক এবং অভিন্ন হয়ে পড়েছে। চর্যাপদ এবং কবীরের দোহাকোষে এই শোষণের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ আমলে এই শোষণের ভিন্নমাত্রা যোগ হলো সামাজিক স্তরবিন্যাসের নতুন ক্রিয়াকৌশলের মাধ্যমে। একদিকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ-বিভেদের জাল বুনে হিন্দুদের একটি বিশেষ শ্রেণীর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলো অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের শোষণনীতির হাতিয়ার হিসেবে, অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে কৌশলে ধর্মান্ধতার বীজ বপন করে শিক্ষাদীক্ষায় হিন্দুদের থেকে পশ্চাৎপদ রেখে শূদ্রদের সঙ্গে একীভূত করার প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল। তবে এর মধ্যে এদেশীয় সেনাবাহিনী ১৮৫৭ সালে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং তাদের এই সংগ্রামকে সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। এই সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ মুসলমান থাকায় এ দেশের মুসলমানেরা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।[১১৪]

ইংরেজরা ক্ষমতালাভের পর থেকেই নানাভাবে এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নানা খাজনা, ভূমিকর ইত্যাদি আরোপ করতে থাকে এবং কৃষকদের পক্ষে তা পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না; ফলে তারা জমিহীন হয়ে পড়ে।[১১৫] এর পরে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার মানুষ অভাব-অনটনে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। ইতোমধ্যে ইজারাদারদের অবর্ণনীয় পীড়ন নির্যাতনে এদেশের কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এ সময়ে লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী ব্যবস্থা[১১৬] প্রবর্তন করে তাদের মদদপুষ্ট একশ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি করে। এই জমিদারগণই সব জমির মালিকানা লাভ করে এবং তাদের মাধ্যমেই ইংরেজরা তাদের লুণ্ঠনপ্রক্রিয়া অবাধে চালাতে থাকে। ফলে দেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এদেশীয় জমিদারদের নানা অত্যাচারের কাহিনী আমাদের লোকসাহিত্য এবং সংগীতে উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বাউলগানেও এসব অত্যাচারের বিবরণ দেহবাদের আড়ালে বিবৃত হয়েছে। যেমন পাঞ্জু শাহের একটি গান :

এক পশ্চিমে বাবাজি এলো
চৌষট্টি রোগ সারাইলো
বেজো নারীর ছেলে হল
শুনে গুরু হত হল
খড় ধরিয়ে তুড়ি দিয়ে ভাই
হাত ঘুরিয়ে বাবাজি কয়
আগুন জ্বলে যায়।

এই গানে পশ্চিমা তথা ব্রিটিশজাতিকে নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এমনি একটি গানে লালন ফকির সে সময়ের সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন :

জমির জরিপ একদিনেতে সারা
আপার পাগার আছে তোমার
ঠিকেতে ঠিক করা ॥

লালনের গানে পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতির নানা প্রভাবের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। দেহবাদের ব্যাখ্যায় এসব গান ব্যবহৃত হলেও তৎকালীন সমাজজীবনের একটি ছবিও প্রত্যক্ষ করা যায় তার গানে।

কী এক আজব কল বটে
কী ইশারায় কল টিপে দেয়
অমনি ছবি ধায়ে ওঠে।
দেখ সে অগ্নিজল হতে
সে কল পাতা ভিতরেতে
ধড়ফড় করে চলছে
বনদাড়ায় হেঁটে।

এখানে ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা কিংবা সিনেমা বা বায়স্কোপ ইত্যাদি পাশ্চাত্য প্রসংগ দেহবাদের পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে। লালন ফকির প্রথম মহাযুদ্ধের বিবরণও দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে :

ধু ধু শব্দে ধূমা ওঠে
বুমা কল ফেটে
একজনা তার হাতনে ফোঁকে
তার জায়গায় বারপিঠে ॥

এ প্রসঙ্গে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংসের জন্য ইংরেজদের নানা ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। নীলচাষ ছিল এ ধরনের একটি বড় ষড়যন্ত্র। ইংরেজদের বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য প্রয়োজন ছিল নীলচাষের। কৃষিজমিকে তারা নীলচাষে ব্যবহার করেছিল এবং এদেশের কৃষকদের শোষণ করেই তারা এই অর্থকরী ফসল ঘরে নিয়ে যায়। কিন্তু নীলকর শাসকদের অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে নীল বিদ্রোহী[১১৭] শুরু হয় এবং নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এতে এ দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। ইংরেজ শাসকশ্রেণী এদেশের মানুষের মধ্য থেকে তাঁবেদার ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ও গড়ে তোলে এবং তাদের মাধ্যমে জমিদার এবং মহাজনী কারবারগুলো ফেঁপে ওঠে। ঋণদানের সুযোগে এদেশীয় মহজনেরা সাধারণ মানুষদেরকে নির্মমভাবে শোষণ করেছে। দেনার দায়ে কৃষককে জমি হারাতে হয়েছে, হতে হয়েছে ভাগচাষি অথবা বিপন্ন মানুষ। এসব চিত্র বাউলসাধকদের গানে লক্ষ করা যায়। যেমন :

এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা
বাকির দায়ে যাবি যমালয়ে
হবে রে কপালে দায়মাল ছাপা।
(লালন)

আর একটি গান :

বাকির কাগজ গেল হুজুরে
কোনদিন যেন আসবে শমন
সুখের অন্তঃপুরে
যখন ভিটেয় হও বসতি
দিয়েছিলে খোশ কবলতি
... ...
এখন দেখি ভুলেছ তারে ॥
(লালন)

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বাউলসাধকেরা প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক সমস্যার বিষয়গুলি না বলতে চাইলেও দেহসাধনার স্বার্থে তার আবির্ভাব স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে এবং তার মধ্য থেকেই সেদিনকার সমাজচিত্রের একটি বিবরণ খুব সহজেই জানা যায়। যেমন :

এক রাজ্যে হলো দুইজন রাজা
কার হুকুমে গত হয় প্রজা
লালন বলে তেমনি গোলে
খাতায় পোলো বাকি।

এই দুই রাজার একজন ইংরেজ, অন্যজন দেশীয় জমিদার এবং মহাজন সম্প্রদায়।

বাউলগানের বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে তৎকালীন সমাজজীবনের চালচিত্র ধরা পড়ে। আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কাছারি দেওয়ানি, খোসকবলি, শমন, নিলাম ইত্যাদি এবং নানা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয়লিপি এসব গানে লক্ষ করা গেলেও এদেশের সমাজ যে কৃষিভিত্তিক ছিল এবং কৃষির মাধ্যমেই যে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়েছে, এ বিষয়টিও বাউলের দৃষ্টি এড়ায়নি।

এই সে বঙ্গের ঘর রে মনা
এই সে রঙ্গের ঘর।
কোম্পানিতে নিলাম হবে
দেনা হয়েছে বহু তোর ॥
(কালুশা ফকির)

ইংরেজ এবং ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বক্ষেত্রে যে তাদের স্বার্থকেই দেখেছে এবং এদেশের সম্পদ লুট করে নিয়েছে, তার পরিচয় যেমন আমরা পাই এইসব গানে; তেমনি তারা যে এদেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য আসেনি, তারও অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত গানে :

রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরেরও শিরোমণি
নালিশ করব আমি
কার নিকটে ॥
(লালন)

বাউল লালন ফকিরের জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে এবং মৃত্যু ঊনবিংশ শতকের শেষে (১৮৯০ ইং)। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলোতে সাধারণ মানুষ স্বাধীনতাহীনতায় কীভাবে দিন কাটিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন, কীভাবে ইংরেজরা এদেশের মানুষদের দ্বারাই এদেশের মানুষকে শোষণ করেছে জমিদারি প্রথার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে (১৭৯৩ ইং)। জমিদারেরা তালুকের মালিক হয়ে তালুকদার নামে সমাজে ক্ষমতাধর হয়ে উঠলেন। অবশ্য তাদের সর্বশক্তির উৎস ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী। এদের মাধ্যমে জমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ১১৭৬-এর মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস তার জীবৎকালে ঘটে গেছে।

এই সময়কালে ইংরেজদের মতো ফরাসি এবং অন্য বণিকেরাও এদেশে এসেছে শোষণের উদ্দেশ্যে। এদেশকে তারা ভেবেছে স্বর্ণপ্রসবিণী। এরই মধ্যে লালন প্রত্যক্ষ করেছেন প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ যাকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) নামে চিহ্নিত করেছে। প্রত্যক্ষ করেছেন নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কৃষক এবং ফকির বিদ্রোহী[১১৮]। দেখেছেন ইংরেজদের অত্যাচারে মানুষ কীভাবে দেশান্তরি হয়েছে। তাঁর নিজের সংসারও ভেঙে গেছে এরই মধ্যে এবং তার কারণে অধ্যাত্মসাধনার আড়ালে তাঁর মনের দুঃখ অকপটে প্রকাশ করেছেন তিনি :

এই দেশেতে এই সুখ হল
আবার কোথায় যাই না জানি
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা
জনম গেল সেঁচতে পানি ॥

উপর্যুক্ত গানে তাঁর একাধিক দুঃখকেই তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রত্যক্ষ লড়াই তিনি না করলেও দেহবাদী গান রচনার মাধ্যমে উপমা প্রতীকের সাহায্যে তিনি তাঁর প্রতিবাদী চেতনাকে প্রকাশ করেছেন। শুধু যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষই লালন ফকির বা বাউলদের পীড়িত করেছে তা নয়; জাতীয় জীবনে নানা অর্থনৈতিক

বিপর্যয়ে জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারের কাহিনীও লিপিবদ্ধ আছে বাউলদের গানে। পাঞ্জু শাহ রচিত এমনি একটি গানে বলা হয়েছে :

কী রূপে ছেলেপুলে মানুষ করি ॥
তেরোশো সাল চারি, ধান চালে আককারা ভারি ॥
... ...
মহাজনের হলোরে ত্যাল
দেখিয়ে ভারি আকাম
সোনা রূপা পোছে না আর
এক টাকায় লয় দশ ভরি ॥

মধ্যস্বত্বভোগী এই মহাজন এবং উচ্চবিত্তের মানুষেরা নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীনদের শোষণ করে সমাজে ফুলেফেঁপে ওঠে। বাউল ফকিরদের গানে তাদের এই অনাচার এবং অত্যাচার সতর্কধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। লালন তাঁর গানে এ সম্পর্কে বলেন :

১

ফড়িয়া মহাজন যে জন
তার বাটখারাতে কম
তারে কসুর করবে যম ॥

২

ভেঙেছ সরকারি তহবিল
সাক্ষীও আছে কাতেবীন
হুজুরে হয়ে হাজির
বলতে হবে সত্য বুলি ॥

বাউলদের এমন বহু গানে সামাজিক অত্যাচার এবং অনাচারের কাহিনী বিধৃত। এসব গানের মাধ্যমে সমকালীন সমাজচিত্র পাওয়া যায়। বাউলগান মূলত ফোকলোর বা লোকঐতিহ্যের অংশ। 'ফোকলোর' বলতে সাধারণ মানুষের যে অভিজ্ঞতা বোঝায় এসব গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এদেরকে অশিক্ষিত এবং অজ্ঞানতায় নিমগ্ন কোনো সমাজ নামে অভিহিত করা তাই সংগত নয়। বরং এসব গানের মধ্যে তৎকালীন সমাজের যে চালচিত্র ফুটে উঠেছে একজন সমাজবিজ্ঞানী সমাজতত্ত্বের উপাদান হিসেবে তা বিবেচনা করতে পারেন। যুগে যুগে যে শ্রেণীসংগ্রাম ছিল এবং *Survival of the fittest* এর নামে এক জাতি যে অন্য জাতিকে প্রদমিত করেছে, তার একটি করুণ ইতিহাসও রয়েছে এসব গানে। এখানে বলা প্রয়োজন যে সমাজের কোনো অন্যায়-অত্যাচার লোকচক্ষের অগোচরে থাকেনি। লোকসাহিত্যিক এবং লোকসংগীত রচয়িতারা এসব সামাজিক

অন্যায়-অবিচারকে তাদের সাহিত্যে এবং গানে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে K. Blaukoupf সংগীতের মাধ্যমে সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণে বলেন :

> A collection of all those social facts which are relevant to the practice of music, the arrangement of those facts according to their importance for the practice of music and the recognition of those facts which determine alterations in the practice of music.[১১৯]

এ সম্পর্কে Alphons Silberomann বলেন :

> Given that music an aspect of human and social life, then the sociology of music is the science which attempts to understand this aspect from within and from without to consider it both in itself and in relalion to other aspects, in its practical and its symbolic functions, as it occurs individually or in numbers, as cause or a effect. [১২০]

বাউলগানে বিধৃত সমাজজীবনের চালচিত্র এবং তা থেকে সমাজতত্ত্বের উপাদান অনুসন্ধান করা একজন সমাজবিজ্ঞানী অথবা লোকবিজ্ঞানীর দায়িত্ব। এক্ষেত্রে বাউলগান নিঃসন্দেহে অতীত ও বর্তমান সমাজকাঠামোর একটি পরিচয়সূত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ : "No sociology can be realistic unless it is historical just as no historical research can be scientific and realistic unless it is socialogical."[১২১]

এমনিভাবে সমাজজীবনের নানা ভালোমন্দ দিক বা ঘটনা লোকসংগীত রচয়িতা বা লোকসংগীত শিল্পীর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাউলগান পর্যন্ত বাঙালি জীবনের যে কদর্য দিকটি আজো মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে তা তার বর্ণবাদ বা জাতিভেদ প্রথা। অদ্যাবধি আমাদের সমাজজীবনে জাতিভেদ প্রথা দুষ্টক্ষতের মতো বেড়ে উঠেছে। জাতিভেদ প্রথা জন্মলগ্নে কর্মবিভাজনের সুবিধার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজপতিরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যসমাজ জাতিভেদ প্রথাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের স্বার্থকেও এই প্রথার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছে। এরই মধ্যে মুসলিম রাজন্যবর্গের আবির্ভাবে জাতিভেদ প্রথা মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে, অথচ ইসলামে জাতিভেদ প্রথা নির্মূল করার কথা বলা হয়েছে।

জাতিভেদ প্রথার কারণে মানুষে মানুষে শুধু বিভেদই সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, এই প্রথায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, সুফিসাধনার প্রবর্তন একটি রাজনৈতিক এবং

সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ফসল। ইতঃপূর্বে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে বাউলসাধনা, যা সুফিসাধনার বাতেনী শাখার অনুসারী, তার মধ্যেও এই প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। ভারত এবং বাংলাদেশে জাতিভেদের প্রভাবে নিষ্পেষিত বৌদ্ধসমাজের অধিকাংশই বলা চলে সুফিপ্রবর্তিত ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়ে এবং তাদের একটি অংশ সমাজে বাউল হিসেবে পরিগণিত হয়। অবশ্য যৌনাচার এবং আনুষঙ্গিক নানা কদাচার প্রথার কারণে সমাজে তারা তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' এবং মালাধর বসুকৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে বাউলদের আচার-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজে যারা সর্বাধিক নিগৃহীত হয়েছে; তাদের মধ্যে বাউলেরা নিঃসন্দেহে অন্যতম।

সামাজিক স্তরবিন্যাসে এদের স্থান ছিল সর্বনিম্ন। এদের সঙ্গে অন্যদের পানাহার, বিবাহ ইত্যাদি এমনকি সংমিশ্রণও পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হতো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে বাউলসাধনায় নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষ যেমন অংশ নিয়েছে; তেমনি সমাজে যারা নিগৃহীত, লাঞ্ছিত বিশেষ করে পরিত্যক্তা, বিধবা, কুলটা মহিলারাও আশ্রয় পেয়েছে। গ্রামীণ সমাজে বাউলেরা 'নাড়ার ফকির' হিসেবেও অভিহিত হয়ে থাকে। 'নাড়া' অর্থে সন্তানহীন এবং সংসারবিহীন বোঝায়। এদের মধ্যে বিবাহের তেমন রেওয়াজ নেই, কণ্ঠিবদল আছে এবং নারী-পুরুষ উভয়েই তা বহুবার করে থাকে—তাতে আপত্তি ওঠে না। সাধারণ গ্রামবাসী এদের গান শুনে তৃপ্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ড—যেমন বিবাহ ইত্যাদি এসবে সংশ্রব এড়িয়ে গেছে। ইদানীংকালে সরকারি পৃষ্ঠপোষতা এবং রবীন্দ্রনাথসহ নানা সাহিত্যিকের কারণে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছে। তথাপি আজো বাউলসমাজ একটি স্বতন্ত্র সমাজ হিসেবেই পরিগণিত এবং তাদের সব আচার-অনুষ্ঠান নিজেদের মধ্যেই সংঘটিত হয়। গোঁড়া মুসলমানেরা এসব বাউলদেরকে মুসলিম সমাজভুক্ত করেনি। এদেরকে সমাজে 'অপাঙ্‌ক্তেয়' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং নানাভাবে তাদেরকে নিগৃহীত করা হয়েছে। গোঁড়া হিন্দুসমাজেও বাউলদেরকে 'অস্পৃশ্য' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। গোঁড়া মুসলমানদের এমন আচরণ সম্পর্কে দুদ্দু শাহ তাঁর গানে কটাক্ষ করেছেন। যেমন :

১

জাতি বুদ্ধি হিংসা অভিমান
এই দোষেতে বঙ্গের মুসলমান
মরে রে আজ হয়ে পেরেশান ॥

২

সৈয়দ কাজী দেখিরে ভাই
যেমন বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণ সবাই ॥

ব্রাহ্মণের দেখা দেখি
কাজী খোন্‌কার পদবী রাখি
শরীফি ফওলায় ফাঁকি দিয়ে সর্বদাই ॥

৩

সহস্র বৎসর পূর্বে ভাই
মুসলমানদের গন্ধ দেখিনাই।
যত অনার্য শূদ্র ওরাই,
ধর্ম ভারতে হয় রে ॥
তারাই সৈয়দ খোন্‌কার
বলিয়া ফওলায় এবার
দুঃখে মরিবে বারবার
দশা এদের হয় রে ॥

জাতিভেদের বিরুদ্ধে দুদ্দু শাহ তাঁর গানে বিশেষভাবে প্রতিবাদমুখর ছিলেন। প্রায় সব বাউলগানেই জাতিভেদ বিষয়টি তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে।

লালন ফকির তাঁর একটি গানে বলেন :

সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কী হয় বিধান
বামন চিনি পৈতায় প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে ॥

বাউলেরা বুঝেছিলেন যে জাতিভেদের কারণে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে গোটা বাঙালি জীবনে নেমে এসেছে অমানিশার কালো ছায়া। এই প্রসঙ্গে দুদ্দু শাহ বলেন :

জাতাজাতি সৃষ্টি করে ভারতকে শশ্মানে দিলে
যত সব কায়েত বামন অবশেষে এই বুঝিলে ॥
... ...
সাজিয়া জাতের বেড়া
দেবতারে করলে দেশ ছাড়া
মানুষ ছাড়িয়া নোড়া সবাই পূজিলে ॥

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টির মূলে যে ব্রাহ্মণসমাজ; আমাদের সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাগীতিকা, কবীরের দোহাকোষ এবং বাউলগানে তাদের সম্বন্ধে নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং কটাক্ষপাত করা হয়েছে। নিম্নের বাউলগানে ব্রাহ্মণদের প্রতি দুদ্দু শাহের বিদ্রূপ :

বলিহারি এক জাত এই ব্রাহ্মণ ভবে
ব্রহ্মত্বে খোঁজ নাহি দেখি
ক্লিং হিং দিয়ে ঠকায় সবে।
সার করেছে টিকি আর পৈতে
জাতের বড়াই করে খেতে আর শুতে।
... ...
গত বংশে ঘি খেয়েছে কে
তাহার গন্ধ আজও শোঁকে সে
এমনি বজ্জাত কুঁড়ে নাজাৎ পাইবে কবে ॥

বাউলগানে মানুষই প্রাধান্য পেয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজগতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। দেব-দেবতা সবারই স্থান মানুষের নিচে।

এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা করো তরায় করো এই ভাবে
... ...
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে ॥
(লালন)

বাউল তাই সকল জাতের মানুষকে কাছে টেনেছে। বাউল বলে :

হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে না দেবে।

বাউলগানে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তার একটি দিক ব্যবসা-বাণিজ্য। বিভিন্ন গানে বাউল তার সাধনাকে বুঝবার উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপন করছে। এখানে অসৎ ব্যবসায়ীদের প্রতি যেমন ব্যঙ্গ করা হয়েছে তেমনি সাধনভজনের ক্ষেত্রে কিছু অসাধুর সাধনার নামে বিকৃত কামচারিতাকেও সমালোচনা করা হয়েছে।

১

সোনার মান গেল রে ভাই
বেঙ্গা এক পিতলের কাছে
শাল পটকের কপালের ফের
কুষ্টার বানাত দেশ জুড়েছে।

২

হীরে লাল মতির দোকানে গেলে না
সদায় কিনলি রে মন পিতলদানা।
চটকে ভুলেরে মন
হারালি অমূল্য ধন
হেরে বাজি কাঁদলে তখন
আর সারে না।
... ...
ব্যাপারে লাভ করলে ভালো
সে গুণপনা জানা গেল
লালন বলে মিছে হল
আওনা যাওনা ॥

এখানে উল্লেখ্য যে, এসব গানে যে উপমা প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রতিদিনকার জীবন থেকে নেওয়া। দেহতত্ত্বকে সাধারণের নিকট সহজেই বুঝাবার জন্য বাউল এমন ব্যবস্থা নিয়েছে। এতে বাউলের গান সাধারণের নিকট জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু এ গানের ভেতর যে গভীর রহস্য রয়েছে তা প্রতীকের মাধ্যমে আড়াল করেও রেখেছে। কেবল দীক্ষিতই এই গানের মর্ম বুঝতে পারে। একটি গানে লালন বলেন :

আমার চরকা ভাঙা টেকো আড়ানে
আমি টিপে সোজা করব কত
আর তো প্রাণে বাঁচি নে ॥
একটি আঁটি আর একটি খসে
বেতো চরকা লয়ে যাব কোন্ দেশে
আর কতকাল জ্বলব এ হাল
এ বেতো চরকার গুণে।
ছুতোর বেটার গুণ পরিপাটি
ষোলো কলে ঘুরায় টেকোটি
তার একটি কল বিকল হলে
সারতে পারে কোন্ জনে ॥
সামান্য কাঠ-পাটের চরকা নয়
তার খসলে খুঁট খেটে আটা যায়
মানবদেহ চরকা সেতো
লালন কি তার ভেদ জানে ॥

বাউলগানের রচিয়তা এবং শিল্পী একাধারে সাধক ও গায়ক। তাদের গান দীক্ষিতজনের জন্য লেখা হলেও এই গানের একটি বহিরঙ্গ রূপ রয়েছে। এই

পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে এই গান 'ভাবগান' নামে পরিচিত। সাধারণ মানুষ এসব গানের মাধ্যমে একদিকে চিত্তবিনোদনের অভাবকে যেমন পূরণ করেছে, তেমনি তাদের অধ্যাত্ম-ক্ষুধাও কমবেশি নিবৃত্ত হয়েছে। এসব গান ধর্মীয় লোকসংগীত হিসেবে সামাজিক সমস্যাদির কথাও নানাভাবে ব্যক্ত করেছে। লালন শাহের সমকালে রাজা রামমোহন রায় নানা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর একটি গৌরবময় ভূমিকা ছিল। লালন শাহ এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। লালন-শিষ্য দুদ্দু একটি গানে উল্লেখ করেন :

সতীদাহ যারে বলে
তা কি মনুষ্যে করে
রামমোহন চেষ্টা করে
বন্ধ করেছে তায়।

বস্তুত, রামমোহন এবং লালন ফকিরের সমকাল ছিল বাঙালি জাতির জাগরণের কাল। রামমোহন জাতিভেদ এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, লালন ফকির এবং তাঁর সমসাময়িক অন্য বাউলসাধকেরা পাশাপাশি বর্ণবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষায় গান রচনা করেছেন। এ আলোচনায় আমরা তা উল্লেখ করেছি। বাউল ধর্মমত সুফি মতাদর্শ নির্দেশিত হওয়ায় সব ধর্মের মানুষকে সে তার দলে গ্রহণ করতে পেরেছে। ফলে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় তাঁর কাছে বড় হয়নি—যা হয়েছে তা তাদের মনুষ্যত্ব। লালনের ভাষায় :

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মুচি
এক জলে সবাই শুচি।

বাউলগানের সমাজতত্ত্ব এই অসাম্প্রদায়িক সমাজচেতনাপুষ্ট। এখানে মানুষের পরিচয় কেবল মানুষ হিসেবে। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ বাউলধর্ম ও দর্শনকে মানবধর্ম ও দর্শন হিসেবে উল্লেখ করে তাকে তাঁর নিজস্ব ধর্ম ও দর্শন বলে গ্রহণ করেন। তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে রামমোহন রায় যেভাবে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন করেছিলেন, লালন এবং বাউলেরা তা করেননি। তবে তাঁরাও সমাজকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে পথ রাজনৈতিক নয়—সাংস্কৃতিক। গানের মাধ্যমে এক নতুন সমাজের কথা তারা সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছেন।

যৌনজীবন মানুষের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম 'তন্ত্রে' এই যৌনজীবনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলার কৃষিসমাজে তন্ত্র ও যোগসাধনা সভ্যতার ঊন্মেষলগ্ন থেকেই গভীর রেখাপাত করেছিল[১২২]। বাউল মতাদর্শে হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। সুফিধর্মে এই প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো নিত্য প্রবহমান। বাউলসাধনায় এই যৌনজীবন

একটি ভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মুক্তবুদ্ধি ব্যতিরেকে তা বোধগম্য হয় না। বাউলসাধক ও গীতিকার জীবনের এই দিকটি অস্বীকার করেনি। তারা নানা উপমা ও প্রতীকের মাধ্যমে যৌনজীবনকে সাধনার অঙ্গীভূত করেছে। বাউলের গান যৌনজীবনভিত্তিক হলেও এই বাউলগানের রচয়িতা এবং শিল্পী অপূর্ব কৌশলে উপমা ও প্রতীকের আড়ালে তাকে জীবনভিত্তিক অধ্যাত্মসাধনায় পর্যবসিত করেছে। শহর, বন্দর, নগর, থানা এবং নানা তীর্থস্থানের নামের প্রতীকী প্রয়োগে এক নতুন জীবনবোধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এ এক অভিনব লোকবিদ্যা বা জ্ঞান। দেহকে মানবজমিন হিসেবে কল্পনা বাউলদের নিজস্ব চেতনাপুষ্ট উপলব্ধি। দেহকেই তারা সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল বলে ভেবেছে। 'যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। বলেছে, 'মন তুমি কৃষি কাজ জানো না, যত্ন করে বপন করলে এই দেহেতে ফলত সোনা'। এই প্রসঙ্গে বাউল কালাচাঁদের উক্তি স্মরণযোগ্য!

১

মানবদেহ কল্পভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে
ভবে আমার আশা পূর্ণ হবে
শুভ যোগে চাষ করিলে

২

মন, তোমাকে বলি, শোনো আমার কথা
এই পতিত জমিনে শুদ্ধ লতাপাতা
বীজ রোপায়ে গেছেন মন্ত্রদাতা
যত্ন করে এবার সেচ নিত্য করি ॥

ফকির লালন বলেন :

জমির জরিপ একদিনেতে সারা
আগার পাগার আছে ডেগার
ঠিকেতে ঠিক করা।
দেহের আঠারো কালি
সেকথা এখন বলি
পণ্ডিত পায় না খুঁজে
বুঝবে সাধু যারা ॥

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বাউলগানে চিহ্নিত সমাজজীবন সম্পর্কে আমাদের একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মে। বাউলগানের অধ্যাত্মচিন্তা এই সমাজকে কেন্দ্র করেই। লালন ফকির তথা সমগ্র বাউলসাধক এবং গায়ক একটি অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী সমাজকেই কামনা করেছিলেন। একটি গানে লালন বলেন :

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে ॥

বাউলগানে চিহ্নিত এই সমাজচিত্র একটি প্রতিবাদী মনোভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বধর্মই মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানায়। কিন্তু কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী মানুষ এই ধর্মকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে প্রয়োগ করেছে। তারা ধর্মীয়প্রধান হিসেবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ তার নিজস্ব অস্তিত্ব ভুলে কেবল তথাকথিত ধর্মের প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করে। ফলে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। অতঃপর তার বিষবাষ্পে দগ্ধীভূত হয় মানুষের সকল মূল্যবোধ। মানুষ আর পশুতে তখন আর পার্থক্য থাকে না।

একজন সমাজতাত্ত্বিকের নিকট বাউলগানে চিহ্নিত সমাজজীবনের এই চালচিত্র তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাউলগানে সমাজের যে চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা কোনো একটি কালে সীমাবদ্ধ নয়। আবহমান কাল ধরে এই নিষ্পেষণের ইতিহাস চলে আসছে। যথার্থ ধর্মীয় জ্ঞান এবং শিক্ষার অভাবে সমাজের একশ্রেণীর মানুষ সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে এসেছে এতকাল। পীরবাদ গুরুবাদের আড়ালে সামাজিক শোষণও থেমে থাকেনি। সমাজের অসংখ্য 'মাজার' ও 'দরগা' সৃষ্টি হয়েছে। পীর এবং তার অনুসারীরা মিথ্যা স্তোকবাক্যে সাধারণের সম্পদ লুণ্ঠন করছে অবলীলাক্রমে। অনেক বাউলগুরু নিজেও এমন শোষণের মাধ্যমে গড়ে তুলেছে অর্থের পাহাড়। সমাজে কুলটা, পরিত্যক্তারা বাউলধর্মে আশ্রয় পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদেরকে 'পতিতা' হিসেবেও ব্যবহৃত করা হয়ে আসছে ধর্মসাধনার আড়ালে। এ কাজে বাউলগুরুরাও কম দায়ী নয়। বাউলদের মধ্যে লোকজ চিকিৎসার প্রচলন রয়েছে। অসুখ-বিসুখে এরা কোনো ওষুধপত্র ব্যবহার করে না। এই চিকিৎসা গোপনীয় এবং দীক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বাউলেরা জাতিভেদ মানেনি ঠিকই, কিন্তু নিজেরাই গণ্ডি টেনে দিয়েছে নিজেদের চারপাশে। খুব সহজেই তাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না। এরা বলেছে তারা কোনো মন্ত্রে কিংবা ধর্মাচরণে বিশ্বাসী নয়। সব ধর্মগ্রন্থ, আচার-অনুষ্ঠানকে তারা অস্বীকার করেছে। কিন্তু বাউল মতে দীক্ষিত হতে হলে নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। গুরুকে 'সেবা' দেওয়ার রীতিও রয়েছে যা পালন না করলে বাউলকে বহিষ্কৃত হতে হয়। বিভিন্ন সহজিয়া গ্রন্থ এবং বাউলগানই তাদের ধর্মতত্ত্ব হিসেবে গণ্য হয়। খাওয়াদাওয়াও একটি নির্দিষ্ট ধারায় হয়ে থাকে। মাজারে শিরনি, আলো দেওয়া এবং 'নজরানা' প্রদানের রীতিও চালু আছে। গুরুকে না খাইয়ে কোনোকিছু ভক্ষণ করা যায় না। ওরশের সময় গুরুর মাজারে 'ভোগ' দিতে হয়। লালনের আখড়ায় দেখেছি বাউলদের খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনের পূর্বে লালন মাজারে এই 'ভোগ' দেওয়া হয়। একজন বাউলের

সেবাদাসী একাধিক। এদের অধিকাংশই কমবয়েসী। পীর মুরিদী রেওয়াজ কঠিনভাবেই অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

সুতরাং বাউলগানের সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণে বাউলদের নিজস্ব সমাজ এবং তাদের সামাজিক আচরণও তাই সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

তথ্যনির্দেশ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন বাতেনী সুফিসাধনার প্রবর্তক। তিনি সুফিসাধনার প্রবর্তক ইমাম জাফর-আস-সাদেকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলের অনুসারী ছিলেন। ইসমাইল অসৎকর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর পিতা জাফর-আস-সাদেক কর্তৃক শিয়া ইমামতি থেকে বহিষ্কৃত হন। বাতেনী সুফিসম্প্রদায়ের আব্বাসীয়দের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিল। এই সম্প্রদায় কেবল দীক্ষিতদের মধ্যেই তাদের সাধনার বিষয় সীমাবদ্ধ এবং গোপন রেখেছিল।

২. 'সামা'-একধরনের সুফিসাধন সংগীত। নবম-দশম শতকে এর উদ্ভব। সুফিদরবেশগণ নৃত্যগীত সহযোগে তাদের সাধনাকে 'পরম প্রিয়ে'র নিকট নিবেদন করত। এই সংগীতের অর্থ দ্ব্যর্থবেধক এবং অস্পষ্ট। কেবল দীক্ষিত সাধকই এই সংগীতের মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো। চিশতিয়া সুফিসাধকগণ এই সংগীতের প্রবর্তক। সুফিসাধকেরা আল্লাহকে তাদের পরমপ্রিয় বা 'মাশুক' হিসেবে গণ্য করত।

৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউলগান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৮

৪. ঐ, পৃ. ৩৭১

৫. ঐ, পৃ. ২৮৩

৬. ঐ, পৃ. ৫১

৭.৮ Shashibhusan Das Gupta, *Obscure Religious Cults*, 1976. Calcutta, p. 160-161

"The Bauls belonging to the Hindu community are generally Vaisnavite in their faith and those belonging to the Muslim community are generally Sufi-istic and in both the schools the emphasis is on the mystic conception of Divine love."

"...the Sadhakas of the Vaisnava Sahajiya order and orders akin to it, with their secret practices involving the four moons (cari canadra) were also known as the Bauls."

৯. ক্ষিতিমোহন সেন, *বাংলা বাউল* (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের লীলা বক্তৃতা), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৪, পৃ. ৫৬

১০. অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ঢাকা, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০
১১. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৬০
১২. মুহাম্মদ আবু তালিব, *লালন শাহ ও লালন গীতিকা* ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৮
১৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
১৪. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, (মধ্য, ৩য়, ৮ম, অন্ত-৭ম)
১৫. বীরভদ্র চৈতন্যদেবের অন্যতম শিষ্য নিত্যানন্দের পুত্র। তিনি প্রকাশ্যভাবে যুগল সাধনা বা পুরুষ প্রকৃতি মিলনঘটিত সাধনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যসহ অনেকেই মনে করেন যে, তিনি বাউলধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু অত্র গবেষণায় বাউলসাধনাকে অনেক প্রাচীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বীরভদ্র এই সাধনার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।
১৬. Annemarie Schimmel, As Through a Veli, Mystical Poetry in Islam, New York 1982, p. 7.
১৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০
১৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
১৯. বাউলসাধনায় 'জ্যান্তে মরা' প্রক্রিয়াকে দীক্ষালাভের হেতু বলা হয়ে থাকে। এই সময় সাধক এবং সাধিকাকে কাফন ইত্যাদি পরানো হয় এজন্য যে তারা জীবন্মৃত। সে আর সংসারজীবনে ফিরে যেতে পারবে না এবং কোনো সন্তান-সন্ততি লাভ করতে পারবে না। 'জ্যান্তে মরা' সাধনাকে তাই পরিপূর্ণ রতিনিরোধ সাধনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে।
২০. *Encyclopedia of Islam*. p. 302
২১. Ibid.
২২. Deviprasad Chattopadhyaya, *Lokayata*, Calcutta, p. 45
২৩. Deviprasad Chattopadhyaya, *Lokayata*, of cil. p. 357
২৪. Ibid.
২৫. Ibid.
২৬. আহমদ শরীফ, *বাংলার সুফী সাহিত্য*, ভূমিকা, পৃ. ১০৬
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯
২৮. John Woodroffe, *Shakti and Shakta*, London, 1918, P. 35
২৯. Suniti Kumur Chatterji, op, cit. P. 25
৩০. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৫ দ্র. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২
৩১. John Woodroffe, op. cit. p. 89
৩২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭, ৪২৪
৩৩. H. C. Paul, *Baul Poets or Chari Chandra* (or four state of the mind) p. 1

৩৪. Munindra Mohan Bose, *An Introduction to the Post Caitanya Sahajia Cult*. (Reprint from Journal of the Department of letters, Calcutta University, Vo. XVI) p. 8
৩৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪
৩৬-৩৭. আহমদ শরীফ, *বাংলার সুফী সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, সির্নামা, কাজী শেখ মনসুর, পৃ. ২৮৯-২৯২
৩৮. ক্ষেত্রগবেষণায় বাউলদের নিকট থেকে এই তথ্য জানা গেছে। বাউলেরা সহজিয়া পুঁথি থেকে মিলনসাধনা সম্পর্কে নির্দেশনা লাভ করে থাকে।
'পঞ্চানন দাসের কড়চা', 'বিবর্ত বিলাস', 'রত্নসার', প্রভৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত পৃ. ৪০৮-৪২৪
৩৯. Anwarul Karim, *Folk Medicine, Baul Practice and their System of Birth control*, Folklore, Journal of the Folklore Research Institute, Vol. IV-V. 1979-80. p. 26-38.(ed) Anwarul Karim.
৪০. Nicholson, R.A. The Idea of Personality is Sufism, Delhi, first edition (Reprint) 1976. p. 14 নিকোলসন বলেন : "Fana, the passing away of consciousness in mystical union is consistent with belief in personal God. 'ফানা'কে নিকোলসন বৌদ্ধ নির্বাণের সঙ্গেও এক করে তুলনা করেছেন। পৃ. ১৪
৪১. দ্র. শাহ আব্দুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, ঢাকা ৩য় সংস্করণ ১৯৫২, পৃ. ২১২ বরজখ শব্দের অর্থ আড়াল। শাহ আব্দুর রহমান বলেন : 'কাঁচের লণ্ঠনের ভিতর বাতি জ্বলতে থাকে। উহার আলো কাঁচের স্বচ্ছতায় ভিতর দিয়া বাহির হইয়া বাহিরের স্থান আলোকিত করে। কিন্তু বাতির শিখা ধরিতে হইলে কাঁচ ভাংগিয়া প্রবেশ না করিলে শিখা ধরা যাইতে পারে না। অতএব এ স্থলে লণ্ঠনের কাঁচের আবরণটি বরজখ।' শাহ আব্দুর রহমান বরজখ শব্দকে ইংরেজি Prism শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে : 'নিরঞ্জন ও নিরাকার আল্লাহতায়ালার জাত সেফাতের মজহর (আবির্ভাব) তাহার সৃষ্টি। অতএব তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার 'প্রিজম' স্বরূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া করিতে হইবে। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান সৃষ্টি মানব। অতএব খোদাতায়ালাকে চেনার জন্য মানুষই প্রধান প্রিজম বা বরজখ।'
৪২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৪৩. Nicholson R.A. op. cit. p. 57-60
৪৪. Asim Roy, op. cit. p. 50-51
৪৫. Dr. Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal down to A. D. 1538* (Unpublished Ph.D) Thesis Dhaka University 1958, p. 202
Also see Social Research in East Pakistan, ed. Pierrie Bessaignet, JASP publications, No, 5, 1964

৪৬. Asim Roy, op. cit. p. 159-60
৪৭. Asim Roy, op. cit. p. 51
৪৮. আহমদ শরীফ, সৈয়দ সুলতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৬০
৪৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪
৫০. June Mc Daniel, *The Madness of the Saints, Esoteric Religions in Bengal*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1989, p. 157-58
৫১. Samuel Peter Landel Mills. *An Anthropological Account of Islamic Holy Men in Bangladesh*, Ph.D thesis (unpublished), University of London, 1992 p. 26
৫২. Mills SPL Ibid. p. 247-289
৫৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে তাদের কুকীর্তি প্রকাশিত হয়েছে।
৫৪. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৫৫. ঐ, পৃ. ৩৩
৫৬. ঐ, পৃ. ৩৩
৫৭. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, ১৪০০ (১৯৯৩), পৃ. ৪৯১
৫৮. ঐ, পৃ. ৪৮৭
৫৯. Pramatha Nath Bose, *A History of Hindu Civilization during British Rule* Vol. 1, Calcutta 1894, p. XLI
৬০. অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৬১. ঐ, পৃ. ১৩২
৬২. ঐ, পৃ. ১৩০
৬৩. অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-৬২
৬৪. ঐ, পৃ. ৩২
৬৫. ঐ, পৃ. ১৬৮-৬৯
৬৬. শ্রীবৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, প্রাগুক্ত
৬৭. অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৬৮. শ্রী বৃন্দাবন দাস, প্রাগুক্ত
৬৯. অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-৬৭
৭০. আলি রাজা জ্ঞান সাগর, দ্র. আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাংলার সুফী সাহিত্য*, প্রাগুক্ত
৭১. আলি রাজা, ঐ, পৃ. ৫৫
৭২. ঐ, পৃ. ৮৩
৭৩. ঐ, পৃ. ১১৩
৭৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। *লোকায়ত দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫
৭৫. George Ryley Scott, *Phallic Worship*, London, 1941, p. 46

৭৬. Ibid, p. 1-11
৭৭. H. M. Westropp, *Ancient Symbol Worship*, New York, 1874, pp. 23-29
৭৮. Max Weber, *The Sociology of Religion*, Tr. Ephraim Fischoff, London 1966, p. 102
৭৯. Ibid, p. 107
৮০. Ibid, p. 107
৮১. Debiprosad Chattopadhyaya : *Lokayata, Sex Rituals, New Delhi, 1968*, p. 65.
৮২. Harish Johari : *Dhanwantari*, Calcutta, 1986
৮৩. শক্তিনাথ ঝা : *বস্তুবাদী বাউল*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ . ২৭৭-৭৮
৮৪. আদম আলী, *মানবতা ও মূল্যবোধ*, পৃ. ৩৮, ৫২, দ্র. শক্তিনাথ ঝা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯-৮০
৮৫. শক্তিনাথ ঝা : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
৮৬. শক্তিনাথ ঝা : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
৮৭. Abdul Wali : *On curious tenets and Pracrtices of a Certain class of Faqirs in Bengal*, Journal of the Anthropological society of Bombay, Vol. V, No. IV, Calcutta, 1900
৮৮. Garver Michael : *Introduction in Dhanwantari* by Harish Johari, Calcutta, 1986. p. IV-VI
৮৯. Ibid, p. IV
৯০. Garver Michail : *Introduction in Harish Johari : Dhanwantari*, Calcutta, P. VII. 1986
Also see Scientific American 1974, MIT, Boston, U.S.A.
৯১. Horish Johari : Op. cit, Garver Michael, Introduction, p. VII.
৯২. Horish Johari : Op. cit, p. 16
৯৩. মোরারজী দেশাই : *প্রাকৃতিক চিকিৎসা* (Nature Cure), মাহমুদ খান অনূদিত। সম্পাদক : মোস্তফা হারুণ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০০ পৃ: ৪৬-৪৯
৯৪. Debiprosad Chattopadhyaya : *Lokayata*, Op. cit. p. 353
৯৫. Ray. P.C : *History of Hindu Chemistry*, Vol. I London, 1907. Vol. II Calcutta, 1925
Also see Debiprosad, Lokayata, p. 353
৯৬. Debiprosad Chattopadhyaya : Op. cit. p. 358
৯৭. Debiprosad Chattopadhyaya : Op. cit. p. 357
৯৮. John Woodroff, op. cit. p. 156-157
৯৯. Ibid

১০০. Arthur Symons, *Movement in Literature.* দ্র. শ্রী অশোক সেন, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৪, পৃ. ১২০-১২১
১০১. Joseph Jastrow, *Freud-his Dreams and Sex Throries.* দ্র. শ্রী অশোক সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
১০২. *Defence of Poetry*, P.B. Shelley দ্র. শ্রী অশোক সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-২৩
১০৩. শ্রী অশোক সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
১০৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭
১০৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭
১০৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০
১০৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭
১০৮. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা* (এনামুল হক সম্পাদিত), এবং মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণ, বিজয়। উভয় গ্রন্থ সম্পর্কে পূর্ব পরিচ্ছদসমূহে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে।
১০৯. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, প্রাগুক্ত।
১১০. ক্ষিতিমোহন সেন, *বাংলার বাউল ও ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা*, প্রাগুক্ত।
১১১. Suniti Kumar Chatterjee, *Islamic Mysticism, Iran and India*, Reprinted from the Indo-Iraniea Vol I. No. 11, October, 1946, op. cit.
১১২. ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাগুক্ত।
১১৩. AK Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society*, Nawroje Kitabistham, Dhaka, 1980, pp. 127-176
১১৪. AK Nazmul Karim, op cit, pp. 97-102
১১৫. K.N., Chaudhuri, *The Economic Development of India under the East India Company*. 1813-1858, Cambridge, 1971, p. 62-74
১১৬. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (১৭৫৭-১৮৫৯) প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৫৬
১১৭. Strachey John, *India its Administration and Progress*, London 1911, 10452-453
১১৮. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা ১৯৯৬, পৃ. ৭৩
১১৯. Alphons Silbermann, *The Sociology and Music* by Corbet Stewart, Routledge and Kagan Paul, London 1963, p. 60
১২০. op. cit, p. 60-61
১২১. Lucian Goldman, *Genetic Structuralism in Sociology of Literature* Elizabeth and Tom Burns (ed.) *Sociology of Literature and Drama*, Penguin Books, London, 1973, p. 109
১২২. Bharat Aghenanda, *The Tantric Tradition*, Landon, 1965



চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের লোকসংগীত ও বাউলগান

বাংলাদেশের সংগীত মূলত বাংলাদেশের লোকসংগীতকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছে। আজ যে সংগীতের এত উন্নতি ঘটেছে–আমরা নিত্যনতুন সুর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখেছি, এসবের উৎস মূলত লোকসংগীত। মানুষ একদিন পাখির ডাক, নদীর কলতানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল সুর। তার আনন্দ-বেদনা ভালোবাসার ভাষা রূপ পেয়েছিল প্রকৃতির নন্দন কাননে, বাতাসের পেলব কোমলতায়, পাখির কূজনে। বুক চিরে বেরিয়ে এসেছিল গান।

সেই শুরু। আজো তা থামেনি। এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে গান জেগেছে। এমনি করে বংশপরম্পরায় জনমে জনমে এই গান গীত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। প্রকৃতির বুকে লালিত এই গান প্রকৃতিগত সহজ তালে অভ্যস্ত হয়েছে। 'বাংলাদেশ' নামে এই দেশের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ কাজ করতে করতে, অথবা অবসরের মুহূর্তে ভালোবাসার মানুষের কথা মনে রেখে, তার দুঃখ-সুখের কথাগুলি নৃত্য-সুরের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে। এ গানের সুষমার কোথাও লেগেছে নোনা পানির সাথে সোঁদা মাটির গন্ধ, কোথাও বৃষ্টি আর নদীর পানিতে পলি কিংবা দোআঁশ মাটির স্বাদ। কোথাও মেঘের ধারায় লেগেছে প্লাবন–মাটি গেছে হারিয়ে। কোথাও খরা আর মাটিতে রুক্ষতা। কোথাও ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জেগেছে বাঁচবার সাধ। কোথাও রুক্ষতায় ক্লিষ্ট প্রকৃতির বুকে নেচেছে বাউল। কোথাও 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর' বলে গেয়েছে উদাসী পথিক। কোথাও একটি রাতের মমতা মাখানো ভালোবাসার পরশে অজানা পথে পাড়ি দেওয়া কোনো পথিককে ঘর বাঁধবার প্রার্থনায় আকুতিভরে ডেকেছে নারী। বাংলাদেশের নদী, মাটি, সমুদ্র, আকাশ, ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গে ঐকতান তুলে একতারা, দোতারা, খমক কিংবা মন্দিরা অথবা প্রেমজুড়িতে লেগেছে গান–সেই তো তার এদেশের সংগীত, হৃদয়ে হৃদয়ে মেলাবার বিনিসুতোর মালা–যার স্রষ্টা 'লোক' নামে কথিত সকল অবহেলার পাত্র মেঠো মানুষের দল। নদী-মাটি-মানুষকে নিয়ে একদিন যে লোকসংগীতের জন্ম হয়েছিল, এদেশে তার সাথে সংগতি রেখে উদ্ভব হয়েছিল লোকবাদ্যের।

সুর-তাল-রাগ-রাগিণী বা শাস্ত্রীয় আচারের ছোঁয়া সেখানে নেই। এই গান গাইবার জন্য দীক্ষিত হবার প্রয়োজন নেই। লোকসংগীতের সহজ বুনন তাদের আপনা থেকেই পারদর্শী করে তোলে। এই গানের মাঝে জাগে যে নৃত্য–তাও আপনাআপনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোথাও সুর ও তালের বিপর্যয় ঘটেনি, সবকিছুই ঘটেছে তাদের নিজস্ব ঢঙে।

এই যে আমাদের মাটি মানুষের গান–তাতে বৈচিত্র্য আছে, মিশ্রভাবের স্বাদ আছে, সমতল বিশেষের রং আছে। গায়কিতেও আছে ভিন্নতা। বাংলাদেশের আকাশ সূর্য চন্দ্র তারা, নদী হাওয়ার মতো, ধানের সুবাস এবং পাখির সুরের মতো অসাম্প্রদায়িক এদেশের অজস্র লোকসংগীত হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টানের মিলিত ভাবনা এবং চর্চার পূর্ণতা এবং সংহতির প্রতীক। এ সংগীত কেবল একটি ধর্মের কিংবা গোষ্ঠীর নয়–এ সংগীত গোটা বাংলাদেশের মানুষের সম্পদ, তার হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসার ছন্দ।

বাংলাদেশের লোকসংগীতের এই মর্মবাণীকে উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই। একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে। কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।[১]

এতক্ষণ লোকসংগীতের একটি কাব্যিক রূপের কথা বলেছি। এবার এর তত্ত্বকথা। শুরুতেই আমাদের দেশে লোকসংগীতের নামকরণ নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার আলোচনা প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রায়ই লোকসংগীত এবং পল্লীগীতি একই পরিমণ্ডলে তুলনীয় হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে লোকসংগীতের উৎস গ্রাম এবং গ্রামীণ পটভূমি। কখনও বা শহর, নগর কিংবা বন্দরের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবন। পল্লীগীতির উৎস বলতে তাই-ই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পল্লীগীতির সঙ্গে লোকসংগীতের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পল্লীগীতি নামে আমরা যা পাই তার একটি লিখিত রূপ, নির্দিষ্ট সুর এবং রচয়িতা রয়েছে। অনেক শহরের গীতিকারেরাও এসব গান রচনা করে থাকেন এবং পল্লীতে প্রচলিত কোনো সুরে তার সুরারোপও ঘটে। সুতরাং এ ধরনের পল্লীগীতিকে লোকসংগীতের পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।[২]

১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সংস্থা (ইন্টারন্যাশনাল ফোক মিউজিক কাউন্সিল) লোকসংগীত সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত সংজ্ঞা প্রণয়ন করেন :

> Folk music is the product of a musical tradition that has been evolved through the process of oral transmission. The factors that shape the tradition are : (i) continuity which

> links the present with the past; (ii) Variation which springs from the creative impulse of the individual or the group; and (iii) selection by the community which determines the form or forms in which the music survives.
>
> The terms can be applied to music that has been evolved from rudimentary beginning by a community uninfluenced by popular and art music and it can likewise be applied to music which has originated with an individual composer and has subsequently been absorbed into the unwritten living tradition of a community.
>
> The term does not cover composed music that has been taken over ready made by a community and remains unchanged, for it is the refashioning and recreation of the music by the community that gives it its folk character.

আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক ফোক মিউজিক সম্পর্কে এই সংজ্ঞা নির্ণয়ের পর পুনরায় লোকসংগীত বিশেষজ্ঞগণ এই সংজ্ঞার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা করেন। অতঃপর ১৯৭৫ সালে ফোক মিউজিক-এর পাশাপাশি ট্রাডিশনাল মিউজিক ব্যবহারে মতামত দেন এবং তাঁদের আলোচনার প্রেক্ষিতে সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় *International Council for Traditional Music* সংক্ষেপে I.C.T.M–এই নামই বর্তমানে চালু রয়েছে। ট্র্যাডিশনাল মিউজিক ব্যবহারের পক্ষে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছিল তা নিম্নে দেওয়া হলো।

> Traditionality should be seen, rather as an emphasis within a wide range of musical activities. Existing definition of folk music' founder in making classifications that are too narrowly based of content and form. The suggestion is that the concept of traditionality in music proves more fruitful when applied to actual societies than of folk music.[৩]

এ লোকসংগীতের সংজ্ঞা অনুসারে লোকসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার পুরুষানুক্রমিক মৌখিক বিস্তার লাভের ধারা (Oral transmission). অর্থাৎ যে গান পুরুষ বা বংশপরম্পরায় লোকের মুখে মুখে ঘুরে ফেরে। এই গান এমন এক সমাজের সৃষ্টি যাদের কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছিল না অর্থাৎ যারা অশিক্ষিত হলেও প্রকৃতিগতভাবে যারা ছিল জ্ঞানের অধিকারী। আমার জীবনে আমি এমন অনেক অশিক্ষিত (non-literate) লোকগীতির শিল্পী এবং রচয়িতাকে দেখেছি যারা মুখে

মুখে গান রচনা করেছে–যার ভেতর অনেক জ্ঞানের কথা, তত্ত্ব এবং দর্শন রয়েছে। এদের অনেকে মুসলমান হলেও হিন্দুর ধর্মের কথা অবলীলাক্রমে বলে গেছে যার একটাও তাদের ধর্মানুসারে মিথ্যা নয়। এর কারণ হিসেবে বলা চলে, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দু এবং বৌদ্ধের সংখ্যাধিক্য এবং আধিপত্য ছিল। প্রাচীনকাল থেকে লোকসংগীতে জীবনের সাথে জাতির কথা প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর এদেশের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর মানুষ জাতিভেদ-পীড়িত থাকায় মুসলমান হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরনো বিশ্বাস এবং সংস্কারকে তারা মুছে ফেলতে পারেনি। আমি আমার কিশোর এবং তরুণ বয়সে গ্রামে হিন্দুবাড়িতে সংগীতানুষ্ঠান এবং গীতা-রামায়ণ পাঠ হতে দেখেছি। গ্রামে আপামর জনসাধারণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এসব গান শুনেছে এবং মুসলমান লোকসংগীত রচয়িতা সহজেই এসব ধর্মের কথা তাদের গানে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ বলা চলে সে সময়ে গ্রামে যেমন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে একে অপরের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জেনেছে; পরস্পর সহমর্মিতার কারণে এবং শ্রবণশক্তির গুণে তা মনে ধারণ করে অতি সহজেই যেসব কথা তারা তাদের গানেও বলেছে।

এ লোকসংগীতের অপর বৈশিষ্ট্য হলো এর অবিচ্ছিন্নতা (continuity) এবং পরিবর্তনশীলতা (changeability) অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে পুরুষপরম্পরায় এ গান যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের মুখে মুখে গীত হয়েছে তেমনি তা লোকমুখে থাকার কারণে গানের শব্দে বা বাণীতে এসেছে পরিবর্তন এবং বিভিন্নতা (Variation) সুরেও যে পরিবর্তন আসেনি তা নয়। মাঝিদের কণ্ঠে বাউলগান ভাটিয়ালি সুরে গীত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লোকসংগীতের কাঠামো (form) এবং আধেয় নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে ঐকমত্য না হওয়ায় সকলের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'লোকসংগীত. (folk music) এই নামের পাশাপাশি 'প্রাচীন ঐতিহ্যভিত্তিক সংগীত' (Traditional music) ব্যবহার করেছেন। ফলে লোকসংগীতের পরিধি এবং ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা 'লোক' নামক কথিত সমাজের সকল সংগীত-ঐতিহ্যের পরিচয় লাভে সক্ষম হচ্ছি। এর ফলে বাউল এবং পল্লীগীতিকেও আমরা লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের লোকসংগীত গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এবং গ্রামীণ মানুষের দ্বারা রচিত হলেও তার কোনো একক বা নির্দিষ্ট চেহারা নেই। এখানে অঞ্চলবিশেষে আঞ্চলিক ভাবনা ও চেতনাপুষ্ট লোকসংগীত রচিত হয়েছে যা সার্বিকভাবে আমাদের সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ।

লক্ষ করা গেছে কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলগান যখন সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী কিংবা দিনাজপুরে গীত হয়েছে তখন গানের বাণীর উচ্চারণে,

সুরের প্রক্ষেপণে এবং গায়কীতেও বিভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও মূল সুর এবং বাণীর মধ্যে কমবেশি ঐকতান (point of similiarity) থেকে যায় তা গ্রহণ করতে আপত্তি নাও আসতে পারে। অঞ্চলবিশেষে যে গানের সৃষ্টি, অন্য অঞ্চলে তা গীত হলে তা যে অবিকল তেমনি থাকবে এমন হয় না। লোকমুখে গীত হওয়ার কারণে তার পরিবর্তন যা স্বাভাবিক তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সুরের আমূল পরিবর্তন হলে অঞ্চলবিশেষের সংগীত হিসেবে তার পরিচয় আর থাকবে না। আশার কথা, আমাদের লোকসংগীতে তা এখনও হয়নি। তবে ইদানীং বাউলগানের জনপ্রিয়তার কারণে অনেক শিল্পীই তাদের সুবিধানুযায়ী মূল সুরের পরিবর্তে নিজেদের তৈরি সুরে গাইছেন। তারা ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন লোকসংগীতের সুর এসব গানে সংযোজন করেছেন। অঞ্চলবিশেষে লোকসংগীতশিল্পীদের কণ্ঠে এবং বাণীতে যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি তা স্বাভাবিক, লোকসংগীতের ধর্মের সঙ্গে তা সংগতিপূর্ণ। কিন্তু এসব গানের সুর এবং বাণী পরিমার্জন (Sophistication) করে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের যোগে গাওয়া হলে তা আর লোকসংগীত থাকে না। আমাদের দেশে কিছু কিছু পপ সংগীতশিল্পী আমাদের লোকসংগীতকে এমনিভাবে গাইছেন এবং আমাদের তরুণেরা তা গ্রহণ করছে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। রেডিও-টেলিভিশনে লালনগীতি পরিমার্জিত সুরে গাওয়া হচ্ছে এবং তার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, অনেক বাউল এবং লালনপন্থী শিল্পীরাও তাদের নিজস্ব সংগীতধারার পরিবর্তে রেডিও-টেলিভিশনের সুরকে অনুসরণ করেছেন। তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, জনগণ এখনও রেডিও এবং টেলিভিশনে পরিবেশিত সুর গ্রহণ করছে দেখে তারাও সেই সুরে গাইতে শিখছেন।

এই পরিবর্তনের কারণে লালনগীতির যথার্থ সুরের সাথে আমাদের পরিচয় ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাউল এবং লালনের গান অতীতে ভাবগান অথবা শব্দগান নামে পরিচিত ছিল।[৪] তখন যে সুর প্রচলিত ছিল তা অনেকটা ঢালাও সুর। তাছাড়া দোতারা কিংবা সারিন্দায় যে সুর এবং তাল আপনা-আপনি সৃষ্টি হতো কণ্ঠের গান কখনও তা অনুসরণ করত, কখনও কণ্ঠে জেগে ওঠা সুরই প্রাধান্য পেত। গ্রামে-গঞ্জে আমি বাজনাবিহীন গান শুনে অভিভূত হয়েছি। গরুর গাড়িতে, নৌকায়, এমনকি রাখালের কণ্ঠে যে লোকসংগীতের সুর শুনেছি তা আজো কানে বাজে।

বাংলাদেশের এই লোকসংগীতের দুটি বিশেষ ধারা। এক. লোকধর্ম বা লৌকিক অধ্যাত্মচেতনাপুষ্ট সাধনসংগীত। দুই. লৌকিক জীবননির্ভর সাধারণসংগীত।[৫]

লোকধর্মভিত্তিক সাধনসংগীতই বাংলাদেশের লোকসংগীতের আদিতম প্রকাশ। চর্যাপদ বা 'বৌদ্ধগান ও দোহা' শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিম

রূপের পরিচয় বহন করে না, বরং এদেশের মাটি ও মানুষের এযাবৎকাল আবিষ্কৃত লোকধর্মনির্ভার গণমুখী লোকসংগীতের সার্থক প্রকাশ বলেও তা স্বীকৃত।[৬] বাউলগানও এমনিভাবে লোকধর্মনির্ভর প্রতিবাদী লোকসংগীত।

লোকধর্মনির্ভর বা লৌকিক অধ্যাত্মচেতনাপুষ্ট লোকসংগীতের শ্রেণীবিন্যাস এভাবে করা যেতে পারে, যেমন : বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, ভাবগান, শব্দগান, অষ্টক, বিচার।[৭]

বলেছি, বাউলগান বাউল লোকধর্মের অনুসারীদের সাধনসংগীত। এই গান বা সংগীতের উদ্ভবকালের তেমন কোনো ইতিহাস জানা যায় না। বাউল সম্প্রদায়ের কথা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রচিত বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ আছে। চতুর্দশ শতকে শাহ্ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ জোলেখা', পঞ্চদশ শতকে মালাধর বসু কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রভৃতি সাহিত্যকর্মে বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যা অনেকাংশে সম্প্রদায়নির্দেশক। সুতরাং এ থেকে এমন ধারণা জন্মে যে, চতুর্দশ শতকের অনেক আগে থেকেই এই সম্প্রদায় তৎকালীন সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। সাম্প্রতিককালে গবেষণায় জানা যায় যে, পারস্যে অষ্টম-নবম শতকে সুফিসাধনা প্রবর্তনকালে 'বা'আল' নামে সুফিসাধনার একটি বে'শরা এবং বাতেনী শাখাও গড়ে ওঠে। এরা সংগীতাশ্রয়ী, মৈথুনভিত্তিক গুপ্তসাধনপন্থী ছিল এবং মরুভূমি অঞ্চলে এখানে-সেখানে গান গেয়ে ফিরত। পরবর্তীকালে এরা অন্য সুফি ফকিরদের সঙ্গে ভারত উপমহাদেশে আগমন করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভারত উপমহাদেশে সুফিসাধকদের প্রবর্তিত 'সামা', 'গজল' এবং 'কাসিদা' জনগণের মনে বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কবীর, নানক, রজ্জব এবং দাদু এসব সুফিসাধকদের অনুসারী ছিলেন। আমির খসরু পরবর্তীকালে 'কাউল'[৮] নামে একটি সাধনাসংগীত প্রবর্তন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টীয় নবম শতকে আবুল ফরজ আল-ইস্পাহানী 'কিবাত আল আগানী' বা সংগীতমালা নামে প্রাচীন আরবীয় সংগীতের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল বলে জানা যায়। গ্রন্থটিতে প্রাক-ইসলামপর্ব থেকে আব্বাসীয় আমল পর্যন্ত আরবীয় সংগীতের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুফিফকিরদের আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে আরব ও পারস্যের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এর ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও নানা পরিবর্তন আসে। ধারণা করা হয়, বৌদ্ধধর্মের সিদ্ধাচার্যগণ কর্তৃক দশম একাদশ-শতকে প্রণীত 'বৌদ্ধগান' ও 'দোহা', 'কিতাব আল আগানী' এবং বা'আল>বাওল>বাউল সুফিসাধকদের প্রভাব থাকতে পারে। কারণ বর্তমানে বাউলগান নামে পরিচিত বাউল সম্প্রদায়ের সাধনসংগীতের সঙ্গে চর্যাগীতিকার অনেক পদাবলীর ভাবনা ও

দর্শনের গভীর মিল ও সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। কবীর রচিত পদাবলীর সঙ্গেও বাউলগানের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে।

বলেছি, বাউলগান বাউল সম্প্রদায়ের সাধনসংগীত। বাউলদের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনাচরণের সঙ্গে এই গান সম্পৃক্ত। এই গানের প্রবক্তাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফকির লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, সিরাজ শাহ্ এবং দুদ্দু শাহ্। এঁরা বাউলমতাবলম্বী ফকির ছিলেন। তাঁদের এবং অন্য বাউলসাধকদের বিরচিত গান গ্রামাঞ্চলে 'ভাবগান' বা 'ভাবসংগীত' নামে পরিচিত ছিল। কেউ কেউ এসব গানকে 'শব্দ গান' ও 'ধুয়া গান' নামেও অভিহিত করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, বাউলগান পরিবেশনায় সাধারণত দুটি ধারা লক্ষ করা যায়।[৯] একটি, আখড়াআশ্রিত সাধনসংগীত। এখানে গানের ঢং এবং সুর শান্ত এবং মৃদু তালের। অনেকটা হাম্দ, গজল কিংবা নাত অনুসারী। লালন ফকিরের আখড়ায় ফকিরেরা বসে বসেই এসব গান করে থাকে। অপর ধারা, আখড়ার বাইরে অনুষ্ঠানাদিতে, জনসমক্ষে–এই গান চড়া সুরে গীত হয়। তখন একতারার সঙ্গে যুক্ত হয় ডুগী, খমক এবং প্রেমজুড়ি, কখনও ঢোলক, সারিন্দা কিংবা দোতরা। তাল : দাদরা, কাহারবা; কখনও ঝুমুর, একতালা কিংবা ঝাঁপতাল। শিল্পীরা নেচে নেচে গান করে। কখনও গ্রামে অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে ভাবসংগীতের মাধ্যমে নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়। বাউলেরা কখনও একক আবার কখনও দলগতভাবে সংগীত পরিবেশন করে। বাউল বা ভাবগানের একজন মূল প্রবক্তা থাকে। তার গানের সঙ্গে অন্যেরা ধুয়া বা 'পাছদুয়ার' ধরে। তাদের কারো কারো হাতে থাকে খমক, জুড়ি ইত্যাদি।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, বাউলগানে নাচের প্রচলন রয়েছে।[১০] লালন ফকিরের গানেও তা বিদ্যমান। এসব গানে নাচের কোনো মুদ্রা প্রদর্শিত হয় না। এটা সুফিদের 'হাল'[১১] এবং বাউল প্রভাবিত বৈষ্ণবগানের 'দশা'র সঙ্গে তুলনা করা চলে। বাউলগানে নাচের প্রবর্তন কবে হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনোকিছু তেমন জানা যায় না। শান্তিদেব ঘোষের মতে এই নাচের উৎস হলো গ্রামীণ পাঁচালী গান।[১২] 'গম্ভীরা' গানেও নাচের প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশে লাঠিখেলা নৃত্যসহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে তাল ও সুর নৃত্যের অনুষঙ্গী।

যাহোক, বাউলগানের নাচ কোনো বিশেষ রীতিতে বাঁধা-ধরা নাচ নয়। বাউল যেখানে যে ছন্দ পেয়েছে তা-ই সে গ্রহণ করেছে অত্যন্ত সহজভাবে। চেষ্টাকৃত কোনো নৃত্যছন্দ সে পছন্দ করেনি। গান গাইবার রীতিতে সে যতপ্রকার ছন্দ পেয়েছে তাকেই সে নৃত্যরূপ দিতে চেষ্টা করেছে। যার নাচতে ভালো লেগেছে, সে নেচেছে। যার ইচ্ছে করেনি, সে নাচেনি। বাউলগানের নাচ তাই সংগীতের সঙ্গে অবশ্যকরণীয় কিছু নয়। এ গানে নাচের অন্তর্ভুক্তি জনগণের মনোরঞ্জনের কারণেই

আখড়া আশ্রিত সাধনসংগীতে এর প্রচলন নেই। সেখানে সাধক নিবেদিতপ্রাণ–অনেকটা ধ্যানীর ভূমিকা। কিন্তু আখড়ার বাইরে হাজার মানুষের সম্মুখে বাউল প্রায়ই চড়া সুরে নৃত্যভঙ্গিমায় গান পরিবেশন করে থাকে। যশোরের কানাই ক্ষ্যাপা, মহেন্দ্র গোঁসাই বাউলগানে নৃত্যের অন্তর্ভুক্তি করেছিলেন। তবে একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে বাউলগায়ক তার গানের দাবিতেই দেহকে নৃত্যসর্বস্ব করে তোলে।

বাউলগীতির শ্রেণীবিন্যাস সাধারণত দুই প্রকার : দৈন্য এবং প্রবর্ত। এই দৈন্য এবং প্রবর্ত ভেঙে রাগ দৈন্য এবং রাগ প্রবর্ত। এখানে 'রাগ' শাস্ত্রীয় সংগীতের 'রাগ' নয়, ভজন সাধনের রাগ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মতো বাউলগানে 'রাগ' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে 'রাগ' অর্থে 'অভিমান' এবং প্রেমের নিবিড়তা বোঝায়। ইষ্টের প্রতি নিবেদিত প্রেমের প্রগাঢ় ও পরিপক্ব অবস্থার নামই 'রাগ'। 'রাগ দৈন্যে' এমন ভাব লক্ষণীয়। রাগের সাথে বাউলের ভাবগত সংযোগ আছে। সুফি আশেকের সঙ্গে মাশুকের যে প্রেম ও অভিমান, তাই-ই 'রাগ'। বাউলেরা তাদের সাধনপন্থাকে 'রাগের করণ' বলে অভিহিত করে থাকে।

আমার হয় না রে সে মনের মতো মন
আগে জানব কি সে রাগের করণ।

বাউলগানে কেউ কেউ শাস্ত্রীয় রাগসংগীতের প্রভাবের কথা বলেছেন।[১৩] বাউলগান মূলত ধর্মীয় লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত। শাস্ত্রীয় সংগীতের উন্মেষ ও বিকাশ লোকসংগীতের অনেক পরবর্তীকালে। আধুনিক সংগীতশিল্পীদের কণ্ঠে কখনও কখনও রাগের ব্যবহার দেখা যায়, তবে তা সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।

বাউলগান সচরাচর যেভাবে গাওয়া হয়ে থাকে, তাতে দুই প্রকার সুর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম কলি অর্থাৎ আস্থায়ীতে এক সুর, অন্য সব কলিতে সে সুর বেশকিছুটা ভিন্ন। সবশেষে পুনরায় দ্রুতগতিতে দ্বিতীয় কলির অংশবিশেষ গীত হয়ে থাকে। বাউলগানে আস্থায়ী এবং অন্তরাই প্রধান। আস্থায়ীকে কখনও ধুয়া বা মহড়া বলা হয়। আরম্ভের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সুর নেই। প্রতি অন্তরার পরে আস্থায়ী গাইতে হয়। কোনো কোনো বাউলগানে সঞ্চারী লক্ষ করা যায়। বাউলগানে, বিশেষ করে লালনের গানে দৈন্যপদে কখনও একটা টানা সুর লক্ষ করা গেলেও লালনের গান প্রায়ই দ্রুতলয়ের।

বলেছি, বাউলগানে যে নাচের প্রচলন রয়েছে তা সুফিদের 'হাল'-এর সাথে তুলনা করা চলে। কিছু কিছু বাউলগান কীর্তন-আশ্রিত। বৈষ্ণবপ্রভাবের ফলে এমনটি হয়েছে। তবে বাউলগানে সুফিভাবনাই প্রবল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিম বাংলা (ভারত) এবং বাংলাদেশের বাউলগানে সুরের পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিম বাংলায় সহজিয়া বৈষ্ণব সুরের আধিক্য, বাংলাদেশে সুফি গজলের–যার একটি দেশজরূপ : ভাব ও শব্দগান। তবে বাউলের গানে একটি

উদাসীন ভাবনা লক্ষ করা যায়। একটি বেদনার ছোঁয়া যেন তার সুরের পরতে পরতে। না-পাওয়ার বেদনা কেবলই তার কণ্ঠে বাজে।

বাউলগানের একটি বড় সম্পদ তার গায়কী বা গায়নশৈলী। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাউলগান একটি বিশেষ অঞ্চলে রচিত হলেও সংগীতশিল্পীদের কারণে অঞ্চলবিশেষের প্রভাব তার উপর পড়ে। ফলে সুর এবং গায়কীতেও আসে পরিবর্তন। কখনও কখনও শব্দেও পরিবর্তন ঘটে যায়।

অতীতে বাউল কিংবা লালনের গানে ঢালাও জাতীয় সুর ছিল, যার কোনো নির্দিষ্ট সাংগীতিক বাঁধন ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে লালনশিষ্য মনিরুদ্দিন ফকির এবং তার শিষ্য খোদা বখস্ এই গানের একটি 'ছক' বাঁধার প্রচেষ্টা নেন। খোদা বখসের শিষ্য অমূল্য শাহ একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাউল তথা লালনগীতির একটি সংগীতকাঠামো (Structure) নির্মাণ করেন বলে জানা যায় এবং তার শিষ্য বেহাল শাহ্, শুকচাঁদ, দাসী ফকিরানী, চাঁদার গহর, নিমাই শাহ, মহেন্দ্র, কানাই ক্ষ্যাপা, মতি ফকিরানী এই গানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। পরবর্তীকালে মহিম শাহ, খোদা বখ্স শাহ, ঝড়ু শাহ, করিম, বেল্লাল, ফকির চাঁদ, জোমেলা, খোরশেদ ফকির, লাইলি, তক্কেল ও ইয়াছিন শাহ্ প্রমুখ এর আরও উৎকর্ষ সাধন করেন। বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী মকছেদ আলী শাহ বাউল ও লালনগীতির আধুনিকীকরণ করেন এবং তাঁর শিষ্য ফরিদা পারভীন বর্তমানে লালনগীতির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিল্পী–বাউল ও লালন গানে নতুন মাত্রা ও সুর সংযোজন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা এসে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি প্রায় গানে বাউলের সুর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে কীভাবে তার অন্তর্ভুক্তি হলো সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি। এ সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ বলেন : 'বাংলার নিজস্ব সুর এবং ঢঙে রচিত গুরুদেবের গানের আর একটি নতুন সৃষ্টির প্রকাশ আমাদের কাছে ধরা পড়ে, যাকে আমি বলি রাবীন্দ্রিক কীর্তন বা রাবীন্দ্রিক বাউল–অর্থাৎ আচার ইত্যাদি বর্জিত, বাউলের প্রভাবযুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের জীবনে যার সূত্রপাত। সেই গান আসলে কীর্তন ও পূর্ববঙ্গের বাউলদের সুরের মিশ্রণে উদ্ভূত এক বিশেষ সুরের গান। জীবনের শেষ পর্বেই এই গান তিনি সবচেয়ে বেশি রচনা করেছেন। এই গানে বাউল ও সারি গানের মতো জলদ লয়ের ছন্দ পাব; কিন্তু তা কেবল বাউলের মতো চার বা তিন মাত্রা ছন্দ ও তালে বাঁধা নয়, এতে তেওড়া, ঝাঁপতালও স্থান পেয়েছে। কিন্তু ত্রিতাল, চৌতাল ইত্যাদি উচ্চাঙ্গসংগীতের তালগুলি একেবারেই এ গানে স্থান পায়নি।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ রচিত আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এই গানটি শিলাইদহ (কুষ্টিয়া) অঞ্চলের বাউল

গগন হরকরা রচিত এবং গীত 'আমার মনের মানুষ যে রে আমি কোথায় পাব তারে' এই সুরে গাওয়া। কিন্তু কী করে বুঝব রবীন্দ্রনাথ সেই সুরকে অবিকল ধরে রেখেছেন তাঁর গানে। তাঁর অন্যান্য গানে বাউলের যে সুরের উল্লেখ দেখতে পাই তা কি যথার্থ বাউলের সুর? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবাংলার এবং বাংলাদেশের বাউলের সুরে পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমবাংলায় সহজিয়া বৈষ্ণবসুরের আধিক্য, বাংলাদেশে সুফি গজলের–যার একটি দেশজরূপ ভাব ও শব্দ গান।[১৪] উভয় দেশের বাউলগানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাউলসুর প্রভাবিত গানের মিল পাওয়া যায় না। আমি শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষকেও এ প্রশ্ন করেছি। তিনি বলেছেন, ঢঙে এবং চরিত্রে উদাসী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ হয়তো এসব গানকে বাউল প্রভাবিত বলেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বাণীতে অনেক বাউল শব্দ এবং উপমা ব্যবহার করেছেন সত্য। কিন্তু তাঁর গান তাঁর নিজস্ব সুরের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত গানে বিদেশী সুরের প্রভাব রয়েছে বলে জানা যায় তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না।

এমনিভাবে নজরুলের অনেক গান বাউলসুর প্রভাবিত বলে আমরা জেনে আসছি। এখানেও সেই একই সমস্যা। হাজার বছর আগে চর্যাপদে কী সুর ব্যবহৃত হতো, তা আমাদের জানা নেই। কোনো কোনো পদে রাগরাগিণীর কথা বলা হয়েছে সত্য, কিন্তু তার চেহারা বুঝবার উপায় এখন আর নেই। এভাবেই আমাদের লোকসংগীতের অনেক সুর হারিয়ে গেছে। এ কারণে 'আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সংস্থা' যার বর্তমান নাম 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ট্রাডিশনাল মিউজিক'—লোকসংগীত সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের দেশে লোকসংগীত সংরক্ষণের জন্য কোনো আর্কাইভস নির্মিত হয়নি। তথাপি বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ বেতার-এর ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস তাদের সীমিত সম্পদ নিয়ে এসব গানের সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিচ্ছেন—তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। লোকসংগীতের গবেষকবৃন্দ এসব লোকসংগীতের তুলনামূলক পাঠ প্রণয়ন করলে অনেক উপকার হবে। আমাদের দেশের স্বরলিপি প্রণয়ন পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকায় সবসময়ে আদিসুর ধরা সম্ভব হয় না, এজন্য Staff notation পদ্ধতি উপকারে আসতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাউলগান মূলত বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সংগীত। বৃহত্তর কুষ্টিয়া এবং যশোর জেলায় এ সংগীতের উদ্ভব এবং বিকাশ। এ অঞ্চলে নদীর সংখ্যা তেমন বেশি নয়। পদ্মা নদী কুষ্টিয়ার পাশ দিয়ে বয়ে গেলেও প্রমত্ত পদ্মার সর্বগ্রাসী রূপের পরিচয় এখানে নেই। নদীর প্রকৃতি শান্ত। বৃষ্টির পরিমাণও স্বল্প। প্রকৃতি অনেকটা রুক্ষ। সূর্যের প্রখরতা তীব্র। কিন্তু সন্ধ্যায় প্রকৃতির আরেক রূপ। আকাশ এবং মাটিতে তখন উদাসী হাওয়ার পরশ।

কুষ্টিয়ার পশ্চিমপাড়ে পশ্চিম বাংলার নদীয়া। চৈতন্যদেবের প্রভাবে সেখানে বৈষ্ণব এবং কীর্তনসংগীতের সৃষ্টি। এ অঞ্চলে বাউল আছে এবং তারা বৈষ্ণবাশ্রিত। 'সহজিয়া' ভাবনা তাদের গানে মুখ্য। কুষ্টিয়া অঞ্চলে তাই সুর এবং দর্শনের অনুবর্তন ঘটেছে। তবে মুসলিমপ্রধান অঞ্চল হওয়ায় এবং সুফি ফকিরদের প্রভাবে গানে সুফিপ্রভাব বেশি লক্ষণীয়। এতদঞ্চলে সিরাজ সাঁই, লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই, বিজয় সরকার, ইদু বিশ্বাস, প্রভৃতি সাধককবি ও সংগীতরচয়িতাদের জন্ম এবং চারণক্ষেত্র হওয়ায় ভাবসংগীত যা বাউলশব্দ এবং বিচার নামে পরিচিত ছিল, তার বিকাশ সাধিত হয়।

বাউলগানের ঘরানা আছে। অবশ্য এই 'ঘরানা' শাস্ত্রীয় সংগীতের নিয়ম বা রীতি অনুযায়ী হয়নি। এই ঘরানা সাধনভজন সংক্রান্ত। বাউলগানের ঘরানার সংখ্যা পাঁচ। লালনশাহী, পাঞ্জুশাহী, দেলবার শাহী, উজল শাহ চৌধুরী এবং পাঁচু শাহী। পাঁচু শাহ পশ্চিমবাংলার ঘোষপাড়ার সতীমায়ের 'ঘরানা'। মানিকগঞ্জের ঝিটকা নিবাসী দেওয়ান রশীদের একটা বিশেষ ঘরানা আছে। এই 'ঘরানা'য় মারফতি এবং মুর্শিদা গানের প্রাধান্য। মহিম শাহ এই ঘরানার অনুসারী। বাউলগানে নানা তত্ত্বকথা আছে। যেমন : দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরু বা মুর্শিদতত্ত্ব অথবা নবীতত্ত্ব, লীলা অথবা মনের মানুষতত্ত্ব। প্রতি গানে দুটি পদ : দেহতত্ত্ব এবং ভজনতত্ত্ব। বাউলেরা নিজেদের ভাষায় একে উপর পদ এবং নিচের পদ বলে উল্লেখ করে থাকে। বাউলগানের সুরে কেউ কেউ ভাটিয়ালি সুরের পরিচয় পেয়েছেন–এর কারণ এই গান অনেক সময় মাঝি-মাল্লারাও নৌকা বাইতে বাইতে ধীরলয়ে গেয়ে থাকে। বাউলগানের বড় কৃতিত্ব, এই গান কেবল সাধকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সাধারণ মানুষ বাউলের সাধনভজন না-জেনেও অধ্যাত্মরসের জন্য এই গান নিজের করে নিয়েছে।

বাংলাদেশের এই লোকসংগীত লোকধর্মনির্ভর হওয়ায় সংগীতের বিষয়ও দেহতত্ত্ব।[১৫] কিন্তু অঞ্চলভেদে এই দেহতত্ত্বমূলক লোকসংগীতের নামকরণ হয়েছে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত মানস-সংগঠনের প্রভাবে। ফলে পল্লী অঞ্চলের ভাবসংগীত এবং বাউলগান উত্তরাঞ্চলে হয়েছে ভাওয়াইয়া, পূর্বাঞ্চলে মুর্শিদী, মারফতি এবং ভাটি অঞ্চলে ভাটিয়ালি। ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালি গানকে অধিকাংশ সংগীতবিশেষজ্ঞ ধর্মনিরপেক্ষ এবং জীবননির্ভর লোকসংগীত হিসেবেই গণ্য করেছেন। শ্রমজীবী মানুষ ঘর ছেড়ে দূরদেশে গমন করে। বাহন তাদের নৌকা, কিংবা গরু অথবা মহিষচালিত গাড়ি। ধীরগতিতে চলার সময়ে বাতাসের আর্দ্রতায় মন হয়ে ওঠে উদাসী। পুরুষের মন আপাতকঠিন মনে হলেও তা নিতান্তই কোমল এবং পেলব। কিন্তু পৌরুষের কারণে সে নিজের হৃদয়ের ভাবকে ঢেকে রাখতে চায়। তাই নিজের হৃদয়ের ভাবকে নারীমনের

আর্তিতে প্রকাশ করাই সে সংগত মনে করেছে। অবশ্য সাধন-ভজনে পুরুষকেও নারীরূপে ভক্তি নিবেদন করতে হয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে লোকসংগীত মূলত পুরুষের সৃষ্টি। তাই সে তার নিজের জীবনের ব্যথা-বেদনাকে একটি নারীমনের আড়ালে ব্যক্ত করে।

উত্তরাঞ্চলের ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে সৃষ্ট ভাওয়াইয়া গানে পশ্চিমাঞ্চলের ভাবসংগীতের মতো দেহতত্ত্ব উপজীব্য হলেও প্রেক্ষিত এবং মানস সংগঠন ভিন্ন। ভাওয়াইয়াকে পশ্চিমাঞ্চলের ভাবসংগীতের সমগোত্রীয় বলার কারণ, ভাব শব্দের প্রাকৃত রূপ ভাও এবং রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে ভাবকে 'ভাওয়াইয়া' বলা হয়ে থাকে।[১৬] কোনো কোনো লেখক 'বাউদিয়া' শব্দ থেকে ভাওয়াইয়ার উৎপত্তি বলে মনে করেছেন। বাউদিয়া শব্দের অর্থ ইতস্তত ভ্রমণকারী, প্রেমে পাগল বা খ্যাপাটে ধরনের লোক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদেরকে বাউলের মতো সাধনসম্প্রদায় হিসেবেও অনেকে চিহ্নিত করেছেন। বাউলগানের মধ্যে মনের মানুষের প্রতি যে গভীর প্রেম এবং তাকে না পাওয়ার যে আকুল আর্তি এবং বিরহবোধ সাধকের মনে জেগে থাকে, ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেও সেই একই ভাবনার অনুরণন। বাউলগানে 'গুরু' 'সাঁই', 'মুর্শিদ' 'দয়াল' 'বন্ধু' ইত্যাদি আধ্যাত্মিক চেতনাযুক্ত শব্দ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে; ভাওয়াইয়াতে 'গাড়িয়াল ভাই', 'মৈশাল বন্ধু', 'পতিধন' প্রভৃতি শব্দের তেমন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবে বাউলগানের চরণে যেমন সাধন-ভজনের কথা স্পষ্ট, ভাওয়াইয়া গানে তা প্রত্যক্ষ নয়। বাউল এবং ভাওয়াইয়া উভয় গানেই শৃঙ্গার রস এবং আরাধ্যের প্রতি বিরহ ব্যাকুলতা লক্ষণীয়। উভয় গানের ভিতর উদাসী ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এবং ভাষা ব্যবহার দ্ব্যর্থবোধক। তবে বাউলগানে দেহবাদ প্রত্যক্ষ হওয়ায় উপমা এবং প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ যেমন দেহসাধনা নির্দেশক, ভাওয়াইয়া গানে তা অপ্রত্যক্ষ হওয়ায় উপমা এবং প্রতীকী শব্দ নর-নারীর যুগলজীবনের প্রেম-বিরহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এ কারণেই অধিকাংশ সংগীত-গবেষক ভাওয়াইয়া গানকে জীবননির্ভর সংগীত হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু মূলত এ গান যৌননির্ভর, দেহতত্ত্বমূলক। যেমন :

১

ওকি কানাই রে
আটো নদীর খরধার
মইধ্যে মইধ্যে কানাই বালুচর
আঙ্গুল হাতে শক্ত করি ধরিও
নাইয়ে হাইলারে
সোন্দর কানাই

২

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়া রে
যে দিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর কুইরা খায় রে
ওকি গাড়িয়াল ভাই
হাঁকাও গাড়ি তুই চিলমারীর বন্দরে।

ভাওয়াইয়া গান আঞ্চলিক। কিন্তু বাউলগান যেমন বিশেষ একটি সাধন-ভজন সম্প্রদায়ের গান হিসেবে চিহ্নিত, ভাওয়াইয়া গান তা নয়। আদিবাসী রাজবংশীদের মধ্যে এ গানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তবে এ গানের পাঠ বিশ্লেষণ করলে দেহসাধনার বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিধায় কেবল সাধারণ জীবনবাদী সংগীত হিসেবে তা গ্রহণে আপত্তি হতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন, আমাদের দেশে লোকসংগীত বিশ্লেষণ করলে তা যে মূলত দেহনির্ভর তা প্রতীয়মান হয়। অতীতে মানুষ তার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে লোকসংগীতকেই বাহন করেছিল। পাশ্চাত্য সংগীত-গবেষক ও নৃতত্ত্ববিদ এলান পি মেরিয়াম বলেন :

> The song text is the key to how the folk community feels about its most intense concerns... We are drawing closer and closer to the point of view that song text clearly reflect the culture of which they are a part.[১৭]

ইতিহাসপাঠে আমরা জানি, উত্তরবঙ্গে এবং সিলেট অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ছিল। সিলেটে সুফিসাধনার প্রভাব ব্যাপক থাকায় সিলেটে যেসব বাউলগান পাওয়া যায়, তা সুফিপ্রভাবিত, যদিও বৈষ্ণবাশ্রিত পদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। রংপুর অঞ্চলেও বাউল শব্দের মতো ভাওয়াইয়া গানেও রাধা, কৃষ্ণ, কানাই এবং চৈতন্য লৌকিকচেতনা নির্দেশক। তবে সব ভাওয়াইয়া গান দেহতত্ত্বমূলক—এমন বলা যাবে না। ভাওয়াইয়া যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম বিকাশ লাভ করে তা রাজবংশী জনগোষ্ঠী। অতঃপর রংপুর দিনাজপুরের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সংগীতের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাদের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রায় সুখ-দুঃখ, এতদঞ্চলের ভাষা, সবকিছু ভাওয়াইয়ার মধ্যে রূপ পেয়েছে। বলা যেতে পারে, এতদঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণ ভাওয়াইয়া গান। ভাওয়াইয়া গানকে দোতারা গানও বলা হয়। কারণ দোতারা এই গানের প্রধান লোকবাদ্য যন্ত্র। ভাওয়াইয়া গান, বাউল এবং ভাটিয়ালির মতো অন্যত্র বিস্তার লাভ করার কারণ, এর গায়নশৈলী। ভাওয়াইয়ার উচ্চারণভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণ আঞ্চলিক ঐতিহ্যানুগ এবং উপভাষা প্রভাবিত। এই গানের গীতি-রীতির

ঐতিহ্যের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই বা কম, তাদের পক্ষে এ গান গাওয়া রীতিমতো কষ্টকর। এই গানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগই নয়–ভাষার উচ্চারণ নিখুঁত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কথার মাঝে এবং শেষে স্বরভঙ্গ বা গলাভাঙা অবস্থায় 'হ' উচ্চারণ এ গানের গায়নশৈলীতে অপরিহার্য।

ভাওয়াইয়া গানের সংগীতধারা এবং সুরের প্রয়োগ অতীতে কেমন ছিল এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে কেউ কেউ এই সংগীতধারায় কালীপূজার গান, ষাইটোলপূজার গান, তিস্তাবুড়ির গান, গোরক্ষ গানের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। এই গানগুলো অধিকাংশ চারস্বর বা পাঁচস্বর বিশিষ্ট। ভাওয়াইয়া গান অতীতে সা রে গা মা এই চারস্বর সমন্বয়ে গাওয়া হতো এমন ধারণা করা যায়। তবে বর্তমানে এই গান সা রে গা মা পা ধা নি এই সাত স্বরবিশিষ্ট সুর এবং এর ছয়টি স্বর শুদ্ধ এবং একটি কোমল স্বর 'ণি'। শুদ্ধ 'নি'-এর ব্যবহার ভাওয়াইতে নেই বলে সংগীতজ্ঞদের ধারণা। ভাওয়াইয়ার সঙ্গে চটকা গানের একটি মিল রয়েছে, যেমনটি আছে বাউল এবং ভাবগানের গানের সঙ্গে ভাওয়াইয়া শব্দ গানের। সংগীতজ্ঞদের ধারণা, যখন দ্রুতছন্দে গাওয়া হয় তখন তা চটকায় পরিণতি লাভ করে। ভাওয়াইয়া গানের তাল সাধারণত বারো মাত্রাবিশিষ্ট। ভাওয়াইয়ার অনেক গানে তিন মাত্রা ব্যবহার হলেও দাদরা তালের দ্রুত ছন্দই বেশি ব্যবহৃত। অনেকেই এ গানের তাল মধ্যলয়ের কাহারবা সমগোত্রীয় বলে ধারণা করেন। গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে দোতারা, সারিন্দা, খোল, করতাল, ঘুঙুর, মন্দিরা, কখনও বাঁশির ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে হারমোনিয়াম এবং সানাই-এর বিশেষ ব্যবহার রয়েছে এ গানে।

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সব বাউলগানেই যে একটি নির্দিষ্ট তাল অনুসরণ করা হয়েছে তা নয়। অনেক সময় দাদরা তাল পরিবর্তন করে অন্য তালেও গাওয়া হয়ে থাকে। এটা নির্ভর করে গায়নশৈলীর উপর। লোকসংগীতে এই পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক। 'এক ধামা চাল একটা পটল'–সংগীতের এই লোকজ ভাষা তাল হিসেবে একদিন ঢোলকে ব্যবহৃত হয়েছিল। আজ সেই তালই আধুনিককালে নবরূপে মূল্যায়িত হচ্ছে। আমি অনেক বাউল গায়কের সাথে আলোচনা করেছি, সুর এবং তাল সম্পর্কে তাদের অসাধারণ জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞানের উৎস তাদের লোকজ পরিমণ্ডল। মনে হয় এই কারণে চর্যাপদে একদিন যে তাল বা রাগ ব্যবহৃত হয়েছিল তার মধ্যে একটি রাগের নাম ছিল 'বঙ্গাল'। সেই রাগ কেমন ছিল আজ তা জানার কোনো পথ নেই। বাউলদের গানের মধ্যে যে রাগ ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কোনো কোনো পদে রাগ দৈন্য, রাগ প্রবর্ত ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখেছি। এ সবকিছুই সাধকের নিজস্ব। একে ভিত্তি করেই আমাদের সংগীতের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। নিম্নে বাউলগানে ব্যবহৃত কিছু তালের পরিচয় দেওয়া হলো।

বাউলগানের তাল

দাদরা (ছয় মাত্রা)

II ১ ২ ৩ I ৪ ৫ ৬ II ১ ২ ৩ I ৪ ৫ ৬ II

কাহারবা (আট মাত্রা)

II ১ ২ ৩ ৪ I ৫ ৬ ৭ ৮ II ১ ২ ৩ ৪ I ৫ ৬ ৭ ৮ II

একতাল / ঝুমুর (বারো মাত্রা)

II ১ ২ I ৩ ৪ I ৫ ৬ I ৭ ৮ I ৯ ১০ I ১১ ১২ II

অথবা

II ১ ২ ৩ I ৪ ৫ ৬ I ৭ ৮ ৯ I ১০ ১১ ১২ II

ঝাঁপতাল (দশ মাত্রা)

II ১ ২ I ৩ ৪ ৫ I ৬ ৭ I ৮ ৯ ১০ II

চৌতাল (বারো মাত্রা)

II ১ ২ I ৩ ৪ I ৫ ৬ I ৭ ৮ I ৯ ১০ I ১১ ১২ II

ত্রিতাল (১৬ মাত্রা)

II ১ ২ ৩ ৪ I ৫ ৬ ৭ ৮ I ৯ ১০ ১১ ১২ I ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ II

এছাড়াও বাউলগান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তালে গাওয়া যায়।

ভাওয়াইয়া গানের গ্রামীণ শিল্পী বা লোকশিল্পীদের নাম আমার জানা নেই। এ গান প্রধানত আব্বাসউদ্দিনই জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর সহোদর 'আব্দুল করীম' এ বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেন। অতঃপর তাঁর সুযোগ্য পুত্র এবং কন্যা মোস্তফা জামান আব্বাসী এবং ফেরদৌসী রহমান এ গানের উৎকর্ষ সাধন করেন। অন্যদের মধ্যে হরলাল রায়, রথীন রায়, নাদিরা প্রমুখ এ গানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তবে এঁরা সকলেই শিক্ষিত শিল্পী। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে এ গানের গায়কী বা গায়নশৈলী কেমন ছিল তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

ভাটিয়ালি গানকে সংগীতবিশেষজ্ঞগণ ধর্মনিরপেক্ষ বা জীবননির্ভর, মানবিক ভাবনানুগ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ গানগুলো বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে দেহতত্ত্বের কথাই লক্ষ্য করা যায় এবং তা অনেকাংশে বাউল ভাবনার সহগোত্রীয়। যেমন :

১

ভরা গাঙ্গের কলকাকলী
মাঝি উথাল পাতাল ঢেউ
সাবধানে চালাইও মাঝি
সাথি নাইকো কেও ॥

ঈশান কোণে মেঘ উইঠ্যাছে
মাঝি হারাইও না ধ্যানতীর
ঝোঁকে ঝোঁকে বাইয়া চল
পরান রাইখ্যা থির ॥
আগা পাছা ঠিক রাখিয়া
মাঝি সাবধানেতে চল
মাঝ দরিয়ায় উঠলে তুফান
মাঝি বদর বদর বল ॥

২

ও ঢেউ খেলে রে
ঝিলমিল সায়রে ও ঢেউ খেলে
ঢেউএ আড়ি ঢেউএর পাড়ি
ঢেউএর কারখানা
সেই ঢেউ চিনিয়া ধইরো পাড়ি
ও মন মাঝি কালা ॥

৩

কোন্‌খানে যাও বইয়া রে নদী
কোন্‌খানে যাও বইয়া
কই থাকিয়া আইলা রে নদী
কিসের লাগিয়া ॥
উজান বাঁকে থাকে রে বন্ধু
ভাইটাল বাঁকে ঘর
আইতে যাইতে আপন হইছে
চোখে দেখার পর।
সেই না বন্ধু রইছে আপন হইয়া ॥
উজান-ভাটি সদাই তুমি বন্ধুর দেখা পাও
যাইও তুমি আমার কথা কইয়া ॥

ভাওয়াইয়া গানের মতো ভাটিয়ালি গানেও নর-নারীর প্রেম ও বিরহের কথা উল্লিখিত হয়েছে সত্য, কিছু সূক্ষ্মভাবে তা দেহতত্ত্ব বা নর-নারীর যুগলমিলন নির্দেশক, যা দেহসাধনার অঙ্গ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশের লোকসংগীতে দেহসাধনার কথা যে অনিবার্যভাবে এসেছে তা যে বিশেষ কোনো লোকধর্মের অনুসারী হবার জন্য, তা নয়। সাধারণ মানুষের জীবনে যেমন যৌনজীবন তার সকল আনন্দের এবং চিত্তবিনোদনের বাহক, লোকসংগীতে গীতিকারেরা তেমন দেহতত্ত্বমূলক গান রচনা করে সাধারণ মানুষের মনকে

পরিতৃপ্ত করেছে। বাউলগানের পাশাপাশি বিচার, শব্দগান, কোনো সাধনার অনুসারী সংগীত না হয়ে অনেক দেহতত্ত্বের গান যেমন তার ভিতর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; ভাটিয়ালি এবং ভাওয়াইয়াতেও আমরা তা দেখি। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, ভাটিয়ালি যে পূর্বাঞ্চলের গান, তা নয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ। দক্ষিণাঞ্চলে এ গানের প্রচলনও বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ভাটিয়ালি গানে বিরহের তথা করুণ রসের আধিক্য। সুতরাং সুরের মধ্যে কোমল এবং করুণ রসের প্রকাশ দেখা যায়। মাঝি যখন ভাটিতে নৌকা বায়, তখন তার শারীরিক পরিশ্রম তেমন হয় না। নদী এবং বাতাসের গতিতে থাকে মন্থরতা এবং কোমলতা।

ভাটিয়ালি সুরেও তাই বিলম্বিত লয় এবং ঢিমা তালের ব্যবহার দেখি। এ গানের আরোহণে কোমল নিখাদের প্রয়োগ বেশি এবং অবরোহণের কোমল শুদ্ধ নিখাদ ব্যবহার হয়ে থাকে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাটিয়ালি গানকে বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে প্রাচীনতম বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮] শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, ভাটিয়ালিকে আশ্রয় করে বাংলাদেশের প্রায় সকল লোকসংগীত বিশেষ করে বাউল, মুর্শিদী, মারফতি, দেহতত্ত্ব, কীর্তন ইত্যাদি আনুপূর্বিক রচিত হয়েছে। তাঁর মতে, ভাটিয়ালি সুর নানাদিক দিয়ে মার্জিত ও পরিবর্তন করে বিভিন্ন পল্লীগীতির সুর জন্মলাভ করেছে। তিনি ভাটিয়ালিকে বাংলার শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি বুনিয়াদি (basic) সুর বলে অভিহিত করেছেন। ভাটিয়ালি গান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই গান মূলত কোনো বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গীত হয় না। কেবল সুর এর মুখ্য অবলম্বন এবং এর সঙ্গে নৃত্য এবং অন্য কোনো তাল রক্ষা করার প্রয়োজন না-হওয়ায় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত এই গান গীত হয়। ভাটিয়ালি গানের সুর সম্বন্ধে তাঁর অভিমত এই যে, এই গানের প্রথম পদটির কয়েকটি শব্দ একসঙ্গে গীত হবার পর এর সর্বশেষ স্বরটি দীর্ঘায়িত হয়ে উচ্চারিত হতে থাকে। এই দৈর্ঘ্যের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই, গায়কের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এ গানের সুর যে কোনো সীমায় গিয়ে পৌঁছুতে পারে। প্রারম্ভে পদটি সর্বাপেক্ষা চড়া সুরে উচ্চারিত হবার পর পরবর্তী পদগুলির ভিতর দিয়ে তা কখনও ক্রমান্বয়ে অথবা আকস্মিকভাবে খাদে নেমে আসে। তিনি ভাটিয়ালি গানে সাতটি স্বরের প্রয়োগ আছে বলে মনে করেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এই গানটিকে ভাটিয়ালি ঢঙের বাউলগান বলে চিহ্নিত করেছেন।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাউল এবং ভাটিয়ালি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বাউলগানের কোনো নিজস্ব এবং নির্দিষ্ট সুর নেই। বাংলাদেশের এই গান ভাটিয়ালি এবং সারি, পশ্চিমবাংলায় ঝুমুর এবং কীর্তনের সুরে গীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাউলের সুর বলতে ভাটিয়ালি এবং সারি।[১৯]

সনৎকুমার বসুও বাউলগানকে ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়ার সমগোত্রীয় বলে ভেবেছেন। তাঁর মতে : "the tunes in eastern district Bengal have semblances of Bhatiali of the northern region of Bhawiya"[২০] প্রফেসর কুকার্জ তাঁর একটি প্রবন্ধে বাউলগানের সুরকে ভাটিয়ালি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি পশ্চিম বাংলার বীরভূমে ক্ষেত্রগবেষণায় শিবরাম গিরি এবং অন্য বাউলদের গান শুনবার পর বাংলাদেশের দুটি গানের রেকর্ডে ধারণকৃত সুরের সঙ্গে তুলনা করে উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন :

> Two pieces of Eastern Bengal, now called Bangladesh, complete this brief presentation. The first is a Bhatiyali, i. e. a song of boatmen, usually sung when they are on the river, but also when they are going out into meadows or fields. ... As can be seen from transcription 6, the peculiarity of the Bhatiyali melody lies in the opening figure with its long stretched line rising upto B flat whereas the second part of the melody reaches the octave in a way similar to that of the Folk songs—and the Baul song—from West Bengal. Transcription 7 shows that typical figure of Bhatiyali serves as a model for the construction of the beginning figure in Baul songs of Eastern Bengal. Moreover this figure takes here the same postition as does the figure within the lower fifth in the Baul songs of West Bengal.[২১]

চার্লস ক্যাপাওয়েল, তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *The Music of the Bauls of Bengal*-এ বাউলগানকে বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকসংগীত এবং এই গান 'ভাওয়াইয়া' এবং 'ভাটিয়ালি' গানের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

> Two other types of Folk song in Bengal, `bhaoyaiya' and 'bhatiyali' which are closely related to 'Baul-gan' in musical style, are ideally performed, like 'Baul-gan' in isolated setting. Bhaoyaiya, according to the Folklorist Chittoranjan Dev (1966, 197 f.f.) is the types of song performed by a group of people in North Bengal known as 'baudiya' who lead lives similar to those of the Bauls, but without their religion of initiation... 'Bhatiyali' are

> the songs sung by East Bengal boatmen on rivers so broad that one loses sight of the shore and all of them may have religious interpretations as a sectarian view point. They are called 'dharmosongith' in contrast to the otherwise similar 'bhaoyaiya' and 'bhatiyali.[২২]

উপর্যুক্ত আলোচনায়, চার্লস ক্যাপওয়েল 'ভাওয়াইয়া' এবং ভাটিয়ালিকে এক গোত্রীভুক্ত করলেও বাউলগানের সঙ্গে ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালি গানের কিছু পার্থক্যের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন।

তবে এই তিন শ্রেণীর গানের তিনি একে-অপরের মধ্যে সাযুজ্য এবং সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। এই সাযুজ্য অনেকটাই তাদের গায়নশৈলী সম্পর্কিত। কিন্তু বাউল, ভাটিয়ালি এবং ভাওয়াইয়া গানের সুরের কোনো মিল বা পার্থক্য আছে কি না এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি। ক্যাপওয়েল তাঁর গবেষণাগ্রন্থে পশ্চিম বাংলার বাউলদের সম্পর্কেই আলোকপাত করেছেন।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যসহ উপর্যুক্ত পণ্ডিতদের এই মত যে গ্রহণযোগ্য নয় তা বাউলগানের সুর পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় এবং বাউলগানের যে নিজস্ব সুর আছে সে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বলেছি। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বাংলার নদী, মাটি এবং প্রকৃতি আমাদের সংস্কৃতিকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি এই মাটি থেকে সৃষ্ট গান এবং সুরে তার প্রভাব থাকবেই। সেই অর্থে ভাটিয়ালি এবং সারির প্রভাব বাউলসুরে লক্ষ করা যেতে পারে; তবে তাই বলে বাংলাদেশের বাউলসুর যে কেবল ভাটিয়ালি এবং সারিগানের সুর সহযোগে নির্মিত হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, বাংলায় কীর্তন এবং টপ্পার সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাটিয়ালি গানের আশ্চর্যজনক ঐক্য রয়েছে।[২৩] এমন হতে পারে। তবে একটি বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণের সঙ্গে ঐকমত্য স্থাপন করা যায় তা হলো, ভাটিয়ালি এবং বাউলগান একটি বিশেষ অর্থে একক সৃষ্টি। নদীতে নৌকার মাঝি একা এক গান গেয়ে ফেরে আপন মনে। তার গানের কোনো শ্রোতা আছে কি না, তা সে লক্ষ করে না। বাউলসাধকও তেমনি তার সাধনায় আত্মনিমগ্ন থেকে একা একা একতারা বাজিয়ে গান করে থাকে। সাধারণত আখড়ায় তাই-ই হয়ে থাকে। এখানে গায়ক সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু এইটি যে সব নয়, তা আমরা বলেছি।

বাউল এবং ভাটিয়ালি গান আজ শিক্ষিত শিল্পীদের সামগ্রী। আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে এ গান জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে আব্দুল আলীম সেই ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। বর্তমানে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি এবং বাউলগান শিক্ষিত গীতিকারেরাও

রচনা করেছেন। সুতরাং লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্যের সাথে তার মিল আজ না পাওয়া গেলেও শত বছর পর এ গান আমাদের ঐতিহ্যের সম্পদ হবে বিধায় তা লোকসংগীত হিসেবে গ্রহণ করতে তখন আর কারো আপত্তি হবে না—এ কথা মনে রেখেই হয়তো আন্তর্জাতিক লোকসংগীত বিশেষজ্ঞগণ ফোক মিউজিক-এর পাশে ট্রাডিশনাল মিউজিক কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

এই সীমিত পরিসরে বাংলাদেশের লোকসংগীতের ব্যাপক আলোচনা সম্ভব নয়। আমার এ আলোচনায় যে বিষয়টির বিশদ আলোচনা সম্ভব হলো না, তা বাংলাদেশের লোকসংগীতের মাধ্যমে আমাদের জাতিতত্ত্বের ইতিহাস। বাংলাদেশের লোকসংগীত বাংলাদেশের মানুষের জীবনদর্শন। এই লোকসংগীতের মধ্যেই আমাদের জাতির পরিচয়চিহ্ন রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি আমাদের লোকসংগীত। এই লোকসংগীতের মধ্যে আমাদের জাতি পরিচয় চিহ্ন রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি আমাদের লোকসংগীত। এই লোকসংগীতের মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির যে রূপায়ণ দেখি তা একান্ত মিশ্র সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতি হিন্দু মুসলিম উভয়েরই নিজস্ব সম্পদ। বাউলগানে এই স্রংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় রয়েছে।

আমাদের লোকসংগীত পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই এদেশের মানুষের মনের গতিবিধি, তার আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা যেতে পারে। নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণরীতির মাধ্যমে আমাদের লোকসংগীতের বিকাশ ও বিস্তারের পটভূমি আলোচনা অতীব প্রয়োজন। লোকসংগীতের বিশ্লেষণে নৃবিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন জাতি হিসেবে আমাদের অবস্থান সম্পর্কেও ধারণা দেবে। কারণ লোকসংগীতই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং বর্তমানে আমাদের চেতনা ও ধ্যান-ধারণার সুস্পষ্ট নির্দেশক।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সংগৃহীত লোকসংগীত সংকলন *'হারামণি'র ভূমিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১৪শ খণ্ড (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১), পৃষ্ঠা ৯৬২-৯৬৩।

২. অমর পাল ও দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসঙ্গীত* (কলকাতা, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা. ৭ 'ভূমিকা'।

৩. R.P. Elbourne 'The Questions of Definition'. JIFMC Vol. 7. 1975, Ontario, Canada.

৪.৫. আনোয়ারুল করীম, লালনের গান (কুষ্টিয়া : লালন একাডেমি, ১৯৮৪) পৃষ্ঠা ১৬-১৯। বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা এবং ফরিদপুর অঞ্চলে বাউলগানকে ভাগবান এবং দেহতত্ত্বমূলক অন্যান্য গানকে শব্দ, ধুয়া, বিচার নামে অভিহিত করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে 'বাউলগান' এই নামেও চিহ্নিত হয়ে আসছে।

৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪) পৃষ্ঠা ১২৬।

৭. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৭৮।

৮. আমাদের আলোচ্য বাউলগান ও লালনগীতিতে আমীর খসরু প্রবর্তিত সুফি সংগীত 'কাউল' যা 'সামা' নামেও চিহ্নিত, তার প্রভাব আছে। "Amir Khasru was said to have sung Qaul in the khanqa (seat of the saint) of Shaikh Nizamuddin" : M.N. Mostafa, Our Music. A historical study (Chitagong. 1977) pp. 99-100. 'বাউল' শব্দ থেকে কাউল শব্দের উদ্ভব হতে পারে কিনা এ সম্পর্কে নিবন্ধকার মনে করেন যে অনেক সময়ে অল্পবিস্তর অপরিচিত শব্দ ধ্বনিসাম্যের সুযোগে বিকৃত হয়ে নতুন শব্দের সৃষ্টি করে। এই শব্দবিকৃতিকে ব্যাকরণের ভাষায় লোকনিরুক্তি (folk etymology) নামে চিহ্নিত করা হয়। এমনিভাবে সুফি বা'আল শব্দ থেকে বাওল>বাউল>বাউলিয়া অথবা অনুকার অভ্যয়ের প্রভাবে বাউলিয়া বাউল কিংবা 'আউল বাউল' শব্দে পরিণত হতে পারে। গানের ক্ষেত্রে 'বাউল' শব্দটির বিকৃত রূপ 'কাউল' হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে যখন বাউলগানের প্রকৃতি কাউলগানের অনুরূপ। অবশ্য বাউলসাধকেরা বাউল শব্দের উৎপত্তিমূল বায়ু + উল প্রত্যয়যোগে বাউল বলে উল্লেখ করে থাকে। কেননা বাউল সাধনায় বায়ু (হাওয়া) বা 'দম'-এর প্রয়োগ অনিবার্য। কারণ এ সাধনা মূলত দেহকেন্দ্রিক হওয়ায় তন্ত্র, যোগ এবং সুফি প্রভাবিত। লালন ফকির এই সাধনার একটি পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

হাওয়া ধরো
অগ্নিস্থির করো
মরিলেও বাঁচিত পারো ॥

দ্রষ্টব্য : আনোয়ারুল করীম, বাউল একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস। Also see, Anwarul Karim, the Bauls of Bangladesh (Kushtia : Lalon Academy, 1980)

৯. আনোয়ারুল করীম, *লালনের গান*, পৃষ্ঠা ২৪। দৈন্যপদ গুরুভক্তিমূলক। বাউলসাধনায় গুরুই প্রধান। এই গুরু বা মুর্শিদের প্রকারভেদ আছে। প্রবর্ত, সাধন-ভজনের পদ। এসব পদে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের কথা আলোচিত হয় যা কেবল সাধনায় যারা রত থাকে তাদের জন্য প্রযোজ্য।

১০. Gurusaday Dutt, The Folk Dances of Bengal (Calcutta, 1954). p. 43, "Baul dancing and singing are not associated with any

particular occasion or festivity and are performed as an act of joyous spiritual self expression of the part of the Baul and also as an act of spiritual educational on the community ...Baul songs are often sung with the singer seated without any dance accompaniment." Also see, Anwarul Karim, 'Folk Dance of Bangladesh, Journal of the Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, Vol 3 1980.

১১. Muhamad Enamul Haq, *Impact of Islam on the Gaudian from of Vaisnavism*, JASP, Vol VIII, no. 2, Aug.

১২. শান্তিদেব ঘোষ, *গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য* (কলকাতা, ১৮৮১ শতাব্দ) পৃষ্ঠা ৪৭-৫০

১৩. শান্তিদেব ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭

১৪. আনোয়ারুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬-১৯

১৫. খালেদ হাসান, *ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া*; পাকিস্তানের লোকগীতি (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬)
'ভাওয়াইয়া গান মূলত ভাবগান হলেও এসব গানে সমসাময়িক চিত্র বা সামাজিক অবস্থা ফুটে উঠেছে।... সাংসারিক জীবনের সমগ্র খুঁটিনাটি নিয়ে রচিত হয়েছে নানা গান।' দ্রষ্টব্য, শিবশংকর মুখোপাধ্যায়, 'ভাওয়াইয়া গানের সাংস্কৃতিক ভূগোল,' লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (সম্পাদক, সনৎ কুমার মিত্র) শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯, পৃষ্ঠা ১২৪-১৩৩। 'ভাওয়াইয়া গান প্রধানত নায়ক-নায়িকার প্রেম-সম্বন্ধীয় ও আদি ও করুণ রসপূর্ণ। অধিকাংশ ভাওয়াইয়া গানই নায়ক-নায়িকার বিরহ-বেদনার কাহিনী এবং নিরাশার হা-হুতাশ ও তপ্তশ্বাসে পূর্ণ। দ্রষ্টব্য, শিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মণ্ডল, 'কুচবিহারী পল্লী সঙ্গীত', লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, পৃষ্ঠা ১৬২

১৭. Allan P. Merrium, *The Anthropology of Music*: দ্রষ্টব্য লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ১১৯

১৮. খালেদ হাসান, *ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া*, পৃষ্ঠা ৮৭

১৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি রত্নাকর*, (কলকাতা, ১৯৬৭), পৃষ্ঠা ১৫৮৫

২০. Sanat Kumer Bose, "Baul songs of Bengal", *Folkmusic and Folklore, An Anthology*, (Calcutta, 1967) Vol. I, p. 54

২১. Josef Kucrkertz, *Origin and Construction of the Melodies in Baul songs of Bengal*, Yearbook of the International Folkmusic Council, 1975, Ontario, Canada, P. 80-87

২২. Charles Capwell, *The music of the Bauls of Bengal*, The kent State University Press, Kent Ohio, 1986 p. 34-35

২৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৮৩-১৬০৩

লালন শাহ
(১৭৭৪?—১৮৯০)

লালন শাহ ঊনবিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাউলসাধক এবং সংগীত রচয়িতা ছিলেন। দুশ' বছরের অধিককাল ধরে তাঁর গান প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা নিয়ে সাধারণ লোকসমাজে গীত হয়ে আসছে। বর্তমানে তাঁর গান ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় অনূদিত এবং গীত হয়েছে। বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লালন ফকির এবং বাউলগান নিয়ে উচ্চতর গবেষণা চলছে। ইতোমধ্যে বিদেশীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেছেন। লৌকিক পরিমণ্ডলে থেকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারা নিঃসন্দেহে একটি অভিনব এবং বিরল ঘটনা। লালন ফকির আজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমোচ্চারিত। অনেকের এমন ধারণা এবং তা অনেকাংশেই সংগত যে রবীন্দ্রনাথ বাউল এবং লালনের গানের মধ্যেই তাঁর ধর্ম ও দর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন। অতঃপর স্বীকরণের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন যা তাঁকে নোবেল পুরস্কার লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দেশের অভ্যন্তরেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বক্তৃতামালা এবং নানা নিবন্ধে লালন ফকির এবং বাউলদের ধর্ম ও জীবনবোধের কথা বলেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ বাউলদের বহিরঙ্গ রূপের সঙ্গেই অধিক পরিচিত ছিলেন–সাধনার সঙ্গে নয়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাউল এবং লালন ফকিরকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ আব্দুল ওয়ালী।[১] ১৮৯৮ সালে লালন তথা এদেশীয় বিভিন্ন ফকির-সাধুজনের কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণ সম্পর্কে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯০০ সালে Journal of the Anthropological Society of Bombay-তে প্রকাশিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে লালন ফকিরের জন্ম হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। এই সময়কালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে বাংলার নবাব

সিরাজউদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সমগ্র দেশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়ে পড়ে। এর পর শুরু হয় শোষণের রাজত্ব এবং বাঙালির জাতীয় জীবনে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ[২] প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের একটি মেলবন্ধন সূচিত হলো বটে, তবে তা অনেকটাই ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। ইতোমধ্যে একদল তরুণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি তীব্র অনীহা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং তাদের কারণেই বলা চলে একধরনের নাগরিক লোকগীতি এবং নাটকের প্রচলন হয়। এসব গান ও অভিনয় অনেকাংশেই বিকৃত রুচিসম্পন্ন হয়। 'কবি গান'[৩] 'টপ্পা'[৪] এ জাতীয় মনোভঙ্গির পরিচয় বহন করলেও এর মধ্যে বাঙালির চিরায়ত রসবোধও বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তথাপি এ জাতীয় গীতিতে আবহমান বাংলা ও বাঙালির যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়নি। কবিগানের ভাষা ছিল অশিষ্ট এবং কুরুচিপূর্ণ। এ গান তাই কিছুসংখ্যক নাগরিক এবং শহুরে মানুষের বিকৃত রুচিকে তৃপ্ত করতে সমর্থ হলেও গোটা বাঙালি জাতির সংগীতঐতিহ্যের যথার্থ পরিচয় বহন করতে সক্ষম হয়নি। এমনি মুহূর্তে রামমোহন রায়[৫] এবং লালন ফকিরের আবির্ভাব বাঙালি জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এঁরা উভয়েই ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী। উভয়ের মধ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা, বর্ণবাদের প্রতি তীব্র বিরোধিতা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সক্রিয় ছিল। বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে গণজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার নির্মাণে রামমোহন রায় এবং লালন ফকিরের একটি গৌরবময় ভূমিকা ছিল।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে বাউল পদকর্তাদের নাম তেমন পাওয়া যায় না। এর একটি কারণ, গোঁড়া হিন্দু ও মুসলিম সমাজে বাউলদের প্রতি তীব্র বিরোধিতা ও অসন্তোষ। এরা বাতেনী সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় আচার-আচরণ ও বিশ্বাসে ইসলামের শরিয়তবিরোধী ছিল। ফলে এই সময়ে ইসলামধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট 'তরিকায়ে মুহম্মদী'[৬] বা ওহাবী[৭] এবং ফারায়েজী[৮] আন্দোলন বাউলসাধনাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এ কারণে বাউলদেরকে নানা অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। এ সময়ে লালন ফকিরের জন্ম এবং তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির একটি স্বাক্ষর বহন করে। জাতিভেদের প্রতি তীব্র বিরোধিতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও মুক্তবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে লালন ফকির তাঁর গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ যারা ইতোমধ্যেই বর্ণবাদ এবং জাতিভেদের কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল, তারা বাউল এবং লালনের গানে নিজেদের বেঁচে থাকার একটি পাথেয় খুঁজে পেল। এই নিম্নস্তরের মানুষ ছিল বৌদ্ধসমাজভুক্ত এবং তারা সুফি ফকিরদের প্রভাবে ধর্মান্তরিত হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংগীতচর্চায় লালনের আবির্ভাবের পূর্বকাল থেকে শাক্ত পদাবলী ধর্মীয় সংগীত সাধনা হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। তন্ত্রের সঙ্গে ছিল শাক্তপদ ও পদকর্তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শাক্তকবিদের অধিকাংশই তান্ত্রিক ছিলেন বলে জানা যায়[৯] এবং তারা তাদের গানে তন্ত্রের নানা উপমা ও রূপক ব্যবহার করেছেন। তবে শাক্ত পদাবলীতে ধর্মীয় দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে, ফলে এসব পদাবলীতে উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ পাওয়া যায় না। গানের সুর মানুষের সংগীতপিপাসাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হলেও সাহিত্য হিসেবে এসব পদাবলী ছিল নিতান্ত সাধারণ স্তরের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাগীতিকা[১০] ধর্মীয় সাহিত্য হলেও এর মধ্যে যে সাহিত্যশিল্প রীতির প্রকাশ ঘটেছিল, শাক্ত পদাবলীতে তা পাওয়া যায়নি। বৈষ্ণব পদাবলী[১১] এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বৈষ্ণব পদাবলীতে ধর্মীয় ভাবনা প্রবল হলেও কিছু কিছু পদকর্তা ভক্তি প্রকাশে অনুপম শিল্পরীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসকৃত পদাবলীসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীতেও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না।

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, এদেশে সুফিসাধকদের আবির্ভাব ঘটেছে অষ্টম-নবম শতক থেকে এবং সুলতানী আমলে পারস্য ও বাংলা সাহিত্য অনূদিত হয়েছে উভয় ভাষায়।[১২] এ আমলে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্লাবন এসেছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যেও কবি সাহিত্যিকদের জন্ম হয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে একাধিক মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। শাহ্ মুহম্মদ সগীর[১৩], জৈনুদ্দিন[১৪] এই সময়ের কবি ছিলেন। শাহ মুহম্মদ সগীরের রচনা 'ইউসুফ-জোলেখা'য় বাউল, বাউর এবং আউল শব্দ ও বাউল সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে এবং তা দেখে প্রমাণিত হয় যে বাউল ধর্মসম্প্রদায় দীর্ঘকাল আগে থেকেই বাঙালির সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। বাউলেরা সুফিসাধনার মধ্যে বাতেনী ধারার একটি শাখা বিশেষ ছিল এবং তারা সংগীতাশ্রয়ী ছিল। বিশেষ করে ইরানীয় 'সামা' 'গজল' এবং 'কাসিদা' তাদের সাধনার অংশ ছিল। গোঁড়া হিন্দু এবং মুসলিম সমাজ তাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকায় তারা গুপ্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে সময়ে সৃষ্ট কোনো বাউল পদাবলী এ যাবৎকাল আবিষ্কৃত হয়নি।

লালনের পূর্বে হেরাজতুল্লাহ[১৫] এবং সিরাজ শাহ[১৬] নামে দুজন বাউল সাধকের নাম এ সময়ে জানা যায়। সিরাজ ছিলেন লালন ফকিরের গুরু এবং হেরাজতুল্লাহ ছিলেন লালন ফকিরের সমসাময়িক পাঞ্জু শাহের গুরু। লালন ও পাঞ্জু শাহের গানের ভনিতায় এই দুজন বাউলগুরুর নাম পাওয়া গেলেও এদের

রচিত কোনো গান পাওয়া যায়নি। লালন ফকিরই এ সময়ে প্রধান বাউলসাধক এবং বাউলগানের রচয়িতা ও শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। লালন ফকির অবশ্য তাঁর পূর্বকালে সৃষ্ট নানা সাধনসংগীত, বিশেষ করে শাক্ত ও বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বিরচিত সাধনসংগীত এ সময়ে সাধারণ মানুষ এবং মাঝিমাল্লাদের নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল। বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসও লালনের অজানা ছিল না। ফলে তিনি যে বাউলগান উপহার দিলেন তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছিল।

এখানে বলা আব্যশক যে, বাউলগান সুফি নির্দেশক হওয়ায় এই গানে সর্বধর্মের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সুফিধর্ম মূলত একটি সমন্বিত মতাদর্শ বা ধর্ম। এই ধর্মে বৌদ্ধ, খ্রিস্টীয়, গ্রিক দর্শন, ইসলামপূর্ব ইরানীয় ধর্ম এবং ইসলামের সমন্বয় ঘটেছে। ওমর খৈয়াম, হাফিজ, জামী, জুনায়েদ, নিফফেরী প্রমুখ এই মতাদর্শপুষ্ট ছিলেন। এরা বে'শরাপন্থী ছিলেন। লালন ফকিরের গান এমনি বে'শরা চেতনালব্ধ বাউলগান। তবে গ্রামেগঞ্জে লালন ফকির এবং তাঁর পরবর্তীকালে বাউলসাধক পাঞ্জু ও দুদ্দু শাহ প্রমুখের গান 'ভাবগান' বা 'ভাবসংগীত' নামে পরিচিত ছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে জয়নারায়ণ ঘোষাল বিরচিত 'করুণানিধান বিলাস' (১৮১৩-১৮১৪) নামে একটি কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন লোকসংগীতের পরিচয় পাওয়া যায়। লালন ফকিরের সমসাময়িক ছিলেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), মনোমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮), কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), বিহারীলাল (১৮৩৫-১৮৯৪) প্রমুখ সাহিত্যিক। এঁদের রচিত সাহিত্য সে সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

লালন ফকির এবং তাঁর সমসাময়িকদের পূর্বে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (মৃত্যু ১৭৬০ খ্রি.) সে যুগে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এদেশের নারী-পুরুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তবে তাঁর কিছু কিছু রচনা আদিরসাত্মক ছিল। এই সময়ে ধর্মভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনাপুষ্ট, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিমূলক সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ অবলম্বনে নানা পাঁচালীও সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যপীর[১৭] অথবা সত্যনারায়ণ সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের নিকট যৌথপীর বা দেবতা হিসেবে এযাবৎকাল স্বীকৃত হয়ে আসছে। সত্যপীরের পাশাপাশি মছলন্দপীর[১৮] এবং ত্রৈলোক্যপীরের[২৩] কাহিনী ইত্যাদি পীরমাহাত্মক বিষয়ক পুঁথিগুলি হিন্দু-মুসলিম সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বলেছি, অষ্টাদশ শতকের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) আবির্ভাব একটি বৈপ্লবিক জীবনচেতনা সৃষ্টি করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসংগীতে সুফিধর্ম ও সাধনার প্রভাব পড়েছে। তবে এই ব্রাহ্মসংগীতে লোকসংগীতের সুরই প্রাধান্য পেয়েছিল। রামমোহন রায় সুফিধর্মের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হন এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিমত এবং কাব্যচর্চা শুরু করেন। তিনি আরবি-ফারসি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। রামমোহন রায় লালন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্মসংগীতে (১৮০৩) বাউল সাধন সংগীতের প্রভাব লক্ষণীয় :

কে ভুলালো হায়
কল্পনারে সত্য করি জানো একি দায়।
আপনি গড়ছ যাকে
কে তোমার বশে থাকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনও ভূষণ দাও, কখনও আহার
ক্ষণেক স্থাপহ ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বলি মানো যারে
সম্মুখে না চাও তারে
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

এই প্রসঙ্গে লালনের একটি গান তুলনীয় :

প্রতিমা গড়ায় ভাস্করে
ম'লে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে
আবার গুরু বলে তারে
এমন পাগল কে দেখেছে।
মাটির পুতুল গড়ে নাচায়
একবার মারে একবার বাঁচায়
সাঁই যেন স্বয়ং হ'তে চায়
লালন কয় তার সকল মিছে ॥

লালনের সমকালে বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) সে সময়ে প্রচলিত বাউলগানের ধারায় আকৃষ্ট হন এবং তাঁর অনেক গানই বাউলপ্রভাবিত। তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে বাউলের 'মনের মানুষ'-এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

কোথায় সে প্রাণের পাখি
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি
আর কেন গান কোরে ডাকে না আমায়।

বিহারীলাল 'বাউল বিংশতি' নামেও একটি সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন। 'বাউল বিংশতি'র কোনো কোনো গানে লিরিক রসের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

যে দুটি নয়ন!
জীবন আমরণ
ত্রিভুবন হাসিতেছে কিরণে তাহার
সে সুধাংশু কর পান
জুড়ায়েছে মন প্রাণ
হেসে খেলে চলে যাব ভাবনা কি তার।

এখানে বলা প্রয়োজন যে রামমোহন রায় এবং বিহারীলাল উভয়েই সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের গানে বাউলের বহিরঙ্গ রূপটিকেই প্রকাশ করেছেন। এ সময়ে শাস্ত্রসংগীতেরও প্রসার ঘটে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে ধ্রুপদী, খেয়াল, কবিগান ও টপ্পার ধারার সঙ্গে বাউলধারারও সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

লালন ফকির রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর রচিত পদাবলী সমকালীন অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদেরকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ সময় কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) লালন ফকিরের প্রভাবে ফিকিরচাঁদ বাউল নামে অনেক বাউলগান রচনা করেন। লালনের অপর একজন সমসাময়িক সাহিত্যিক-সাংবাদিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) লালন ফকিরের অনুকরণে বেশকিছু বাউলগান রচনা করেন। তিনি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তাঁরা উভয়ে মিলে বাউলগান রচনা করেন। লালন ফকির এদের উভয়ের থেকেই বয়সে প্রবীণ ছিলেন এবং তাদের সাথে লালন ফকিরের সাক্ষাৎও ঘটে।[১৯] এখানে উল্লেখ্য, মীর মশাররফের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা কাজ করেছিল তার মূলে রামমোহন রায় এবং লালন ফকিরের বিশেষ অবদান থাকতে পারে।

লালন ফকিরের বাউলগানে অসাম্প্রদায়িক চেতনা মুখ্য ছিল। তিনি দীর্ঘ দু'শতক ধরে বাঙালিসমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাঁর প্রায় গানের সুর এবং শিল্পীরীতির সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ কবি রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। তাঁর সকল সাহিত্যকর্মেই বাউলপ্রভাব লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত।

বাউল তথা লালন ফকিরের গান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পশ্চিম বাংলায় (ভারত) গীত হলেও লালনের সাধনপীঠ কুষ্টিয়া এবং পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, ফরিদপুর এবং পাবনা অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার ঘটে। এর কারণস্বরূপ বলা যায় যে, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবিভক্ত বাংলায় নদীয়া জেলার একটি মহকুমা ছিল। নদীয়াতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রসার জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এ সময়ে বাউল লোকধর্ম ও

মতবাদের পাশাপাশি কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী, খুশীবিশ্বাসী, ভগবানী প্রভৃতি নানা লোকধর্মের উদ্ভব ঘটে। বৈষ্ণবধর্মের একটি শাখা বৈষ্ণব সহজিয়াদেরকেও বাউল-বৈষ্ণব নামে চিহ্নিত করা হয়। চৈতন্যদেবের শিষ্য নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র বাউলদের মধ্যে সহজিয়া সাধনধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাউল-বৈষ্ণবের এক মেলবন্ধন রচনা করেন। পশ্চিম বাংলায় বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রভাবের কারণে সেখানে বাউল সম্প্রদায় সুফিতত্ত্ব অপেক্ষা বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে অধিক আকৃষ্ট, তবে সুফিপ্রভাব একেবারে অপ্রত্যক্ষ নয়। বলা চলে, সুফিধারা বৈষ্ণবীয় বাউলগানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশে সুফিধারার প্রভাব সর্বাধিক। ফলে এ অঞ্চলের বাউলগানে বৈষ্ণব অপেক্ষা সুফিধারাই মুখ্য।

লালনের গানে এই দুই ধারার সম্মিলন ঘটেছে। লালন ফকিরের গান তথা 'বাউলগান' দেহতত্ত্বভিত্তিক হলেও এ গানে ইরানীয় সুফি চেতনার প্রভাব সমধিক। লালনের সমকালে পাগলা কানাই (১৮০৯-১৮৮৯) দেহতত্ত্বভিত্তিক গানে পারদর্শিতা লাভ করলেও লালন ফকিরের জীবনবোধ এবং দর্শনের পাশাপাশি তাঁর গানের ভাষা, শিল্পসৌন্দর্য তাঁর গানকে চিরায়ত সাহিত্য এবং সংগীতের মর্যাদা দিয়েছে।

লালনের জীবনকাহিনী

লালন ফকির কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার ছেঁউড়িয়া গ্রামে তাঁর নিজস্ব আখড়ায় ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর, বাংলা ১২৯৭ সালের ১ কার্তিক শুক্রবার মৃত্যুবরণ করেন। এ বিষয়ে সকল গবেষক, পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষ একমত পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর জন্ম এবং জন্মস্থান নিয়ে অদ্যাবধি কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এর মূল কারণ, লালন ফকির নিজে এ বিষয়ে তাঁর জীবিতকালে কারো কাছে কোনো তথ্য বলে যাননি, এমনকি তাঁর গানেও এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাঁর গানে কিছু কিছু নামের উল্লেখ আছে যা দেখে কখনও কখনও কোনো কোনো গবেষক তাঁকে মুসলমান এবং হিন্দুর সন্তান বলে ভেবেছেন। লালন ফকিরের জীবনী, জন্মস্থান এবং ধর্মমত সম্পর্কে এ যাবৎকাল যেসব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে আমরা দুই ধরনের মতবাদ লাভ করি। প্রথমত, লালন হিন্দু কায়স্থের সন্তান, জন্মাস্থান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার ভাড়ারা গ্রাম। দ্বিতীয়ত, লালন মুসলমানের সন্তান এবং তাঁর জন্মস্থান বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমা (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত হরিণাকুণ্ডু থানার কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রাম।

উপর্যুক্ত মতবাদ সম্পর্কে কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে দুটি বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক. সমকালীন পত্রপত্রিকাতে লালনজীবনীর উপাদান।

দুই. লোকশ্রুতি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ।

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার : গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

লালনজীবনী সংক্রান্ত বিষয়ে এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে লালন ফকিরের সমসাময়িক কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র ১০ম ভাগ ১৭শ সংখ্যা ভাদ্র ১২৭৯; আগস্ট ১৮৭২, পৃ.৩-এ 'জাতি' শীর্ষক নিবন্ধে লালন ফকির সম্পর্কে যে বিবরণ দান করেন তাই-ই সর্বপ্রথম লালনজীবনীমূলক তথ্য। এই বিবরণে হরিনাথ মজুমদার বলেন, "...লালন শাহ নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমার মাসিক পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করে না সে কথা বলা বাহুল্য।"

এ ব্যতিরেকে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর 'ব্রহ্মাণ্ড বেদ' ২য় ভাগে বলেন :

> *...নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া বিভাগের নিকটবর্তী ঘোড়াইগ্রামে লালন সাঁই নামে যে ফকির বাস করেন, তিনিও পরম যোগী। তাঁহার গুরু সিরাজ সাঁই সিদ্ধযোগী ছিলেন।*

কিন্তু এই বিবরণ সঠিক নয়। কারণ লালন ঘোড়াই গ্রামের পরিবর্তে ছেঁউড়িয়াতে বসবাস করতেন এবং এটা তাঁর নিজস্ব গ্রাম ছিল না।

লালন ফকিরের মৃত্যুর দু সপ্তাহ পরে বাংলা ১২৯৭ সালে কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া থেকে 'পাক্ষিক হিতকারী' পত্রিকায় ১৫ই কার্তিকের ১৩শ' সংখ্যায় লালন ফকির সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। তবে সেখানে লেখকের কোনো নাম বা পরিচয় দেওয়া হয়নি। নিবন্ধে লেখক একইসঙ্গে প্রথমে 'জমিদার' অতঃপর 'মহাত্মা লালন ফকীর' এবং শেষে 'ইন্‌কম ট্যাক্‌স' বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করেন। 'হিতকরী' পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হিসেবে লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীদেবনাথ বিশ্বাসের নাম পত্রিকায় মুদ্রিত। পত্রিকার সর্বত্র মীর মশাররফ হোসেনের বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের বিজ্ঞাপন লক্ষ করা যায়। একটি বিজ্ঞাপন কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের 'গীতাবলী' সম্পর্কীয়। এই বিজ্ঞাপনে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার ফিকিরচাঁদ নামে যেসব বাউলগান রচনা করেছিলেন তার একটি বিবরণ। 'হিতকরী' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন রাইচরণ দাস। পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো কুমারখালী মথুরানাথযন্ত্রে। প্রিন্টার ছিলেন শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ। 'পাক্ষিক হিতকরী' পত্রিকার এই সংখ্যাটি বিশিষ্ট গবেষক ম. মনিরুজ্জামানের নিকট থেকে সংগৃহীত। এই পত্রিকায় লালন ফকির সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হলো।

পাক্ষিক হিতকরী

মহাত্মা লালন ফকীর,

লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর পশ্চিমে অনেকদূর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ২ স্থানে বহু সংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য শুনিতে পাই। ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫/১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভালবাসিতেন না। শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না। আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন; সম্প্রদায়ের ধর্মমতানুসারে ইহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে, বাউল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের এক নতুন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মতবিশ্বাস অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবা ও বাউলের দলে যে কলঙ্ক দেখিতে পাই, লালনের সম্প্রদায়ের সে প্রকার কিছু নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি 'সাধুসেবায়' অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভিচার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহাপাপ। তবে প্রত্যেক সৎ নিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে।

বাউল, সাধুসেবা ও লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটি গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান জননের পথ এককালে রুদ্ধ। 'শান্ত-রতি' শব্দের বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে উৎকৃষ্টভাব বুঝায়, ইহারা তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে। এই জঘন্য ব্যাপারে এ দেশ ছারে খারে যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বেশি কিছু জানাইতে স্পৃহা নাই।

শিষ্যদিগের ও তাহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকীরের বিচার হইতে পারে না। তিনি এ সকল নীচ কার্য্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম জীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই;

কিন্তু ধর্মালাপে তাহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাহাকে মুসলমান মনে করিত; বৈষ্ণবধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি ইঁহার শিষ্যগণ ইহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারো উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা "সাঞ" এই কথা মুখে শুনতে পাওয়া যায়। ইনি নোমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদ বিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ-সাধনের কথা ইহার মুখে শুনা যাইত তাহাতে তাহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারো মতদ্বৈধ নাই। লালনফকীর নাম শুনিয়াই হয়তো অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকীর ছিলেন। সামান্য জোতজমা আছে; বাটি ঘরও মন্দ নহে। জিনিসপত্রও মধ্যবর্তী গৃহস্থের মতো। নগদ টাকা প্রায় দুইহাজার বলিয়া মরিয়া যান। ইহার সম্পত্তির কতক তাহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি ফরমমাত্র করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজে শেষকালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না। শিষ্যরাই ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা (মহোৎসব) দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও আলোচনা হইত। তাহাতে তাহার ৫/৬ শত টাকা ব্যয় হইত।

ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়তো তাহার নিষেধক্রমে নাহয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জ্ঞাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থগমন কালে পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকীর হয়েন। ইঁহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন

পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িত কালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ববৎ সাধন করিতেন; মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। এই সময়ের রচিত কয়েকটি গান আমাদের নিকট আছে। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন "আমি চলিলাম।" ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিম কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরেনাম নামও দরকার নাই। হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্য শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম শা, মানিক শা ও কুধু শা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন। ভরসা করি, ইহাদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না। লালন ফকিরের অসংখ্য গান সর্ব্বত্রে সর্ব্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাহার নাম, ধর্ম্ম, মত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল–

গান

সব লোকে কয় লালন কি জাত.সংসারে
লালন ভাবে জাতের কিরূপ দেখলেম না এই নজরে ।

১

কেউ মালা কেউ তছবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে।

২

যদি সন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামণ চিনি পৈতা প্রমাণ
বামণি চিনি কিসে রে ॥

৩

জগত বেড়ে জেতের কতা,
লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন সে জেতের ফাতা
ঘচিয়াছে সাধ বাজারে ॥

আলোচনা

এই নিবন্ধ রচয়িতার কোনো নাম নিবন্ধের সঙ্গে নাই। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পত্রিকার কোনো সাংবাদিক এই তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি কে ছিলেন এ নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কেউ কেউ হিতকরী পত্রিকার সহ-সম্পাদক রাইচরণ দাসের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অন্যরাও লিখতে পারেন। কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখের সঙ্গে লালন ফকিরের পরিচয় ছিল। 'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীদেবনাথ বিশ্বাসের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল এবং তিনিও এ বিষয়ে লিখে থাকতে পারেন। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে এমন বলা যায় যে, পত্রিকার কোনো সাংবাদিক এই তথ্য পরিবেশন করেছেন। সাধারণত পত্রিকার সংবাদ কিংবা সংবাদ-নিবন্ধের সঙ্গে সাংবাদিকের নাম সচরাচর ছাপা হয় না। তবে এ প্রসঙ্গে হিতকারী পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। এ তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ লালনের মৃত্যুসংবাদ জড়িত এই জীবনকাহিনী অনেক নতুন তথ্যের ইঙ্গিত বহন করে।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবী বাংলা ১৩০২ সালে (ইংরেজি ১৮৯৫ আগস্ট-সেপ্টেম্বর) 'ভারতী' পত্রিকায় 'লালন ফকির ও গগন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক প্রদত্ত লালনজীবনীর কিছু মনগড়া তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, যা পরবর্তীকালে লালনজীবনীকার এবং গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কেউ কেউ এই তথ্যকে সঠিক বিবেচনা করেছেন। নিবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ আরও এজন্যে যে বাউল সাধনা ও লালন ফকির অনুসারী শিষ্যদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও এখানে বর্ণনা আছে।

এর পরে ১৯০০ সালে মৌলভী আব্দুল ওয়ালী ইংরেজিতে "On Curious Tenets and Practices of A Certain Ceass of Faqirs in Bengal" নামে একটি প্রবন্ধ *Journal of the Anthropological society of Bombay*-তে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে লালন ফকিরের জন্মস্থান ও সংক্ষিপ্ত জীবন বিবরণীর উল্লেখ আছে। লালনসংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনে ইংরেজিতে এই লেখাটি সর্বপ্রথম। 'হিতকরী' পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা শেষে উপর্যুক্ত বিষয় এবং অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

পাক্ষিক হিতকরী পত্রিকা

এ পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংবাদ কিছু প্রশ্নের উদ্রেক করেছে।

১. সংবাদদাতা লিখেছেন যে, লালন আখড়ায় সস্ত্রীক বসবাস করতেন। কিন্তু নিবন্ধে তাঁর স্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। বাউলদের মধ্যে বিবাহের কোনো

রীতি নেই বলে জানা যায়। তবে বিশখা নামে একজন মহিলা তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন—এ কথা জানা যায়। শিষ্যরা তাঁকে 'গুরুমা' জ্ঞানে ভক্তি করত।

২. নিবন্ধ-লেখক 'সাধুসেবা' নামে একটি নতুন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে 'সাধুসেবা'র সঙ্গে শিষ্যদের মতপার্থক্য না থাকলেও লালন সে মত বিশ্বাস করেননি। আবার বলেছেন যে, সাধুসেবা এবং বাউলের দলে যৌনাচারজনিত যে কলঙ্ক ছিল লালনের সম্প্রদায়ে তা ছিল না। কিন্তু এই নিবন্ধের অপরস্থানে তিনি বাউল, সাধুসেবা, লালন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক একই গুহ্য আচার-আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে বলেছেন, 'মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভিচার নাই।' 'পরদার' মহাপাপ বলে উল্লেখ করলেও এদের মধ্যে এর অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নয়—এমন কথাও নিবন্ধকার বলেছেন। রতিনিরোধ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল এমন কথা উল্লেখ করা হলেও এদের অনেকে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়সেবায় রত থাকে এবং সে কারণে দেশ ধ্বংসের সম্মুখীন—সে কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। তবে লালন ফকির নিজে যে এমন অসামাজিক কাজ করেননি তা বলা হয়েছে। বাউলদের মতে, 'সাধুসেবা' অর্থে বাউলদের কোনো অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাধু ফকিরের ভোজক্রিয়াকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। লালন ফকির তাঁর সমকালে সাধুসেবা দিয়েছেন বলে জানা যায়। বাউলসাধনায় পরকীয়া প্রেম প্রচলিত। কিন্তু এখানে শিষ্যদের মধ্যে অনেকের স্ত্রী ছিল বলা হয়েছে। তবে তাদের সন্তান ছিল না।

৩. লালন ফকির লেখাপড়া জানতেন না বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবুতালিব উদ্ধারকৃত একটি দলিলে লালন ফকিরের স্বাক্ষর এবং পিতা সিরাজ সা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য আরেকটি দলিলে লালন ফকিরকে বকলম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।

৪. নিবন্ধকার লিখেছেন যে লালন ফকিরের জীবনী বিষয়ক কোনো উপকরণ পাওয়া কঠিন, কারণ এ বিষয়ে তিনি কাউকে কিছু বলেননি। তবে সাধারণের মধ্যে এমন ধারণা ছিল যে তিনি কায়স্থ এবং কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা তাঁর একই জাতি ছিলেন।

সে সময়ে লালন ফফিরের কোনো আত্মীয় জীবিত ছিল না। সুতরাং কোথায় তাঁর আসল বাড়িঘর ছিল তা বোঝার উপায় নেই। চাপড়ার ভৌমিকেরা এক জাতি হলেও তাঁর জাত ছিল না। লালন নিজেই তাঁর জাতিত্ব অস্বীকার করেছেন।

'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণে লালন ফকিরের জন্ম যে চাপড়া ইউনিয়নের ভাড়ারা গ্রামে তাও জানা যায় না। ভাড়ারা লালনের আখড়াবাড়ি ছেঁউড়িয়া থেকে মাত্র ৪/৫ মাইলের দূরত্ব। লালনের জীবিতকালে এধরনের কোনো দাবি উঠেছিল বলে জানা যায় না।

৫. নিবন্ধকার লোকশ্রুতি অনুসারে লেখেন, 'ইনি (লালন) নাকি তীর্থ ভ্রমণকালে পথে বসন্তরোগ আক্রান্ত হইয়া সঙ্গীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকীর হয়েন। ইঁহার মুখে বসন্তরোগের দান বিদ্যমান ছিল।'

স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জানা যায় যে, লালন অচৈতন্য অবস্থায় ছেঁউড়িয়া গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কালীগঙ্গা নদীর পূর্বপাড়ে পড়েছিলেন। তাঁকে ছেঁউড়িয়া গ্রামের মলম সা কারিকরের স্ত্রী মতিজান বিবি নদীর ঘাটে পানি আনতে গিয়ে দেখতে পান এবং বাড়ি এনে সেবা-শুশ্রূষায় ভালো করে তোলেন।

লালন কিভাবে এখানে পড়েছিলেন এবং কোথা থেকে এসেছিলেন কিংবা যাচ্ছিলেন, কোনো কথাই কাউকে বলেননি। তাঁর মৃত্যুশেষে অন্তিমকার্য কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে হয়নি এবং সে বিষয়ে তাঁর কোনো অভিপ্রায় এবং উপদেশ ছিল না। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে অস্বীকার করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এমন এমন বলা যায় যে, নিবন্ধকারের বিবরণে কোথাও কোথাও স্ববিরোধী বক্তব্য উপস্থিত থাকলেও লালনের জীবনীবিষয়ক তথ্যসমূহের মধ্যে এই নিবন্ধ নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য।

ভারতী পত্রিকা

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমতি সরলা দেবী রচিত 'লালন ফকির ও গগন' নামক নিবন্ধে রাজশাহী নিবাসী 'শিক্ষা পরিচয়' সম্পাদক শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্র কর্তৃক লালন ফকিরের জীবন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে।

> লালন ফকিরের সকল কথা ভাল করিয়া জানি না, যাহা জানি তাহাও কিম্বদন্তীমূলক। লালন নিজে অতি অল্প লোককেই আত্মকাহিনী বলিতেন, তাঁহার শিষ্যরাও বেশী কিছু সন্ধান বলিতে পারেন না। লালন জাতিতে কায়স্থ। কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপড়া গ্রামের ভৌমিকেরা তাঁহার স্বজাতীয়। ১০/১২ বৎসর বয়সে বারুণী গংগাস্নান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে যান। তথায় উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু দশায় পিতামাতা কর্তৃক গংগাতীরে পরিত্যক্ত হন। লালনের মুখে বসন্ত চিহ্ন বর্তমান ছিল বলিয়া অনেকে এই কাহিনী বিশ্বাস

> করিয়া থাকেন। শ্মশানশায়ী লালনকে একজন মুসলমান ফকীর সেবাশুশ্রূষায় আরোগ্য করিয়া লালন পালন করেন ও ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন। এই ফকীরের নাম সিরাজ সা, জাতিতে মুসলমান। লালনের প্রণীত অনেক গানে এই সিরাজ সা দীক্ষাগুরুর উল্লেখ আছে।

শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় স্বীকার করেছেন যে লালনজীবনী সম্পর্কে যা জানেন তা কিংবদন্তিমূলক। সুতরাং তাঁর বিবরণ নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। এ ছাড়া তিনি বলেছেন যে, লালন গঙ্গাস্নানের জন্য পিতামাতাসহ মুর্শিদাবাদে যান এবং সেখানে উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হলে পিতামাতা কর্তৃক গঙ্গাতীরে পরিত্যক্ত হন। কিন্তু বাস্তবে লালন ফকিরকে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামসংলগ্ন কালীগঙ্গা নদীর পাড় থেকে উদ্ধার করা হয়। এমন ধারণা স্থানীয়ভাবে প্রচলিত। সুতরাং সিরাজ সাঁই যে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং রোগমুক্ত করেন এ কথা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে সিরাজ সাঁই যে লালনের গুরু ছিলেন এ-কথা সত্য।

শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লালন ফকিরের মৃত্যুকাল ১৮৯১ সালের ১৭ অক্টোবর শুক্রবার বলে উল্লেখ করেছেন–এ তথ্যও সঠিক নয়।

Journal of the Anthropological Society of Bombay, 1900

'পাক্ষিক হিতকরী' পত্রিকা ও সরলাদেবী-রচিত লালন ফকিরের জীবন তথ্যবিষয়ক নিবন্ধাদি প্রকাশের পর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল ওয়ালী (১৮৫৫-১৯২৬) ইংরেজিতে "On Curious Tenets and Practices of a Certain Class of Faqirs in Bengal" এই নামে একটি লেখা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর একটি সভায় পাঠ করেন। এই লেখাতে এদেশের সুফি ফকির, বাউল এবং লালন শাহ সম্পর্কে তথ্যাদি রয়েছে। লেখাটি পরবর্তীকালে Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. V. No 4, 1900-এ প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে লেখা লালন ফকির বিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কে আব্দুল ওয়ালী লিখিত এই নিবন্ধটিই প্রথম দেশে ও বিদেশে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লালন ফকির সম্পর্কে আব্দুল ওয়ালীর এই প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে লেখক আব্দুল ওয়ালী রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এই বিভাগে সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে রেজিস্ট্রার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল যশোর জেলার ঝিনেদা মহকুমার শৈলকূপা থানার সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জীবনে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে সকলের নিকট সমাদৃত হন। তাঁর

ঊর্ধ্বতন বিদেশী কর্মকর্তাগণও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। আব্দুল ওয়ালী চাকুরিকালীন সময়েই এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন এবং ইংরেজিতে তার পঞ্চাশটিরও বেশি লেখা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল এবং অন্যান্য প্রথমশ্রেণীর জর্নালে প্রকাশিত হয়। তাঁর কর্মদক্ষতা এবং চারিত্রিক গুণাবলির জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'খান সাহেব' উপাধি প্রদান করেন। তিনি তাঁর গবেষণার কারণে লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর সাধারণ সম্পাদক জোহান ভ্যান ম্যানেন তাঁর অবদান সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন : "The Society is poorer for his departure, which leaves a gap which connot be entrirely filled by any other."

আব্দুল ওয়ালী শৈলকূপা সাব-রেজেস্ট্রি অফিসের দায়িত্বে থাকাকালে লালন ও বাউল ফকিরদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। লালন ফকির ও সিরাজ সাঁই-এর জন্মস্থান বলে কথিত হরিশপুর গ্রাম শৈলকূপা রেজিস্ট্রি অফিসের আওতাধীন ছিল। এক্ষেত্রে আব্দুল ওয়ালীর পক্ষে হরিশপুর গ্রাম সম্বন্ধে ধারণা থাকা স্বাভাবিক। নিম্নে আব্দুল ওয়ালী রচিত প্রবন্ধের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

> ...Another renowned and the most melodious versifier whose 'dhuyas' are the rage of the lower classes, and sung by boatmen and others, was the far famed 'Lalon Shah'. He was a disciple of Siraj 'Shah' and both were born at the village Harishpur, Subdivision Jhenidah, District Jessore. Having travelled long and made pilgrimages to Jagannath and other shrines, and met with all sorts of devotees, he at last settled at Mauja Siuriya, near the subdivisional headquarters of Kushita (Nadiya). Here he lived, feasted, sang and worshipped and was known as 'Kayastha' and where he died some ten years ago. His disciples are many and his songs are numerous.

আব্দুল ওয়ালী উপর্যুক্ত অংশে যা বলেছেন সংক্ষেপে তা এমন যে, লালন শাহ্ একজন বিশিষ্ট লোকসংগীত রচয়িতা ছিলেন এবং তাঁর গান (ধুয়া) সে সময়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষ, মাঝি-মাল্লা এবং অন্যদের কণ্ঠে গীত হতো। লালন, সিরাজ শাহের শিষ্য ছিলেন এবং উভয়ে যশোর জেলার ঝিনেদা মহকুমার হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লালন শাহ্ জগন্নাথের মন্দির এবং নানা-মাজার ইত্যাদি দীর্ঘদিন

পরিভ্রমণ শেষে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা সদরের নিকটে ছেঁউড়িয়া মৌজায় বসতিস্থাপন করেন। এখানেই তিনি সংগীত রচনা এবং সাধন-ভজন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেন। ছেঁউড়িয়াতে সাধারণ লোকে তাকে কায়স্থ বলে জানত এবং এখানেই লালন এই নিবন্ধ লেখার ১০ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শিষ্যসংখ্যা বহু এবং তার গানও ছিল অসংখ্য।

আব্দুল ওয়ালী এই নিবন্ধে লালন ফকিরকে সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্য এবং উভয়ের জন্মস্থান হরিশপুর বলে উল্লেখ করেছেন। তবে জাতিতে লালন হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন তা বলেননি। আব্দুল ওয়ালীর এই বিবরণে লালন ফকিরের বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়া এবং পরিত্যক্ত হয়ে কোনো মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবন লাভ ও ফকির হওয়ার বর্ণনা নেই। 'হিতকরী' পত্রিকাতে এই ঘটনা অনুমান করে বলা হয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রের বর্ণনাও এমনি অনুমানভিত্তিক।

জনশ্রুতি

কুষ্টিয়াতে ছেঁউড়িয়া এলাকায় যে লোকশ্রুতি তা থেকে জানা যায় যে, ছেঁউড়িয়া গ্রামের মলম শাহের স্ত্রী মতিজান কালীগঙ্গা নদীতে পানি নিতে এসে লালনকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান এবং বাড়িতে নিয়ে এসে সেবা-শুশ্রূষা করে ভালো করেন। মতিজান এবং মলম, সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্য থাকার কারণে সেদিন সিরাজ তাদের বাড়িতে এসে লালনকে ফকিরি মতে দিক্ষা দেন এবং সে অবধি তিনি ছেঁউড়িয়া গ্রামে বসবাস করেন। মলম জমিজমার এক অংশ লালনের নামে উইল করে দেন। অতঃপর লালন এই জমিতে আখড়া নির্মাণ করেন। কিছুদিন পর লালন বিশখা নামে একজন মহিলাকে নিয়ে আসেন এবং আমৃত্যু এই মহিলা তাঁর সঙ্গে বসবাস করেন। এই আখড়াতে লালন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মাজারের একপাশে মতিজান বিবির কবর এবং একটু দূরে বিশখা ও মলম শা-এর কবর। লালনের অন্যান্য অনেক শিষ্যদের কবরও চারপাশে রয়েছে। জনশ্রুতি আছে লালন মতিজানকে মায়ের মতো ভক্তি করতেন। এ বিবরণের কোনো প্রমাণাদি নেই। মাজারে লালন-অনুসারীদের মধ্যে এই মতবাদ অদ্যাবধি চালু আছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

আমি লালন একাডেমির পরিচালক থাকাকালে লালন ফকিরকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এমন দুজন ব্যক্তির সন্ধান পাই। তাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের একজনের বিবরণ ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করি। নিম্নে তাঁর বর্ণনা দেওয়া হলো :

আইনউদ্দিন মণ্ডলের বিবৃতি

আমার নাম আইনউদ্দিন মণ্ডল। বয়স ৯৩ বৎসর। আমার বাড়ি লাহিনী, থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া। আমার সামান্য অক্ষরজ্ঞান আছে। আমি ফকির লালন শাহকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তখন আমি ছোট। যখন আমার বয়স আনুমানিক ১০/১১ বৎসর তখন লালন শাহ ইন্তেকাল করেন। কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া আখড়ায় মারা গিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছেঁউড়িয়াতে আখড়া করিয়া তিনি সেখানে বসবাস করিতে থাকেন। তাহার আখড়াতে সাঁইজির সেবা করিবার জন্য একজন বোষ্টমী ধরনের মেয়েছেলে সর্বসময়ের জন্য থাকিতে দেখিতাম। তিনিও আখড়াতে দেহত্যাগ করেন। তবে তাহার মৃত্যু লালন শাহের মৃত্যুর পরে ঘটিয়াছিল। এই মহিলাকেও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি যখন মারা যান তখন তিনি দেখিতে বুড়ি হইয়া গিয়াছিলেন। লালন শাহের আখড়ায় একখানি মাত্র বাংলা খড়ের ঘর ছিল এবং আশেপাশে নানা ধরনের গাছগাছড়া ছিল। তিনি ঘরের ভিতর থাকিতেন এবং ঘরের মধ্যেই গান হইত। এই গান দেহতত্ত্বের গান। তিনি গান রচনার পূর্বে চোখ মুদিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন এবং কিছুক্ষণ পরে গান বলিতেন এবং শিষ্যদেরও গাহিতে বলিতেন। আবার কিছুক্ষণ পরে চিৎ হইয়া শুইয়া একপার্শ্বে কাৎ হইয়া নতুন গান রচনা করিতেন। লালন শাহ কোন জাতের মানুষ ছিলেন তাহা কেউই বলিতে পারে না। জাতের কথা বলিলে লালন শাহ মৃদু হাসিতেন এবং বলিতেন বামন চেনা যায় পৈতায় কিন্তু বামণি কী করিয়া চিনিব। আমার জাতের কথা আমার মা বলিতে পারেন। তিনি কোন্ স্থানের লোক তাহাও তিনি বলেন নাই। তিনি খুব লম্বা চওড়া ব্যক্তি ছিলেন। নাক খাড়া ছিল, দেখিতে ছোট এবং লক্ষ্মীট্যারার মতো ছিল। তিনি লম্বা চুলের অধিকারী ছিলেন। তাহার চুল ছাড়া থাকিত এবং পিঠের উপর আসিয়া পড়িত। তাহাকে কখনও ঝুঁটি বাঁধিতে দেখি নাই। গোছল করিয়া আসিলেও ঝুঁটি বাঁধিতেন না। তাহার মুখে বসন্তের অল্প অল্প দাগ ছিল। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। রং মুসুরের ডালের মতো। তাহার সঙ্গে যে মহিলা বোষ্টমী ধরনের বাস করিতেন তিনি তাহার শরীরে তেল মর্দন এবং অন্যান্য সেবাকার্য করিতেন। তাহার বয়স ১৬/১৭ বৎসর ছিল। এবং এই মহিলাকেই লালন শাহ মালাবদল করিয়া ঘরণী বানাইয়া ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন তাহারা একত্র বসবাস করিবার পরও তাহাদের কোনো সন্তানসন্ততি ছিল না। আমরা সাঁইজির মুখে শুনিয়াছি যে তিনি পূর্বে একজন মহিলাকে বিবাহ করেন, তবে তাহাকে তিনি কোনোদিন আনিতে পারেন নাই। এইজন্য সাঁইজি বড় দুঃখ করিতেন আর বলিতেন–

আমি আইছি একা যাব একা
সঙ্গে তো কেউ যাবে না-রে
পাকা দালান কোঠা দিব
মহাসুখে বাস করিব
লালন বলে কোন্ দিন যাব

ওইনা মনের মানুষ পালাম না-রে
একদিনও হে–
আমার বাড়ি আমার ঘর
বলা কেবল ঝাকমারি সব
লালন বলে কোন্ দিন যাব
আমার মনের মানুষ পালাম না একদিনও।

লালন শাহ-কে নামাজ পড়িতে কোনোদিন দেখিনাই তবে গাঁজা খাইতেন দেখিয়াছি। কেউ দেখা করিতে গেলে তিনি সর্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেন : "বাবা কিছু খেয়েছ?" এবং তাহার সঙ্গেকার বোষ্টমী ধরনের মহিলাকে খাবারের জন্য বলিতেন। খাবার ছিল খিচুড়ি। এই খিচুড়ি লোকজন আনিয়া দিত এবং তাহার আখড়ায় শত শত লোক আসিতেন এবং খাওয়াদাওয়া করিতেন। এই বোষ্টমীর চেহারা খুব সুন্দরী ছিল।

লালন শাহ গেরুয়াবসন পরিতেন। পরনে কপনি থাকিত, তার উপর গেরুয়াবসন পরিতেন এবং এই পরিধানের কাপড় পা পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। এই কাপড় তিনি কোনো খলিফা দ্বারা তৈরি করেন নাই। নিজের হাতে সেলাই করিয়া পরিতেন। তিনি রাতে গান বলিতেন এবং এই গান মধ্যরাত পর্যন্ত চলিত এবং সকালে ঘণ্টাখানেকের কিছু বেশি সময় গান করিতেন। তাহার পরে স্নান আহার করিয়া নির্জনে ধ্যানে বসিতেন, তখন কাউকেও তিনি তাহার কাছে যাইতে দিতেন না। মাঝে মাঝে ভিতর হইতে শব্দ শোনা যাইত। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি খুব জোয়ান ছিলেন এবং কর্মঠ ছিলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি তাহার আখড়ায় উৎসব করিতেন। তিনি কাহারও সাথে গানের পাল্লা বা প্রতিযোগিতা করেন নাই। তবে ফকিরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা পাল্লাপাল্লি হইলে তিনি গানের মাধ্যমে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। তিনি আখড়া হইতে কোথাও তেমন যাইতেন না। কোনো বাহাছে তিনি অংশ লইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি বসিয়া বসিয়া দু'তারা বাজাইয়া গান করিতেন এবং তাহার বোষ্টমী দাঁড়াইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেন। তিনি কালিগাঙে স্নান করিতেন এবং মাঝে মাঝে আখড়ার ভিতরে একটি কুয়ার পানি তুলিয়া স্নান করিতেন। শিমুলিয়ার উমেদ ফকির, দোহাখোলা-আলমপুরের রায় মল্লিক ফকির এবং ছেঁউড়ের লাচন ফকির, ভোলাই সা–তাহার শিষ্য ছিলেন। মলম শাহ নামে একজন লোক তাহার পাশে সর্বদা থাকিতেন। জোলাপাড়ায় বাড়ি ছিল। আমি শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাহার আখড়ায় আসিতেন। তাহাকে সম্মান জানাইতেন এবং গান শুনিতেন। লালন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়িতে কোনো দিন গিয়াছেন কিনা শুনি নাই। তবে ছেঁউড়িয়ার কিছু জমি লালন শাহকে দিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি।

লালন শাহ-এর হাতে একটি লাঠি থাকিত, তাহা মুঠির কাছে দেখিতে ধলশার পাখির ঠোঁটের মতো ছিল। তাহার কোনো ঘোড়া ছিল না। রবিঠাকুর কুষ্টিয়ায় আসিয়া তাহার নিজের বাড়িতে (কুষ্টিয়া স্টেশনের কাছে) থাকিতেন এবং একদিন পরে লালন শাহ-এর গান শুনিয়া কুঠিবাড়িতে ফিরিয়া যাইতেন। কুঠিবাড়িতে রবিঠাকুর

প্রায়ই নাচ-গানের আসর করিতেন। অনেক মেয়ে-ছেলে নাচগান করিত। আমি নিজে এই নাচগান দেখিয়াছি। তখন কুঠিবাড়িতে বিজলি বাতি জ্বলিত।

লালন শাহ যেদিন মারা যান সেদিন রাত্রিকালে তাহার জ্বর আসে এবং পরের দিন দিনের বেলায় তিনি মারা যান। সকলে বলিত তিনি খাঁচা বদলাইয়া গেছেন। লালন শাহ ছেঁউড়িয়াতে মারা গিয়াছেন বলিয়া লোকমুখে শুনিয়াছি। তবে তাহার শিষ্যগণ বলিতেন সাঁইজি খাঁচা বদলাইয়াছেন এবং আখড়ায় তাহার কবর দেখাইয়া বলিত : সাঁইজি এই কবরে নাই। তিনি খাঁচা বদলাইয়া স্বর্গে গেছেন। যদি কেউ কবর খুঁড়িতে চাহিত হবে তাহারা কবর খুঁড়িতে দিত না। সর্বদা পাহারা রাখিত।

উপরের লিখিত বিবৃতি আমার কথামতো লেখা হইয়াছে এবং আমাকে পড়িয়া শোনানো হইয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

১। স্বাক্ষর : আইনউদ্দিন মণ্ডল
আমাদের সামনে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হলো :
বিবৃতির লেখক : আনোয়ারুল করীম

স্বাক্ষর : সিরাজুল হক তাং ২/৬/১৯৭৩ইং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	স্বাক্ষর : বি মজুমদার তাং ২/৬/১৯৭৩ইং সহকারী পরিচালক পল্লী উন্নয়ন	স্বাক্ষর : অস্পষ্ট তাং ২/৬/১৯৭৩ইং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
স্বাক্ষর : ম. আ. খালেক তাং ২/৬/১৯৭৩ইং ১ম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট কুষ্টিয়া	স্বাক্ষর ; হেদায়েতুন্নবী তাং ২/৬/১৯৭৩ইং ১ম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট কুষ্টিয়া	

শের আলী মণ্ডল

আমার নাম শের আলী মণ্ডল, পিতার নাম মধু মণ্ডল, বাড়ি জয়নাবাদ (ছেঁউড়িয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম)। আমার বয়স আনুমানিক প্রায় ১১৬ বৎসর। আমার জন্ম বাংলা ১২৪৯ সন। আমি ছোটবেলা হইতে লালন শাহকে দেখিয়াছি। প্রথম যেদিন দেখি তখন আমার বয়স প্রায় ১২/১৩ বৎসর। আজ হইতে ৮০/৮৫ বৎসর আগে লালন শাহ মারা যান। আমি তাহার মৃত্যুর দিনে উপস্থিত ছিলাম না, তবে তাহার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া যে খয়রাতি খাওয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই খয়রাতি খাওয়াতে অংশ লইয়াছিলাম। আমার আপন খালাত ভাই পাচু মণ্ডল লালন শাহ ফকিরের শিষ্য ছিলেন এবং তাহার কাছেই অধিকাংশ সময় থাকিতেন। আমাদের এ অঞ্চলে লালন শাহ ফকিরের দলের বিরুদ্ধবাদী অনেক লোক ছিলেন। তাহারা লালনের গান এবং লালন শাহ-এর দল পছন্দ করিতেন না।

লালন শাহ ছেঁউড়িয়া আশ্রমে থাকিতেন। এই আশ্রম সিরাজ সাঁই নামক এক ফকিরের ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। লালন শাহ ছেঁউড়িয়ায় আসিয়া প্রথমে মলম কারিকরের বাড়িতে ওঠেন বলিয়া শুনিয়াছি। তবে তিনি আশ্রমে এক চারচালা খড়ের ঘরে থাকিতেন এবং এই ঘরেই তিনি মারা যান। এই ঘর ছাড়া এই আখড়ায় আরও তিন-চার খানি খড়ের ঘর ছিল। লালন শাহের এক সেবাদাসী ছিল। তার নাম আমার মনে নেই। বয়স দেখিতে মধ্যম বয়সী মনে হইত। তবে মনে হয় তখন বেশি বয়স ছিল না। ইনি লালন শাহ-এর পরে মারা যান।

লালন শাহ কোন অঞ্চলের লোক ছিলেন কিংবা কোন জাতের মানুষ ছিলেন তা বলিতে পারিব না। তিনি কোনো সময় সে বিষয়ে কথা বলিতে চান নাই। লালন শাহ দেখিতে লম্বা ধরনের ছিলেন। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল। নাক খাড়া ছিল। বাম চোখ ছোট ছিল। মুখে বসন্তের দাগ হয়তো সামান্য ছিল, কিন্তু তেমন মালুম হইত না। বাম চোখ দেখিতে ট্যারা ধরনের ছিল। চুলে ঝুঁটি বাঁধিতেন না। বড় বাবরি ছিল। এই বাবরি ঘাড় পর্যন্ত নামিয়া আসিত। মুখে ছাগলদাড়ির মতো ছিল। চুল তখনও অর্থাৎ আমার দেখাকালীন সম্পূর্ণ পাকা ছিল না। কিছু কিছু পাকা ছিল। আকার আকৃতি সাধুপ্রকৃতির ছিল।

লালন শাহকে নামাজ পড়িতে কখনও দেখি নাই। তবে মারা যাবার পর তাহার কবরের পাশে লালনের শিষ্যরা একঘটি ওজুর পানি রাখিত দেখিয়াছি। লালন শাহ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কথা বলিতেন না। অধিকাংশ সময়ে ধ্যানে থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে গান গাহিয়া শিষ্যদের শুনাইতেন। কোনো বাহাছ বা তর্কাতর্কিতে লালন শাহ অংশ নিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তবে শিষ্যরা পাল্লা গান আরম্ভ করিলে তিনি মীমাংসা করিয়া দিতেন।

লালন শাহ-এর গলায় মোটা ধরনের তছবি ছিল। লালন শাহ কপনি পরিতেন এবং তাহার উপরে গেরুয়া ধরনের বসন পরিধান করিতেন। খিরকা ফুলহাতা ছিল। লালন শা-এর সেবাদাসী লালন শাহ-এর শরীরে তেল মর্দন করিতেন।

লালন শাহ-এর আখড়ায় সকাল-সন্ধ্যায় গান হইত। তাঁহার এই আখড়ায় রবিঠাকুর আসিতেন শুনিয়াছি। আমার খালাত ভাই পাচু মণ্ডল লালন শাহকে রবিঠাকুরের কুঠিবাড়িতে লইয়া যাইতেন। অনেক সময় ঠাকুর কুষ্টিয়ায় তাহার নিজের বাড়িতে আসিয়া থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে আখড়ায়ও আসিতেন। তখন চারিদিকে জঙ্গল ছিল। লালন শাহ-এর একটি আশা (একপ্রকার লাঠি) ছিল। তিনি এই আশা সবসময়ে হাতে নিয়া চলিতেন। এই আশার রং কালো ছিল। লালন শাহকে দেখিতে হিন্দু মনে হইত। অবশ্য ইহা আমাদের ধারণা। তিনি খুব গাঁজা খাইতেন। লালন শাহ আখড়ার ভিতরকার কুয়ার পানি উঠাইয়া গোছল করিতেন। তিনি খড়ম পায়ে দিতেন। তাহার মুখে গোঁফ ছিল। তিনি ভিক্ষায় যাইতেন কিনা জানি না। তাহার আখড়ায় মাঝে মাঝে উৎসব (মচ্ছব) হইত। অনেক ফকির আসিয়া তাহাতে যোগ দিত।

লালনের চারপাশে প্রায় যাদের দেখিতাম তাহারা অনেকে ছেঁউড়িয়া ও আশেপাশের বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে মলম কারিকর, রহিম শা, লাচা বিশ্বেষ, ভোলাই শাহ, শীতল শাহ, মনিরুদ্দিন শাহ অন্যতম।

এই বিবৃতি আমি স্বজ্ঞানে বলিলাম এবং প্রফেসর আনোয়ারুল করীম তাহা লিখিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য। নাম এক পার্শ্বে সহি।

স্বাক্ষর : *শের আলী মণ্ডল*
আমাদের সামনে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইল :
বিবৃতির লেখক : *আনোয়ারুল করীম*

স্বা. সহিদ হোসেন
শিল্পী

স্বা. মো. ইসহাক আলী
প্রাক্তন ছাত্র
সরকারি কলেজ
গ্রাম : জয়নাবাদ

স্বা. মো ফরিদুল কবীর
জয়নাবাদ

স্বা. অস্পষ্ট
১ম বর্ষ আলেম
বাড়ি বাখরপাড়া,
যশোর।

অন্যান্য তথ্য

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের ভাড়ারা গ্রামে লালন শাহ নামে অপর একজন ব্যক্তির খবর পাওয়া যায়। তিনিও ফকিরধর্মে দীক্ষিত ছিলেন এবং গান করতেন। লালনের সমকালে তিনি জীবিত ছিলেন। আমি এই গ্রামে এই কথিত লালন শাহ-এর বাড়িতে যাই এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আলাপ করি। ভাড়ারা গ্রামে দ্বিতীয় কোনো লালন ফকির কোনো দিন ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারেননি। আমার ধারণায় ভাড়ারার এই কথিত লালন এবং আমাদের আলোচ্য লালন ফকির এক নন। লালনের জীবিতকালে এবং পরবর্তী সময়ে আত্মীয়স্বজনের মধ্য থেকে এমন দাবি কখনও ওঠেনি।

অতিসম্প্রতি আমি ভাড়ারা গেলে সেখানে কতিপয় তরুণ লালন ফকিরের বাড়ি ভাড়ারা গ্রামে ছিল বলে জানায় এবং সেখানে তারা 'লালনগীতি সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছে, দেখতে পেলাম। তরুণদের মধ্যে এই উৎসাহের কারণ লালন বর্তমানে জাতীয় লোককবি এবং সাধক। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে গবেষণা চলছে। এ ছাড়াও বেশকিছু গ্রন্থে এবং নিবন্ধে ভাড়ারা গ্রামের উল্লেখ রয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামেও এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। হরিণাকুণ্ডু থানাতে লালন শাহের নামে একটি সরকারি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে জনাব আবু তালিব এবং ড. এস.এম লুৎফর রহমান লালনশিষ্য দুদ্দু শাহ বিরচিত একটি কলমী পুঁথি আবিষ্কারের দাবি করেছেন। এই পুঁথিতে লালনের জন্ম হরিশপুর এবং মৃত্যুকাল ১২৯৭ সালের পরিবর্তে ১২৯৫ বলা হয়েছে। গবেষকরা নানা কারণে এই পুঁথি গ্রহণ করেননি। অতঃপরও জনাব আবু তালিব 'লালন চরিতের একটি অধ্যায়' এই নামে অধম কাঙ্গাল বিরচিত 'মুন্সি ফকিরের বাহেছ নামা' ভিত্তিক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এসব তথ্য পর্যালোচনার অবকাশ রাখে।

তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে সাধু বা ফকিরমহলে অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা গ্রহণকালে নতুন নামকরণ হয়ে থাকে। লালনের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়েছিল কিনা জানা যায় না। পুঁথিতে লালনের পিতা দরিবুল্লাহ দেওয়ান ওরফে মলম কারিকর এবং আলম কলম নামে লালনের আর দুই ভাইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ছেঁউড়িয়াতে মলম কারিকরের স্ত্রী মতিজান লালনকে উদ্ধার করে বলে জনশ্রুতি আছে, এবং মলমের আরও তিন ভাই–আলম, তিলম ও কলম-এর সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে দুদ্দু শাহের পুঁথি বিষয়টি সন্দেহের উদ্রেক করে। পুঁথিটি আমি স্বচক্ষে দেখিনি। পুঁথির যথার্থতা সম্পর্কে কেবল অভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গই মন্তব্য করতে সক্ষম হবেন।

তবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : লালন ফকির নিজেই তাঁর জন্মস্থান এবং জাতিত্ব কাউকে বলে যাননি এবং সে বিষয়ে তাঁর কোনো শিষ্য কখন বলতে সক্ষম হয়নি। দুদ্দু শাহ লালনের শিষ্য ছিলেন সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে আরও অনেকেই লালনের শিষ্য ছিলেন এবং ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে তারা একত্রে বসবাসও করেছেন। দুদ্দু শাহ তাঁর একটি গানে বলেছেন তিনি লালন শাহ-এর কুল জানেন না এবং লালনের কোনো শিষ্যও কখন সে সম্পর্কে কিছু বলেননি।

আব্দুল ওয়ালী সাহেবের নিবন্ধে লালনের জন্মস্থান হরিশপুরে বলা হয়েছে, কিন্তু কিসের ভিত্তিতে আব্দুল ওয়ালী এমনটি বললেন তার কোনো প্রমাণ তিনি দেননি। বরং লালন যে সাধারণের মধ্যে 'কায়স্থ' নামে পরিচিত ছিলেন আব্দুল ওয়ালী তাও বলেছেন। এসব কারণে লালন ফকিরের জন্মবৃত্তান্ত আজো আমাদের কাছে রহস্যময় রয়ে গেল–যেমনটি রয়েছে তাদের গান।

লালনের গান তথ্যানুসন্ধান

লালনজীবন তথ্যানুসন্ধানে লালন ফকির রচিত গান কম গুরুত্বের নয়। লালন তাঁর গানে জাতিভেদের প্রতি যেমন প্রতিবাদমুখর ছিলেন, তেমনি সকল জাতিত্বকে অস্বীকার করে কেবল 'সকল মানুষই এক জাতি' এই ধারণা পোষণ করেছেন। এমনি একটি গানে লালন তাঁর জাতিত্বের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। যেমন :

সব বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান ॥
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
ভবে কেউ খায় না কারো ছোঁয়া
ভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥
বেদ পুরাণে করেছে জারি
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
আমি বুঝেও বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কী তার প্রমাণ ॥
বিবিদের নাই মুসলমানি
পৈতা যার নেই সেও তো বাওনি
বোঝরে ভাই দিব্যজ্ঞানী
লালন তেমনি খাতনার জাত একখানা ॥

এই গানে লালন জাতিত্বের প্রতি শুধু ব্যঙ্গ বা কটাক্ষপাতই করেছেন তা নয়, নিজের জাতিত্বকে অসার প্রমাণ করেছেন সুকৌশলে। মুসলমানের বিবির যেমন খাতনার প্রয়োজন হয় না, বামণীর প্রয়োজন হয় না পৈতার; কারণ উভয়ে পরিচিত হয় স্বামীর সুবাদে, তেমনি লালন খাতনার জাত। অর্থাৎ তার খাতনা হয়নি। গুরু মুসলমান নামধারী বিধায় তিনিও তাই। এতে এমন ধারণা জন্মে যে জন্মগতভাবে হয়তো তিনি ভিন্নধর্মালম্বী ছিলেন, কিন্তু ফকিরি মত গ্রহণ করার পর তিনি মুসলমান ফকির। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, বাউলসাধনা মূলত সুফি বাতেনী এবং বে'শরা নির্দেশক। সুতরাং শরিয়তি মুসলমান থেকে তাঁর আদর্শ ছিল ভিন্ন। আব্দুল ওয়ালী তাঁর বিবরণে লালনকে মুসলিম বলে উল্লেখ করেননি তবে তিনি সাধারণের মধ্যে কায়স্থ বলে পরিচিত ছিলেন–এমন বলেছেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে লালন জন্মসূত্রে হিন্দুর সন্তান ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ফকিরি মতে মুসলমান হন। সিরাজ সাঁই এবং লালন একই স্থানের মানুষ থাকায় উভয়ে উভয়কে চিনতেন এবং লালন তাঁর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষা নেওয়ার পেছনে কোনো কারণ থাকতে পারে। এক্ষেত্রেও আমরা গানের সাহায্য নিতে পারি।

১

কুলের বউ হয়ে মনা আর কত কাল থাকবি ঘরে
ঘোমটা ফেলে আয় না এখন সাধ বাজারে।
কুলের দায়ে কাজ হারাবি কুল কি নিবি সঙ্গে করে
পস্তাবি শ্মশানে যেদিন রাখবে তোরে ॥

২

তুমি কার কেবা তোমার এই সংসারে
মিছে মায়ায় মজে কেন এমন কারো রে ॥
এত পীরিত দন্তে ও জিহ্বায়
কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়
স্বল্পেতে জানতে হয় ভাব নগরে ॥
সময়ে সকলি সখা
অসময়ে কেউ না দেয় দেখা
যার পাপে সে ভোগে একা চার যুগেরে ॥
আপনি যখন নও আপনার
কারে বল আমার আমার
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার জ্ঞান নাইরে ॥

এ দুটি গান থেকে এমন অনুমিত হয় যে লালন সাংসারিক জীবনে প্রচণ্ড আঘাত লাভ করেন এবং সে কারণেই হয়তো তিনি সমাজ সংসার ত্যাগ করে বাউল ফকিরি মতে দীক্ষিত হন। অথবা এমনও হতে পারে যে, তিনি বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনে সকলে পরিত্যাগ করে এবং পরবর্তীকালে সিরাজ সাঁই কর্তৃক সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে ভালো হলে ফকিরি মতে দীক্ষা নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন এবং মুসলমান হওয়ায় তাঁকে আর হিন্দুসমাজে কেউ গ্রহণ করে না। এমনকি তাঁর স্ত্রীও তাঁর সাথে আসতে চান না। এসব ঘটনা তাঁর মনকে পীড়িত করে তোলে। মনে হয়, এ কারণে চাপড়ার ভৌমিক বংশীয়দের কেউ তাঁর স্বজাতি হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাননি এবং লালনের জীবিত থাকাকালে অথবা পরে এ সম্পর্কে কেউ কখনও কিছু বলেননি। তবে লালনের গানের ভাষা দেখে অনুমিত হয়, তিনি কুষ্টিয়া কিংবা পার্শ্ববর্তী জেলার বাসিন্দা ছিলেন।

কুষ্টিয়াতে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মোসলেম ফকির বলে একজন বাউল ফকির ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে চাকরি করতেন। তাঁর কাছে শুনেছি, কুষ্টিয়াতে সিরাজ সাঁই-এর দুজন শিষ্য ছিলেন। এর একজন ছিলেন ভাড়ারা গ্রামের আরমান সাঁই এবং ছেঁউড়িয়া গ্রামের মলম সাঁই। ছেঁউড়িয়ায় মলম সাঁই-এর বাড়িতেই লালন ফকির প্রথমে ছিলেন। তারপর মলম তাঁর বাড়ির দক্ষিণপাশের অংশ লালনের নামে উইল করে দেন।

ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালনের অনুসারী শিষ্য প্রবীণ ইসমাইল সাঁই ফকির (৭০) তাঁর জীবিতকালে আমাকে বলেন যে মলম সাঁই লালন ফকিরকে দুই একর সাতাত্তর শতক জমি উইল করে দিয়েছিলেন। তিনি তার তরুণ বয়সে এই উইল স্বচক্ষে দেখেন, তখন তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। এই উইলে লালনের হস্তাক্ষর ছিল। তবে হাতের লেখা আঁকাবাঁকা ছিল। ইসমাইল ফকির বলেন যে, তিনি

ভোলাই সাঁই ফকিরের নিকট শুনেছেন যে ২৫ বছর বয়সে লালন ফকির ছেঁউড়িয়া আসেন এবং আসার তিন বছর পরে বিশখা নামে ২০/২২ বছর একজন মহিলাকে একদিন সঙ্গে নিয়ে আসেন। সবাই তাকে 'গুরু মা' বলত। তিনি লালনের সঙ্গে একত্রে ছেঁউড়িয়াতে বসবাস করেছেন। লালনের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর তার মৃত্যু হয়। মাজারে তার কবর আছে।

লালন শাহ দর্গা কমিটি :

লালন ফকিরের মৃত্যুর পর শীতল সাঁই এবং ভোলাই সাঁই লালনের আখড়াবাড়ি তদারকি করতেন। দীর্ঘদিন আখড়াবাড়ি খাজনা পরিশোধ না-করায় ১৯৪৫ সালে আখড়াবাড়ির সম্পত্তি নিলামে ওঠে। ইসমাইল ফকির আখড়াবাড়ি নিলামে খরিদ করেন। এই সময় তিনি লালন শাহ দর্গা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ভাগ্যকুল এস্টেটে দর্গা কমিটি দরখাস্ত দিয়ে আখড়াবাড়ির খাজনা ১ টাকা নিরিখে লাখেরাজ হিসেবে ধার্য হয়।

লালন ফকিরের শিষ্য

সমগ্র দেশে লালন ফকিরের অসংখ্য শিষ্য এবং অনুসারী ছিল। এদের মধ্যে যারা লালনের আখড়ায় অধিকাংশ সময়ে কাটাতেন, তাদের সকলের নিবাস আখড়ার আশেপাশে কিংবা পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে ছিল। এখানে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো : শীতল শাহ, ভোলাই শাহ, পাচু শাহ, মানিক শাহ, মনিরুদ্দীন শাহ, কুধু শাহ, মহরম সা, আরমান শাহ, দুদ্দু শাহ, জগো সা, মতিজান, ভাঙ্গুড়ী ফকিরানী, কামিনী ফকিরানী, পেয়ারী নেছা, শান্তি ফকিরানী।

লালন শাহের একটি গানের ঘরানা ছিল। এর মূলে ছিলেন মনিরুদ্দীন ফকির। এবং সঙ্গী ছিলেন খোদাবখ্শ (হরিণাকুণ্ডু), দুদ্দু সা এবং পরবর্তীতে অমূল্য সা।

ভোলাই শাহ (মৃ. ১৯৪০)

লালন ফকিরের ছেঁউড়িয়া আখড়াবাড়িতে যে কয়জন শিষ্য নিয়ত তাঁর পাশে থাকতেন তাঁদের মধ্যে দুদ্দু শাহের পরে ভোলাই শাহ, শীতল শাহ, মনিরুদ্দিন শাহ, পাঁচু শাহ অন্যতম ছিলেন।

লালনের মৃত্যুর পর আখড়াবাড়ির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল শীতল শাহ এবং ভোলাই শাহ-এর উপর। শীতল শাহকে ফকিরেরা বড়ফকির এবং ভোলাই শাহকে ছোটফকির বলে অভিহিত করত। ভোলাই শাহ-এর বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী উদিরবাড়ি-মজমপুর গ্রামে ছিল বলে জানা যায়। তিনি তরুণ বয়সে লালন ফকিরের গান শুনে ছেঁউড়িয়াতে গিয়ে লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লালন ফকির তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পরবর্তীকালে লালন ফকিরের পালিতা কন্যা বলে কথিত পিয়ারী বেগমের সঙ্গে ভোলাই শাহ-এর বিবাহ দেন। ভোলাই শাহ অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিলেন। অতঃপর শীতল শাহের মৃত্যুর পর ভোলাই শাহ আখড়াবাড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। শীতল শাহ ও ভোলাই শাহ-এর জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের উভয়কে কুঠিবাড়িতে আমন্ত্রণ করেন এবং লালন ফকির সম্পর্কে তথ্যাদি গ্রহণ করেন। ভোলাই শাহ ১৯৪০ সালে ছেঁউড়িয়া আখড়াবাড়িতে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে পিয়ারী বেগম দেহত্যাগ করেন।

ভোলাই শাহ-এর শিষ্যদের মধ্যে কোকিল শাহ ও ইসমাইল শাহ অন্যতম ছিলেন। ভোলাই শাহ বাউলসাধনাতে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং লালন ফকিরের গান শুনে তিনি তা কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। পরবর্তীকালে সেসব গান একটি খাতায় লিখে রাখা হতো।

মনিরুদ্দীন শাহ

লালন শাহের শিষ্যদের মধ্যে মনিরুদ্দীন শাহ-এর নাম সকলের নিকট সুবিধিত। তিনি বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড থানার কালিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাইদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় মনিরুদ্দীন ছেঁউড়িয়ায় লালন ফকিরের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মনিরুদ্দীন শাহ লালনগীতির ভালো শিল্পী ছিলেন। লেখাপড়া জানার দরুন লালন-এর প্রায় গানই তিনি খাতায় লিখে রাখতেন। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং প্রায়ই তিনি শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে যেতেন। লালন শাহের মৃত্যুর পর আখড়াবাড়ির কর্তৃত্ব নিয়ে ভোলাই শাহ ও তাঁর মধ্যে মনোমালিন্য হয়। অতঃপর তিনি ছেঁউড়িয়া ত্যাগ করে স্ব-গ্রামে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথের নিকট লালন ফকিরের গানের যে খাতা ছিল সে খাতাটি মনিরুদ্দীন শাহের বলে জনশ্রুতি আছে। তিনি শিক্ষিত হওয়ায় লালন ফকিরের 'ভাবগান' তিনি অন্যদের নিকট ব্যাখ্যা দিতেন বলে শোনা যায়।

মনিরুদ্দীন শাহের শিষ্যদের মধ্যে হরিয়ারঘাট (হরিণাকুণ্ড) গ্রামের খোদাবখশ সে সময়ে একজন বিশিষ্ট বাউল সংগীতজ্ঞ ছিলেন। শুকচাঁদ নামে তাঁর একজন শিষ্য ছিল। শুকচাঁদও বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন।

পাঁচু শাহ (মৃ. ১৯২৮)

পাঁচু শাহ লালন ফকিরের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তাঁর আদিবাড়ি কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার অন্তর্গত উজানগ্রামের সোনাইডাঙ্গা। তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং একজন বিশিষ্ট সংগীতসাধক ছিলেন। লালন শাহ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। লালনের জীবিতকালে তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে বসবাস করেন। লালন ফকিরের মৃত্যুর পর আখড়াবাড়ির কর্তৃত্ব নিয়ে গোলমাল শুরু হলে তিনি স্ব-গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

মানিক পণ্ডিত

মানিক পণ্ডিত নামে লালন শাহের অপর একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং গানের বিশ্লেষণে পারদর্শী ছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে লালন ফকিরের গানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন বলে সকলেই তাঁকে 'মানিক পণ্ডিত' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে স্বভাবের ছিলেন। লালন ফকিরের বহু গান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ছেঁউড়িয়াতে পরলোকগমন করেন।

উপসংহার

লালনজীবনীর তথ্যানুসন্ধানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে তারা কিশোরকালে লালন ফকিরকে দেখেছিলেন বিধায় এত দীর্ঘকালের ব্যবধানে তা যথাযথভাবে স্মরণ থাকা সম্ভব নয়। এই বিবরণে জানা যায় ছেঁউড়িয়াতে সিরাজ সাঁই-এর আখড়া ছিল এবং মলম সাঁই তাঁর শিষ্য ছিলেন। লালন মলম সাঁই-এর বাড়িতে এসে ওঠেন। এ থেকে অনুমিত হয় সিরাজ সাঁই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা লালন কীভাবে ছেঁউড়িয়াতে আসেন তা বলেননি। তাঁকে কালীগঙ্গার ঘাটে পাওয়া যায়—এমন মন্তব্যও তাঁরা করেননি। সুতরাং লালনজীবনী অদ্যাবধি রহস্যময়ই থেকে গেল।

তথ্যনির্দেশ

১. আনোয়ারুল করীম, *খান সাহেব আব্দুল ওয়ালী*, বাংলা একাডেমি ১৯৯৫।
আব্দুল ওয়ালী একজন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর সদস্য ছিলেন। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ, 'On Curious Tenets And practices of a contain class of Faqirs in Bengal' JAS BB, Calcutta, vol. V. No. 4, 1900-এ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে লালন ফকির এবং দেশজ ফকিরদের সম্বন্ধে সমালোচনা আছে।

২. ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা লালবাজারের কাছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে এই কলেজের সঙ্গে বাঙালিদের যোগাযোগ ছিল না। এই কলেজে বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, উর্দু এবং ফারসি পড়ালেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা নির্মাণে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিশেষ অবদান ছিল। দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলকাতা ১৯৯৬, পৃ. ২৮৬

৩-৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮ ও ২৭৩

৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৯২-২৯৬

৬.৭ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (১৭০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ৩-৪

৮. ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৮

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১

১০. চর্যাগীতিকার পুঁথিগত প্রকৃত নাম *চর্যাগীতিকোষ*। মহামুখোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালে রাজদরবারের সহযোগিতায় সেখানকার সংরক্ষণশালা থেকে অপভ্রংশ মিশ্রিত বাংলা ভাষায় লেখা চর্যাগীতিকা আবিষ্কার করেন।

পুঁথিটি প্রাচীন বাংলা ও নেপালি অক্ষরে লিখিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার তিব্বতি অনুবাদও আবিষ্কার করেন। চর্যাগীতিকা প্রাচীনতম বাংলা ও নেপালি অক্ষরে লিখিত। দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৮
অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, প্রাগুক্ত।

১১. বৈষ্ণব পদাবলীর দুটি ধারা। একটি প্রাক-চৈতন্যপর্ব, অপরটি চৈতন্যপর্ব। প্রথমপর্বে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নিতান্তই আদিরসাত্মক। কিন্তু চৈতন্যপর্বে বিদ্যাপতি আদিরসের পাশাপাশি কাব্যরসকে প্রাধান্য দিয়েছেন ছন্দ এবং উপমার প্রয়োগকৌশলে।

১২. Muhammed Mohor Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol IB, Imam Muhammed Ibn, Sa'ud Islamic University, Riyadh 1985, P. 726
"...from the very beginning Islam made contact with the Hindus on an intellectual plan and gained converts from their highest class through persuasion. Bhojar Brahman (of Kamrup, Assam) presented a Hindu yogic work named Amritkundu (Cistern of nectar) to Qadi Rukn-al-Din who persued it and had it translated into Persian and Arabic" p. 783
অমৃতকুণ্ড সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল এবং এই গ্রন্থটি আলী মারদান খালজী (১২১০-১২১৩ খ্রি.) এর আমলে কাজী রুকন আল দীন সমরকন্দী কর্তৃক অনূদিত হয়। এই গ্রন্থের আরবি সংস্করণ *Journal Asiatique*, tome C C XX III pp. ২৯২-৩৪৪ এ প্রকাশিত হয়েছে। Also see, *Journal of the Pakistan Historical Society*, (J.P.H.S., I, 1953, part-1, 46-55)
মোহর আলী বলেন : "One of the Persian versions entitled Bahr-al-Hayat has been ascribed to Shaikh Muhammed Ghauthi of Gwalior, India who died in 1562 and an Arabic version has been ascribed to the famous Damascus scholar Ibn-al-Arabi. The Arabic work is variously entitled as Hawd al Hayat."
এ সময় বেশকিছু সংখ্যক পণ্ডিত আরব এবং পারস্য থেকে এদেশে আসেন। এদের কেউ কেউ সোনারগাঁও একাডেমির শেখ শরফ আল দীন আবু তাওয়ামার সঙ্গে এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে কাজ করেন। এঁরা অনুবাদ অপেক্ষা সৃজনশীল সাহিত্য এবং গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রণয়নে অধিক উৎসাহী ছিলেন। আবু তাওয়ামা রচিত 'মাকামাত' একটি অধ্যাত্মসাধনা বিষয়ক গ্রন্থ এই সময়কালে রচিত। আবু তাওয়ামার ছাত্রদের মধ্যে তাঁর জামাতা শেখ শরফ আল দীন ইয়াইয়া নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তার অনেক গ্রন্থই সুফিবাদ বিষয়ে রচিত।
(দেখুন, *Calcutta Review*, 1939, P 313)
সুলতানী আমলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংস্কৃত থেকে প্রথম বাংলাভাষায় অনূদিত গ্রন্থ। এই সময় সুলতান ছিলেন জালাল আল দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩১)। এরপর মুর্শিদাবাদ জেলার কুলীন গ্রামের মালাধর বসু 'ভাগবত'-এর ১০-১১ পরিচ্ছেদের

উপর ভিত্তি করে *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* অনুবাদ করেন। এই কাজের জন্য তাঁকে গুণরাজ খান উপাধি দেওয়া হয়। বারবাক শাহ অথবা ইউসুফ শাহ তাঁকে এই উপাধি দেন। (লালনের প্রায় গানে তাঁর ভনিতা আছে। লোকশ্রুতি আছে তিনি লালন ফকিরকে উদ্ধার করেন। তিনি পাল্কিবাহকের কাজ করতেন বলে শোনা যায়।

১৩. শাহ মুহম্মদ সগীর মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রাচীনতম মুসলিম কবি। তাঁকে কেউ কেউ পঞ্চদশ শতকের কবি বলে উল্লেখ করেছেন। ড. এনামুল হক শাহ্ মুহম্মদ সগীরকে চতুর্দশ শতকের কবি বলে উল্লেখ করেছেন। (দ্র. 'ইউসুফ-জোলেখা' সম্পাদক এনামুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ, ১৭-২৭)
মোহর আলী বলেন : The uncertainty about Shah Muhammad Saghir's (and also Zain al Din) date apart, there is no doubt, he was he earliest Muslim to write in Bengaic, See Moho, Ali, op cit p. 861
শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জুলেখা' গ্রন্থে সর্বপ্রথম বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি বাউল, বাউর এবং আউল শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন–

১
চপল চঞ্চল ভেল বাউর মুরতি
২
বিরহে তাপিতহৃদয়কম্পিত
উন্নত লোর এ কেশ
মলিন বয়ান কাতরনয়ান
আউলবাউল বেশ।

১৪. শাহ মুহম্মদ সগীরের কিছু পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতকের কবি। তাঁর সময়কালে সুলতান ইউসুফ শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন (১৪৭৪+৮২)।

১৫. হেরাজতুল্লাহ, পাঞ্জু শাহের গুরু। বাড়ি হরিশপুর কাজীপাড়া। হরিণাকুণ্ডু থানা, জেলা ঝিনাইদহ।

১৬. সিরাজ শাহ, ইনি লালন শাহের গুরু। বাড়ি হরিশপুর, হরিণাকুণ্ড থানা, জেলা ঝিনাইদহ।

১৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫, ২৬৮।

১৮. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮
সত্যপীর, সত্যনারায়ণ মূলত কথিত পীর এবং দেবতা। হিন্দু মুসলমান উভয়েই সত্য পীরের দরগায় মানত ইত্যাদি করেছে এবং তাকে জীবননির্বাহে অন্যতম অধীশ্বর ভেবেছে। অতঃপর কেবল হিন্দুজনের জন্য পরবর্তীকালে সত্যনারায়ণের সৃষ্টি। দেখুন, Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Princetion, New York, 1983, p. 214-217

১৯. জলধর সেন, *কাঙ্গাল হরিনাথ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩২০
আশরাফ সিদ্দিকী, *জমিদার দর্পণের ভূমিকা* ৩ পরিশিষ্ট, ঢাকা, ১৯৬২।

লালন ফকিরের প্রতিকৃতি

এ যাবৎকালে শিল্পী নন্দলাল বসু অঙ্কিত লালন ফকিরের একটি ঝুঁটিবাঁধা ছবি লালনের আসল প্রতিকৃতি বলে সুধীসমাজে চলে আসছিল। নন্দলাল বসু ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে আসেন। এখানে বসেই তিনি অনেকগুলি স্কেচ অঙ্কন করেন। তাঁর মধ্যে একটি স্কেচ তিনি কল্পিত লালন ফকিরের বলে উল্লেখ করাতে সেই স্কেচটিই লালনের আসল প্রতিকৃতি বলে এ যাবৎকালে সমাদৃত হয়ে আসছে। নন্দলাল বসু কখনও লালন ফকিরকে দেখেননি। লালন ফকির ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রায় ২৬ বছর পরে নন্দলাল বসু কর্তৃক লালন ফকিরের সেই ছবি অঙ্কিত হয়েছিল।

কিন্তু পশ্চিম বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত লালন ফকিরের একটি স্কেচ আবিষ্কৃত হওয়ায় নন্দলাল বসু অঙ্কিত স্কেচের প্রতি সকলের সন্দেহ জাগে। কী কারণে এই স্কেচটি এতদিন পাওয়া যায়নি তার কোনো কারণ জানা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত লালন ফকিরের এই স্কেচ কলকাতা রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ছিল। অধ্যাপক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়[১] উক্ত সংগ্রহশালা থেকে প্রতিকৃতিটি উদ্ধার করেন। অধ্যাপক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৬ সালে চাকদহ কলেজ, নদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত লালন স্মরণিকা গ্রন্থে এই প্রতিকৃতি পুনর্মুদ্রণ করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর একটি নিবন্ধও ওই স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়। স্মরণিকাতে আমরাও একটি লেখা প্রকাশিত হয়। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'লালন স্মরণিকা'র একটি কপি আমাকে পাঠান। আমি ১৯৮৪ সালে আমার 'লালনের গান' গ্রন্থে এই প্রতিকৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করি। ড. সনৎকুমার মিত্র[২] ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে 'লালন ফকির কবি ও কাব্য' নামক গ্রন্থে লালনের আসল প্রতিকৃতি বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমতী সরলা দেবী লিখিত 'লালন ফকির ও গগন' নামে একটি নিবন্ধে লালনের পরিচয় দিতে গিয়ে ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্র

বলেন, 'শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রপুস্তকে ইঁহার একটি প্রতিকৃতি দেখিয়াছি তাহাই লালনের পার্থিব দেহের একমাত্র ছায়া—অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই একমাত্র আদর্শ।'

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ গবেষক ডা. সুশীল রায়ের[৩] সঙ্গে এবং নন্দলাল বসুকৃত লালন প্রতিকৃতি অঙ্কনের সঙ্গে জড়িত শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন :

> আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস যে, লালনের সাথে দেখা হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের। একটা চোথা কাগজে লালনের একটি পেন্সিলস্কেচ এঁকেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।... যে কোন কারণেই হোক লালনের স্কেচটি হারিয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুকে এই খবর জানানোর পর তিনি স্মৃতি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচ-এর অনুরূপ লালন ফকিরের একটি স্কেচ আমায় এঁকে দেন। নন্দলাল বসুর এই স্কেচটি পরে আমার গ্রন্থে এবং অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়কে প্রদত্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর এই চিঠি সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন : নন্দলাল বসু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের অনুরূপ আঁকলে লালন ফকিরের আসল প্রতিকৃতির সঙ্গে কমবেশি মিল থাকত। নন্দলাল বসু এবং শচীন্দ্রনাথ অধিকারী কোথাও এই চিত্র অঙ্কনের বিষয়ে এ-কথা বলেননি যে ইতঃপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালন ফকিরের কোনো বাস্তবচিত্র বা স্কেচ করেছেন। লালন ফকিরের স্কেচ হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা এবং তা পরে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সংগ্রহশালা থেকে আবিষ্কার, সবকিছু গোলমেলে মনে হয়। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ড. সুশীল রায়ের এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ড. সুশীল রায়ের উপদেশ এবং নির্দেশ অনুসারে ড. চট্টোপাধ্যায় পরে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহশালায় লালনের স্কেচটি আবিষ্কার করেন। অতঃপর ড. সুশীল রায় ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়কে পত্রে জানান :

> তোমার ৭ নভেম্বর ১৯৭৩ তারিখের চিঠি পেলাম। আমার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল সেই অনুসারে তুমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালনের স্কেচটি রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংরক্ষণশালায় দেখেছ জেনে সুখী হলাম। অবশ্যই লক্ষ্য করেছ যে ঐ স্কেচটির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে চিত্রপরিচয় আছে। স্কেচটি শিলাইদহে বোটে আঁকা, তারিখ ৫ই মে, ১৮৮৯। আমার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থে যে চিত্রতালিকা দেওয়া আছে তাতেও (পৃ. ২৪৫) ঐ ১৮৮৯ উল্লেখ আছে। লালনের এই প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।
>
> তোমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে বলি যে, আচার্য নন্দলাল বসু যেহেতু স্মৃতি থেকে লালনের স্কেচ করেছিলেন, সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূল স্কেচ-এর

সঙ্গে তাঁর পার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়। এ সম্বন্ধেও তুমি উপযুক্ত অনুসন্ধান করো। বাংলাদেশে লালন দ্বিশত জন্মোৎসব উপলক্ষে সেখানে যখন যাচ্ছ, ওখানকার লালন-গবেষকদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে একটু চর্চা করে দেখতে পার।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমি অনেক আগেই (১৯৭৩) এই বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করি এবং লালন ফকিরকে যারা দেখেছিলেন তাদের সঙ্গে আলাপ করি। তাঁরা নন্দলাল বসু অঙ্কিত লালনের চিত্রটি সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেন। তাদের বর্ণনানুসারে আমি ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শিল্পী সহিদ হোসেনকে দিয়ে লালন ফকিরের একটি কাল্পনিক চিত্র আঁকি। চিত্রটি সাপ্তাহিক চিত্রালী (ঢাকা) পত্রিকায় ১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাই শুক্রবার প্রকাশিত হয়।[৪] অতঃপর এ বিষয়টি পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, ড. দুলাল চৌধুরী এবং ড. সনৎকুমার মিত্রকে অবহিত করি। ১৯৭৪ সালে লালন দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট অধ্যাপক, গবেষক ও শিল্পীদের আনবার জন্যে আমি কলকাতায় যাই। সে সময়ে আমার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং লোকসাহিত্য চর্চায় উভয় বাংলার অন্যতম পথিকৃৎ প্রফেসর ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগের তদানীন্তন রীডার প্রফেসর ড. অসিতকুমার ব্যানার্জী, বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, পূর্ণদাস বাউল, বালকৃষ্ণ মেনন, মঞ্জুদাস, ড. দুলাল চৌধুরী, দিব্যজ্যোতি বসু, গৌরী ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্রভারতীয় সংগীত বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এসেছিলেন। সম্ভবত ১৯৭৫ সালে ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় কুষ্টিয়াতে এলে তাঁর সঙ্গেও এ বিষয়ে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমি ১৯৭৩ সালে ছেঁউড়িয়ার তিলাম মণ্ডল, পার্শ্ববর্তী গ্রাম জয়নাবাদের শের আলী মণ্ডল এবং লাহিনীপাড়ার আইনউদ্দিন মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ করি এবং এদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করি। তিলাম মণ্ডলের লিখিত বক্তব্য হারিয়ে যাওয়ায় আইনউদ্দিন মণ্ডল ও শের আলী মণ্ডলের সে সময়ে প্রদত্ত বিবরণ এতদ্‌গ্রন্থে প্রকাশ করেছি।

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রেরিত 'লালন স্মরণিকা'য় এ বিষয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত লালন ফকিরের স্কেচটি এই স্মরণিকায় স্থান পায় এবং তা থেকে শিল্পী সহিদ হোসেনকে দিয়ে আমি এই স্কেচটি পুনরঙ্কিত করি এবং লালন একাডেমির মিউজিয়ামে তা সংরক্ষণ করি। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রচেষ্টা সফল হওয়ার জন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাই।

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় আমাকে জানান যে লালনের প্রতিকৃতি বিষয়ে তিনি শান্তিদেব ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধীর কর, সন্তোষভঞ্জ, গৌরীভঞ্জ প্রমুখের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং তাঁর ধারণা জন্মে যে নন্দলাল বসু অঙ্কিত লালনচিত্রটি মৌলিক নয়। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত লালনের স্কেচটি দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হন।

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের পর ড. সনৎকুমার মিত্র তাঁর গ্রন্থ 'লালন ফকির'-এ উল্লেখ করেন যে সংগ্রহশালায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব ছবিই আছে। লালনের এই ছবির ক্রমিক সংখ্যা ১৯১৪। (Catalogue of Mukul Ch. Dey's collection of paintings and drawings Vol. IV, SI, No. 1914 ... Jyotirinndranath Tagore... Portrait of Lalon Faqir, Pencil-$11\frac{1}{2}''$ + $8\frac{1}{2}''$ 5th May, 1889

সনৎ মিত্র উল্লেখ করেন : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের সঙ্গে নন্দলালের স্কেচের কোনো সম্পর্ক নেই। এবং নন্দলালের লালনচিত্র সম্পূর্ণরূপেই স্বকল্পিত।'

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই লালন ফকিরের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সকল ছবির মধ্যেই লালন ফকিরের ছবিটি ছিল এবং ক্যাটালগে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে, তা বলেছি। এতদসত্ত্বেও লালনের আসল প্রতিকৃতি হারিয়ে গেছে এই মিথ্যে প্রচারণার কি কোনো উদ্দেশ্য ছিল? কী কারণেই বা তা হলো—এ নিয়ে অনুসন্ধান হলে অনেক নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

লালনের গানের খাতা

লালন ফকির ছেঁউড়িয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর তাঁকে কেউ কখনও লেখাপড়া করতে দেখেনি এবং তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন এমনটিই প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি যে গান রচনা করতেন তা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যরা লিখে নিতেন এবং নিজেই সুরারোপ করে গাইতেন। লালনের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া জানতেন। শীতল শাহ, ভেলাই শাহ, মানিক শাহ, মনিরুদ্দীন শাহ প্রমুখ লেখাপড়া জানা মানুষ ছিলেন বলে জানা যায়। তখনকার দলিলে ভোলাই শাহ, শীতল শাহ-এর স্বাক্ষর আছে। তবে লালন ফকির যে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা তার গানের ভাষা, উপমা প্রয়োগ এবং গানে নানা বিষয়ের উল্লেখ দেখে বেশ বোঝা যায়। লালন যে আখড়ায় বসেই সবসময় গান রচনা করেছেন তা নয়। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলেও গান করেছেন এবং সে সময়ে তার গান শিষ্যরা মুখে মুখে শিখে নিত এবং পরে তা তাদের গানের খাতায় লিখে রাখত। লালন ফকিরের অনুসারী অনেক গায়কের কাছে লালনের গান সংবলিত খাতা দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিতে বাউলদের গানের কথা জানা যায়। নন্দলাল সেনগুপ্তের নিকট লিখিত একটি চিঠির এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেন : "...বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।" রবীন্দ্রনাথ এসব খাঁটি বাউলের নাম কোথাও প্রকাশ করেননি, তবে তাদের পুরাতন খাতা সম্বন্ধে যে তার কৌতূহল ছিল—তা বেশ বোঝা যায়।

ছেঁউড়িয়া রবীন্দ্রনাথের জমিদারিভুক্ত ছিল এবং সেই সুবাধে লালনের গানের খাতা রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়া থেকে সংগ্রহ করেন। অতঃপর ১৩২২ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে তাঁর এই সংগীতখাতা থেকে মোট কুড়িটি গান প্রকাশ করেন। প্রকাশের কাল : কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও সতীশচন্দ্র দাস ১৩২২ সালে আষাঢ় মাসে দুটি এবং করুণাময় গোস্বামী ভাদ্র মাসে দুটি লালনের গান প্রকাশ করেন।

আমি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে তিন মাসের জন্য ভারতের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য সেখানে গমন করি। এ সময় শান্তিনিকেতনে বাংলা বিভাগে লালন ফকির এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বক্তব্য রাখি। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে আমি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালনের গানের দুটি খাতা দেখেছিলাম। এই খাতায় সর্বমোট ২৯৮টি গান লেখা ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি গান সামান্য পরিবর্তন করে দুবার লেখা হয়েছিল। আমি তখন লালন একাডেমির পরিচালক ছিলাম। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে এ দুটি গানের খাতার ফটোকপি লালন একাডেমিতে সংরক্ষণের প্রস্তাব দেই। তাঁরা দূতাবাসের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। আমি এই গানের খাতা ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা দেখেছি। খাতার শেষ পৃষ্ঠা থেকে উল্টোদিকে অর্থাৎ ডান থেকে বামে লেখা। লালন একাডেমিতে পরিচালক থাকাকালে অন্য ফকিরদের নিকট রক্ষিত আরও কয়েকটি খাতাতে বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা দেখেছি। কোকিল শাহ-এর নিকট রক্ষিত এমন খাতা সংগ্রহের জন্য চাইলে তিনি তা দিতে চাননি, তবে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বললে চড়াদাম চাওয়াতে তা আর কেনা সম্ভবপর হয়নি। আমি ডানদিক থেকে বামে লেখা বেশকিছু পুঁথি দেখেছি। লালনের গানের খাতা এই পুঁথিস্টাইলে লেখা। লালনগীতির এই দুটি গানের খাতা, যা বিশ্বভারতীর পাণ্ডুলিপি বিভাগে রক্ষিত তা কোনো ফকিরের লেখা। লেখার ধরন পুঁথি এবং দলিল-দস্তাবেজের মতো অনেকটা।

রবীন্দ্রনাথ গানের খাতা কার নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা কেউ বলতে পারে না। তবে লালনের মৃত্যুর পর শীতল শাহ এবং ভোলাই শাহ আখড়ার দায়িত্বে ছিলেন। লালনের জীবদ্দশায় মনিরুদ্দীন শাহ বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানায়, লালন ফকিরের গান প্রায় মুখস্থ করে পরে খাতায় লিখে রাখতেন। পাচু শাহ, বাড়ি সোনাই ডাংগা, কুষ্টিয়া; মানিক শাহ (পণ্ডিত) এবং খোদাবখশ শাহ (হরিণাকুণ্ডু) এবং আরও অনেকে এসব গান লিখে রাখতেন। এসব গানের খাতায় ডানদিকের প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রী শ্রী হক নাম সহায়, শ্রী শ্রী এলাহি ভরসা এমন লেখা দেখেছি। ইসমাইল শাহ-এর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি মনিরুদ্দীন শাহ-এর লিখিত গানের খাতায় লালন ফকিরের যে গানগুলি ছিল তা লালন ফকিরের সময়ে গীত গানের মূল পাঠ। তার কাছ থেকে আরও জানতে পারি যে, মনিরুদ্দীন শাহ, খোদাবখশ শাহ এই গানগুলির সুর এবং বাণী অবিকৃত রেখেছিলেন। পরে এই দায়িত্ব অমূল্য শাহ-এর নিকট ছিল। অমূল্য শাহ লালনগীতির কিছু সুর পরিবর্তন করেন।

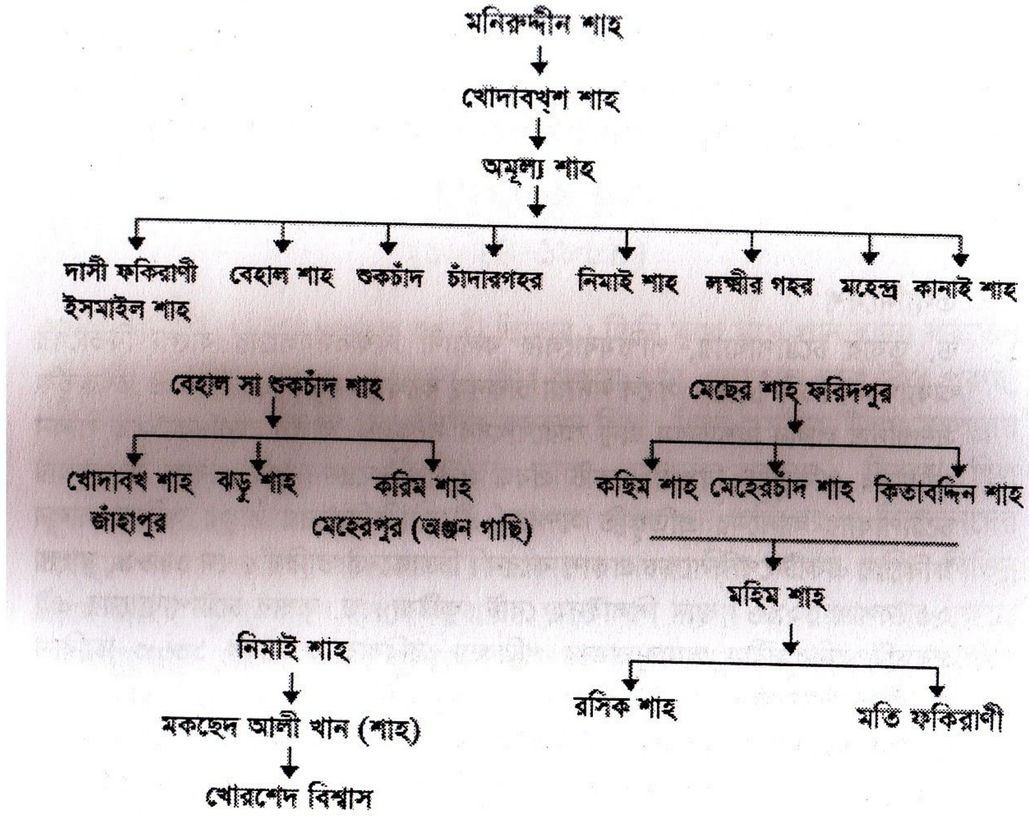
এখানে বলা প্রয়োজন, লালনের মৃত্যুর পর লালন আখড়ার কর্তৃত্ব নিয়ে বেশ দলাদলি শুরু হয়। এই দলাদলির কারণে মনিরুদ্দীন শাহ এবং খোদাবখশ শাহ

আখড়াবাড়ি ত্যাগ করে চলে যান। আমি ১৯৫৭ সালে প্রথম লালন ফকিরের আখড়াবাড়িতে যাই এবং ইত্তেফাকের সাহিত্য বিভাগে 'বাউল কবি লালন শাহ' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখি। সে সময় কোকিল শাহকে আখড়ায় দেখেছি। বেহাল শাহ, খোরেশদ শাহ, খোদাবখশ শাহ (জাঁহাপুর, আলমডাঙ্গা) শুকুর, ইসমাইল সা, সেতু সা, মাতু সা, তক্কেল ফকির, নিমাই শাহ প্রমুখের সঙ্গে আমার প্রায়ই আলোচনা হতো। আরও অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি সবার নাম মনে নেই। এদের কাছে বিভিন্ন গানের খাতা দেখেছি এবং সেসব থেকে বেশকিছু গান আমার প্রথম গ্রন্থ *বাউল কবি লালন শাহ* (১৯৬৩), *লালন গীতি* (১৯৬৬), *বাউল কবি লালন শাহ*, ২য় সংস্করণ (১৯৬৮), *বাউল সাহিত্য ও বাউলগান* (১৯৭১)-এ প্রকাশ করেছি। তবে গান সংগ্রহ করতে গিয়ে লক্ষ করেছি, টাকা-পয়সার বিনিময়ে ফকিরেরা গান বিক্রি করেছে এবং একই গান প্রায় সব সংগ্রহকারীদের দিয়েছে।

যা হোক, 'লালনের গানের খাতা' যা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেন সে খাতার কে লিপিকার ছিলেন তা বলা মুশকিল। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এই গানের খাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো কর্মচারীকে দিয়ে নকল করাননি। যদিও এমন ধরনের একটি অভিমত চালু ছিল যে, ঠাকুর-এস্টেটের একজন কর্মচারী বামাচারণ ভট্টাচার্য এই অনুলিখনের কাজটি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন সালে এই গানের খাতা সংগ্রহ করেছিলেন তার কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে খাতা সংগ্রহ করেছিলেন তার ডানদিকের প্রথম পৃষ্ঠায় 'শ্রী শ্রী হক নাম সহায়' কিংবা 'এলাহি ভরসা' এমন কিছু লেখা দেখিনি। এ থেকে মনে হয় খাতাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কোনো কর্মচারীকে দিয়ে না লেখালেও কোনো বাউল ফকির এই গানের খাতা তৈরি করে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। বাউলেরা সাধারণ মানুষের চোখে 'আবেগপ্রবণ, সহজ ও খোলামেলা' মনে হলেও বাস্তবে তারা অত্যন্ত সাবধানী, স্বার্থপর এবং পরশ্রীকাতর। আমি দীর্ঘদিন তাদের সাথে মেলামেশা করে তা বুঝেছি। আখড়াবাড়িকে কেন্দ্র করে নানা গোলমাল, ঈর্ষাপরায়ণতার শিকার হয়েছে নিজেরাই। মাজারের কর্তৃত্ব নিয়ে ফকিরে ফকিরে বিরোধিতাও দেখেছি। এহেন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ যে লালন গানের আদি খাতা লাভ করেছিলেন–তা মনে হয় না। এই গানের খাতার লেখক মনিরুদ্দীন, কিংবা খোদাবখ্শ অথবা অন্য কেউ হতে পারে। তবে যেই লিখুক না কেন তার সঙ্গে আখড়াবাড়ির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। এ সময় যারা অল্পবিস্তর লেখাপড়া জানতেন তাদের লেখার ধরন ছিল প্রায় একই রকম। গুরুপরম্পরায় এসব গান রক্ষিত হতো। এক-এককজন গুরুর শিষ্যরা সেসব গান শিখে নিত। অবশ্য গানের ক্ষেত্রে ভালো গায়ককেও অন্যেরা অনুকরণ করত। নিম্নে সে-সময়ের লালনগীতির শিল্পীদের ধারাবাহিকতার একটি পরিচয়

দিচ্ছি। ইসমাইল শাহ, গোলাম ইয়ামিন শাহ, স্বরূপ শাহ, দুর্লভ শাহ, বেহাল শাহ, খোদাবখ্শ, ঝড়ু শাহ, মহিন শাহ, কানাই শাহ, মহেন্দ্র গোঁসাই, মনোরঞ্জন গোঁসাই, নিজাম শাহ, গনি শাহ, শুকুর শাহ প্রমুখের সঙ্গে আলাপ অনুসারে লালনগীতির প্রবহমানতার একটি পর্যায়ক্রম তৈরি করেছি।



ইসমাইল শাহ দোতারা নিয়ে গান করতেন। তাঁর গানের সুর অনেকটা গজলের ঢঙে ছিল।

আখড়ায় গোলাম ইয়াসিন শাহ, জব্বার শাহ, গনি শাহ, স্বরূপ শাহ, দুর্লভ শাহ, লালনের গান ধীরলয়ে গাইতেন। তাদের গানে নিবেদনের ভাবটাই ছিল প্রধান। গণি শাহ আজো এই ঢঙেই গেয়ে থাকেন। মহিম শাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে লালনগীতি পরিবেশন করেছেন। তাঁর গান চড়া সুরে এবং দ্রুততালে গীত হতে দেখেছি। তিনি প্রথম জীবনে দোতারা নিয়ে গাইতেন। মহিম শাহ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন এবং বাংলা গানের নানা সুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

লালন ফকির কত গান রচনা করেছিলেন তা অদ্যাবধি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। লালনগীতির গায়কদের নিকট রক্ষিত খাতা থেকে এসবের একটি হদিস করা সম্ভব; তবে অনেক বাউলগায়ক নিজেরাও গান রচনা করতে জানেন এবং

তাদের গানও লালনগীতি বলে অনেক সময় গীত হয়ে থাকে। এ কারণে সব খাতার গানই যে লালনের গান তা মনে করা যথার্থ হবে না। একই গান বিভিন্ন সংগ্রাহক সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। ফলে এসব গান অনেকটাই চর্বিতচর্বণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল ভাষা এবং শব্দের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। লালনগীতির প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বিশ্বভারতীর পাণ্ডুলিপি বিভাগে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত খাতাই এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র ভরসা। ড. সনৎকুমার মিত্র তাঁর 'লালন ফকির' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত গানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবাংলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ১৯৬৭ সালে নদীয়া চাকদহ কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত লালন দ্বিশততম জন্ম স্মরণোৎসব সংকলন 'লালন স্মরণিকা'-তে লালন ফকিরের প্রতিকৃতি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় লালনের প্রতিকৃতি সম্পর্কে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত লালন ফকিরের একটি পেন্সিলস্কেচ প্রকাশ করেন। চিত্রাঙ্কনের তারিখ ৫ মে ১৮৮৯, বাংলা ২৩ বৈশাখ ১২৯৬। স্থান শিলাইদহ বোট, কুষ্টিয়া। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধটি রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়, রবিবার ৯ শ্রাবণ ১৩৮৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

২. ড. সনৎকুমার মিত্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তিনি বাংলা ১৩৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'লালন ফকির' গ্রন্থে লালন ফকিরের প্রতিকৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুরত। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সনৎকুমার মিত্র উভয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত এই লালন প্রতিকৃতি কলকাতার রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহমালা থেকে উদ্ধার করেন বলে উল্লেখ করেছেন।

ড. সনৎ মিত্র তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন : "১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউটে 'ইন্ডিয়ান কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর রায় ছিলেন সভাপতি। আমি সেখানে লালন সম্পর্কে একটি পেপার পাঠ করি। যার অনুষঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরত লালনের স্কেচটিও সভায় প্রদর্শিত হয়।" দ্র. সনৎকুমার মিত্র, লালন ফকির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩. সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭০, পৃ. ২৪৫

৪. সাপ্তাহিক চিত্রালী, ঢাকা, ১৩ জুলাই ১৯৭৩, সম্পাদক : এস.এম পারভেজ।

পাগলা কানাই
(১৮২৪-১৮৮৯)

পাগলা কানাই একজন প্রখ্যাত বয়াতী ছিলেন। তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং তা গ্রামেগঞ্জে গেয়ে ফিরতেন। তাঁর সময়ে গ্রাম এলাকায় নানা সাধু-পুরুষ, পীর-দরবেশ এবং বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের বসবাস ছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল এদেশে অত্যন্ত সম্প্রীতির সাথে বসবাস করেছে। হিন্দুরা ছিল মুসলমানদের তুলনায় বেশি শিক্ষিত। সমাজে মুসলমান জমিদার ও বিত্তবানদের অবস্থান থাকলেও হিন্দু জমিদার ও বিত্তবানদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। বিভিন্ন গ্রামে প্রায়ই পূজা-পার্বণ লেগে থাকত। তবে গান রচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমানেরাই অগ্রণী ছিল। সুফিদের প্রভাবে বাংলাদেশের মুসলমানেরা অত্যন্ত উদারপন্থী ছিল এবং অন্যধর্মের প্রতি তারা সহমর্মিতাসম্পন্ন ছিল। ফলে তাদের গানে এবং শিল্পকর্মে হিন্দুধর্মের কথা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল গ্রামেগঞ্জে সুফিদের অবস্থান থাকায় মুসলমানদের আচার-আচরণে, সংগীত ও শিল্পকর্মে বিভিন্ন ধর্মের একটি সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণে বাংলাদেশে নানা লোকধর্মে, বিশেষ করে বাউল মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

পাগলা কানাই-এর সমকালে লালন ফকির, ইদু বিশ্বাস, নয়ন ফকির, সিরাজ সাঁই, হেরাজতুল্লাহ খন্দকার (সাবেক যশোর জেলা, বর্তমান ঝিনাইদহ জেলা) বিশিষ্ট সাধক এবং তত্ত্বজ্ঞ সংগীতরচয়িতা ও শিল্পী ছিলেন। এ সময়ে পশ্চিমবাংলার ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের নানা দরবেশ ফকির এবং সংগীতসাধকদের কথা জানা যায়। শের আলী শাহ, বুধ শাহ, তাদের অন্যতম ছিলেন। পাগলা কানাইও তাঁদের গান শোনেন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে এসে একজন বয়াতী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এ সময়ে কিছু সাধকদের মধ্যে গগন হরকরা, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ হিন্দুসাধকও গীত রচনা ও পরিবেশনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এসব সংগীতজ্ঞের প্রভাবে পাগলা কানাই

তাঁর গানে একদিকে যেমন দেহতত্ত্বকে উপজীব্য করেছেন তেমনি সমাজ সচেতনার কথাও প্রায় গানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তিনি মূলত একজন বিশিষ্ট লোককবি এবং সংগীতরচয়িতা ছিলেন।

পাগলা কানাই ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার বেড়বাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কুড়ন শেখ ও মাতার নাম মোমেনা বিবি। পাগলা কানাই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। শৈশবে পাগলা কানাই পিতামাতাকে হারান। অতঃপর নীলকুঠিতে কিছুদিন চাকরি করার পর, পেশাদার বয়াতী হিসেবে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে সুপরিচিত হন। বয়াতী হিসেবে পাগলা কানাই যশোর জেলার মণিরামপুর থানার রছুলপুর গ্রামে নয়ান ফকিরের নিকট প্রথম শিক্ষালাভ করেন। নয়ান ফকির একজন বিশিষ্ট 'গাইন' (গায়েন, বয়াতী) ছিলেন। তিনি নিরক্ষর হলেও মুখে মুখে গান রচনা করতে পারতেন এবং তাঁর জারি গানের একটি দল ছিল। পাগলা কানাই এই দলের সদস্য ছিলেন।

পাগলা কানাই কত গান রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না। তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং তাঁর শিষ্যগণ তা মুখস্থ অথবা খাতায় লিখে রাখত। পাগলা কানাই প্রথম জীবনে ধুয়া ও জারিগানে পারদর্শিতা দেখান। এ সময় তিনি ইদু বিশ্বাস নামে জনৈক লোককবির সমসাময়িক ছিলেন এবং কখনও কখনও গ্রামেগঞ্জে একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে গানের আসরে অংশগ্রহণ করেন। ইদু বিশ্বাস পরবর্তীকালে পাগলা কানাই-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইদু বিশ্বাস ধুয়াগানে কৃতিত্ব দেখালেও গানের রসসৃষ্টি এবং শিল্প-সৌন্দর্যে পাগলা কানাই ইদু বিশ্বাস অপেক্ষা অনেক বড়মাপের শিল্পী ছিলেন। পাগলা কানাই মূলত ধুয়া-জারিগানে তাঁর সমকালে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন, জারি গান মূলত এজিদ বাহিনী কর্তৃক কারবালার হজরত ইমাম হোসেন ও তার পরিবারের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

পাগলা কানাই তাঁর রচিত জারিগানে একদিকে যেমন মুসলিম ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন তেমনি কারবালার আহাজারির সঙ্গে বাংলাদেশের বেহুলা-লখিন্দরের বিলাপকে একীভূত করে এক অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন। তাঁর পূর্বে এমন জারিগান অন্যে রচিত করেছেন কিনা জানা যায় না। যেমন :

ও পূর্বে হল ভানু উদয়।
একলা ঘরে শুইয়ে থাকি,
খালি বিছানা দেখি ওরে থেকে থেকে ওঠে মনে স্বামীর হৃদয়
ভরা ঘরে দুয়ার দিয়ে স্বামী যায় বাণিজ্যের নৌকায়।

থাকত পতি খেলতাম পাশা,
পুরাইতো মনের আশা,
ও কারবালাতে ভেঙ্গে নিল এই সকল আশা,
বিধাতা দিয়াছে ফাঁকি।
পাগলা কানাই বলে, ও যেমন লখাই মরে বেহুলার দশা॥

কারবালায় সখিনার বৈধব্য সম্পর্কীয় বিষয়ে কানাইগীতিতে হিন্দু-মুসলিম চিত্র অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন :

আমার বিয়ের রাত্রে মলো পতি এই ছিল কর্মে
কাল সকালে বেরণ বলে গয়না দিছ গায়—
আজ কেন মোর সিঁদুর গয়না খোলা যায়।

কারবালার ঘটনাকে এদেশের মানুষের, বিশেষ করে হিন্দুজীবনের সঙ্গে তুলনামূলক উপস্থাপনা পাগলা কানাই-এর পূর্বে কোনো সংগীতরচয়িতা করতে সক্ষম হয়নি। তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা দীর্ঘকাল হিন্দু-মুসলমানের একত্র বসবাসের সার্থক চিত্র। কারবালায় হজরত ইমাম হোসেনের মৃত্যুতে তাঁর মাতা হজরত বিবি ফাতেমার কল্পিত পুত্রশোক কৃষ্ণজননী দৈবকীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ও দৈবকিনীর কৃষ্ণহারা
ও দুঃখে মায় পাগলাপারা
ও চক্ষে না রয় ধারা
ও গোপালে উদরে রাখলাম
ও চন্দ্র মুখ না দেখলাম
ও প্রাণ থাকতে থাকতে পাষাণের জ্যান্ত মরা
ও বুঝি সেই দশা আমার হলো
কেন ইমাম ছেড়ে গেল
ইমাম শোক আগুন রলো মায়ের বুকে পুরা॥

কিন্তু জারি গানের এই সার্থকতা অপেক্ষা পাগলা কানাই যেজন্য সাধারণ মানুষের হৃদয়মূলে, পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছেন, তা তাঁর দেহতত্ত্ব বিষয়ক ভাবগান। বলতে দ্বিধা নেই যে, পাগলা কানাই-এর ভাবগান বাউলগানের শ্রেষ্ঠতম রচয়িতা ফকির লালনের গানের সঙ্গে একইভাবে সমাদৃত হয়েছে। পাগলা কানাই-এর দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানের সাধনার পরিচয় বিধৃত হলেও তাঁর গানকে বাউলগান বলা যায় না। কারণ তাঁর এই অভিব্যক্তি একজন পরিপূর্ণ সাধকের গভীরতম উপলব্ধির ফসল নয়। পাগলা কানাই যেমন হিন্দুসমাজ ও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা বলেছেন, তেমনি তৎকালীন ভাবগানের রচয়িতা তত্ত্বজ্ঞ সাধকদের ধ্যানধারণার কথাও উল্লেখ

করেছেন। তবে পাগলা কানাই-এর দেহতত্ত্ববিষয়ক গানেও সমাজসচেতনতার কথা বিশেষ রূপ পেয়েছে। যেমন :

আমার দেহ জমি আবাদ হইল না
গুরুর বীজ বুনতে পারলাম না
ও বীজ বুনতে পারলে হত কামরঙ্গা ফল
পুষ্ট হত দানা
গুরু নিবাদের প্রসাদ, ভাই আমার ভাগ্যেতে হল না।
চিরদিন ক্ষেতে ম'লাম খেটে
বেজুতে লাঙ্গল নিলাম জুতে
আমি লাঙ্গল জোয়াল নিয়ে গেলাম স্বর্ণধামের মাঠে।
পাগলা কানাই এর কাঁচি পাহাল ভাই
বীজের দাম দিতে ফাটে ॥

পাগলা কানাই-এর দেহতত্ত্ববিষয়ক গান সাধারণের নিকট ধুয়া বা ভাবগান নামে পরিচিত ছিল। পাগলা কানাই অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং হাজার হাজার শ্রোতাকে তিনি তার সুরেলা কণ্ঠের মাধ্যমে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। পাগলা কানাই-এর একটি ভাবগান :

ও একটি মানুষ দেখলাম ত্রিবেণীর ঘাটে
ও আমি বলি দশের নিকটে
ও মাটি ছাড়া শূন্যে সে হাঁটে
ও তার শিরে জটা বড় লেঠা
সিন্দুর ফোঁটা ললাটে
তিনটি সন্তান তার পেটে।
সে নিজের দুগ্ধ নিজে পান করে
ও দুগ্ধ নাই হস্তিনীর বাঁটে
গোমাংস সে করতেছে আহার
ও তার জাতিকুলের নাই বিচার
সর্বদেবতার পূর্বে পূজা তার
সে যে অনুরাগী, সর্বত্যাগী বক্ষস্থলে জুমের ধার
আহা মরি রূপের কারবার
তাই পাগলা কানাই বলে ভেবে দেখে
ও লীলার নাই পারাপার।

পাগলা কানাই-এর গানে রহস্যময়তা এবং ধাঁধার প্রকাশ ঘটেছে। সাধারণ মানুষ তাঁর এই প্রক্রিয়াকে বেশি উপভোগ করেছে।

অপর একটি গান :

সন ১২৮০ সনে বাধেছে বিষম ক্ষরা
ক্ষেতের শস্য যায় শুকাইয়া
ধানপাটের কর্ম সারা
ছাড়লাম রে ভাই কাজকর্ম করা
এবার পাটে লেগেছে গরম, এই ইস্তক লেগেছে শরম
মরব বলে খাই পচায় মরা।

পাগলা কানাই মূলত অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন কবি ছিলেন। বাউলের মতো তিনি জাতিভেদকে অস্বীকার করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিনি কোনো বিভেদ দেখেননি। যেমন :

নামটি আমার পাগলা কানাই জাতে মুসলমান
হিন্দুলোকের বাড়ি আমরা করিতাম গাহান
ব্রাহ্মণ পেলে আমরা করি কোটি প্রণাম
সে নাম নারায়ণের সমান।

এখানে পাগলা কানাই তৎকালীন সমাজের একটি চিত্রের উল্লেখ করেছেন। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা লোকধর্মে বিশ্বাসী থাকলেও হিন্দু ধর্মবিশ্বাসকে তারা তাদের জীবনাচরণে অস্বীকার করেনি। হিন্দুদের পূজাপার্বণে তারা নিয়মিত তাদের অনুষ্ঠানে গান করেছে। বস্তুত, লোকসংগীতের উদ্ভাবন ও তার সফল প্রকাশ ঘটিয়েছিল মুসলমান লোকসংগীত শিল্পীরা।

পাগলা কানাই ও লালন শাহ সমসাময়িক ছিলেন। তবে লালন শাহ বাউলসাধক হিসেবে তাঁর রচিত গানকে সাধনার অঙ্গ বিবেচনা করেছেন। অপরদিকে পাগলা কানাই বয়াতী হিসেবেই বিভিন্ন অঞ্চলে গান গেয়ে ফিরেছেন। দেহতত্ত্বমূলক সংগীতরচয়িতা ও সংগীতশিল্পী হিসেবেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

পাগলা কানাই-এর গান জনসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। শব্দচয়নে অনুপ্রাস সৃষ্টি করে এবং ছন্দের অপরূপ মাধুর্যে তিনি তাঁর গানকে গতিশীল এবং হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছিলেন। খুব সহজভাবে সাদামাটা আটপৌরে লৌকিক ভাষায় দেহবাদের অনেক জটিল তত্ত্বকে তিনি সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করেছেন। ফলে তিনি একদিন প্রতিদিনের খেটে খাওয়া মানুষের চিত্তবিনোদন ঘটিয়ে তাঁর গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর প্রায় সকল গানেই সমকালীন জীবনের চিত্র রয়েছে। পাগলা কানাই তাঁর দেহতত্ত্বের গানেও সমাজের নানা চিত্র তুলে ধরেছেন। বস্তুত সমাজই ছিল তাঁর গানের উপজীব্য। এ সম্পর্কে তাঁর একটি গানের

অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

এবারকার দুরন্ত বর্ষায় ধান পাট সব তলাইয়া গেল
ভেবে আর কূল পাই না সাকুল্যে মনের শখ মাটি হল
বাজারে খাজনা মহাজনের দেনা দিয়া আদায় করি
ভাবছি বসে অবিরত মনে সেই চিন্তা ভারি।

অপর এক গানে কানাই বলেন :

এক বাপের দুই বেটা, তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরই এক রক্ত, একই ঘরে আশ্রয়
একই মায়ের দুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায় ॥
কারো গায়ে শালের কোর্তা, কারো গায়ে ছিট,
দুই ভায়েরে দেখতে ভারি ফিট
কেবল জবাবিতে ছোট বড়, বোবা বাচাল চেনা যায়।
কেউ বলে দুর্গা হরি
কেউ বলে বিসমিল্লাহ আখেরি
তবু পানি খেতে যায় এক দরিয়ায় ॥
মালা পৈতা একজন ধরে
কেউবা সুন্নত করে
তবে ভায়ে ভায়ে মারামারি করে
যাচ্ছিস কেন সবে গোল্লায় ॥

এমন অসাম্প্রদায়িক চেতনা পাগলা কানাই-এর সমকালে লালন শাহের গানেই লক্ষ করা যায়। এই চেতনা সুফিবাদের প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে গড়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, সুফিবাদের প্রভাবে এদেশের নিম্নশ্রেণীর মানুষ মুসলমান হয়ে পড়ে। হিন্দুদের মধ্যে যে কঠিন জাতিভেদ প্রথা ছিল, মুসলমানদের মধ্যে এমন ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমান সুলতান, মোগল বাদশাহের প্রভাবে বেশকিছু অমাত্যশ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাদের মাধ্যমে এবং স্থানীয় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে তাদের বিবাহ ও সংযোগ সাধনের ফলে আশরাফ আতরাফ এবং আজলাফ শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। হিন্দুরা মুসলমানদের নিকৃষ্ট ভাবত এবং তাদের ছোঁয়া কোনোকিছু স্পর্শ করত না। কোনো মুসলমান তাদের ঘরে গেলে সে ঘর নানাভাবে পবিত্র করা হতো। একই সমাজের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করেও হিন্দুরা মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর বলে মনে করেছে। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যেও কিছু অংশ হিন্দুর প্রতি প্রতিহিংসা পোষণ করেছে। কিন্তু সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা বিরাজ করেনি। এরা লোকধর্মের অনুসরণ করে সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পাগলা কানাইসহ সমকালীন লোকগীতি ও বাউলগানে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

পাগলা কানাই-এর সমকালে ফিকিরচাঁদ বাউল নামে খ্যাত সাংবাদিক-কবি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের সাথে পাগলা কানাই-এর যোগাযোগ ছিল বলে শোনা যায়। মীর মশাররফ হোসেনের একটি গানে পাগলা কানাই, লালন এবং ফিকিরচাঁদের উল্লেখ আছে।

আরে ভাই না পাই দিশে কলির শেষে
কিসে কার মন মজেছে
ফিকির চাঁদে, আজব চাঁদে
রসিক চাঁদে সব মেতেছে ॥
কোথা আর পাগলা কানাই, লালন গোঁসাই
সব সাঁই এতে হার মেনেছে ॥

পাগলা কানাই এত জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন যে তাঁর গান শোনার জন্য হাজার হাজার নারীপুরুষ ভিড় জমাত। সারা রাত ভরে তাঁর গান মানুষ শুনেছে। এসব গানে সাধারণ মানুষেরা চিত্তবিনোদনের সঙ্গে ধর্ম এবং জীবনবোধ সম্পর্কীয় নানা জ্ঞানপিপাসা মিটিয়েছে।

ডক্টর মযহারুল ইসলাম 'পাগলা কানাই' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন : 'শব্দচয়নে প্রায়ই কবি অনুপ্রাস সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং প্রত্যেকটি চরণের শেষে শুধু নয়, মাঝেও বহু মিল দিয়ে ছন্দকে অদ্ভুত গতিশীল ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন। গাঁথুনির পরিপাট্য ছাড়াও কবি অত্যন্ত সহজ কথায় মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। এ সবই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ। পাগলা কানাই-এর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে কাব্যে ছন্দ সৃষ্টিতে বা কথায় সুন্দর গাঁথুনি নির্মাণে এমন অপরিসীম কৃতিত্ব এক লালন ছাড়া আর কারো মধ্যেই ছিল না।"

নিম্নে তাঁর কিছু গানের উল্লেখ করা হলো :

১

শোন বলি মন পাগলা
সারোরে তিন তাসের খেলা
আইসে ভবের হাটে ॥
ও তোর সঙ্গে আছে ছয়জন দাঁড়ে
ও তারা দুষ্ট আর বোম্বেটে
ও তার সঙ্গে কেউ না হাঁটে
ও তারা কাম ছাড়ে যায় লোভের ধারে মন

ও তোপিল বান্দে আইটে ॥
দুই মুড়া দুই মুহুরি খাড়া
জমা ওয়াশিল লেখে তারা
দাখিল হয় একজনের কাছে ॥
ও দলিলপত্র সব নিকাশের কাগজ
ও আবার লক্ষ্য করে যারা
যদি কমতি হয় এক ভরা
পাগলা কানাই বলে, ও আমার মন
সেদিন নিকাশের চোর পড়বে ধরা ॥
তাই বুঝিয়া আমার মন
করো সেই আপ্ত সাধন, করবে মন ত্বরা,
তিন তাসের খেলা সাঙ্গ করো মন
খেলাইতে পারবি তোরা ॥

২

ধড়ে বলে মনের কাছে
ভবের খেলা এই তিন তাসে খেলো সর্বজনা,
ঠক্‌তে ঠক্‌তে জিততে পারবি মন
ও দানে পাবি খাঁটি সোনা ॥
ও 'ধড়' তুমি জানো না
খেলতে লেখতে খেলুয়া সেজন
ও তারে খেলাতে যাবে চেনা ॥
দুই মুড়া দুই ছবি ধরা
ও তার দলিলের কাগজ নিকাশ করে তারা,
ও তার সঙ্গে ছিল যোগী অন্য ধারা,
ও তারা তিন তাসে মিল দিচ্ছে ॥
ও তার কি জমা খরচ আছে–
এই জগতে আর বহিগন আছে ॥
ও তারা আদি এক জগতে আছে ॥
পাঁচেতে পাঁচ মিলে যাবে
পরমেতে জীব লয় হবে,
কার নিকাশ কে দিবে?
ও তিন তাসের খেলা সাঙ্গ হলে ॥
ও হাকিম থাকে কোথায় কারে,
ও থাকে কোন্ শহরে
পাগলা কানাই কয়, সুবিচার করে
ও সেদিন চোর ধরিবা কারে?

৩

আমার মনরে লয়ে ঠেকলাম বিষম দায়,
সে যে গামছা-মোছার দলে ফেরে
দমবাজে দমবাজি খেলায়,
তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা
পলায় যারা কুটনী পাড়া,
কেমনে ধরব সে মন চোরা।
সে চোরা চুরি করে নূপুর দিয়ে পায়,
সে জাগলি ঘরে করে চুরি, ঠিক পায়না দ্বারী পাহারায়,
ঘরে থাকতে মানুষ করে চুরি, ডাংকা মেরে ঘুরে বেড়ায়,
তারে ধরা হল বড় দায় ॥
হইল সদরপুরে চোরের বসতি,
কামেতে প্রেম গিলটি করা ধরে যারে আছে জ্ঞানের বাতি
ও যেমন আগলা নাও শয়তানের ঘোড়া
গুরু বলে নাই প্রেম ভক্তি।
তাই পাগলা কানাই বলে, হল রে তার ঠকবাজারের গতি।

৪

গাছ কাটা ও ভাই গাছি, দুই চার কথা তোমায় বলি,
হুঁস থাইক্যা চাঁচ দিয়ে গাছে ঠিক রাইখো কপালি ॥
অনুরাগের ছড়ি, জ্ঞানের ছুরি
ভাড় যেন হয় না খালি,
ও যেদিন লাল চমকা লাগবে গাছে
বস্তু হয় না রস জ্বাল দিলি।
পাগলা কানাই বলে, পাবি সে ধন চেতন গুরুর সঙ্গ নিলি ॥
আর অজ্ঞানী গাছি যারা, চারা গাছ কাটে তারা,
সে গাছ কখন বাঁচে না;
ঢেইকা গাছের রস হইলে জ্বাল দিলে ওঠে ফেনা
আরও যোগ চিনে গাছে কাটো ভাই,
সে গাছ হবে মিছরিদানা ॥
ও ষোলো ফোঁটা রস আইলে মায়ের চতুর্দলে করো স্থাপন,
অনুরাগের অগ্নি দিয়ে করো সে দাহন,
ও তার এগারো ফোঁটা কইমা যাবে, পঞ্চফোঁটায় মিঠায় হবে
চার ফোঁটায় চিনির গোলা
তাই দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে
তার সন্ধান জানো রে ভাই মনা ॥

৫

বাওয়া একে কলের রথ গড়ে দিচ্ছে দীননাথ,
এমন রথ আর কভু দেখি নাই।
সে রথের গড়ছে আনন খুঁটি
দেখতে বড় পরিপাটি, দেখতে চমৎকার,
এই রকম রথ কভু দেখি নাই ॥
এ রথ গড়া কামিলকারের যদি নাগাল কেহ পাতো
ভবে তার মানব-জনম-বাঞ্ছা পূরণ হোত,
তবে সে রথে চড়ে ছুতার বাড়ি যাইত।
রথের চাকা চূড়োতে গাঁথা আছে এক সূতে
না হলে রথ চলতে পারে না।
ও রথের সারথি আর ইচ্ছা মন
যখন চলে চাকা ঘোর, কোথায় চলে যায়।
সেই রথের সঙ্গে দেখা হলি রথে কথা কয়
এ বড় গৌরব কথা, তাই পাতলা কানাই কয় ॥

৬

যে দেহ-জমি আবাদ হয় না,
দুই বলদে কথা শোনে না।
ওরে আমি যখন হালে জুড়ি
'আইত' কইলে আইত মানে না।
ও সদয় লাঙ্গল চাটে জাঙ্গাল চাটে চঙ্গ টানে না।
দেহ জমি পতিত রইল শস্যা ফলে না।

গেলি সেই বলদের কাছে, রুইখা আসে
ক্ষেনে ক্ষেনে ধরতে চায় ঠাসে,
আবার মদনা এড়ে দুষ্ট ভারি
ও সে ভিটে খুঁটে ধসাইয়া দিছে
পাগলা কানাই বলে, ও মণি
কইরে নেও দিশে।

পাঞ্জু শাহ
(১৮৫১-১৯১৪)

পাঞ্জু শাহ বাউলসাধক ফকির লালন শাহের সমকালে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন তাঁর অত্যন্ত বয়ঃকনিষ্ঠ। পাঞ্জু শাহ তাঁর সমকালে লালন শাহ, পাগলা কানাই, হেরাজতুল্লাহ এবং সিরাজ সাঁই-এর ফকিরি সাধনা এবং গান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। গ্রামেগঞ্জে এসব গান 'ভাবগান', 'ধুয়ো' 'শব্দ' এবং 'বিচারগান নামে পরিচিত ছিল। পাঞ্জু শাহ শৈশবকাল থেকেই এসব গানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রায়ই গোপনে বিভিন্ন গানের আসরে সময় কাটাতেন। এমনিভাবে তিনি হেরাজতুল্লাহ খন্দকার নামে জনৈক ফকিরের সান্নিধ্যে আসেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর নিকট ফকিরি মতে দীক্ষালাভ করেন। হেরাজতুল্লাহ বাতেনী সুফিসাধক ছিলেন। এ সময় বাতেনী সুফিসাধকদের প্রভাব সমধিক ছিল এবং তার অন্যতম কারণ ছিল তাদের গান। এরা প্রচলিত আচার-আচরণ অস্বীকার করেছে এবং গুরু বা পীরকে তাদের জীবন-মরণে নিয়ামক হিসেবে গণ্য করেছে। পাঞ্জু শাহ লালন ফকিরের গানের মাধ্যমে প্রভাবিত হন এবং নিজেও সে অনুসারে সাধনসংগীত রচনা করেন। আরবি, ফারসি এবং বাংলা ভাষায় জ্ঞানলাভের কারণে তৎকালীন সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল এবং সে কারণে পয়ার, ত্রিপদী এবং পুঁথিছন্দে কাব্যও রচনা করেন। পাঞ্জু রচিত 'ছহি ইস্কি ছাদেকি গওহোর' নামে একটি সুফিকাব্য এ সময় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পাঞ্জু শাহ মধ্যযুগের পুঁথিরচয়িতাদের অনুকরণেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাঁর এই রচনায় লৌকিক অধ্যাত্মবাদ ও দেহতত্ত্ব বিষয়ে নানা গুপ্ততত্ত্ব প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আলোচিত হয়েছে। ফলে তাঁর এই রচনা নিছক সাধনতত্ত্ব না হয়ে শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়েছে। পাঞ্জু শাহের বিভিন্ন সাধনসংগীতেও সাহিত্য এবং শিল্পবোধের পরিচয় মেলে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাঞ্জু শাহ তাঁর সাধনায় নিজস্ব একটি 'ঘরানা' নির্মাণ করেন। লালন ফকিরের সাধনার সঙ্গে পাঞ্জু শাহের সাধনার ঘনিষ্ঠ

সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও যৌন আচার-আচরণে তিনি পরোক্ষ এবং ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। শরিয়তবাদী পরিবারে জন্মগ্রহণের ফলে তাঁর মধ্যে একটি রক্ষণশীল মনোভক্তি কাজ করত। লালন ফকিরের সাধনায় সহজিয়া প্রভাব অনেকটাই প্রত্যক্ষ ছিল। পাঞ্জু শাহ এই প্রভাবে প্রভাবিত হলেও সাধনায় তাঁর কৌশল ছিল ভিন্ন।

পাঞ্জু শাহের জীবন ও সাধনার সময়কালকে বিংশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণ বলে অভিহিত করা যায়। এ সময়ে নাগরিক জীবন ও সাহিত্য-সংগীত চর্চার প্রাবল্য লক্ষ করা গেলেও গ্রামেগঞ্জে এই প্রভাব তেমন কার্যকর ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের মনে লোকসংগীত এবং লোকসাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের তেমন কোনো ভাটা পড়তে দেখা যায়নি। বরং লক্ষ করা গেছে যে একশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিও আগ্রহান্বিত হয়েছে। অবশ্য এজন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাদের সাহিত্যরচনায় প্রাচীন আদর্শ ও সংস্কৃতিকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। পাঞ্জু শাহ অবশ্য এই নাগরিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি কৃষিসমাজের প্রতিনিধি ছিলেন বিধায় তাঁর সাহিত্য এবং সংগীত রচনায় এই কৃষিসমাজের অভিব্যক্তি নানা উপমা এবং প্রতীকের মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পাঞ্জু শাহের সমকালে জহরদ্দী শাহ, দুদ্দু শাহ, যাদুবিন্দু সংগীতে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন। এরা লালন শাহ এবং পাঞ্জু শাহের অনুসারী ছিলেন।

জীবনী

পাঞ্জু শাহ ১২৫৮ বঙ্গাব্দে (১৮৫১ খ্রি.) বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাদেম আলী খন্দকার এবং মাতা জোহরা বেগম। খাদিম আলী খন্দকারের পাঁচ সন্তানের মধ্যে পাঞ্জু শাহ ছিলেন তৃতীয়। সাংসারিক কারণে খাদেম আলী খন্দকার শৈলকূপা ত্যাগ করে ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তাঁর প্রভাবে পাঞ্জু শাহ শৈশবকালে কেবল আরবিতে কুরআন শরিফ শিক্ষা করেন। সে সময়ে আরবি ফারসি ব্যতিরেকে অন্য ভাষায় শিক্ষালাভ মুসলমানদের নিকট গ্রহণীয় ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা ছিল তৎকালীন মুসলমানদের নিকট পাপকার্যের মতো গর্হিত। ফলে বাংলা ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষা দুটোই গোঁড়া মুসলমান পরিবারে বর্জনীয় ছিল। ইংরেজ কর্তৃক মুসলমানদের রাজ্যচ্যুতিই এই মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল। কারণ ইসলামধর্মে কোনো ভাষা পরিত্যাজ্য নয়; ভাষা এবং বর্ণ আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শন। ইসলামে এ বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বরং ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করা হয়েছে। পাঞ্জু শাহ সংগোপনে বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

চব্বিশ বছর বয়সে পাঞ্জু শাহ প্রথম বিবাহ করেন। প্রথমপক্ষের স্ত্রীর এক পুত্র শামসুদ্দীন এবং দুই কন্যা কলিমন নেছা ও ছালেহা খাতুন জন্মলাভ করেন। সাতান্ন বছর বয়সে পাঞ্জু শাহ তাঁর পিতাকে হারান এবং তাঁকেই সংসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ফকিরি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি সংসারের দায়িত্ব তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওয়াসীমউদ্দীন খোন্দকারের নিকট অর্পণ করেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি গুরু হেরাজতুল্লাহ খন্দকারের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পূর্ণভাবে ফকিরি সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি দ্বিতীয়বার পাঁচিনেছা নামে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার আফিলউদ্দীন প্রামাণিকের কন্যাকে বিবাহ করেন। পাঁচিনেছার গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। এরা হলেন খোন্দকার শফিউদ্দিন, জয়তুননেছা, খোন্দকার রফিউদ্দীন এবং খোন্দকার রইসউদ্দীন।

পাঞ্জু শাহ মাংসাশী ছিলেন না। তবে মাছ খেতেন। তাঁর শিষ্যদের অনেকেই মাংসাশী নয়। অধিকাংশ ফকির মাংস খাওয়া বর্জনীয় বলে ভেবেছেন। বাউলসাধনায় নিয়মিত মাছ বা দধি খাওয়ার প্রচলন আছে। পাঞ্জু শাহ ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রি.) ৬৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

তবে তাঁর কবর প্রচলিত উত্তর-দক্ষিণে না হয়ে পূর্ব-পশ্চিমমুখী এবং পশ্চিম শিয়রী। প্রতি বছর তার জন্ম-মৃত্যুকালে মাজারে অসংখ্য ফকিরের সমাবেশ হয় এবং তিনদিন ধরে তাঁর ওরশ উদযাপিত হয়।

পাঞ্জু শাহের রচনাবলি

পাঞ্জু শাহ 'ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর' নামে একটি পুঁথি প্রণয়ন করেন। পুঁথিটি দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি বা প্রস্থে ৬ ইঞ্চি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২। আরবি ফারসি এবং অন্যান্য পুঁথির মতো ডানদিক থেকে পাঠক্রম শুরু। রচনাকাল ১৩১৭ বাংলা (১৮৯০ খ্রি.)। এই পুঁথির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সংস্করণ বাংলা ১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি.)

পাঞ্জু বাতেনী সুফিসাধক ছিলেন এবং তাঁর সাধনা গুপ্ত থাকায় তিনি অনুসারীদের জন্য এই পুঁথি প্রণয়ন করেন। পুঁথিটি নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীকরণ হয়েছে :

১. হামদ, ২. নাত, আশকতত্ত্ব, ৩. মুরশিদতত্ত্ব, ৪. ভজনতত্ত্ব।

পয়ার ত্রিপদী ঢঙ্গে গোটা পুঁথিটি লেখা। ভাষা দোভাষী পুঁথি অনুসরণে রচিত। পুঁথির কিছু অংশ আধ্যাত্মিক বা কাহিনীমূলক হওয়ায় বর্ণনাধর্মী। পুঁথিটি মূলত সাধনভজন ভিত্তিক। পাঞ্জু শাহ সুফিমতাবলম্বী ছিলেন। সুফিসাধনায় আল্লাহ বা প্রেমাস্পদকে 'মাশুক' বলা হয় এবং তাঁকে যে প্রেম নিবেদন করে তাকে 'আশেক' বলা হয়। এখানে 'ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর' গ্রন্থের রচনারীতির কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

১

আশক মাশুক কথা বলি এই খানে।
আশক বুঝিয়া কর পাবে নিরঞ্জনে ॥
... ...
ছাদেকী আশকে ভাই দেখ না খুঁজিয়া
আল্লাহকে চিনিয়া ধর মাশুক জানিয়া ॥
আল্লাহকে স্বামী জানো আওরাত হইয়া
আওরাতের কাছে ভাই লহ না শিখিয়া।

২

আহারে রে জগৎপতি তোমা বিনে নাহিগতি
ভিক্ষা মাঙ্গে এই দুরাচার।
তোমারি কদমে মতি থাকে যেন দিবারাতি
পাই যেন তোমার দিদার ॥

এই পুঁথির মধ্যে সাধনসংগীতও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঞ্জু শাহ নিজেও একজন লোকসংগীতশিল্পী ও রচয়িতা ছিলেন। এসব গানে তিনি নিজেই গানের তাল নির্দেশ করেছেন। যেমন : ১৬ নং গান, তাল-ছিপকা

আল্লা পাবে সত্য প্রেমিক হলে
সুখের ধিয়ানে যেন রয়েছে কমলে ॥
জলেতে কমল রয়
স্বভাব তাহার হয়।
(সাঁই গো)
... ...
যে দিকে সুরয চলে
কমল সে দিকে হেলে (সাঁই গো)
ফেরে না কোনকালে ঝড় তুফান হলে ॥
তেমনি আশকদার
পতিকে করেছে সার (সাঁই গো)
যদি হয় ছারেখার তবু নাহি টলে ॥
মনরে কমল হও
গুরু শব্দে মন দাও (সাঁই গো)
ওর কূলে কালি দাও ভুল না কারো ভোলে ॥
হীন পাঞ্জু আলাঝালা
না জানে পীরিতি জ্বালা (সাঁই গো)
মেলে কি মালেক আল্লা সবার কপালে ॥

উপর্যুক্ত পদটি 'ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর' থেকে উদ্ধৃত। এখানে তালের বিবরণ 'ছিপ্‌কা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'ছিপ্‌কা' শব্দটি লোকজ বলে মনে হয়। অন্য কোনো গানে পাঞ্জু শাহ তালের তেমন উল্লেখ করেননি। পাঞ্জু শাহের রচিত সংগীতসমূহ নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিভাজন করা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন, পাঞ্জু শাহ নিজে তাঁর গানের কোনো শ্রেণীকরণ করেছিলেন কি না তা জানা যায় না। এসব গানে তাল সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই :

১. আল্লাহতত্ত্ব, ২. রছুল বা নবীতত্ত্ব, ৩. মুরশিদ বা গুরুতত্ত্ব, ৪. দেহতত্ত্ব, ৫. মানুষতত্ত্ব, ৬. প্রেমতত্ত্ব, ৭. পরমতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব, ৮. গোষ্ঠীতত্ত্ব, ৯. লীলাতত্ত্ব।

পাঞ্জু শাহের গানের সঙ্গে লালন ফকির এবং অন্যান্য বাউল পদকর্তাদের রচনার সাদৃশ্য আছে। মূলধারা একই, তবে প্রেক্ষিত কখনও কখনও ভিন্ন। গানগুলি মিথুনাত্মক দেহসাধনাভিত্তিক। এসব গানে বাতেনী সুফিসাধনার ধারা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। পাঞ্জু শাহ লালন শাহের প্রত্যক্ষশিষ্য না হলেও তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন এবং তাঁর অনেক গানের আসরে পাঞ্জু শাহ উপস্থিত ছিলেন। পাঞ্জু শিক্ষিত হওয়ার কারণে তাঁর গানে লোকভাষা অপেক্ষা মার্জিত ভাষার ব্যবহার অধিক লক্ষ করা যায়। তবে অমার্জিত ভাষাও তাঁর গানে রয়েছে। উপমা প্রতীকের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চতুর্পার্শ্বের জীবনধারাকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। গানে আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। পাঞ্জু শাহ পুরোপুরি 'গায়েন' বা 'বয়াতী' ছিলেন না। লালন ফকির এবং পাগলা কানাই-এর মতো তিনি গ্রামেগঞ্জে গান গেয়ে ফেরেননি। তিনি নিজেকে পীর বলে ভেবেছেন এবং সেই হিসেবে মুরিদ তৈরি করেছিলেন এবং তাদেরকে সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিয়েছেন। তাঁর 'কেতাব' ও 'গান' তাঁর মুরিদ এবং অনুসারীরা 'পবিত্র রচনা' বলে গণ্য করে। দীক্ষার প্রক্রিয়া অন্যান্য বাউলদের মতো গুপ্ত। বীজমন্ত্র প্রদানে তিনি আল্লাহ ও রছুলের উল্লেখ করেছেন। বস্তুত তাঁর সাধনা ছিল সমন্বিত লৌকিক আধ্যাত্মিক সাধনা। লালন ফকিরের সাধনা অর্থাৎ বাউলসাধনার মতো তিনি বস্তুবাদী চেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মবাদকে একীভূত করেছেন। তাঁর গানে তন্ত্র, যোগসাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। সবখানেই দেহবাদ মুখ্য। যেমন :

আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার
সাঁই করেন লীলা ভবে যার ॥
এই মানুষে রঙ্গরসে বিরাজ করেন সাঁই আমার ॥
একটি ছিলেন, দুটি হলেন, নীরে ক্ষীরে যুগল তার
পুরুষ প্রকৃতি ঘটে হরেক রঙ্গে দেন বাহার ॥
পাপীর ঘটে রঙ্গ দেখে হাকিম ঘটে দেন বিচার
দারিদ্র্যের ঘটে বসে ফিরতেছেন সাঁই দ্বার বেদ্বার ॥

পাঞ্জু বলে মানবলীলা করেছেন সাঁই চমৎকার
মানুষ ধর, মানুষ ভজ, মন যাবি তুই ভব পার ॥

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাঞ্জু শাহ তার কোনো কোনো গানে প্রত্যক্ষভাবে সমাজের কথা বলেছেন। তাঁর সমকালে সাধারণ মানুষের দুরবস্থার চিত্রও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে অনেক গানে, যেমন :

কী রূপে ছেলে পিলে মানুষ করি।
তেরোশো সাল ধরি ধান চাল আককারা ভারি
হয়েছে দানার আকাল
পুড়ছে চুলার কপাল
ঘরে বাইরে কী করিতে কী করি ॥
সুখের সময় সোনা-রুপা
অকালে কোথায় থাকো বা
কী করিব কেমনে যাব জ্বালা ভারি ॥
মহাজনের হল রে তেল
দেখিতে ভারি আকাল
সোনারুপা কেউ পোছে না এক টাকায় লয় দশ ভরি ॥
সু-কালে খাবরে পান
আকালে মেলে না ধান
এবার তো বাঁচে না প্রাণ কারে পায় ধরি ॥
এক টাকায় ধান ধামায় খায়
সিঝোলে দেড় তোলা হয়
খুদ-কুঁড়ো থাকায় খালি ভাত রাধতে হয় ভীষণ দেরি
ভাতে সবে বুড়োবুড়ি
জামাই যায় শ্বশুরবাড়ি
বেটার তো বুদ্ধি ভারি মনে করি।
দুঃখের সময় সুখের কথা
ঘাটে না ওসব যথাতথা
কী করবে নাতি পোতা, পেটের জ্বালায় জ্বলে মরি ॥
দেখিয়া আকাল ভারি
ভুলে গেলাম দীনদারি
হিন্দুতে আর বলে না হরি, হায় কী করি ॥
অধীন পাঞ্জু কয়
যা করেন সেই দয়াময়
বিপদে তারি তরে মন তোর ভরসা, কেবল তারি ॥

এই গানে পাঞ্জু শাহের সমকালে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে। এখানে মহাজনসহ অন্যান্য সুবিধাভোগীদের চালচিত্র রয়েছে। পাঞ্জু শাহ এসব গানের মধ্যে দেহতত্ত্বের বিষয়ের সঙ্গে রঙ্গরসেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন লালন ফকিরের গানে সমাজজীবনের চিত্র প্রতীকী উপমায় ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু পাঞ্জু শাহের গানে তা প্রত্যক্ষ। জাতিবিভেদের প্রশ্নে দুজনেই আপোষহীন এবং লোকধর্মে আস্থাশীল। এখানে আল্লাহ, রাসুল, ঈশ্বর, কৃষ্ণ, গৌর একান্তভাবেই লৌকিক।

পাঞ্জু শাহের গানের ভাষা ও শব্দচয়ন আঞ্চলিক। তিনি সর্বক্ষেত্রেই আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করেছেন। উপমা প্রতীকীও নির্ধারণ করেছেন লোকজীবনী লোকচর্চা থেকে। যেমন :

১

আপন ক্ষেতে নল বাঁধলে,
তা শুনে বগল বাজাই ॥
মনিবের কাছে গোলামেতে
অবশ্যই পাপী হয়
তবে আউলিয়া যত
বেঁধে গেছে রোগের ভার ॥
... ...
আপন জ্বালায় পথ দেখিলে, কী কব কাহারে রে
ভালো কথা কইতে গেলে মন্দ হয়ে যাই রে ॥
যা করিস তা তোরাই কর গে, আমাদের কী দায় রে ॥
ভাতার পুতের ঘাট করি
খেটেখুটে উদর পুরি হায় রে ॥
ভালো মন্দ কারেও কই না, তবু পড়ে গায়ে রে
আপন স্বামীর মাঠ ফেলে
যারে তারে মন্দ বলে হায় রে।
পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া করে হস্তিনী বেড়ায় রে ॥

২

দীন বন্ধুর প্রেম করা
যে করে সে জানে ধারা হায় রে ॥
সহজ প্রেমের প্রেমিক হয়ে গোপনেতে রয় রে ॥
অধীন পাঞ্জু বুদ্ধি হত
কড়কড়া মুরগির মতো হায় রে ॥
ঘরের মধ্যে আণ্ডা পেড়ে পাড়ার লোক জানায় রে ॥

যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলে লালন শাহ এবং পাঞ্জু শাহের গান গ্রামাঞ্চলে অধিক প্রচলিত। পাঞ্জু শাহ বাউল সুফিসাধক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন। এক্ষেত্রে লালন শাহ ছিলেন ব্যতিক্রমী। তাঁর কোনো স্ত্রী ছিল কিনা জানা যায় না। বিশখাকে কেউ কেউ 'সেবাদাসী', কেউ 'স্ত্রী' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। পাঞ্জু শাহের শিষ্যরা অনেক ক্ষেত্রে সেবাদাসীকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের অনেকের সন্তানাদিও আছে।

যাহোক, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে লালন শাহের পর বাউলসাধনার ক্ষেত্রে পাঞ্জু শাহই ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় সাধক এবং শিষ্যসংখ্যাও ছিল অনেক। এদের মধ্যে অনেকে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ছিলেন।

দুদ্দু শাহ
(১৮৪১-১৯১৯)

লালন ফকিরের অন্যতম শিষ্য দুদ্দু শাহ ওরফে দুদ মুল্লিক শাহ ইংরেজি ১৮৪১ বাংলা ১২৪৮ সালে বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড থানার অন্তর্গত বেলতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দুদ্দু শাহ-এর পিতা ঝড়ু মণ্ডল একজন কৃষক ছিলেন। দুদ্দু তাঁর চার ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকায় দুদ্দু বাল্যকালেই বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী প্রকৃতির ছিলেন এবং অল্প বয়সেই আরবি ফারসি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। দুদ্দু শাহ পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করেন বলে শোনা যায়। দুদ্দু শাহ বিবাহিত ছিলেন, তবে সাংসারিক কাজে তেমন মনোযোগী ছিলেন না। যৌবনকালে তিনি বিভিন্ন সাধু-পুরুষদের সংস্পর্শে আসেন এবং এই সময়ে লালন ফকিরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বয়সে দুদ্দু শাহ সাধক ফকির পাঞ্জু শাহের বড় ছিলেন। তাঁরা উভয়েই একই থানার অধিবাসী ছিলেন। কারো কারো মতে, ফকির লালন শাহ, দুদ্দু ও পাঞ্জু শাহের আবাসভূমি ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত হরিণাকুণ্ড থানার কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে। তবে এ সম্পর্কে তেমন কোনো প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। পাঞ্জু শাহ এবং দুদ্দু শাহ এ বিষয়ে কোনোকিছু বলেননি। দুদ্দু শাহ রচিত লালন জীবনচরিত সম্পর্কে পণ্ডিতদের দ্বিমত আছে। দুদ্দু শাহ শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং বাংলা ১৩১৮ (ইং ১৯১৯) সালে মৃত্যুবরণ করেন। লালনগুরু সিরাজ সাঁইয়ের বাড়িও একই গ্রামে ছিল বলে জানা যায়।

দুদ্দু শাহ লালন ফকিরের শিষ্যদের মধ্যে অত্যন্ত মেধাবী ও ফকিরি সাধনায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন গানে তৎকালীন সমাজচেতনার যেমন পরিচয় রয়েছে তেমনি বাউলসাধনা সম্পর্কেও তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। বাউলসাধনা ও বাউলজীবন সম্পর্কে তিনি বলেন :

যে খোঁজে মানুষ খোদা সেই তো বাউল
বস্তুত ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল ॥

পূর্ব পুনঃজন্ম না মানে
ধরা দেয় না অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে হয় রে কবুল ॥

অপর গানে তিনি আরও বলেন :

বাউল জীবন জানতে হয়
কেমন জীবন কি সে জন্ম কোথায় হয় ॥
যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন
জীবন পরম নিরূপণ বাউলেরা কয় ॥

উল্লিখিত দুটি গানে দুদ্দু শাহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বাউল ধর্ম, জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। বাউলেরা যে বস্তুবাদী এবং অনুমানে নির্ভর করে না সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর গানেও উল্লেখ করেছেন। লালনের গানে যা ছিল প্রতীকীনির্ভর, দুদ্দু শাহের গানে তা একান্ত প্রত্যক্ষ।

বাউলসাধনা যে বৈষ্ণব সাধনার অনুরূপ নয় এবং বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ যে বাউলসাধনায় ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত, নিম্নের গানে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। যেমন :

১

বাউল ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব-এর যোগ নাই
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব
পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ
তুলসী মালা অনুষ্ঠান সদাই ॥
বাউল মানুষ ভজে
সেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুত অমৃত মজে নারী সাক্ষী তাই।

২

কোন্ কৃষ্ণ হয় জগৎ গতি
মথুরার কৃষ্ণ নয় সে, যে কৃষ্ণ হয় সবার গতি ॥
জীবদেহে শুক্ররূপে
এ ব্রহ্মাণ্ডে আছে ব্যাপে
কৃষ্ণবস্তু নিগুম ঘরে
জীবদেহে বিরাজ করে
রসিকের করণ সে কৃষ্ণ বরণ, করণ গভীর অতি ॥

বাউল সাধনা যে মূলত সুফিসাধনার একটি বিশেষ শাখা, সে সম্পর্কে তিনি বলেন :

দরবেশী বাউলের ক্রিয়া
বীরভদ্র জানে সেই ধারা
দরবেশ লালন সাঁইএর কথায়
দুদ্দু জানায় তাই ॥

অতঃপর দুদ্দু বলেন :

শোগল রাবেতা দোন
বরজোখ নিরূপণ
মোশাহাদায় মশগুল রয় ॥
খোদারূপে করিয়া ফানা
বেখুদি আশেক দেওয়ানা
মাশুকরূপে তার মিলনা
খোদার রঙ্গে রঙ্গ ধরায় ॥
আশেক মাশুক হমবেস্ত
কেরামান কাতেবীন খবরনেস্ত
লালন কয় হাদিস ছাবেদ
দুদ্দুর সে ভয় নাহি যায় ॥

এই সুফি সাধনা ছিল নিতান্ত গুপ্ত এবং কেবল দীক্ষিতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইরানের শিয়া ইমাম জাফর সাদেকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল বাউল এই বাতেনী বা গুপ্ত শাখার প্রবর্তক ছিলেন। ওমর খৈয়াম, হাফিজ, জুনায়েদ, নিফফেরী প্রমুখ মরমী কবি ও ভারতীয় সন্ত কবীর, রজ্জব এই মতাবলম্বী ছিলেন। হিন্দি 'বাউরা'দের সঙ্গে বাউলদের ঘনিষ্ঠ সংযোগই শুধু নয়, বাউল এবং বাউরা উভয়েই সমগোত্রীয়। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে (?) শাহ্ মোহাম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ জোলেখা' গ্রন্থে আউল, বাউল ও বাউরা শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে। এই বাউল সম্প্রদায় কোনোকালে গোঁড়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিকট সম্মানজনক অবস্থানে থাকেনি বলা চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিন্দিত হয়েছে। তবে লোকধর্মের অনুসারী হয়ে কবীর যেমন তাঁর গানের মাধ্যমে সমাজকে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবোধের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন লালন ফকির, দুদ্দু ও পাঞ্জু শাহ এমন অনেকের গানে সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনেছি। সুফিবাদে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বিত চেতনার প্রকাশ ঘটলেও ইসলামের মানবতাবাদ ও সর্বজনীনতা এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। দুদ্দু তাঁর গানে ইসলামের মানবতা ও সর্বজনীনতার পাশাপাশি মারেফতি চেতনাকেও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নিম্নের পদগুলিতে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

১

হাকিমুল হাকিম সাঁই, তোমা বিনে দিব আর কার দোহাই ॥
ঘোর সঙ্কটে তরাইতে তোমাবই আর নাই ॥
সৃজন পালন কর, রুজি যোগাও সবাকার
রাখো মারো হাত তোমার, তোমারই এই জগৎময় ॥
বিমারির দাওয়া পানি, তুমি বৈদ্য তুমি গুণী,
জানের জান আপে রব্বানি, দয়াময় দরদী সাঁই ॥
এতিম মিছকিন কর, ভিক্ষা মাঙ্গাও দ্বারে দ্বারে,
ধনের ধনী কাঙ্গাল কর, কারেও দাও ধনের বাদশাই ॥
রাখো ছায়ায় ধুপে জ্বালাও, দরদে কবুল কবুলকে দরদাও,
দুদ্দু বলে আমায় তরাও কদমেতে দিয়া ঠাঁই ॥

২

তলবেত মওলা যে জন হয়,
কেরামান কাতেবিন তার খবর নাহি পায় ॥
নাহি করে বেহেস্তর আশায়, দোজখ বলে না রাখে ভয়,
দীন দুনিয়া তরক তার হয়, খোদার তারে তার মিশায় ॥
শোগল বারেতা দোন বরজখ নিরূপণ মোরাকাবা তার ধিয়ান
মোশাহাদায় মশগুল রয়, খোদরূপে করিয়ে ফানা,
বেখুদি আশেক দেওয়ানা,
আশেক মাশুক গম যেস্ত কেরামন কাতেবিন খবর পেস্ত,
লালন কয় দলিল ছাবেত, দুদ্দু সে ভেদ নাহি পায় ॥

৩

খোদা রূপে আছেন খোদায়
খুদি ছেড়ে বেখুদ হলে খোদাকে সেই দেখতে পায় ॥
খুদি শব্দের দুই অর্থ হয়, আমি খুদি আর সে খোদায়,
জাতেতে ছেফাত দেখা যায়, ছেফাতে জাত রয় ॥
মোকাম মঞ্জিল লতিফাতে খোদা ছাড়া সাধনা তাতে,
শেরেকি হইবে তাতে জানহ নিশ্চয় ॥
খোদা রূপেতে খোদাতালা খেলছে সে কুদরতি খেলা,
কুল্লে সাঁইন মহিত আলো, স্বয়ং কাদের হয় ॥
খোদা রূপেতে সেরূপ জানা, দ্বিদল তার বারামখানা,
লালন বলে সে ভেদ জানা দুদ্দুর কর্ম নয় ॥

৪

নবী চেনা হয় ক্যামনে আগে মুরশিদ ধর ॥
আওল আখের জাহের বাতেন, তবে সে ভেদ জানতে পার ॥
আল্লার নূরে যে নবী হয়, ছারে জাহান তার নূরে কয়,
হায়াতাল মুরছালিন নাম জেন্দা চার যুগের পর,
নবী অঙ্গ অংশ কালারূপে তিন রূপ ধরে এক রূপেতে,
কালারূপে মদিনাতে জাহের হলেন তরিক দিতে,
জাহেরা আর মুরশিদাতে ছিনা ছপিনা ভেদ তাহার ॥
নবী মুরশিদ ভজন আইন দিয়ে, খাকের দেহ থাকে থুয়ে,
নূরেতে নূর যায় মিশিয়ে দুদ্দু কয় আকারে সা-কার তার ॥

৫

আপনাকে আপনি চিনা যায় কিসেতে ॥
সে চিনা আল্লাকে চিনা ফরমায় নবী হাদিসেতে ॥
রোজাকিয়া নামাজ পড়া কলমা কি হজ্জ্ব যাকাত দেওয়া,
তাম্বি ভাবরি পাঞ্জাগানা নিজ পরিচয় কৈ তাহাতে ॥
কাবাতে নিয়ত নিরূপণ আপন কাবার নাই অন্বেষণ,
খলিলে কাবায় কি কখন আল্লাজিকে পার দেখিতে ॥
আপনাকে আপনি ভুলে পশ্চিম তরফ খাড়া হলে,
দুদ্দু কয় রুকু সেজদা দিলে খোদার দিদার কৈ তাহাতে ॥

৬

নবীজির আইন মাফিক,
ধরবি তরিক শরিয়ত আর মারফতে
ছালেকী মজ্জবী হয় দুই রাহা তায়
জাহেরা আর পুশিদাতে ॥
শরাতে পঞ্চবেনা হজ কালেমা রোজা নামাজ আর জাকাতে
মারেফাতে দাখেল যারা কামেল তারা,
এরফানের ভেদ বেলায়েতে, তলবেল মওলা সে হয়,
বরজখ ধিয়ান মজ্জবী তরিকতে ছাদেকী এশকী সে হয়,
দেল হুজুরায় মিলে মাশুকের সাথে ॥
এশক বাজী কারখানা হয় দেওয়ানা মিলে মাশুকের সাথে ॥
নবীজির আইন ছাবেদ দুই রাহাভেদ নবুয়ত আর বেলায়েতে,
লালন সাঁই কয় সে বেনা হয় দিন কানা দুদ্দু ডোবে শরিয়তে ॥

৭

জীবন থাকিতে মরিতে হয় ॥
জানিনা সে কেমন মরণ শুনতে মনন হয়
জীবন থাকিতে মরণ গোস্বামীর কলম নিরূপণ,
মরার সরায় করে সাধন
সে মরণ কারে বলা যায় কারণে অটল সাধন
সে আত্মসুখের করণ লোহায় লোহায় করে ঘর্ষণ
জীবনে মরণ কৈ সে হয়। বাণে বাণে বাণ করায়
পূর্ব স্বভাব তাহাতে রয় মাসী পিসী জ্ঞান নাহি রয়
শিশু ব্যবহার তারে কয়।
রসিক রসিক বলে ঘোষণা, কোটির মধ্যে ২/১ জনা
দুদ্দু মরার ভাব জানে না চটকে মাতায় ॥

গগন হরকরা
(জন্ম : অষ্টাদশ শতক)

গগন হরকরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় তাঁর জমিদারি শেরেস্তার সন্নিকটস্থ শিলাইদহ পোস্ট অফিসে ডাক হরকরা ছিলেন। তিনি লালন শাহের সমসাময়িক হলেও বয়সে লালন শাহ অপেক্ষা অনেক ছোট ছিলেন। যতদূর জানা যায় গগন হরকরা কোনো ফকিরের নিকট সাধনমার্গ শিক্ষা লাভ করেননি। লেখাপড়াও খুব সামান্যই জানতেন। তবে বাউলগান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বহুবার শিলাইদহের কাছারিবাড়িতে গগন হরকরার গান শুনেছেন। গগন এই অঞ্চলে পাগলা কবি বলে পরিচিত ছিলেন। কুষ্টিয়া অঞ্চলের প্রাচীন লোকজনের মুখে শোনা যায়, গগন স্বরচিত গান গাইতে গাইতে ভাবের আবেগে মত্ত হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করতেন। গগনের সাথে লালন শাহের কোনো সাক্ষাৎকারের ঘটনা তেমন জানা যায় না। তবে একেবারে যে দেখাও হয়নি এমন ধারণা করাও সংগত নয়। লালন শাহ শিলাইদহের কাছারিবাড়িতে যাতায়াত করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনের গান শুনেছেন–শিলাইদহে এমন জনশ্রুতি আছে। এ অঞ্চলে অনেক প্রাচীন ব্যক্তির ধারণা গগন হরকরা লালন শাহের ভাবশিষ্য ছিলেন এবং তাঁর গানের অনুকরণে তিনি নিজেও অনেক পদ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় গগনও সুধীসমাজে পরিচিত হন। তাঁর কয়েকটা গান রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেন। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন : 'রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যাতায়াত ও অবস্থানকালে সে অঞ্চলের বাউলদের গানের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তিনিই লালন ফকিরের কতকগুলি গান তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে প্রচার করেন। কিন্তু সম্ভবত তাহাদের বিশিষ্ট ধর্মমতের জন্য তিনি সেগুলি সংগ্রহ করেন নাই। পল্লীসাহিত্যের উচ্চভাব নিদর্শন হিসেবেই সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার–

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে,

–এই ভগবৎ ভক্তিমূলক গানটিও সেইসঙ্গে সংগ্রহ করেন।'

গগন অত্যন্ত দরিদ্রভাবে জীবনযাপন করেছেন। পারিবারিক অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেও তিনি কখনও তার মনের সুকুমার বৃত্তিকে নষ্ট করেননি। গগন হরকরার কিছু গান রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। গগনের গান আজকাল আর তেমন শোনা যায় না। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য, একসময় তার গান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বাউলদের মুখে বার বার এসেছে। অনেকের ধারণা লালন শাহ ও গগন হরকরার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ এতবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাঁর গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং অনেক নাটকে তিনি বাউলসুর এবং বাউল ভাবনার সংযোজন করেছেন। তাঁর নাটকেও তিনি অন্ধ বাউলের ভূমিকা সংযোজিত করে এই বাউলদের প্রতি তাঁর সকল শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গগন হরকরার একটি জনপ্রিয় গান নিম্নে দেওয়া হলো :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হত খুশি
দেখতাম রে নয়ন ভরে ॥
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে
(এখন) নিভাই কেমন করে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওগো দেখ না তোর হৃদয় চিরে ॥
দিব তার তুলনা কী
যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে ॥
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে।
ও সে না জানি কী কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে ॥
কুল মান সব গেল রে
তবু না পেলাম তারে
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে।

ও তার বসত কোথায়
না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে ॥
ও সেই মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস
কৃপা করে আমার সুহৃদ হয়ে
ব্যথার ব্যথিত হয়ে
আমায় বলে দে রে ॥

গোঁসাই রামগোপাল

লালন ফকিরের মৃত্যুর পর কুষ্টিয়ার শিলাইদহ অঞ্চলে বাউলমতাবলম্বী একজন সাধকের উদ্ভব হয়। তাঁর নাম গোঁসাই গোপাল। গোঁসাই গোপালের পিতা রামলালও একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব-বাউলসাধক ছিলেন। তিনি নিজেও বাউল পদকর্তা ছিলেন এবং তাঁর অনেক গান রয়েছে। গোঁসাই গোপাল পিতার কাছ থেকেই বাউলসাধনার পরিচয় লাভ করেন। তাঁর গানে হিন্দু বৈষ্ণবধর্মের একটি সহজিয়া রূপ ধরা পড়ে। এ ধরনের সহজিয়া বৈষ্ণবসাধনা বাউলসাধকদের গানেও লক্ষ করা যায়। একশ্রেণীর বৈষ্ণবসাধকদের গানে যেমন সহজিয়া সাধনাকে আমরা লক্ষ করি, তেমনি মুসলমান সাধকদের গানেও সুফি মতবাদের সহজিয়া রূপটিও ধরা পড়ে। মূলত সুফি বাউলসাধনায় গ্রিক, বৌদ্ধ, খ্রিস্টীয়, তন্ত্র, যোগ, সহজিয়া এবং মুসলিম দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। এই সুফি সহজিয়া সাধনা পরবর্তীকালে বাউলসাধনা বলে চিহ্নিত হয়।

গোঁসাই গোপাল সম্বন্ধে ইদানীং বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁর গান আর এতদঞ্চলে এখন তেমন প্রচলিত নেই। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে এই সাধকের কয়েকটা গান সংকলিত করেছেন। আমি সেখান থেকে তাঁর কয়েকটি গান পুনরায় আমার গ্রন্থেও সংকলিত করলাম। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন : 'গোঁসাই গোপালের পুত্র শ্রীরাজকুমার জোয়ারদার মহাশয়ের অশেষ সৌজন্যে তাঁহার পিতার কতকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। শিলাইদহের সুসাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী গানগুলি জোয়ারদার মহাশয়ের নিকট হইতে আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়েছেন এবং ঐ সঙ্গে রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখিয়া দিয়াছেন। গোঁসাই গোপালের কতকগুলি গান পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাউলের মুখে বহুবার গীত হইতে শুনিয়াছি।'

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সংগৃহীত গোঁসাই গোপালের জীবনী

সাধক রামগোপাল জোয়ারদার শিলাইদহ গ্রামে ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা গঙ্গাস্নানের শুভদিনে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার

নাম রামলাল জোয়ারদার এবং মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী। রামলাল পরম বৈষ্ণব, উদার হৃদয় ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রামগোপাল পিতার সমস্ত সদগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যৌবনকাল হইতেই সাধন পথের পথিক।...

রামগোপাল বাল্যে সাধারণ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সংগীতে লোকচিত্ত মুগ্ধ করিতে পারিতেন। রামগোপালের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাব প্রবল হইতে লাগিল। তিনি উচ্চস্বরে অধিকাংশ সময় হরিনাম গানে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা এই অল্প বয়সেই বৈরাগ্যলক্ষণ দেখিয়া পুত্রকে বিবাহ দিলেন। রাম গোপাল কিছুকাল সাংসারিক জীবনযাপন করিয়া হঠাৎ অত্যন্ত উদাসীন হইয়া সংসার পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন।... বহু চেষ্টাতেও রামগোপলকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারা গেল না। ...তিনি অবশেষে নির্জন সাধক-জীবনযাপন করিবার মানসে বসতবাটীর পূর্বদিকে জলবেষ্টিত উচ্চভূমিতে রমণীয় আশ্রম নির্মাণ করিয়া সে স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং ধ্যানধারণা ও আনন্দকীর্তনে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বহুস্থান হইতে বহু ধর্মপিপাসু ব্যক্তি তাঁহার আশ্রমে সমাগত হইতে লাগিল। এই সময় পাঁচু ক্ষেপা নামক একজন ত্যাগী ভক্ত তাঁহার আশ্রমে আসিয়া অপূর্ব উপদেশ লাভ করিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

সাধক রামগোপাল বৈষ্ণব মতানুযায়ী গোপীভাবের ভজনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া স্বয়ং একনিষ্ঠভাবে মাধুর্য রস আস্বাদন করিতেন এবং তাহার ভক্তগণকেও ঐভাবে গড়িয়া তুলিতেন। বৈষ্ণবধর্মের গোঁড়ামি তাঁহাকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি হিন্দু মুসলমান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে ধর্ম উপদেশ দিতেন। জাতিভেদ প্রথার তিনি বিরোধী ছিলেন। ...সন ১৩১৯ সালে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।

গোঁসাই গোপাল রচিত বাউলগান :

[নিম্নলিখিত ১ থেকে ১০ পর্যন্ত বাউল পদগুলি আমার স্নেহভাজন ছাত্র ও বিশিষ্ট বাউল গবেষক ড. আবুল আহসান চৌধুরী কর্তৃক শিলাইদহ (কুষ্টিয়া) থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহের কাল ১৩৭৫ বাংলা]

১

গৌরচাঁদ আর কি আমি পাব বল ।
আমার ভাবতে ভাবতে দিন ফুরাল ॥
যে হতে নদের জীবন ব্রজপুরে করলেন গমন,
সোনার নদে সেই দিন হতে অন্ধকার হল ॥
যে চাঁদে হয় জগৎ আলো
সেই চাঁদ আমার মেঘে ঢাকল
আমার প্রাণটি মাত্র দেহে রইল ॥

জীবের জীবন, সেই চাঁদ রতন,
যে দিন হতে দিলাম বিসর্জন
ঐ দিন হতে গোপাল পাগল হল ॥

২

সে করণ সিদ্ধ করা সামান্য নয়।
গরল অমৃত করা করলে তো হয় ॥
এ নয় সামান্য ফণি
কে চেয়ে আনবে মণি,
তাই বসে গণি
আমার ঐ ভাবনায় দিন বয়ে যায় পাইনে সময় ॥
সাপ নয় কামিণীপনা,
বলি রসনা;
কত জন যেয়ে মণির আলো হইতেছে ক্ষয় ॥
সৎ গুণীন ধরলে পরে,
সাবধানে সাপ ধরে
সে কিরে মরে
বিষ পানে তার, হয় সুধার হার, গোপালে কয় ॥

৩

বেদ ছাড়া এক মানুষ আছে ব্রহ্মাণ্ডের উপরে।
স্বরূপ শক্তি যুক্ত হয়ে আছে এ নিহারে ॥
চৌষট্টি রস সাধ্য করে
বসে আছে রূপের ঘরে অসাধ্য সাধনে,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনজনে আছে দীগ করে,
শুদ্ধ রসিক হলে পরে,
তবে যাবে রূপের ঘরে মহতে তাই বলে,
ও সে রূপের করণ বিষম যাজন সামান্যে কি মেলে ॥
গোঁসাই রামলাল বলে সত্য
এ বড় কঠিন রে তত্ত্ব, ধরবি তায় কেমনে?
গোঁসাই গোপাল বলে, রস সাধিলে সেই তো পাবে পরে ॥

৪

অটল রূপে ভেসেছে নীরে
জয় রাধার প্রেম সাগরে ॥
আসমান-জমিন যখন ছিল না,
এই অজানা খবর ভেবে দেখলে না,
বিদ্যুৎ বরণ করেন যখন, সাকার রূপ নিরাকারে ॥

চব্বিশ চন্দ্র সাধ্য করিলে,
মূলে যেমন এক ফুল মেলে;
তার চারটে দলে চারজন খেলে,
রস থাকে তার ভিতরে ॥
চার রঙ্গে হয় একরূপ ধারণ,
কে জানিবে তাহার বিবরণ,
গোঁসাই রামলাল বলে গোপাল প্রেম রতন বলে তারে ॥

৫

ঐ এক সরোবরে পঞ্চ পদ্ম ভাসিল
ইহার মধ্যেতে একটি কমল লুকাল ॥
সরোবরের অগাধ জলে
তাহে কত মুক্তা ফলে,
রসিক যত্ন করে রত্ন তুলিল ॥
এক কমলে দুই রং ধরে,
মন-প্রাণ সকল হরে
তাইতে সাধক প্রেমে মত্ত হইল ॥
গোঁসাই রামলাল বলে বচন,
সরোবরে ডোবে যে জন
ভেবে দেখে গোপাল যে পাগল হয় ॥

৬

হাওয়া ধরে কর সাধন।
তবে পাবি মানুষের দর্শন ॥
হাওয়ায় আসে হাওয়ায় ভাসে,
হাওয়ার মধ্যে যায় সে মিশে,
সামান্য তার পায় না দিশে
যে জন থাকে সচেতন ॥
আত্মতত্ত্ব পরতত্ত্ব,
সার করতে হয় গুরুতত্ত্ব
এই তত্ত্বে কেন হও না মত্ত,
কী করবে তার কাল শমন ॥
কপাট মেরে নব দ্বারে,
মরা কে বিশ্বাস করে,
গোঁসাই গোপাল বলে ভাসবে নীরে
দমেতে হবে মিলন ॥

৭

ভবে সুমজে কর সাধনা,
টলাটল তবে ত্যজ্য করে নিটল কর ভাবনা ॥
ভক্তি মুক্তি দুই পথ বলছে
সেই পথেতে সবই যাচ্ছে,
আর এক পথ ভার মাঝে আছে
কে করে তার ঠিকানা ॥
ষড়তত্ত্বের শুন মিলন,
এক জানিবে মানুষের জীবন,
তাতে বদ্ধ গোঁসাই নিরঞ্জন
সেইখানে তুমি হও কানা ॥
উঁচু নীচু যবে যাবে,
সকল তত্ত্ব সিদ্ধ হবে
গোঁসাই রামলাল সত্য ভাবে,
গোপাল পরমার্থ চিনলে না ॥

৮

প্রেম রাগের তুফান দেখে চমকে যাসনে মন।
উজান ভাটি তেজ্য করে ডুবলে পাবি রতন ॥
কাম রতিতে প্রেম সাধ্য করা,
হইতে হবে জীয়ন্তে মরা;
তবে যাবে অধর ধরা,
রসের খেলা খেলবে দুইজন ॥
প্রেম প্রকৃতি স্বরূপ শক্তি
কাম গুরু তার নিজ পতি,
শুদ্ধ রস রসিকের ভক্তি,
সামান্যের ঘটিবে মরণ ॥
সাপের মাথায় রসের খনি,
প্রেম শৃঙ্খলে নেওরে মণি,
গোঁসাই গোপাল বলে অন্য যোনি
না ছুলে এড়ায় শমন ॥



পঞ্চম অধ্যায়

বাউলগানের সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই জীবন একক নয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই সে যুগল। অতঃপর পাঁচজনের সুখ-দুঃখ, হৃদয়াবেগ এবং কর্মধারাকে সে তার নিজের অন্তরে মিলিয়ে নিতে পেরেছে অনুভব এবং আবেগের মাধ্যমে এবং তখনই ভাব[১] (Imagination) বা কল্পনাকে সে হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছে। কিন্তু তার এই কল্পনা বস্তু বা জীবনকে অস্বীকার করে নয়; বরং বস্তুগত জীবন তার কল্পনাশক্তিকে আবেগ এবং অনুভবে সুদৃঢ় করেছে। কখনও সে প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল, কখনও বিয়োগে বিধুর। এই দুঃখের প্রচণ্ডতা তাঁকে প্রাণিত করেছে–কখনও গানে, কখনও চিত্রকর্মে কিংবা গল্পে। এ সবই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। আদিম জীবনে সাহিত্যের উদ্ভব এবং বিকাশ এমনিভাবে ঘটেছিল। নর-নারীর প্রেম, উভয়ের কামনা বাসনা যা সম্ভোগের নামান্তর, তা সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। অতঃপর তাতে সংযুক্ত প্রকৃতি। এই প্রকৃতির একক কোনো ভূমিকা নেই। মানুষের দুঃখ-সুখের অনুষঙ্গী হিসেবেই তার সার্থকতা। রোমান্টিক সাহিত্যের উৎসও এখানে।[২]

সাহিত্যে মানুষই প্রধান। প্রকৃতি তার আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের অনুগামী, সহচর। আদিম জীবনে প্রথম সংগীতশিল্পী, কিংবা কবি অথবা গাল্পিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে অন্যের মধ্যে সঞ্চরণের উদ্দেশ্যে এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুন্দরকে উপজীব্য করে রসসৃষ্টি করতে চেয়েছে। মুখ্যত আনন্দই তার কাম্য। এ আনন্দ কখনও সুখের মধ্যে রূপময়তা পেয়েছে; কখনও বেদনায়। তবে প্রাপ্তিতে যে আনন্দ তা অনেকাংশে খণ্ডিত, না-পাওয়ার বেদনাতে যে উপলব্ধি তা অখণ্ড। প্রাপ্তিতে সম্ভোগ আছে, মিলনে আছে সুখের আতিশয্য–সদাসুখ। কিন্তু দুদিনেই সে আকর্ষণ যায় কমে। কখনও তা বিকর্ষণেও পর্যবসিত হয়। স্বকীয়ার সঙ্গে বুঝি তাই প্রেম তেমন জমে না—প্রয়োজন হয় পরকীয়া। বাউলের মনের মানুষের প্রতি যে আকুল আর্তি, তার ক্ষেত্র তো এই পরকীয়া সাধনায়।[৩] কিন্তু স্বকীয়া তো পরিত্যাজ্য নয়। সাহিত্যিক কখনও-বা স্বকীয়াকে কল্পনায় পরকীয়াতে পর্যবসিত করে থাকেন।

দেহগত প্রেম থেকে দেহাতীত প্রেমে মনের মানুষের সন্ধান বাউলগানের বৈশিষ্ট্য। অতীতে সীমার মাধ্যমে অসীম বা অনন্তকে উপলব্ধি করতে পেরেছে মানুষ। সাহিত্যিক রসপিপাসু চিত্তে সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের মনের এই চিরন্তন বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদিম নিদর্শন চর্যাগীতিকায় এই বোধের উন্মেষ ঘটেছিল একদিন। কিন্তু তখনকার জীবন ছিল ধর্মের সঙ্গে বাঁধা। ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল এই ধর্মের প্রতিভূ। একদিন বর্ণবাদের যে আদর্শ ছিল সকল কর্মকাণ্ডের উৎস, পরবর্তীকালে তা স্বার্থপরতার কারণে জাতিভেদে পর্যবসিত হয়। ধর্মের আবরণে সাধারণ মানুষ যারা এদেশের আদিবাসী তারা অনার্যরূপে চিহ্নিত হয়েছিল, বহিরাগত আর্যধর্মের নিয়ামক ব্রাহ্মণ্যবাদে তাদেরকে অস্পৃশ্য এবং দাসে পরিণত করেছিল।[৪]

হিন্দুধর্মে জাতিভেদপ্রথা সমাজকে যেভাবে গ্রাস করেছিল, বৌদ্ধ আমলেও তা অনুসৃত হয়েছিল একইভাবে। ফলে তৎকালীন সময়ে 'অস্পৃশ্য' নামে পরিচিত অনার্যগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও জাতিভেদের অত্যাচার থেকে তারা মুক্তি পায়নি। ফলে অবক্ষয় নেমে এসেছিল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তন্ত্রের দেহবাদী সাধনা সমাজকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।[৫] এই সময়ের সৃষ্ট-সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। চর্যাগীতিকায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। যে জাতির যে ধর্ম, তা তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে। ফলে এ সময়ের সৃষ্ট-সাহিত্যে সাধনার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে পড়েছিল। এই সাহিত্যের ভাষা, শব্দ, অলঙ্কার ও রসের বিকাশ প্রচলিত ধর্মের অনুগামী বা প্রতিচ্ছবি ছিল। কিন্তু সব ছাপিয়ে চর্যাগীতিকার মানবতা, সমাজজীবনের অবক্ষয়, জাতিভেদের অভিশাপ এবং সিদ্ধাচার্যদের বিদ্রোহের ভাষা এ যুগের সাহিত্যে কালজয়ী অবদান রাখতে সক্ষম হলো। ধর্ম এখানে জীবনের রস সৃষ্টিতে বাধা হয়ে থাকেনি বরং ধর্মের অবক্ষয়ের এই চিত্র সিদ্ধাচার্যগণ যথাযথভাবে অঙ্কিত করেছেন তাদের রচিত বিভিন্ন পদে যা একদিকে যেমন তৎকালীন সমাজের চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে, তেমনি রসপিপাসু মানুষের মনকে তৃপ্তি দিয়েছে অনুপম সৌন্দর্যসৃষ্টির কুশলী ব্যঞ্জনায়। চর্যাগীতিকা তাই কেবল সাধনমার্গের ভাষা হয়নি, হয়েছে চিরায়ত সাহিত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, বহিরাগত ধর্মের আগমনে স্থানীয় ধর্মে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, তা তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় এবং এই বিপ্লবে ভাষা ও সাহিত্য নতুনভাবে নির্মিত হয়। চর্যাগীতিকায় এই ধর্ম বিপ্লবের পরিচয় পাওয়া যায়।[৬] এই সময়ের বেশকিছু পূর্ব থেকে সুফিদের আগমন ঘটেছিল এদেশে।[৭] তাদের ভাবনা-চিন্তারও প্রতিফলন চর্যাগীতিকায় লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও এদিকে সনাতন ধর্মসাধনা ও বহিরাগত ধর্মের আগমনের ফলে সৃষ্ট ধর্মীয় বিপ্লবের চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত হয়েছে। লক্ষণীয়, এই সময়ে সাহিত্যে

অজ্ঞেয়তাবাদ (mysticism) এবং পুরাতত্ত্ববাদ (Transcendentalism) নর-নারীর প্রণয়ের কথাতেও রূপলাভ করেছে। তবে এ সময়ে কিছু সাহিত্যে দেহতত্ত্ববাদ প্রবল হওয়ায় তা সাহিত্যপদবাচ্য হলেও তার ভিতর উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। মধ্যযুগে এমন অনেক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে যা দেহবাদ বা যৌনসম্ভোগের চিত্র বই অন্য কিছু নয়, ফলে এসব সাহিত্য নিম্নস্তরের সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

যথার্থ সাহিত্যে চেতনার মুক্তি ঘটে। নিম্নস্তরের সাহিত্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সত্য, হয়তো তা সমাজবিদের প্রয়োজনে লাগে, কিন্তু উচ্চাঙ্গ বা মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিতে তার তেমন কোনো অবস্থান থাকে না। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যধর্মের প্রতিচ্ছবি হলেও সেসব কেবল ধর্মের নিরাভরণ অনুকরণ নয়—তা দয়িতের প্রতি মহৎ প্রেমের প্রগাঢ় আর্তিতে উজ্জ্বল। এখানে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ প্রেমিকের বিরহবোধকে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে উপনীত করেছেন। দয়িতা এবং দয়িতের প্রেমের এই সূক্ষ্ম অনুভূতি পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়। এখানে প্রেম 'বেদনার গৈরিকবর্ণে' অনুরঞ্জিত। তখন কেবলই মনে হয়, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়ে জুড়ল না গেল।'

বৈষ্ণবপদাবলীর যেখানে শেষ, বলা যেতে পারে বাউলগানের সেখানে শুরু। বস্তুত বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রেম সীমাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। বৈষ্ণবদের পরকীয়া প্রেমের উপাদান কাব্যে সর্বস্বতা লাভ করেছে ঠিকই, এখানেও একদিকে সমাজের বিধি-বিধান লঙ্ঘন ও তার বেদনার সব যন্ত্রণাই প্রেমিকাকে বহন করতে হয়েছে। প্রেমের এই যন্ত্রণা এবং বেদনায় বৈষ্ণবপদাবলীর নায়িকা আশ্চর্যভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার অকৃত্রিম অনুভূতি এবং আবেগ অপূর্ব সুষমায় প্রস্ফুটিত কমলের মতো হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবির এই অনুভূতি বৈষ্ণব পদাবলীতে ধর্মীয় বোধকে অতিক্রম করে শাশ্বত জীবনবোধের নির্দেশনা দিয়েছে বিধায় পদাবলী ধর্মপ্রধান হয়েও তা যথার্থ সাহিত্য হতে পেরেছে।

বাউলগানেও ধর্ম প্রাধান্য পেলেও সীমা ও অসীমের দ্বৈতসাধনায় মানুষের বিরহী মনের মর্মজ্বালা এবং আর্তি তাকে চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে। বাউলগান তত্ত্বপ্রধান হলেও প্রতিটি গান ব্যক্তিগত অনুভূতির জারকরসে পুষ্ট। এ গান শুধু সাধনার ভাষা নয়, বাউলগানে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে খুঁজে পাই। এখানে সমাজের ছবি আছে, আছে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসংবলিত প্রচণ্ড বিদ্রোহের চালচিত্র। এই গানে বাঙালির সংস্কৃতি এবং চেতনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। এই গানের সুর এবং ভাষার মধ্যে এমন একটি হৃদয়স্পর্শী আবেদন আছে যা সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রভাবিত করে। এ গান তাই শুধু তত্ত্বমূলক নয়, এ গান যথার্থ সাহিত্যও বটে।

বাউলগানের স্থিতি তার রোমান্টিকতায়। এই রোমান্টিকতা একান্তভাবে জীবনঅন্বিষ্ট প্রেমে পরিপূর্ণ। এখানে রহস্যময়তা এবং অজ্ঞেয়তা আছে। কিন্তু তা সর্বত্রই জীবননির্ভর। এখানে মানুষ এবং মানবজীবনই প্রধান। বাউলগানের একটি বড় বৈশিষ্ট্য তার অজ্ঞেয়তা যাকে ইংরেজিতে কখনও 'মেটাফিজিক্যাল' কখনও বলা হয় 'মিস্টিসিজম'-এর অপরূপ মানবিক রূপায়ণ। উপনিষদের জীবনদর্শন এবং সুফিপ্রেম বাউলগানে একবৃন্তে দুটি ফুল হয়ে ফুটেছে।

বাউলগান মূলত সাধনসংগীত। সাধনভজনের কথা গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করাই বাউলগানের সাধক-রচয়িতাদের লক্ষ্য। বাউলগানে দেহভিত্তিক সাধনার কথা মুখ্য হওয়ায় এ গানের ভাষা নির্মাণে রচিয়তা নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এ গানের তত্ত্বকথা দীক্ষিত ব্যতিরেকে অন্য সকলের জানার বিষয় নয়—এটা বুঝেই রচিয়তা বাউলগানে যে উপমা বা রূপকের আশ্রয় নিয়ে থাকে, তা দীক্ষিতকে সাধনভজনের নির্দিষ্ট ধারার নির্দেশ প্রদান করলেও অপরের রসাস্বাদনে তা বাধা হয় না। তবে এ গানের ভাষা উপমা এবং রূপকে এক আলো-আঁধারের রহস্যময়তা থাকে, যা দীক্ষিতকেই কেবল আলোকিত করে।

বাউলগান মুখ্যত সাধনভজনের ভাষা হওয়ায় এ গানের উপমা এবং রূপকের এমন প্রয়োগ অন্য সাহিত্যকর্ম থেকে স্বতন্ত্র। এই গান বাণীপ্রধান, ফলে তা একদিকে শব্দের উপর নির্ভরশীল হয়ে যেমন ধ্বনি বা সংগীতধর্মী, তেমনি রূপক বা উপমা সৃষ্টির মাধ্যমে এক অপূর্ব সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও তার লক্ষ্য। এখানে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার উভয়ের প্রয়োগে বাউলগান নানা রসমাধুর্যে সরস এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভাব এবং ভাষা উভয়েই শব্দের অনুষঙ্গ। ভাষার মধ্যে নিহিত যে ভাব, বাউলগীতিকার তাকেই প্রতীকী উপমায় অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রকাশ করে থাকে। এসব উপমা ভাবের অনুকল্পে গভীরভাবে ইঙ্গিতবহ। কোথাও কোথাও অতিশয়োক্তি, বিরোধাভাস ও রূপকের ব্যবহার অপূর্ব রসময়তা সৃষ্টি করেছে। যেমন :

১

বাড়ির কাছে আরশীনগর
সেথা এক পড়শী বসত করে।

২

অমাবস্যায় পূর্ণশশী পূর্ণিমাতে অমাবস্যা
অমাবস্যা পূর্ণিমা যোগ
আজব সম্ভব সম্ভোগ।

৩

লীলা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
গঙ্গা ডাঙ্গা বয়ে যায় ॥

৪

চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া
জমিনে ফলছে মেওয়া
চাঁদের সুধা ঝরে।

৫

আঁখির কোণে পাখির বাসা।
দেখতে নারি কী তামাশা
আমার এই আদল দশা
কে আর ঘুচায় ॥

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এসব উপমা এবং রূপক বাউলগানকে এক অপূর্ব শিল্পসুষমামণ্ডিত করেছে। দেহ এই চেতনার উৎস হলেও বাউলসাধক তার অপূর্ব রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেহের সঙ্গে দেহাতীত জীবনের যেমন সংযোগ ঘটিয়েছে, তেমনই কল্পনা যাকে ইংরেজিতে Imagination নামে চিহ্নিত করা হয়, তা আমাদের চিত্তবৃত্তিকে এমনভাবে জাগিয়ে দেয় যা সীমা এবং অসীমের মধ্যে এক মেলবন্ধনের সূচনা করে। যেমন :

কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই
চেতনগুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই ॥
চক্ষু আঁধার দেলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগম ঠাঁই ॥

আমাদের হৃদয়ে এই গান গভীরতম অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ ঘটায়। বাউলগানের এই অপূর্ব রসময়তা রবীন্দ্রনাথকে বারবার নাড়া দিয়েছে। বাউলের মনের মানুষ, অচিন পাখি–রবীন্দ্রনাথে কোথাও তার মানসী, কখনও সোনার তরীর মাঝি কিংবা জীবনদেবতায় রূপপরিগ্রহ করেছে।

এই বাউলগানের সর্বশ্রেষ্ঠ রসশিল্পী ছিলেন লালন শাহ (মৃত্যু : ১৮৯০) যে আনন্দ-রস তিনি রহস্যে ঢাকা মানবদেহে উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন, তাকেই

তিনি অবলোকন করেছিলেন অসীমের বৈচিত্র্যময় লীলার আবর্তনে। বস্তুত লালনের গানে এক অতলস্পর্শী আত্মনিমগ্নের ভাব সুস্পষ্ট। তাকে বুঝতে হলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের *The blessed mood*-এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন সব রহস্যের অবসান ঘটে। এই রসদৃষ্টি মুহূর্তে সব অপরিচয়ের বন্ধনকে মুক্ত করে দিয়ে চিরসত্যকে ভাস্বর করে তোলে এক অভূতপূর্ব অমৃতজ্যোতিতে। লালন সর্বেশ্বরবাদ বা *Pantheism*-এ বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং শেলীর মধ্যেও এই বিশ্বাসের অনুরণন ঘটতে দেখা যায়। লালনের গানে এই দেহনির্ভর অতীন্দ্র চেতনা এক অভিনব শিল্পবোধের সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ তাদের একদিন প্রতিদিনের আটপৌরে জীবনে এই গানকেই তাদের অধ্যাত্মক্ষুধা নিবারণের পাথেয় বলে ভেবেছে।

বাউলগানকে কেউ কেউ কেবল দেহতত্ত্ব গান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এসব গানে যৌনচারভিত্তিক কায়াসাধন বা ষটচক্র কিংবা ছয় লতিফার কথা রয়েছে, কিন্তু তা নিছক দেহসাধনায় পর্যবসিত হয়নি। এসব দেহতত্ত্বের কথাকে বাউল জীবননির্ভর গীতধর্মী কাব্যিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। চর্যাগীতিকাতে দেহতত্ত্ব একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কখনও কখনও তা মার্জিত মানুষের মন ও চোখের পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার মধ্যে চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্যগণ তাদের বিভিন্ন পদে অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। তবে এখানে বলা প্রয়োজন, চর্যাগীতিকা যে সময়ে রচিত হয়েছে তখন বাংলা ভাষা অপভ্রংশ আকারে আমাদের হস্তগত হয়েছে।[৮] তখনকার দিনে সংস্কৃতই ছিল সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যম। এর মধ্যেই চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্যগণ জীবনঅন্বিষ্ট কাব্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। যেমন :

উঁচা উঁচা পাবত তহিব সই শবরী বালী
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিণ গীবত গুঞ্জরী মালী ॥

উঁচু পাহাড়ে (পর্বত) শবরী বালিকা বাস করে। সে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা।

পদকর্তাগণ দেহসাধনার কথা বলতে গিয়েও জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে পিছিয়ে থাকেননি। এসব গীতিকায় যৌনাচারের পরিচয় রয়েছে ঠিকই; কিন্তু তা উপমা এবং প্রতীকের ছদ্মাবরণে বিধৃত।

বাউলগানে আপাতভাবে বাংলা ভাষার পরিণত রূপ পাওয়া গেলেও এ গানের ভাষা একান্তই লৌকিক। কিন্তু এই লৌকিক ভাষাতেও যে অপূর্ব কাব্যরসাশ্রিত ভাষা সৃষ্টি করা যায়, তা আমাদের শিক্ষিত মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। এখানে বলা প্রয়োজন চর্যাগীতিকায় যে দেহতত্ত্ব প্রত্যক্ষ, বাউলগানে তা অনেকটাই অপ্রত্যক্ষ। গীতিকার ভাব ভাষা এবং উপমার ছদ্মাবরণে একে এক অভূতপূর্ব স্নিগ্ধ সুষমামণ্ডিত

করেছেন। বাউলগানের তত্ত্বকথা মনকে শুধু আলোড়িত করে না বরং তা হৃদয়ে এক গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার ইঙ্গিত দান করে। লালনের একটি গান :

কে কথা কয় রে
দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না ॥

কথা নিতান্ত সাধারণ। কিন্তু এই গানে এমন এক গভীর বাণীর প্রকাশ ঘটেছে, যা আমাদের অন্তরকে দারুণভাবে উচ্চকিত করে। এই প্রসঙ্গেই তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের দুটি গান। 'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে' অথবা 'এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।' এমনিভাবেই মনে পড়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের *The Cuckoo* কবিতার কথা। এখানে তিনি বলেছিলেন :

Even yet thou art to me
No bird, but an invisible thing
A vioce, mystery;
The same whom in my school boy days
I listened to, that Cry
which made me look a thousand ways
In bush and tree, and sky.

তবে এ-কথা সত্য যে চর্যাগীতিকা, বৈষ্ণবপদাবলী এবং বাউলগানে এমন অনেক গান রয়েছে যেসব দৃষ্টিকটু, কদাচার এবং রুচিবিগর্হিত। এসব গান কেবলই নিম্নস্তরেই আবর্তিত। কিন্তু এসবের মধ্যেও এমন অনেক গান রয়েছে, যা দেহতত্ত্বমূলক হয়েও আমাদের কাব্যরসাস্বাদনে কখনই মনকে পীড়িত করেনি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলা সাহিত্যে এই যে দেহবাদের অবতারণা–এর উৎস কোথায়?

ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি, বাংলাদেশে অনেক পূর্বকাল থেকে আরব ও পারস্যের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আরবীয় মুসলিম ফকিরেরা অষ্টম শতক থেকেই এদেশে আসতে শুরু করেন। অনেক সুফিকবিও বিশেষ করে দিওয়ানা হাফিজ ভারতবর্ষে এসেছিলেন বলে কথিত আছে। জালালউদ্দিন রুমীর 'মসনবী' বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। সুতরাং এমন ধারণা অসংগত নয় যে পারস্যের সুফিকবি রুমী, ওমর খৈয়াম, জামী, হাফিজ প্রভৃতি সুফিকবিদের রচনা এদেশে কবি এবং গীতিকারদের মনকে নাড়া দিয়ে গেছে। এসব পারস্যকবিদের মধ্যে বিশেষ করে ওমর খৈয়ামের একটি কবিতায় উল্লেখ আছে :

Here with a loaf of bread in the bough
A flask of wine, a book of verse and thou

Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise now

এখানে এই কুঞ্জবনে এক টুকরো রুটি এবং সুরাপাত্র, তার সঙ্গে একটি কাব্যগ্রন্থ এবং তুমি এই বিজনে আমার পাশে বসে গান গাইছ; এই বিজনভূমি আর বিজন নয়, এই আমার বেহেস্ত।

ইতঃপূর্বেও এই গ্রন্থের অন্যত্রে ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াত' নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এসব গানে আপাতবস্তুগত জীবনের কথা থাকলেও এর মধ্যেই আধ্যাত্মচেতনার পরিচয় রয়েছে। সুফিকবিদের প্রত্যেকেই ছিলেন অধ্যাত্মবাদী *Mystic*। আমার ধারণায় চর্যাগীতিকা থেকে শুরু করে বৈষ্ণবপদাবলী এবং বাউলগানে এই পারস্য সুফিকবিদের প্রভাব সমধিক। দেহবাদও যে অপূর্ব কাব্যসুষমামণ্ডিত হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানেও কবির অধ্যাত্মচিন্তার একটি পরিচয় আমরা পাই, যখন কবি বলেন :

নহ মাতা, নহ কন্যা
নহ বধূ, সুন্দরী উর্বশী

অনেকেই এই কবিতায় শ্লীল ও অশ্লীল প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে 'উর্বশী' কবিতাটি আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লালনের একটি গান 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়' এই আলোকে 'পত্রপুটে' একটি অপূর্ব কবিতা উপহার দিয়েছেন সত্য, কিন্তু লালনের গান লোকায়ত জীবনের পরিমণ্ডলে এক অভিনব চমৎকারিত্বের সুষমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, এসব পদ সংগীত হয়েও সাহিত্য, যা আত্মবোধকে আনন্দে পূর্ণ করে তোলে; হৃদয়ে অনির্বচনীয়কে রূপময় করে ফোটানোই যার লক্ষ্য। বাউলসাধনা দেহবাদী হলেও গানে তার প্রকাশ রূপক-ব্যঞ্জনায়। এ যেন পাঁকের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা কোনো পদ্মফুল অথবা কাঁটা পেরিয়ে কোনো সুবাসিত গোলাপ। বাউল দেহবাদী হয়েও দেহেই পদ্ম এবং গোলাপের রূপময়তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। বাউল এবং লালনের গানে একজন কুশলী শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। এখানেই লালন কিংবা কোনো কোনো বাউলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'গোলাপ আমারই আত্মবোধকে আনন্দ দ্বারা নিবিড় করে তোলে, তাতে আমারই সত্তার বিকাশ।' বাউলগানে এই বোধেরই প্রকাশ ঘটতে দেখি।

সাহিত্য এবং সংগীতের উৎসমূল হৃদয়। হৃদয়ে আনন্দ জাগে। কিন্তু যখন তা যুক্তির ছোঁয়ায় সুমিত, তখনই তা হয় কল্যাণধর্মী। সে এক মহোত্তম উপলব্ধি যার অভিঘাতে সৃষ্টিতে আসে উদ্দীপনা। বাউলের গানে যে বিশাল রসময়তা তা একান্তই অনুভূতিনির্ভর। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় যাকে বলা যায় *Spontaneous*

overflow of powerful feelings। বাউলের গানে অমাবস্যা গাঢ় অন্ধকারময় হলেও পূর্ণিমার আলোকচ্ছটায় তা দীপ্ত।

সে কথা কি কবার কথা, জানতে হয় ভাবাদেশে
অমাবস্যায় পূর্ণশশী পূর্ণিমাতে অমাবস্যে ॥
অমাবস্যায় পূর্ণিমার যোগ আজব সম্ভব সম্ভোগ
জানলে খণ্ডে এ ভবরোগ গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥

এই গানে বাউল ভাষাতত্ত্বের আপাতবিরোধিতা *Oxymorn* প্রয়োগ করে ভাষাকে এক বিস্ময়কর চিত্রকল্পে পরিণত করেছে। এখাসে রস আছে, রূপও আছে; আর এ দুটিকে মিলিত করেই বাউলের স্বরূপসাধনা। এই স্বরূপ অভিজ্ঞানই তার অন্ধকারে আলোর দীপ্তি। এখানেই তার মুক্তি। এই রূপকে জানবার এক আকুল আকুতি জেগেছে বাউলের মনে। হৃদয়ের কথা সে বলিতে ব্যাকুল। বাউলের গানে একটি বেদনাবোধ জেগে থাকে, যা মনকে আন্দোলিত করে এক নিদারুণ অতৃপ্তিতে।

আমার হয় নারে সে মনের মতো মন
আমি জানব কি সে রাগের করণ।

বাউলের গান সংগীত হয়েও সাহিত্য এবং এ সাহিত্য একটি বেদনাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ বেদনাই যে তার আনন্দ, তার সকল পাওয়া! 'আমার আনন্দই আমার বেদনা।' এই আনন্দ-বেদনার মাঝেই বাউল তার দয়িতকে অনুভব করে। 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভোর মেলে না।

বাউলের গানে মিলনের প্রত্যাশা আছে, কিন্তু মিলন নেই। বেদনা আছে, কিন্তু দুঃখ নেই। আনন্দ আছে, কিন্তু সুখ নেই। বাউল অরূপের সাধনা করেছে রূপের মধ্যে। রূপলোকে অরূপ হয়েছে অপরূপ। এ তার বেদনা, তার আনন্দ। এ তার প্রেম এবং এই প্রেমেই তার মুক্তি। বাউলের গানে এই মুক্তির কথা আছে।

রবীন্দ্রনাথ তার পথের দিশা পেয়েছেন বাউলের গানে। বাউলের মনের মানুষ রবীন্দ্রনাথ রূপ পেয়েছে তার মানসী এবং জীবনদেবতায়। সমগ্র বাউলগানে বলা যেতে পারে সীমা ও অসীমের এক দ্বৈত সুর রয়েছে, যা এক অস্ফুট বেদনাকেই জাগ্রত করে।

মিলন হবে কত দিনে
আমার মনের মানুষের সনে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-গানে বাউলের এই দ্বৈত সুরের সফল প্রকাশ ঘটেছে। বাউলগানের এটাই বড় বৈশিষ্ট্য তার অপরূপ শিল্পকুশলতা–যা আমাদের হতবাক

করে দেয়। বাউল তার প্রতি গানে এক অপূর্ব অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এ যেন এক অপরূপ চিত্রময়তা, যাকে বলা যায় রোমান্টিক কাব্যের *Egoistical sublimity.* এই চিত্রময়তা, যার প্রকাশ ঘটেছে রূপক কিংবা উপমা প্রতীকের সফল প্রয়োগে। বস্তুত এই চিত্রময়তা বাউলগানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। যেমন :

১

বাড়ির কাছে আরশী নগর
সেথায় এক পড়শী বসত করে

২

লীলা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝায়
গঙ্গা ডাঙ্গা বেয়ে যায় ॥

৩

চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া
জমিনে ফলছে মেওয়া
চাঁদের সুধা পরে।

৪

বিনা কাষ্ঠে অনল জ্বলে
জল রয়েছে বিনা স্থলে।
আখের হবে জলানলে
প্রলয় অতি।

৫

আঁখির কোণে পাখির বাসা

৬

বিন্দু নালে সিন্ধুবারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চাঁদের স্বর্গপুরী

৭

চক্ষু আঁধার দেলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়।

এমন অসংখ্য উপমা, প্রতীক এবং রূপক সৃষ্টি বাউলগানে রয়েছে, যা দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। বাউলগানে যেসব উপমা ব্যবহার করা হয়, তা সবই লোকজীবনের অনুগামী। সচরাচর যে ভাবনা লোকজীবন ও মানসে ব্যাপ্তি লাভ করে তারই রসময় প্রতিফলন ঘটে বাউলের গানে। যেমন :

১

খুঁটো ধরে বসে আছে যে জনা
জাঁতার ঘেঁষ তার গায় লাগে না

২

তাঁতি আছে তাঁতশালে
রসে ভক্তি-তক্তি নাচনি কলে
কলে বেঁধে মায়া ফাঁসি,
তাঁতি ভাই টিপন নড়ি ধরছে কসি
জীব কর্মসূত্রে মাকুর তালে করছে রে আনাগোনা

৩

তাঁতি ভাই ক্ষণে ক্ষণে
তাতে বিষয়নলি দিচ্ছে যোগান,
বাঁধনি আছে ছয় জনা ॥

৪

চেতন বেড়া উপড়ে পড়েছে
সব জায়গা আলগা পেয়ে
গরু ছাগল পাকা ফসল খেয়ে ফেলেছে।

লোকজীবনের বিচিত্র ভাবনা এবং গানের ভাষার অপূর্ব সংগতি বিধানে যে যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তার অসাধারণ রূপকার বাউলগানের রচিয়তাগণ। বাউলগানে সংগীতময়তা প্রধান হলেও এর মধ্যে ধ্বনিমাধুর্য এসব গানকে শিল্পসুষমামণ্ডিত করে তোলে। বাউলগানের রচিয়তাবৃন্দ প্রতি গানের বাণী এবং ধ্বনি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। অনুপ্রাসের কিংবা অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহারে গানে যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে তা শ্রোতা এবং পাঠকের মনকে দ্রবীভূত করে।

১

যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে
মহাযোগ সেই জানতে পারে
ও সে তিনদিনের তিন মর্ম জেনে
একদিনেতে সেধে লয়।

২
বিনা জলে হয় চরণামৃত
যা খাইলে যায় জরামৃত

৩
সর্পের কাছে নাচে বেঙ্গা
এতো বড় আজব রঙ্গা
রসিক যদি হয় সে ধোঙ্গা
অমনি ধরে খায়।

৪
একান্ত যে অনুরাগী
জ্যান্তে মরা ভয় ত্যাগী
লালন কয় সে রসিক যোগী
আমার কার্য নয়।

৫
দিনে দিনে হল আমার দিন আখেরী

বাউলগানের রচয়িতাদের মধ্যে লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ প্রমুখ সাধক অত্যন্ত কুশলী শিল্পী ছিলেন। লালনের গান শব্দ অলঙ্কার ধ্বনিসংযোগে অপরূপ ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয় এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ তার গানের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুভাষণ বা প্রবাদ প্রবচন নির্মাণে লালন ফকির এবং অন্যান্য বাউল গীতিকারেরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

১
আপন মনের গুণে সকলি হয়
ও সে পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর পায়
মুসলমানের মক্কাতে মন
হিন্দুতে করে কাশী ভ্রমণ
ও রে মনের মধ্যে অমূল্য ধন
কে দূরে যায়।

২
জ্যান্তে মরা প্রেম সাধনা কি পারবি তোরা
যে প্রেমে কিশোর কিশোরী হয়েছে হারা ॥
শোষায় শোষে না ছাড়ে বাণ

ঘোর তুফানে বায় তরী উজান
ও তার কামনদীতে চর পড়েছে, প্রেমনদীতে জল ভরা ॥

৩
আমার বাড়ি বিষয় আমার
সদায় ঐ রবে দিন গেল যে তোমার
বিষয় বিষে খালি
সে ধন হারালি
এখন কাঁদলে আর কী হবে তাই ॥

৪
সময়ে সকলি সখা
অসময়ে কেউ না দেয় দেখা ॥

৫
লোভে পাপ পাপে মরণ
তাও কি জানে নারে মন।

৬
সকলি কপালে করে
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুয়েগোবরে।

৭
কপাল বিমতি হলে
ফাঁকা বনে বাঘে মারে।

৮
এত পিরিত দন্তে জিহ্বায়
কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়।

বাউলগানের আরেক সৌন্দর্য এর শব্দবৈচিত্র্যে ধাঁধার কৌশল প্রয়োগ। বাউলগানে রচয়িতা এমন ধাঁধা সংবলিত গানে সকৌতুক রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন। বাউলগানে রূপকের আড়ালে উত্থাপিত ধাঁধার আবরণ ভেদ করে যখন কোনো গোপন বস্তুর আকস্মিক প্রকাশ ঘটে, তখন শ্রোতাসাধারণের মধ্যে দারুণ আনন্দ বয়ে যায়। নিম্নে এ ধরনের ধাঁধা সংবলিত গানের উদাহরণ দেওয়া হলো :

মামা-শ্বশুর ভাগ্নেবধূর কোলে বসে রয়েছে।
যে তিনজনা বাঁজানারী সেই তিনজনার ছেলে হয়েছে ॥

আবার একজন নারীর শুনি একটি পুত্র দুই সম্পর্ক পাতিয়েছে,
আবার কথা শুনে লোকে হাসে পিসির গর্ভে হয় পিসে,
একজন নারীর নাইকো কসুর, দিনে শ্বশুর, রাতে হয় ভাসুর।
জেনেছে সে ধর্ম প্রচুর, জগতে নিশান তুলে রয়েছে ॥
অষ্টমীতে একাদশী, উদয় হলো পূর্ণশশী।
বিধবার মন বড় খুশি, সেই দিনের দিন ধরেছে ॥
সতীর গর্ভে আছে পতি, সাধনে তার হয় সুখ্যাতি,
কুবীর চাঁদে কয় মতি যুগল, চরণ ধরে রয়েছে ॥

বলেছি, বাউলগানে উপমা প্রতীকের ব্যবহার অপূর্ব। এসব লোককবি যারা অশিক্ষিত, তারা কী অসাধারণের নৈপুণ্যে এই উপমা এবং প্রতীক নির্মাণ করেছেন, যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটি অত্যন্ত গৌরবময় স্তরে উন্নীত করেছে। অনেক আধুনিক কবি তারাও বাউলগানের বিভিন্ন উপমা-প্রতীকের ব্যবহার দেখে অবাক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তো তাদের শিল্পকুশলতাকে বারংবার অভিনন্দন জানিয়েছেন। নিম্নে এমনি আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

১

আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কত দিনে ॥
চাতক প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছি কালো শশী
হব বলে চরণ দাসী
তা হয় না কপাল গুণে ॥
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ
কালারে হারালেম তেমন
ও রূপ হেরিয়ে স্বপনে।

২

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কমনে আসে যায়।
ধরতে পার্‌লে মনোবেড়ী
দিতাম পাখির পায়।
আট কুঠরি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না মহল তায় ॥

বলেছি, বাউলগান সাধন-ভজনের গান। এখানে সাধক তার বক্তব্য প্রকাশের জন্য চারপাশের আটপৌরে ভাষাকে চয়ন করে তা থরে থরে সাজিয়েছেন তাদের গানে। এখানে বাউলগীতিকারেরা বিশেষ করে লালন শাহ শব্দচয়নে যত্নবান হয়েছেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার রোমান্টিক কবিতা নির্মাণে আটপৌরে জীবন থেকে শব্দসম্ভার চয়ন করে নিয়েছিলেন ঠিকই এবং তার ব্যবহারেও তিনি অত্যন্ত যত্নবান হয়েছিলেন। তার কাব্যে এই *Selection of words* আমরা দেখেছি। বাউলদের গানেও সেই একই কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

যে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিকর
তার কারিকুরির বলিহারি
সেই কারিকরের কোথায় ঘর।
ধন্য কারিকর ॥
ঘরের কুল তিনটি খুঁটি কি পরিপাটি
দড়ি দড়া বাঁধা ছাদা, সাড়ে তিনকোটি।
ঘরে দরজা নয়খান সকলি প্রমাণ
সে ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর ॥
(অনন্ত গোঁসাই)

বাউলগীতিকারেরা আমাদের চারপাশ থেকে উপমা, প্রতীক বা রূপক গ্রহণ করে তা গানে সন্নিবেশিত করেছেন এবং তা সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত না-হওয়ার ফলে তার সৌন্দর্যলাভে তাকে হতাশ হতে হয়নি। এসব গানে বাউলরচয়িতাদের যুক্তিবাদী মন ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই লোকঅভিজ্ঞানই ফোকলোর। বাউলগানে এমন কিছু জ্ঞানের পরিচয় সংবলিত শব্দসম্ভারের উদাহরণ দেওয়া হলো :

১

মন কি তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া
সদরে সাজ করেছ ভালো, পাছবাড়ি তোর নেই বেড়া
... ...
পাছবাড়ি আঁটেল করো
ঘর চোরারে চিনে ধরো
লালন বলে নইলে তোরও
থাকবে না মন এক কড়া ॥

২

এখন আর ভাবলে কি হবে
কৃতকর্মের লেখাজোকা
আর কি ফিরিবে ॥
তুষে যদি কেউ পাড়ও দেয়
তাতে কি আর চাল বাহির হয়
আমার মন হল যে তুষের ন্যায়
বস্তুহীন ভবে।

৩

না জেনে করণ কারণ শুধু কথায় কী হবে।
কথায় যদি ফলে কৃষি বীজ কেন রোপে ॥
গুড় বললে কি মুখ মিষ্টি হয়।
দীপ না জ্বাললে কি আঁধার যায়
অমনি জানো আল্লা বলায় কি আল্লা পাবে ॥

ছন্দ

বাউলদের গানে যে বিষয়টি সুধীমহলে গুরুত্ব পেয়েছে তা এর ছন্দপ্রকরণ। সংগীতধর্মী হওয়ায় এসব গানের ছন্দ হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে বাউলগীতিকারদের চেষ্টার অন্ত থাকে না। কিন্তু আমরা অবাক হই যখন দেখি কত সহজভাবে তারা এই ছন্দ নির্মাণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের এই ছন্দনির্মাণের কৌশলকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই লোককবিদের কণ্ঠে যেমন আপনা থেকেই গান জেগেছে, ছন্দও তেমনি সহজাতভাবেই তার সংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে; এটা তার কষ্টার্জিত কোনো কিছু নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এইসব লোককবি প্রকৃতির কাছ থেকেই এইসব গানের সুর, ছন্দ শিখেছেন। তাই তাদের গানে মার্জিত ভাষা, কিংবা সুবিন্যস্ত ভাব বা সচেতন অলঙ্করণের কোনো প্রকাশ নেই। যুগ যুগ ধরে লোকপরম্পরায় তাদের এই গান নদীর ধারার মতো আপনি প্রবহমান। একটি সহজাত কবিত্ব স্বতঃউৎসারিতভাবে পাখির কাকলীর মতো আপনিই তাদের কণ্ঠে এসেছে। ভাব, বাণী এবং ছন্দে তাই সেখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই।

বাউলগানের ছন্দ বিশ্লেষণে প্রথমে যে ধারণা জন্মে তা হলো, এর নিজস্ব ঢঙ বা স্বকীয়তা। প্রকৃতিদত্ত এই ছন্দকে প্রাকৃত ছন্দ বা ছড়াচ্ছন্দ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তেও অনেক গান রচিত হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে সেসব যে শুদ্ধতার পরিচয় বহন করে তা নয়। তবে সব বাউল গীতিকারের রচনায়

যে ছন্দের সফল প্রয়োগ হয়নি, এমন নয়। যাদের গানে ছন্দ ত্রুটিযুক্ত, গায়ক তখন তার নিজস্ব তাল ও সুর সহযোগে এসব গান পরিবেশন করেছে। তবে লালন ফকিরের গান, ভাব ভাষা বা বাণী এবং ছন্দে নিঃসন্দেহে অনুপম। এখানে বাউলগানের বিভিন্ন ছন্দের কিছু পরিচয় দেওয়া হলো :

১.	আপনে চোরা আপনে সে লয় লালন বলে কই না থাকি	আপন বাড়ি আপন বেড়ী এ লাচাড়ি চুপে চাপি	স্বরবৃত্ত
২	মাটির ঢিবি ভূতভাবে সব ভোলে না সে (ও সে) মানুষ রতন	কাঠের ছবি দেবা দেবী এ সব রূপী চেনে	স্বরবৃত্ত
৩	লালন বলে দিবা নিশি (আমি) মণিহারা হারা হলেম	মলেম জ্বলে জলে স্থলে ফণীর মতো পিতৃধনে	*মাত্রাবৃত্ত*
৪	হেলায় হেলায় মহাকাল এখন আর কতকাল রং মহলে	দিন ফুরালো ঘিরে এলো বাঁচবি বলো লাগল হানা ॥	*স্বরবৃত্ত*
৫	কেউ মালা কেউ তাইতে কি জাত যাওয়া কিংবা জাতের চিহ্ন	তছবি গলে ভিন্ন বলে আসার কালে রয় কাররে ॥	*মাত্রাবৃত্ত*
৬	বারি যোগে খেলছে খেলা	বারি তালা মন কমলে	*মাত্রাবৃত্ত*

এখানে বাউলগানের যে ছন্দ পরিচয় দেওয়া হলো, তাকে মূলত লৌকিক ছন্দ বলাই শ্রেয়। কারণ বাউলগানে যে ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা গীতিকার বা লোককবি প্রকৃতিগতভাবে বেড়ে ওঠা স্বভাবসুলভ নিজস্ব ঢঙে ব্যবহার করেছেন। এসব গান মুখে মুখে রচিত। তাই স্বাভাবিকভাবে শ্বাসাঘাত প্রধান। একে তাই

'প্রাকৃত ছন্দ' নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। এখানে ছন্দ নির্মিত হয়েছে গানের মধ্যে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এজন্য এসব ছন্দ বাণীপ্রধান এবং এখানে অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনি কিংবা মাত্রা নির্ণয় করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার বিশ্লেষণে বাউলগান বা মেয়েলি গীত, ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদিকে প্রাকৃত ভাষার 'ছড়াচ্ছন্দ' বা 'পদাতিকছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। বাউলগানের এই স্বভাবসৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছিল। বাউলদের আপাত-খ্যাপামি স্বভাবকে লক্ষ করে হয়তো তিনি এই লৌকিক ছন্দকে 'পদাতিক ছন্দ' নামে চিহ্নিত করেছেন।

সাহিত্যের বড় গুণ তার রসবোধকে জাগ্রত করে। যে কোনো কবিতা পাঠ বা গান শুনবার পর আমাদের অন্তরে যে ভাবের সৃষ্টি হয় বা অনুভূতি জাগে, তাকেই আমরা বলছি রসাস্বাদন। বাউলগানে এই রসসৃষ্টির বিষয়টি রয়েছে। এখানে বাউলকবি তার অন্তরের অতৃপ্তির কথা উল্লেখ করেছে। তার গানের সর্বত্র কাঙ্ক্ষিত মানুষকে না-পাওয়ার বেদনাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই বেদনায় আনন্দ আছে। চর্যাগীতিকা এবং বৈষ্ণবপদে আমরা এই চেতনার পরিচয় পাই।

সাহিত্যের একটি বড় অবদান সে সঙ্গ দেয়। মানুষকে তার নিজের কাছে টেনে নেয়। সাহিত্য মিলনের সেতু রচনা করে। কিন্তু পরিপূর্ণ মিলন ঘটায় না। বিরহেই তার সার্থকতা। হৃদয়ের সাথে যোগাযোগ সংঘটিত হলেই সাহিত্যের কাজ একরকম শেষ হয়। হৃদয়ে অনুভূতি সৃষ্টি করাটাই সাহিত্যের বড় অবদান। রসের আনন্দও সেখানে তাই নিত্য ঝরে। সাহিত্যে শিল্পসৃষ্টির দুটি দিক আছে : একটি তার অনুভূতি, অপরটি ছন্দকৌশলে তার সার্থক প্রকাশ বা সফল সঞ্চরণ। কবির অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন রূপভাষণে সার্থকতা লাভ করে, তখন তা পরিপূর্ণ শিল্প হিসেবে স্বীকৃত হয়। শিল্পের সার্থকতা তার প্রকাশে। বাউলগানে এই প্রকাশের জাদু আছে যা আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বলেছি, বাউলগানের শিল্পবোধের উৎস তার রোমান্টিকতা। কিন্তু এই রোমান্টিকতা জীবনকে অস্বীকার করে নয়, বরং জীবনকে তা প্রকৃত অর্থে, অভিজ্ঞানে আরও পূর্ণতর এবং দীপ্তরঙিন করে তুলেছে।

বাউলগানে শব্দচয়ন অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে হয়েছে এবং প্রতিটি শব্দেই, বলা চলে, একটি চিত্রময়তা রয়েছে। তথাপি বলা চলে, আধুনিক কাব্যরীতির মাপে বাউলগানে অপূর্ণতা আছে। কিন্তু এই অপূর্ণতা নিয়েও বাউলগান লোকসাহিত্য হিসেবে শুধু নয়, যথার্থ সাহিত্য হিসেবেও তা সার্থক। বাউলগানে একটি বিশেষ লোকধর্মের পরিচয় আছে ঠিকই; তাদের সাধন, ভজন, দেহবাদ ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে এসব গানে; কিন্তু এসব গানে একটি লোকধর্মের অনুসারীদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের জীবনবোধের কথাও আমরা জেনেছি, যা সর্বলোকের সঙ্গে একীভূত। এসব গানে যে মানবতার কথা উচ্চারিত হয়েছে তা আজকের দিনে সাম্প্রদায়িক

মনোভাবপুষ্ট সমাজে বড় প্রয়োজন। বাউলগানে বাঙালি সংস্কৃতির যথার্থ রূপ ফুটে উঠেছে। এই গান কোনো একটি সম্প্রদায়ের সম্পদ নয়, এসব গানে মানুষে মানুষে মিলনের আহ্বান জানানো হয়েছে। জাতি, বর্ণ সবকিছুকে নস্যাৎ করে একজন যথার্থ মানুষের কথা বলা হয়েছে। এ কারণে দেশকাল ছাপিয়ে আজ বাউলগান বিশ্বসাহিত্যে তার আসন করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের গান থেকে তার জীবনদর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে তিনি তার সকল সাহিত্যকর্ম নির্মাণ করেন। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং অন্যান্য কবিতায় তিনি বাউলদের দর্শন সুকুমারশিল্পে পরিণত করেন। তার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মূলেও বাউল এবং লোককবিদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

বাউলগান মূলত ভাবনির্ভর। ভাষা এই ভাবের বাহন। বাউলগানের রচয়িতারা গ্রামে বসবাস করেছে। এই সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের নিত্যদিনের ভাষা এই গানের সম্পদ। এই ভাষা সব ধরনের কৃত্রিমতাবর্জিত, যাকে আটপৌরে বা মুক্তভাষা বলে অভিহিত করা যায়। অনেক গানে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা কেবল নিরক্ষর বা পিছিয়ে পড়া সমাজেই প্রচলিত। এই গান যে-অঞ্চলে রচিত, সে-অঞ্চলে ব্যবহৃত সাধারণ মানুষের ভাষা এই গানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু গানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তা অন্যের নিকট দুর্বোধ্য হয়নি। অনেক সময় এই গান অন্য অঞ্চলে গীত হওয়ার সময় সেই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে কোথাও শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু কোনো সৌন্দর্যহানি হয়নি। অবশ্য এক্ষেত্রে উচ্চারণের পার্থক্য ঘটে কিন্তু অর্থে কোনো তারতম্য হয় না।

বলেছি, বাউলগানের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই গানে লৌকিক ভাষার সফল প্রয়োগ। গ্রামেগঞ্জে পিছিয়ে পড়া সমাজের নিরক্ষর মানুষ একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় নিরন্তর যে অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করে থাকে; লোককবিরা তাদের গানে, সাহিত্যে তা প্রয়োগ করে থাকে। এই ভাষাকে আমরা তাই লোকভাষা নামে চিহ্নিত করে থাকি। আর্যদের এদেশে আগমনের পূর্বে সাধারণ, নিরক্ষর মানুষের একদিন প্রতিদিনের কথ্যভাষাই ছিল লোকভাষা। আর্যদের আগমনে যে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন হয়েছিল তা বাংলা ভাষায় সাধু ভাষা, চলিত ভাষা নামে রূপ লাভ করে। অতঃপর চর্যাগীতিকায় প্রাকৃত, সংস্কৃত-পালি-অপভ্রংশের পরে বাংলা ভাষার উন্মেষ ঘটে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব অদ্যাবধি অক্ষুণ্ন আছে। কিন্তু লৌকিক ভাষা এই প্রভাবমুক্ত। বাউলগান মূলত ধর্মীয় লোকসংগীত। এই গানে যে ভাষা বা উপমা, উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিতান্তই আটপৌরে এবং প্রতিনিয়ত লোকসমাজে ব্যবহৃত। এইসব ভাষার মাধ্যমেও আমরা আমাদের অতীত সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পরিচয় পাই। বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশে এই লৌকিক ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতির আগমন ঘটেছে। বলেছি, এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকে অনার্য নামে পরিচিত এদেশের আদিবাসীদের সাথে প্রাচ্যের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটেছিল। দীর্ঘকাল ধরে এদেশের জনগণের সঙ্গে আরব-পারস্যের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ফলে আর্য-পূর্বকাল থেকে এদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রাচ্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাচ্যের ভাষাগোষ্ঠীতেও তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব থাকাও স্বাভাবিক। আর্যদের এদেশে আগমনের পর বাংলাদেশের আদিবাসীদের হেয়-প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস যেমন আমরা লক্ষ করেছি তেমনি তার ভাষাকেও অস্বীকার করবার প্রবণতাও আমরা আর্যদের মধ্যে লক্ষ করেছি।

চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের বাংলা ভাষা চর্চা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। আর্যদের পরবর্তীকালেও মুসলিমদের আগমনের পর তুর্কি, আরবি ও ফারসি ভাষার প্রবর্তন হয় এবং এদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিকের রচনায়ও এসব ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অবশ্য এ সময়েই অনেক কবি-সাহিত্যিক বাংলা ভাষাচর্চার পরিবর্তে মুসলিম রাজন্যবর্গের ভাষাকে তাঁদের সাহিত্যকর্মে স্থান দিয়েছেন এবং কেউ কেউ এসব বিদেশী ভাষায়ও সাহিত্যচর্চা করেছেন। এসবের কারণে একজন এদেশীয় বাউল কবি দুদ্দু শাহ বলেন :

মাতৃভাষা ত্যাজে সবাই
আরবি ভাষা শিখলেরে ভাই,
তাতে ভাই ফায়দা তো নাই অবশেষে।

স্বীয় মাতৃভাষার প্রতি এই জাতীয় অনুরাগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গৌরবের। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, বিদেশীদের আগমন কিংবা তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কারণে ভাষার আকৃতি এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসে লৌকিক পরিমণ্ডলে। এসব ভাষা অনেকক্ষেত্রে বহিরাগত বলে মনে হলেও তা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ায় তা দেশী ভাষা হয়ে পড়েছে। সাধারণ লোকসমাজে তাই অনেক বিদেশী শব্দও দেশী বলে গ্রহণ করতে কারো বাধেনি। তবে এইসব শব্দ সাধারণের মধ্যে দেশী বলে প্রচলিত হলেও মূলত সেগুলো বিদেশী। আরবি, ফারসি, ভাষার সঙ্গে এমন অনেক বিদেশী ভাষা, যেমন পর্তুগিজ, ইংরেজি এবং লাতিন ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে যার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

বিদেশী শব্দ

আমাদের আলোচ্য বাউলগানে ব্যবহৃত এসব বিদেশী শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হলো। যেমন : ফুটপিন, হুপিং, সীট, ব্যালান্স, দোহাই, পর্দা, শহর, জাহাজ, গোয়াল, কিতাব, আইন, আলখেল্লাহ, সাঁই, কসুর, এলাহি,

আলামিন, আল্লাহ, বাদশা, আলমপনা, নবী, মেহের, জাহের, বাতেন, আউলে, কাফের, দায়মাল, দোজখ, বেহেস্ত, খালাস, ফিরিঙ্গি, সমঝে, হাল, দালান, কোঠা, বেহুঁশ, আখের, কায়দা, সাজা, তুফান, খোদা, রছুল, আদম, রুহ, কেতাব, মুরশিদ, খোদছুরাত, গজল, যায়দা, আহাদ, আহম্মদ, নবী, নজির, দর্গা, ভরসা, কাণ্ডারী, রহিম, করিম, জবান, খরচ, বেদীন, আপনা, আব, আতস, খাক, বাত, শরা, নিকাশ, নিস্তার, কুত্তা, আন্দাজ, বেরাদর, ফয়দা, পরওয়ার, নূর, কুরআন, হাদিস, ছাদি, ইস্টিশন, দুনিয়া, ইঞ্জিল-কল, লা-শারিকালা, আসমান-জমিন, রেলগাড়ি, শরিক, বদ হাওয়া, ফকির, শমন, দরদ, বালাখানা, এনতেজারি, চালান, বারামখানা, হাওয়াখানা, মওলা, বিগার, সমুদ্দুর, দরশন, ফর্মান, দিলদরিয়া, জিন, ফেরেস্তা, আজাজিল, শয়তান, মশহুর, হুর-নারী, টযছে, তৈছে, কুদরতি, আজব, ওরশ, রশি, কারবার, জজ, ম্যাজিস্টারি, হাকিম, আহম্মক, কায়দা, বেকায়দা, আয়াত, ওলিয়াম, মোরশেদ, মর্দা, কালাম, আলেক, দরওয়ানী, সদরকোঠা, আয়না, আদমী, মহল, ওয়াশিল, খোসকবলাত, খোলাস, মুমিন, মুর্দা, মুন্সী, মৌলভী, মোকাম, ইল্লিন, সিজ্জিন, মক্কা, মকছুদ, মঞ্জিল, মদিনা, কাবা, জাহির, বাতিন, ইঞ্জিল, ছিনা, দরিয়া, ছফিনা, জায়নামাজ, ইশারা, নহবৎ, পাগলা, খিজি, থানা, জমিদার, জিম্বা, বারি, পাঞ্জাতন, বারিতালা, লাহুত, মালকুত, জাবরুত, নাছুত, হাউত, ভরসা, লতিফা, লাল, জরদ, ছিয়া, ছাফেদ, দম, বেদম, চিজ, বেহাল, পেরেক, আখের, কাজী, হুজুর, হকদার, খুসকিজারি, টাঁকশাল, আখেরি, ফানা, কামেল, ফাজেল, তরিকা, কাছারি, টেককা, তুরুপ, হরতন, তহশিল, দম, মাদার, মিছকিন, বাকাবিল্লাহ, ফানা ফিল্লাহ, পীর, বয়াত, হামেশা, আলি, ফাতেমা, কালাম, মালেক, মৌজ, দলিল, সেজদা, হারাম, হালাল, মশরেক, বরজোখ, গোর, বিলায়েত, ছুন্নত, দরবেশ, দারোগা, খাজলত, ইল্লৎ, সোয়াস্তি, জুদা, পস্তাবি, দুন্দবি, রোজা, নামাজ, হজ্ব, জাকাত, কোরবানি, ওজন, খবর, মজবুত, হুঁশিয়ারী, বেহুঁশিয়ারী, চাকর, আওয়াজ, কাজনা, বাগান, কলম, ফৌজদারি, বাটপাড়, পেরেশান, সেরেস্তা, তালিম, কোর্ট, মাইকেল, কারখানা, ওলিআল্লাহ, হরফ, ফেরেপবাজি, ফেৎনা, ফাছাদ, লাগাম, ঝরোকা, বন্দেগী, মোজেজা, তেলেসমাতি, কুঠরী, সাঁই, আদল, সামাল, তুফান, হিল্লা, নিশানা, নেহারী খাড়া, নিদান, মামলা, রব্বানী, দীন, মাশুক, আশেক, নেগাহবান, বেহাল, তরিক, মঞ্জিল, ফাই-ফরমাশ, আরজি, মৌজ, কলমাদাতা, আরেফিন, দীদার, দেলদরিয়া, আলেখ-নুরী, ফিকির, ফকির, আখেরি, দম, ধেয়ান, আব-হায়াত, মাতোয়ালা, ওয়াশিল, ফতুর, খাজনা, বাদশা, দায়মাল, বেহিসাব, হুপিং, তামাশা, বদমাশ, কাঁকন, ঝুট, জুদা, আরশ, নছিব, ইস্কুল, আসামি, তিরপল।

লৌকিক ও দেশী শব্দ

ঘাট-আঘাট, কাষ্ঠের পুতুলী, পীরিত, রাঙ্গা-চোঙ্গা, তালো ডোঙ্গা, বাও, কলুর বলদ, গুয়ে-গোবরে, লাচাড়ী, জঙালা, কপনিধ্বজা, ডিঙ্গি-নালা, পড়শী, ছেউটি ছেঁদা, মথন দণ্ড, চাম-কেঠো, পলাম, মলাম, বিল, বাঁওড়, খাল, গাঙ, দোয়াড়ী, ময়রা, আবাল-গুদড়ী, চার, তালা-ছোড়ান, কোনা-কানছি, ঢেঁকিপাড়, উজান-ভেটান, তোড়ানি, ঠুসি, দপ-কাপ, ধোঙ্গা, বেঙ্গা, আড়া, আইল, মহি-কুণ্ড, তড়পা, সঙ, পাছ-বাড়ি আঁটেল, চুয়াইয়ে, ঝড়ি-ঝটকা, দড়া-দড়ি, কুলো-চালুনী, ছাই-চাপা, তেড়ো, শিল-নোড়া, ছেঁচের পান, মটকা, কলকে, খাবি, ভাণ্ড, বেভাণ্ড, কাছি-দড়ি, সাঁকো, বেসাতি, চৌরশি-ভ্রমণ, বচন, অকৈতব, নান্দা, হামাল, আচলা, হুমো, যাজন, ঘাটাল, নালা, কুহক, বাঁধাল, আজগুবি, আলগোছে, নালি, যোগান, মাকু, তারণ, মাঝি, মাল্লা, কিনার, পাগার, কান্দা, ছেড়া, পলক, বেপার, মহাজ গাহক, আলা, ভোলা, ফেও, ফেপি, ফ্যাকাস, গাটরি, দুয়রি, ধন্বন্তরী, আলেক, পীড়ে, বোঁড়ো, ঝাপা, গেরাপি, নিদান, নিরিখ, গাছি, টোপা, পানা, ছানা, তর, লেংটি, এড়া নাগর, ডাঙ্গা, খাঁদা, বাঁদা ভুত, ছুড়া, ঘুস, ঘুসানি, হাতেন, ঘড়ি, বিকার, ভেল্কিবাজি, আড়া, ফন্দি, চোপাস, আদলা, দশা, চৌকি, ভেড়ুয়া, ভিয়া, কাটুর, কুটুর, গুগলি, ডোঙ্গা, খালুই, গাছি, মন, নিকেশ, নলেন, তড়পানো, ঠুসি, ছেচে, পাচবাড়ি, আটেল, চুয়ারে, কুলো-চালন, উইপোকা, পুই, কুড়ে, পিলুই, চুবানি, উঝা, রোঝা, গুণীন, কেলে, পোষমানা, আস্তা, সারা, ঠেঁটা, টেঁটা, হোঁচট, কানা, খোঁড়া, রাঙ, চটক, জাঙলা, উটকো, বাণ, মদন, রস, গুরো-আটা, পাটাতন, গুণ, গাড়ে, দেওয়া, কপিকল, ফাঁফর, খাবি-খাওয়া, বাধাল, মীন, লাচারী-পাতারী, কপট, বান, হাবুডুবু, বাজি, বেশভুষা, মাকাল বকাউল্লা, কালসিটা, গুণরী, আড়িগুড়ি, ডুবারু, জ্যান্ত-মরা, জারণ-মরণ, উথলে ওঠা, ময়রা, সপে, শঠ, অভাজন, অন্তিমকাল, ডঙ্কা, আগম-নিগম, পেলা-দেওয়া, ঘরামি, ঝড়ি-ঝটকা, নেলা, চেলা, দেনা, টোপা, পানা, দাঁড়ী, উজান, বাঁক, নীর, ক্ষীর, পতঙ্গ, গরল, বামন, শান, পসরা, গিলটি করা, বাড়া, আড়িপাতা, মিস্তিরি, তুষ-কুঁড়ো, কয়লা, ক্রোশ, চাড়াল, জোয়াল, ছাঁনচে।

তৎসম শব্দ

জল, বায়ু, আকাল, মানুষ, চন্দ্র, কর্ম, ধর্ম, ভক্তি, কৃষ্ণ, সর্প, তৃষ্ণা, রত্ন, মুক্তি, বাতুল, পঞ্চ, পুণ্য, স্বর্গ, শক্তি, জন্ম-মৃত্যু, সত্য, মিথ্যা, লক্ষ্য, গুরু, দিবাকর, নিশাকর, পূর্ণিমা, নারী, অমাবস্যা, ক্ষিতি, বৃক্ষ, দুঃখ, সুখ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ, বস্তু, জ্ঞান, অন্ন, প্রসন্ন, দৃষ্ট, মৎস্য, ক্ষীরোদ, রবি, শশী, অমৃত, পুত্র, সহস্র।

অর্ধতৎসম শব্দ

রত্ন>রতন, চন্দ্র>চন্দন, কৃষ্ণ>কেষ্ট, ত্রিবেণী>তিরপিনি, জ্যান্ত>জীয়ন্তে, শক্তি>শকতি, মূর্তি>মুরতি, জন্ম>জনম, মর্ম>মরম, ধর্ম>ধরম, প্রকৃতি>পিকিতি, দর্শন>দরশন, স্পর্শ>পরশ, মন্থর>মথন, গর্ব>গরব, ভ্রমি>ভরমি, প্রীতি>পিরিতি ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দ

হাত, পা, কান, চোখ, মাথা, বাবা, মা, ভাই, বোন, আমি, তুমি, তিনি, সে, সাধ, ছার, বেহারা, আড়াই, ইদারা, ওঝা, ঢাক ইত্যাদি।

যমক

যমক অর্থে 'যগ্ম' বুঝালেও একই রকমের শব্দ যদি দুবার কিংবা তার বেশি ভিন্ন অর্থে উচ্চারিত হয় তবে তাকে 'যমক' বলা হয়। বাউলগানে 'যমক'-এর বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন :

১

সকলি কপালে করে,
কপালের নাম গোপাল চন্দ্র
কপালের নাম শুয়ে গোবরে।

(লালন)

২

এই মানুষ সেই মানুষে আছে

(লালন)

৩

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা,
ওরে কেমন করে চাঁদ, ধরবি গো তোরা।
লক্ষ লক্ষ চাঁদে ভরছে আভা
তার মাঝে অধর চাঁদের আভা

(লালন)

৪

নবী চিনে করো ধ্যান
আহম্মদে আহাদ মিলে
আহাদ মানে সোবহান।

(পাঞ্জু)

অনুপ্রাস : কাব্য বা রচনায় রূপবর্ণের পুনঃপুন বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। এই পুনরাবৃত্তির ফলে প্রয়োগকৃত শব্দে শ্রুতিমাধুর্য আসে। যেমন :

১

তিন দিনের তিন মর্মজেনে
সাধু সাধনে ধরে একই দিনে।

(লালন)

২

আঁখির কোণে পাখির বাসা।

(লালন)

৩

ফণী মণি জিনি এরূপ উজলে।

(লালন)

৪

চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া।

(লালন)

শ্লেষ : যমকের ন্যায় একটি বিশেষ শব্দালঙ্কার। এই শ্লেষ ধ্বনির উপর নির্ভরশীল।

১. যদি সাধ করে সাধনে/নিক্তিধারে টোকা মেরে/তিন কাঁটা করো সমানে।

২. সরল চন্দ্র গরল চন্দ্র/রোহিণী চন্দ্রধারা/ রস-বীজ মিলন করে পান করেছে তারা।

নতুন চাষা ম'ল পরাণে/চাষের ভাব না জেনে/আমজোয় শুকনো ডাঙ্গায়/ধানবোনে বেগুন জ্ঞানে।

বাউলগানে উপমা, রূপক কিংবা যমক বা অনুপ্রাস ইত্যাদির ব্যবহার রচয়িতার সৌন্দর্যপিপাসু মনের পরিচয় বহন করে। একজন লোককবি আধুনিক কবির মতো সচেতনভাবে এই অলঙ্কার কাব্যে প্রয়োগ করেননি, কাব্যের দাবিতে তা আপনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লোককবিদের রচনায় এই অলঙ্কার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে তাই বিস্ময়কর এবং অভিনব।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। কেবল গানের কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা হলো। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১. 'ভাব' সাধারণ-অর্থে 'কল্পনা' বোঝা গেলেও কবিদের কাছে এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। এ সম্পর্কে C.M. Bowra বলেন : "...It reveals an important kind truth...When it is at work, it sees things to which the ordinary intelligence is blind and that it is intimately connected with a special insight or perception or intuition.
Bowra C.M. The Romantic Imagination, London 1961, P. 7

২. Ibid, Bowra আরও বলেন : "...Imagination and insight are infact inseparable and form for all practical purposes a single faculty. Insight both awakes the imagination to work and is in turn sharpened by it when it is a work, this is the assumption on which The Romantics wrote poetry. লালন ফকির ও বাউলদের মধ্যে কল্পনা বা ভাব কখনও বাস্তববর্জিত নয়। 'ভাব' যেন এক সঞ্জীবনী সুধা (Living Power) যা কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করে।

৩. শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল*, কলকাতা।

৪. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ*, কলকাতা ১২৮১

৫. Devi Prasad Chattopadhyaya, *Lokayata*, Calcutta 1965

৬. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ

৭. সব মুসলিম ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত যে অষ্টক শতক থেকেই আরবের মুসলমানগণ এদেশে আগমন করেন। তারা সমাজে ফকির বলে পরিচিত হন। ভারতে আগে আরব বণিকদের আগমন ঘটেছিল এবং সুফিদের বাংলাদেশে আগমন শুরু হয়েছিল নবম শতক থেকে। অবশ্য তার অনেককাল আগে থেকেই ভারতীয় বৌদ্ধমতবাদ পারস্যে একটি বিশেষ মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সুফি মতবাদ একটি সমন্বিত মতবাদ। বাতেনী ধারা সুফি মতবাদের একটি শাখাবিশেষ। ইসমাইল নামে একজন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এই মতের প্রবর্তক। তিনি সুফি মতবাদের প্রবর্তক শিয়া ইমাম জাফর-আস-সাদেকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইসমাইল নিজেও শিয়া ইমামতের একজন সদস্য ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে নানা দুর্বলতার কারণে তাঁকে শিয়া ইমামতি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

৮. Suniti Kumar Chattopadhyaya, *The Origin : And Development of Bengali Language*, Calcutta.

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার বাউল

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাউলপ্রভাব

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বাংলাদেশ অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন বাঙালি কবি হিসেবে এতদিন যারা তাঁকে সাধারণের মধ্যে কিছুটা অসাধারণ ভেবেছিলেন, তারাই তার কবিত্বের মধ্যে মহৎ ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিশ্চিত অর্থেই 'অসাধারণ ভাবনা'র প্রকাশ লক্ষ করে চমৎকৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে যারা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন, গোটা পৃথিবীর সাহিত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল। বেদ উপনিষদ সম্বন্ধেও তারা অবহিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার যে পরিচয় সেদিন তারা লাভ করেছিলেন তার সাযুস্য তারা অন্যত্রে লক্ষ করেননি। রবীন্দ্রপ্রতিভার এই পরিচয় সেদিন পাশ্চাত্যকে হতবাক এবং অভিভূত করেছিল। পৃথিবীর তাবৎ মহৎ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে একটি নতুন ভাবনা ও মৌল চেতনার প্রকাশ দেখে অভিভূত হয়েছিল। লন্ডনে শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের বাড়িতে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ শুনবার সময় সেদিন যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে এভরিম্যান লাইব্রেরির সম্পাদক আর্নেস্ট রীস, ঔপন্যাসিক মে সিনক্লেয়ার, সি.এফ. অ্যান্ড্রুজ, কবি এজরা পাউন্ড, অ্যান্ড্রু ব্রাডলি, ইভলিন আন্ডারহিল অন্যতম। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন :

> একবার তার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে রবীন্দ্রনাথের মুখে সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যার বিবরণ শুনেছিলাম, যখন হ্যামস্টেডে রোদেনস্টাইনের বাড়িতে ইয়েটস একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাছে তখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। পড়া হয়ে গেল; Stolid ইংরেজরা একটি কথা না বলে একে একে বিদায় নিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হল তিনি নিজের উপর লজ্জা ডেকে আনলেন, লজ্জা দিলেন তার জন্মভূমিকে। কিন্তু পরের দিন পৌঁছুতে লাগল চিঠির পর চিঠি—তাতে অভিনন্দনের ভাষা এমন উঁচু পর্দায়ে বাঁধা, ছিল যা

> প্রাপকের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ হল না যে সেগুলো সত্যিই সেই নিঃশব্দ শ্রোতাদের মনের কথা।[১]

'গীতাঞ্জলি'র প্রভাবের কথা আরও উল্লেখ করে বুদ্ধদেব বসু বলেন :

> আমাদের মনে পড়ে যায় তারই প্রভাবে চার্লস অ্যান্ড্রুজ নামক একজন ইংরেজ মিশনারির সমগ্র জীবনধারা বদলে গিয়েছিল; মনে পড়ে সেই রাতে এক বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে অ্যান্ড্রুজ বেশি কথা বলেননি, চেয়েছিলেন একা হয়ে সদ্যশোনা বিদেশী কাব্যের *Wonder and glory* বিষয়ে চিন্তা করতে এবং অনুরণনে পরিপূর্ণ মন নিয়ে সেই গ্রীষ্মের রাত্রি আকাশের তলায় বিনিদ্রভাবে কাটিয়েছিলেন। রোদেনস্টাইনের মনে হয়েছিল যে, 'গীতাঞ্জলি' মহনীয় মিস্টিকদের রচনার সগোত্র আর অ্যান্ড্রু ব্রাডলি দেখতে পেয়েছিলেন অবশেষে আমাদের মধ্যে এক মহৎ কবিকে।[২]

সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ এক মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। 'গীতাঞ্জলি'তে স্রষ্টার যে পরিচয় বিধৃত হয়েছে তা কোনো বিশেষ ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বর একক এবং তিনি অভিনবও বটে।

রবীন্দ্রপ্রতিভার মর্মমূলে এই যে গভীর বিশ্বাস, তার পরিচয় বিশ্লেষণে অনেক পণ্ডিত ও গবেষকবৃন্দ অনেক মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। কেউ ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, কেউ ভেবেছেন তিনি ব্রাহ্মসমাজ বা বৈষ্ণব আদর্শে অনুপ্রাণিত। কেউ কোনো প্রভাবকেই গ্রহণ করতে চান না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'গীতাঞ্জলি'তে যে বাণীর প্রকাশ ঘটেছে তা সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান। প্রশ্ন জাগে, কবির অন্তরে এই যে বাণী তার সমগ্র সাহিত্য ও সংগীতকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এর উৎস কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ বাউলদের মধ্যেই তা পেয়েছিলেন। এই বাউলেরা ছিলেন ইরানীয় বাতেনী সুফিভাবধারাপুষ্ট একশ্রেণীর সাধকদের উত্তরসূরি। দিওয়ানা হাফিজ, ওমর খৈয়াম, সরমদ, জুনায়েদ এই মতাদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ খুব ছেলেবেলা থেকে বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে ইরানীয় কবি হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের কাব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন।[৩]

হাফিজের সংগীত এবং ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত যে জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাউলদের মধ্যে তার পরিচয় পেয়ে আশ্চর্যান্বিত হন। পিতা দেবেন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রনাথ নিজেও ফারসি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। বলা চলে, বাউলদের প্রতি তার এই মমত্ববোধের পেছনে ফারসি সাহিত্য এবং সংগীতের সমধিক প্রভাব ছিল। একই কারণে রবীন্দ্রনাথের কবীরের পদাবলীর প্রতিও আকৃষ্ট ছিলেন। তার অনেক পদকে তিনি ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেন। কবীরও ছিলেন বাতেনী সুফিবাউল মতাদর্শী।[৪]

মোগল আমলে বাতেনী সুফিসাধক সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করে। সম্রাট আকবর এবং পরবর্তীকালে দারাশিকো তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। দারাশিকো এসব সুফিদের ভাবধারা নিয়ে নানা গ্রন্থও রচনা করেন। মোগল আমলেও অনেকদিন সে প্রভাব সমাজে অক্ষুণ্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইরানীয় সাহিত্য এবং সংগীত, বিশেষ করে হাফিজের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এবং তার জীবন ও কর্মে হাফিজের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে। এ সম্পর্কে অজিত কুমার চক্রবর্তী উল্লেখ করেন : "হাফিজের সংগীত ব্যতীত, ধর্মগ্রন্থ নয় এমন অপর কোনো গ্রন্থকে মানুষ এত অধিক পরিমাণে জীবনের সঙ্গীরূপে সযত্নে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন কিনা সন্দেহ।"[৫] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হাফিজের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমের এক নিবিড় গভীর মমতাপূর্ণ নির্ভরতার খোঁজ পেয়েছিলেন। উপনিষদের বহু বাণীর অনুসরণও তিনি হাফিজের কাব্যে লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রমুখ কবিদের প্রতি তীব্র ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। মনে হয়, বাংলার বাউলদের মধ্যে এসব ভাবধারার প্রকাশ লক্ষ করে তিনি তাদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন।

হাফিজ, ওমর খৈয়াম, সরমদ, জুনায়েদ প্রমুখ ইরানীয় কবিদের রচনায় যে দেহস্থ আত্মার অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়, হিন্দিসাধক কবীর এবং বাংলার বাউলদের শিরোমণি লালন শাহ এবং অন্যান্য বাউলদের গানে তারই প্রতিধ্বনি শুনি। রবীন্দ্রনাথে তারই পরিশীলিত অনুরণন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এসেই বাউলদের মধ্যে তার আত্মদর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন তার সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সর্বত্রই তার কবিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। বলা চলে, তিনি স্বরূপসন্ধানী এক মহৎ কবি। তার প্রতিভা একান্তভাবে বাংলাদেশ-কেন্দ্রিক। তিনি পরিপূর্ণ বাঙালি কবি। তার সমগ্র সাহিত্যকর্মে বাংলাদেশ অসাধারণ উজ্জ্বলতায় প্রতিভাত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তার সাহিত্যে দুটি আকাঙ্ক্ষা আছে—সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা; আবার অন্যধারে, নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যালোকের সাথে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। জমিদারি তদারকিতে বাংলাদেশে এসে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়েছে। পদ্মা এই চেতনার সজল প্রকাশ। নদীমাতৃক বাংলায় মানুষ এবং নদী একে অপরের অংশীদার হয়েছে। পদ্মায় চাঁদ উঠবার সাথে সাথে বাংলার হৃদয়দেশে পল্লীর বুকে গান জেগেছে। ঢাকের কাঠির ঢাককুড়কুড় শব্দসংকেতে কবি জমিদার অসাধারণে সাধারণ হয়ে নিত্যকালের অসাধারণই রয়ে গেলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি ভূগোল কল্পনা করেছেন।[৬] এই ভূগোল গোটা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ এই বাংলাদেশ থেকে তার

রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। পশ্চিম বাংলার জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়েছে। আর এই বাংলাদেশ গোটা পূর্ব বাংলা। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির প্রতি ধমনীতে, রক্তবীজে, আত্মার আত্মজ হয়ে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাঙালি খুঁজে পেয়েছে তার হারানো বাংলাকে; দেখেছে এক সূর্যোজ্জ্বল চারণভূমি, গবাদিপশু, গাঁয়ের রাখাল, হাতুড়ি গাঁইতি চালানো মজুর শ্রমিক; দেখেছে সারা বাংলার মাঠ প্রান্তর,—ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিত্য প্রবহমান শ্যামলী কন্যার মতো উজ্জ্বল পদ্মা নদীকে। দেখেছে তার মোহনা কেবলই বিস্তৃত হয় এবং আপনাকে ছড়িয়ে দেয় মহৎ প্রশান্তি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এডওয়ার্ড সি-ডিমক, (জুনিয়র)-এর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> That Rabindranath as a poet and as a thinker lies well within the tradition of a long line of Indian poet-saints, and that his roots are far more deeply buried in medieval Bengal than they are in the West. This is not to say that Rabindranath was uninfluenced by western thought and literature. Indeed, I should find that very difficult to argue, particularly on the literary level. I do feel that he lives today in Bengal as he did fifty years ago because he is first and foremost a Bengali poet. He is great because he had profound insight and rare lyric genius. These are the exclusive property of no language or tradition. He is great to non-Indians perhaps because the tradition out of which he comes, is not the highly complex Sanskrit-Classical tradition which speaks primarily to the educated and sophisticated people of India but the simple, personal tradition of the poet-saints who wrote for the people.[৭]

জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণের আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাথে কুষ্টিয়ার একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তরুণ বয়সেই শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে তিনি এসেছেন। পদ্মা ও গড়াই বিধৌত কুষ্টিয়া এবং শিলাইদহ রবীন্দ্রপ্রতিভাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাধনায় কুষ্টিয়ার প্রভাব মৌলচেতনার মতো সক্রিয় ছিল। শিলাইদহকে কেন্দ্র করেই তিনি গোটা বিশ্বকে দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রমথনাথ বিশী বলেন :

> অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, অঞ্চলবিশেষে সৃষ্টি হলেই সে রচনা আঞ্চলিক হইতে বাধ্য, তাহা সর্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে না। ইতিহাসের নজির ইহার প্রতিকূল। সার্থক আঞ্চলিক সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত সর্বজনের রস চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয়। বীজের মধ্যে বনস্পতির ন্যায় বিশেষের মধ্যেই নির্বিশেষ আছে। নির্বিশেষ অভাবাত্মক নয়, তাহার অপর নাম সর্বজনীনতা।[৮]

বলতে কী, শিলাইদহ এমন একটি বিশেষ অঞ্চল, যে অঞ্চলে দাঁড়াতে পারলে স্থিরমস্তিষ্কে জগৎটাকে দেখতে পাওয়া যায়। এই শিলাইদহের প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়েছে শাহজাদপুর ও পতিসর। শিলাইদহ কবিপ্রতিভার যোগ্যধাত্রী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা স্বীকার করেছেন। শিলাইদহের পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদীকে উদ্দেশ্যে করে কবি বলেন :

তোমার হোমাগ্নি মাঝে
আমার সত্যের আছে ছবি
(পুরবী)

শিলাইদহে এলে তাঁর মন কেমন হয়ে উঠত এ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা শিলাইদহ থেকে লিখিত একটি চিঠিতে তার প্রমাণ রয়েছে। কবি উল্লেখ করেছেন :

> পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষভাবে দেখিনে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলবর সহকারে গাছপালা নগরের মধ্যদিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে–এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম এ্যান্ড মেন মে গো বাট আই গো অন ফর এভার–কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখাপ্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলছে–তার একপ্রান্ত জন্মশিখরে, আর একপ্রান্ত মরণসাগরে; দুইদিকে অন্ধকারের রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি; কোনোকালে এর আর শেষ নেই।[৯]

শিলাইদহ ছিল রবীন্দ্রনাথের *Lake District,* প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় : 'এ তাঁর জন্মস্থান নয়, এখানে এসে পৌঁছুতে তাঁর কিছু বিলম্ব হয়েছে—তাই তাঁর প্রতিভা স্ফুরণেও কিছু বিলম্ব।'[১০] এই শিলাইদহেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল বাউল ফকিরদের সাথে, যাদের প্রভাব তিনি কখনও অস্বীকার করতে পারেননি।

যথার্থই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ থেকেই তার উপাদান সংগ্রহ করেছেন যা তাঁকে বিশ্বকবির মর্যাদা দিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একজন মহৎ কবি একটি বিশেষ দেশে বা যুগে জন্মগ্রহণ করেও তাঁর প্রতিভার কারণেই তিনি যুগোত্তীর্ণ হয়ে থাকেন। হোমার, শেক্সপিয়র এবং রবীন্দ্রনাথ এমনই মহৎ কবি যাদের প্রতিভা একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু সকল মহৎ কবির প্রতিভা বিকাশের মর্মমূলে অতীত এবং কালিক চেতনা সক্রিয় থাকে এবং এইসব ভাবনা ও

ধ্যানধারণার প্রভাব জীবনে যে ঐক্য সাধিত হয় তা তার মানবীয় মূল্যবোধ। রবীন্দ্রনাথেও এই মানুষই প্রধান উপজীব্য। মানুষই ব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> মানুষ প্রকাশ চায়, ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখতে চায়, তারপর আপনাকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার-বিহারের চেয়ে বেশি। এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণ, তার মনের মন। এই প্রকাশেই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।[১১]

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন :

> সেই প্রকাশের অনির্বচনীয় রূপ হচ্ছে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপের সুখ এবং দুঃখ দুই-ই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুই-ই সার্থক, এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলী আঘাতের মতো, মধুর সুরে বাজতে থাকে।... অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে।[১২]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই উপলব্ধির সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশের বাউলদের সংস্পর্শে এসে। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের ধর্মের বিশেষত্ব কী আমাকে বলতে পার? একজন বললে, বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না। আর একজন বললে, বলা যায় বৈকি—কথাটা সহজ। আমি বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি, তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন। কেউ বললে, যার পিপাসা হবে সে আকাঙ্ক্ষার কাছে আপনি আসবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তাই কি দেখতে পাচ্ছ, কেউ কি আসছে? সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বলল, সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে। আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ তো মিথ্যা বলেনি। আসছে, সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে বলতে হচ্ছে, আর যাবে কোথায়।... মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্য পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বাউল তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে। আপনাকে না পেলে তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই।—আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটনদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে এই 'আপনি'র খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্তে হাস্যে বলছে, সবাইকে আসতে হবে এই 'আপনি'র খোঁজ করতে। কেননা এ তো কোনো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়; সমস্ত মানবের মধ্যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতির মূলে এই যে বাউলের গান, যা তাঁর সমগ্র জীবনের ধ্রুবজ্যোতির মতো উজ্জ্বল ছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে ডিমক বলেন :

> A Bengali writer says that Rabindranath's style of writing was redically changed after he had been touched by the golden wind of the pure lyricism of vaishnava poetry. But the Bauls held his attention the most. He is known as the 'discoverer of the Baul Songs' who, by his discovery, added greatly to the wealth of Bengali literature.[১৪]

রবীন্দ্রনাথের মনে বাউলের গান যে তীব্র প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ বিধৃত রয়েছে তার বিভিন্ন রচনায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলাম : *আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।*' সে আরও গেয়েছিল : *আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে!* তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিংবা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয়নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িকভাবে এর ঠিক কী অর্থ বোঝে। কেননা অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে, মিথ্যাভাবে সে কথাটাই বোঝে। কিন্তু এ কথাটা ঠিক যে, এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে– সেইজন্য ওই বাউলের দলই বলেছে : *'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।'* আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা–

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ সুরও নিকটরূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করেছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলটুকু রয়ে গেছে। অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের কাছে তিনি মনের মানুষ, তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না।... মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে। এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে 'আমি কোথায় পাব তারে।' সেই মনের

> মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যে তাঁকে না পাওয়া।... এই যে তার চিরকালের গান; আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে! এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন।[১৫]

কৈশোরে গৃহাঙ্গনে বৈশাখের নিরুদ্দিষ্ট মেঘের মতো কোনো এক বাউলের গান রবীন্দ্রনাথের মনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো চমক লাগিয়েছিল, তাঁকে তিনি সারা জীবনভরে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি বলেছেন : 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে।' এই বাউলগানকে বাহন করে তিনি পথে নেমেছেন। অনেক গানেই তিনি নিজেকে 'পান্থজন' 'পথিক পরাণ' বা শুধু 'পথিক' বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন :

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।

তুলনীয় :

এমন মানব জনম আর কী হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।
(লালন)

পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই নতুন 'খবর' পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, মহৎ কবিমাত্রেই বিদ্রোহী এবং এই কারণেই বলা যেতে পারে : প্রতিষ্ঠিত ভাবনা, তত্ত্বকথা বা ধর্মচিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। যদিও শৈশবে পিতৃস্নেহে ব্রাহ্ম ভাবনা, পরিণতকালে উপনিষদ, বৈষ্ণবীয় প্রেম তার কাব্যে কখনও বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পেলেও মূলত যে বিদ্রোহী মতাদর্শ তার সকল চিন্তাকে মানবীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে—তা বাউল ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথ বলেন :

কবি আমি ওদের দলে,...
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছাল না।
... ...
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
রীতি বন্ধনের বাইরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা ॥

রবীন্দ্রনাথের মনে এই একান্ত মানবীয় ভাবনা, যা প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আচার অস্বীকার করতে প্রেরণা দিয়েছে, তার সৃষ্টি হয়েছিল যৌবনের প্রারম্ভে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ঠিক বাইশ বৎসর তখন তিনি তাঁদের পারিবারিক পত্রিকা 'ভারতী'তে 'বাউলের

গান' এই প্রবন্ধে তিনি ঐ সময়ে প্রকাশিত 'সংগীত সংগ্রহ : বাউলের গাথা' নামে একটি পুস্তিকার সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন :

> ইহাকে দেখিলেই এমনি আত্মীয় বলে মনে হয় যে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই। তোমরা বাঙ্গালা বাঙ্গালা করিয়া সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ; সংস্কৃত, ইংরেজি সমস্ত ওলটপালট করিতেছ, কেবল একবার হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই... আমাদের ভাব আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।[১৬]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন : 'এই প্রবন্ধের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা সম্পর্কে যে মন্তব্যটুকু করিয়াছেন, তাহা তাহারই জীবনের কথা।'[১৭]

বাউলগানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই মমত্ববোধের সৃষ্টি তাঁর প্রতিভার একেবারে উন্মেষলগ্নে এবং এই সময়েই তিনি তার চিন্তায় স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছিলেন। বাউলগানের প্রতি তাঁর এই প্রীতিময়তার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> আমার লেখা যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স... শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল :
>
> *কোথায় পাব তারে*
> *আমার মনের মানুষ যে রে*
> *হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে*
> *দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে।*
>
> কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ'—যাঁকে জানাবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায় যাকে সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন

> মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয় থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি; ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায় সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।... আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তারা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি... এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কেউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস! এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাঁধেনি।... বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল-কলেজের অগোচরে আপনাআপনি কী রকম কাজ করে এসেচে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে; এই বাউলগানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।[১৮]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন যে বাউলগানের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> ...বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউলগানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকেলে আধুনিক। হাল আমলে কলেজে পাশ করা সেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরেজি পড়ো বাউলের গান আছে, দেখেছি তা, তা অস্পৃশ্য। আমার অনেক গান বাউল ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টা করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্রনাথের রচনা। কিন্তু কাব্যপরিচয়ে যে বাউলগানগুলো আছে সে আমার মাথায় কিম্বা কলমে আসতো না, লোক ঠকাতে গেলে নিশ্চিত ধরা পড়তুম।[১৯]

বাংলাদেশের বাউল সমাজ, তাদের গান এবং দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সে কী গভীর বিশ্বাস ছিল নিচের উদ্ধৃতি তার সাক্ষ্য বহন করে :

> One Day I chanced to hear a song from a begger belonging to the Baul sect of Bengal... what struck me in this simple song was a religious expression that was neither grossly concrete, full of rude details, nor metaphysical in its rerified transcendentalism. At the same time it was alive with an emotional sincerity. It spoke of an intense yearning of the

heart for the divine which is in man and not in the temple... Since then I have often tried to... understand [these people] through their songs, which are their only form of worship, One is often surprised to find in many of their verses, a striking originality of sentiment and diction for, at their best, they are spontaneously individual in their expression.[২০]

অন্যত্রে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন :

I felt that I had found my religion at last, the religion of man, in which the infinite become defined in humanity and come close to me so as to need my love and co-operation. This idea of mine found at a later date its expression in songs of my poems addressed to what I called Jiban-Devata, the Lord of my life. ... It spoke of and intense yearning of the heart for the divine which is in man and not in the temple of scriptures, in images and symbols.[২১]

রবীন্দ্রনাথের সকল কর্মে বাউল এবং তার গান যে তীব্র প্রভাব রেখেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ রচিত 'গোরা' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে কলকাতার রাস্তার ধারে আলখেল্লা পরা এক বাউল গান গেয়েছে–'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন পাখির গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু ভোর রাতে যেমন শীতশীত করে কিন্তু গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না তেমনি একটি আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না কেবল অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুনগুন করিতে লাগিল।[২২]

শুধু উপন্যাসেই নয়, অনেক নাটকেও রবীন্দ্রনাথ বাউল চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এমনকি নিজেও বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দ্বিধা করেননি। এ সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন :

১৬ই জানুয়ারী ১৯১৬ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহাসমারোহে হলো 'ফাল্গুনী'র অভিনয়। এ অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিশেখর এবং অন্ধ বৃদ্ধ বাউল–দু'টি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে অভিনয়ের স্মৃতি আজো মনে প্রদীপ্ত রয়েছে। কী অপূর্ব তার অভিনয় – কী অপরূপ মেকআপ।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের প্রায় সকল শাখায় বলতে কি বাউল ও তার গানের প্রভাব লক্ষণীয়। জীবনের সায়াহ্নেও এই প্রভাব তীব্র ছিল। 'শেষ সপ্তক'-এর তেরো নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়
গাইল 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়'
দেখে অবুঝ মন বলে,
'অধরা'কে ধরেছি।
তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানালায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে চাওয়া চোখের পল্লবে
অধরা ছিল তোমার কাঁকন পরা নিটোল হাতের মধুরিমায়।
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে
ও গেল চলে;
জানলে না এই গানে তোমারই কথা
তুমি রাগিণীর মতো আসো যাও
একতারার তারে তারে।

পরিশেষে কবি তাঁর নায়িকাকে বাউলের অচিন পাখির সাথে তুলনা করে বলেন :

অচিন পাখি তুমি
মিলনর খাঁচায় থাকো—
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়
স্থকিত ওড়ার মধ্যে।
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়॥

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীতে বাউলের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের বিভিন্ন উপমা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করেছেন। আমরা যথাস্থানে তার উল্লেখ করব।

বাউলগান ও তার দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল রবীন্দ্রনাথ তার 'জীবনস্মৃতি'র (১৩১৯) 'গান' প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

সেই বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডের বিশ্ব বিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমার দেশে
আমি অতিথি তোমার দ্বারে
ওগে বিদেশিনী।

ইহার অনেকদিন পরে বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল–

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতেম পাখির পায়।

দেখলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথাই বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরন্তর ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।[২৪]

১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বাউলগান সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন :

These people roam about singing there songs, one of which I heard years ago from my roadside window, the first two lines remaining inscribed in my memory.

Nobody can tell whence the bird unknown
Comes into the cage and goes out
I would feign put round its feet
the fetter of my mind
Could I but capture it

This village poet evidently agrees with our sage of Uponishad who says that our mind comes back baffled in its attempt to reach the unknown being, and yet this poet like the ancient sage does not give up adventure of the infinite, thus implying that there is a way to its realization... It reminds me fo Shelley's poem in which he sings of the mystical spirit of Beauty :

The awful shadow of some unknown power
Floats, though unseen, among us visiting
This various world with as inconstant wing

As summer winds that creep flower to flower
Like moonbeams that behind some piny...
Mountain shower,
Its visits with inconstant galance,
Each human heart and contenance.

That this unknown is the profoundest reality though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing beats of the unknown bird... only Shelley's utterance is for the cultured few, while the Baul song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households who are never bored by its mystic transcendentalism.[২৫]

এই বক্তৃতার বাংলা রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

...সেই অজানাদূরধিগম্য হইলেও সে সকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং অজ্ঞাতনামা বাঙ্গালী উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য তাহার গ্রাম্যসংগীত সেই অজানা পাখির ডানার সঙ্গে মুখরিত। শুধু প্রভেদ এই যে, শেলীর ভাষা জনকয়েক শিক্ষিত লোকের জন্য, আর এই বাউলগান গ্রামের চাষী ও সর্বসাধারণের, যাহারা এই গানের অতিবাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে না।[২৬]

রবীন্দ্রনাথের উপর বাউলগানের এই প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন :

বাউলগানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কিশোর কাল হইতে, একটি আধুনিক বাউলগানের সংকলন গ্রন্থ উপলক্ষ করিয়া। রবীন্দ্রনাথ 'বাউলের গান' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। (ইহার অনেক কাল আগে শৈশবে, এক গানের চরণ : 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে দিলে' তাঁহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কিন্তু সেটি যে বাউলগানের কলি তা তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন)। বাউলগানের সাদাসিদা ভাষা ও সরলভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্যত্র নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তখনও তাঁহার কবিতায় আধ্যাত্মিকতার রঙ ধরে নাই। তবুও রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের মধ্যে যে প্রেম গভীরতা অনুভব করিয়াছেন তাহা আধ্যাত্মিক অর্থেও প্রেম। বাউলগান রবীন্দ্রনাথকে প্রীত করিয়াছিল কেননা তিনি তাহার মধ্যে নিজের সুরের মিল পাইয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের সার্থকতা এইখানেই।... সাধনা চালাইবার কালে রবীন্দ্রনাথ উত্তর মধ্যবঙ্গে লালন ফকির ও আন্দী বোষ্টোমীর মতো অনেক বাউল বৈষ্ণব দরবেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের গীতনিষ্ঠ ধর্ম অনুশীলনের পরিচয়

পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে পরিচয়ের ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলে নাই। কিন্তু বোলপুরে পথে শোনা এই বাউলগানের পদ :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতেম পাখির পায় ॥

রবীন্দ্রনাথের মনে মিস্টিক অনুভবের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল এবং বাউলগানের দিকে তাঁহার লেখনী ও কণ্ঠ পরিচালিত করিয়াছিল। তাহার প্রথম ফল পাওয়া গেল 'বাউল' (১৩১২) নামে পুস্তিকাখানি, যাহাতে বাউল রীতিতে লেখা ও বাউলের সুর দেওয়া স্বদেশী গানগুলো সংকলিত। 'আমার নাই বা হ'ল পারে যাওয়া' এই বিশিষ্ট গানটিও (খেয়াল সংকলিক) এই সময়ের লেখা। তাহার পর গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি। ...রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব বাউলদের অন্তরের যোগ যে কতটা নিবিড় ছিল তাহা বোঝা যায় উভয়ের রচনায় আকস্মিক অথবা গভীর সাদৃশ্যে। এখানে একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় ও গানে জাল ফেলার ও ফাঁদ পাতার সিম্বল আছে। যেমন :

বিশ্ব হৃদয় পারাপারে
রাগ রাগিণীর জাল ফেলাতে

এবং *বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছে কেমনে দিই ফাঁকি*
আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকি।

কোন পুঁথিতে (১২৬০ সালে লেখা) একটি যে বাউলগান পাইয়াছি তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত রচনার বাহিরের মিল না থাকিলেও ভাবের অন্তর্বাহী প্রবাহ একই।

তোরা পালাবি আর কোন পথে
রসিক জেলে জাল ফেলেছে জগতে।'[২৭]

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে বাউলের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্ট এ সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিত ও গবেষকগণ একমত হয়েছেন। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন :

> 'বাউলের গান' প্রবন্ধটির মধ্যেই রবীন্দ্রসাহিত্যে সর্বপ্রথম অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রমানসে অধ্যাত্মচিন্তার উৎস সন্ধান করতে গেলে উপনিষদ কিংবা কোনো পাশ্চাত্য দর্শনের পরিবর্তে এইখানেই তা সন্ধান করতে হবে। এমনকি, তার মধ্যে পরবর্তীকালে উপনিষদের চিন্তা যখনই স্থান লাভ করেছে, তখন তাকে তিনি বাউলতত্ত্বের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে নিয়েছিলেন। ঔপনিষদিক তত্ত্বের সঙ্গে যেখানে বাউলতত্ত্বের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন সেখানেই তিনি উপনিষদের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন। তিনি সাধারণত উভয়ের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধের সন্ধান পাননি। অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় অভিজাত দর্শন ও উপনিষদের সঙ্গে নিরক্ষর বাউলসাধক এবং ভারতীয় ঋষীদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই, এ-কথা তিনি বারবার অনুভব করেছেন।[২৮]

ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে বাউলপ্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন; এমনকি রবীন্দ্রনাথকে বাউলশ্রেষ্ঠ বলতেও তাঁর বাধেনি। রবীন্দ্রনাথের একটি নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্ষুদিরাম দাস বলেন :

> উদাসীন রসাভিলাপী কঠিন চিত্ত না থাকলে সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নির্বিকার আনন্দানুভব আসে না। আসুক বা নাই আসুক, তা অসম্ভব নয়। ঠাকুরদার চরিত্র আলোচনায় এই বৈরাগ্যের দিক সম্পর্কে বলেছি, এবং বাউলশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে ঐ ভোগমুক্ত সর্বনাশের পথিকের মধ্যে আদর্শ মানুষ কল্পনা করেছেন তাও দেখিয়াছি।[২৯]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের একটি শাখা তার নাটক। এই নাটকের মধ্যে 'প্রায়শ্চি', 'ফাল্গুনী' ও 'ডাকঘর' বাউলপ্রভাবিত। এই তিনটি নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো বাউলের আদর্শে স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বারংবার নিজেকে রবীন্দ্রবাউল বলে সম্বোধন করতে আনন্দ পেয়েছেন। বাউলদের প্রতি কত গভীর মমতা ও ভালোবাসা থাকলে এমনটি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তার নিজের নাটকসাধনায়ও বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

এ সম্বন্ধে সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন :

> ...১৬ জানুয়ারী ১৯১৬, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহাসমারোহে হয় 'ফাল্গুনী'র অভিনয়। এ অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিশেখর এবং অন্ধ বৃদ্ধ বাউল—দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে অভিনয়ের স্মৃতি আজও মনে প্রদীপ্ত রয়েছে। কী অপূর্ব তাঁর অভিনয়... কী অপরূপ মেকআপ। কার সাধ্য আছে বোঝে, একই ব্যক্তি দুটি বিপরীতমুখী বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।[৩০]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পার্শ্বচরিত্র হিসেবে বাউলের ছবি রয়েছে। ছোটগল্পেও রবীন্দ্রনাথ বাউলকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শিলাইদহে 'সর্বখেপী'ও বাউল মহাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। এখানে বলা যেতে পারে সে সময়ে বাউলদের মধ্যে বেশকিছু বৈষ্ণব-বাউল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সর্বখেপী'কে নিয়েই তাঁর 'বোষ্টমী' গল্প লিখেছিলেন। 'বোষ্টমী' গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ শ্রী হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক পত্রে বলেন :

> ...বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই 'বোষ্টমী' স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী গুরুকে যে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়–সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।[৩১]

বস্তুত, নানা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ তার বাউলভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তবে কবিতা ও সংগীতে এই প্রভাব যত প্রত্যক্ষ, ছোটগল্পে তা বলা যেতে পারে অনেকটা পরোক্ষেই রয়ে গেছে।

ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে বলেছেন :

> মরমী বাউলদের জীবনসাধনা সমন্বয়ধর্মী ও যুগোপযোগী মৌলিক রবীন্দ্র কাব্যপ্রতিভায় মিশে গেছে।[৩২]

তিনি মন্তব্য করেছেন :

> রবীন্দ্রকাব্যে 'অরূপানুভূতি'র পূর্ণতা সাধিত হলে বাউলদের প্রেমসাধনার সারবস্তুও সমাজমুখী পথ চলার সুর মিলিত হয়ে এই কবি প্রতিভাকে পূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে গেছে।[৩৩]

বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন, তার সাহিত্য, দর্শন সবকিছুতেই বাউলভাবনা একটি অমোঘ শক্তির মতো সক্রিয় ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. বুদ্ধদেব বসু, *কবি রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৭৩, জুন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১০৩
২. ঐ, পৃষ্ঠা ১০৩-৪
৩. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। সম্পাদকের নিবেদন 'ভিনটারনিট্‌স' এর জার্মান ভাষায় লেখা বই *Rabindranath Tagore : Religion and Weltarms chauung des Deichters* রবীন্দ্রনাথের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবে তাঁকে উৎসর্গ করা। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : *শান্তিনিকেতনে এক যুগ*, পৃষ্ঠা ২১০-২১৫
৪. কবীর যে বাউল/বাউর মতাবলম্বী সাধক ছিলেন তাঁর গানেই সে পরিচয় রয়েছে। যেমন :

কৌন মুরলী শব্দ সুন আনন্দভয়ো
জোত বরে বিন বাতি
বিনা মূলকে কমল প্রগট ভয়ো
ফুলরা ফুলত ভাঁতীভাঁতী ॥

কোন মুরলীর শব্দ শুনিয়া মন আমার আনন্দিত হইয়াছে, বিনা প্রদীপে জ্যোতি জ্বলিতেছে, বিনামূলে কমল প্রস্ফুটিত হইল, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটিয়া উঠিল।

তুলনা : *বিনা তেলে জ্বলে বাতি*
দেখতে যেমন মুক্তামতি
জলময় তার চতুর্ভুতি
মধ্যে থানা
(লালন)

কে বুঝতে পারে সাঁই-এর কুদরতি
অগাধ জলের মাঝে জ্বলছে বাতি
বিনা কাষ্ঠে অনল জ্বলে
জল রয়েছে বিনা স্থলে
আখের হবে জলানলে প্রলয় মতি ॥

৫. অজিত কুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০৬
৬. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, পৃষ্ঠা ১০
৭. Edward C. Dimock Jr. *Rabindranath Tagore.—The Greatest of the Bauls of Bengal*, Journal, of the Asian Studies, University of Michigan, U.S.A. 1957, p. 33-34
৮. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১-১২
৯. রবীন্দ্রনাথ, *ছিন্নপত্র*, শিলাইদহ ২ কার্তিক, অক্টোবর ১৮৯১
১০. প্রমথনাথ বিশী, *শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩
১১. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৬৬
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭১-৩৭২
১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৭
১৪. Dimock E. C (Jr.). op cit, P. 31
১৫. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪৮-৪৫০
১৬. *'ভারতী'*, ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা, বৈশাখ ১২৯০, পৃষ্ঠা ৩৪-৪১ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১২৮৪ শ্রাবণ। সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ৮৩
১৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী* (১৩৬৭), পৃষ্ঠা ১৬৬
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আশীর্বাদ*, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, *হারামণি* (অষ্টম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা; জুন, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ১-৪
১৯. নন্দলাল সেনগুপ্ত, *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০০-১০১ চিঠির তারিখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ (দ্র. হারামণি, পরিশিষ্ট খ, পৃষ্ঠা ১৭৫)
২০. Rabindranath Tagore, *The Religion of Man*, New York, 1931, pp 110-111.
২১. Ibid, pp 90-97
২২. রবীন্দ্রনাথ, *'গোরা'* উপন্যাস, কলকাতা,
২৩. সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রস্মৃতি*, পৃষ্ঠা, ১৫৪
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন স্মৃতি, ১৩১৯

২৫. Rabindranath Tagore, *The Philosopy of our people*, Presidential Address at the Indian Philosophical congress. 1925. দ্র. শ্রী পুলিন বিহারী সেন (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রায়ণ*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬
২৬. শ্রী পুলিনবিহারী সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৭
২৭. শ্রী সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, 'রবীন্দ্রনাথ'; কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৪
২৮. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা*, লোক-ঐতিহ্য পত্রিকা, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৭, কুষ্টিয়া, সম্পাদক আনোয়ারুল করীম
২৯. ক্ষুদিরাম দাস, *রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়*, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃষ্ঠা ২১৫
৩০. সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রস্মৃতি*, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৫৪
৩১. রবীন্দ্রনাথ, *পত্রধারা*, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৯
৩২. ঐ, পৃষ্ঠা ২২৫
৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৫০

রবীন্দ্রসংগীতে বাউলপ্রভাব

বাউলগান বাংলাদেশের প্রাচীন লোক এবং ধর্মীয় সংগীতের একটি বিশেষ ধারা। লালন শাহের পূর্বে এ গানের অস্তিত্ব সমাজে থাকলেও এ গানের সংগ্রহ এবং কোনো সংকলন না-থাকায় লালন শাহ এবং তার সমকালীনদের রচিত গানকেই বাউলগানের প্রাচীন প্রকাশ বলে ধারণা করা চলে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ধর্মমতের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন লালন ফকির। তার মতবাদের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষুদ্র ধর্মমতের অনেকাংশে মিল এবং সাযুজ্য ছিল। এসব লোকধর্মে সংগীত ছিল তাদের সাধনার অনুষঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ খুব ছেলেবেলা থেকেই লোকসংগীত তথা বাউলগানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। পরিবারের সংগীত ভাবনা, অনুশীলন এবং তাত্ত্বিক আলোচনা তাঁকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সংগীতের রূপায়ণ এবং তার কাঠামো নির্মাণ ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধ্যানধারণার পরিচায়ক।

সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা চিন্তাভাবনা তার সাহিত্যকর্মে বিধৃত হলেও প্রথম জীবনে তিনি 'সংগীত ও ভাব' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।[১] মোগল আমলীয় সংগীতচর্চার অবসানের পর ব্রিটিশদের আগমনে নাগরিক এবং নগর প্রভাবিত সমাজে সংগীতের যে নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। নিধুবাবুর টপ্পা, ব্রাহ্মসমাজের গীত, ধ্রুপদ ও খেয়াল ইত্যাদি সংগীত রবীন্দ্রনাথের মনকে সে সময়ে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালেই সংগীতের উৎপত্তি এবং উপযোগিতা যা হার্ভার্ট স্পেন্সারের *The Origin and Function of Music*-এর অনেকটা অনুসরণ, এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।[২] অতঃপর তিনি এ বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং বিশ্বভারতী ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনা বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে।[৩] রবীন্দ্রনাথ তার প্রবন্ধে সংগীত সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাই সর্বত্র ব্যক্ত করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীত,

ধ্রুপদ এবং খেয়াল প্রভৃতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিকই এবং তার সংগীত নির্মাণে এসবের প্রত্যক্ষ প্রভাবও পড়েছে; কিন্তু নগরসভ্যতা থেকে যেদিন তিনি জ্যোতিদাদার হাত ধরে শিলাইদহের পথে পা বাড়ালেন, তখন থেকে তার চিন্তাচেতনা নতুনভাবে মোড় নিল। তিনি বাস্তবজীবন থেকেই তার শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। ইতঃপূর্বে তার পরিবারের মাধ্যমে সংগীত সম্পর্কে যে ধারণা জন্মেছিল, ঘর ছেড়ে বাইরে আসবার পর তিনি বাংলা সংগীতের এক নতুন পরিচয় লাভ করলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই নতুন ধারায় গান রচনা করার পূর্বেই বাউলসুরে বিশেষ করে কুষ্টিয়া অঞ্চলে লালন শাহের আবির্ভাবের পরপরই কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার 'ফকির চাঁদ' নামে গান রচনা করেন। মীর মশাররফ হোসেনও সে সময় বেশকিছু বাউল গান রচনা করেছিলেন। অন্যদের মধ্যে বিষ্ণু রাম চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অমৃতলাল বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সে সময় লালন শাহ ও পাগলা কানাই প্রমুখের অনুকরণে গান রচনা করেছিলেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতক ছিল বাঙালি সংস্কৃতির এক নবজাগৃতির কাল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে এ সময়ে স্বদেশ-সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। 'হিন্দুমেলা' এই আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণার উৎস ছিল। এসবের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর যে পড়েছিল তা আমাদের ধারণা করতে কষ্ট হয় না। জোড়াসাঁকোতে কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মন লোকজীবন সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। তারপর জ্যোতিদাদার হাত ধরে শিলাইদহে যাওয়া-আসা এবং পরবর্তীসকালে জমিদারি দায়িত্ব।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন, চর্যাগীতি থেকে শুরু করে একটি নির্দিষ্ট ধারা বয়ে এসেছে বাঙালির সংগীতচিন্তায়। বাঙালির নিজস্ব ধ্যানধারণার সঙ্গে খুব সহজভাবেই মিশে গেছে সুফি, সামা, গজল ইত্যাদি ফারসি সংগীতের প্রভাব। ইংরেজি সংস্কৃতি ও সংগীত নগরজীবনকে দ্রুত প্রভাবিত করতে পারলেও লোকজীবনকে স্পর্শ করতে তার বেশ দেরি হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে আপাতভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব আছে। এই প্রভাব অনেকটাই তার সুরকে নিয়ে। তবে এখানে তিনি পুরোপুরি পাশ্চাত্য-প্রিয় ছিলেন না। এই সুরকে তিনি দেশজ সুরের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় গানেই এমনটি হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি সুরকে বাণীর অনুষঙ্গী করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান এমন যে তা কবিতা হিসেবেও সুখপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা জন্মেছিল তার পিতার সান্নিধ্যে এসে। তিনি ফারসি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। হাফিজ এবং ওমর খৈয়াম প্রমুখ কবির রচনাবলী তার নিত্যসঙ্গী ছিল। ফারসি সাহিত্য এবং সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অনুরাগ, বলা যেতে পারে, পিতৃপ্রভাবে। ফারসি সুফিসাহিত্য এবং সংগীতের একটি পরিচয় তিনি লাভ করেন মধ্যযুগীয় সাধককবি

কবীরের পদে। কবীর বাউল মতাদর্শী ছিলেন। হিন্দিতে বাউলকে 'বাউরা' বলা হয়। লালন শাহ এবং কবীর উভয়েই ছিলেন 'লোক' নামে কথিত সাধারণ মানুষদের প্রতিনিধি। তাদের গানে মানবতার যে উদ্বোধন ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীতের ওপর আকৃষ্ট হলেও তিনি সুরের পরিবর্তে 'ভাব'কেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে লোকজসুরকে তিনি অস্বীকার করেননি।[৪] বলা যেতে পারে তিনি এই সুরকে ঢেলে-মেজে এক নতুন সুরে রূপ দিয়েছেন। এই সুর তার নিজস্ব। যেমন :

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে ॥

এমনিভাবে তার প্রায় গানে বাউলভাব স্পষ্টত বোঝা গেলেও সুরে তা যে বাউল নয় তা বেশ বোঝা যায়। বাউলসুর বলতে শান্তিদেব ঘোষ[৫] বলেছেন :

> বাউলগানের সুরে আমরা দেখি দুটি ভাগ। সাধারণ নিয়মে এই গানের যত কলিই থাকুক না কেন, সুরে পার্থক্য দেখা যায় কেবল প্রথম কলির সঙ্গে দ্বিতীয় কলির। পরের আর সব কলির সুর দ্বিতীয় কলিকে অনুসরণ করে চলে, এবং প্রথম কলি ছাড়া অন্যান্য সব কলির ছন্দও এক।... গুরুদেবের হাতে পড়ে বাউলদের গানের ঢঙ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমা থেকে এই ভাবেই বড় ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর বাউলসুরের এই গানে আছে ধ্রুপদের মতো চারটি অংশ। আস্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারীতে সুরের বৈচিত্র্য ও আভোগ ঠিক ধ্রুপদের মতো অন্তরাকে অনুসরণ করে। অধিকাংশ গানের সঞ্চারীর সুর গুরুদেবের নতুন সৃষ্টি। বাউলদের সুরের গঠনপ্রণালীর সঙ্গে মিল রেখেই এগুলি তিনি তৈরি করেছিলেন। এই কাজে গুরুদেবকে অনেক সময় প্রাচীন রাগরাগিণী বা কীর্তনের সুরের সাহায্য নিতে হয়েছে। বাউলের সুরের গঠনপ্রণালীর সঙ্গে মিল রেখেই এগুলি তিনি তৈরি করেছিলেন। এই কাজে গুরুদেবকে অনেক সময় প্রাচীন রাগরাগিণী বা কীর্তনের সুরের সাহায্য নিতে হয়েছে। বাউলের বৈশিষ্ট্যও তাতে আছে, অথচ সুরে বৈচিত্র্য পেয়েছে গানগুলি। তার বাউলগানে রাগরাগিণী মিশেছে, অথচ বাউলসুরের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যটি চমৎকার। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি গান উল্লেখ করি : 'বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা' গানটির সঞ্চারীতে বা তৃতীয় অংশে যে সুর বসেছে তাতে পাচ্ছি দেশ রাগিণীর রূপ। 'আমি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে' গানটির সঞ্চারীতে বসেছে পিলু রাগিণী; 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাওগো এবার যাবার আগে' গানটি গুরুদেবের বাউলসুরের গানের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাউলসুরের সঙ্গে পিলু রাগিণী এতেও মিশেছে অথচ ধ্রুপদের মতো নিয়মের

চারটি ভাগে এর সুর গঠিত নয়। গান আরম্ভ হয়েছে বাউলের সুরে কিন্তু গানটি সুনির্দিষ্ট কোনো বিশেষভাবে বিভক্ত নয় বলে সুরযোজনাও কোনো বাঁধাধরা নিয়মে হয়নি, দুই রাগিণী একটি আর একটির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গানের কথায় যেখানে যে ভাবে সুর বসানো দরকার ঠিক সেইভাবেই সুরগুলি নিজের স্থান করে নিয়েছে। গানটির প্রথম অংশে যে বেদনা প্রকাশ পায়, সুরও ঠিক সেই বেদনার অনুকূল এবং শেষ অংশে যেখানে একটা উন্মাদনার ভাব ফুটে উঠেছে কথার সাহায্যে, সুরও তাকে সেই পথেই সাহায্য করেছে।

বাউলের প্রধান লক্ষ্য কথার ছন্দোবদ্ধ সহজ গতি। তাই অন্যান্য লোকসংগীতের তুলনায় বাউলগান ছন্দোবহুল। তার একমাত্র কারণ বোধ হয় বাউলদের নৃত্যের আবেগ। ভাবের আবেগে যখন তারা নেচে ওঠে, তখন সে উন্মাদনার জন্যে যেরকম ছন্দের প্রয়োজন হয়, যে ছন্দ মানুষ সহজে পেয়েছে আপনা হতে, সেই সহজ ছন্দটি বাউলদের একমাত্র লক্ষ্য। সহজ ভাষা ও সুরের সঙ্গে গানের ছন্দও সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই আমরা বাউলদের গানে তিন মাত্রার দাদরা বা কখনও চার মাত্রার কাহারবা জাতীয় ছন্দের পরিচয় পাই। গুরুদেব সেই কারণেই তালের দিক থেকে বাউলগানে নতুন কিছু করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

এতদসত্ত্বেও বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের বাউল আঙ্গিকের গান ও সুর তার নিজস্ব। এখানে বাউল তথা লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ প্রমুখের বাউলগানের সুরের সঙ্গে তার কোনো মিল হয়নি। গায়নশৈলীতেও রয়েছে ভিন্নতা। বাউলগানের সুরকে কেউ কেউ উদাসী সুর বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষকে আমি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম প্রথমবার শান্তিনিকেতনে এবং দ্বিতীয়বার যখন তিনি প্রথম কুষ্টিয়াতে শিলাইদহ দেখবার জন্য এসেছিলেন ১৯৮৬ সালে। শিলাইদহে তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। শিলাইদহ কুঠিতে বসে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক গান গাইলেন আবেগভরে। বাউলের গানে যে সুর তাকে তিনি উদাসী সুর বলে উল্লেখ করলেন। বললেন, বাউলদের এই উদাসী এবং আত্মনিমগ্নের ভাবটি গুরুদেবকে প্রভাবিত করেছিল। হৃদয়ের ব্যথাকে প্রকাশ করতে যে সুর আপনি জেগেছে তাইই রবীন্দ্রবাউলের সুর। রবীন্দ্রনাথের গানে বাউলদের 'মনের মানুষ' বারবার নানাভাবে গুরুদেবের গানে ফিরে এসেছে। কোনো এক আপনজনের অভাবে হৃদয়ে যে গভীর বেদনা অনুভব করা যায় রবীন্দ্রনাথ তাকেই ব্যক্ত করেছেন তার গানে। বাউলপ্রভাবের যথার্থতা এখানে। রবীন্দ্রনাথ তার গান বাউলদের মতোই শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। যেমন : বাউলদের দৈন্য পদের গান। বাউলদের গানের আসরে বাউল সর্বপ্রথম তার গুরু মুরশিদকে নিবেদন করে গান গেয়ে থাকে।

এখানে কয়েকটি গানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

১. এলাহি আলামিন আল্লাহ বাদশা আলামপানা তুমি
২. এসো দয়াল পার করো ভবের ঘাটে
৩. এসো হে প্রভু নিরঞ্জন
৪. এসো হে অপরের কাণ্ডারী

রাগদৈন্য :

১. ক্ষম ক্ষম অপরাধ দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়
২. পার কর দয়াল আমার কেশে ধরে
৩. পারে লয়ে যাও আমায়

রবীন্দ্রনাথ তার গীতাঞ্জলিতে তার আরাধ্যকে নিবেদন করে বহু গান রচনা করেছেন। যেমন :

১. আমার মাথা নত করে দাও হে
২. তোমার চরণ-ধুলার তলে।
৩. লহ লহ তুলে লহ
৪. বাঁচান বাঁচি মারেন মরি

দৈন্যপদের পরে 'প্রবর্ত' পদে বাউল তার সাধনজীবনে মনের মানুষের অন্বেষণ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেমন :

১. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
২. বাড়ির কাছে আরশীনগর
৩. কে কথা কয়রে দেখা দেয় না
৪. কেন কাছের মানুষ ডাকিস শোর করে
৫. আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
৬. মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের সনে
৭. আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে
৮. আমার মনের মানুষ যে রে আমি কোথায় পাব তারে
৯. এই মানুষে মানুষ আছে
১০. বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা দেশ বিদেশে
১১. ক্ষ্যাপা না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়
১২. ও যার আপন খবর আপনার হয় না
১৩. কোন সুখে সাঁই করে খেলা এই ভবে
১৪. মধুর দেল দরিয়ায় সে জন ডুবেছে
১৫. না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেনে আসমানে
১৬. কি এক অচিন পাখি পুষলাম খাঁচায়

বাউলের এমন আত্মতত্ত্বমূলক গান রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রাণিত করে এবং তার ফলে তিনি 'পূজা' 'প্রকৃতি' পর্বে বহুগানে অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেমন :

১. আমি তারে খুঁজে বেড়াই
২. সে যে মনের মানুষ
৩. আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
৪. আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
৫. আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
৬. আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
৭. আমি তারেই জানি যে আমারে আপন জানে
৮. ভেঙে মোর ঘরের চারি
৯. তুমি বাহির থেকে দিলে
১০. খ্যাপা তুই আছিস আপন
১১. আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে
১২. আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে
১৩. আমার নাইবা হল পারে যাওয়া
১৪. ওগো তোরা কে যাবি পারে
১৫. সে কি ভাবে গোপন রবে
১৬. আমার কি বেদনা
১৭. তোর আপন জনে
১৮. সকল জনম ভোরে ও মোর দরদিয়া

উপর্যুক্ত গানগুলি কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হলো। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গানে এবং কবিতায় বাউল প্রভাব পড়েছে। সুতরাং একটি তালিকায় রবীন্দ্রনাথের বাউল প্রভাবের গানের পরিচয় যথেষ্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথ বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের বাউলগান শুনেছেন। তবে বাংলাদেশের বাউলগানই তাঁকে সর্বাপেক্ষা আন্দোলিত করেছে। শান্তিদেব ঘোষ[৬] বলেন :

> গুরুদেব এই রকমের একদল প্রেমিক সাধকদের সঙ্গ পেয়েছিলেন শিলাইদহের পল্লী অঞ্চলে। যাঁরা আজকে বাংলাদেশে বাউল নামে বিখ্যাত এঁরা একটা বিশেষ সম্প্রদায়। সংখ্যার দিক থেকে এ সম্প্রদায়ের অতি সামান্যই তখনো পর্যন্ত বর্তমান। এতে হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল। তবু ধর্মে এরা না হিন্দু না মুসলমান। এদের অধ্যাত্মজীবন গড়ে উঠেছিল এই দুই ধর্মের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে। এরা প্রেমের সাধক। অজানা অচেনা কায়াহীন বিশেষ এক প্রেমের বস্তুকে ভালোবেসেই এঁদের আনন্দ, যাঁকে তাঁরা বলেছেন 'মনের মানুষ'। কিন্তু সে মনের মানুষ অন্যসব দেবদেবীর মতো কোনো শক্তির প্রতীক নন। তিনি

> মানুষের বাস্তব জীবনের ভালোমন্দ কিছুই করেন না। তিনি আছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে গোপনে। সেই গোপনবাসী মনের মানুষের খবর প্রেমের সাধনায় তাঁরা পান। কিন্তু ধরতে পারেন না। তাই এঁদের গানের ভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেয়েছে সেই অন্তরবাসী মানুষকে জেনেও না-জানার অসীম বেদনা।

শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের গানে বাউলভাবনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন : "জীবন দেবতা ও মনের মানুষের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পেয়েই গুরুদেব বাউল ও তাদের সাধনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।" শান্তিদেব ঘোষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুব কাছের মানুষ। শিলাইদহে প্রথমবার আসবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছেন। একটি ঘরে একটি বাঁধানো ছবির সামনে এসে তিনি হঠাৎ নিস্পলক হয়ে যান। আমি তাকিয়ে দেখি, তাঁর চোখে অশ্রু। তিনি বললেন, "জানো, এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথসহ যাঁদের ছবি আছে তাঁদের মধ্যে আমিও আছি। আমার গান করেছি, নাটক করেছি। আজ কেউ বেঁচে নেই, কেবল আমি আছি।"

এখানে বলা বিশেষ প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের সব গানই যে বাউলপ্রভাবিত, তা নয়। তিনি অনেক গানে বাংলাদেশের ভাটিয়ালি এবং সারিগানের সুর ব্যবহার করেছেন। তবে এ জাতীয় সুরেও বাউলভাবনা অনুভব করা যায়। যেমন :

১. নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে
২. আমার মন যখন জাগলি নারে
৩. গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
৪. তোমার খোলা হাওয়া

সারি গানের সুরে রচিত গান :

১. খর বায়ু বয় বেগে
২. এবার তোর মরা গাঙে

রবীন্দ্রনাথ তার গানে বাউলভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার সুরকে এই ভাবনানুগ করে তুলেছিলেন। এখানে তিনি সুরকে কোনো স্বতন্ত্রভাবে দেখেননি।

বাউলগানে তিনি বাংলাগানের সত্যিকার পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, এই গান হিন্দুস্তানী রাগসংগীতের মতো কথা বাদ দিয়ে কেবল সুরের উপর নির্ভরশীল নয়, এ গান বাণী এবং সুরের সম্মিলনে গঠিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> বাংলাদেশের হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান করিবে সুধা নিরবধি, সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালির অন্তরের টান; এইজন্যই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের

> প্রকাশের পূর্ণতা হয় না–এজন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন। এর প্রমাণ দেখো আমাদের কীর্তনে। এই কীর্তনের সংগীত অপরূপ, কিন্তু সংগীত যুগলভাবে গড়া—পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা। পদাবলীর মধ্যেই যেন তার রাসলীলা, স্বাতন্ত্র্য সে সইতে পারবে না।[৭]

'কীর্তন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে কথা, বাউলগান সম্পর্কেও সেই একই কথা তিনি নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন। তিনি 'কথা ও সুর' প্রবন্ধে আরও বলেন : 'আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষের আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না।"[৮]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের অন্তরঙ্গ রূপের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার বহিরঙ্গে যে লোকসংগীতের সুর, যার গায়কীতে পরিবর্তন আসে অঞ্চলভেদে—এমনকি, কথা ও সুরে, রবীন্দ্রনাথ তা মেনে নিতে পারেননি। বাউলগানের গায়কদের এই স্বাধীনতা লোকসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসংগীত এ কারণেই লোকসংগীতের নানা পরিচয় নিয়েও তা রবীন্দ্রসংগীতই থেকে গেছে। রবীন্দ্রসংগীতে গায়কী স্বাধীনতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ দিলীপ রায়কে বলেছিলেন : "তুমি কি বলতে চাও যে আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সেরকমভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে অনুমতি দিইনি।"[৯]

এই প্রসঙ্গে শৈলজারঞ্জন মজুমদার[১০] বলেন :

> ...রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী সম্পর্কে আলোচনা শেষে যে-কথাটির উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল রবীন্দ্রনাথের বাউল আর কীর্তনাঙ্গ গান। এই বাউল ও কীর্তনাঙ্গ গান তার গানের জগতে অতি প্রশস্ত স্থান গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, অনেক ধ্রুপদী গানের মাঝখানে হঠাৎ দেখা যায় বাউলের কীর্তনের আভাস এসে পড়েছে, আবার বাউলের মধ্যে ধ্রুপদী গানের প্রভাব ফুটেছে। এ যেন রসের এক নিবিড় সংশ্লেষণে মুক্ত উদার আকাশের সুর আর দরবারী ছকে বাঁধা তান একই মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি বাউলগান 'দিনের পরে দিন যে গেল' এ সঞ্চারীতে পরজ রাগিণীর ব্যবহার এবং 'তব সিংহাসনের আসন হতে' বাউল ঢঙের মিশ্রণ অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু এই হঠাৎ পরিবর্তন–গায়ক অনেক সময় অসতর্কতাবশত এইগুলি গাইবার সময় তার সূক্ষ্মবোধটিকে হারিয়ে আটপৌরে করে গান। অতি প্রচলিত দুটি গান 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' এবং 'ঐ আসন তলে মাটির পরে' গানদুটিতে ঠিক ঢঙে ঠিক গায়কী সহযোগে আজকাল দৈবাৎ শুনতে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটির সঞ্চারীতে 'মরি হায়' কথা দুটি ছাড়াই গানটি এককালে গাওয়া হত। বাংলা গানের কীর্তন বাউল

> বাঙালীর ঘরে আটপৌরে জিনিষ। এর সর্বজনীন রূপ তাই এমন এক সংস্কার সৃষ্টি করেছে যার বাইরে পা ফেলাই শক্ত। রবীন্দ্রনাথ বাউল কীর্তনের সুর নিয়েছেন কিন্তু তাকে দিয়েছেন এক অভিনবত্ব। তাই তার বাউল কীর্তনাঙ্গ গানের অনেক সুরের বিস্ময় চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এই গানগুলিই গায়কের কণ্ঠে বিকৃত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।... রবীন্দ্রসংগীত আমাদের অতুলনীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ। একে নিখাদ শুদ্ধতার সংরক্ষিত করার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে অধিক হয়ে দেখা দিয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে রবীন্দ্রনাথ তার গানে যে বাউলভাবনার স্থান দিয়েছেন তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু সুরের ক্ষেত্রে বাউল এবং কীর্তন নতুন আঙ্গিকে বা ঢঙে চিহ্নিত হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতে। এই সুরের সঙ্গে বাউলদের গাওয়া গানের সুরের খুব সামান্যই মিল রয়েছে। তাল এবং মাত্রায়ও রয়েছে পার্থক্য। বাউলদের গানে দুটি ঢং রয়েছে—একটি আখড়াশ্রিত—যেখানে বাউল সুর অনেকটা ধীমা লয়ে গাওয়া হয়। এখানে আত্মনিমগ্নতা সাধকের কণ্ঠে ফুটে ওঠে। সাধকের একাকিত্বে এবং কেবল নিজের জন্যই তখন তা গাওয়া হয়। তাতে গানের তালে ও মাত্রায় শান্ত নদীর ছবি। কিন্তু জনসমক্ষে বাউলগান চড়া সুরে এবং দ্রুত তালে ও মাত্রায় গাওয়া হয়। আখড়ার এই বাউলসুরের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গানে আছে বলে মনে হয়। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ এই আখড়াবাসী বাউলদের গান শুনেছিলেন। কিন্তু এই আখড়ার গান শুধু প্রার্থনা হিসেবেই নিবেদিত। এখানে সুরের কোনো বৈচিত্র্য নেই। লোকসমাজে গীত বাউলদের সুর আর রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গানে এই মিল ঘটেনি। ড. প্রিয়ব্রত চৌধুরী[১১] এই প্রসঙ্গে বলেন : "...বাউলের নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাতেও বৈচিত্র্য অর্থাৎ তালফেরতা আছে। এই হিসেবে বাউলগান শুধু কানে শুনবার নয়, চোখে দেখবার বস্তু। বাউলের একতারা, নৃত্যের ভঙ্গি, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবই সামনে থেকে দেখে শুনে তবে বুঝতে হয়।"

প্রিয়ব্রত চৌধুরী বাউলগান এবং লোকসংগীতে নানা রাগের পরিচয় পেয়েছেন।[১২] এটিও লোকসংগীতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সময়ের সাথে তাল রেখে লোকসংগীত এগিয়ে যায়। তাই এ-কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, লোকসংগীতে রাগের পরিচয় থাকতে নেই। কিন্তু এমনটি হয়তো বলা যায় যে, বাউলগান রচনার সময় হয়তো রাগের ব্যবহার হয়নি, পরবর্তীতে গায়কীর মাধ্যমে তা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে একটি বাঁধাধরা নিয়ম আছে এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার বাইরে আসতে চাননি। এক্ষেত্রে গগন হরকরার গান :

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে—

যে সুরে একসময় গগন হরকরা নিজে অথবা অন্য বাউল গেয়েছে, সেই সুরকে ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' প্রণয়ন করেননি। এখানে এই সুরকে বাউলপ্রভাবিত মনে করা হয় তা রবীন্দ্রবাউলের কীর্তি এবং বাংলা সংগীতজগতে রবীন্দ্রবাউল নিজের একক অস্তিত্ব নিয়ে সমাসীন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গান বিচিত্রতায় ভরা ছিল। ধ্রুপদী থেকে বাউল, কীর্তন এবং ভাটিয়ালি সুরের সঙ্গে কখনও কখনও রাগের মিশ্রণ ঘটেছে তার গানে। তবে তার বাউল-আঙ্গিকের গান ছিল তার নিজস্ব সৃষ্টি। কোনো কোনো গানে বাউলসাধনার কিছু কিছু প্রতীকী শব্দ যেমন 'রূপ-স্বরূপ' ইত্যাদির ব্যবহার হয়েছে। বাউলের 'রূপ-স্বরূপ'-তত্ত্ব তার অজানা ছিল না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসব শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তার জীবনদর্শনের প্রয়োজনে। প্রকৃত অর্থে, রবীন্দ্রনাথের বাউলগানে সুর অপেক্ষা বাণীরই প্রাধান্য ছিল এবং তার কুশলী প্রয়োগে তার গান নতুন মাত্রাও পেয়েছিল।

এখানে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যকর্মে এবং গানে নানা ভাবনা বা ভাবের মিলনই যে ঘটিয়েছিলেন তা শুধু নয়, তিনি তার সময়ে প্রচলিত দেশী এবং মার্গসংগীতের নানা সুরেরও সমন্বয় সাধন করেছিলেন তার গানে। রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে নিধুবাবু পর্যন্ত কাউকে তিনি বাদ রাখেননি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রসংগীতে দেশী এবং মার্গসংগীতের পাশাপাশি সুফি, গজল, সামা, এমনকি কবীরের গানও প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথের বাউলগানে কীর্তন, বাউল এবং ভাটিয়ালির তাল ও লয় ঢুকে পড়েছে। এসব গানের সর্বত্রই লোকসংগীতের ভাব, ভাষা ও সুর প্রাধান্য পেয়েছে। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের প্রায় ক্ষেত্রেই লোককথা ও লোকসুর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাউলের গান লোকসংগীত হওয়ায় তার মধ্যে যে অমার্জিত শব্দ ও সুরের পরিচয় পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের বাউল-আঙ্গিকের গান সে অর্থে মার্জিত এবং পরিপাটি এবং তা একান্ত করেই রবীন্দ্রনাথের রচনা। এসব গানে সহজ তাল, মাত্রা এবং সুরের আধিক্য রয়েছে। তবে গানের মীড় সর্বত্রই একই রকম। অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ তার বাউল আঙ্গিকের গানে কিংবা ভাটিয়ালি সুরে ধ্রুপদী মীড়ের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বাউলগানের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান একটি অপরটি থেকে আলাদা এবং তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এখানেই রবীন্দ্রসংগীতের স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের গান বাউলগানের মতোই বৈচিত্র্যহীন। অনেক সময় তা 'একঘেয়েমী' বলে মনে হয়। কিন্তু একবার সে গানের গভীরে প্রবেশ করলে তার আবর্ত থেকে আর সহজে বের হওয়া সম্ভব হয় না। তবে লোকসংগীতশিল্পীদের গায়কীতে বাউলগান যে বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম, রবীন্দ্রনাথের গানে তা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের গান একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা বলেই শিল্পীর তেমন কোনো স্বাধীনতা

থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ও বাউলগানের মধ্যে যে গভীর মিল তা হলো উভয়ের গানে বিরহের সুরই প্রধান। এই বিরহ প্রেমাস্পদের মিলনজনিত বিরহ। বাউলগানের 'মনের মানুষ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' এই বিরহবোধ জাগিয়ে তোলে প্রেমিকের কাছে। রবীন্দ্রনাথ বাউলের এই বিরহবোধকে আজীবন লালন করেছেন : মধুর তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ।'

তথ্যনির্দেশ

১. ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ বেথুন সোসাইটিতে আয়োজিত এক সভায় এই প্রবন্ধ পাঠক করেন।
২. 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন : "আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়স্বরূপ সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে ভাষায় ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়। 'দ্রষ্টব্য : *ভারতী*, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।
৩. রবীন্দ্রনাথ, *সংগীত চিন্তা*, বিশ্বভারতী, ১৯৬৬।
৪. করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*, লোকসংগীতানুগ গান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫১
৫. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা*, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৯৭
৬. করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬
৭. শান্তিদেব ঘোষ, ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৮. দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা ১৭৭
৯. দ্রষ্টব্য : করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮
১০. শৈলজারঞ্জন মজুমদার, *রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ*, ছায়ানট, ঢাকা, পৃ. ৪৪-৪৭।
১১. প্রিয়ব্রত চৌধুরী, *রবীন্দ্রসংগীত*, কলকাতা, ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৭৭, পৃ. ২২৪
১২. প্রিয়ব্রত চৌধুরী, *রবীন্দ্রসংগীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতে বাউল প্রভাব

এক

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুল 'বিদ্রোহী' হিসেবে চিহ্নিত। তার 'বিদ্রোহী' কবিতা তার যুগেই শুধু নয়, অদ্যাবধি একটি নতুন ধারার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে যে বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, সে বলয় ভেদ করে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা অনেকটা দুঃসাধ্য ছিল। 'কল্লোল' যুগের কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা নয়। কারো পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন, এই কবিরা তার আবর্ত থেকে বেরিয়ে সাহিত্যের একটি ভিন্ন স্বাদ এবং নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছিলেন এবং তার ফলেই যা ছিল অনিবার্য, তাইই ঘটল–সাহিত্যে পালাবদল হলো। 'কল্লোল'যুগের কবি-সাহিত্যিকরা ছিলেন মেধাদীপ্ত এবং সমকালীন বিশ্বের কবি-সাহিত্যিকদের রচনা সম্পর্কে 'ওয়াকিফহাল'। এরা বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নজরুল তো এ সময়ে একজন সৈনিক ছিলেন। সৈনিক হিসেবে তিনি প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। খুব ছোটবেলা থেকে কবিতা লেখা এবং গান গাওয়া তার শখের বিষয় ছিল। তার জন্ম হয়েছিল বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। সে সময়ে বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বৈষ্ণব-বাউলদের নানা আখড়া ছিল। সর্বদা সেখানে ছিল তাদের আনাগোনা। এতদঞ্চলে নবনী বাউল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একজন প্রিয় বাউল। অবশ্য বাউলদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় বাংলাদেশে তার ছেলেবেলায়। কুষ্টিয়াতে তিনি বাউলদের দেখেছিলেন, তাদের গান শুনেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেসব গান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। শিলাইদহের কুটিবাড়িতে থাকাকালে তিনি লালন শাহের কথা শুনেছিলেন। কুঠিবাড়ি থেকে লালন শাহের আখড়ার দূরত্ব ছিল ৫-৬ মাইল। কুষ্টিয়া শহরে রবীন্দ্রনাথ যে বাড়িতে কখনও কখনও থেকেছেন ব্যবসা ইত্যাদি কারণে, সেখান থেকে ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন ফকিরের আখড়ার দূরত্ব আধ মাইলের মতো ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তার জমিদারি পোস্টঅফিসের ডাক হরকরা গগন বাউলের গান প্রতিনিয়ত শুনতেন। এসব বাউলের গান রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে এবং তিনি তাদের গান স্বীকরণ করে নতুনভাবে রূপ দিয়েছেন তার সাহিত্য ও সংগীতে।

বাউলদের সঙ্গে মেলামেশায় নজরুল যতটা একান্ত হতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি, তার জমিদার হওয়ার কারণে। নজরুল তাদের একজন হয়ে পড়েছিলেন। তাদের সাথে বেড়িয়েছেন, গান গেয়েছেন এবং বাউলগান রচনাও করেছেন বাউলদের ঢঙে। বাউলদের অসাম্প্রদায়িকতা মানবতাবোধ এবং জীবনদর্শন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। সৈনিক হিসেবে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকালে তিনি সুফিসাধক এবং কবিদের দেখেছিলেন। ওমর খৈয়াম, হাফিজ, রুমী, জুনায়েদ প্রমুখদের সাহিত্য তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বাউলেরা ছিল এই সুফিসাধকদের একাংশ। এরা 'বাতেনী' শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পারস্যে 'বাআল'/'বউল' নামে একটি সুফি সাধকশ্রেণীর কথা জানা যায়।[১] বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে (চতুর্দশ শতক) শাহ্ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে 'বাউল', 'বাউর', এবং 'আউল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

এ থেকে বোঝা যায়, পারস্যে 'বাআল' বাউল সুফিসাধকেরা বাংলাদেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মতবাদের জন্ম অনেকটা দ্রোহের মধ্যে। এর কারণটি অনেকাংশে রাজনৈতিক। আব্বাসীয়, উমাইয়া এবং ফাতেমী মতাদর্শীদের মধ্যকার বিরোধ এবং পরবর্তীতে শিয়া-সুন্নী কোন্দল ইত্যাদির কারণে ইসলামের নানা তরিকা বা পন্থীর সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বাউল এই পারস্য বাতেনী সুফিসাধুদের অনুসারী। কবীর, রজ্জব প্রমুখ বাউরা বা বাউলসাধক ছিলেন। এরা বাউল সুফিদের মতো সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। এই সাধনায় গ্রিক, বৌদ্ধ, খ্রিস্টীয় ও ইরানীয় চিন্তা-চেতনার সঙ্গে ইসলামের মিলন ঘটিয়ে 'বাআল'/'বাউল' সুফিসাধনার আত্মপ্রকাশ। নজরুল ইসলামও তার জীবনকর্মে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। বাউল সুফিসাধনা তথা ওমর খৈয়াম, হাফিজ, জুনায়েদ এবং ভারতের কবীর ও বাংলাদেশের লালন ফকিরের গান তার প্রেরণার উৎস ছিল। নজরুলের মধ্যে তাই একদিকে যেমন ইসলামী ভাবনার প্রকাশ রয়েছে তেমনি হিন্দু, শাক্ত এবং বৈষ্ণবধর্মেরও অপূর্ব মিলন সংঘটিত হয়েছে। এই প্রতিভাকে তাই বাউলপ্রতিভা বলে উল্লেখ করা হলে তা অসংগত হবে না। বস্তুত, নজরুলের সমগ্র সাহিত্য ও সংগীতকর্মে বাউলমতাদর্শ ফাল্গুধারার মতো সতত প্রবহমান। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে নজরুল যখন কলকাতায় বসবাসকারী, তখন কলকাতায় 'ফোর আর্টস ক্লাব' বা 'চতুষ্কলা সমিতি' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে।[৩]

এই প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ছিল। এই 'ফোর আর্টস ক্লাস'-এ সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প এবং কারুশিল্প—এই চারটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল। এই ক্লাবের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ 'আড্ডা'র মাধ্যমে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ অনুশীলন করতেন। নজরুল মাঝেমধ্যে এই ক্লাবে আসতেন, গান গাইতেন এবং কবিতা শোনাতেন। এই ক্লাবটি পরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই ক্লাবের অনেক সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠে কল্লোলগোষ্ঠী। মাসিক পত্রিকা 'কল্লোল'-এর নামানুসারে এই গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এরা বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেন। 'ফোর আর্টস ক্লাব' বন্ধ হয়ে গেলেও তার আদর্শ 'কল্লোল' গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। নজরুল 'কল্লোল' গোষ্ঠীর জন্মলগ্ন থেকেই এর সদস্য ছিলেন। 'কল্লোল পত্রিকায় তিনি কবিতা ও গান প্রকাশ করেছেন। 'কল্লোলে' থাকতে নজরুলের নতুন ধারার কবিতা সাহিত্যিক ও সুধীমহলে দারুণ চমক সৃষ্টি করে। তার লেখা কবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তার আগাম খবর 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হতো। যেমন ১৩৩১ সালে শ্রাবণ সংখ্যায় উল্লেখ ছিল ভাদ্রের কল্লোলে কবি নজরুল ইসলামের 'পুবের হাওয়া' শেষ হবে, এবং আশ্বিন সংখ্যায় 'মলয় মারুত' প্রকাশিত হবে। ১৩৩১-এর বৈশাখ সংখ্যায় 'কল্লোল' বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত : 'সপ্তম বছরের কল্লোল অভিনব রসসমৃদ্ধ। বাংলার নবতম সাহিত্যের মুখপত্র। আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়... নজরুল ইসলামের গান... ইত্যাদি ইত্যাদি।[৪]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুল যে যথার্থই নতুনের ডাক নিয়ে এসেছিলেন, 'কল্লোল' পত্রিকায় তার প্রমাণ আছে। এক অর্থে বলা যায় তিনি ছিলেন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অন্যতম প্রাণপুরুষ। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশ পেলে তার সমকালীনদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নতুন কবিরা নজরুলের এ কবিতাকে 'অসাধারণ' এবং 'অভিনব' বলে আখ্যায়িত করেন; অপরদিকে একশ্রেণীর ঈর্ষাকাতর, বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিরা নজরুলকে নিয়ে সমালোচনা শুরু করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সজনীকান্ত দাস। তিনি লিখলেন 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারোডি, 'ব্যাঙ', শনিবারের চিঠি, ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৪। এর সাথে শনিবারের চিঠির প্রথম সংখ্যায় নজরুলকে 'গাজী আব্বাস বিটকেল' বলে আক্রমণ করা হয়।[৫]

এর মধ্যে মোহিতলাল মজুমদারও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন তার কবিতায়। 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার পূর্বে মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল উভয়ে একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নজরুল মোহিতলালকে 'গুরু' হিসেবে সম্মান করতেন। মোহিতলাল তার 'আমি' কবিতার সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার ভাবগত মিল লক্ষ করলেও আদতে 'বিদ্রোহী' কবিতা 'আমি' অপেক্ষা অনেক মহৎ সৃষ্টি। 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে ভাব, ভাষা এবং উপমা

উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ ঘটেছে মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় তা পাওয়া যায় না। 'শনিবারের চিঠি'তে নজরুলকে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছিল, তার পেছনে যে মোহিতলালের হাত ছিল, নজরুল তা জানতেন এবং সে কারণে 'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩১ সালে কার্তিক সংখ্যায় লিখলেন 'সর্বনাশের ঘণ্টা'।[৬] নজরুল বললেন, 'হে দ্রোণাচার্য! আজি এই নব জয়যাত্রার আগে দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে শিষ্য তোমার; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি, অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি!...

যদি অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিতেছ গুরু! কেন তব হিয়া দগদগী জ্বালা?
হোলির রাজা কে সাজালে তোমারে পরায়ে বিনামে মালা?

নজরুল যথার্থই এই কবিতায় 'বিদ্রোহী'র সফলতা বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অদ্যাবধি 'বিদ্রোহী' কবিতা একটি অনুপম সৃষ্টি হিসেবে বাংলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করে আসছে। নজরুল যদি আর অন্য কিছু নাও লিখতেন, তথাপি নিঃসন্দেহে এই কবিতার জন্যই তিনি খ্যাতিমান হতেন। অবশ্য মোহিতলাল তার ক্রোধ এবং ঈর্ষা নিয়ে থেমে থাকেননি। তিনি নজরুলকে অভিশাপ দিলেন, বললেন :

আত্মপূজায় ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার, মহাবীর হওয়া মর্কট সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোশ মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস
চরম ক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস![৭]

মোহিতলালের এই অভিশাপ নজরুলের রথযাত্রাকে থামাতে সক্ষম হয়নি। যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে তার একটি কারণ, তার দারিদ্র্য; অর্থের অভাবে তিনি কবিতা, কাব্য সবই সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন। তার সময়ে তিনি যে ঈর্ষা ও বিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার মৃত্যুর জন্য তা অন্যতম কারণ ছিল। এর পরে স্বেচ্ছাচারিতা তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। নজরুল নিজে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। এই অসাম্প্রদায়িক ভাবনা তিনি বাউলদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে হিন্দুমেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। 'শ্যামাসংগীত' রচনা করেছেন। মানবতা এবং সাম্যবাদের প্রতিধ্বনি করেছেন তার কবিতায়। কিন্তু এতেও তিনি 'পার' পাননি তৎকালীন হিন্দুসমাজের কাছে। কবিদের মধ্যে মোহিতলাল শুধু নন, বদ্ধদেব বসু এবং আরও অনেকেই নজরুলকে সহ্য করতে পারেননি। বুদ্ধদেব বসু যে 'কাজীদা'কে একদিন মাথায় নিয়েছিলেন, পারিবারিক

কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে ছোট করতেও তার বাধেনি। নজরুলের কবিতায় যে 'সাম্যবাদ' আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার অনুসরণে সমর সেনের মতো অনেকেই পরবর্তীকালে কবিতা লেখেন। সাহিত্যে এই নতুন ভাবনা এমন বলিষ্ঠ ভাষায় নজরুলের পূর্বে আর কেউই লেখেননি। অথচ কী আশ্চর্য! কবিতায় সমর সেনকেই বুদ্ধদেব বসু প্রথম সাম্যবাদের কবি বলে আখ্যায়িত করেন।[৮]

রবীন্দ্রনাথ 'কল্লোল'যুগের কবিদের প্রতি প্রীতিময়তা তেমন না দেখালেও নজরুলের প্রতিভাকে তিনি স্বীকার করে তার 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছিলেন। নজরুল তার সমকালে কী আলোড়ন এনেছিলেন, তার বিবরণ দিয়েছেন জীবেন্দ্র সিংহ রায়।[৯] তিনি বলেন : নজরুলের (১৩০৬) কবিতার প্রথম যথার্থ প্রকাশ প্রবাসীতে (পৌষ, ১৩২৬)। তারপর মোসলেম ভারত, ধূমকেতু প্রভৃতি হয়ে তিনি আসেন 'কল্লোলে'র প্রথমবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)। 'কল্লোলে'র সঙ্গে তার এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন বন্ধুদ্বয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।[১০]

তারপর থেকেই 'কল্লোলে'র অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠেন নজরুল; তার কবিতা ও গান হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজের অন্যতম আকর্ষণ। বলেছি, পত্রিকাটির আগের সংখ্যায় প্রচ্ছদপটে ঘোষিত হতো পরবর্তী সংখ্যায় নজরুলের কোন কবিতা বা গান প্রকাশিত হবে। শত্রুপক্ষ ও সংরক্ষণপন্থীরা তাঁকে কল্লোলের অন্যতম নায়ক ধরে নিয়ে তার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করতেন বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ শায়ক। কিন্তু সমস্ত আক্রমণ সত্ত্বেও তিনি লিখে গেছেন পত্রিকাটির সপ্তমবর্ষ পঞ্চম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৩৬) পর্যন্ত।[১১] আর এই কারণে নজরুল 'কল্লোলে'র কবি বলে পরিচিত। 'কল্লোল' এবং অন্যান্য পত্রিকায় লেখা ছাপা হলে নজরুলের কবিপ্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়ে মোহিতলাল 'মোসলেম ভারতে' (ভাদ্র ১৩২৭) চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার কবিজীবনের প্রচণ্ড সম্ভাবনা দেখে এই পত্রে তাকে প্রশংসা করেন। নজরুলও অতঃপর মোহিতলালকে গুরুর আসনে বসিয়ে 'কল্লোল' এবং অন্যত্র নিয়ে আসেন। অথচ নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে ছেদ পড়ে।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর গোঁড়া মুসলমানদের এক শ্রেণী তাঁকে 'কাফের' আখ্যায় আখ্যায়িত করে। অপরদিকে গোঁড়া হিন্দুসমাজ 'ভগবান বুকে পদচিহ্ন' এঁকে দেবার দায়ে তাঁকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করে। বস্তুত নজরুলের প্রতিভা এবং তার কবিতাকে বুঝতে অক্ষম হওয়ার কারণে এমনটি ঘটেছিল। নজরুলের পরে এ যাবৎকাল এমন মহিমান্বিত বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আর পাওয়া যায় না। প্রসংগত বলা যায় যে, এই কবিতা শুধু ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ছিল তা নয়, তৎকালীন সমাজের নিম্নবিত্ত এবং

বিত্তহীনদের প্রতি বর্ণবাদী উচ্চবিত্ত মানুষদের পাশবিকতা, নির্মমতা এবং সকল ধর্মের স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মব্যবসায়ী তথা মানবতাবিরোধীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার গতানুগতিক পথ ছেড়ে তিনি ভিন্ন আঙ্গিকে, অভিনব ছন্দের কৌশলে একটি নতুন জীবনবোধের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

একসময়ে মোগল আমলে দিল্লীশ্বর যেমন হয়ে উঠেছিল জগদীশ্বর, তেমনি ইংরেজ আমলে ইংরেজ এবং তাদের আনুকূল্যে গজিয়ে ওঠা তথাকথিত বিত্তশালীদের সমাজকে 'বিশ্ববিধাতা' বলে উল্লেখ করাতে তার আবির্ভাব সকলের নিকট বিস্ময়স্বরূপ বলে নজরুল চিহ্নিত হয়েছে। কবিতায় তার এই বলিষ্ঠতা যেন তার অস্তিত্বকেই সপ্রমাণ করে। আবহমানের শোষকশ্রেণী ইংরেজ শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে এইসব কবিতা তখনকার সংগ্রামী পুরুষদের নিত্যদিনের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ সরকার ১৯২২ এ 'যুগবাণী', ১৯২৪-এ 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' নিষিদ্ধ করেন। 'প্রলয় শিখা' ছিল বাজেয়াপ্ত গ্রন্থাবলির চতুর্থ বই (১৯৩১)। কবিকে এজন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[১২] কবির এই বিদ্রোহের মর্মমূলে যে বাংলাদেশের লোককবি বাউলদের দর্শনও কাজ করে, 'প্রলয় শিখা' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'চাষার গান'[১৩] তা প্রমাণ করে। কবিতাটি নিম্নরূপ :

আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি,
সমান রে ভাই!
কে রাবণ করে হরণ
দেখব রে তাই।
আমাদের ঘরের বেটির কেশের মুঠি
ধরে নে যায় সাগর পারে,
দিয়ে হাত মাথায় শুধু
ঘরে বসে রইব নারে ॥
যে লাঙল ফলা দিয়ে
শস্য ফলাই মরুর বুকে,
আছে সে লাঙল আজও
রুখব তাতেই রাজার সেপাই ॥
পাঁচনীর আশীর্বাদে
মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ,
সে পাঁচন আছে আজও
ভাঙব তাতেই ওদের গলদ।
যে জলে ভাসছি মোরা
চল্ সে জলে ওদের ভাসাই ॥

পাথুরে পাহাড় কেটে
নিঙাড়ি নীরস ধরা,
আনি রে ঝর্নাধারা
এ নিখিল শীতল করা।
আজি সে গাঁইতি শাবল
কোথায় গেল, হাতে কি নাই ॥
খেতেছে ফসল নিতুই
ডিঙিয়ে বেড়ার কাঁটা,
এবারের পুজোয় নতুন
বলি দে সেসব পাঁঠা
দেখিবি আসবে ফিরে
শক্তিময়ী আবার হেথাই ॥

এই কবিতাটি একদিকে যেমন বাউলগানের আদলে লেখা, তেমনি শব্দ প্রয়োগেও কবি বাউলআশ্রিত ছিলেন। 'খেতেছে ফসল নিতুই' শব্দগুলি অনেকটা বাউলগান থেকে ধার করে নেওয়া। যেমন :

এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই
কেন দেখলি না আপনার ভুঁই
তোর দেহ জমির পাকা ধানে
দেখ লেগেছে ছটা বাবুই
বহু কষ্টে করলি কৃষাণী
এমন মানবদেহ চৌদ্দ পোয়া
লাল জমিখানি।
তাতে ভক্তি ফসল জন্মেছিল
সব খেয়ে গেল হিংসা চড়ুই ॥
(যাদু বিন্দু)

বলেছি, কল্লোলের সঙ্গে ছিল নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধন। এ সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন : 'দে গুরুর গা ধুইয়ে' বলে হাঁক ছেড়ে কাজী 'কল্লোল' অফিসের দরজায় এসে হানা দিত। ঘরে ঢুকেই চৌকিতে বসে বার করত একঝুলি–আরসি, চিরুনি, স্নো ইত্যাদি ঠাসা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অসংযত চুলগুলিকে চিরুনির সাহায্যে সুবিন্যস্ত করে, মুখে স্নো লাগিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে শুরু করত আড্ডা। সকল কাজকর্ম বন্ধ। শোন কাজীর গান, গল্প ও হল্লা। কাজী চলে গেলে আবার সব চুপচাপ। ঝড়ের পর স্তব্ধতা।...[১৪]

নজরুল রবীন্দ্রবলয় থেকে বেরিয়ে যে নতুন সাহিত্যের উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে জীবেন্দ্রসিংহ রায় বলেন :

...বাংলা কাব্যে এই অ-রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ ও সুরের ক্রমাভিব্যক্তিতে নজরুল ইসলামেরও একটি দান আছে। তার জীবনের চলন বোহেমীয়, অনেকটাই বিশৃঙ্খল। এই বেপরোয়া ভাব তার মনের চরিত্রে, বিশেষ করে তার আদিপর্বে, এনে দিয়েছিল একটা উদ্দাম উল্লাস। সেই উল্লাসে বেগ সঞ্চার করেছে পল্টনী পর্যায়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রায় বিস্ফার ঘটিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির প্যান ইসলামিজম ও কামাল পাশার রিপাব্লিকানিজমের স্বপ্ন খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ, চিত্তরঞ্জনের স্বদেশ সাধনার বলিষ্ঠতা। এর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় তার শিল্পস্বভাবে যে উদ্দীপনা জাগে তারই সৃষ্টি তার প্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা' (১৩২৯)। আর এই অগ্নিবীণা কাব্যের জন্যই তিনি পেয়েছেন কবি বিদ্রোহীর সম্মান, আখ্যাত হয়েছেন 'চড়া গলার কবি' বলে। বাংলাকাব্যে এমনতর উচ্চকণ্ঠের উচ্চারণ পূর্বে শোনা যায়নি। অন্যদিকে তার গজল গানের ফার্সি আবহাওয়া বাংলাদেশের সংগীতলোকে একটা নতুন স্বাদ আমদানী করেছিল। এ সবই রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীত বলয়ের বহির্ভূত এবং সেই কারণেই সুর-স্বাতন্ত্র্যে তার আছে একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য।[১৫]

নজরুলের অগ্নিবীণার রুদ্ধ ঝঙ্কারে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল যেমন ঘটেছে, তেমনি এই পালাবদলের নৈয়ায়িকের দায়িত্বও পালন করেছেন কবি নজরুল। মোহিতলালের কবিতা 'আমি'র ভাবের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য ছিল বলে মোহিতলাল ভেবেছিলেন নজরুল তা স্বীকার করবেন। কিন্তু ভাবের সামান্য সাদৃশ্য থাকার অর্থ এই নয় যে সমগ্র কবিতাটি তার অনুকরণে লেখা। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং অন্য ইংরেজ কবিদের ভাব শুধু নয়, ইংরেজি ভাষারও অনুবাদ বলে মনে হবে। নজরুলের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সুতরাং সেক্ষেত্রে মোহিতলালের দাবি স্বীকার্য নয়। অবশ্য মোহিতলাল নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে লেখেন :

মানস আকাশে রক্তসাগরে ডুবিছে রবি?
কাল নিশীথিনী বধূ কি তোমার, মরণ-লোভী?
এতটুকু আলো কোথাও নাহি রে! সৃষ্টি শেষ।
চিতায় চিতায় ফুৎকারি তাই ফিরিছ কবি।
হে কবি নবীন জীবন তোমার মুক্তধারা।
তুমি গাও গান শুনিবে সকলে নিদ্রাহারা।
দাও বিশ্বাস, দাও আশ্বাস-অভয়বাণী
আলোক-আঘাতে ভেঙ্গে দাও এই আঁধার কারা।
(কবি বিদ্রোহীর প্রতি)

এই কবিতায় মোহিতলাল নজরুলকে যেমন নতুন ধারার কবি হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের দিনও যে শেষের পথে এবং তার মূলে যে

নজরুল, এমন কথারও উচ্চারণ করেছেন তিনি। নজরুলের সমকালীন কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীষ ঘটক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং জীবননানন্দ দাশ প্রমুখ ছিলেন। এদের কাব্যরচনায় নতুন ভাবনার প্রকাশ দেখেছি আমরা। জীবনযন্ত্রণার এক অসহ্য উত্তাপ তাদের কাব্যে ভরে আছে। এরা সকলেই বুদ্ধিদীপ্ত এবং মেধাবী। এদের আবেদন একশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের মধ্যে। তাদের কবিতাও সহজে বোঝা যায় না। এরা নিজেরাই একটি বলয় তৈরি করে নিয়েছেন। তথাপি বলা যায়, এদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই ভাবগত এবং ভাষা প্রয়োগে কবিতায় নতুন স্বাদ এনে দিয়েছেন।

নজরুল-প্রতিভা একজন চারণকবির প্রতিভা। তিনি চড়াগলার কবি। বাউল যেমন চড়া সুরে হাজার মানুষকে উচ্চকিত করে তোলে তার গানে, নজরুল ঠিক সেই কাজটি করেছেন। ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে তার এই ভূমিকা তাকে গণমানুষের হৃদয়ের কবি করে তুলেছিল এবং আজো তিনি উভয় বাংলায় সকলেরই প্রিয় কবি। বস্তুত তার প্রতিভা ছিল এমনি। তিনি বাউলের মনের মানুষের সন্ধান করে ফিরেছেন, কিন্তু আজীবন তাকে পাননি। এই বিরহবোধ তার কাব্য এবং গানের সর্বত্রে। তার কোনো কোনো কবিবন্ধু তার কবিতায় হৈচৈ দেখেছেন। একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগাতে হৈচৈ বা কোলাহলের প্রয়োজন হয় বৈ-কি। একজন কবি সমাজসংস্কারক নন। কিন্তু সমাজ বদলানোর রসদ থাকে তার কবিতা ও গানে। নজরুলের মধ্যে তা ছিল। কবিতা মানুষের জন্য, কবিতার জন্য মানুষ নয়। নজরুলের পরিচয় তিনি মানুষের কবি। তার কবিতায় ভাষা ও ছন্দ সমকালীন কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। অদ্যাবধি তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারেননি।

নজরুলের বিপ্লবী কবিমূর্তি এবং তার ভাবনা 'কল্লোল' যুগেই শুধু নয়, পরবর্তীকালেও নবীন ও প্রবীণ লেখকদের উজ্জীবিত করেছিল। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে যে পালাবদল ঘটল, নজরুলের বিদ্রোহে তাকে উদ্ধত, অবিনীত মনে হলেও তা ছিল অপ্রতিরোধ্য। নজরুল পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং সে পথের পান্থজনেরা তাঁকেই ধারণ করে অসাধারণ কবিতা লিখেছেন। এসব কবি ভাষায় ও ছন্দে 'নতুনত্ব' আনলেও সমাজ বদলের ক্ষেত্রে নজরুল যে ভাব ও বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, তাকে দূরে সরানো সম্ভব হয়নি। কবিতায় নজরুল যে আধুনিকতা নিয়ে এসেছিলেন, তাকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে নাগরিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ নগরজীবনকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন। একে 'আধুনিক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। নগরজীবনের কদর্যতা, যৌনভাবনা ইত্যাদি নাগরিক কবিদের কবিতায় প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়েছে। এক্ষেত্রে এদেশীয় কবিরা পাশ্চাত্য কবিদের অনুসরণ করেছেন। এই নাগরিক কাব্যে 'নারী' ভূমিকা প্রধান। নজরুলের

কাব্যে নারী এবং দেহবাদ অপ্রত্যক্ষ নয়। বিষয়টির উৎসও বাউল এবং লোকধর্ম। দেহের কথা তারা বলেছেন আড়ালে, আবডালে। যেমন :

১

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
আমি ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতাম পাখির পায়।
(লালন)

২

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
বাড়ির কাছে আরশীনগর
সেথায় এক পড়শী বসত করে।
(লালন)

কিন্তু 'নাগরিক' বলে কথিত আধুনিক সাহিত্যে 'জীবন' বলতে অতিমাত্রায় দেহবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে দেহই চরম সত্য এবং কামতৃষ্ণাই প্রধান। একে আধুনিক কবিরা শৈল্পিক ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, সুষমামণ্ডিত করেছেন নাগরিক চেতনায়। অবশ্য এই নাগরিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি এই ভাবনার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন লোকজ উপাদনের। প্রকৃতির কাছে ফিরে গিয়েছেন তিনি। 'ঘাই হরিণী'কে সুচতুর কৌশলে ব্যবহার করেছেন মানুষের আদিম কামনার জৈবিক রসাস্বাদে। এখানেই তিনি নজরুল-পরবর্তী নতুন ধারার কবি। জীবনানন্দ দাশ তার 'ঝরা পালক' এবং অন্যান্য কবিতায় তারুণ্যের উল্লাস এবং উচ্ছ্বাসকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। এ সময়ের কবিতায় ছন্দ, ভাষা, ভাব সবকিছুতেই বেশ বেগ আছে। এই বেগ একান্ত করেই নজরুলের। জীবনানন্দ দাশ ভাব, ভাষা এবং উপমা প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু নজরুলের আবেগকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। এবং এখানেই নজরুলের সার্থকতা।

দুই

বলেছি, নজরুলের প্রতিভা অনেকাংশেই বাউলের প্রতিভা। নজরুল বাউলসুরে গান লিখেছেন, বাউলের ধ্যানধারণাও প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন বাউলের ভাবনাকে তার কাব্যে ও সংগীতের ক্ষেত্রে চেতনার আদর্শ ভেবেছেন, নজরুল হয়তো তা করেননি। তবে নজরুল যে বাউল ভাবনাকে অস্বীকার করেননি এর প্রমাণ রয়েছে। শৈশবে লেটোর দলে থাকবার সময় বাউলদের মতো দেহভিত্তিক তত্ত্বমূলক গান রচনা করবার প্রবণতা তার এসেছিল এবং তিনি লিখেছেনও।

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে না ফসল এতে

নামাজে জমি উগালে
রোজাতে জমি শাঁসালে
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে ॥
লা ইলাহা ইল্লালাতে
বীজ ফেলা তুই বিধি মতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে
নয়টি নালা আছে তাহার
অজুর পানি সিরাত যাহার
ফল পাবি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে
যদি ভালো হয় সে জমি
হজ্জ যাকাত লাগাও তুমি
আরও সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে ॥

প্রথমজীবনে বাউলদের অনুসরণে গান লিখলেও পরবর্তী জীবনে বাউলদের ভাবনা দ্বারা যে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, নিম্নোক্ত গানে তার পরিচয় পাওয়া যায় :

আমি ভাই খ্যাপা বাউল আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ
আমার এই প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির গেহ ॥
সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
আমার বুকে অহরহ
কভু তাই প্রণাম করি বক্ষে ধরি
কভু বা তাই বিলাই স্নেহ ॥
ভুলায়নি আমার কুল
ভুলেছে নিজেও সে কুল
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল মোর সাথে মিলন বিরহ ॥
সে আমার ভিক্ষা বুঝি কাঁধে তুলি
চলে ধূলি মলিন পথে
নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে
কেউ বোঝে বোঝে না কেহ ॥

বাউল ভাবনা সমন্বিত নজরুলের আরও কয়েকটি গান :

১

ভবের এই পাশা খেলায়
খেলতে এলি হায় আনাড়ি
হাতে তোর দান পড়ে না
হাত খোলে না তাড়াতাড়ি ॥
তুই আর তোর সাথী ভাই
কাঁচা খেলোয়াড় দুজনাই
মায়া রিপু সাথে তাই
নিত্য হেরে ফিরিস বাড়ি ॥
তোরই সে চালের দোষে
যাই কেঁচে তোর পাকা গুটি
ওরে হরদম চক, ছয় তিন নয় পড়েতে আড়ি ॥
সংসার ছক পেতে হায়
বসে রোজ মোহের নেশায়
হেরে যে সব খোয়ালি
যাস নে তবু খেলা ছাড়ি ॥
প্রাণ মন দুই গুটিয়ে, যোগ বেধে তুই যা এড়িয়ে
আড়িতে মার খেলে তুই স্বর্গে যাবি জিতবি হাঁড়ি ॥

২

বিজন গোঠে কে রাখাল বাঁজায় বেণু
আমি সুর শুনে তার বাউল হয়ে এনু
ঐ সুর পড়ে মনে
কোন্ সুদূর বৃন্দাবনে
যেত নন্দদুলাল ব্রজের গোপাল বাড়িয়ে বাঁশি বনে
শুনে ছুটত পথে ব্রজের বালা, ভুলত তৃণ ধেনু।
নদীয়াতে গোরা
ডেকে যেত অমনি ঘুরে এমনি পাগল পারা
কেঁদে ডাকত বৃথায় শচীমাতা, দেখত বসুন্ধরা
প্রেমে গলে কত নর-নারী যাচত পদ-রেনু ॥

৩

ভালোবেসে অবশেষে কেঁদে দিন গেল
ফুলশয্যা বাসি হল বধূ না এল।
পানের খিলি শুকাইল বাটাতে ভরা

এ পান আমি কারে দিব সে বধূ ছাড়া
নীলাম্বরী শাড়ি ছি ছি পরলেম মিছে লো ॥
সখি, এবার ধরে দিস যদি তাই
তবে রাখব বেঁধে বিনোদ খোঁপায়
কাঙ্গালে পাইলে রতন যেমন রাখে লো।
সোঁদা মাথা দিসনে কেশে গানে যে লো তার
মনে আনে চন্দন গন্ধ সোনার বঁধূয়ার
এত দুঃখ ছিল আমার এই বয়সে লো ॥

বাউলেরা সর্ব সংস্কার ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করে যে মানবতার জয়গান গেয়েছেন, কবি নজরুল তা অনুসরণ করেছেন। একটি গানে নজরুল তাদের এই মনোভঙ্গি সুন্দরভাবে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন :

মোরা ভাই বাউল চারণ
মানিনা শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি
অ-বিনাশী নাইকো মোদের ডর রে ॥
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই
মরা প্রাণ উটকে দেখাই
ছাইচাপা ভাই অগ্নি ভয়ংকর রে ॥
খুঁড়ব কবর তুড়ব শ্মশান
মরার হাড়ে নাচাব প্রাণ
আনব বিধান নিদানকালের বর রে।
(বিষের বাঁশি)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাউলগান সর্বক্ষেত্রে নজরুলের প্রেরণার উৎস না হলেও তার মানসিকতা গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তিনি নিজের জীবনে যে অনেকটাই বাউলের মতো ভাবোন্মাদ ছিলেন, নজরুলকে যারা দেখেছেন তারা এ-কথা স্বীকার করেছেন। নজরুল কোনো বাউলগায়কের সাথে পরিচিত ছিলেন কি না এবং কোনো বাউল কবি তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছেন কি না এ সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তার রচনাবলিতে বাউলগানের প্রভাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, নজরুল তা করেননি। শুধু তার রচিত কবিতা ও গানগুলি আমাদের একমাত্র উপায়স্থল।

নজরুল তার অনেক গানেই বাউলের সুর গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হয়তো এমন হতে পারে যে বাঙালি মন তার সময়ে বিশেষভাবে এই সমস্ত গানের প্রতি আকৃষ্ট হতো। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন :

> ...But in Bengal, which had never been properly a part of India untill the British regime, music had remained more or less confined to semi-religious folk melodies like Kirtan and Baul, which with all their limitation, had the perfect sincerity, wherein the pseudo classical schools of Bishnupur and Dhaka were glaringly deficient... To the Bengali mind, the sensuous and dramatic movement of Kirtan and almost painful nostalgis of Baul and Bhatiali, despite their relatively meagre technique, remained emotionally and aesthetically more satisfactory than any variety of kheyal available at home.[১৬]

নজরুল অনেক দেশাত্মবোধক গানে বাউলের সুর মিশিয়েছেন। নিম্নের গানটি তার একটি উদাহরণ :

আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি ॥
এই দেশেরই মাটি-জলে
এই দেশেরই ফুলে-ফলে
তৃষ্ণা মিটাই–মিটাই ক্ষুধা
নিয়ে এরি দুধের বাটি ॥
এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ করে ধন্য হতে আসে কত জাতি ॥
এই দেশের ধুলায় পড়ি
মানিক যায় রে গড়াগড়ি
বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো
এই দেশেরই জিয়ন-কাঠি ॥
এই মাটি এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
সভ্য হল নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি ॥
এই সন্ন্যাসিনী সকল দেশে
জ্বালালে আলো ভালোবেসে

মা আঁধার রাতে একগা জাগে
আগলে রে এই শ্মশান ঘাটি ॥

এ ব্যতিরেকে, মন যদি নিবিরে বন্ধু কেন মন করিলি খালি/গেরুয়া রঙ মেঠো পথে বাঁশরী বাজিয়ে কে যায়/সাগর আমায় ডাক দিয়েছে, মন-নদী তাই ছুটেছে ঐ প্রভৃতি গানে বাউল সুরের মিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, নজরুল অত্যন্ত সচেতনভাবেই বাউলগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে তার এসব গানে দেশজ বাউলগানের হুবহু অনুসরণ নেই। নজরুলের বাউলগান আমাদের মনে কিছুটা পরিবর্তিত স্বাদ এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের বাউলগানেও এই পরিবর্তনের স্বাদ পাওয়া যায়, তবে নজরুল অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ দেশজ বাউল সুরকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন।

নজরুলের গানের মতো নজরুলের কবিতায়ও বাউল প্রভাব আছে কিনা এ বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা এ যাবৎ হয়নি। বলেছি, বাউলেরা বিদ্রোহ করেছে সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে। তাদের রচনায় একটি প্রতিবাদী ভাবনা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুলিতে মার্কসীয় দর্শন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও পরোক্ষভাবে সেসব কবিতায় বাউলভাবনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো যে প্রবাহিত ছিল এমন ধারণা একেবারেই অসংগত নয়। বাউলগানের মূলে এর মানবতাবাদ। নজরুলের গান ও কবিতার বিষয়বস্তু মানুষ। আমাদের সমাজে যে বৈষম্য মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর খাড়া করে তুলছে, বাউল তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বাউল ঘোষণা করেছে, "নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/জগত ভরমিয়া দেখি একই মায়ের পুত।" ইংরেজিতে এই ভাবনাকে Humanism নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। নজরুল এই মানবতাবাদে বিশ্বাসী। তার রচনায় লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের ভাবনা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে তার কাব্যে শোষিত মানুষের যে সংগ্রামের আহ্বান শোনা যায়, বাউলের গানে প্রত্যক্ষভাবে সেই সংগ্রামী চিত্র নেই। বাউলের গানে অন্যায়ের প্রতিবাদ আছে কিন্তু হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার চিত্র নেই। মানবতার অপমান বাউল কবি ও নজরুল উভয়কেই পীড়িত করেছে, তাই তাদের সাযুজ্য লক্ষ করা গেছে। যেমন নজরুল যখন বলেন :

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
(মানুষ)

বাউলের কণ্ঠে তখন সেই একই সুর :

সব লোক কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে ॥
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতায় প্রমাণ
বামণী চিনি কিসে রে ॥
কেউ মালা, কেউ তসবী গলে
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার কালে
জাতের চিহ্ন রয় কার ॥
কূপে গেলে কূপজল হয়
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়
মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন জাগায়
পাত্র অনুসারে।
জগৎ বেড়ে জাতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা তথা
লালন সে জাতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে ॥

২

জাতিধর্মের বড়াই করো না ভাই
কত শত মহাপুরুষ তাদের কুল ঠিকানা তো নাই ॥
নারী নর দুইরূপ মানুষ
আছে তাহার মান ও হুঁশ
খোদার নিচে ভুবন মাঝে
শাস্ত্রে শুনি তাই ॥
ধলা কালায় একই বীজে ভাই
সর্ব জাতি যাতে হয় উদয়
কর্মগুণে এই সমাজে
ভিন্ন গোত্র আখ্যা পাই।
দীন দুদ্দু বিনয় করে কয়
আমার কোনো জাতি গোত্র নাই
দিয়ে মানুষের দোহাই
মানুষের বন্দনা গাই।

নজরুল যখন বলেন :

দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে
চোখে ফেটে এল জল
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল!

তখন দুদ্দু শাহর মুখেও সেই একই কথার ধ্বনি :

ছোট বলে ত্যাজো কারে ভাই
হয়তো ওর রূপে এলেন ব্রজের কানাই ॥
শূদ্র চাঁড়াল বাগদী বলার দিন
দিনে দিনে হয়ে যাবে ক্ষীণ,
কালের খাতায় হবে বিলীন
দেখছিরে তাই ॥
ছোট, হীন বলে যারে
ঘৃণা করে দিলে দূরে
আজি সে সবে উপরে
দেখিতে তাই পাই ॥
এলোরে ধর্ম কলিকাল
ছোট বড় এক হবে সকল
সেই আশাতে ফেলছি নয়ন জল
দুদ্দু সর্বদাই।

আমরা আশ্চর্য হই যখন নজরুলের কণ্ঠেও শুনি :

রাখাল বলিয়া কারে কারো হেলা, ও হেলা কাহারে বাজে
হয়তো গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে ॥
(মানুষ)

বাউল সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানবতার জয়গান গেয়ে ফেরেন। এমন ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী অন্য কোথাও শোনা যায় না।

দুদ্দু বলেন :

জাতা জাতি সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে দিলে
যতসব কায়েস্ত বামন অবশেষে এই বুঝিলে ॥
শূদ্র বৌদ্ধ ইতর মুসলমান
সবি তো এ মায়ের সন্তান,
ভারতের মাটিতে সবারই প্রাণ
কেউ না দেখিলে ॥

রচিয়ে জাতির বেড়া
দেবতায় করিলে দেশছাড়া
মানুষ ছাড়িয়া নোড়া
সবাই ভুলিলে
এ দুঃখ আর বলি কারে
যে দুঃখে মোর প্রাণ বিদরে
দুদ্দু কয়, তাই বিনয় করে,
দরবেশ লালন সাঁই যা বলে ॥

নজরুলের কণ্ঠেও তার প্রতিধ্বনি :

মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরআন, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
... ...
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী
তারি মাঝে কবে এল ভোলানাথ, গিরিজায়া, তাহি চিনি।
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা মুষ্টি দিলে
দ্বারী দিয়ে তায় মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।
(মানুষ)

শুধু তাই নয়, মানুষের অন্তরেই মানুষের দেবতা রয়েছেন, এ কথা তো বাউলের–

বল কারে খুঁজিশ ক্ষেপা দেশবিদেশে।
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে ॥
দৌড়াদৌড়ি দিল্লী লাহোর,
আপনারে ফেলে রয় ঘোর
নিরূপ আলেক সাঁই মোর
আত্মারূপ সে ॥
যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডের উপর
সেই লীলা ভাণ্ড মাঝার
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার
মেঘের পাশে ॥
আপনাকে আপনি চেনা
সেই বটে উপাসনা
লালন কয়, অনেক চেনা
হলে হয় তার দিশে ॥

নজরুলের কবিতায় সেই একই সুর :

কে তুমি খুঁজিতেছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড় চূড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ
বুকের মণিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।
(ঈশ্বর)

বাউল বলেন, 'এই দেহেতে মক্কা মদিনে' এই দেহেই কাবা।

লালন বলেন :

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখ নারে মন ভেয়ে
দেশদেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ॥

নজরুল তখন বলেন :

কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুরে মৃত পুঁথি কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।
বন্ধু বলিনি ঝুট
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়েই সেই নীলাচল, কাশী মথুরা ও বৃন্দাবন,
বুদ্ধ গয়া এ, যেরুজালেম এ, মদিনা কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এই খানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয় ॥
... ...
মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।
(সাম্যবাদী)

বাউলগানের মূল সুর তার লৌকিক অধ্যাত্মবাদ। কাব্যের ভাষায় একে সীমা ও অসীমের সাধনা নামে চিহ্নিত করা যায়। নজরুলের বেশকিছু কবিতায় এই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। নজরুলের অধ্যাত্মসাধনা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে আজাহারউদ্দিন খাঁন বলেন :

> মধ্যযুগের কবীর নানক-দাদু-রজ্জব-মৈনুদ্দীন চিশতী-নিজামুদ্দিন আউলিয়া এবং আরো অনেক সাধু-সন্ত আউল-বাউলের সাধনার ধারাকে তিনি এ শতাব্দীতে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন।[১৭]

নজরুল তার প্রেমের কবিতা, প্রকৃতির মধ্যে যে প্রিয়াকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন সেই প্রিয় তার প্রেম ও ভক্তিতে, অধ্যাত্মসাধনায়, ঈশ্বরচিন্তায় রূপ গ্রহণ করেছে।

১

কাহারে খুঁজিতেছিল আমার এ চোখে
অবসান গোধূলির মলিন আলোকে?
জিজ্ঞাসার, সন্দেহের শত আলো ছায়া
ও মুখে খুঁজিতেছিল কী যেন মায়া।
কেবলি রহস্য হায়, রহস্য কেবল,
পার নাই সীমা নাই অগাধ অতল।
... ...
এ যেন চেনার সাথে অচেনার নিশা
যত দেখি তত হয়ে বাড়ে শুধু তৃষ্ণা।
(তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চক্রবাক)

২

হে সুন্দর, মোর! তব শুধু অনুরাগে
কোনো দিকে দেখি নাই, চলিয়াছি আগে
লঙ্গিয়া বাধা, মঙ্গিয়া নিষেধ
মানিনিকো কোরআন পুরাণ শাস্ত্র, মানিনিকো বেদ
নির্বেদ তোমার ডাকে শুধু চলিয়াছি।

কোরআন পুরাণ শাস্ত্রকে অতিক্রম করে কবি যে সৌন্দর্যকে ধ্যান করেছেন তিনি তো বাউলের মনের মানুষ। নজরুল অপর একটি কবিতায় বলেন :

অসীম, এলে না তুমি সীমারেখা পারে।
স্বপ্নে পাইয়া তোমায় স্বপনে হারায় বারে বারে।
অরূপ লো।
জন্ম-জন্মান্তর ধরি, লোকে-লোকান্তরে তোমা
করেছি আরতি
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি।
যেখানে দেখেছি রূপ, করেছি বন্দনা প্রিয়া
তোমারেই স্মরি।
রূপে রূপে অরূপা, খুঁজেছি তোমায়।
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়
চির দূরে থাকা ওগো চির নাহি-আসা।
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে।

বাসনার বিপুল আগ্রহে–
জন্ম লভি লোকে লোকান্তরে।
(অনামিকা, সিন্ধু হিন্দোল)

তুলনীয় :

১

আমার এই ঘর কে বিরাজ করে
আমি জনমভর একদিন দেখলাম নারে
(লালন)

২

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনমভর মেলে না।
(লালন)

নজরুলের সৌন্দর্যকল্পনায় লৌকিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা এই দুটি ধারা মিশেছে। নজরুলকাব্যের এই মিস্টিসিজম সম্পর্কে নজরুলের নিজস্ব বক্তব্য :

> এই মিস্টিসিজম বা মিস্টির মাঝে মিষ্টি, যে মধু পেয়েছি, তাতে আজ আমার বাণী কেবল 'মধুরম, মধুরম, মধুরম'! এই মধুরমকে প্রকাশের ভাব ভঙ্গি ভাষা এখন আমার চিরমধুরের ইচ্ছাধীন। আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন, মরণ তার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আজ দেখি, অনন্ত আকাশ বেয়ে যেন আমার সেই পরম সুন্দরের পরমাশ্রু ঝরে পড়ছে। অনন্ত ভুবন ধরতে পারছে না সে পরমাশ্রীকে, অনন্ত নীহারিকালোক থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ছুটে আসছে উদ্দাম বেগে পরমাশ্রীর প্রসাদ লোভে। আজ আমার মনে হয়, এই নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরমাশ্রীই আমার অস্তিত্ব, আমার স্বস্তি। নিরাকার, নিপুণ অবাঙমানস! ব্রহ্মা যেমন তার শক্তি আশ্রয় ভিক্ষা করে সৃষ্টির রূপে-গুণে প্রতিভাত হন বা মনের গোচর হন, এই প্রেমশক্তির আশ্রয় পেয়ে আমিও তেমনি আবার আমার সৃষ্টিতে যেন ফিরে এসেছি। এই প্রেমই যেন আমার অস্তিত্ব।[১৮]

এই পরম নিত্য প্রেমশক্তিকে পেয়েই আমি পরম নিত্যম, আমার eternal existence-কে পেলাম।

'সিন্ধু' কবিতায় নজরুল তার প্রেমময়কে লক্ষ করে বললেন :

হে মৌনী, কহিলে কথা মরি মরি,
সুন্দর সুন্দর।
সুন্দর সুন্দর গাহি জাগিয়া উঠিল চরাচর।
সেই যে আদিম শব্দ, সেই আদি কথা
সেই বুঝি নির্জনে সৃজনের ব্যথা।

সেই বুঝি বুঝিলে রাজন
একা সে সুন্দর হয় হইলে দুজন।...
(সিন্ধু প্রথম তরঙ্গ)

তুলনীয় :

নিরাকারে জ্যোতির্ময় নিত্যধামে প্রেমধন,
যুগল পদ্মে জ্যোতি মিশে হচ্ছে সুধা বরিষণ
(পাঞ্জু শাহ)

অক্ষয় নামে আদি পুরুষ নিত্য উপরে
শূন্যে ফেরে, শূন্যে ঘোরে, সূক্ষ্ম রূপ ধরে ॥
তার ইচ্ছায় এক বিন্দু এল
বীজ ফুলে ফল তিনটি হল
তার স্বভাবে মিশে ছিল
তিন শাখা দুই কে রে ॥
বলতে গেলে বলা যাবে না
আছে দুই, এক চেনো না,
আছে সব দেশে, নাই সব দেশে,
সেবক কিশোর কিশোরী রে ॥
(কালাচাঁদ)

নজরুল তার চেতনার মধ্য দিয়ে পরমসুন্দরকে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি পরমসুন্দরও সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিকাশ করে তৃপ্ত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই চেতনার বিকাশ লক্ষ করেছি তার 'জীবনদেবতা'মূলক কবিতায়। 'গীতাঞ্জলি'তে তার এই 'জীবনদেবতা' বিশ্বদেবতায় রূপ নিয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যে বাউলপ্রভাব সক্রিয় ছিল। নজরুল অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি তার প্রভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে সক্ষম হননি।[১৯]

বাউলভাবনা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে নজরুলকে প্রভাবিত করেও থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নজরুল সচেতনভাবে প্রভাবিত ছিলেন কি না তা বলা যায় না।

পরবর্তী জীবনে নজরুল আধ্যাত্মিক ভাবনায় তার পরম প্রিয়কে আল্লাহ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন :

আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া রাখে পরম সে প্রেমময়।
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরমপতি,
মোর ধ্যান-জ্ঞান তনু মন প্রাণ আমার পরমপতি।

... ...

তারি সাধ পুরাইতে বলি, আমি তাহার নিত্য দাস,
দাস হয়ে করি তাঁর সাথে কত হাস্য ও পরিহাস।
রূপ আছে কিনা জানি না, কেবল মধুর পরশ পাই
এই দুই আঁখি দিয়া সে অরূপে কেমনে দেখিতে চাই।

(আল্লাহ, পরম প্রিয়তম মোর, নজরুল রচনাসম্ভার)

এই আল্লাহ তো পরম প্রিয়। বাউলের সাঁই। বাউলের মতোই নজরুল তাকে পতি (স্বামী) হিসেবে বরণ করেছেন। তাকেই তিনি খুঁজে ফিরেছেন সারা জীবন। কিন্তু তাকে কাছে পেয়েও তার পাওয়া হলো না। এই বিরহ যন্ত্রণা তো বাউলের অন্তর্জ্বালা। নজরুল বলেন :

পদ্মার ঢেউ রে—
ও মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যারে।
এই পদ্ম ছিল রে যার রাঙ্গা পায়
আমি হারিয়েছি তারে।
... ...
পদ্মার ঢেউরে, তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমিল করে কৃষ্ণ কালো
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়
যদি দেখিস তারে সে পদ্ম তাঁর গায়
বলিস কেন বুকে রূপের দেয়ালি জ্বালিয়ে
নেমে গেল চির অন্ধকারে।

(বুলবুল, ২য়)

নজরুলকাব্যে রূপের এই তন্ময়তার মূলে অন্যান্য প্রভাবের সঙ্গে বাউলপ্রভাব অনেকটাই প্রত্যক্ষ। নজরুলের ভক্তিমূলক গান ও বাউলগানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মূলত কোনো পার্থক্য নেই। শ্যামাসংগীত ও ইসলামীসংগীতের ক্ষেত্রে সব একই কথা। যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন, সে প্রেরণা তাকে ইসলামী সংগীত রচনায়ও উদ্বুদ্ধ করেছে। আজাহার উদ্দিন খান বলেন :

স্বেতাস্বতর উপনিষদে আছে :
এক দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ॥

সেই এক পরমেশ্বরই সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতান্তরাত্মা। নজরুল এই সত্য, জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি নয়, প্রেম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। হিন্দু মুসলমানে কোনো ভেদ রাখেননি। তাই তিনি যেমন বলতে পারেন :

মোহাম্মদ মোর নয়ন মণি,
মোহাম্মদ মোর জপমালা

সেই মন গাইতে পারে :

আমার নয়ন কৃষ্ণ নয়ন তারা
হৃদয় মোর রাধাপেয়ারা

এই ভাবনা তো একান্তই বাউলের। বাউল সাধনা তো হিন্দু মুসলিম উভয়ের মিলিত সাধনা। আজাহারউদ্দিন খান বলেছেন :

> আবহমান কাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে মিলিত সাধনা চলে আসছিল, সেই যুক্ত সাধনা নজরুলের সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া গেল। হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম তমদ্দুনের অপূর্ব সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতির জন্ম তাকেই একালে নজরুল ইসলাম দিতে পারে।[২০]
>
> আর নজরুল ইসলামের নাম নেওয়ার অর্থই হল ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বধর্ম সমন্বয়ের অপূর্ব আত্মীয়তার বন্ধনকে স্বীকার করা।[২১]

আজাহারউদ্দিন খানের এই বক্তব্যকে অনুসরণ করেই আমরা এ-কথা বলতে পারি যে, নজরুলের কাব্যে-সংগীতে যে মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং দ্রোহের অবতারণা, তার মর্মমূলে বাউলভাবনা সকলের অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। নজরুলের কাব্য, সাহিত্য এবং সংগীত বিশ্লেষণ করলে এমন ধারণা জন্মায় যে, তার সকল প্রেরণার উৎসই ছিল বাউলের জীবনদর্শন—যা তিনি শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনেও অনুভব করেছেন। আধুনিক চিন্তা-চেতনা, আকর্ষণীয় দর্শন ইত্যাদির পাশাপাশি সুফিদর্শন ও বাউলভাবনা নিভৃতে নাবিকের কাজ করেছেন। এ সাধনায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ভাবনারও সম্মিলন ঘটেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Dr. Mohd. Moin. *A Persian Dictionary*, Vol. V proper Names, Tehran, 1978, P. 37
২. শাহ্ মোহাম্মদ সাগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, সম্পাদনা ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা, পৃ. ৬৭
৩. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *কল্লোলের কাল*, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ. ১-২
৪. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮ কলকাতা
৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৬. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯
৭. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৮. বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, কলকাতা
৯. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *কল্লোলের কাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
১০. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৯৬
১১. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
১২. বিষ্ণু বসু ও অশোক কুমার মিত্র (সম্পাদিত) *ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই*, কলকাতা ১৯৯৭, পৃ. ২৯
১৩. বিষ্ণু বসু ও অশোক কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
১৪. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
১৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
১৬. Buddha Deve Bose, *Nazrul and Modern Bengali Music*, New Volumes, Calcutta, 1949
দ্র. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *নজরুল ইসলাম*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৪৩
১৭. আজাহারউদ্দিন খান, *বাংলা সাহিত্য* নজরুল, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৬৯, পৃ. ২৪০
১৮. ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ বনগাঁ চতুর্থ বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।
দ্র. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাসম্ভার*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ., ২৯৫
১৯. গোলাম মুরশিদ, নজরুল জীবন; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা, ১৯৬৯
২০. আজাহারউদ্দিন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, কলকাতা, পৃ. ২৪৫
২১. মুহম্মদ মুনসুরউদ্দিনের *হারামণির ভূমিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, কলকাতা।

সমকালীন সাহিত্যে বাউলগানের প্রভাব

উপমহাদেশে বাউলসুফিদের আগমনের ফলে এদেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি যে নতুন অবয়ব লাভ করেছিল এবং তার ফলে যে বাউল ধর্ম ও সাধনার বিকাশ ঘটে, তা পরবর্তীকালে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। চতুর্দশ শতকে লেখা শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থে তার পরিচয় রয়েছে। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, হিন্দি সাহিত্যেও বাউলসুফিদের 'বাউর' এবং 'বাউরা' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কবীর ছিলেন এমনি একজন বাউলসাধক। তার, পরবর্তী কোনো বাউল সাধকের নাম তেমন জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকে বাউলসাধক হিসেবে লালন ফকিরের নাম জানা যায়। তবে এই সময় শুধু লোকসাহিত্য এবং সংগীতেই যে বাউলের প্রভাব পড়েছে তা নয়, লিখিত সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে।

বলেছি, বাউলসাধনা সুফিসাধনার মতো উদার মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাধনায় স্রষ্টা-প্রেম মানবীয় প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে। সম্পর্ক হয়েছে বন্ধুত্বের। তাই ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগই এই প্রেমের ভিত্তি। স্রষ্টার নিরাকারত্ব বাউলের মনের মানুষের মধ্যে কখনও সাকারত্ব পেয়েছে, কখনও তা নিরাকারই থেকেছে। এ থেকেই বাউলের পরকীয়া সাধনার ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। বাউলের ধর্মসাধনার সঙ্গে বেদান্ত উপনিষদের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগের পরিচয় আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি। বাউল অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে জাতিভেদে আচ্ছন্ন সমাজকে যে শুধু আঘাতই করেছে তা নয়, জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বিত্তহীন, কুলটা, বিধবা এবং 'অসামাজিক' বলে কথিত মন্ত্রহীন, ব্রাত্যদের নিয়ে এক নতুন সমাজ গঠন করেছে। এই সময়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ করে খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রেমবাদ এবং মানুষকেই ঈশ্বরারোপ করার প্রবণতা বাউলধর্ম ও সাধনায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পারস্যে সুফিসাধনার প্রারম্ভেই এই প্রভাব লক্ষ করা যায়। পুনরায় তা এদেশে বাউলসাধনার মধ্যে তার শেকড় গভীরভাবে প্রবিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। নিম্নে কয়েকজন সমকালীন কবি-সাহিত্যিকের উপর বাউলপ্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

বাউলের এই মতাদর্শ, বিশেষ করে তার মানবতাবাদ ও সমন্বয়-চেতনা (Syncretism) ঊনবিংশ শতকের অনেক সমাজসংস্কারক ও বিদ্বজ্জনকে প্রভাবিত করেছিল। রামমোহন রায় প্রণীত 'তুহফাতুল মুয়াহিদিন' নামে একটি গ্রন্থে এই ভাব-ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে রামমোহন, ইসলামের মানবতাবাদ ও একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি আরবি-ফারসিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার ধর্মবিশ্বাস মূলত বেদান্ত-আশ্রিত। তিনি উপনিষদের দর্শনকেই নিজের দর্শন বলে ভাবেন। কিন্তু তিনি তান্ত্রিক আচার-আচরণকেও উপেক্ষা করেননি। এসবের একটি প্রতিফলন তার রচিত গ্রন্থ 'তুহফাত'-এ পড়া স্বভাবিক। বাউলমতের সঙ্গে রামমোহনের চিন্তা-চেতনার যে মিল কেউ কেউ এখানে লক্ষ করেছেন তা বেদকে অস্বীকার করার মনোবৃত্তির কারণে ঘটেছিল।

বাউলসাধকেরা ছিলেন সর্বসংস্কারমুক্ত এবং মানবতাবাদী। রামমোহন যে ধর্মসংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার মর্মমূলে নিঃসন্দেহে বাউলসুফি সাধনার প্রভাব ছিল। প্রথম যৌবনে তিনি একেশ্বরবাদভিত্তিক একটি ফারসি সুফিগ্রন্থ রচনা করেন। কলকাতা থেকে একটি ফারসি সাময়িক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি হাফিজ, জুনায়েদ, মনসুর হাল্লাজ ও ওমর খৈয়ামের অনুসারী ছিলেন। তিনি 'বেদ' অপেক্ষা 'বেদান্ত' বা 'উপনিষদ'কে অধিক গুরুত্ব দিতেন। তার 'বেদান্ত গ্রন্থ' 'বেদান্ত সার' এবং উপনিষদের অনুবাদ তার অসাধারণ মুক্ত মনের পরিচয় বহন করে। তবে এসব কর্মকাণ্ডে বাউলসুফি সাধনা ও তাদের বিরচিত 'সামা সংগীত' রামমোহনের মনে গভীর রেখাপাত করে। বস্তুত তার ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের প্রবণতার মূলে নিঃসন্দেহে বাউলদর্শন প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছিল। রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্মসংগীত' গ্রন্থে বাউলের প্রভাব আছে। যেমন :

কে ভুলালো হায়
কল্পনারে সত্যি করি জানো একি দায়।
আপনি গড়ছ যাকে
... ...
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার
ক্ষণেক স্থাপহ তারে ক্ষণেক সংহার।
প্রভু বলে মানো যারে
সম্মুখে নাচাও তারে
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

রামমোহন রায় এই গানটি তার সমকালীন বাউলসাধক লালন ফকিরের একটি গানের অনুকরণে রচনা করেন। বাউল লালন বলেন :

প্রতিমা গড়ায় ভাস্করে
ম'লে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে
আবার গুরু বলে তারে
এমন পাগল কে দেখেছে।
মাটির পুতুল গড়ে নাচায়
একবার মারে একবার বাঁচায়
সাঁই যেন স্বয়ং হ'তে চায়
লালন কয় তার সকল মিছে।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম অনেকাংশেই সুফিবাউলের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফসল। ব্রাহ্মধর্মে মানুষই প্রধান। সুফিধর্মসাধনার মতো সর্বধর্মের নির্যাস নিয়েই এই ধর্ম গড়ে উঠেছে এবং সে কারণেই রামমোহনের সঙ্গে বাউল চেতনার মিল হয়েছে। রামামোহন ও লালন ফকির সমসাময়িক।

দেবেন্দ্রনাথ

রামমোহনের মতো দেবেন্দ্রনাথও উপনিষদ এবং সুফিপ্রেম-সাধনার মধ্যে যে ঐকমত্য লক্ষ করেন তা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। উপনিষদ ও সুফিসাধনার প্রতি রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যে গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন তা তার পিতার কারণেই। বাউলের গানে উপনিষদ এবং সুফিধর্মের এই সমন্বয় লক্ষ করে তাই তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের শিষ্য রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ ফারসি পড়েছিলেন এবং সে ভাষায় তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পারস্যের সুফিকবি হাফিজ এবং অন্য সুফিকবিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, এই সাধকেরা অধ্যাত্মসাধনায় ভক্তি অপেক্ষা প্রেম বা 'অনুরাগ'কে অবলম্বন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সুফিদের এই ভাবনাকেই গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মে সুফিবাদের প্রেম দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ ও কবি হাফিজের দর্শনের মধ্যে একটি বড় রকমের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তার ধর্মবোধ এবং অধ্যাত্মচিন্তায় উপনিষদ ও কবি হাফিজের প্রভাব গভীরভাবে শিকড় গেড়েছিল। অজিতকুমার চক্রবর্তী তার সম্পর্কে বলেন : "হাফিজের সংগীত ব্যতীত, ধর্মগ্রন্থ নয় এমন অপর কোনো গ্রন্থকে মানুষ এত অধিক পরিমাণে জীবনের সঙ্গীরূপে সযত্নে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন কি না সন্দেহ।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী) : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পৃ. ৭০৬)। এর অন্যতম কারণ দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের বহু বাণীর মধ্যেই হাফিজের 'দিওয়ান' কাব্যগ্রন্থের

ভাবনা ও চিন্তাচেতনার অপূর্ব মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং অনেকাংশে উপনিষদ থেকে হাফিজের বাণীই তাকে গভীরভাবে প্রাণিত করেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হাফিজের এই অধ্যাত্মচেতনা তৎকালীন 'বা-আল' সুফি সাধকদের ধ্যানধারণার প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। হাফিজ তথা সুফিসাহিত্যের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের এই গভীর অনুরাগ রামমোহন থেকেই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথে।

ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরগুপ্তের পরিচিতি একজন ব্যঙ্গ কবিতা এবং প্যারোডি রচয়িতা হিসেবে হলেও মূলত তার প্রতিভা ছিল একজন লোকগীতিকারের। তার কবিতা ও গানের বৈশিষ্ট্য ছিল অধ্যাত্মচেতনামূলক এবং সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ক ও প্রেমরসাত্মক। তিনি বাউলপদ অনুসারে অনেক গান রচনা করেছেন। তিনি লালন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। এই সময় দ্বিজ নরেশচন্দ্র বা নরচন্দ্র নামে একজন বাউল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঈশ্বরগুপ্ত এসব বাউলের আচার-আচরণ এবং দর্শনের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। বাউলগানভিত্তিক নিম্নের প্যারোডি তার রসবোধের পরিচয় বহন করে :

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোয়ানো ভার
হোলো পুন্নিমাতে অমাবস্যা তেরোপহর অন্ধকার।
এসে বেন্দাবনে চলে গেল, রামী বোষ্টমী
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম অষ্টমী।
আর ভাদ্দর মাসের সাতই পোষে, চড়ক পূজার দিন এবার।
সেই ময়রা মাগী মরে গেল, মেরে বুকে শূল
বামুনগুলো ঔষুধ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল বিষ্টি জলে ছিষ্টি ভেবে, পুড়ে হোলো ছারে খার।
ঐ সুজ্জিমামা পূব্বুদিগে অস্ত চলে যায়,
উত্তুর দখিন কোণ থেকে আজ, বাতাস লাগছে গায়
সেই রাজার বাড়ির টাটু ঘোড়া, শিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী, ধোপাস্বামী হাসতেছে কেমন
এক বাপের বোটেতে এরা জন্মেছে কজন
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশী ধামে হাহাকার।

এখানে উল্লেখ্য যে, সংস্কারবাদী মানুষ বাউলসাধনা ও তাদের যৌনচারমূলক জীবনাচরণকে সমাজবিরোধী মনে করায় সমাজে বাউলেরা অনেকটা একঘরে হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের গান সমাজকে যে দারুণভাবে প্রভাবিত করে, উপরের গানটি তার নিদর্শন।

বিহারীলাল (১৮৩৫-১৮৯৪)

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বিহারীলাল বাউলগান দ্বারা অধিক প্রভাবিত হন। তার শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদামঙ্গল' (১২৮৬) গ্রন্থে বাউলের এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিহারীলাল ছিলেন লালন ফকিরের সমসাময়িক। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে কবি তার কাব্যলক্ষ্মীকে পরিপূর্ণরূপে না-পাওয়ায় এক গভীর বেদনাবোধ তাঁকে নিয়ত পীড়িত করে তোলে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রতি সর্গেই কবির বিরহবিধুর মনের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। কখনও তিনি তার কাব্যলক্ষ্মী এবং আনন্দলক্ষ্মীর হঠাৎ আবির্ভাবে উচ্চকিত, কখনও তাঁকে হারানোর ব্যথায় তিনি মুহ্যমান :

কোথা সে প্রাণের পাখি
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি
আর কেন গান কোরে ডাকে না আমায়।

এই অভিজ্ঞতা অনেকটা বাউলের অভিজ্ঞতা।

বিহারীলাল একজন সংগীতজ্ঞ হিসেবে তার কালে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি 'সংগীত শতক' (১২৬৯ সাল) নামে একটি সংগীতগ্রন্থও রচনা করেন। এ সময় তিনি বৈষ্ণবপদাবলী এবং বাউলগান দ্বারা প্রভাবিত হন। বিহারীলালের এই গান সংগীতজগতে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করে। বিহারীলালের গান ও কাব্য ঠাকুরপরিবারের সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিহারীলালের গানের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথ তার ছেলেবেলা থেকেই বিহারীলালের গানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। বিহারীলালের প্রতিভায় বাউলের অনেকটা উদাসী এবং বিরহী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'বাউল বিংশতি' নামে তার লেখা একটি বাউলগানের সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি গান লালন শাহের জীবদ্দশায় ১২৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। এ থেকে অনুমিত হয় যে, বাউল এবং লালনের গান সম্পর্কে হয়তো তিনি অবহিত ছিলেন।

সে দুটি নয়ন!
জীবন আমার
ত্রিভুবন হাসিতেছে কিরণে তাহার
সে সুধাংশু করি পান
জুড়ায়েছে মনপ্রাণ
হেসে খেলে বলে যায় ভাবনা কী তার!
সে জন্য এখানে আসা
পরিপূর্ণ সে পিপাসা;
রুধিয়া অন্যের আশা থাকিব না আর
বেশি থাকিব না আর

বিহারীলালের এই বাউলগান লিরিকধর্মী। এখানে বাউলের মনের মানুষের একটি পরিচয় আছে। এই মনের মানুষ বাউলের প্রেমাস্পদ, জীবনদেবতা। আবার তাকেই বাউল অচিনপাখি রূপেও কল্পনা করেছে। দেহের খাঁচায় এই অচিন পাখি আসা-যাওয়া করে, কিন্তু তাকে ধরা যায় না। এই না-পাওয়ার বেদনা বাউলের মনে তীব্র হয়ে বাজে। বিহারীলালের মনেও বাউলের এই ভাবনা বিরাজ করেছিল।

বিহারীলাল তার একটি কবিতায় এমনিভাবে বলেন :

তোমারি এ রূপরাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি...
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাষিত আপনি।

প্রকৃত অর্থে বাউলগানের 'মনের মানুষ তত্ত্ব' কবি-সাহিত্যিকদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথে এই ধারণা তার সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে একটি পরিশীলিত রূপ গ্রহণ করে। বাউলের এই মনের মানুষের উৎস, বলা যেতে পারে, সুফিকবিদের রচনায় পাওয়া যায়। দেওয়ান হাফিজ সর্বপ্রথম অচিন পাখি সম্পর্কে তার রচনায় 'আন্‌কা' শব্দটি ব্যবহার করেন। কবি ইকবাল তার *The Development of Metaphysics in Persia* গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। ওমর খৈয়ামও তার অসংখ্য রুবাইয়াত ও সামা সংগীতে এই মনের মানুষের উল্লেখ করেছেন। বাউলের মনে এই রোমান্টিক চেতনার উদ্ভব পারস্য কবিদের প্রভাবেই সংঘটিত। বিহারীলালও সেই একই ধারার অনুসারী। তিনি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ফারসি কাব্যধারার একজন বিদগ্ধ পাঠক এবং রসসাধক ছিলেন। বিহারীলাল তার 'সারদামঙ্গল' কাব্যে এই মনের মানুষের প্রতীক তার অন্তরবাসিনী কাব্যশ্রীকে অন্তর বাহিরে বিচিত্র কল্পনায় উপলব্ধি করেছেন।

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার একজন সাংবাদিক ও কবি ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ আমলে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি পত্রিকা ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠা করেন। বলা যেতে পারে, গ্রামীণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কবিতা, উপন্যাস, নাটক এবং সংগীত রচয়িতা ছিলেন। সংগীত রচনার ক্ষেত্রে তিনি তৎকালে বাউলসাধক লালন শাহ কর্তৃক অধিক প্রভাবিত হন। তার জীবদ্দশায় লালন শাহের গান যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

কারো কারো মতে লালন ফকিরের সঙ্গে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের সাক্ষাৎ হয়েছিল তার নিজ বাড়ি কুমারখালী শহরে। লালন শাহ তাকে বেশ কয়েকটি বাউলগান শুনিয়েছিলেন। লালন শাহের গান শুনে হরিনাথ তার অনুকরণে ফিকির চাঁদ ফকির ছদ্মনামে বাউলগান রচনা করেন এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীর মশাররফ হোসেন, প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে নিয়ে ফিকির চাঁদ ফকিরের দল নামে একটি বাউলগানের দলও গঠন করেন ১৮৮০ সালে। হরিনাথ যেসব বাউলগান রচনা করেন, তা পরবর্তীকালে কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ ফকিরের 'বাউলসংগীত' নামে প্রকাশিত হয়। হরিনাথ সাংবাদিক হওয়ার কারণে তার ফিকির চাঁদ বিরচিত গান বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার বাউলসাধক ছিলেন না, কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি লালন শাহের গানের অনুকরণে বাউলপদ রচনা করতে সক্ষম হন। তবে তার গানে তৎকালীন সামাজিক চিত্র বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হরিনাথ শিক্ষিত ছিলেন এবং কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন বিধায় তার পক্ষে বাউলদের ঢঙে গান লেখা সহজ হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও লালন শাহ এবং অন্যান্য বাউল পদকর্তাদের রচনায় যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য, উপমা, উৎপ্রেক্ষার প্রকাশ দেখি; ফিকির চাঁদের গানে তেমনটি দেখা যায় না। তার বাউলগানগুলো যে কোনো লোককবির রচনানুগ নয়—পাঠকমাত্র তা বুঝতে সক্ষম। তথাপি বলা যায় যে, হরিনাথ একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন এবং তার রচিত বাউলগান সে সময়ে সমাজজীবনের একটি প্রতিবাদী চিত্র তুলে ধরেছে। এসব গানে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, তার মধ্যেও সাহিত্যরসের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

নিম্নে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার 'ফিকির চাঁদ ফকির' নামে যেসব বাউলগান রচনা করেন তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হলো :

১

ভোলা মন, কী করিতে কী করিলি
সুধা বলে গরল খেলি।
সংসারে সোনারখনি পরশমণি
রতন মণি না চিনিলি
কী বলে অবহেলে সোনা ফেলে
আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস ছুটে
লোভের মুটে তুই কেবলি
না বুঝে তেতো মিঠে, খুঁটে খুঁটে
ভেবে মিঠে মিঠে নিলি।

না বুঝে ভালো মন্দ, এমনি অন্ধ
পাপের ফন্দ গলায় দিলি
পাশরি পরমার্থ, পুরুষত্ব
তুচ্ছ ভ্রমে মজে রলি।
ফিকির চাঁদ ফকির বলে, গেলি ভুলে
যা করতে ভবে এলি,
এ জগৎ চিন্তামণি আছেন যিনি
তায় না চিনে মাটি হলি ॥

২

যোগ সাধিতে হবে না তার বিড়ম্বনা
অধর চাঁদকে খুঁজে চিনে নে না।

৩

যদি বসে যোগাসনে অধর চাঁদের সনে,
পার রে করিতে যোগ সাধনা।
হয়ে অচল অটল (মনরে) থাকিলে কেবল
তুমি পাবে পরশ, হবে সোনা
(এই অসার ভবে)

৪

ওরে যদি মহা যোগে ব'সো মনোযোগে
হইবে সাধন তোর কামনা।
ও তোর কিসের ভাবনা (মনরে) উজান ধর না,
তরে যাবি পাবি নে যাতনা (ভব পরপারে)

৫

ফিকির চাঁদ বলে, মনঃ কুতূহলে
কেন কর এত আনাগোনা।
ও তুই, বিষয় প্রলোভনে
(মনরে) কখনো টলিস নে,
শির সিতে কর যোজনা ॥
(সেই তো উজান ধরা)

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার এসব বাউলগানে অনুপ্রাসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাউলগান অপেক্ষা 'ধুয়া' এবং 'শব্দ' গানে অনুপ্রাসের প্রয়োগ বেশি লক্ষ করা যায়। পাগলা কানাই-এর গান অনুসারে ফিকির চাঁদ ফকির বা হরিনাথ মজুমদার। উল্লেখ্য, কাঙ্গাল হরিনাথ পাগলা কানাই-এরও সমসাময়িক ছিলেন। মীর মশাররফ তার গুরু হরিনাথ মজুমদারের বাউলগানের প্রশংসা করে সে সময়ে লেখেন :

ফিকির চাঁদে, আজব চাঁদে, রসিক চাঁদে সব মেতেছে।
কোথা আর পাগলা কানাই, লালন গোঁসাই
সব সাঁই এতে হার মেনেছে ॥

উল্লেখ্য, মীর মশাররফ হোসেনের বাউলগান রচনার ধারা হরিনাথ মজুমদারের অনুরূপ।

হরিনাথ মজুমদারের রচনায় বাউলগানের প্রভাব উল্লেখ করে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন :

> ঊনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে কয়েকজন শখের বাউলের উদ্ভব হয়। ইঁহারা বাউলগানের ছন্দ ও সুরে সাধারণ ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি, পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ, সংসারের অনিত্যতা, প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্ত হইবার নীতিকথা বাউলদের অনুকরণে, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া গান রচনা করিয়াছেন... এরূপ বাউলগান রচয়িতাদের মধ্যে কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার ও পাবনার গোলকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার অতঃপর তার সমকালে কয়েকটি লোকধর্ম সম্পর্কে তার পত্রিকা 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় নানা বিবরণ প্রকাশ করেছেন। এইসব লোকধর্ম অনুসারীদেরকে তিনি বৈরাগী সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেন। যেমন : ১. নেড়া, ২. বাউল, ৩. দরবেশ, ৪. সহজিয়া, ৫. কর্তাভজা, ৬. প্রেমভক্ত বা প্রেমভজা, ৭. গুরু সত্য, ৮. আঁখড়াধারী গৃহস্থ।

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় উপর্যুক্ত লোকধর্মের নানা কদর্য, বীভৎস এবং যৌনাচারিতামূলক কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পত্রিকায় বাউলদেরকে 'বায়ুল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কাঙ্গাল হরিনাথ উল্লেখ করেন যে, উপর্যুক্ত সুফি ফকিরেরা হিন্দু-মুসলমান জাত মানেননি এবং তাঁদের সান্নিধ্যে এসে অনেক হিন্দু-মুসলমান রোগমুক্ত হয়েছেন। উল্লিখিত ফকিরগণ কুমারখালী সন্নিকটস্থ বাটিকামারা গ্রামে অবস্থিত দুর্গাবাড়িতে বসবাস ও সাধন ভজন করতেন। এসব ফকিরদের সাধনায় হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মাচরণের সমন্বিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের প্রিয় থাকায় দুর্গাবাড়িতে তাদের অবস্থানের বিষয়ে কেউ কখনও প্রতিবাদ করেনি। কাঙ্গাল হরিনাথ এ বিষয়ে তার গ্রন্থে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি সোনাবন্ধু নামে একজন সাধকের বর্ণনা দিয়েছেন তার গ্রন্থে। এই সাধক জাতিতে হিন্দু কিন্তু তিনি জনৈক সোনাউল্লাহ ফকিরের বন্ধু ছিলেন বিধায় তার মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। অদ্যাবধি এই সমাধি সোনাবন্ধুর দর্গা নামে খ্যাত।

আমরা আশ্চর্য হই, কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার বিভিন্ন লোকধর্ম এবং লালন ফকির ও তার সম্প্রদায় সম্পর্কে নানা বিরূপ এবং বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে লালন শাহের গানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তার গান স্বকর্ণে শুনবার পর তিনি 'ফিকির চাঁদ ফকির' ছদ্মনামে গ্রহণ করে প্রচুর বাউলগান রচনা করেন এবং একটি সংগীত দল গঠন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কাঙ্গাল হরিনাথ বাউলগান রচনা করার আগেই তার দুই শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং প্রফুল্লচন্দ্র বাউলগান রচনা করে কাঙ্গালকে উপহার দেন। হরিনাথ তার এই দুই শিষ্যের লেখা বাউলগান পাঠ করে নিজেই বাউলগান রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হন এবং 'ফিকির চাঁদ ফকিরের দল' নামে একটি গানের দল গঠন করেন। এ সম্পর্কে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার তার 'দিনপঞ্জি'তে উল্লেখ করেন :

> শ্রীমান অক্ষয় ও শ্রীমান প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য পাইলাম তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এভাবে সত্য জ্ঞান ও প্রেম সাধনাতত্ত্ব প্রচার করিলে, পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে। অতএব কতিপয় গান রচনার দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেম সাধনের উপায়স্বরূপ পরমার্থ পথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকির চাঁদের আগে 'কাঙ্গাল' নাম দিয়া দলের নাম 'কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ' রাখিয়া তদানুসারে গীতাবলীর নাম করিলাম। (জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪)

বলেছি, বাংলা ১২৮৭ সালে ফিকির চাঁদ ফকিরের বাউলগানের দল গঠিত হয়। এর ১০ বৎসর পর ১২৯৭ সালে লালন শাহ ছেঁউড়িয়া গ্রামে তার আখড়াবাড়িতে পরলোকগমন করেন। ফিকির চাঁদ বিরচিত বাউলগান হরিনাথ মজুমদার প্রণীত 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' 'মাতৃমহিমা' প্রভৃতি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ'-এর দ্বিতীয় ভাগ, দশম সংখ্যায় এক আলোচনার পাদটীকায় হরিনাথ উল্লেখ করেন : "নূরনবী হজরৎ মহম্মদের পর মোশল্মানকুলে আর কোন ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেহ পাছে এরূপ মনে করেন, সেই আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি যে, মহম্মদের পর অনেক ভক্ত মোশল্মানকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। অনেক ভক্ত ফকিরের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছে।..."

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া বিভাগের নিকটবর্তী ঘোড়াই গ্রামে লালন শাহ নামে যে ফকির বাস করেন, তিনিও পরম ভক্তযোগী। তার গুরু সিরাজ সাঁই সিদ্ধযোগী ছিলেন। হরিনাথ মজুমদার বর্ণিত 'ঘোড়াই' গ্রাম বর্তমানে আর নেই। ছেঁউড়িয়া গ্রামের উত্তরপাশে গড়াই নদীর সংলগ্ন নদীর পাড়টি বর্তমানে 'ঘোড়াই ঘাট' নামে পরিচিত। আমরা আশ্চর্য হই। হরিনাথ আখড়াবাড়ি সম্পর্কে কোনো কিছু না বলে তাকে সরাসরি ঘোড়াই গ্রামের অধিবাসী হিসেবে উল্লেখ করলেন। তবে কি ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালনের আখড়াবাড়ি সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না?

যাহোক লালন শাহ ছেঁউড়িয়া গ্রামে বসবাস করতেন এবং এখানেই তার মৃত্যু হয়েছিল। এই গ্রামে তার আখড়াবাড়িতে তার মাজার রয়েছে।

তবে হরিনাথ মজুমদারের 'ফিকির চাঁদ' ফকিরের গান সেসময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এ সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে বলেন :

> আমরা যখন সিলাইদহে ছিলুম তখন রোজ আমাদের বোটে সেখানকার গ্রাম্য গাইয়েদের আমদানী হত। তার মধ্যে দু'জন আমাদের মার্কা মারা হয়ে পড়েছিল। একজন বঙ্কম সে কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের গান গাইত, আর একজন নেড়ে এবং বাচ্চা–তার গান নানারকম। তার নাম সুনাউল্লা।"

বলেন্দ্রনাথ এই বিবরণ লিখেছিলেন ১২৯৬, ইং ১৮৮৯ সালে। তখন তার বয়স উনিশ বছর। এই ১৮৮৯ সালে ৫ মে পদ্মাবোটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালন শাহের একটি স্কেচ এঁকেছিলেন।

যাহোক এসব থেকে বোঝা যায় যে, সে সময়ে ফিকির চাঁদের গানও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

মীর মশাররফ হোসেন মূলত গদ্যশিল্পী। কিন্তু তিনি আত্মজীবনীমূলক রচনা, উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদির পাশাপাশি কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তার সংগীতের একটি বিশেষ অংশ বাউলগান। মীর মশাররফ কুমারখালী থানার অন্তর্গত চাপড়া ইউনিয়ন অধীন লাহিনীপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ছেঁউড়িয়া লাহিনীপাড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং একই ইউনিয়ন ও থানার অর্ন্তগত ছিল। মীর মশাররফ হোসেনের বাউলগান রচনার মূলে ছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার। 'ফিকির চাঁদ ফকিরের দল' নামে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের যে সংগীতদল ছিল, মীর মশাররফ হোসেন তাদের প্রয়োজনে গান রচনা করেছিলেন। 'সংগীত লহরী' নামে তার একটি গানের সংকলনে বাউলপদের বেশ কয়েকটি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে মীর মশাররফ স্মৃতি সংসদের সম্পাদক থাকাকালে লাহিনীপাড়া গ্রামে আশি বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধের নিকট থেকে মীর মশাররফ লিখিত একটি বাউলগান সংগ্রহ করি। গানটি নিম্নরূপ :

ওরে মন আমার আমার সব ফাঁককিকার
কেবল তোমার নামটি রবে।
হবে সব লীলা সাঙ্গ সোনার অঙ্গ
ধুলায় গড়াগড়ি যাবে ॥
রবে না দিন চিরদিন সুদিন কুদিন
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে ॥

ওরে তোর আত্মীয় স্বজন ভাই পরিজন
হায় হায় করে কাঁদবে সবে ॥
তারা সব পাবে ব্যথা ভাঙবে মাথা
তবু তুমি কথা না কহিবে ॥
ওরে মন টাকা কড়ি ঘর বাড়ি
জুড়ি গাড়ি পড়ে রবে ॥
ওরে তোর হাত থাকিতে পা রহিতে
পরের কাঁধে যেতে হবে ॥
ওরে মন করে হেলা গেল বেলা
সন্ধ্যা বেলা আর কি হবে ॥
ওরে তোর এক পলকে তিন পলকে
সকল আশা মিটে যাবে ॥
জগতের কারণ যিনি দয়ার গণি
তিনি মশার ভরসা হবে ॥

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে মীর মশাররফ রচিত বাউলগান তৎকালীন সমাজের প্রচলিত 'ধুয়া' ও 'শব্দ' গানের অনুরূপ ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের গানেও সেই একই ধারা অনুসৃত হয়েছে। মীর মশাররফের বাউলগানের আরও কিছু উদাহরণ :

মিছে ভাই জাতির বিচার আচার-ব্যাভার
মিছেরে এই দুনিয়াদারি।
... ...
দেখ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মুসা, ঈসা
নানক, নিতাই জটাধারী।
ওরে ভাই অন্নপূর্ণা, বিবি ফাতেমা
মোহাম্মদ পয়দা তাঁরি
... ...
আরে নাই ভেদাভেদ, বর্ণ বিভেদ
কিছু প্রভেদ কাছে তারি।
মশা কয় ধোঁকায় পড়ে বোকা হয়ে
করি আমরা মারামারি।

মীর মশাররফ হোসেনও কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের শিষ্য হিসেবে তার রচিত বাউলগানে গুরুকীর্তন করেছেন। তিনি বলেছেন যে সময়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা লালন শাহ পাগল কানাই হরিনাথের ফিকির চাঁদ ফকিরের দলের কাছে হার মেনেছে।

আরে ভাই না পাই দিশে, কলির শেষে
কিসে কার মন মেতেছে
ফিকির চাঁদে আজব চাঁদে
কোথা আর পাগলা কানাই লালন গোঁসাই
সব সাঁই এতে হার মেনেছে।

এখানে বলা প্রয়োজন, বাউলসাধক লালন শাহের গানে যে তত্ত্বকথা, চমৎকার উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীক সহযোগে অসাধারণ ছন্দ কৌশলে লিখিত হয়েছে এবং এসব গানের যে গভীরতা ও জীবনদর্শন রয়েছে কাঙ্গাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ বিরচিত বাউলগানে তা পাওয়া যায় না। অনেকটা শখের বাউল হিসেবে হালকা আনন্দ দানের উদ্দেশ্যই এসব গান রচিত হয়েছিল। তথাপি এসব গানে সমাজের একটি চালচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

মীর মশাররফ নিজেও লালন শাহকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তার গান শুনেছিলেন। কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনে লালনের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে তাঁকে যে নতুন জীবনবোধের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়, তাতে তিনি এবং তার অনুসারীরা যে প্রভাবিত হয়ে পড়েন, উপর্যুক্ত বিবরণ তার যথার্থতা প্রমাণ করে।

মীর মশাররফ হোসেনের সমকালে কুষ্টিয়াতে অপর একজন কবি দাদ আলি (১৮৫২) বাউল ভাবনানুগ কিছু পদ ও গান রচনা করেন। তার সময়ে লালন শাহের গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। দাদ আলি নিজেও বাউল ও লালনের গান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেন। নিম্নে তার রচিত পদের উদাহরণ দেওয়া হলো :

তোমায় দেখব নয়ন ভরে
মনের মধ্যে গুমরে গুমরে
আশায় পাগল করলে মোরে
তাইতে এ সাগরতীরে।
আত্মীয়বন্ধু নানাজনে
কত যে করিলে মানা
এ পাগল মনে হেয় জ্ঞানে
কারো কথা শুনল না।
যার শিরে পড়ে টানা
সেই জানে কেমন যাতনা
শুধু মুখের কথা এ না।
সেই জানে যার বোঝা শিরে।
আড়াল থেকে থেকে থেকে
প্রেম ডোরেতে মার টান

... ...
কাজের বেলায় অন্তর্ধান
আমার জীবন যৌবন দেহ প্রাণ
সকলি ছিলাম তোমার করে ॥
তোমার কোমল হৃদয়
কঠিন হ'ল কেন এ পাপীর ভরে
পাপীর জন্য জন্ম তোমার
পুণ্যবানের জন্য নয় রে॥
পুণ্যের জোর থাকলে পরে
এতই চিৎকার করে
কখনও না ডাকতেম তোরে
ক্ষমা করো এ দাসে রে ॥

দাদ আলির পদাবলী ভক্তিতেই শুধু নয়, প্রেমরসেও পরিপূর্ণ। তিনি তার দেহমন সবই তার প্রেমাস্পদের প্রতি সমর্পণ করেছেন। তার গানে সুফিকবি ওমর খৈয়াম এবং রাবেয়া আদাবিয়ার অভিমানক্ষুব্ধ প্রাণের আকুতি ব্যক্তি হয়েছে।

আধুনিক কবিতায় বাউল চেতনা

বাউলসাধনার উদ্ভবকাল থেকেই বলা যেতে পারে বাউলগান এবং দর্শন সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে এসেছে। কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল বাউল ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হলেও রবীন্দ্রনাথে এই প্রভাব সমধিক। কিন্তু আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে বাউলচেতনার প্রেক্ষিত ভিন্নতর। বাউলসাধনার রহস্যময়তা আধুনিক কবিদের প্রাণিত করেছে। বাউলসাধনা নারী এবং পুরুষের যুগলসাধনা। এই সাধনা একান্ত করেই দেহনির্ভর। বাউলদের সাধনপ্রক্রিয়া আধুনিক কবিকে আকৃষ্ট করেনি। তার গানে ব্যবহৃত চিত্রকল্প এবং প্রতীকী শব্দসম্ভার আধুনিক কবিমনকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি। বাউলের চিত্রকল্প এবং প্রতীকী শব্দে শুধু যে কবিতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি বা তাকে শিল্পসুষমামণ্ডিত করার জন্যই–তা নয়; আধুনিক কবি এইসব প্রতীকী ভাবনার সাহায্যে বাউলের মতোই তার মনের কবিতাটিও ব্যক্ত করেছেন। সর্বোপরি বাউল যে-দর্শন প্রচার করেছে, আধুনিক কবি তাকেই স্বীকরণ করে নিয়েছেন। পার্থক্য কেবল প্রেক্ষিতের।

আধুনিক কবিদের ভাবনা বিচিত্রগামী। বর্তমান জীবনের জটিলতা, সংশয়, তাদের কাব্যে নানাভাবে রূপ নিয়েছে। তাদের এই ভাবনা—মনন, বুদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। কোনো একটি বিশেষ ভাবনা আধুনিক কবিদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। একজন কবির› কাছে সময়ের কোনো শেষ নেই—সময় অনন্ত। Time past, Time present, Time Future—কবির কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সময়ের একেকটি মণ্ডল মাত্র। এর সব মণ্ডলেই কবিকে বাস করতে হয়। কবির চৈতন্য এই অনন্ত সময়ের কাছে নিবেদিত। তার কাছে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্ত নেই–যেমন নেই তার ভালো লাগায়। একটি মুহূর্ত কেবল সময়ের অনন্ত আকাশে বিচিত্রতায় রঙিন হয়ে ওঠে এবং তখনই তা স্মরণীয় হয়। সময়চেতনার এই নতুন পরিমণ্ডলে কবি উদ্দীপ্ত হন। নিদারুণ সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও তখন তার হৃদয় বুঝি 'বিচূর্ণ পরমাণু'র আশ্চর্য উত্তাপে সতেজ :

প্রিয়তমা, এই দুঃখের কাঁটাঝোপে
রজনীগন্ধা নেই;
তবু তুমি ঘোরো ভাঙা বাগানের মাঠে
ফুলের সন্ধানেই?
আশাহীন, তবু কি আশায় দিন কাটে।

[শুধু এইটুকু : কৃষ্ণচূড়া : মণীন্দ্র রায়]

আধুনিক কবিতায় বাউলচেতনা এমনি এক মুহূর্তের আবিষ্কার—বাউলের oblique মনের সাথে আধুনিক কবির অন্বয়বোধ কবিতাকে এক আশ্চর্য গতিশীলতা দান করে। কবিতা তখন 'চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায়' উজ্জ্বল। আধুনিক কবিদের বাউলচেতনার মর্মমূলে এই সত্য বিরাজমান।

আধুনিক কবিদের হাতে সময়ের যে নতুন পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথে তার পরিচয় আছে। জীবনানন্দের[২] ভাষায় বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'সাহায্য ও ইঙ্গিত' পেয়ে আধুনিক কাব্যের 'ঈষৎ সূত্রপাত' আমরা লক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথ বাউল-ভাবনা দ্বারা আশৈশব প্রভাবিত। নিজেকে তিনি রবীন্দ্রবাউল বলতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু জীবনের যে দীর্ঘকাল তিনি বাউলের আটপৌরে ভাবনা দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিলেন, জীবনশেষে তার পরিমণ্ডল ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। 'শেষ সপ্তক'-এর তেরো নম্বর কবিতায় কবি তার মানসীকে লক্ষ করে বলেন :

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়।
দেখে অবুঝ মন বলে,
অধরাকে ধরেছি
তুমি তখন স্নানের পরে এলো চুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানালায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে চাওয়া চোখের পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন পরা নিটোল।
হাতের মধুরিমায়।
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে
জানলে না এই গানে তোমারই কথা।
তুমি রাগিণীর মতো আসো যাও
একতারার তারে তারে।

বাউলের অচিনপাখি বিরহবোধকে জাগ্রত করে। এই বিরহই তার আনন্দ-বিচ্ছেদে মিলন; 'আমার দুঃখ যেন আমার আনন্দ।' কবি তার নায়িকাকে বাউলের অচিনপাখির সাথে তুলনা করেন বলেন :

অচিন পাখি তুমি
মিলনের খাঁচায় থাকো
নানা সাজের খাঁচা
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়
চকিত ওড়ার মধ্যে
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।

কবি জানেন, 'অচিন ক্ষণিকের জন্য তার প্রেমের বন্ধনে ধরা দিলেও আবার সে মিলিয়ে যাবে' 'দোলনচাঁপার গন্ধে'—কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? কবি বলেন :

তাকে বেড়াই বুকে করে
ওতে রঙ লাগাই ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।

আধুনিক বাংলা কবিতা যে নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, রবীন্দ্রনাথে তার পরিচয়-চিহ্ন আমাদেরকে প্রাণিত করে, আমরা উদ্বুদ্ধ হই। জীবনানন্দ দাশ[৩] বলেছেন : "সময় ও পৃথিবী অভিজ্ঞতার আধার। কবিও সঞ্চয়ী। কিন্তু তার আনীত অভিজ্ঞতা কতখানি সার্বিক, কতখানি তার নিজের এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে কতদূর অপরের করে তুলতে পারা যায়, নিজের মূল্য জ্ঞানের চেতনায়—এ দায়িত্ব কবির।"

রবীন্দ্রনাথ সে দায়িত্ব সার্থকভাবেই পালন করেছেন। তিনি বাউলের অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে তা পুনরায় অপরের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করে তুলেছেন।

বাউলের মরমিয়াবাদকে একটি আধুনিক মহিলার বিচিত্রগামী ভালোবাসার প্রেক্ষিতে বুঝবার প্রয়াস নিঃসন্দেহে আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত। একদা যে রবীন্দ্রনাথ তার প্রিয়ার অদেহীরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন ঊষার কনকবর্ণে, সন্ধ্যার স্বর্ণালি মেঘমালায়, আধুনিক রবীন্দ্রনাথ তার দেহজ রূপকে অবলোকন করেছেন নানা চিত্রকল্পের মাধ্যমে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আধুনিক কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে প্রেরণালাভ, অতঃপর দেহজ কামনায় প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা। বুদ্ধদেব বসু তার নায়িকার মৌন মাধুর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বাউল ভাবনার সাহায্য নিয়েছেন।

মাঝ রাতে আজ বাতাস জেগেছে, শুনতে পাও
কঙ্কাবতী
এলো এলোমেলো ব্যাকুল বাউল উতল বাও,
কঙ্কাবতী।
... ...
হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ার বেহালাখানি
কঙ্কাবতী
জানালার কাছে হানা দেয় তার মনের বাণী
কঙ্কাবতী
কোন্ কথা কয়? তুমি কি শুনবে? শুনাব নাকি?
আধো বিস্ময় আধো সংশয়ে মেলবে আঁখি?
কঙ্কা জাগে

(সেরিনাড, কঙ্কাবতী/বুদ্ধদেব বসু)

বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতা-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি প্রেমের কবি। তার নায়িকা রক্ত-মাংসের নারী–অধিকাংশ আধুনিক কবির ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রযোজ্য। বাউলের প্রেম দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তা অবশেষে দেহাতীতে পৌঁছয়। তার মরমিয়তার সার্থকতা দেহজ ভালোবাসার–যেমনটি হয়েছে শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথে। বুদ্ধদেব বসুতেও সেই একই মনোভঙ্গি। তবে 'বাউলভাবনা' এখানে অনেকটা তাৎক্ষণিক চেতনার প্রতিফলন।

কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাউলভাবনাকে তাৎক্ষণিক চেতনায় আবিষ্কার করলেও তাকে একটি দর্শনের উপজীব্য বিষয় করে তুলতে প্রত্যাশী। বর্তমান যুগ—যন্ত্রণার পাশবিকতা থেকে মুক্তির অভিপ্রেত।

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাঁধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,
আহা, ভুলে গেলাম কী যেন তার গান।
প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি
গানের মতো প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা
সেই যে তার মরণাহত হাসি
ঝর্ণা জানো, তারি নাম তো বাঁচা।

(ঝর্ণাকে : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

এখানেও বাউল-ভাবনার অনুপ্রবেশ নারীপ্রেমের সহযাত্রী রূপে। কিন্তু বাউল-ভাবনাকে জীবনের সাথে একাত্ম করে দেখেছেন অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী নিজেও

মরমিয়া। তার কবিমানস বেশ জটিল এবং দ্বিধাবিভক্ত। তার মিস্টিক চেতনা বাউলের লৌকিক অধ্যাত্মবাদ-অনুসারী—পার্থক্য কেবল পরিমণ্ডলের।

পরাণ বাউল কয় গো–
কখন হাসি কখন কাঁদি জানাজানির নয় গো,
তুমিই জানো।
গহীন জলে লুকিয়ে চলে আমার জাগর চাঁদ
হারামণি, ওগো আমার মণি
ছলছলিয়ে কালো ঢেউএ উপচে পড়ে বাঁধ
অগাধ পূর্ণিমায়
কানায় কানায়।
ভাটার টানের কথা
বুকে ঢাকা রয় গো
তুমিই জানো।

তবে বলা যেতে পারে আধুনিক কবিতায় বাউলভাবনার কোনো ধারাবাহিকতা নেই। বৈশাখের নিরুদ্দিষ্ট মেঘের মতো এ ভাবনা একান্তই খণ্ডিত। আবু হেনা মোস্তফা কামাল তার একটি কবিতায় অনেক চিত্রকল্পের মধ্যে বাউল উপমাকেও উপজীব্য করেছেন।

জাতজন্ম কিছুই মানিনি; মানিনি কেবল তোকে
পাব বলে
অঙ্গে তুলে নিয়েছি গৈরিক, পথে পথে
পেতেছি বাসর শয্যা, দোতারায় তুলেছি গুঞ্জন আমি
'একদিনও না দেখলাম তারে...' তবু তুই
অধরা যোগিনী;

(বাংলা : আপন যৌবন বৈরী/আবু হেনা মোস্তফা কামাল)

এখানে নারীপ্রেম দেশপ্রেমে রূপান্তরিত। কিন্তু দেশও বুঝি কোনো ছলনাময়ী নারী—বাউলের অচিন পাখির মতো কেবলই যায় রং বদলায়। 'ধরতে গেলে পাওয়া যায় না তারে।' আবু হেনা মোস্তফা কামালের মতো হাসান হাফিজুর রহমানও পরিব্রাজক। কিন্তু আবু হেনার মতো তিনি স্বদেশকে একটি ছলনাময়ী নারীর প্রেমের সাথে তুলনা করেননি। তার কবিতায় বাউল-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঐতিহ্যের প্রীতিময়তাকে কেন্দ্র করে। তার কবিতায় বাউল কোনো প্রস্তাবিত বিষয় নয়। বাউল এখানে একটি 'সত্যের প্রাগঢ় শাঁস'। তার মতে কবিতা বস্তুকে বস্তুভাবে দেখে না। 'বস্তুর স্বরূপের সঙ্গেই তার যোগাযোগ, যেখানে সহস্র বস্তু বিভিন্ন পরম্পরায় অন্তর্গূঢ় সম্পর্কে লীন এবং যেখানে সত্য জন্ম নেয়।[৪]

হাসান হাফিজুর রহমান বলেন :

ইবনে বতুতা নই আমি, নই বার্নিয়ের
তবুও পর্যটক আমি এক আমারই স্বদেশে।
... ...
কিংখাবে মোড়া প্রাচীন পুঁথি সরবে মুখর
বাংলায় গরিমাতে। এখনো গানে ভেসে আসে
বাউলের সুর।

(স্বদেশে পরিব্রাজক : অন্তিম শরের মতো/হাসান হাফিজুর রহমান)

হাসানের কাছে অতীত বলে কিছু নেই। কারণ সময় তো অনন্ত। সব অতীত এককালের বর্তমান, সব বর্তমানই একদিন অতীত। কবির মনে অতীতের রোমন্থন ভবিষ্যৎকে সংলগ্ন করে। একটি বিশেষ মুহূর্ত অনন্ত হয়ে উঠেছে।

বাউল-ভাবনার একটি খণ্ডিত চিত্রকল্পের পরিচয় পাওয়া যায় হুমায়ুন কবিরের কণ্ঠেও। হুমায়ুনও বাউল-ভাবনাকে স্বাদেশিকতার চেতনায় বুঝতে চেয়েছেন।

একদিন জল ডাহুকের ডাকে শৈশবে তোমার ডাক
চিনেছিলাম। বিশ্বাস করিনি জলপ্রপাতের শব্দ
অন্ধকারের বেলাভূমি ঝিঁঝির শব্দের সাথে বেজে
উঠলে গরিব খালের শান্ত বাঁকে আমি অচিন সাধুর
নাম ধরে ব্যাকুল বাউল ডাক পাঠাল চারণ কথা,
ভেসে আসো, নিসর্গ সুন্দরী।

(রক্তের প্রতিবেশী জন্মভূমি : কুসুমিত ইস্পাত/হুমায়ুন কবির)

আমরা আশ্চর্য হই যখন দেখি আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হাসান হাফিজুর রহমান এবং হুমায়ুন কবির স্বদেশের বর্ণনায় বাউল চিত্রকল্পের ব্যবহার করেন। উল্লিখিত তিনজন কবির ভাবনার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টত প্রকাশ পেলেও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের চেতনার সহমর্মিতা এই সত্যের ইঙ্গিত বহন করে যে, তাদের ভাবনার জগৎ বিচিত্রগামী হলেও ঐতিহ্যের প্রীতিময়তা তাদের যোগাযোগের রহস্যময় সূত্রটি ধরে রেখেছে। এদের কাছে অতীত স্মৃতি হিসাবে সত্য এবং 'জীবন্ত'। কারণ এই ঐতিহ্যের সঙ্গে গোটা জাতির জীবনচর্চা, আশা-নিরাশার ইতিহাস জড়ানো। এই ঐতিহ্যের একটি ভিন্নতর বিশ্লেষণ লক্ষ করা যায় সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায়। তিনি বলেন :

আমিও বাংলার লোক, স্বভাবত বাংলার মতোই
সমতল, সংগীতের শস্যভারে নত, দূরগামী
পদ্মার মতোই ধীর, পলিমাটি আত্মার সঞ্চিত।

কিন্তু তাই বলে আমি নই জেনো আয়ুধ বঞ্চিত;
বর্ষার কোমল কাদা, পোড়ামাটি চৈত্রে সেই আমি।
লালনের দেশে জন্ম নিয়েছিল সিংহল বিজয়ী
এবং গোপালবাবু, পরিহাসে নির্মল বিশ্বাসী।
মনে আছে? এত দুঃখ বাংলাদেশে, তবু আমি হাসি।

(আমিও বাংলার লোক : প্রতিধ্বনিগণ/সৈয়দ শামসুল হক)

এখানে বলা যেতে পারে হাসান হাফিজুর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং হুমায়ুন কবিরের মতো সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায়ও বাউলভাবনার তাৎক্ষণিক প্রকাশ ঘটেছে। তবে এরা সকলেই ঐতিহ্য-সচেতন ছিলেন। এই ঐতিহ্য ব্যাপক অর্থে বাংলাদেশ। সৈয়দ শামসুল হক লালনকে প্রতিবাদী সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লালন এখানে সংগ্রামী পুরুষ। বাংলা এক বিদ্রোহের দেশ। এখানে উল্লেখ্য, আধুনিক কবিতা এক নতুনতর জীবনের প্রত্যাশী। আজকের সমাজ একটি ভিন্নতর পরিমণ্ডলে লালিত। 'যন্ত্রসভ্যতার অনেক ময়লা' তাকে কেবলি ঘোলাটে করেছে। বিষ্ণু দে-র ভাষায় : "আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা।"[৫] এডউইন হোনিগ একে বলেন, "A marriage between the modern life and traditional life"[৬] গারথিয়া লোরকাও লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে খোঁজ করেছিলেন তার কবিতার সুষমা। ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যাওয়া ব্যতিরেকে আর তো কোনো উপায় নেই। কারণ আমরা তো আজ মোটা মানুষ, ফাঁপা মানুষ। আমাদের জগৎ তো অনুর্বর, Waste Land বহির্জগৎ নিষ্ফলা মরুর-রূপ ধারণ করাতে কবিকে আজ ঐতিহ্য-সচেতন হতে হয়েছে, গড়ে নিতে হয়েছে এক 'অন্তর্লীন ধ্যানরাজ্য'। স্টিফেন স্পেন্ডার[৭] বর্তমান জগৎকে বলেন, A spiritually barren external world, তাই অতীতের রোমন্থন প্রয়োজন। টি.এস. এলিয়ট বলেন : The historical evidence involves a perception, not only of the pastenss of the past, but also of the present, বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীতকে জানা প্রয়োজন; ঐতিহ্য শুধু ঐতিহ্যের খাতিরে নয়—ত্রিকালকে মিলিয়ে নবতর অভিজ্ঞান লাভের জন্য।

এই ঐতিহ্যের পথ ধরে লালনের আবির্ভাব। ইতঃপূর্বে বাউলভাবনার যে তাৎক্ষণিক প্রকাশ লক্ষ করেছি, ক্রমে তা অখণ্ড চিত্রকল্পের জন্ম দিয়েছে। শামসুর রাহমানের একটি কবিতায় তিনি বলেন :

যখন তোমার বাহুর বাসরে
মগ্ন ছিলাম, চন্দ্রিত তন্দ্রায়,

আলো-আঁধারির চকিত সীমায়
লালনের গান দূর হতে এল ভেসে।
সে গানের ধ্বনি স্তব্ধ সায়রে
ফোটায় নিবিড় অজস্র শতদল।
ধুলোয় উধাও সে গানের কলি
গ্রাম-ছাড়া পথে মনের মানুষ খোঁজে
শৈশব গাঁথা জামতলা আর
কনক দুপুরে শ্রাবণ-দীঘির ডুব
ঘোর লাগা ভোর, অভিজ্ঞ সাঁঝ
সবি আছে বুঝি স্মৃতির আর্দ্রভূমে।
কে আসে ঘাসের স্তব্ধ সবুজে
নীরবে নগ্ন শুভ্র চরণ ফেলে
সে যে সেই গান স্পন্দনে যার
আঁধারেও চির মনের মুকুল জ্বলে।
... ...
সে গানের ধ্বনি ফিরে ফিরে আসে
মর্তজীবীর রঙিন ধুলোর পথে—
তারই মাধুর্যে ঋতুতে ঋতুতে
রৌদ্র ছায়ায় শান্ত বাগানে বাঁচি।
সে গান আমার বৈশাখী দিনে
যাত্রী প্রাণের তৃষ্ণার সরোবর।
তারই টানে চলি বাঁকা চোরা পথে
লালনের গান স্মৃতির দোসর সে যে ॥

(লালনের গান : রৌদ্র করোটিতে/শামসুর রাহমান)

আধুনিক বাংলা কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের তথা বাউলভাবনা অনেকটা সার্থকতা লাভ করেছে আল মাহমুদের কবিতায়। যদিও সর্বত্র বাউলভাবনা স্থান পায়নি, কিন্তু লোক-ঐতিহ্য, বলতে কি আল মাহমুদের মজ্জাগত। ঐতিহ্যসচেতনতায় তিনি ফররুখ আহমদের উত্তরসূরি। লোক-ঐতিহ্যে উজ্জীবিত হয়েছেন জীবননানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি, যারা আধুনিক কবিতাকে একটি স্থিতিশীলতা দান করেছেন। জীবনানন্দের কাছে 'বাংলা' একটি অনুবিশ্ব। তার সকল চেতনা জুড়ে বাংলা। তবে বাউল-ভাবনা জীবনানন্দে অনুপস্থিত নয়।

কে যেন ডাকিছে আকুল অলস উদাস বাঁশির সুরে
কোন্ দিগন্তে নির্জন কোন্ মৌন মায়াবীপুরে।

বাংলাদেশের তরুণ কবিদের মধ্যে কারো-কারো কবিতায় লোক-ঐতিহ্য প্রাখর্যতায় দীপ্তিমান। এক্ষেত্রে নির্মলেন্দু গুণ, আসাদ চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, সানাউল হক খান অন্যতম। তবে লোক-ঐতিহ্যে আল মাহমুদে যেমন মজ্জাগত, এমনটি অন্যদের নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লোক-ঐতিহ্য-উজ্জীবিত হলেও আল মাহমুদসহ তরুণ কবিদের রচনায় বাউল-ভাবনা বিরল আত্মপ্রকাশ। 'সোনালী কাবিনে'র ৬নং কবিতাংশে বাউল-ভাবনার প্রকাশ লক্ষণীয়। তবে এখানে আল মাহমুদ মার্কসীয় দর্শনকে কাব্যের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন এবং লোক-ঐতিহ্য ও বাউলভাবনা তার চেতনাপ্রবাহে একটি অন্বয় প্রতিষ্ঠিত করেছে :

মাৎস্যন্যায়ে সায় নেই, আমি কৌম সমাজের লোক
সরল সাম্যের ধ্বনি তুলি নারী তোমার নগরে,
কোন সামন্তের নামে কোনদিন রচিনি শোলোক
শোষকের খাড়া ঝোলে সেই নগ্ন মস্তকের পরে।
পূর্বপুরুষেরা কবে ছিলো কোন সম্রাটের দাস
বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়,
সেই অপবাদে আজও ফুঁসে ওঠে বঙ্গের বাতাস।
মুখ ঢাকে আলাওল–রোসাঙ্গের অশ্বের সোয়ার।
এর চেয়ে ভাল নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল?
আরশিনগরে খোঁজা বাস করে পড়শী যে জন
আমার মাথায় আজ চুড়ো করে বেঁধে দাও চুল
তুমি হও একতারা, আমি এক তরুণ লালন,
অবাঞ্ছিত ভক্তিরসে এ যাবৎ করেছি যে ভুল
সব শুদ্ধ করে নিয়ে তুমি নব্য কথার কূজন।

(সোনালী কাবিন/আল মাহমুদ)

আল মাহমুদের এক বিপরীতধর্মী বাউলচিত্রকল্প সংযোজন করেছেন আসাদ চৌধুরী তার একটি কবিতায়। তার ঐতিহ্যপ্রীতি অতিমাত্রায় নাগরিক।

লালনের সাথে দেখা হলো আরিচায়।
কুষ্টিয়ায় আমি তাঁকে কী খোঁজাখুঁজিই না করলাম।
লালনের কী এখনও ফেরিটেরির অসুবিধা আছে?
এ-রকমই হয় আজকাল।
একজন আরেক জায়গায় বসে আছেন।
কেন? কি বৃত্তান্ত?—জানি না।
মাঝখান থেকে আমার হয়রানি।
এখন কি আর এ-সব ভালো লাগে?

লোকে যাকে প্রতীক্ষা বলে
তাতে বিরক্তই হই।
কোনো বিস্ময় নেই প্রতীক্ষায়, না প্রতীক্ষার শেষে।
দুয়ার খোলাই থাকে–
ঘরে দেখা পাই না।
বাইরেও না–
অবশ্য বাইরের দুয়ার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাও নেই।
কুষ্টিয়ায় লালনকে এজন্যেই খুঁজেছিলাম। আর
না-খুঁজেই দেখা হয়েছিল আরিচা—পারঘাটে।

(বিস্ময় নেই প্রতীক্ষায়/আসাদ চৌধুরী)

কিন্তু আসাদ চৌধুরীর ব্যতিক্রমী চিন্তা সত্ত্বেও কোনো কোনো আধুনিক কবি জগৎ ও জীবনের প্রতি ভালোবাসার মায়া-বেষ্টনীর সাথে বাউলভাবনার সাযুজ্য খুঁজে পেতে চান। এমনই কবি সানাউল হক খান। তিনি বলেন :

লালনের সেই চোর এসে প্রতিদিন হাত রাখে
আমার খাঁচায়
আমি তার স্বভাবে আপ্লুত হই আপন বিভুঁইয়ে
যেন বা ভাগ্যের নীড়ে সেই অচিন পাখির ডিম
বারবার নিরুপায় হাতড়াতে গিয়ে ভেঙে ফেলি
খুঁজেও পাইনে।
আমারও একেকটি বয়স এভাবেই নষ্ট হয়
অপচয়ের কীর্তন শুনি।
মনবেড়ি ছিঁড়ে যায় অলক্ষিত আকুল ক্রন্দনে
আহারে অচিন পাখি, কোন গগনের খড়কুটো
এনে দিলে আজীবন আমাকে পোড়াতে
সে কোন্ পালিত প্রেমে শরীরের রক্ত জমে যায়
পাথরের মতো
কোন্ মহাসুখে জ্বলে যায় জীবনের হু হু মোম
কোনোদিন জানি না তো–
আর এই জানাজানি যেন কোনোদিনও
শেষ হয়ে না যায়।

(সেই চোর, সেই অচিন পাখি/সানাউল হক খান)

এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক কবিদের কাছে বাউল-ভাবনা কোনো সময় আনন্দের আবার কখনও-বা বেদনার অনুষঙ্গী। বাউলেরা যে-অর্থে অধ্যাত্মবাদী আধুনিক

বাংলা কবি যে-অর্থে অধ্যাত্মচিন্তা করেন না। বাউল-ভাবনার অধ্যাত্ম-উপলব্ধি দেহাতীত ভাবনায় বিজড়িত। আধুনিক কবির মানস-সংগঠন নিতান্তই দেহজ। বাউল অখণ্ডে বিশ্বাসী—তাই মানুষের মাধ্যমে সে মানবতার আরাধনা করে। আধুনিক কবি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। তার চেতনাই খণ্ডিত। ব্যক্তিমানুষ তার আরাধ্য।

পবিত্র বলিয়া এই দেহ নরদেহ করেছি স্বীকার
দেহ স্পর্শে উচ্ছ্বাসিছে অমৃত আপনার।

[পাপী : পৃথিবীর পথে/বুদ্ধদেব বসু]

যতক্ষণ বাউল দেহের সাধনা করেন ততক্ষণ আধুনিক কবির সাথে তার অন্বয় লক্ষণীয়। কিন্তু পার্থক্য এখানে যে বাউলের দেহসাধনা অধ্যাত্ম-নির্দেশক কিন্তু আধুনিক কবির তা নয়।

এই দেহ-ধূপদহি, উঠিয়াছে কামনার ধূম
তাহারি সুগন্ধে মোর স্নায়ুতন্ত্রী নিহারিত
সেই মোর কলঙ্ক কুঙ্কুম

[পাপী, পৃথিবীর পথে/ বুদ্ধদেব বসু]

ফরহাদ মজহার বলেন :

ঘরের পাশে পড়শী তুমি আমার পড়শী আমার মতোন আরশীনগর যেমন তেমন আমার মতোন তুমি আমি সেইখানে এক পাড়ার পড়শী কিম্বা আমি তোমার মতোন পড়শী থাকে নও তা জানি নিজেই পড়শী পড়শী পুরুষ ঘরের পাশে প্রতি পুরুষ আরশীনগর প্রতি পুরুষ।

[খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ/ফরহাদ মজহার]

অতীতে বাউল-ভাবনা একটি সম্প্রদায়ের সার্বিক চেতনার 'মৌলবিন্দু' হিসেবে বিবেচিত হতো। বর্তমানে আধুনিক কবিতায় বাউল-ভাবনা একটি কবি বিশেষের ব্যক্তিমানসের পরিচয়-চিহ্ন বহন করে।

বাউলের সাথে আধুনিক কবিদের যেখানে বিশেষ মিল তা এর চিত্রকল্প। জীবন রহস্যময়। কবিতা এই রহস্যমণ্ডিত জীবনকে চিত্রকল্পের মাধ্যমে বাঙ্ময় করে তোলে। মালার্মে যেমন বলেছেন : Poetry is the expression of mysterious feeling of the aspects of existence–আধুনিক কবিতায় বাউল-ভাবনার প্রয়োগ অনেকটা তাই।

আবু সয়ীদ আইয়ুব[৯] বলেছেন, কবিতা যেহেতু ভাষার ছাঁচে গড়া শিল্পবস্তু অর্থাৎ এমন উপাদান দিয়ে গড়া বা অবশ্যতই এবং অনিবার্যত একটা মাধ্যম বা প্রতীক, তাই প্রতীকধর্ম ত্যাগ করতে পারে না কবিতা, করলে কবিতা আর কবিতাই থাকে না। তার মতে ইচ্ছা করলেই একজন শিল্পী, তিনি চিত্রকর বা

সংগীতকার যা-ই হোন, প্রতীক বা সাংকেতিকতা তার শিল্পকর্মে বর্জন করতে পারেন। কিন্তু একজন কবি তা পারেন না। কারণ ভাষানির্ভর শিল্পকর্মকে ভাষার স্বধর্ম রক্ষা করে বাঞ্ছিত অর্থের বাহন বা সংকেত হতেই হয়–কবিতার সঙ্গে অন্যান্য শিল্প সৃষ্টির তফাত এখানে সুস্পষ্ট। কবি তার প্রতীক বা সংকেতের মাধ্যমে জগতের কোনো এক খণ্ডের ভিতর দিয়ে পূর্ণের রূপটিকে শুধু চোখে নয়, হৃদয়েই অনুধাবন করেন।

আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত সমস্ত দৃশ্যজগৎই তো সংকেতময়। যা-কিছু আমরা দেখি সে সবকিছু আমাদের ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে টেনে নিতে চায়। এই পৃথিবীর সবকিছুই যেন একেকটা প্রতীক। প্রত্যেক রূপকের একটি বাহ্যিক রূপ আছে, কিন্তু সেইটিই সব নয়—ইঙ্গিতের দ্বারা আমরা এক গভীরতর বিরাটত্বের স্বরূপের সাথে পরিচিত হই।

একজন সাধক তার তপস্যা বা সাধনার ফলে অতীন্দ্রিয় এবং অনির্বচনীয় সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে সক্ষম হন, কবি তার অনুভূতির আলোকে সেই লোকোত্তর রহস্য উপলব্ধি করেন সকল দৃশ্যের মাঝখানে। যোগী, মুনি-ঋষির মন্ত্র বা সাধনা কবিকে আকৃষ্ট করেনি। কিন্তু বাউল তাঁকে প্রভাবিত করেন কারণ তিনি তো মন্ত্রহীন ব্রাত্য। সর্বোপরি তিনি কবি। মনে হয় এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি আধুনিক কবিতারও জনক, বলতে সক্ষম হয়েছিলেন :

কবি আমি ওদের দলে
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
(পত্রপুট/১৫)

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, বাউলের গান যত না সংগীত তার থেকে অধিক তা কবিতা। এখানেই রবীন্দ্রসংগীতের সাথে বাউলগানের মিল। বাউলগান বাণীপ্রধান। সুর বাদ দিয়ে শুধু কবিতা হিসেবেও তা পাঠযোগ্য। বাউলগানে সুর সংযোজিত হয়েছে আমাদের মনকে অনুরণিত করার জন্য, আমাদের হৃদয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে তা ধারণ করার জন্য। বাউল এবং রবীন্দ্রনাথের গানে বাণী বা কথাই প্রধান। উভয়ের গানে যে সুর সংযোজিত তা ভাবকে গভীরতা এবং তীব্রতা দান করার জন্যই। সুর এখানে আপন মহিমায় বিরাজিত বা প্রতিষ্ঠিত নয়—চেতনার অনুষঙ্গী। এ কারণে বাউলগান এবং রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে মার্গসংগীতের তফাত। বাউলগানে যারা ক্লাসিক্যাল বা মার্গসংগীতের সুর খুঁজতে যান তাদের ভুলটা ভাঙবে আশা করি। বাউল তার উপলব্ধিকেই ব্যক্ত করেছে তার গানে। এই প্রকাশিত উপলব্ধিতে কবিতার সার্থকতা। উপলব্ধি যত গভীর ও হৃদয়গ্রাহী হবে এবং তার সাথে প্রকাশ যত পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে কবিতা তত উঁচু দরের হবে। রবীন্দ্রসংগীত এবং বাউলগান এই

অর্থেই উঁচুদরের কবিতা এবং শিল্পকর্ম। বুদ্ধদেব মনে হয় এ কারণেই গীতাঞ্জলি-পর্বের গান পড়তেই ভালোবাসেন বলে উল্লেখ করেছিলেন।[১০] কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রসংগীত কিংবা বাউলগানের সুর মোটেই উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু তার ভূমিকা কেবল সহকারীরূপে–আধিপত্য বিস্তার বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়।

কবিতায় কবি প্রতীক বা সংকেতের মাধ্যমে যে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন, তা শুধু বহির্জগতের প্রতিবিম্ব হিসেবেই নয়—তা কবির অন্তর্লোকের অভিব্যঞ্জনা। আধুনিক কবিদের সঙ্গে বাউলদের এই ভাবের মিল যথার্থই অনুধাবনযোগ্য। সাধারণের কাছে বাউলগান দুরূহ দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার আলোছায়ায় রহস্যময়। এই রহস্যতাকে বাউল সাংকেতিক অর্থে কাব্যময় করে প্রয়োগ করেছে। চর্যাপদের ভাষার মতো তাকে সন্ধ্যাভাষা নামে অভিহিত করা যায়। চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকাও বাউলগান কিংবা রবীন্দ্রসংগীতের মতো কবিতা হিসেবেই হৃদয়গ্রাহী।

আধুনিক কবিতার রূপকার মারিত্যাঁ মনে করেন কবিতার ভাষা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের অর্থ বহন করে, কিন্তু এই ভাষার দুই প্রকার অর্থ কেবল ভিন্নই শুধু নয় তা একে অপরের 'অনপেক্ষ'। প্রথম অর্থে প্রত্যক্ষ পার্থিব বস্তুর নির্দেশনা থাকলেও তা বর্জন করে। দ্বিতীয় অর্থে অতীন্দ্রিয় এবং অনির্বচনীয় সত্তার ইঙ্গিত প্রাধান্য লাভ করে।[১১] এই প্রসঙ্গে লালনের একটি গানের উল্লেখ করতে চাই।

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
বাড়ির কাছে আরশীনগর
সেথা এক পড়শী বসত করে।

এখানে 'আরশী' শব্দের প্রয়োগ করে লালন যে প্রত্যক্ষ পার্থিব বস্তুর উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে এক অতীন্দ্রিয় পরম রহস্যময় সত্তার ইঙ্গিত বহন করে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি বাউলগানের উদ্ধৃতি দিচ্ছি : বাউলগান

১

সে কথা কি ক'বার কথা জানতে হয় ভাবাবেশে
অমাবস্যায় পূর্ণশশী পূর্ণিমাতে অমাবস্যে।
অমাবস্যায় পূর্ণিমার যোগ
আজব সম্ভব সম্ভোগ
জানলে খণ্ডে এ ভাব রোগ
গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥
রবি-শশী রং বেমুখা
মাস অন্তে হয় একদিন দেখা
সেই যোগের যোগে লেখাঝোকা
সাধলে সিদ্ধি হয় অনায়াসে ॥

দিবাকর নিশাকর সদায়
উভয় অঙ্গে উভয় লুকায়
ইশারাতে সিরাজ সাঁই কয়
লালন ভেড়োর হয় না দিশে ॥

২

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়
অমাবস্যা নেই সে চাঁদে দ্বিদলে তার বারাম উদয় ॥
যেথায় সে চন্দ্রভুবন
দিবারাত্রি নাই আলাপন
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদায় ॥
বিন্দু নালে সিন্ধু বারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চাঁদের স্বর্গপুরী
সেই তো তিনি প্রমাণ জানায় ॥
দরশনে দুঃখ হরে
পরশনে সোনা করে
এমন মহিমা সে চাঁদের
লালন ডুবে ডোবে না তায় ॥

মানুষ ভাবপ্রবণ। সে একাধারে স্রষ্টা এবং শিল্পী। বাউল তার মনের মানুষের নানা অরূপ-রূপের বিবিধ প্রতিচ্ছবি বিভিন্নভাবে কল্পনা করেছে। এই প্রতিচ্ছবিগুলি সে চায় মন থেকে মনে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে চালনা করতে, ব্যাপ্ত করতে, উৎক্ষিপ্ত করতে। এ কাজে সহায়ক হয়েছে বিভিন্ন চিত্রকল্প। এইসব চিত্রকল্প বা প্রতীকের মধ্যে সাধারণত দুটি অর্থ থাকে—একটি প্রত্যক্ষ বা বাহ্যিক, অপরটি অপ্রত্যক্ষ বা গুপ্ত। কবিতার ভাষা গদ্যের ভাষা থেকে পৃথক। গদ্যের ভাষা স্বচ্ছ কাচের মতো। একবার তাকাতেই সবই দৃষ্টিগোচর হয়। কবিতার ভাষায় চোখ আটকে যায়। সহজেই সবকিছু দেখা যেন সম্ভব নয়। গদ্যে একবারেই সব বোঝা যায়। ভাষা সেখানে নির্ভেজাল, সহজ এবং প্রত্যক্ষ; কবিতার ভাষা তা নয়। কবিতার ভাষা বুঝতে সময় লাগে। সব বলে ফেললেও তার সব বলা হয় না। অতীতে কবিতার ভাষা অনেকটা গদ্যের অনুষঙ্গী ছিল। কিন্তু আধুনিক কবিতা ক্রমান্বয়ে অধিক মাত্রায় প্রতীকীধর্মী হওয়ায় তা সাধারণ পাঠকের চোখে কখনও বেশ দুর্বোধ্য মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতীক বা চিত্রকল্পের তেমন কোনো অর্থ থাকে না। কখনও কখনও আধুনিক কবিরা কবিতার ধ্বনি কিংবা শব্দপ্রয়োগের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কেউবা খোঁজ করেন

ছন্দ এবং তাল—যা সংগীতের অংশবিশেষ। এরা কবিতায় বাহ্যিক অলঙ্করণের প্রতি নিবিষ্ট। ভালেরি, মালার্মে এ ধরনের ভাবনার জনক এবং আধুনিক বাংলা কবিতায় তাদের অনুসারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যেমন :

১

যে আমাকে প্রেম শেখালো
জোছনা রাতে
ফুলের বনে
সে যেন আজ সুখেই থাকে,
সে যেন আজ রানীর মত
ব্যক্তিগত
রাজ্যপটে
পা ছড়িয়ে সবার কাছে বসতে পারে
বলতে পারে
মনের কথা
চোখের তারায়
হাত ইশারায়
ঐ যে দ্যাখো
দুঃখী প্রেমিক যাচ্ছে পুড়ে
রোদের ভিতর
ভিক্ষে দিলে ভিক্ষে নেবে
শীর্ণ বাসে শীর্ণ দেহে
যাচ্ছে পুড়ে
রোদের ভিতর
কিন্তু শোনো,
প্রজাবৃন্দ
দুঃসময়ে সেই তো ছিলো
বুকের কাছে
হৃদয়ে মাঝে
আজকে তারে দেখলে শুধু
ইচ্ছে করে
চোখের পাতায়
অধর রাখি
যে আমাকে প্রেম শেখালো
প্রেম শিখিয়ে চিনিয়েছিলো
দুষ্টগ্রহ।

(মাকিদ হায়দার/আমাকে : রোদে ভিজে বাড়ি ফেরা)

২

কোথায় পালালো সত্য?
দুধের বোতলে, ভাতের হাঁড়িতে! নেই তো
রেস্টুরেন্টে, হোটেল, সেলুনে,
গ্রন্থাগারের গভীর গন্ধে
টেলিভিশনে বা সিনেমা, বেতারে
নৌকার খোলে, সাপের ঝাঁপিতে নেই তো!
গুড়ের কলসি, বিষের কৌটো
চিনির বয়াম, বাজারের ব্যাগ
সিগারেট কেস, পানের ডিব্বা,
জর্দার শিশি, লক্ষ্মীর সরা,
নকশী পাতিল, চৌকির তলা
সবি খুঁজেছিলাম, খুঁজে দেখলাম নেই তো!

(আসাদ চৌধুরী/সত্যফেরারী : তবক দেওয়া পান)

এ ধরনরে কবিতায় অত্যন্ত সহজভাবে বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়। পাঠক তখন অর্থের প্রতি তেমন আকৃষ্ট না হয়ে ধ্বনি বা শব্দের প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করেন বেশি। আনন্দের বিষয় আধুনিক বাংলা কবিতা শুধু ধ্বনি কিংবা ছন্দসর্বস্ব নয়। কবিতার পাঠক বক্তব্যকে খোঁজেন ছন্দ বা ধ্বনির ব্যঞ্জনায়। এই বক্তব্য রহস্যঘেরা হলে কাব্যরসিক তার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হন। বাউলগানের রূপময়তার সাথে তার কাব্যময়তা আধুনিক কবিদের এবং আধুনিক কবিতার পাঠকদের আকর্ষণ করেছে। বলা যেতে পারে ইদানীং কালে বাউলগান আধুনিক কবিদের চেতনাকে যেভাবে আলোড়িত করেছে অন্য কোনো বিষয় বা ভাবনা তা করেনি। সম্প্রতি একজন আমেরিকান মহিলা কবি[১২] ক্যারোলিন রাইট বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে পড়াশোনা করতে এসে বাউলগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। কুষ্টিয়ায় লালন মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি বাউলদের গান, বিশেষ করে তাদের গানের বাণী শুনে মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হন। তার মতে বাউলগানের কাব্যমূল্য অপরিসীম। প্রতীকী শব্দ অথবা চিত্রকল্পের এমন সহজ এবং কাব্যিক প্রয়োগ তিনি ইতঃপূর্বে কোনো লোককবিদের রচনায় লক্ষ করেননি। লালনের গান তার চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, শুধু শব্দ বা চিত্রকল্পের প্রয়োগেই নয়, লালন শাহের গান ভাব এবং বাণীর এক অপূর্ব সমন্বয়। বাউলগান দেহভিত্তিক হওয়ায় যৌনচেতনা স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপিত হলেও কবি তা প্রকাশে চিত্রকল্প এবং প্রতীকের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু বৈষ্ণবগীতিকায় এই যৌনচেতনা বেশ স্থূল পর্যায়ের এবং তার প্রকাশভঙ্গি আটপৌরে ভাষায়। কিন্তু বাউলগানে তার প্রয়োগ অত্যন্ত শিল্পসুষমামণ্ডিত। যেমন :

লীলা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
গঙ্গা ডাঙা বেয়ে যায়।
... ...
ফুল ফোটে তার গঙ্গা জলে
ফল আছে কোন্ অচিন দলে
যুক্ত হয়ে ফলে ফুলে কিবা শোভা হয় ॥

(লালন)

আধুনিক কবির চেতনায় বাউলের গান যে কী গভীর অনুভূতির জন্ম দিয়েছে, নিম্নের কবিতাটি তার এক চমৎকার উদাহরণ :

কৃত্রিম রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস
আমারে ডাকিয়া নিল তরঙ্গিত দেহ গঙ্গানীরে ॥

(বুদ্ধদেব বসু; মানুষ : বন্দীর বন্দনা)

এখানে নৌকা, গঙ্গা, ফুল, ফল শব্দগুলো যৌনচেতনা নির্দেশক। আধুনিক কবির 'তরঙ্গিত দেহ গঙ্গানীর' শব্দপ্রয়োগে সেই একই চিত্রকল্প। কিন্তু ভাবের জগতে বাউলের গান কী দারুণ উপলব্ধি ঘটায়। বাউলগানে যৌনচেতনার যে কাব্যিক প্রয়োগ, আধুনিক কবি তার প্রতি স্বাভাবিকভাবে গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। নিম্নে দুটি বাউলগানের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

১

রূপের গাছ চাঁদের ফল তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
একবার দৃষ্টি করে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি
রূপের কিরণে চমক পারা ॥

(লালন)

২

চাঁদে চাঁদে ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া
জমিনে ফলছে মেওয়া
চাঁদের সুধা ঝরে ॥

(লালন)

এখানে বাউল তার সাধনাকে যৌননির্ভর করেও প্রতীকী ভাবনার আড়ালে তার সে বিশুদ্ধ আবেগ এক অপূর্ব সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। বাউলগানের মতো আধুনিক কবিদের প্রেমও দেহনির্ভর। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার মতো তা দেহসর্বস্ব নয়। প্রেমের শারীরিক দিক সেখানে বাউলগানের মতোই বিশুদ্ধ একটি অনুভূতি।

তোমার নামের শব্দ 'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী'
আকাশে ও চাঁদে, জলে আর মেঘে,
দিগন্ত-পারে গাছের ছায়ায়,
ফাঁকা আকাশে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে মেঘের শরীরে, জলের স্রোতে—
চুপে চুপে বলা চাঁদের মুখের কথা
চাঁদের মুখের কথা জেগে ওঠে : কঙ্কাবতী
(বুদ্ধদেব বসু : কঙ্কাবতী)

আকাশ ঘুমায় মাথা রেখে কালো মেঘের কোলে,
মেঘের মুখেতে মুখ রেখে চাঁদ পড়েছে ঢ'লে
কঙ্কাবতী
(বুদ্ধদেব বসু : কঙ্কাবতী)

বাউলের সাধনায় নারীই প্রকৃতি। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চাঁদ প্রভৃতি শব্দ নারীর স্বরূপসাধনার অঙ্গবিশেষ। বাউলসাধনা যুগলসাধনা। এখানে নারীর গুরুত্ব সর্বাধিক। নারীর মাধ্যমেই বাউল তার প্রাণের মানুষকে উপলব্ধি করে। জীবনানন্দ দাশ তা উপলব্ধি করেছিলেন। কোনো এক বাউলসাধককে লক্ষ করে কবি তাই বলেন :

হে ফকির, আলেয়ার আলো!
কোন্ দূর অস্তমিত যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া
চিত্তে তব জাগিতেছে কবেকার প্রিয়া
... ...
আজো তব লোহিত কপোলে
চুম্বন-শোনিমা তার উঠিতেছে জ্বলে
অনল ব্যথায়।
চলে যায়—মিলনের লগ্ন চলে যায়!

জীবনানন্দ দাশ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেননি। বলা যেতে পারে, তার কবিতা ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এবং একজন বাউলের গানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন মনুষ্যত্বের যথার্থ উন্মেষ ঘটানোর প্রচেষ্টাকে লক্ষ করে। বাউলগান মূলত ধর্মীয় সংগীত হলেও এই মতাদর্শের বড় কথা হচ্ছে 'আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীন সত্তার সন্ধান'। এই স্বাধীন সত্তা যাকে বাউলেরা সহজ মানুষ, সোনার

মানুষ, অধর মানুষ, মনের মানুষ নামে অভিহিত করেছে, তিনি তাদের পরমার্থ। তার স্বরূপ সম্বন্ধে বাউল ধারণা করতে চেয়েছে তার দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত এক নতুন জগতের আবিষ্কারের মাধ্যমে। এই চেতনা বস্তুজগতের বিরোধী নয়, বরং বলা যেতে পারে 'বস্তুজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর অনুপ্রবেশ'। বস্তুজীবনের সঙ্গে অধ্যাত্ম বা ভাববাদের সংযোগ সাধনই বাউলসাধনা। বাউলের গান নিঃসন্দেহে হৃদয় আশ্রিত। কিন্তু বাউলের হৃদয় বুদ্ধিবৃত্তিকে অস্বীকার করেনি। বরং বলা যায়, এ তার অভিজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে। বাউল ধর্মীয় সংগীত হলেও এই সাধনা বিশেষে কোনো ধর্মের অনুসরণ করেনি। বাউল লক্ষ করেছে, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদের বেড়াজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ প্রবঞ্চিত হয়েছে। মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে। একধরনের আধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের আড়ালে মানুষ তার নিজের অধিকারকেই হারিয়ে এসেছে এতকাল। ধর্মের নামেই বর্ণবৈষম্য এবং জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। চর্যাগীতিকায় সিদ্ধাচার্যগণ এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহ বাউলের গানে আরেকবার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে প্রতিধ্বনিত হলো। বাউলের গানে মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। মানবজীবনকে বাউল সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে ॥
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম আর কিছু নাই
দেবদেবতাগণ করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে ॥
(লালন)

বাউলের এই হিউম্যানিজম বাংলা কবিতা এবং সাহিত্যে রেনেসাঁস-এর সূত্রপাত ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাউলের এই ধর্মমতকে 'মানবধর্ম' নামে চিহ্নিত করে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।[১৩] নজরুল তার কবিতায় বাউলের এই ভাবনাকে স্বীকরণ করে নিয়েছেন। উদাত্ত কণ্ঠে নজরুল ঘোষণা করলেন :

আমি চির বিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির ॥
(নজরুল : বিদ্রোহী)

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
(নজরুল : মানুষ)

ব্রাহ্মণ্যবাদের হাতে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা ঘটেছিল তার প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর 'চর্যাগীতিকা'। মধ্যযুগে ধর্মের নামে যে শোষণ সমাজজীবনকে পঙ্গু করে ফেলেছিল;

বাউলের গান তার বিরুদ্ধে দীপ্ত প্রতিবাদই শুধু নয়—মনুষ্যত্বের মুক্তির উপায়ও বটে। এতদিন যে ঈশ্বর স্বর্গে বসবাস করতেন, যিনি কেবল দেবতারূপেই সকলের পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন, বাউলের গানে তিনি প্রেমিকপুরুষ। মানুষের জীবনে তার অধিষ্ঠান হওয়ায় বাউল মানুষকেই ভজনা করেছে। মানুষই তার চিরআরাধ্য। বাউলের গানে এই 'নতুন কথা' রবীন্দ্রনাথের জীবনকে পাল্টে দিয়েছে। তার জীবন ও সাহিত্য বাউলের মতাদর্শের সাথে একাকার হয়ে গেছে। নজরুলের বিদ্রোহী মনের মর্মমূলেও এই বাউলগান। কিন্তু বাউল তার ঈশ্বরকে আপন জীবনে অধিষ্ঠিত করলেও তার স্বরূপ জানতে তো সে সক্ষম হয়নি। তাই তো সে গেয়ে ফিরেছে :

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে ।
(গগন)

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার খোঁজ পাননি। কিন্তু তাঁকে জানবার চেষ্টা তো ফুরায় না। আধুনিক কবিদের রচনায় এই ঐতিহ্য নতুনতর আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে।

তোমার নিবিড় কালো বুকের ভিতর
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খৃস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্য জাগার মতন;
কত কাছে,—তবু কত দূর।
(জীবনানন্দ দাশ : সুচেতনা : বনলতা সেন)

কিন্তু বিচ্ছেদেই মিলন সম্ভবপর। কবি তাই হতাশাগ্রস্ত হয়েও আশাবাদী :

যে জিনিস বেঁচে আছে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে :
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে মানুষীর মনে।
(জীবনানন্দ দাশ : নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

আধুনিক কবি তাই তার মনের মানুষের সন্ধানে পথে নেমে আসেন :

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে
–এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।
(জীবনানন্দ দাশ : সুচেতনা : বনলতা সেন)

বাউলের গানে যে আধ্যাত্মিকতা আছে তাকে এককভাবে উপনিষদ, বৌদ্ধ কিংবা সুফিভাবনার সাথে মেলাতে গেলে ভুল হবে। তবে নিঃসন্দেহে এসবের উপাদান

বাউলের আধ্যাত্মিকতায় মিশে গেছে ঠিকই, কিন্তু এ এক ভিন্ন আধ্যাত্মিকতা—যা একান্ত করেই লৌকিক, দেশজ। জীবনানন্দ দাশের কাব্যে তার আদর্শ প্রতিফলিত। এমনি আধ্যাত্মিকতা অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যেও আমরা লক্ষ করি :

সেখানে সে ডুবে আছে
সেখানে জল নেই
সোনালি দোলে ঝিনুক তল
মুক্তো ঝলক
আরো গহন আলোর নীল।
(অমীয় চক্রবর্তী : দিঘি, পালাবদল)

তুলনীয় :

মধুর দিল-দরিয়ায় যে জন ডুবেছে
সে না সব জবর খবর পেয়েছে
পর্বতের চূড়ায় গঙ্গা
জলের ভিতর ডাঙা
ডুবে দেখ না, একবার ডুবে দেখ না
ডুবলে ডাঙা পাই
উঠলে ভেসে যাই
বিষম তরঙ্গ সদাই বহিছে ॥
(লালন)

বাউলসাধনায় যৌনজীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ মানুষের কাছে যৌনজীবনের আবেদন অন্যদের থেকে একটু বেশি। এর অনেক কারণের একটি হলো এই যৌনজীবনের চর্চা এবং চর্যার মধ্যেই সে নিজের জন্য আনন্দ এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রেরণার পথ খুঁজে পায়। যৌনজীবনে যে পারদর্শী সেই সিদ্ধিকাম। কিন্তু বাউল এবং বৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈষ্ণব যৌনতাকে স্থূল পর্যায়ে সাধনার মাঝে অঙ্গীভূত করেছে। অপরদিকে বাউল যৌনতাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম পর্যায়ে উন্নীত করে তাকে অধ্যাত্মসাধনার মাধ্যম বানিয়েছে। বাউলের এই অধ্যাত্মসাধনার মূলে তার অর্থনৈতিক ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। চর্যাগীতিকায় যে বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ রয়েছে, সহজিয়া সাধক তার অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য রতিনিরোধের সাধনার কথা উল্লেখ করেছে। অর্থনৈতিক কারণের জন্য তার জন্মনিয়ন্ত্রণ। সহজিয়া সাধকদের পথ ধরে বাউল নিজেও এই রতিনিরোধে সাধনা করেছে মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকে বাঁচবার জন্যে। অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ভুলতে সে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। জন্মনিরোধ করে সে মুক্তি খুঁজেছে অধ্যাত্মচিন্তায়। বাউল সকল সংস্কার, জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে

মানবধর্মী তথা লৌকিক অধ্যাত্মসাধনাকে আশ্রয়স্থল ভেবে শান্তি পেতে চেয়েছে। মানুষই তার সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। সে সকল শাস্ত্রাচার এবং আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে সে অস্বীকার করে ধর্মকে সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে গ্রহণ করেছে। বাউল লালন ফকির বলেন :

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে ॥
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কী হয় বিধান
বামন চিনি পৈতায় প্রমাণ বামনী চিনি কিসে রে ॥
(লালন)

অনুসারী বাউল দুদ্দু শাহের কণ্ঠেও সে একই সুর :

জাতি ধর্মের বড়াই করো না ভাই
শত শত মহাপুরুষ তাদের কুলের ঠিকানা তো নাই ॥
নারী নর দুইরূপে মানুষ
আছে তাহার জ্ঞান ও হুঁশ,
খোদার নিচে ভুবনমাঝে শাস্ত্রে শুনি তাই ॥
ধলা কালার এই বীজ ভাই
সর্বজাতি যাতে হয় উদয়
কর্ম শুনে এই সমাজে ভিন্ন গোত্র আখ্যা পাই।
(দুদ্দু)

অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও ভেদবুদ্ধি সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। সাম্প্রদায়িকতা বলতে ধর্মের চেয়ে ধর্মসম্প্রদায়কে বড় করে দেখা বোঝায়। যথার্থ ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ না করে কেবল নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান মনে করাটা নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক এবং এর ফলেই কে ব্রাহ্মণ না শূদ্র, সৈয়দ না জোলা এই প্রশ্ন তার মনে বড় হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলিম এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দুটো জাতিকে চিরতরে শত্রু হিসেবে পরিগণিত করেছে। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণে আজো ভারতে বাবরী মসজিদ এবং রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়।

আজ সারা ভারত এবং বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উৎকট এবং পাশবিক প্রকাশ যথার্থ ধার্মিক মানুষকে ব্যথিত করে তোলে। এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা কোনো নতুন কিছু নয়—এ যেন আমাদের রক্তে মিছে আছে। এ কারণেই সারা পৃথিবী যখন এগিয়ে চলে আমাদের তখন পিছু হটবার পালা। মানুষের এই অবমাননা বাউলকে ব্যথিত করে তুলেছে। দুদ্দু বলেন :

জাতাজাতি সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে দিলে
যত সব কায়েত বামন অবশেষে এই বুঝিলে ॥
শূদ্র বৌদ্ধ ইতর মুসলমান
সবি তো এক মায়ের সন্তান
ভারতের মাটিতে সবারই প্রাণ কেউ না দেখিলে ॥
রচিয়া জাতির বেড়া
দেবতারে করিলে দেশ ছাড়া
মানুষ ছাড়িয়ে নোড়া সবাই পূজলে ॥

আধুনিক কবি নজরুল ইসলামের কণ্ঠে এই সুরেরই প্রতিধ্বনি :

মানুষের ঘৃণা করি
ও কাবা কোরাণ, বেদ বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি ॥

বাউলেরা যে পিছিয়ে পড়া মানুষের জয়ধ্বনি করেছেন তাদের গানে, তারই প্রতিধ্বনি নজরুলের মধ্যেই শুধু নয়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য আধুনিক কবির মধ্যেও অনুরণিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন :

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
–আমি কবি যত ইতরের।
(প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রামা)

আধুনিক কবিতায় মানবতার এই যে বোধনমন্ত্র ধ্বনিত হলো নিঃসন্দেহে বাউল তার পূর্বসূরি। বাউল ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসিকতায় যদিও অনেক পার্থক্য তথাপি উভয়েই মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় মানুষের অবমাননা উভয়ের মনকে বেদনাসিক্ত করে তুলেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন :

আজ এই রাস্তার গান গাইব—এই নগরের শিরা উপশিরার এই রাস্তার
ধূলির গান!
... ...
তার সঙ্গে গান গাইব মানুষের
যে মানুষ পথ সৃষ্টি করেছে
মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলাবার পথ
... ...
সে পথ আরো বিস্তৃত হোক
যে পথ মানুষকে বৃহৎ করেছে।
(প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রামা)

বাউলকবি এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের মিল এখানে যে তারা উভয়েই মানুষকে ভালোবাসেন যদিও চেতনার প্রেক্ষিত উভয়ের ভিন্ন। একজন লৌকিক অধ্যাত্মবাদকেই জীবনের পরমার্থ বলে মনে করেন, অপরজন সংগ্রামকেই সাধনার সিদ্ধি বলে জানেন।

মানুষের মানে চাই—
– গোটা মানুষের মানে!
রক্ত মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত–
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সবকিছুর মানে খুঁজে হয়রান হল–
এবার চাই মানুষের মানে–নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না!
(প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রামা)

বলেছি, বাউল জাতিভেদ প্রথা এবং সর্বপ্রকার প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তার গান একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের ইঙ্গিত দানকারী, যা দানা বাঁধলে যে কোনো সময়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ণবৈষম্য এবং জাতিভেদ প্রথায় জর্জরিত ভারতে সুফিবাদের আদর্শে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ মুক্তির আলো খুঁজে পেয়েছিল। দলে দলে তারা সুফিধর্মে দীক্ষিত হলো এবং পরবর্তীকালে তারা নব্য সুফিবাদ (Neo Sufism)-এর জন্ম দিল। এই নব্য সুফিদর্শন সকল ধর্মীয় ভাবনাকে একত্রীভূত করে এক নতুন মতাদর্শ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো। চৈতন্যদেব নিজেও এই দলের সাথে তার ধর্মীয় চিন্তাকে এক করে নিলেন। অবশ্য প্রথমদিকে তিনি এই নব্য সুফিদর্শনকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিলেন এবং এদেরকে বাউলিয়া, বাউল, বাতুল নামে ধিক্কৃত করেন। কিন্তু এতে ফল হলো উল্টো। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের একটি বিরাট অংশ যখন নব্য সুফিবাদে দীক্ষিত হতে শুরু করল, তখন চৈতন্যদেব তার প্রধান শিষ্য অদ্বৈতাচার্যের পরামর্শে ঘোষণা দিলেন :

মুচি যদি ভক্তি ভরে ডাকে কৃষ্ণ ধনে
কোটি নমস্কার করি তাহার চারণে!
(চৈতন্য ভাগবত)

চৈতন্যদেব অতঃপর নিজেই 'মহাবাউল' নাম ধারণ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রবঞ্চিত মানুষদেরকে তার ধর্মমতে আশ্রয় দিলেন। তার এই ধর্মমত কৃষ্ণ প্রেমসর্বস্ব হওয়ায় সাধনায় যৌনাচার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই যৌনাচার করতে কোনো স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দিতে না পারে, তার জন্য তিনি যৌনাচারকে উপাসনার বস্তু হিসেবে প্রাধান্য দেন এবং নর-নারীর জীবনে ধাতু-নিরোধকল্পে

তিনি 'বিন্দুসাধনা'র প্রবর্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি মানবদেহে ধাতুস্বরূপ বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রভু বলেন কৃষ্ণ শক্তি ধাতুর প্রচার ॥
ধাতু সূত্র কথা নিয়ে শুন সর্বজন
দেখি কার শক্তি আছে কর খণ্ডন ॥
(চৈতন্য ভাগবত : মধ্যখণ্ড পৃষ্ঠা : ১০)

বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিন্দুসাধনা মুখ্য হয়ে ওঠে। বাউলসাধনায় বিন্দুসাধনা সুফিদের দমের সাধনার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণবসাধনার সাথে বাউলসাধনার পার্থক্য এখানে যে, বৈষ্ণবসাধনায় যা ছিল স্থূলপর্যায়ের, বাউল তাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে উন্নীত করে একটি দার্শনিক অবয়ব নির্মাণ করতে চেয়েছে। বাউল সাধকের দৃষ্টিতে 'আরশীনগরের পড়শী', মনের মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ—এ সবই তাদের সাধনায় যৌন কর্মকাণ্ড নির্দেশক। কিন্তু বাউলগানে এসব শব্দ অপূর্ব চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় পাঠকদের মনে দার্শনিক ও সাহিত্যিক অভিব্যক্তি সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ বাউলের সাধনার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বাউলের ভাবের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন সর্বাধিক। বাউলগানের ভাষা তাঁকে প্রাণিত করেছে। বাউলের মনের মানুষ তার কাব্যে জীবনদেবতায় পর্যবসিত হয়েছে। বাউলের গানে যা ছিল একান্ত করেই দেহভিত্তিক, রবীন্দ্রনাথে তার পরিণতি হলো দেহাতীত সৌন্দর্যের অপরূপ মহিমায়। কিন্তু তার এই ভাবনা দেহকে অস্বীকার করে নয়—এখানেই বাউলের সাথে তার মিল।

এখন ভাসিছ তুমি
অন্তরের মাঝে, স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনক বর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; ঊষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল–ছলছলে
লালিত যৌবনখানি; –
... ... সেই তুমি
মূর্তিতে কি দেবে ধরা?
(মানসসুন্দরী : সোনার তরী)

বাউলের মনের মানুষ, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা (কখনও কখনও যিনি মানসসুন্দরী, জীবনদেবী কিংবা মানসী) নজরুলেও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। নজরুল একটি কবিতায় বলেন :

অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা পারে;
স্বপনে পাইয়া তোমা স্বপনে হারাই বারে বারে।

অপরূপ লো...
জন্ম জন্মান্তর ধরি লোকে লোকান্তরে তোমা' করেছি আরতি
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি।
যেখানে দেখেছি রূপ, করেছি বন্দনা প্রিয়া তোমারেই স্মরি।
রূপে রূপে অপরূপ, খুঁজেছি তোমায়।

(অনামিকা : সিন্ধু হিল্লোল)

তুলনীয় : ১. *আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে*
আমি জনমভরে একদিন না দেখিলাম তারে ॥
২. *কে কথা কয়রে দেখা দেয় না*
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনমভর মেলে না ॥

(লালন)

নজরুল অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথে বাউলচেতনা যতবেশি প্রত্যক্ষ, আধুনিক কবিদের কাব্যে তা সর্বক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। তবে আধুনিক কবিদের কাব্যে বাউলচেতনা নিঃসন্দেহে ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপস্থিত।

কী পরীক্ষা নেবে তুমি আর বারবার?
হাতে জপমালা নেই, তবু
আমি তো তোমার নাম মন্ত্রের মতন
করি উচ্চারণ সর্বক্ষণ। যেভাবে তোমার ছায়া
স্বপ্নিল বিলাসে
অপূর্ব লুটিয়ে পড়ে, সেখানে আমার ওষ্ঠ রেখে
অনেক আলোকবর্ষ যাপন করতে পারি, তোমারই উদ্দেশে
সাঁতার না জেনেও নিঃশঙ্ক দ্বিধাহীন
গহন নদীতে দ্রুত নেমে যেতে পারি।
তোমার সন্ধানে ক্রোশ ক্রোশ দাউ দাউ পথ হেঁটে
অগ্নিশুদ্ধ হতে পারি, পারি
বুকের শোণিতে ফুল ফোটাতে পাষাণে।
যখন পাথরে হাত রাখি
পাথর থাকে না আর অপরূপ পাথর,
হয়ে যায় প্রতিমা তোমার।

(শামসুর রাহমান : আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি : কী পরীক্ষা নেবে?)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাউলগানে যে অধ্যাত্মিকতার সাথে আমাদের পরিচয় হয় তা একান্তই লৌকিক। বাউলের মনের মানুষ ঈশ্বর নয়। ধর্মসাধনায় যে ঈশ্বরের পরিচয় রয়েছে বাউলের মনের মানুষের সঙ্গে তার মিল নেই। বাউলের

মনের মানুষ তার মানসপ্রিয়া, বন্ধু সুজন—যে কৌতুকপারঙ্গম। আধুনিক কবিতায় তার আবির্ভাব নারীরূপে যে কবির সকল ভালোবাসার আরাধ্য, জীবনদেবী। বাউলগানে মানবপ্রেম মুখ্য হলেও ভাববাদ সাধককে জীবনবিমুখ করে তুলেছে। অপরদিকে আধুনিক কবি কী অসাধারণ নৈপুণ্যে বাউলচেতনাকে ভাববাদের প্রচ্ছায়া এড়িয়ে জীবনের সাথে মিলিয়ে দেন :

কুষ্টিয়া কি অচিন পাখি
না-কি-সুনীল আকাশের চিল?
কুষ্টিয়াতে বনের পাখি
মনের পাখি হয় একাকী।
খাঁচার পাখি আকাশ পানে
উড়ায় গানে মোহিনী মিল ॥

(নির্মলেন্দু গুণ : কুষ্টিয়া : যখন আমি বুকের পাঁজর খুলে দাঁড়াই)

নির্মলেন্দু গুণ কুষ্টিয়ার বাউলকবি লালন ফকিরের মাজারে বাউলের গান শুনেছেন। এদের অনেকে লালন মাজারের পাশে অবস্থিত মোহিনী মিলের শ্রমিক ছিলেন। মোহিনী মিল হঠাৎ বন্ধ হবার কারণে তারা বেকার হয়ে পড়েন। সংসারের দুঃখ-কষ্ট ভুলতে তারা লালন মাজারে অধিকাংশ সময়ে বাউলগান গেয়ে কিংবা শুনে দিন অতিবাহিত করতেন। পেটে ক্ষুধা থাকলেও, অথবা অন্যের দয়ায় উপর নির্ভর করেও, তারা একতারায় বাউলের সুর তুলে মনের মানুষের সন্ধানে ফিরতেন, তখন তাদের আর দুঃখী মনে হতো না। লালনের গান তখন তাদের ভালোবাসার দোসর, পান্থজনের সখা।

বাউলসাধনা জীবনবাদী সাধনা। আপাতদৃষ্টিতে বাউলদর্শনকে পলায়নবাদী বলে মনে হলেও বাউল জীবনকে অস্বীকার করেনি। বাউলসাধনা দেহভিত্তিক হওয়ায় নর-নারী উভয়েই যুগলসাধনার মাধ্যমে পরমার্থকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। বাউল বস্তুবাদী। এই দেহকে সে কৃষিজমির সঙ্গে তুলনা করেছে তার অভীষ্ট সাধনের জন্য। তাই যৌনাচার বা কামসাধনা খুব স্বাভাবিকভাবেই সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বাউল তার এই সাধনায় কামাচারকে স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত করেনি। নর-নারীর প্রেমের মাধ্যমে কামাচারকে পবিত্র করে তুলেছে।

বাউল কালাচাঁদ বলেন :

মানবদেহ কল্পভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে
শুভ যোগে চাষ করিলে ॥
কর্ম ধাতুর লাঙ্গল ধরে
ছয় বলদে নে চাষ করে;

সময় হলে রতন মিলে,
জো থাকিতে বীজ বুনিলে ॥
এই জমি তোর চৌদ্দ পোয়া
ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া
মন্ত্র বীজ নে সৃজে
গাছ হলে বীজ জন্ম মূলে ॥
কালাচাঁদ পাগলে বলে
ফুল ফুটিতে জলে
ঐরূপ মিলে ভজন সত্য হলে
হৃদকমলে প্রেম উথলে।

আধুনিক কবির কাছেও প্রেম দেহনির্ভর। কিন্তু তা একেবারে দেহসর্বস্ব নয়। তা হলে কামুক এবং প্রেমিকের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? বাউলের এই প্রেমকে আধুনিক কবি তার চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করে দেহকে পবিত্র করে তুললেন।

ভালোবাসার মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছে
চাষ হচ্ছে তিন একর জমিতে;
ধানের রোয়ার মতো বেড়ে উঠছ তুমি
বেড়ে উঠছে তোমার উর্বর মনোভূমি
তার নিচে সোনা;
এমন মানবজমিন রয় না পতিত
আবাদ করলে হয় না গোনাহ।
(মুহম্মদ নূরুল হুদা : চাষাবাদ : নির্বাচিত কবিতা)

দেহের এই আকাঙ্ক্ষার নামই প্রেম। আধুনিক কবি তাই বাউলের মতো দেহভজনা করেছেন। বাউলের মতো দেহের মধ্যেই তার বিশ্ব। যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। আর এই দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই বাউল খুঁজে পেল জীবনের শাশ্বত সত্য :

নানান বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখি
একই মায়ের পুত ॥

আর আধুনিক কবির মানসিকতায় যখন এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন :

...মগজের পুকুরে সাঁতার প্রিয় হৃদয়ের তন্ত্রী
কী রুদ্র ঝংকারে ছিঁড়ে সুবিস্তৃত রৌদ্রের ভিতরে যায়, যন্ত্রী,
হয়ে ঘোরে, শাড়ির পাড়ের মতো রাঙা পথে, পতিত বাগানে।
বাউল বাউল বলে রসালো জোছনায় খুব মেতে ওঠে গানে।
(শামসুর রাহমান : হে প্রিয় কল্পনালতা : আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি)

তথ্যনির্দেশ

১. T. S. Eliot : Four Quartets.
২. জীবনানন্দ দাশ, *কবিতার কথা*, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৯
৩. জীবনানন্দ দাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৪. হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৫ পৃ. ২
৫. বিষ্ণু দে, *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ*, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৩
৬. Edwin Honig, *Garcia Lorca*, London, 1945, p. 75
৭. Stephen Spender, *The Creative Element,* p. 2
৮. T. S. Eliot, *Paints of view,* London 1951, p. 28
৯. আবু সয়ীদ আইয়ুব, *কবিতার ভাষা,* আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩
১০. আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
১১. Jacques Maritain, *Creative Intuition in Art and Poetry*, Meridian, p. 214
১২. ক্যারোলিন রাইট, ফুলব্রাইট স্কলার। বাংলাদেশে থাকাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আমেরিকার সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে ডক্টর অব আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন। তার অনেক কবিতাগ্রন্থের মধ্যে Stealing the Children, From a White Woman's Journal, Premonitions of An Uneasy Guest অন্যতম। ১৯৯০ সালে অক্টোবর মাসে বাউলসাধক লালন শাহের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে কুষ্টিয়াতে তার সাথে গ্রন্থকারের পরিচয়।
বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে আলোচনায় বাউল-চিত্রকল্পের একটি চমৎকার আধুনিক প্রয়োগ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করতে না-পারায় এখানে তার উল্লেখ করছি।
বাউল লালন ফকিরের গানে ব্যবহৃত চিত্রকল্প :
আঁখির কোণে পাখির বাসা
জীবনানন্দ দাশের প্রয়োগ :
পাখির নীড়ের মতো চোখ।
(বনলতা সেন)



পরিশিষ্ট

বাউলসাধন প্রণালী সংক্ষিপ্তসার

বাউলসাধনা অত্যন্ত গুপ্ত এবং কেবল দীক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দীর্ঘ ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে বিভিন্ন বাউল ফকিরদের সঙ্গে চলে-ফিরে আমি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার সংক্ষিপ্তসার এখানে উল্লেখ করলাম।

বাউলদের ধর্মানুসারে এসব তথ্য প্রকাশ মহাপাপ সমতুল্য। তথাপি গবেষণার স্বার্থে আমি এসব তথ্য প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। বেহাল শাহ, কালাই শাহ, মহেন্দ্র শাহ, মহিম শাহ, ঝড়ু শাহ, ফকির চাঁদ, কোমেলা, খোরশেদ, লাইলী, আব্দুল গনি শাহ (কাদের), মনোরঞ্জন বিশ্বাস, নিহাজউদ্দিন, গোলাম ইয়াসিন শাহ, স্বরূপ শাহ, বিল্লাল শাহ, নিমাই শাহ প্রমুখ বাউলের সঙ্গে প্রায়ই নানা আলাপ-আলোচনায় এসব গুহ্য সাধনপ্রণালী সম্পর্কে যা জেনেছি তা এখানে উপস্থাপিত করলাম। ইতঃপূর্বেও এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

বলেছি জন্মসূত্রে কেউ বাউল হয় না। এই মত অনুসরণ করতে দীক্ষা নিতে হয়।

বাউল সাধনা যুগলধর্মী। অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ে একত্রে গুরুর নিকট থেকে এই সাধনায় দীক্ষা নেবেন।

বর্তমানে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো বড়ি, কনডম বা অপারেশন–লাইগেশন, বা ভেসেকটমি ইত্যাদি গ্রহণ করলে তাদেরকে এই মতে দীক্ষা দেওয়া হয় না। এই মতে দীক্ষা নিতে পিতা-মাতার মতামত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বর্তমানে অনেক বাউলগুরু পীরদের মতো আচরণ করে থাকে এবং তারা সে মতে দীক্ষা দিয়ে সমাজে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। গুরু যে মন্ত্র দান করেন তা তিন, পাঁচ বা সাত অক্ষরে হয়ে থাকে। বলেছি, এই দীক্ষা মূলত রতিনিরোধকে কেন্দ্র করে। রতিকে ঊর্ধ্বগামী করার জন্য যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তা নিম্নরূপ :

'হু' বিন্দুকর্তা 'হু' নাম তোমার বিন্দু বিধাতা
ঐ বিন্দুনাম গণি
'হু' বিন্দু নামে উদ্ধার করো
তুমি উজানে যাও দয়ার সিন্ধু লাল বিন্দু মণি ॥

দেহমিলনের পূর্বে এই নাম জপ করে কার্যত 'হু' শব্দে দম বন্ধ ও বায়ু নিঃসরণ করতে হয়। এই পর্যায়ে ছয় লতিফার কার্যকরণ থাকে। রতিস্খলন বন্ধের জন্য এই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য।

বাম নাক বন্ধ রেখে ডান নাকে বায়ু প্রবাহিত করে দম বন্ধ এবং দম ছাড়ার মাধ্যমে রেচকপূর্বক ও কুম্ভকসাধনা করতে হয়। দেহমিলনের সময় এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়।

গোলাম ইয়াসিন শাহ বলেছেন, বাউলদের নামাজ দুই ওয়াক্ত। স্ত্রীকে 'জায়নামাজ' বলা হয়। দেহমিলনের পূর্বে বাউলেরা সাধিকার নানাস্থানে 'সেজদা' দিয়ে থাকে এবং নামাজ আদায়ের সময় নানা মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়।

কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে ৮ মাইল দূরে আলমপুর গ্রামে 'খোকা ফারাজী' নামে এক বাউল ফকিরের আশ্রম আছে। তার বাড়ির আশেপাশে বেশ কিছু বাউলদের বসতবাটী আছে। আমি এই গ্রামে জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং রতিসাধনার বিষয়ে ক্ষেত্রগবেষণা করেছিলাম। খোকা ফরাজী লালন শাহ ও পাঞ্জু শাহের ভক্ত। তবে তার দীক্ষা পাঞ্জু শাহের অনুসারী সাধক ফকিরের কাছে। তার কোনো সন্তানাদি নেই। আমার জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ক্ষেত্রগবেষণার একটি বিবরণ মাসিক গণস্বাস্থ্য পত্রিকায় ৩য় বর্ষ ৮/৯ সংখ্যা, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ সালে প্রকাশিত হয়। আমার লিখিত বিবরণ নিয়েই পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। আমি আলমপুর এবং ছেঁউড়িয়াতে এই ক্ষেত্রগবেষণা পরিচালনা করি। ক্ষেত্রগবেষণা শেষে আমার যে প্রতিবেদন ছিল তা নিম্নরূপ :

বাউলসাধনা যুগলসাধনা। এই সাধনায় নারী পুরুষ উভয়েই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। এই সাধনায় কোনো নিষ্ঠুর বা জটিল পদ্ধতি, গাছগাছড়া বা গাছের বীজ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় না। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাবলা গাছের 'বীজ' ধাতুকালীন সময়ে ব্যবহারের কথা জেনেছি। দুটি বীজ ব্যবহারে দীর্ঘদিন সন্তান সম্ভাবনা থাকে না। ৩টি বীজ ব্যবহারে সমগ্র জীবনে আর সন্তান হয় না। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

বাউলেরা যে বীর্যস্খলন করে না তা ঠিক নয়। তবে এই স্খলন অত্যন্ত কৌশলে হয়। আলমপুর এবং ছেঁউড়িয়াতে বাউল সাধকগণ 'আট ইঞ্চি' বিষয়টিকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে। বাউলদের মতে নারী যোনির গভীরতা আট ইঞ্চি বা ষোল আঙুল। বাউলেরা যোনির গভীরে বীর্যপাত না করে যোনির মুখদেশে যা ৪ (চার) আঙুল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। বাউলসাধক সেখানে স্খলন করে। এবং বীর্যপাতের সঙ্গে সঙ্গে সাধিকা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে এবং কৃত্রিম উপায়ে জোরে হাঁচি দেয়। ফলে জরায়ুর মুখ পর্যন্ত বীর্য পৌঁছাতে পারে না। এই পদ্ধতিকে 'আজল' নামেও চিহ্নিত করা হয়।

বলেছি, বাউলদের সঙ্গে যেমন বাতেনী সুফিদের ঘনিষ্ঠ সংযোগই শুধু নয়, বলা যেতে পারে এই মত ও পথ তাদের একটি শাখাবিশেষ, তেমনি এ দেশীয় নাথযোগী এবং সহজিয়াদের সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। ফলে দেহমিলনে বাউলেরা তাদের পদ্ধতিও অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিতে বীর্য স্খলন যোনিতে না করে সাধিকার মুখে করা হয় এবং তা একে অপরে অর্থাৎ উভয়েই গ্রহণ করে। লালনের গানে বীর্যকে 'অধর চাঁদ' বলে উল্লেখ করে তাকে ধরার কৌশল হিসেবে বলা হয়েছে :

ধররে অধর চাঁদেরে
অধরে অধর দিয়ে ॥

যদি পুরুষের ডান নাকে শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকে তবে কৌশলে বাম নাক থেকে ডান নাকে তা প্রবাহিত করতে হবে। মেয়েদেরও তেমনি ডান নাক থেকে বাম নাকে শ্বাস-প্রশ্বাস কৌশলে প্রবাহিত করতে হবে।

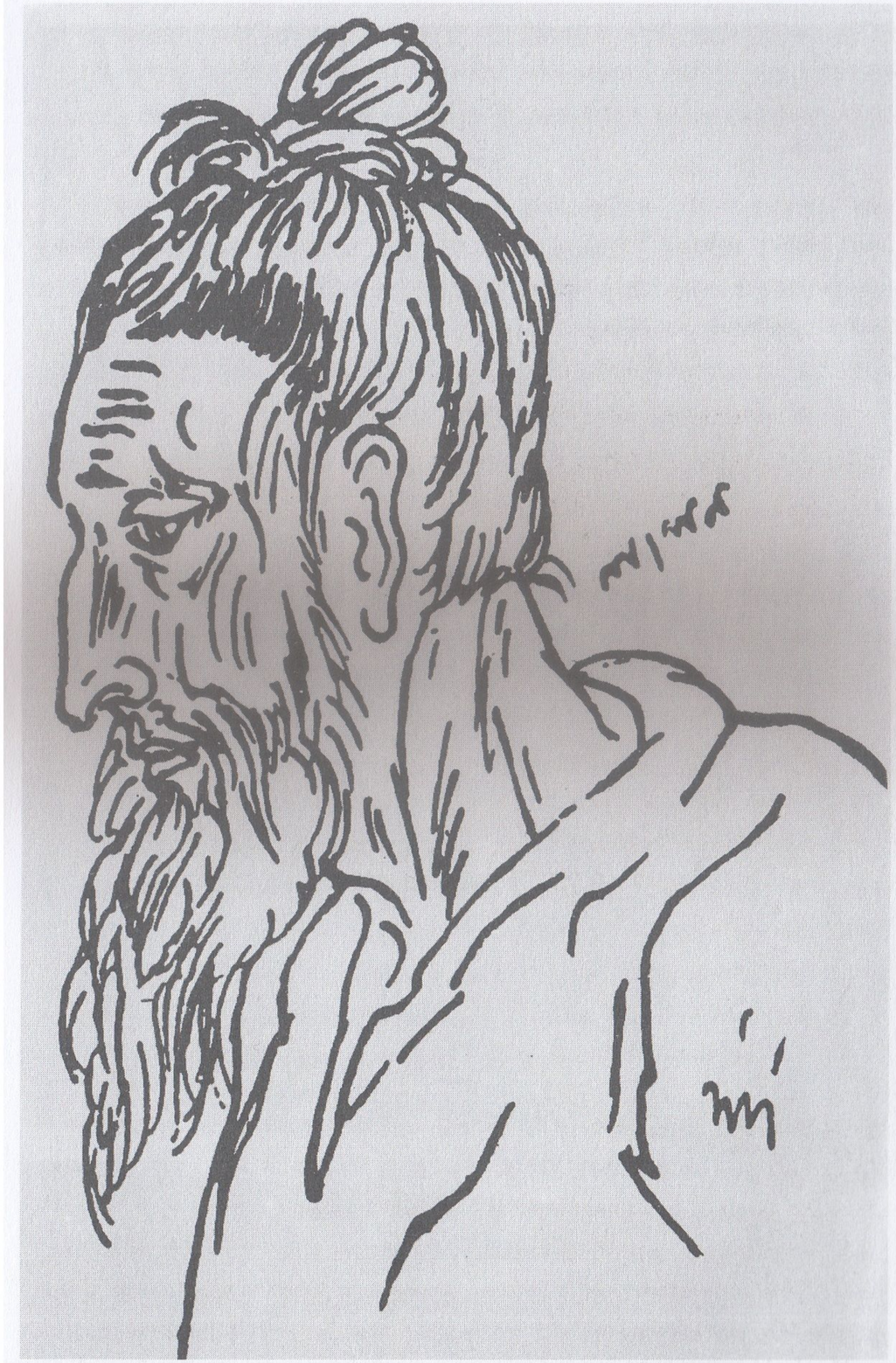
দেহমিলনে উভয়ে সক্রিয় থাকবে এবং প্রথমেই দীর্ঘক্ষণ ধরে শৃঙ্গার ইত্যাদিতে রত হতে হবে। অতঃপর ধীরে ধীরে সাইকেল চালনার মতো করে কিংবা ছাদ পিটানোর তালে তালে দেহমিলনে রত থাকতে হবে। কখনও সাময়িক বিরতি অথবা দেহে স্থিতিদান মিলনকে দীর্ঘস্থায়ী করে। এই পদ্ধতিতে সহজে বীর্যপাত হয় না। বীর্যপাতের সম্ভাবনা থাকলে উভয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখবে এবং কিছুক্ষণ নিষ্ক্রিয় থাকবে।

দ্বিতীয় কৌশল : শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জিকর। বাউলদের ভাষায় নফি-তজবাত। কোনো কোনো বাউল আল্লা বলে শ্বাসকে উর্ধ্বগতি ধান করে 'r' শব্দে স্ত্রীজননাঙ্গে জোরে প্রক্ষেপণ করে। একে ইংরেজিতে Tkrushins বলা চলে। এই পদ্ধতিকে শরীরচর্চার কৌশল বা জিমন্যাস্টিক পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে সহজে বীর্যপাত হয় না এবং দেহমিলন প্রলম্বিত করা যায়। কিন্তু বাউলফকির মতে এই প্রক্রিয়া সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। বাউলদের যৌনজীবন অত্যন্ত সুখের এবং তৃপ্তিদায়ক। এদের মধ্যে দেহমিলনকালে আসনের সংখ্যা সীমিত। এরা মিলনকালকে দীর্ঘস্থায়ী করে এবং প্রয়োজনে রতি নিক্ষেপ করে। রতিনিরোধের ক্ষেত্রে কয়েকটি কৌশল রয়েছে। প্রথমত, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ। একে বাউলেরা দমের সাধনা বলে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম রতিনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর। যে এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত তাকে বাউল বলা হয়। বাউলদের মতে বায়ু+উল=বাউল। সাধক দেহমিলনে বায়ুর গতিপ্রকৃতিকে গুরু প্রদর্শিত পথে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হলে তাকে বাউল, সাঁই ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বাউলের 'সাঁই' তার মনের মানুষ। তার কোনো সন্তানাদি নেই। তিনি কেবল

লীলায় অভ্যস্ত। তিনি মানুষের মধ্যে 'রসের রসিক' হিসেবে বিরাজ করেন। তাঁকে পেতে হলে সাধনার প্রয়োজন। বাউল বলে :

কোথায় আছেরে দীন দরদী সাঁই।
চেতন গুরুর সঙ্গে লয়ে খবর করো ভাই ॥

এই চেতনগুরু সাধকের সঙ্গিনী-মহিলা। যা হোক, দেহমিলনে যে শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ তা গুরুর কাছে শিখতে হয়। সাধারণত ডান নাক দিয়ে পুরুষ শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে এবং মহিলা নেবে বাম নাকে। অর্থাৎ দেহমিলনে পুরুষের ডান এবং মহিলার বাম নাকে শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকবে।



শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত লালন চিত্র



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত লালন চিত্র
স্থান : শিলাইদহ বোট
২৩ বৈশাখ ১২৯৬, ৫ মে ১৮৮৯



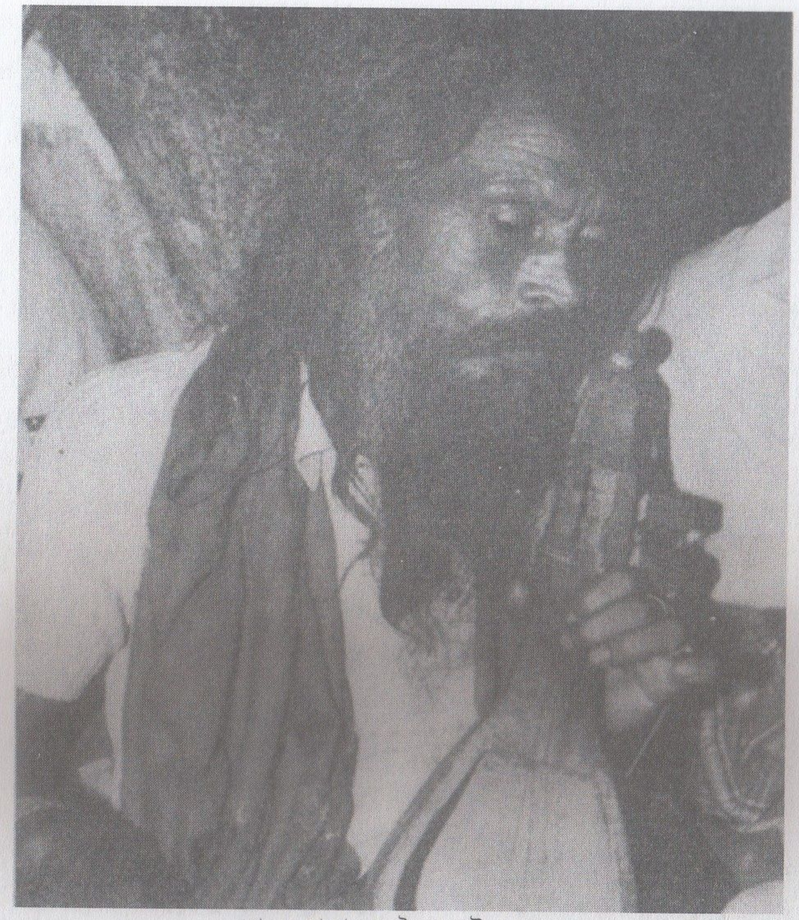
১৯৫৭ সালে ছেউড়িয়া গ্রাম, ডানদিকে লালন শাহের স্মৃতিসৌধ



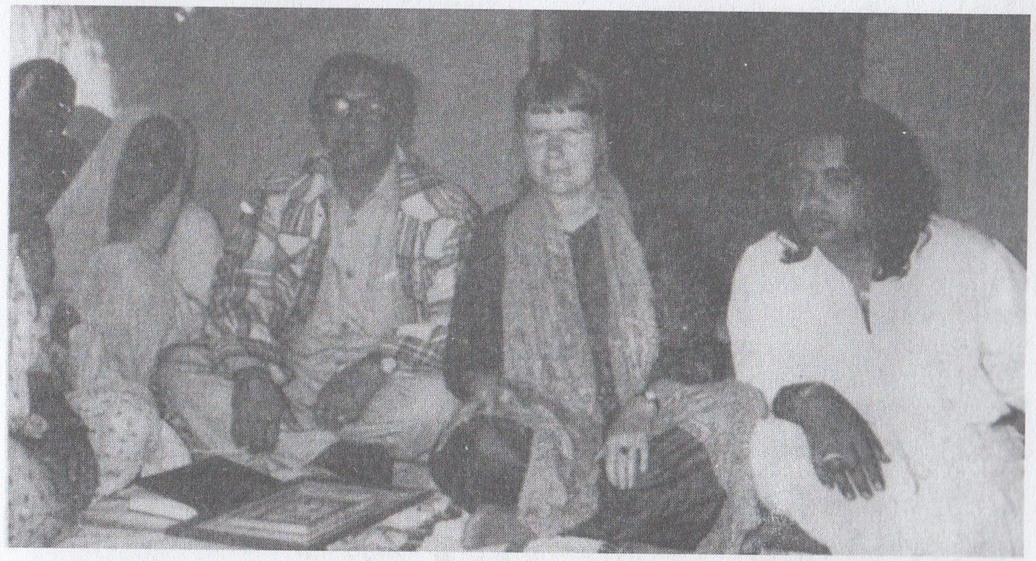
বাউল গায়ক মকছেদ আলী শাহ



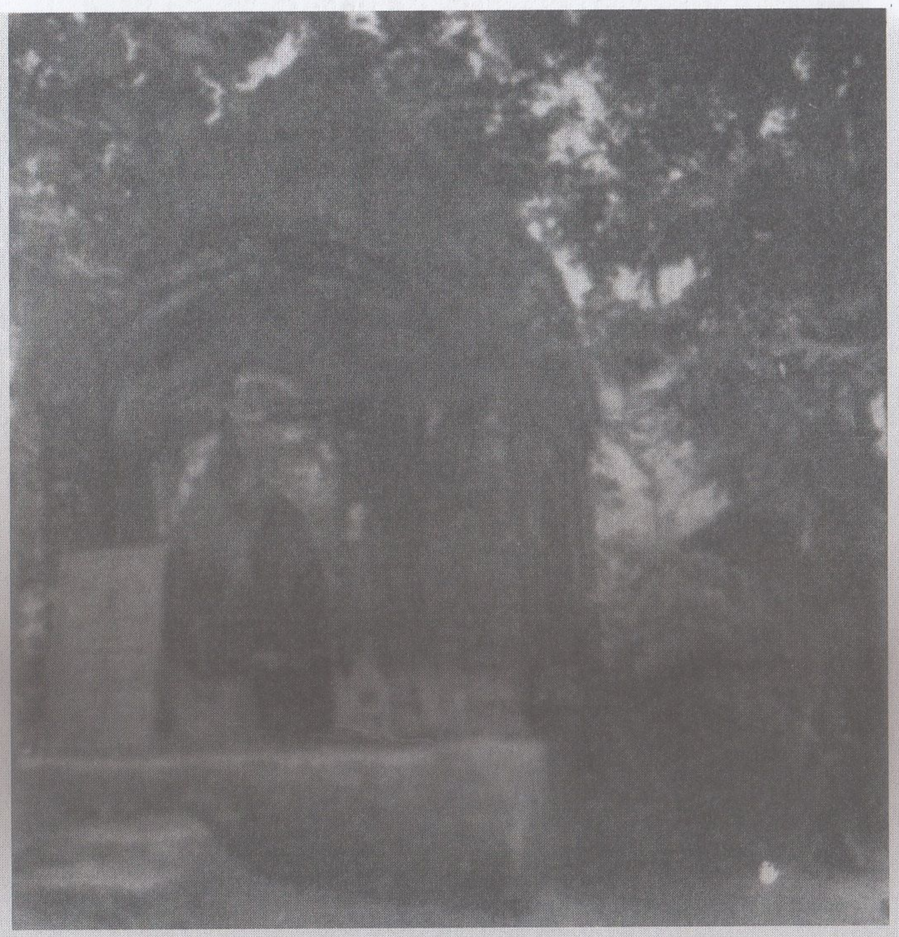
মেহেরপুরের গোলাম ঝড়ু শাহ ও তার স্ত্রী মূলাজান



লালন মাজারে জনৈক বাউল গায়ক



বাঁ থেকে—খোদা বকশ সাঁইয়ের স্ত্রী রাহেলা, বাউল গবেষক ড. আনোয়ারুল করীম, নরওয়ের একজন কবি ও লতিফ সাঁই



পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়ার কুবির গোঁসাই (১৭৮৭-১৮৭৯)-এর সমাধি



লালন মাজারে ভক্তিরত সাধক ও সাধিকা



চুয়াডাঙ্গার গণা ফকির (চুয়াডাঙ্গার পথেঘাটে এদের দেখা মেলে)



খোদা বকশ সাঁইয়ের প্রধান শিষ্য হেদায়েত আলী সাঁই



বাউল ফকির চাঁদ ও তার সেবাদাসী জোমেলা (রাজশাহী)



একুশে পদকপ্রাপ্ত বাউল খোদা বকশ সাঁইয়ের পরিবার : বাঁ থেকে
মেয়ে মালঞ্চ, স্ত্রী রাহেলা খাতুন, ছেলে লতিফ সাঁই ও তাঁর স্ত্রী



চুয়াডাঙ্গায় বেহাল সাঁইয়ের সমাধি



মহিন শাহকে ভক্তি করছে এক শিষ্য



মহিন শাহ ও তার ভক্ত



ফরিদপুরে আলমডাঙ্গা গ্রামের ভদু বিশ্বাসের খিরকা প্রদান অনুষ্ঠান



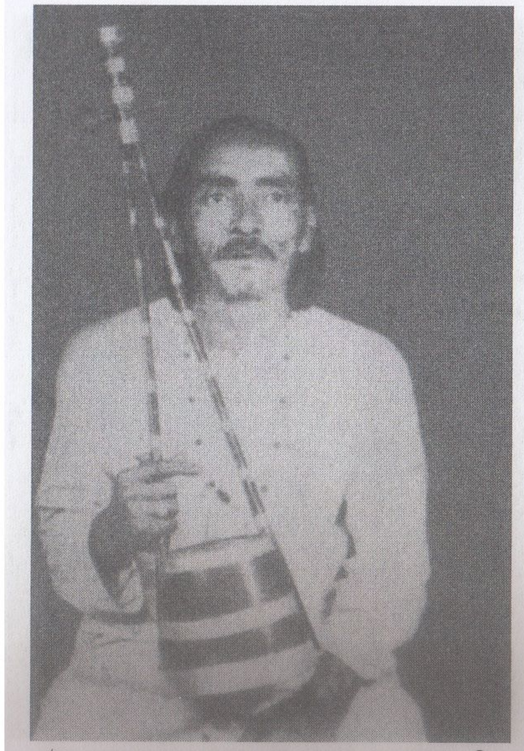
বাউল সাধনায় দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষাপ্রদানকারী ইয়ামিন শাহ,
দীক্ষাগ্রহণকারী আব্দুল গনি শাহ



বাউল গায়ক মহেন্দ্র গোঁসাই



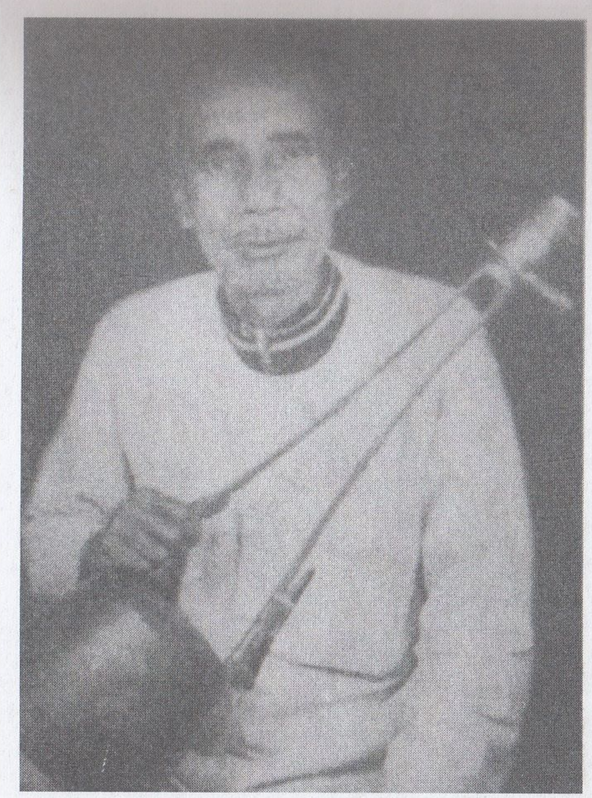
বেহাল শাহ, কানাই শাহ, গোলাম ইয়াসিন শাহ, মকছেদ আলী শাহ ও অন্যান্য বাউল



বাউল গায়ক খোদা বকশ শাহ (একুশে পদকপ্রাপ্ত) শিল্পকলা একাডেমীর লোকসংগীত বিভাগের প্রশিক্ষক ছিলেন



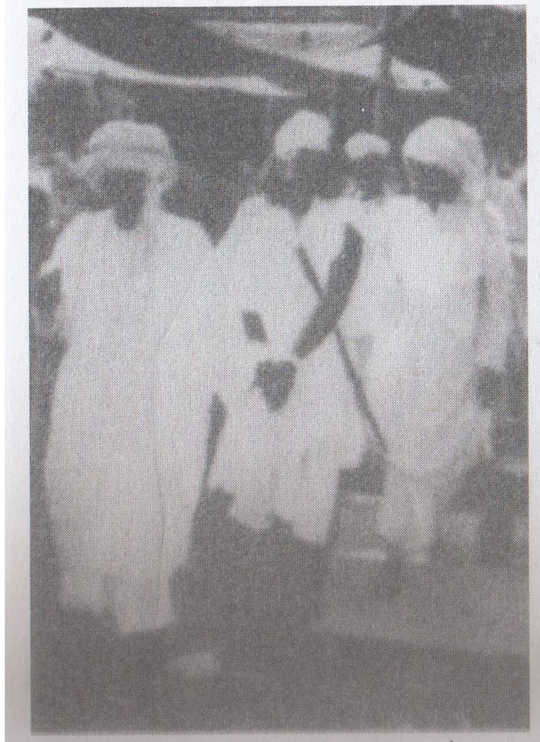
বাউল গায়ক হেদায়েত আলী শাহ



বাউলগুরু বেহাল শাহ (কুষ্টিয়া)



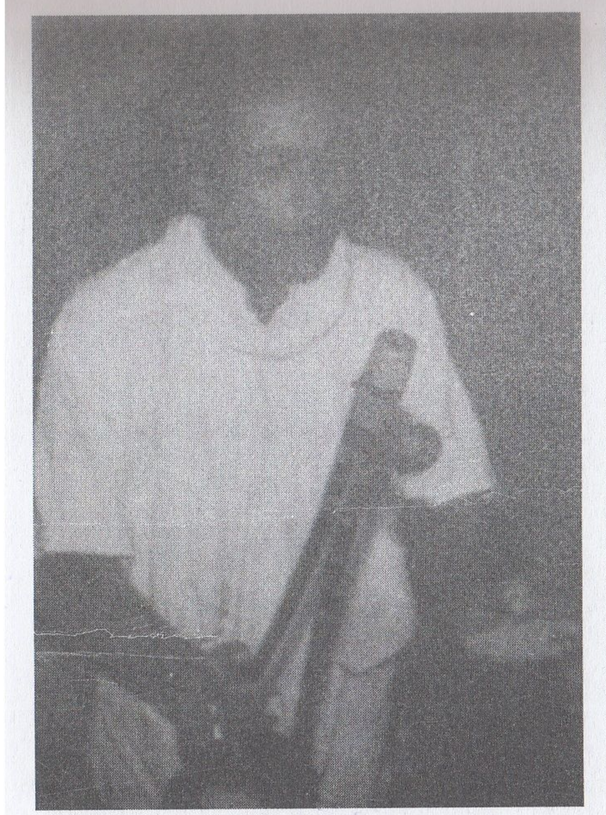
বাউল গায়ক হিরু শাহ



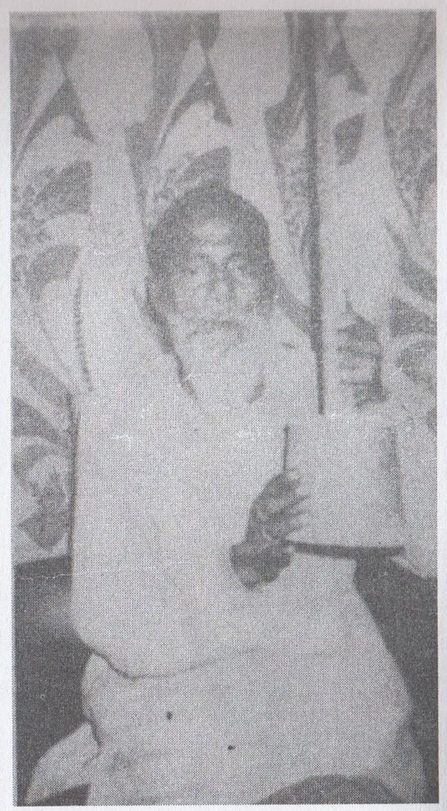
বাউল মতে একটি খিরকা প্রদান অনুষ্ঠান



বাউল গায়ক গোলাম ইয়াসিন শাহ



বাউল গায়ক আমানুল্লাহ্



বাউল গায়ক মুন্সীগঞ্জের অজিত গোঁসাই



চুয়াডাঙ্গার মধুপুর গ্রামের সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রধান গীতিকার কুবীর গোঁসাই (১৭৮৭-১৮৭৯)-এর ভিটে



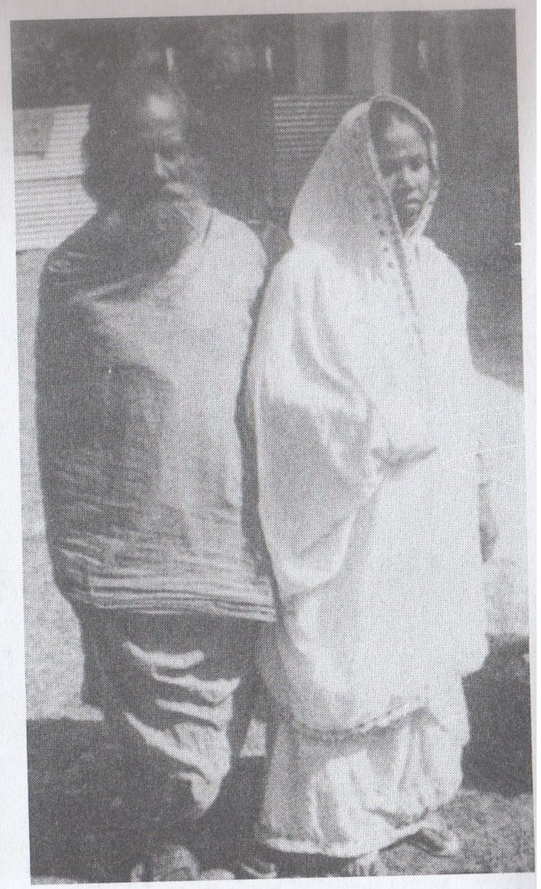
চুয়াডাঙ্গার জাঁহাপুর গ্রামে খোদা বকশ সাঁইয়ের (একুশে পদকপ্রাপ্ত) সমাধি



চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ফরিদপুরে আমজাদ আলী, তপু বিশ্বাস ও তার স্ত্রীর খিলাফত দান অনুষ্ঠান



লালন মাজারে একজন বাউল গায়ক



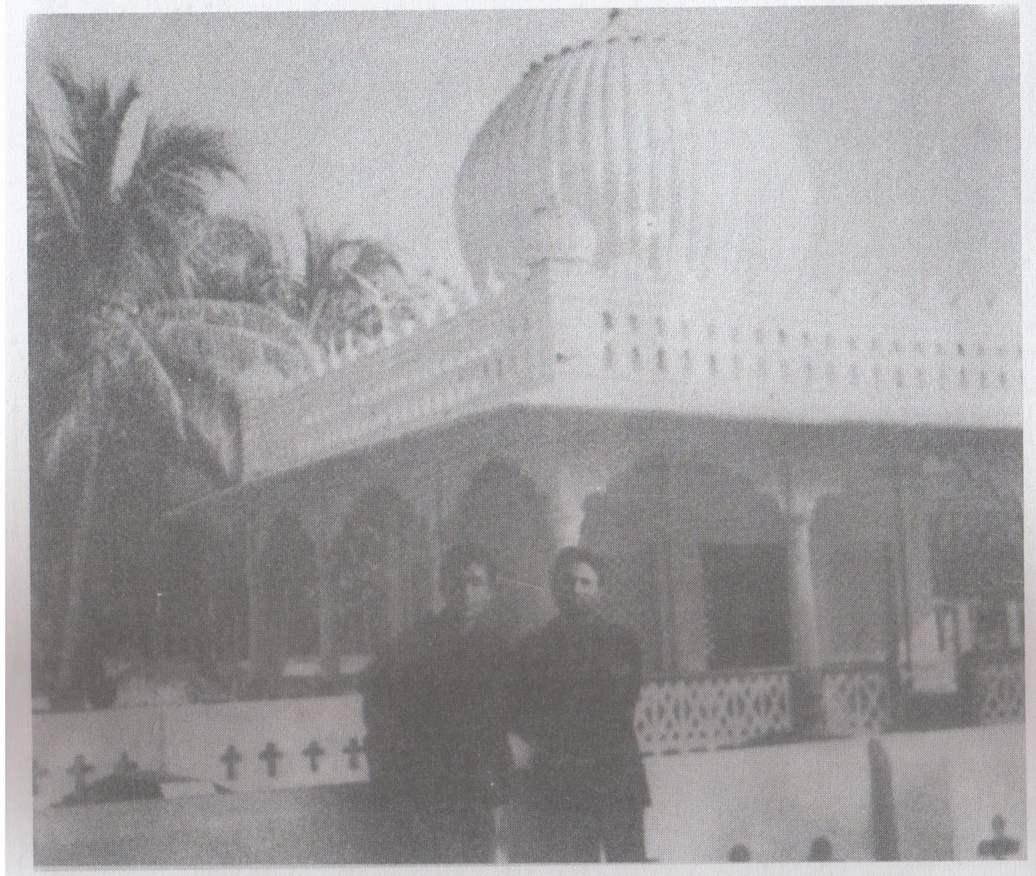
একজন গৃহী বাউল ও তার সেবাদাসী (লালন মাজার)



লালন মাজার প্রাঙ্গণে : সিদ্ধিপানরত বাঁ থেকে দ্বিতীয় সরুপ শাহ, নিজাম শাহ ও কোমেলা



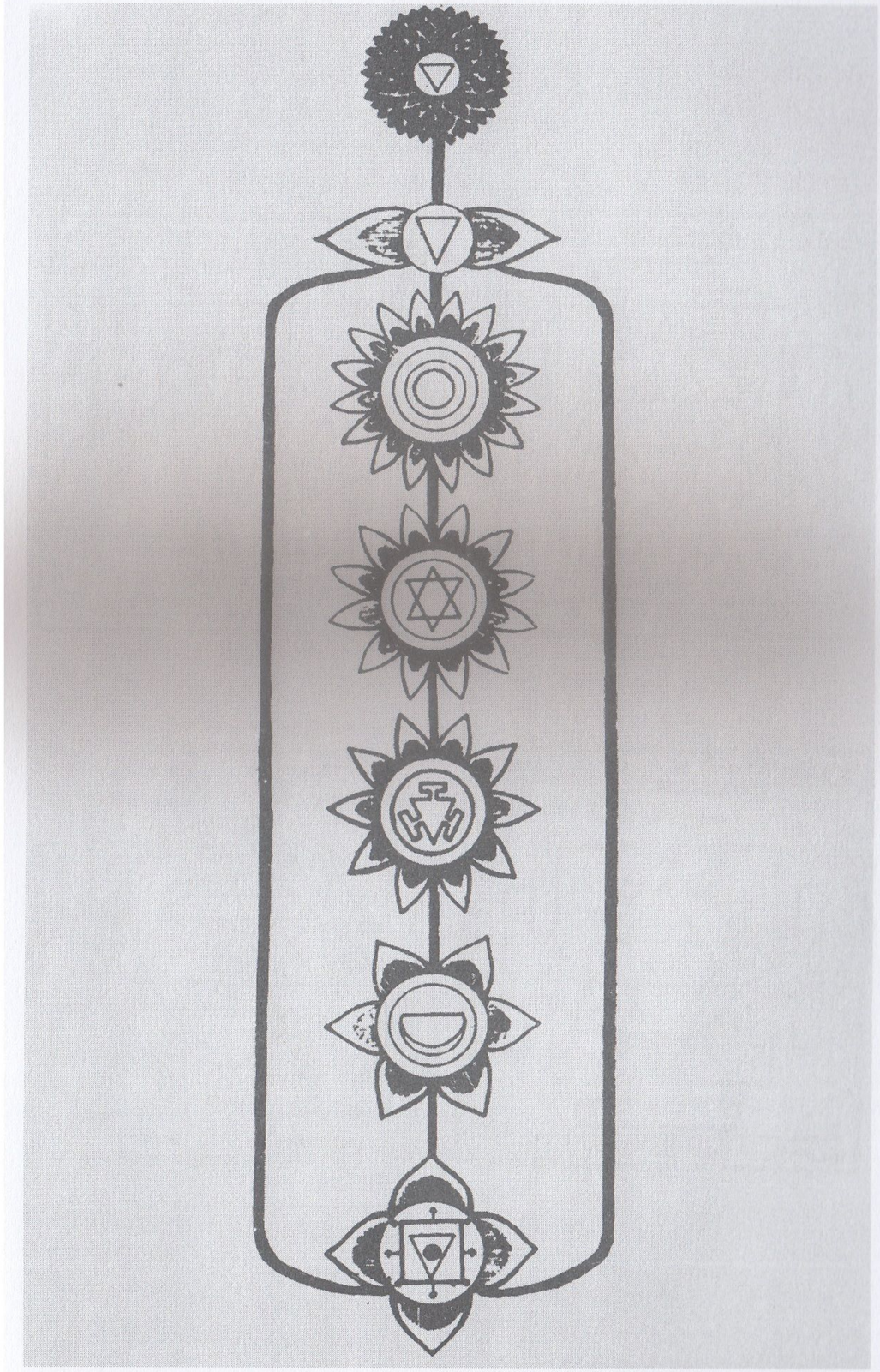
সিদ্ধিপানরত বাউল নিমাজ শাহ ও কোমেলা বিবি



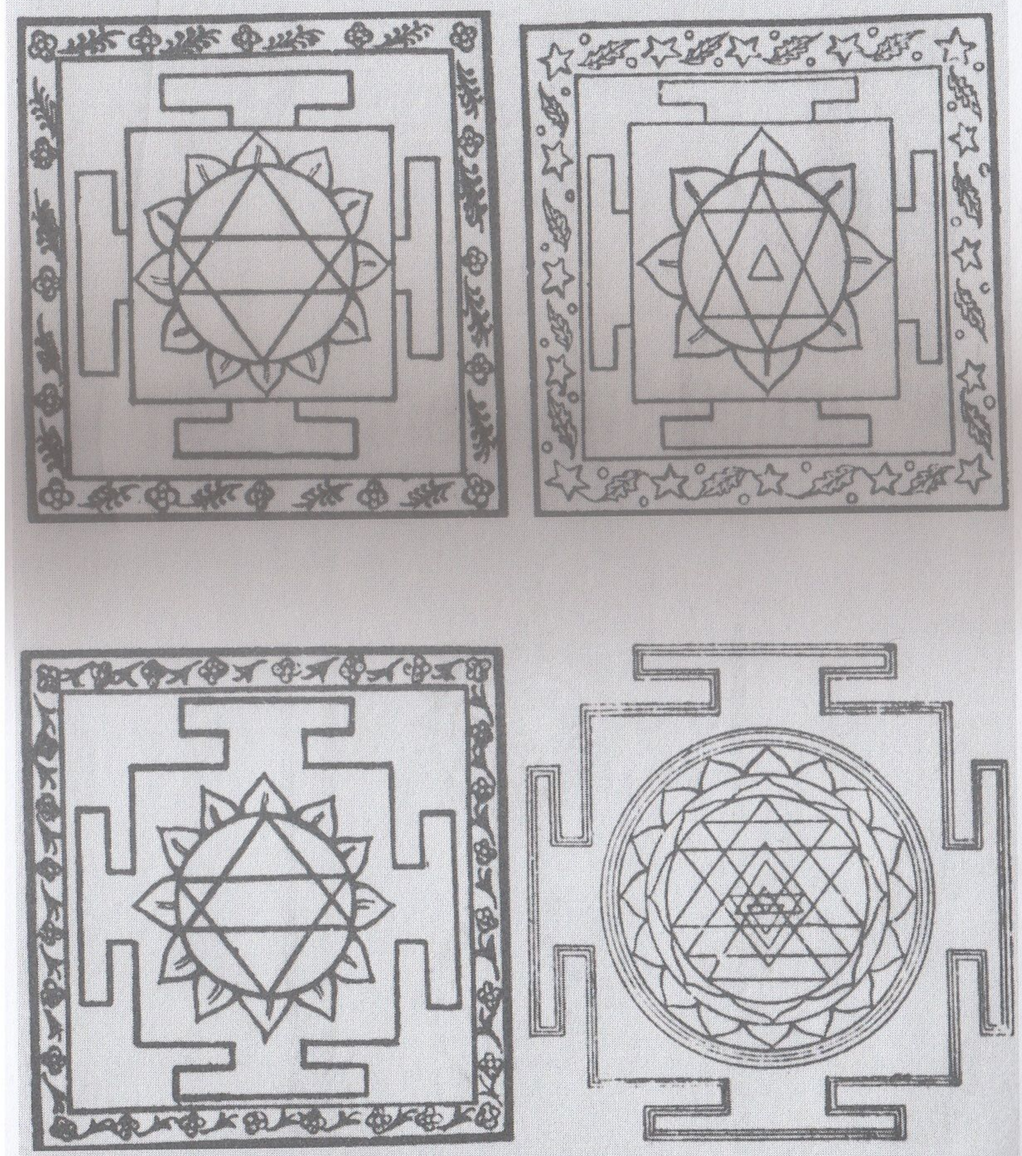
ছেঁউড়িয়াতে (কুষ্টিয়া) লালন মাজার। মাজারের সম্মুখে দুজন লালনভক্ত



মাঝে হীরু শাহ এবং তার উভয়পাশে লালনভক্ত



ষটচক্র



দেহ সাধনায় পদ্ম ও যন্ত্রের ব্যবহার

বাউল ধ্বংস ফতওয়া

অর্থাৎ

বাউল ফকিরি মত ধ্বংস

বা রদ কারী ফতওয়া

This book belongs to
Afsar uddin Ahmed
P.O. Alampur
Vill: Bahadpara
Dist Rangpur

দ্বিতীয় খণ্ড

হাজী মৌলবী রেয়াজউদ্দীন আহমদ

বাঙ্গালীপুর পোঃ সৈয়দপুর, জিলা রংপুর,

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

১ম সংস্করণ

১৩৩৩ সন

এছলাম প্রচারের সাহায্য কল্পে চাঁদা

মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

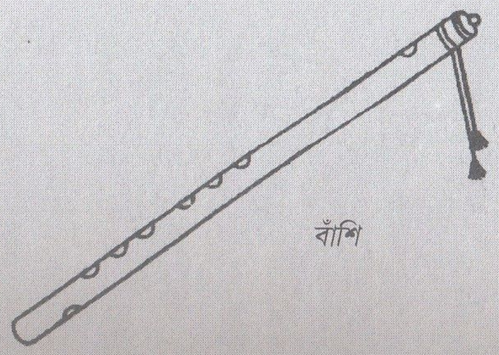
বাংলা ১৩৩৩ সালে মুদ্রিত বাউলবিরোধী একটি বইয়ের ইনার



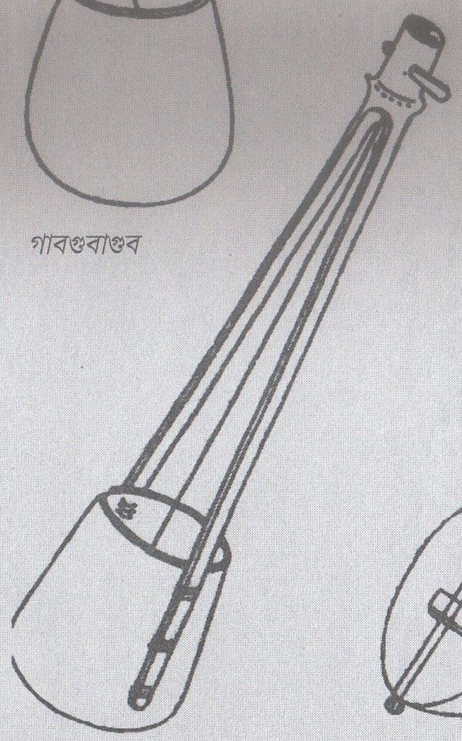
বাউলগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র



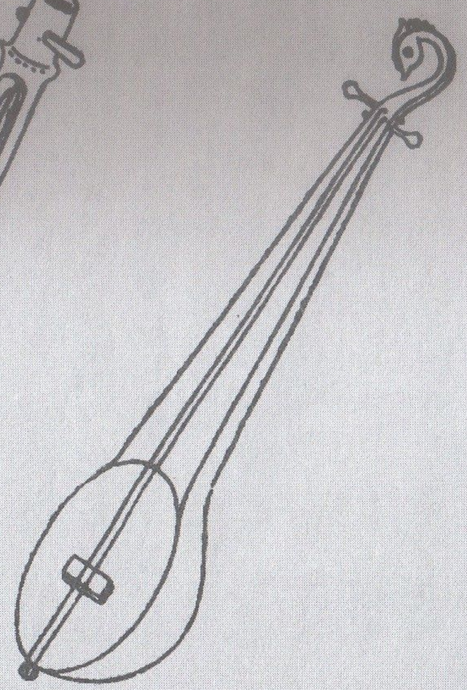
গাবগুবাগুব



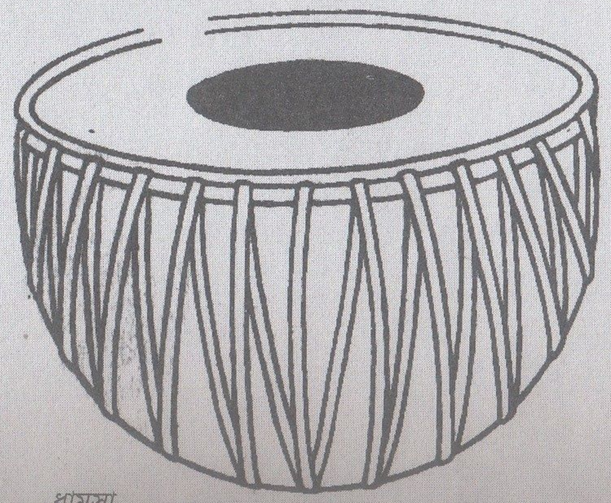
বাঁশি



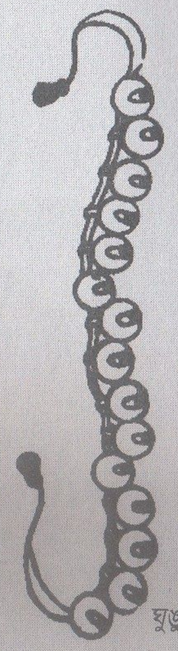
একতারা



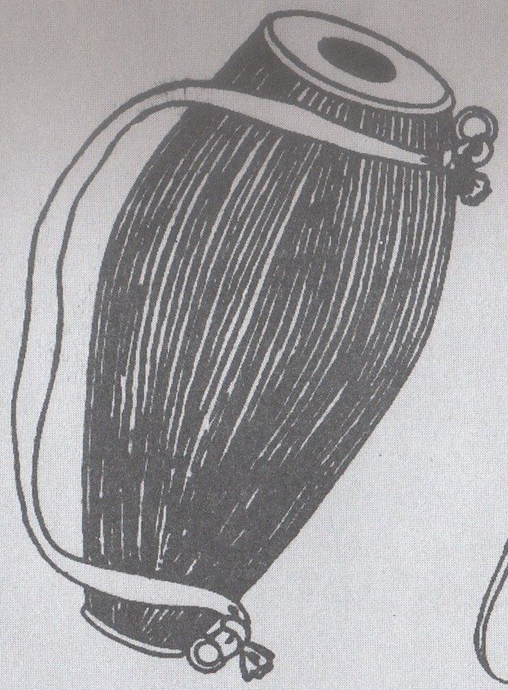
দোতারা



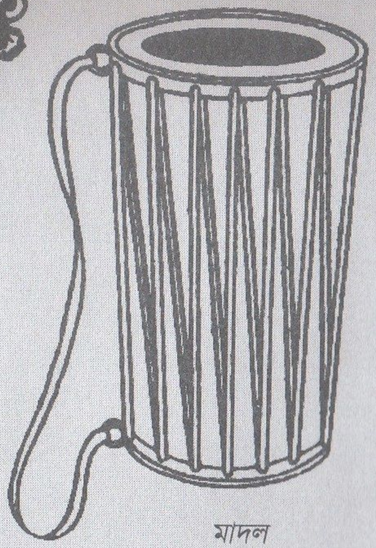
ধাম্‌সা



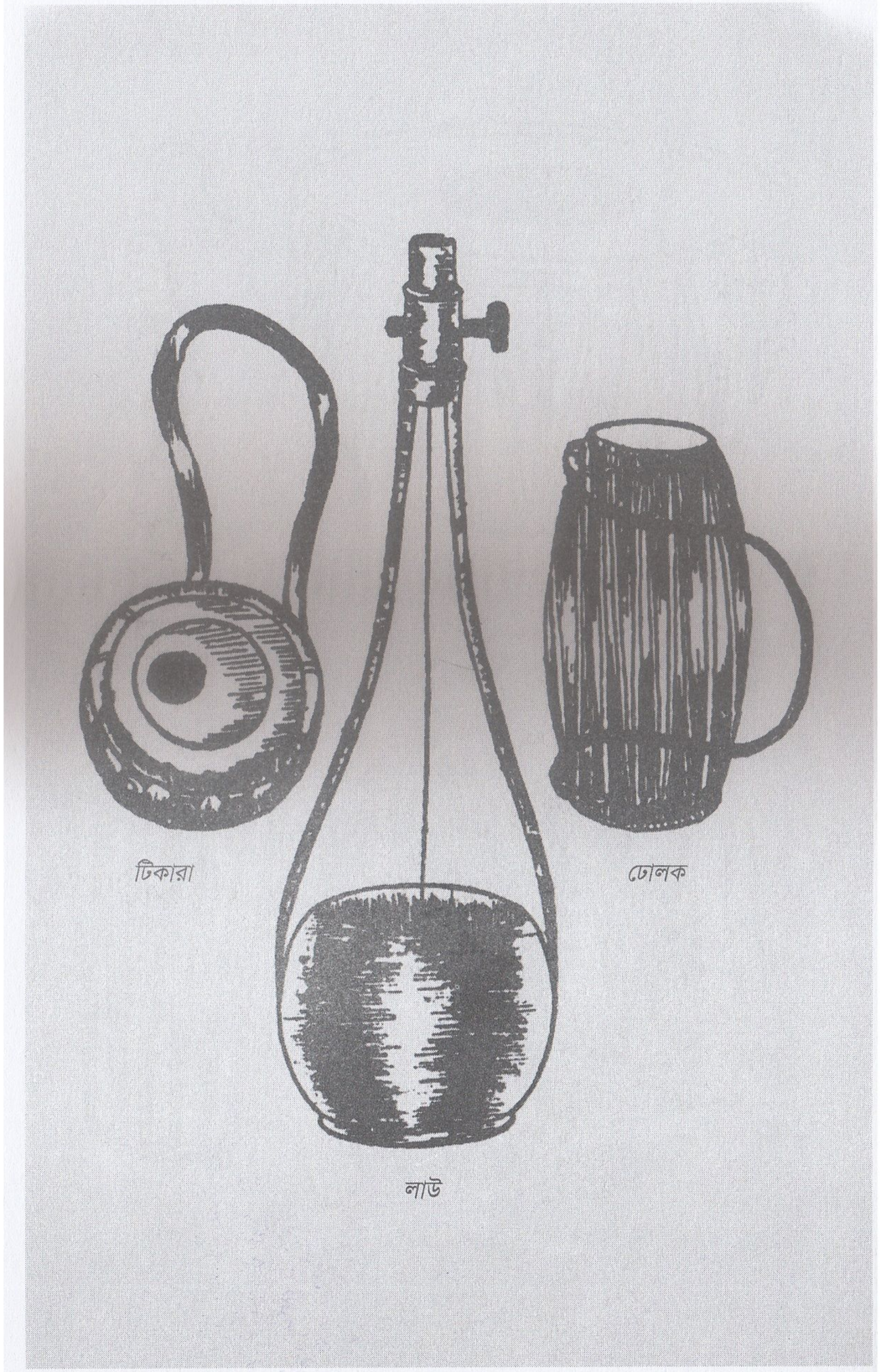
ঘুঙুর

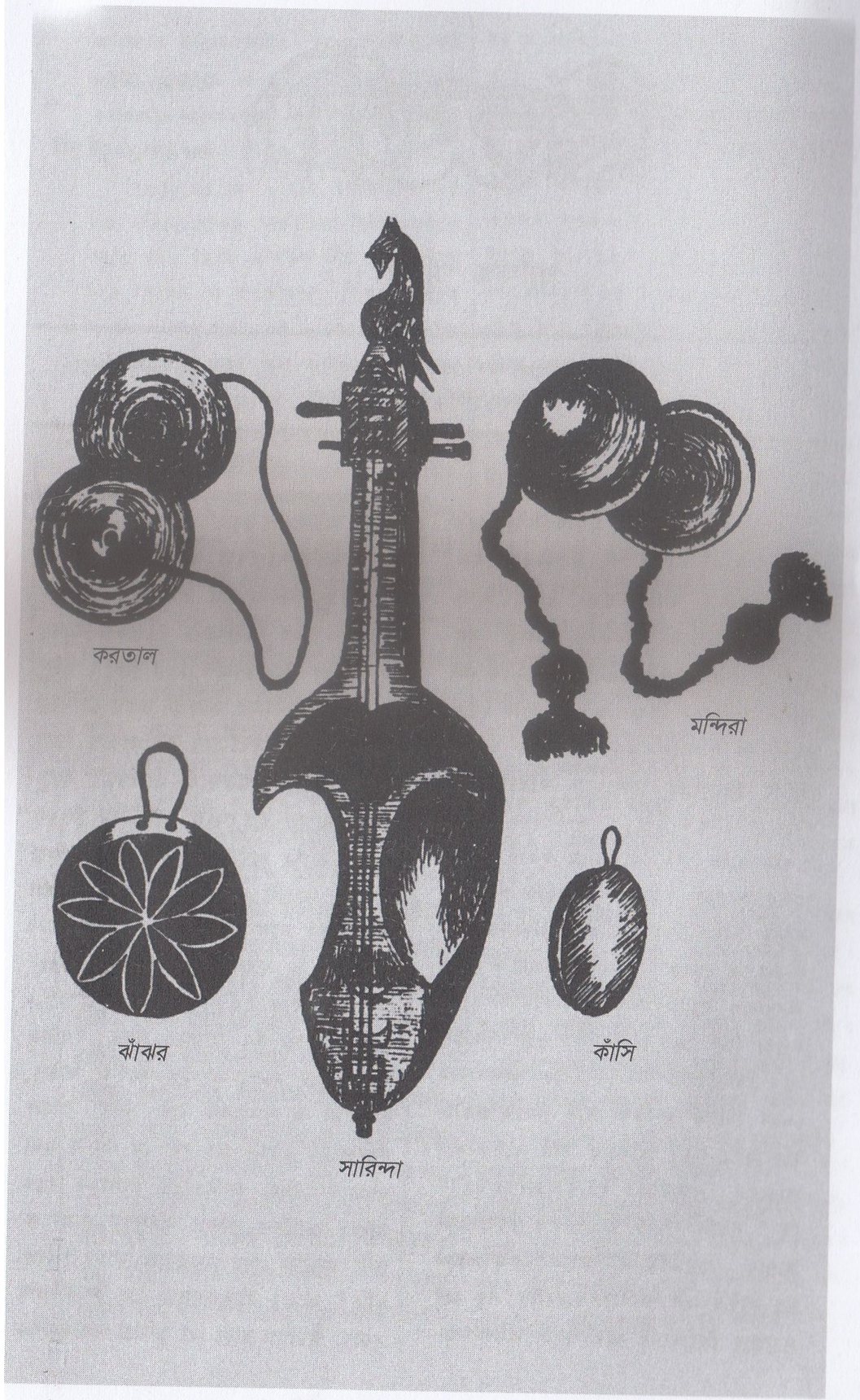


মৃদঙ্গ



মাদল


টিকারা
ঢোলক
লাউ


করতাল
মন্দিরা
ঝাঁঝর
কাঁসি
সারিন্দা

কুষ্টিয়া মাজিনীপাড়া হইতে প্রকাশিত।

হিতকরী

বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাক মাশুল ১৲ টাকা।
নগদ মূল্য ১০ দুই পাই

পাক্ষিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। | সন ১২৯৭ সাল। ১৫ই কার্ত্তিক। ১ম পক্ষ। ইং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। ৩১ এ অক্টোবর। | ১৩শ সংখ্যা।

মহাত্মা লালন ফকীর।

লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্য্যন্ত বহু জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য; তাহাতে আমরা শিষ্য এক হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেউড়িয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫।১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি তত ভালবাসিতেন না। শিষ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হইতে প্রতীয়মান হইত না। আখড়ায় তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেন; সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মতানুসারে ইঁহার যে সন্তান সম্ভতি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে বাউল-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের এই নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের মত কতক বিষয়ে অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবার ও বাউলের মতে যে কতক দেখিতে পাই, লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি সাধুসেবায় অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ বাড়াবাড়ি নাই। পরন্তু ইহাঁদের পক্ষে মহাপাপ। তবে প্রত্যেক সৎ নিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে। বাউল, সাধুসেবা ও লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটী গুরু ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের মনে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান জনমের পথ এককালে রুদ্ধ। "সাধুসতি" শব্দের বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে উৎকৃষ্টতার ব্যবহার, ইহারা তাহা না বুঝিয়া অন্যান্যবিধ

হিতকরী।

প্রকিয়ার ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে। এই জঘন্য ব্যাপারে এ দেশ ছারখারে যাইতেছে, এ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বেশী কিছু জানাইতে ইচ্ছা নাই।

শিবাদিগের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকীরের বিচার হইতে পারে না। তিনি এ সকল নীচ কার্য্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম্মজীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখা পড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকীর নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্ম্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত। বৈষ্ণবধর্ম্মের বড় গৌরব করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইহাঁকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরব্রহ্মে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইহাঁকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা হয়; কিন্তু ইহাঁকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় ভক্তিভাবে সৌম্য মূর্ত্তিতে অধিক কি ইহাঁর শিষ্যগণ ইহাঁর উপাসনা ব্যতীত আর তাহাদের উপাসনা যোগ বলিয়া মানিত না। মরমিয়া "সাঁই" এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি সোহাগ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদবিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণবধর্ম্মের দিকে ইহাঁর অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময়ে যে উচ্চসাধনের কথা ইহাঁর মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। লালন ফকীর নাম শুনিয়াই হয় ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকীর ছিলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে; ইনি সংসারী ছিলেন, সামান্য জোত জমা আছে; বাটী ঘরও মন্দ নহে। জিনিষপত্রও মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার বলিয়া মরিয়া যান। ইহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্ম্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্য্যে প্রয়োগ জন্য ইনি একখানি কবলমাত্র করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজে শেষকালে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরাই ইহাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা [মহোৎসব] দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্য ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংকীর্ত্তন ও আলোচনা হইত। তাহাতে তাঁহার ৫০৲ শত টাকা ব্যয় হইত।

ইহাঁর জীবনী সংগ্রহের কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা বড় ও তাঁহার নিষেধক্রমে না বড় অজ্ঞতা বশতঃ কিছুই বলিতে পারে না। যে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর আহারে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাড়া সৌমক বংশীয়েরা ইহাঁর জাতি ইহাতে বোধ হয় তাহাও নিশ্চিত নহে। ইনি বাল্যে ঈশ্বরানুরাগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কতক দিবসের জন্য পরিব্রাজক হয়েন। পরে পুনর্ব্বার কুষ্টিয়া মুসলমানের বাসায় আসিয়া ফকীর হয়েন।

ইহার দুই মহকুমোদের নাম বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১০ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অধারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অধারোহণেও স্থানের যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে ইহাঁর পেটের ন্যাময় হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি ফলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পাচিত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ব্বৎ সাধন করিতেন, মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্ম্মের আলাপ পাইলে সরলভাবে বলিয়াম হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। এই সময়ের রচিত কয়েকটী গান আমাদের নিকট আছে। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইহাঁর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৩টার সময় শিষ্যগণকে বলেন "আমি চলিলাম।" ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোন সাম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। সুতরাং মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরেরাম নামও দরকার নাই। হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাহারই উপদেশ অনুসারে আখরার মধ্যে একটী ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহা... । শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মাণিক সা ও কুদুস প্রভৃতি কয়েক জন ভাল লোক আছেন। ভরসা করি, ইহাদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না, লালন ফকীরের অসংখ্য গান সর্ব্বত্রে সর্ব্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহার নাম, যশ, মত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে। তাঁহার রচিত একটী গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

গান।

সব লোকে কয় সাধন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কিরূপ দেখলেম না এই
[মন্মরে।

১। কেউ মালায় কেউ তসবি গলায় তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়, যাওয়া কিম্বা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কার রে।

২। যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান, তাইত ভিনি পৈতা প্রমাণ, যাদি ভিনি ভিন্নে রে।

৩। অগৎ বেড়ে জেতের কথা, লোকে গৌরব করে যথা তথা, লালন সে জেতের ফাতা খুচিয়াছে সাধ বাজারে।

গ্রন্থপঞ্জি

অকিঞ্চন দাস (শ্রী শ্রী কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত) : শ্রীশ্রী বিবর্তনবিলাস গ্রন্থ, তারা লাইব্রেরী, কলকাতা।

অক্ষয় কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, ভূমিকা : বারিদবরণ ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৪।

অক্ষয় কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৬।

অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, ৩য় মুদ্রণ, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮১।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৮৪।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৫।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: (সম্পাদিত) বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা, প্রথম প্রকাশ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০।

অতীন্দ্র মজুমদার : চর্যাপদ, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ২য় বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৭৯।

অন্নদাশঙ্কর রায় : লালন ফকির ও তার গান, মিত্র এন্ড ঘোষ প্রা. লি. কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৪০২।

অমরেন্দ্রনাথ রায় : শাক্তপদাবলী (সম্পাদিত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫১।

অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা, কলকাতা ১৯৫৫।

অতুল সুর : ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৮।

অমিত গুপ্ত : বাউলের দেহতত্ত্ব, সমকালীন, কলকাতা, ১৯৮২।

: বাউল ও গবেষক, সমকালীন, কলকাতা, ১৯৮২।

অমিত গুপ্ত : বাংলার লোকজীবন বাউল, সংবাদ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩।

অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী : বাংলার বাউলধর্ম ও গিরিলাল গীতিকা, পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৫।

অবিনাশ চক্রবর্তী : বাউল বিংশতি (বিহারীলাল), কলকাতা, ১৩০৭।

অর্জুন বিকাশ চৌধুরী : ভারতীয় দর্শন, ৩য় সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৭৪।

অমিতাভ চৌধুরী : জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৩।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় : জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলকাতা, ১৯৮১।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলকাতা, ১৯৮১।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত, ১ম সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫০।

অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬।

অজিত কুমার ঘোষ : রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭১।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণীচন্দ : ঘরোয়া, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৯৬২.

অরুণকুমার বসু : বাংলা কাব্যসঙ্গীত, রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা, ১৯৬৬।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, ২য় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৩৭৭।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রমনীষা, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৩৬৮।

অমরপাল ও দুলাল চৌধুরী : বাংলার পল্লীসংগীত, কলকাতা।

আব্দুল জলিল (অনুবাদক) : দাতাগঞ্জে বখ্‌শ বিরচিত, কাশফুল মাহজুব, প্রথম প্রকাশ, শাম্‌স পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৮৪।

আব্দুল হাকিম : নূরনামা, চারি মোকাম ভেদ।

আলি রাজা (কানু ফকির) : জ্ঞানসাগর, সংগ্রহ ও সম্পাদনা মুনশী আব্দুল করিম, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী, ১৩২৪/১৯১৭ দ্র. আহমদ শরীফ, বাংলার সুফীসাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯।

আব্দুল করিম : ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে সমাজবিস্তার, বাংলা একাডেমি পত্রিকা।

আব্দুল করিম : কালুগাজী-চম্পাবতী, গাউসিয়া লাইব্রেরী, তারিখবিহীন।

আব্দুল্লাহ : শাহমাদারের জঙ্গনামা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮৭২।

আজমাত উল্লাহ : সুফি সোনাউল্লাহর সিফাতনামা, ডিম এম ৪০৪, ক্রমিক নং ১২৬।

আহমদ শরীফ : বাংলার সুফী সাহিত্য (সম্পাদিত) প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯।

আহমদ শরীফ : মধ্যযুগের রাগতাল নামা, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ১৩৭৪।

আহমদ শরীফ : মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

আহমদ শরীফ : বাংলাতত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭৩।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড, গীত ও নৃত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, অষ্টমবর্ষ, ১৩৭৭।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর, ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ৩২ বেচারাম চ্যাটার্জী, রোড, কলকাতা, ১৩৭৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর, ৪য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ৩২ বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা, ১৩৭৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল, প্রবন্ধ : বিশ্ববীণা, ৫/২, ১৩৭০।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা, (লোক ঐতিহ্য, সম্পাদক আনোয়ারুল করীম) পত্রিকা অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৭, কুষ্টিয়া।

আব্দুর রহমান : শরফুল ইমান, ঢাকা, ১৯২৯।

আব্দুল গণি : জওহর-ই-মাকনুন, ঢাকা, ১৮৮০।

আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ৩য় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদনা) : রবীন্দ্রনাথ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮।

আবদুল হাই : লালন শাহ ফকীর, ঢাকা, ১৯৮০, হারামনি (৫ম খণ্ড) ঢাকা, ১৯৮৪।

আবদুল হাফিজ : বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া : শুকুর মামুদ বিরচিত গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।
আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ) : গোরক্ষ বিজয়, প্রথম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩২৪।
আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ) : পুঁথি পরিচিতি, সম্পাদনা আহমদ শরীফ, প্রথম মুদ্রণ, বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৮।
আলমগীর জলিল : মুসলিম মানস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী, ১৯৬৮।
আব্বাস আলি খান : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম সংস্করণ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৬৫।
আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য ১ম ও ২য় খণ্ড, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, মুক্তধারা, ১৯৭৭।
আশরাফ সিদ্দিকী : জমিদার দর্পণের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৬২।
আশরাফ সিদ্দিকী : লোকায়ত বাংলা, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮।
আশা দাশ : বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ১ম সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, ১৯৬৯।
আহমদ শরীফ : রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক, প্রথম প্রকাশ, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম, ১৯৭৪।
আব্দুল কাদের : বাংলার পল্লীগানে বৌদ্ধসাধনা ও ইসলাম, বিচিত্রা, কলকাতা, ১৩৩৫।
আবুল ফজল : রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম, সমকাল, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৮।
আবুল সয়ীদ আইয়ুব : পান্থজনের সখা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৩।
আনোয়ারুল করীম : বাউল কবি লালন শাহ, ১ম প্রকাশ, সাহিত্য নিকেতন, কুষ্টিয়া, ১৯৬৩।
আনোয়ারুল করীম : বাউল কবি লালন শাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৮, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।
আনোয়ারুল করীম : বাউল সাহিত্য ও বাউলগান, ১ম প্রকাশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।
আনোয়ারুল করীম : ফকির লালন শাহ, লালন একাডেমি, কুষ্টিয়া, ১৯৭৬
আনোয়ারুল করীম : রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, ফোকলোর রিচার্স ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া, ১৯৭৭।

আনোয়ারুল করীম : লালনের গান, লালন একাডেমি, কুষ্টিয়া, ১৯৮৪।
আনোয়ারুল করীম : কবিতা কথা, ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া, ১৯৯১।
আনোয়ারুল করীম : খান সাহেব আব্দুল ওয়ালী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।
আবুল আহসান চৌধুরী : কুষ্টিয়ার বাউল সাধক, প্রথম সংস্করণ, গণলোক প্রকাশনী, কুষ্টিয়া, ১৩৮০।
আবুল আহসান চৌধুরী : লালন স্মারকগ্রন্থ, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৭৪।
আবুল আহসান চৌধুরী : লালন শাহ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০।
আবুল আহসান চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ (সম্পাদিত) বাংলা একাডেমি ঢাকা ১৯৯০।
আবুল আহসান চৌধুরী : কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯০৮।
আবুল আহসান চৌধুরী : পাগলা কানাই, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।
আজাহার উদ্দিন খান : বাংলা সাহিত্যে নজরুল, চতুর্থ সংস্করণ, ডি এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৮।
আলাউদ্দিন আল আজাদ : শিল্পীর সাধনা, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা ১৩৭৫।
আলী নওয়াজ : খনার বচন ও কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ৩৫-৩৭, ধানমণ্ডি, সড়ক নং ০১, ঢাকা।
আদিত্য মুখোপাধ্যায় : ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল, শরৎ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯৮৮।
ইন্দিরা দেবী : বাংলার সাধক বাউল, কলকাতা ১৯৬২।
ইউসুফ হোসেন : মধ্যযুগীয় পাকভারতীয় সংস্কৃতি, অনুবাদক ফারুক মাসুদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৭।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : মাধবাচার্য বিরচিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল, কলকাতা, ১৮৫৮।
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : ভারতদর্শনসার, কলকাতা, ১৩৫৬।
উমেশচন্দ্র বটব্যাল : বাউলসম্প্রদায়ের আদি সাহিত্য, কলকাতা, ১৩০৮।
উমা রায় : গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকতত্ত্ব, নতুন সংস্করণ, ইন্ডিয়ানা অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৬৩।
উইলিয়াম হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমান (অনুবাদ) আব্দুল মওদুদ, ৩য় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
উইলিয়াম হান্টার : পল্লী বাংলার ইতিহাস (অনুবাদ) ওসমান গণি, ঢাকা, ১৯৭৬।
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউলগান, ২য় সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৮।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, রামমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৮৩।
(মুন্সী) এমদাদ আলি : রদ্দেনাড়া (পাণ্ডুলিপি), কুষ্টিয়া, তারিখবিহীন।
এ.এইস.এম. ইমামউদ্দীন : বাউল মতবাদ ও ইসলাম, কুষ্টিয়া, ১৯৫৯।
এস.এম. লুৎফর রহমান : লালন শাহ : জীবন ও গান, প্রথম সংস্করণ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।
এস.এম. লুৎফর রহমান : লালন জিজ্ঞাসা, ১ম সংস্করণ, ধারণী সাহিত্য সংঘ, ঢাকা, ১৯৮৪।
এস.এম. লুৎফর রহমান : বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা, সাহিত্য পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯১৩/১৩৭৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক আহমদ শরীফ।
এস.এম. ইকরাম : পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, প্রথম সংস্করণ, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৫৪।
এবাদত হোসেন : পদাবলী সমীক্ষা, প্রথম সংস্করণ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৩৭৬।
এম.এ. রহিম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২।
এন.এন. উপধ্যায় : বৌদ্ধ কাপালিক সাধনা, স্মৃতি প্রকাশন, এলাহাবাদ, ১৯৮৩।
ওয়াকিল আহমদ : বাংলার লোকসংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।
ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩।
করুণাময় গোস্বামী : রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩।
কল্যাণ মল্লিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধন প্রণালী, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫০।
কাজী নজরুল ইসলাম : নজরুল রচনাবলী, সম্পাদক আব্দুল কাদির, প্রথম প্রকাশ বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০।
কাজী আবদুল ওদুদ : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., কলকাতা, ১৮৮৪ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২।
কাজী আবদুল ওদুদ : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭৬।
কাজী আবদুল ওদুদ : ব্যবহারিক শব্দকোষ, কলকাতা।
কাজী আকরাম হোসেন : দীউয়ান-ই-হাফিজ, প্রথম সংস্করণ, আজাদ হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত, হোসেনী দালাল রোড, ঢাকা, ১৯৬১।

কাজী দীন মোহাম্মদ : সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, প্রথম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, কলকাতা, তারিখবিহীন।
খগেন্দ্রনাথ মিত্র : বৈষ্ণব পদাবলী, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬১।
খোন্দকার রফিউদ্দীন (সম্পাদক) : ভাবসংগীত, ২য় সংস্করণ, হরিশপুর, যশোর, ১৯৬৭।
খোন্দকার রফিউদ্দীন (সম্পাদক) : মহৎ পদাবলী, ১ম সংস্করণ, হরিশপুর, যশোর, ১৩৩৭।
খোন্দকার রিয়াজুল হক : লালন শাহের পুণ্যভূমি : হরিশপুর, প্রথম সংস্করণ, হরিশপুর, যশোর।
খোন্দকার রিয়াজুল হক : মরমী কবি পাঞ্জু শাহ জীবন ও কাব্য, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯০।
খোন্দকার রিয়াজুল হক : লালন মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, লালন কেন্দ্রীয় পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯২।
ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার বাউল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪।
ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, লেখক সমবায় সমিতি সংস্করণ, লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা, ১৯৬৫।
ক্ষিতিমোহন সেন : কবীর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ (অখণ্ড), জুন ১৯৯৫।
ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, কলকাতা বিশ্বভারতী, ১৯৫০।
ক্ষুদিরাম দাস : বৈষ্ণব রস প্রকাশ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লি., কলকাতা, ১৩৭৯।
ক্ষুদিরাম দাস : রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়, দ্বিতীয় প্রকাশ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬১।
গোপীনাথ কবিরাজ : তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৬৯।
গোলাম সাকলায়েন : ফকীর গরিবুল্লাহ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৬৮।
গোলাম সাকলায়েন : বাংলাদেশের সুফীসাধক, ৩য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২।
গুরু সদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক : শ্রীহট্টের লোকসংগীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।

গোলাম খুরশিদ : রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩।
গোলাম মকসুদ হিলারী : ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রথম প্রকাশ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ১৯৭৪।
গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী : বাংলার সাধক, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭।
চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : রামাই পণ্ডিতের শূন্য প্রাণ (সম্পাদিত), কলকাতা।
চিত্তরঞ্জন দেব : বাংলার পল্লীগীতি, প্রথম সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৬৬।
জয়ানন্দ : চৈতন্যমঙ্গল, সম্পাদক এন.এন. বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩১২।
জলধর সেন : কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩২০-২১।
জসীমউদ্‌দীন : মুর্শীদা গান, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭। লালন ফকির বঙ্গবাণী কলকাতা, ১৯৩৩।
তুষার চট্টোপাধ্যায় : লালন স্মরণিকা (সম্পাদিত) চাকদহ কলেজ নদীয়া, ১৯৭৬।
তারাচাঁদ দাস : বাউল সংহিতা, কলকাতা, ১৯৬১।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৭৬।
ত্রিদিবনাথ রায় (সম্পাদিত) : বাৎস্যায়নের কামসূত্র, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০।
দয়ানন্দ সরস্বতী : সত্যার্থ প্রকাশ, অনুবাদ ও সম্পাদক : প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ, অর্থ সমাজ মন্দির, কলকাতা, ১৩৮৭।
দক্ষিণারঞ্জন বসু : সাংস্কৃতিক ধর্ম, প্রথম প্রকাশ, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৭১।
দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎ বঙ্গ, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানগণ, কলকাতা, ১৯৪০।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকায়ত দর্শন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯।
দুর্গাদাস লাহিড়ী : বাঙ্গালীর গান, কলকাতা, ১৩১২।
দুর্গাদাস লাহিড়ী : ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেড লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬০।
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ: মরমী কবি হাসান রেজা, প্রথম সংস্করণ, মঞ্জিল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৮৯।
দুলাল চৌধুরী : শান্তিনিকেতনের উৎসব এবং রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬।

নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ দ্বাদশ, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বকোষ প্রেস, কলকাতা, ১৩১৮।
নির্মলকুমার বসু : হিন্দুসমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯১।
নরহরি চক্রবর্তী : ভক্তি রত্নাকর, গৌড়ীয়, মিলন, রাগবাহার, কলকাতা, ১৯৮৭।
নরেন্দ্রনাথ দেব : রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, পঞ্চদশ সংস্করণ, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১৯৫৫।
নিত্যানন্দ দাস : প্রেমবিলাস, মুর্শিদাবাদ, ১৩১৮।
নজরুল ইসলাম : সঞ্চিতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬৪।
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বিদ্যাপতি পদাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৪২।
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : সমাজ সমীক্ষা, অপরাধ ও অনাচার, গ্রন্থ প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৬৮।
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : সাহিত্য-সংস্কৃতি : সময়, বাক সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৬৯।
নীতাসাহা কুঠিয়াল : প্রাচীন বাংলা গান, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৯।
নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০০।
নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, ৫ম সংস্করণ, নিউ এজ, কলকাতা, ১৯৬২।
নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ, কলকাতা, ১৩৫২।
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত : বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৪৮।
নিতাই বসু : রবীন্দ্রসংগীতের উৎস, সম্পাদক সাহিত্যায়ন, কলকাতা, ১৯৯০।
নারায়ণ ভট্টাচার্য : অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৭০।
পঞ্চানন মণ্ডল : পুঁথিপরিচয়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৮।
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা।
পাঞ্জু শাহ : ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর, ৩য় সংস্করণ, খোন্দকার রফিউদ্দীন প্রকাশিত, হরিশপুর, যশোর, ১৯৬১।
প্রশান্ত রায় : বাউল সাধনার কাঠামো, বীরভূম ১৩৮৯।
পুলিনবিহারী সেন (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রায়ন, ২য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৬৮।
প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বাউলের ধর্ম, উত্তরা, কলকাতা, ১৩৩৮।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৯।
প্রবোধচন্দ্র সেন : ছন্দ জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৪।
প্রবোধচন্দ্র সেন (সম্পাদিত) : ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২।
পরিতোষ দাশ : সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, ফার্মা, কে.এল.এম. কলকাতা, ১৯৭৮।
পরিতোষ দাশ (সম্পাদিত) : চৈতন্যদেবের প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি, ভারতীয় বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৮৮।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬৭।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭২।
প্রমথনাথ বিশী : শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭২।
প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, ৩য় সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬১।
প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র সরণী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭২।
প্রশান্ত কুমার পাল : রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯২।
প্রিয়ব্রত চৌধুরী : রবীন্দ্রসংগীত, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৭।
ফকির এলাহি বখ্‌শ : দেহতত্ত্ব সঙ্গীত, ৪র্থ প্রকাশ, মফিজ বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৮০।
বসন্তকুমার পাল : মহাত্মা লালন ফকির, ১ম সংস্করণ, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩৬২।
বিনয় ঘোষ : বাংলার নবজাগৃতি, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৭১।
বিনয় ঘোষ : বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৬।
বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮০।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ধর্মতত্ত্ব, ২য় মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৮৯৮।
বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত) : বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটরস কলকাতা, ১৯৯৫।
বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত (কাঞ্চন বসু সম্পাদিত), রিয়েন্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৩।
বুদ্ধদেব বসু : কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৬৬।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ : চরক সংহিতা (সম্পাদিত), নবভারত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪।
ব্রজসুন্দর সান্যাল : মুসলমান বৈষ্ণবকবি, ১ম খণ্ড, রাজশাহী, ১৩৮০।
বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর : বাউলগান ও দুদ্দু শাহ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৭১।
বিমানবিহারী মুজমদার : চৈতন্যচরিতের উপাদান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭০।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৮।
ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম সংস্করণ, বুক ল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৭।
ভুবনমোহন ঘোষ : সঙ্গীত সংগ্রহ/ বাউলের গাঁথা, ২১০/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা, ১২৯০।
মতিলাল দাস ও পীযুষকান্তি মহাপাত্র : লালন গীতিকা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৯।
মণীন্দ্রমোহন বসু : চর্যাপদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী (সম্পাদিত) : আদ্য পরিচয়, শেখ জাহিদ বিরচিত, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৩৭১।
মনিরুদ্দিন ইউসুফ (সম্পাদিত) : রুমীর মসনবী, প্রথম সংস্করণ, ওসমানী বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৬৬।
মুনশী বুদ্দুশাহ : ছহি দিদার এলাহি, ৪র্থ সংস্করণ, সোলেমান-আফতাব-কমরুদ্দীন প্রকাশিত, আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা, ১৩৩৯।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৫।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, রেনেসাঁ প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৫।
মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৫।
মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সুফী প্রভাব, প্রথম সংস্করণ, মোহসীন এ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৩৫।
মালাধর বসু : শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউলগান, কলকাতা, ১৩৭৮।

মুহাম্মদ আব্দুর রহিম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনূদিত), প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২।

মুহম্মদ আবদুল হাই : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহম্মদ আব্দুল হাই : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৫।

মুহম্মদ আব্দুল হাই : লালন শাহ ফকির, ঢাকা, ১৯৮০।

মুহাম্মদ ইনামুল হক : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ : মানুষের ধর্ম, তৃতীয় সংস্করণ, গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৯।

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ : পারস্য প্রতিভা, প্রথম খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ, গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৩।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৩৭।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি, ২য় খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৪২।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও মুহম্মদ আব্দুল হাই (সম্পাদিত) : হারামণি, পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৬৮।

মুহম্মদ আব্দুল হাই (সম্পাদিত) : হারামণি, ষষ্ঠ খণ্ড, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৫।

মুহম্মদ আব্দুল হাই (সম্পাদিত) : হারামণি, সপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহম্মদ আব্দুল হাই (সম্পাদিত) : পাকিস্তানের লোকগীতি (সম্পাদিত), পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৬৬।

মুহম্মদ আবু তালিব : লালন শাহ ও লালন গীতিকা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৮।

মোহাম্মদ আশরফ খাঁ : মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, আজাদ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৬৫।

মোহাম্মদ গোলাম রসুল : বিশ্বমরমী চিন্তাধারায় রুমী, প্রথম প্রকাশ, ইসলামি ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৭৭।

মণীন্দ্রমোহন বসু : সহজিয়া সাহিত্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২।

মযহারুল ইসলাম : কবি পাগলা কানাই, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৫৯।

মযহারুল ইসলাম : বাউল, বেতার কথিকা, ৬ মে, ১৯৬৭।

মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন (কাশিমপুরী) : বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ : বানুমোল্ল্যার শায়েরী (সম্পাদিত), প্রথম সংস্করণ, তালতলা, যশোর, ১৩৪৬।

মীর মশাররফ হোসেন : সঙ্গীত লহরী, কলকাতা, ১২৯৪।

মুনীর চৌধুরী : মীর মানস, ঢাকা, ১৩৮৩।

ম. মনিরুজ্জামান : লালন জীবন ও সমস্যা, কুষ্টিয়া, ১৯৭৮।

ম. মনিরুজ্জামান : লালন ফকিরের গান, কুষ্টিয়া, ১৯৮৭।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য : বাংলায় বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, প্রথম সংস্করণ, বুক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া লি., কলকাতা, ১৩৬৬।

রূপগোস্বামী : বিদগ্ধ মাধব, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত এবং সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, মুর্শিদাবাদ, ১৩৩১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী ১-৪৬ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৩৬৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৬১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছন্দ (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি চ-স, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৮।

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৩।

রামই পণ্ডিত : শূন্য পুরাণ, সম্পাদনা নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৩৪।

রেয়াজউদ্দিন আহমদ : বাউল ধ্বংস ফৎওয়া ১ম খণ্ড, রংপুর ১৩৩২।

রেয়াজউদ্দিন আহমদ : বাউল ধ্বংস ফৎওয়া ২য় খণ্ড, রংপুর ১৩৩৩।

রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী : 'কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত', ঢাকা, ১৩৯১।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৭২।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতীয় সাধনার ঐক্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৫২।

শাহ্ মুহম্মদ সগীর : ইউসুফ জোলেখা (মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত) বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শাহ আব্দুর রহমান : শরফুল ইসলাম, হামিদুর রহমান সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ, প্রভেন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৮৭।

শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৭৮।

শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৬।

শুভগুহ ঠাকুরতা : রবীন্দ্রসংগীতের ধারা, দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৬।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার : রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ, ঢাকা, ছায়ানট, ১৯৭৬।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৪।

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : প্রাচীন প্যালেস্টাইন ও রাসসামারায় আবিষ্কার, ক্যানানাইট সাহিত্য ও ধর্ম

শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত : বাউল সম্প্রদায়, গৃহস্থ, কার্তিক, ১৩২০।

শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস : সংসদ বাংলা অভিধান, সংশোধিত ও পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬০।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাংলা সাহিত্যে অভিধান, ১ম ও ২য় ভাগ, ৪র্থ মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৪।

শক্তিনাথ ঝা : বস্তুবাদী বাউল, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবাংলা সরকার, কলকাতা, ১৯৯৯।

সনৎকুমার মিত্র : লালন ফকির : কবি ও কাব্য, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৩৮৬।

সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানের আমল, প্রথম প্রকাশ, ভারতী বুকস্টল, কলকাতা, ১৯৬২।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সাংস্কৃতিকী ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮২।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, অষ্টম সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৭৪।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্রনাথের গান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬১।

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৪।

সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯।

সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্য সভা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩৬২।

সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৩৬৮।

সজনীকান্ত দাস : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭০।

সৌম্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলার বাউল, কাব্য ও দর্শন, কলকাতা, ১৯৬৪।

সাবিত্রী ঘোষ : বাংলা গানের ইতিবৃত্ত, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬।

সুধীর চক্রবর্তী : সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫।

সুধীর চক্রবর্তী : বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৬।

সুধীর চক্রবর্তী : ব্রাত্য লোকায়ত লালন, পুস্তব বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাচীন ভারতে অপরাধতত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞান, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৯২।

সোলায়মান আলি সরকার : বাংলার বাউল দর্শন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২।

সোলায়মান আলি সরকার : লালন শাহের মরমী দর্শন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, মনীষা, কলকাতা ১৯৮৬।

সুলতানা আফরোজ : জাতিভেদ প্রথা এবং বাংলাদেশের বাউল সমাজ, কুষ্টিয়া, ১৯৮৮।

সুশীল রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৩৭০।

সিরাজুল ইসলাম : বাংলার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসক কাঠামো, (১৭৫৭-১৮৫৯), প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪।

সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা, ১৯৯৬।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম, কলকাতা, ১৩৫৫।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধগান ও দোহা (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৬।

হাবিবুর রহমান : বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২।

হেমাংগ বিশ্বাস : লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম, প্রথম সংস্করণ, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৮৫।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ ব-স, কলকাতা, ১৩৪১।

হুমায়ুন কবির : বাংলার কাব্য, কলকাতা, ১৪৬৫।

Books in English

Ali Muhammad Mohor : History of the Mulsims of Bengal. Vo. IA, Riyadh.

Ahmed Rafiuddin : The Bengal, Muslims 1871-1906, a quest for identity, Delhi, 1983.

Avalan Arther : Principles of Tantra, 1914.

Avalan Arther : The Great Liberation (Mahanirvana Tantra) 3rd ed. Madras 1953.

Aziz Ahmad : Studies in Islamic Cullture in the Indian Environment Oxford : Clarendan Press, 1964.

Ahmed Imtiaz (ed) : Caste and Social Stratification Among the Muslims, Delhi, 1981.

Ahmed Imtiaz (ed) : Ritual and Religion Among Muslims in India, Delhi 1973.

Adam, J.N. : The Latin Sexual Vocabulary, Duckworth, London, 1982.

Arberry Arrthur John : The Doctrine of Sufis, Cambridge University Press, U.K. 1935.

Barth, A : The Religions of India, London 1906.

Buchann, F : A Journy from Madras through the countries of Mysore, Canare and Malabar, London, 1807.

Bose, Manindra Mohan : The post Caitanya Sahajia cult of Bengal, Gian Publishing House, Delhi, India, 1986

Bose, Pramatha Nath : A History of Hindu Civilization during British Rule, Vol. I, Calcutta, 1894.

Bhattacharyya, Jogendranath : Hindu caste and sects, 1896 Calcutta.

Briffault : The Mothers, Vol III, London 1952.

Briffault : Bengal District Gazetters (Nadiya) Census of India 1872-1911.

Bagchi, Probodh Chandra 1, : Studies in the Tantras, Part Calcutta University, Calcutta, 1939.

Bagchi, Probodh Chandra : The Cult of the Buddhist Siddhacaryas, In Cultural Heritage of India, Vol 4, edited by Haridas Bhattacaryya, Ram Krishna Mission, Institute of Culture, Calcutta 1956.

Bake, Arnold : Rabindranath Tagore Music : In the Golden Books of Tagore, edited by Ramananda Chatterjee, Calcutta, 1931.

Bashm A.L. : Aspects of Ancient Indian Culture, Bombay. Asia Publishing House, 1966.

Bharati Agehananda : The Tantric Tradition, London, 1965.

Bhattacarya, Deben : The Mirror of the Sky, London, Allen and Unwin, 1969.

Bose, Sanat Kumar : "Baul Song of Bengal : In Folkmusic and folklore : An Anthology, Vol. I, edited by Hemango Biswas, Calcutta Folkmusic and Folklore Research Institute, 1967.

Bhattacarya, Ranjit Kumar : Moslems of Rural Bengal, Subarnarekha, Calcutta, 1991.

Bhattacaryya, Narendra Nath : History of Indian Erotic Literature. Munshiram Monoharlal, New Delhi, 1975.

Bihari Bankey : Sufis Mystics and Yogis of India, Bombay Bhavans Book University, 1962.

Berke, O.M. : Among the Dervishes, The Octagon Press, (2nd edition) London, 1993.

Chatterji, Suniti Kumar : Islamic Mysticism Iran and India. Indo-Iranica Vol. No-2, 1946.

Chattopadhyaya. Debiprosad : Lokayata, New Delhi, 1968.

Choudhury, M.L. Roy : The State and Religion in Mughol India, Calcutta 1951.

Choudhury K.N. : The Economic Development of India under the East India Company, 1813-1838, Cambridge 1971.

Capwell, Chariles : The Music of the Bauls of Bengal, Kent, Ohio 1986.

Chakravarty Surat Chandra : Bauls : The Spiritral Vikings Calcutta, Firma. KLM 1980, Census of India : 1891 Vol I, Part-I, Vol. II, Part-II 1901, Vol I Part-I

Crooke. W. : An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India. 2 Vols. Munshiram Monoharlal Pvt. Ltd. New Delhi (1st edition) 1968.

Crooke. W. : Secret Messages and Symbols used in India, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. V, Part-IV, New Delhi.

Dasgupta Shashibhusan : Obscure Religious Cults, Firma K.L. Mukhopadhyaya, Calcutta, 1969.

Dasgupta Shashibhusan : An Introduction to Tantric Buddhism, Calcutta University, 1974.

Das Gupta, S.N. : A History of Indian Philosophy, Vols I to V, Motilal Banarasi Dass, New Delhi, 1978.

Das Gupta, S.N. : Hindu Mysticism, Motilal Banarasi Dass, New Delhi, 1982.

Dimock (joniur). Edward C : The Place of the Hidden Moon, University of Chicago Press, Chicago U.S.A., 1967.

Dimock (joniur) Edward, C : Greatest of the Bauls of Bengal, Journal of the Asian Studies, Michigan, 1959.

Dacids, T.W. : Buddhism, London, 1896.

Dey, Lal Behari : Bengal Peasant Life, Calcutta 1970.

De. S.K. : Ancient Indian Erotics and Erotic Literature, Firma K.L.M. Calcutta, 1969.

Daniel, June Mc : The Madness of the Saints. Esoteric Religion in Bengal, Chicago, 1989.

Dikshit, K.N. : Memoirs of the Archaeological Survey of India, No-55, Delhi, 1938.

Douglas, J.D. : The New Dictionary of Bible, London.

Dutt. Gurusaday : The Folk Dances and Folk Songs of Bengal, Culcutta, 1932.

Ehrenfels, O.R. : Mother Right in India, Hyderabad 1941.

Eliade, M. : The Encyclopedia of Religion, Vols. 2,6,13. Macmillan Publishing House, New York, U.S.A.

Eliade, M. : The Quest : History and Meaning in Religion, Chicago University Press, Chicago, 1969.

Eliade, M. : Yoga : Immortality and Freedom (tr. W.R. Trask) Routledge and Kagan Paul, London, U.K. 1958.

Engels, F. : Diabetics of Nature (reprint) Moscow, U.S.S.R. 1966.

Fleming, W.K. : Mysticism in Christianity, London, 1913.

Frazer, James George : The Golden Bough I-Volume Abirdged edition, Collier Books, New York, 1963.

Fowler. H.H. : Modern English Usage, 2nd ed Oxford, London, 1965.

Friedmann. Y, : A Contribution to The Early History of Islam in India, Jerusalem 1951.

Gulik, Robert Hausvan : Sexual life in Anceint China : A Preliminary Survey of chinese sex and society Ca. 1500 B.C. till 1644 a. d. Leiden : E.J. Brill, 1961.

Ghazali. A. (trans by C. Fieldl) : Kimiya-i-Sa'adat, Octagon Press London, 1980.

Ghure. G. S. : The Indian Sadhus, Popular Book Depot. Bombay, 1953.

Goldman, Lacian : Genetic Structuralism. In Sociology of Literature, Elizabeth and Tom Burns (ed.) London, 1973.

Huq. M. Enamul : Impact of Islam on The Gaudion form of Vaishnacvism, JASP Vol-XIII, No-2, 1968.

Huq. M. Enamul : A History of Sufism in Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1975.

Hasrat, Bikramjit : Dara Shikuh : Life and Work. Munshiram Monhorlal, New Delhi, 1982.

Hastings, J. (edited) : Encyclopedia of Religion and Ethics, Vols. IX, XII, New York, U.S.A. 1956.

Hossain. A : The Philosophy of Faqirs, Lahore, 1932.

Hunter. W.W. : A Statistical Accuont of Bengal, Vol. IX, Trubner and Co. London, U.K. 1876.

Hunter. W.W : The Indian Mussalmans (3rd ed.) London, U.K. 1876. Annals of Rural Bengal, London 1897.

Hasan, Syed Mahmudul : Islam, Islamic Foundation, Dhaka. 1982.

Hornby, A.S. : The Advanced Learners Dictionary of Current English, 1963.

Haras, Father : The Religion of Mohenjo Daro according to inscription (Journal of the University of Bombay, Vol, V, Part-1).

Johari. Harish : Dhanwantari, Calcutta 1986.

Joseph Jastrow : Frued : His Dreams and Sex theories, London.

Jasimuddin : Folk Music of East Pakistan, Journal of International Folk Music Council 3: 41-44, 1951.

Kokan. M.Y. : Arabic and Persian in Carnatic, Madras, 1974.

Khan. F.A. : Recent Archacalogical Discoveries in East Pakistan, Karachi.

Karim, A.K. : The Dynamics of Bangladesh Society, Nawroz Kitabisthan, Dhaka, 1980.

Karim, Abdul : Social History of the Muslims in Bengal, 1958.

Kothari, K.S. : Indian Folk Music Instruments New Delhi, 1968.

Kennedy, Melville T. : The Chaitanya Movement : A Study of The Vaisnacesm of Bengal, Calcutta. 1925.

Kuckertz. Josef : Origin and Construction of The Melodies in Baul Songs of Bengal, Yearbook of the International Folk Music Council, 7 : 85-91, Canada, 1975.

———